আত্মকথা

রাজেন্দ্র প্রসাদ

আত্মকথা

প্রিয়রঞ্জন সেন

অনূদিত

সাহিত্য অকাদেমী

নিউ দিল্লী

ভূমিকা

১৯৪২-৪৫ সালে জেল-প্রবাসে লেখা আমার স্মৃতিকথা, জানুয়ারী ১৯৪৭ সালে 'আত্মকথা'-রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ অবধি যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল মূল গ্রন্থে অথবা পরিশিষ্টে সেগুলি সন্নিবিষ্ট করা গিয়াছিল। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে মূল হিন্দীর গুজরাটী ও ইংরেজী অনুবাদও বাহির হইয়া গিয়াছিল। চাহিয়াছিলাম ১৯৪৭-৫৬ পর্যন্ত আমার সম্পর্কিত সকল ঘটনার বিবরণ দিতে। সে-সব ঘটনা অ-সাধারণ ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণও বটে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেও দেশের সঙ্গে ইহাদের গভীর যোগ আছে। ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা যাইতে পারিত, কিন্তু এখন না আছে অবকাশ, না অনুকূল অবস্থা। এজন্য এ-সব বিষয়ে বইয়ে কিছু লিখিলাম না। তথাপি অতীত দিনের স্মৃতি কোনো-না-কোনো রূপে এই পুস্তকে বর্তমানের পটভূমিরূপে আছে। ১৯৪৭ হইতে আজ পর্যন্ত যে-সব হেরফের হইয়াছে, রাজ্যের যে গঠন হইয়াছে, গঠনকর্মের যে-সব রূপরেখা বাহির হইয়াছে, তাহাদের গূঢ় প্রভাব আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ব অধ্যায় হইতে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকল ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের জন্য 'আত্মকথা' নির্বাচন করিয়া সাহিত্য অকাদেমী আমাকে যে-সম্মান দেখাইয়াছেন সে-জন্য আমি অকাদেমীর নিকট কৃতজ্ঞ।

আমার বাসনা ছিল যে ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আরও অধিক আদান-প্রদান হউক, উত্তরোত্তর সকলে আরও নিকটে আসুক। এই ভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ঢিলা যোগসূত্র আবার কসিয়া বাঁধা যাইবে ও তাহা দৃঢ় হইবে। এই দৃষ্টি হইতে ভারতের অন্তর্গত যে-কোনোও ভাষা হইতে নির্বাচিত পুস্তক দেশের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করার যে-উদ্যোগ সাহিত্য অকাদেমী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করি। আমি সাহিত্য অকাদেমীর এই প্রয়াসের সফলতা কামনা করি এবং আশা করি যে অ-হিন্দীভাষী পাঠকও অকাদেমীর অন্যান্য ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ অনুমোদন করিবেন।

১৯-১১-৫৮

সূচীপত্র

আমার পূর্বপুরুষেরা ১
আমার ভাইবোন ৪
মৌলবী সাহেব ৮
গ্রামের জীবন ১২
ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ ২০
বিবাহ ২৫
হাতোয়া স্কুলে ভর্তি—ছাপরা স্কুলে প্রত্যাবর্তন . . ৩০
কলেজে ভর্তি ৪২
পরীক্ষায় অশ্রদ্ধা ৪৯
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৫৩
সমুদ্রযাত্রার বিষয়ে আন্দোলন ৬০
ছাত্র সম্মেলন ও কংগ্রেস ৬৭
বিদেশযাত্রার ব্যর্থ চেষ্টা ৭২
ছাত্রজীবনের অবসান ৭৫
ওকালতির জন্য তৈরি ৮০
মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ . . ৮৬
পাকাদেখায় যৌতুক-প্রথা ৯০
ওকালতি আরম্ভ ও এম্. এল্. পরীক্ষা . . ৯২
পাটনায় আগমন ও পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল . . ৯৯
হিন্দী ও সেবা ১০২
গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ১০৫
চম্পারন আন্দোলনের পূর্বে ১১১
গান্ধীজী ও চম্পারন ১১৬
চম্পারনে সত্যাগ্রহের ফল ১২৪
কলিকাতা কংগ্রেস হইতে দিল্লী কংগ্রেস . . . ১২৯
প্রিয়জন বিয়োগ ১৩৪
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৩৬
রাউলট-বিল-বিরোধী আন্দোলন ১৩৮
৬ই এপ্রিল ও সামরিক আইন . . . ১৪৪
পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ . ১৪৭
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অসহযোগ . . ১৫৮
বিহার বিদ্যাপীঠ ও সদাকত-আশ্রম . . . ১৬০

পূর্ণ অসহযোগ ১৬৬
'দেশ' ও 'সার্চলাইট' ১৭০
আন্দোলনের জোর ও সরকারি দমননীতি . . ১৭৩
এক মজার ঘটনা ১৭৮
হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও খাদি-প্রচার . . . ১৮৪
মোপলা-বিদ্রোহ ও হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন . . ১৮৯
ছাপরার ভীষণ বন্যা ২০০
সত্যাগ্রহের আয়োজন ২০৫
গ্রেপ্তার ও মীমাংসার চেষ্টা ২০৮
আমেদাবাদ কংগ্রেস ও সত্যাগ্রহ . . . ২১৩
চৌরিচৌরা, সত্যাগ্রহে বিরতি, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার . . ২১৭
গঠনকর্মের আরম্ভ ও আইন অমান্য কমিটির নিয়োগ . ২২৬
বিহারে কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ ও তাহার আয়োজন . . ২৩০
আসাম ও সাঁওতাল-পরগনায় দমননীতি . . ২৩৪
কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া বাক্ বিতণ্ডা . . ২৩৯
'গুরু-কা-বাগ' ও মুলতান ২৪১
গয়া কংগ্রেস ২৪৬
স্বরাজ্য দলের জন্ম ২৫৩
স্বরাজ্য দলের সঙ্গে রফার বিফল প্রয়াস . . ২৫৬
পতাকা-সত্যাগ্রহ ও গান্ধী-সেবাসংঘ . . . ২৬০
দিল্লীর বিশেষ অধিবেশন হইতে কোকনদ কংগ্রেস পর্যন্ত . ২৬৩
হাইকোর্টে বর্মার মামলা ২৬৬
বেতিয়ার মীনা-বাজার ২৬৮
জুহুর কথাবার্তা ও তাহার পরবর্তী ঘটনা . . ২৭২
একুশ দিনের উপবাস ও একতা সম্মেলন . . ২৭৭
পাটনা মিউনিসিপ্যালিটিতে . . . ২৮২
স্বরাজ্য দলের চুক্তি ও বেলগাঁও কংগ্রেস . . ২৯২
বুদ্ধগয়ার মন্দির ২৯৫
বেলগাঁওয়ের পরে ২৯৭
দেশবন্ধুর দেহাবসান ৩০১
সমাজসংস্কার ৩০৪
কাউন্সিলের নির্বাচন ও মহাত্মা গান্ধীর বিহার-সফর . ৩০৬
স্বরাজ্য দলে মতভেদ ও কানপুর কংগ্রেস . . . ৩১০
কংগ্রেসে স্বতন্ত্র দল ৩১৪
বিহার-বিদ্যাপীঠ এবং খাদি-প্রচার . . . ৩২১

আমার আসাম-যাত্রা ৩২৮
গৌহাটি কংগ্রেস ৩৩১
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ৩৩৪
সাইমন কমিশন ও মান্দ্রাজ কংগ্রেস . . . ৩৩৭
সিংহল যাত্রা ৩৪০
ইউরোপ যাত্রা ৩৪২
লণ্ডনে কার্যক্রম ও মকদ্দমার তদ্বির . . . ৩৪৯
যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন ৩৫৫
রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যুবক-সম্মেলন . . ৩৫৯
জার্মানী ও ইটালি ভ্রমণান্তে দেশে প্রত্যাগমন . . ৩৬২
সাইমন কমিশনের পুনরাগমন ৩৬৫
কলিকাতা কংগ্রেস ও সর্বদল সম্মেলন . . . ৩৭১
দুঃখের দিন ৩৭৫
রাজবন্দীদের শ্রেণী-বিভাগ ৩৭৮
জামসেদপুরে শ্রমিক ধর্মঘট ৩৮২
এক ঘরোয়া ব্যাপার ও সরকারি ঘোষণা . . . ৩৮৪
বর্মা ভ্রমণ ৩৮৬
লাহোর কংগ্রেস ও মৌলানা মজহর-উল-হক সাহেবের মৃত্যু . ৩৮৯
স্বাধীনতা দিবস ও লবণ সত্যাগ্রহ . . . ৩৯৩
গান্ধীজীর ডাণ্ডীযাত্রা ও নেহেরুজীর বিহার ভ্রমণ . . ৩৯৬
বিহারে লবণ-সত্যাগ্রহ ৩৯৮
লবণ সত্যাগ্রহের পরের কার্যক্রম . . . ৪০৩
বিদেশী বস্ত্রবর্জন ও মদ্যপান নিবারণ . . . ৪০৬
বীপুরে সত্যাগ্রহ ৪০৯
আমার গ্রেপ্তার হওয়া : ছাপরা জেলে অবস্থান . . ৪১৬
হাজারীবাগ জেলে ৪২১
গোলটেবিল কনফারেন্স ও পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যু . . ৪২৬
গান্ধী-আরুইন চুক্তি ৪৩১
করাচি কংগ্রেস ৪৩৪
ত্রিবর্ণ পতাকার রাষ্ট্রীয় রূপ ৪৩৮
গোলটেবিল সভায় গান্ধীজী ৪৪১
সরকারি চণ্ডনীতি ৪৪৬
হরিজনদের জন্য গান্ধীজীর অনশন . . . ৪৫৫
অস্পৃশ্যতা বর্জনের চেষ্টা ৪৫৮
প্রয়াগে একতা সম্মেলন ৪৬৪

দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার ও বিহারের ইউনাইটেড পার্টি . . ৪৬৭
কঠিন রোগ ৪৭৩
বিহারের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ৪৭৭
বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির সেবাকর্ম . . . ৪৮৩
ভূমিকম্পের পরে বন্যা ৪৮৯
সত্যাগ্রহ স্থগিত ৪৯৫
দাদার মৃত্যু ও ঋণসংকট ৪৯৮
ঋণমুক্তি ও বোম্বাই কংগ্রেস ৫০৬
বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আয়োজন ও কর্মাধিকারী . . ৫১০
কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন-সংঘর্ষ . . . ৫১৯
মিঃ জিন্নার সঙ্গে বোঝাপড়া ও সারাদেশ ভ্রমণ . . ৫২২
কংগ্রেসের ইতিহাস ও দেশীয় রাজ্যের সমস্যা . . ৫৩৮
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ৫৪৫
কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী ৫৫১
লখনউ-কংগ্রেস ৫৫৪
নাগপুরে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন : রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন . ৫৫৮
প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন ৫৬৫
ফৈজপুরে কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রথম গ্রামে অধিবেশন . ৫৭৫
নির্বাচনের জন্য ভ্রমণ ও তাহার ফল . . . ৫৭৭
কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠন ৫৯১
সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ ৫৯৭
মন্ত্রীমণ্ডলের বিধানগত অসুবিধা . . . ৬০১
চাষী ও জমিদারের বোঝাপড়া ৬০৩
কানপুরের মজদুর কমিটি ও আমার কঠিন পীড়া . . ৬১৪
মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ ও হরিপুরা কংগ্রেস . . ৬১৬
বিহারের শ্রমিক-সমিতি ৬১৮
বিহারে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কাজ ও বন্যা-নিবারণের উপায় . ৬২৩
গান্ধী-সেবা সঙ্ঘ ৬২৬
গ্রাম সংস্কারের পরিকল্পনা ও নাসিকে অবস্থান . . ৬২৮
মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের শোচনীয় কলহ . . . ৬৩৩
আসাম ও উড়িষ্যার মন্ত্রীসভা . . . ৬৩৮
ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে . . . ৬৪১
অপ্রিয় কর্তব্য ৬৫৩
উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভা . . . ৬৫৭
রামগড় কংগ্রেসের জন্য স্থান নির্বাচন . . . ৬৬১

কংগ্রেস ও ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৬৬৩
রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন . . . ৬৭৪
বিহারের তিন কমিটি ও সোনপুর শিবির . . ৬৮১
মুসলিম লীগের বিষয়ে ৬৮৯
ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, কারণ ও পরিণাম . . . ৬৯১
মহীশূর যাত্রা ৬৯৯
বিহার শরীফের দাঙ্গা ও ভারতীয় জাহাজ কোম্পানি . ৭০১
ঢাকার দাঙ্গা ও বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা . . . ৭০৪
যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা ও ক্রিপ্‌স্‌ পরিকল্পনা . . ৭০৮
ক্রিপ্‌স্‌ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানের পর . . . ৭১৫
যুদ্ধকালে দেশের অবস্থা আর বিহার পরিভ্রমণ . . ৭১৮
১৯৪২-এর বিপ্লবের পূর্বকথা . . ৭২৪
১৯৪২-এর ঝড়ের দিনে . . . ৭২৯
বিয়াল্লিশ সালের বন্দীজীবন . . . ৭৩৩
বিয়াল্লিশ সালের উত্তেজনার পরিণাম . . . ৭৪২
বাংলার দুর্ভিক্ষ ও ভারতের অখণ্ডতা . . . ৭৪৮
জেলে বই লেখা . . . ৭৫০
আমার মুক্তিলাভ ও বিয়োগ দুঃখ . . . ৭৫৬
অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে ৭৬১
পীড়িত রাজবন্দীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্‌যোগ . . ৭৬৯
এসেম্‌ব্‌লির নির্বাচন আর পার্টির কথা ৭৭৪
গোসেবার কার্য ৭৭৯
ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ্‌ ৭৮৩
১৯৪৬-এর ঘোষণা ও সরকারি পরিকল্পনা . . ৭৮৪
কলিকাতার হত্যাকাণ্ড ৭৯৩
অস্থায়ী সরকারের পূর্বাহ্ণে ৭৯৫
পরিশিষ্ট ৭৯৯

আমার পূর্বপুরুষেরা

উত্তর প্রদেশে এক স্থান আছে, তাহার নাম আমোরা। শোনা যায়, সেখানে কায়স্থদের বড় বসতি আছে। অনেক কাল পূর্বে সেখান হইতে একটি পরিবার বাহিরে আসিয়া পূর্বাঞ্চলে চলিয়া গেল এবং বালিয়াতে গিয়া বাস করিল। বেশ কয়েক বৎসর বালিয়াতে থাকিবার পর ঐ পরিবারের এক শাখা উত্তর দিকে গিয়া আজকালকার সারণ জেলার (বিহার) জীরাদেই গ্রামে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। অন্য শাখা গয়ায় গিয়া বাস আরম্ভ করিল। জীরাদেই শাখার কেহ কেহ সেখান হইতে সামান্য দূরে অন্য এক গ্রামে গিয়া বাস করিল। জীরাদেইতে যে শাখা বাস আরম্ভ করিল, আমার পূর্বপুরুষেরা সেই শাখা হইতেই উৎপন্ন। যাঁহারা জীরাদেইতে প্রথম আসেন, তাঁহারা হয়তো আমার হইতে সাত আট ধাপ উপরের হইবেন। তাঁহারা ছিলেন গরীব, আর অর্থের সন্ধানেই এদিকে আসিয়াছিলেন; গ্রামে কোনও শিক্ষিত লোক ছিল না। সেকালেও কায়স্থ তো শিক্ষিতই হইত, সেইজন্য গ্রামের লোকেরা তাঁহাদের জায়গা দিয়া গ্রামে রাখিয়া দিল। প্রায় ঐ সময় হইতে হাতোয়া রাজপরিবারের সঙ্গেও তাঁহাদের সম্বন্ধ হইল, সেখানে লেখাপড়ার ছোটখাট ধরনের চাকরি তাঁহাদের একজনের জুটিয়া গেল। হাতোয়া তখন এত বড় রাজ্য ছিল না। এত অর্থাগমও হইত না। হাতোয়া রাজপরিবারের প্রধান স্থান পরে হাতোয়াতে হইয়াছিল। সেকালে ছিল অন্য কোথাও।

আমার পূর্বপুরুষদের সহিত হাতোয়া রাজপরিবারের সম্বন্ধ কয়েক পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল। তাঁহারা রাজ্যে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা জানা যায় না, কিন্তু যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলিতে পারি, সে পদ কিছু উঁচু ছিল না। গ্রামের বাড়িতেও খড়ের চাল ছিল। জীরাদেইতে তাঁহারা অন্য এক কায়স্থ জমিদারের প্রজা ছিলেন—সে জমিদারের জমিদারি ছিল বড়। আর আমরা আজ পর্যন্ত কখনও আমাদের গ্রামের জমিদারির ভাগ পাই নাই, যদিও আমাদের পূর্বপুরুষ পরে কয়েক গ্রামের জমিদার হইয়াছিলেন। ঠাকুরদাদারা ছিলেন দুই ভাই। আমার ঠাকুরদাদার নাম ছিল মিশ্রীলাল। তাঁহার বড় ভাই ছিলেন চৌধুরলাল। অতি অল্প বয়সেই মিশ্রীলালের দেহান্ত হয়। তাঁহার শুধু এক পুত্র ছিল, মহাদেব সহায়; ইনিই আমার পিতা। চৌধুরলালেরও এক পুত্র ছিল, জগদেব সহায়। মিশ্রীলালের অল্পবয়সে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় আমার পিতার সহিত চৌধুরলালজীর বড়ই স্নেহ-ভালবাসা

ছিল, জগদেব সহায় ও মহাদেব সহায় দুইজনকেই তিনি নিজের ছেলের মত প্রতিপালন করিয়াছিলেন ও শিক্ষা দিয়াছিলেন। জগদেব সহায় ছিলেন বড়, তাঁহারও কোনও ছেলে ছিল না, ছিল শুধু এক মেয়ে, সেও মারা যায়। মহাদেব সহায়ের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে হয়; একটি মেয়ে তো শিশু বয়সেই চলিয়া যায়; অন্য দুইটির বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বড় ভগবতী দেবী বিবাহের অল্প দিন পরেই বিধবা হইয়া গেলেন, এবং তখন হইতে আজ পর্যন্ত আমারই বাড়িতে প্রায় সারা জীবনটাই কাটাইয়া দিলেন। অন্য বোনটিও ভাই দুইজনের হইতে বড় ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার বড় ভাইয়ের নাম বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ, আর সবচেয়ে বাড়ির ছোট ছেলে ছিলাম আমি।

হাতোয়া রাজসরকারে চৌধুরলালজী খুব নাম করিয়াছিলেন। তিনি সেখানকার দেওয়ানের পদে উঠিয়াছিলেন। আর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেওয়ান ছিলেন। তখন গদিতে ছিলেন মহারাজ ছত্রধারী সাহী। তিনি নিজের ছেলেকে রাজ্য না দিয়া দিলেন তাঁহার নাতি রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহীকে, তাহাকে রাজ্য উইল করিয়া দিয়া গেলেন। চৌধুরলালকে তিনি খুব বিশ্বাস করিতেন, এবং অল্পবয়স্ক নাতিকে রক্ষা করিবার ভার মরিবার সময়ে তাঁহার উপরই দিয়া গেলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর ছোট কুমারের ভয়ানক বিপদ হয়। আত্মীয় কুটুম্বেরা রাজত্বের দাবি করিয়া মোকদ্দমা শুরু করিয়া দিল। তাহা প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্ত গড়াইল। প্রিভি-কাউন্সিলের রায় হইল যে, হাতোয়া রাজ্য ভাগ করা চলিবে না। আর অবিভাজ্য রাজ্যের উত্তরাধিকার নির্দেশ করার অধিকার রাজারই আছে, এইজন্য রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহীরই রাজ্যে অধিকার। যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহীর প্রাণহানিরও সম্ভাবনা ছিল; এবং তাঁহাকে রক্ষা করা বড় সহজ কাজ ছিল না। শুনিয়াছি, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য চৌধুরলালজী নিজে তাঁহার বিছনার নিকটেই শুইতেন, এবং তাঁহাকে যাহা কিছু খাইতে দেওয়া হইত তাহাতে বিষ দেওয়া হইয়া থাকিবে এই ভয়ে নিজে আগে খাইয়া দেখিতেন। চৌধুরলালজী রাজাকে শুধু রক্ষাই করেন নাই, তিনি রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্যও যথেষ্ট প্রযত্ন করিয়াছিলেন। অনাবাদী জমি চাষ করাইয়া ও অন্য প্রকার উন্নতিসাধন করিয়া তিনি রাজ্যের আয় প্রায় তিনগুণ করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহী এই সব কারণে তাঁহাকে খুব মান্য করিতেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তিও খুব করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার সামনে মহারাজ কখনও তামাক খাইতেন না, আর তিনি আসিতেছেন শুনিতে পাইলে হুঁকা সরাইয়া দিতেন।

সেকালে কর্মচারীদের মাসোহারা বড় কম হইত। চৌধুরলালের

দেওয়ান হইবার সময় মাসে হয়তো ৫০, কি ১০০, লভ্য ছিল। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা তাঁহার বাসায় থাকিত, তাহাদের সকলের জন্য সিধা—চাউল, দাল, ঘি ইত্যাদি—দৈনিক রাজ-ভাণ্ডার হইতে আসিত। রাজ্যের মধ্যে কয়েকটা গ্রামও রাজা তাঁহার জন্য বন্দোবস্তে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে জমি-জিরাত ছিল, সেই জমিতে হইত ধান চাষ, আর তাহা হইতে খুব টাকা আসিত।

চৌধুরলাল শাসনকর্মে খুব পটু ছিলেন, রাজ্যের আয় তো তিনি দুই গুণ তিন গুণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহা হইলেও সেখানকার চাষীরা তাঁহাকে ভালবাসিত, তাঁহাকে বিশ্বাস করিত; আমি নিজের অভিজ্ঞতাতেও তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। অসহযোগের সময় যখন আমি ঐ এলাকায় ঘুরিতাম, তখন আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই বৃদ্ধেরা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তাহার বিশেষ কারণ ইহাও ছিল যে, আমি চৌধুরলালের পৌত্র। চৌধুরলালজী নিজের কুটুম্বদেরও উন্নতি করিয়াছিলেন। সাত-আট হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের জমিদারি তিনি নিজের টাকাতেই কিনিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া চাল বিক্রয় করিয়াই এই জমি কেনা হয়। কয়েকটা গ্রাম আমার দুই ঠাকুরমার নামেই লওয়া হইয়াছিল, কারণ তাঁহারাই তো ঘরে চাউল তৈয়ার করাইতেন, এবং বিক্রয় করিতেন, ও টাকাও তাঁহারাই দিতেন।

উপরে তা বলিয়াছি, চৌধুরলালজী নিজের ছেলে জগদেব সহায় ও ভাইপো মহাদেব সহায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন ইংরেজীর চলন ছিল না, ফারসির শিক্ষা দুইজনেই পাইয়াছিলেন। একবার হয়তো ছাপরায় পাঠাইয়া ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার কথাও হইয়াছিল। আর আমার জ্যেঠা দুই-একখানি বই পড়িয়াও ছিলেন। কিন্তু ইহাতে মহারাজ উৎসাহ দিলেন না, আর দুই ভাইকে ফারসি পড়িয়াই শেষ করিতে হইল। ফারসিও দুই ভাই সেই মৌলবী সাহেবের নিকটই পড়িতে লাগিলেন, যিনি মহারাজের পুত্রকে, অর্থাৎ যিনি পরে মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী হইয়াছিলেন তাঁহাকে, পড়াইতেন।

মহারাজ রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহীর মৃত্যুর পর রাজ্যের ভার কিছু কালের জন্য কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের হাতে গিয়া পড়িল। চৌধুরলালজী ইংরেজী জানিতেন না, তিনি তো আর দেওয়ানের পদে থাকিতে পারিতেন না; আর পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর সে পদে থাকিয়া তার চেয়ে ছোট কোন পদ লইয়াও তিনি নিজের মর্যাদার হানিকর মনে করিলেন, তখন হইতে আমাদের কয় পুরুষের সহিত হাতোয়া রাজের সম্বন্ধ ছুটিয়া গেল। ইহা আমার জন্মের পূর্বেকার কথা, হাতোয়া হইতে চলিয়া আসিবার পর চৌধুর-লালজী জীরাদেইতে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে অল্প-

দিনের জন্য তিনি গোরখপুরে তমুকাই রাজ্যের দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার বয়সও কিছু বেশি হইয়া গিয়াছিল। সেখানকার জলবায়ুও তাঁহার পক্ষে অনুকূল ছিল না; তাই তিনি শীঘ্রই সেখান হইতে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসেন; তাঁহার জীবনের শেষ দিন জীরাদেইতেই কাটিয়াছিল। তমুকাইয়ের কথা আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম।

আমার ভাইবোন

বলিয়াছি, পিতার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ছিলেন ভগবতী দেবী। আমার জন্মের পূর্বেই এক বিশিষ্ট ধনী কায়স্থ পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। আমি যখন নিতান্ত শিশু, চার-পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার শ্বশুর বাড়ি যাই, এবং সেখানকার জাঁকজমক দেখি। আমার ভগ্নীপতিরা ছয় ভাই ছিলেন। সকলের জন্য আলাদা আলাদা চাকর-বাকর লোক-লস্কর ছিল। বিস্তর হাতি-ঘোড়াও পোষা হইত, আর অন্দর মহল ছিল বড়। জানি না, কি ভাবে চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত জমিদারি, যার বাৎসরিক আয় শুনিয়াছিলাম সত্তর-পঁচাত্তর হাজার, সব বিক্রি হইয়া গেল। আমার ভগ্নীপতির মৃত্যুও সেই সময়ে আমাদেরই বাড়িতে, জীরাদেই গ্রামেই হইল। আমি তখন ছোট ছিলাম, তখনকার কান্নাকাটি গোলমাল এবং ঠাকুরদাদা, জ্যেঠামহাশয়, বাবা ও বাড়ির মেয়েদের করুণ দশার চিত্র এখনও ভুলি নাই। সর্বপ্রথম মৃত্যুর দৃশ্য এই দেখিলাম।

ইহার পর আমার ছোট বোনের বিবাহ হইল। দাদারও বিবাহ হইল। এই দুই বিবাহও আমি দেখিয়াছি। দাদার বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলাম। এই সময়ে বোধহয় আমার বয়স ছিল চার বৎসর; সেখানে গিয়া মার জন্য কাঁদিয়াও ছিলাম, তখন পর্যন্ত মাকে ছাড়িয়া দুই এক দিন কোথাও গিয়া থাকা বড় একটা হয় নাই। দাদা আমার চেয়ে আট বৎসরের বড় ছিলেন। ইহাতে আমার অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষার ক্রম যাহা ছিল, আমার জন্যও স্বভাবতঃ তাহাই ঠিক হইত। আর আমি বিশেষ কোনও অসুবিধায় না পড়িয়া তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতাম।

ঘরে ছিলেন চৌধুরলালজী। আমার খুব ভাল করিয়া মনে আছে যে আমি ও আমার জ্যেঠতুতো বোন, যে আমার চেয়ে পাঁচ ছয় মাস ছোট ছিল, দুজনে তাঁহার কোলে লুটোপাটি খাইয়া খেলা করিতাম, তিনিও খুব ভালবাসিয়া আমাদের দুইজনকে খেলা দিতেন। জ্যেঠামশায় তো জমিদারি দেখাশোনা করিতেন, সর্বদা ছাপরায় যাওয়া-আসা করিতেন। সেখানে জমিদারির মোকদ্দমা প্রায়ই কিছু-না-কিছু লাগিয়া থাকিত। দাদাকে ইংরেজী পড়ানোর জন্য ছাপরায় পাঠানো হয়, তাঁহাকে দেখা-শোনা করিবার জন্যও যখন-তখন জ্যেঠামশায় যাইতেন। ছাপরা হইতে তাঁহার ফিরিবার খবর পাইলে আমরা ছোটরা বাড়ি হইতে খানিকটা দূরে গিয়া তাঁহাকে আগ-বাড়াইয়া আনিতাম, আগ-বাড়ানোর অর্থ হইল, তাঁহার কাছে মিঠাই ফল ইত্যাদি চাহিতাম, আর যাহা কিছু পাইতাম তাহা লইয়া দৌড়াইয়া ঘরে আসিতাম ও মাকে দেখাইতাম।

বাবা বাড়িতেই থাকিতেন। জমিদারি দেখাশোনার কাজে তিনি কমই সংশিলষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বাগানের সখ ছিল। বাগানে গাছ-পালা লাগাইয়া তিনি অনেক সময় কাটাইতেন। আজও তাঁহার হাতে লাগানো বড় বড় দুইটা আমবাগান আমাদের দখলে আছে, তাহাতে ভাল ভাল আম ফলে। ফারসিতে তাঁহার খুব ভাল দখল ছিল, সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। আয়ুর্বেদ ও হেকিমিতে তাঁহার অনুরাগ ছিল। এসকল বিষয়ের পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন ও পড়িতেন। এইভাবে তিনি কাহারও কাছে না শিক্ষা করিয়াও সুনিপুণ বৈদ্য বা হেকিম হইয়া গিয়াছিলেন। নানা রকমের রোগী তাঁহার কাছে আসিত। যে ঔষধ কিনিতে পারিত তাহাকে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিতেন। গরিবকে নিজে হইতে ঔষধও দিতেন। ঔষধ তৈরি করিবার জন্যই একজন চাকর সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। কখনও কাহারও নাড়ি দেখিতেন না, কাহারও বাড়ি গিয়া রোগী দেখিতেন না, অবস্থা শুনিয়াই ঔষধ দিতেন, আর অনেকে আরামও হইয়া যাইত। ইহাতে তাঁহার খুব নাম হইয়াছিল। তাঁহার শরীরও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় আখড়ায় গিয়া ব্যায়ামও তিনি কিছু কিছু করিয়াছিলেন। আমার মনে আছে, আমি যখন স্কুল-কলেজে পড়িতাম, ছুটিতে বাড়ি আসিলে তিনি নিজেই মুগুর ভাঁজিতে শিখাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে মুগুর ভাঁজিয়া নানা রকমের খেলা দেখাইতেন। তিনি ঘোড়ায় বেশ চড়িতে পারিতেন, আর সর্বদাই একটি ভাল ঘোড়া রাখিতেন। ছেলেবেলায় আমাকে ও দাদাকে ঘোড়ায় চড়িতে তিনিই শিখাইয়াছিলেন। অল্পবয়সে আমরা দুই ভাই দুই ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া, কখনও কখনও ছুটিতে জীরাদেই আসিলে, বেড়াইতে যাইতাম। ছেলেবেলায় আমরা গ্রাম্য খেলাও খেলিতাম। বিশেষ করিয়া

সেখানকার প্রচলিত খেলা কবাটি ও চিক্কা তো আমরা খুব খেলিতাম। না খেলিয়া প্রায় কোনও দিনই কাটিত না। কলেজের পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিতেছিল। কখনও ছুটিতে আমরা জীরাদেইতে আসিলে খেলাধুলা নিশ্চয়ই হইত, দাদাও তাহাতে যোগ দিতেন। আর এক প্রকারের খেলা গ্রামে প্রচলিত ছিল, তাহাকে দোলাহাপাতী বলিত। তাহাতে গাছে চড়িতে হইত। আমি গাছে চড়িতে ভয় পাইতাম, তাই সে খেলায় কখনও যোগ দিই নাই। এইভাবে গাঁয়ে বহতা নদী ছিল না বলিয়া আমি সাঁতার দিতেও শিখিতে পারি নাই।

মা ও ঠাকুরমা আমাকে খুব আদর করিতেন। ছেলেবেলা হইতেই আমার অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িতাম আর ওদিকে কিছু রাত্রি থাকিতেই ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিতাম। বাড়ি পাকা, কিন্তু পুরানো ধরনের তৈয়ারী। মাঝখানে আঙিনা, চারদিকে বারান্দা ও কামরা, কামরায় এক দরজা, আর চালের কাছে প্রতি কামরায় দুই একটি ছোট ছোট ঘুলঘুলি—আলো আসিতে পারে। শীতকালে বিশেষ করিয়া রাত্রি দীর্ঘ বলিয়া রাত্রি থাকিতেই ঘুম ভাঙিয়া যাইত, আর সেই সময় হইতে মাকেও আমি ঘুমাইতে দিতাম না। লেপের ভিতরে ভিতরেই মাকে জাগাইতাম, আর তিনি জাগিয়া প্রভাতী ভজন শুনাইতেন। কখনও কখনও রামায়ণ প্রভৃতির কথাও শুনাইতেন। সেইসব ভজন ও কথার প্রভাব আমার মনের উপর খুব কাজ করিয়াছিল। এইভাবে যতক্ষণ না ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া বাহিরের আলো দেখিতে পাইতাম, ততক্ষণ পড়িয়া থাকিতাম—আর মাকে দিয়া ভজন গান করাইয়া লইতাম বা কথা কহাইয়া লইতাম, যখন খুব আলো আসিত তখন ঘর হইতে বাহির হইতাম। সন্ধ্যায় এত শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িতাম যে, কখনও রাত্রের খাবার জাগিয়া খাইয়াছি কিনা সন্দেহ, সেকালে রাত্রের খাবারও তৈয়ারী হইত অনেক দেরি করিয়া। ছেলেরা কেন, বুদ্ধেরাও রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া খাবার খাইত। কোনও রাত্রে বারোটা একটার পূর্বে খাওয়া-দাওয়া হইত কি না সন্দেহ। প্রথমে খাইতে বসিত বাড়ির পুরুষেরা, তারপর মেয়েরা, তারপরে চাকরেরা। গ্রীষ্মকালে তো চাকরদের খাইতে খাইতে কখনও কখনও ভোর হইয়া যাইত। তাই সন্ধ্যার সময় না খাইয়া ঘুমাইয়া থাকি যদি, তবে নিজের কোনও দোষ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। বাড়িতে রান্না করিবার জন্য ছিল এক কায়স্থ। এইজন্য রান্নার ভার জ্যেঠিমা বা মার উপর ছিল না। তাহা হইলেও তরকারী কিছু কিছু রাঁধিতে হইত তো! সন্ধ্যা হইতে না হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিতাম আর আমার সঙ্গে শুইবার জন্য কাঁদিতে শুরু করিতাম। মার হাতে কাজ থাকিলেও তাহা ছাড়িয়া আমার সঙ্গে ঘুমাইতে হইত। তবে আমি বুঝিয়াছি

যে এ ব্যাপারে তাঁহার বেশী সময় যাইত না, কারণ আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া পড়িতাম, আর আমি একবার ঘুমাইয়া পড়িলে মা আবার উঠিয়া গিয়া কাজ করিতেন। মনে আছে, সর্বদা রাত্রে আমাকে জাগাইয়া খাওয়ানো হইত, চোখ খুলিত না, কিন্তু মুখ নাড়িয়া টিয়া ময়না-তোতার নাম করিয়া কাহিনী বলিয়া মুখ খোলানো হইত, তাহার মধ্যে খাবারও ভরিয়া দেওয়া হইত। এক ঝি ছিল, তাহাকে আমি কাকী বলিয়া ডাকিতাম, সে ছিল এই রকম খাওয়ানোর কাজে বিশেষ পটু। যখন অন্য কাহারও হাজার চেষ্টায় আমি মুখচোখ বন্ধ করিয়া রাখিতাম, তখন সে কোনও না কোনও উপায়ে মুখ তো খোলাইতই, ভাতও খাওয়াইয়া দিত। সন্ধ্যার পর শীঘ্র শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়া ও ভোরে শীঘ্র শীঘ্র শয্যাত্যাগ করার অভ্যাস আমার বরাবরই ছিল; এমন কি, ছাপরা ও পাটনায় যখন পড়িতে যাই, তখনও সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িতাম, এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠা পর্যন্ত রাতের খাওয়াটা কদাচিৎ নিজের হাতে খাইতাম। এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, সে-ই আমাকে রাত্রে কোলে বসাইয়া পুরানো উপায়ে চোখ বন্ধ থাকিলেও খোলামুখে ভাতের গ্রাস ভরিয়া দিত, আমি আবার তাহা ওগরাইয়া ফেলিতাম।

সকাল সকাল ঘুমাইয়া পড়িবার অভ্যাস, আমার ওকালতি করা পর্যন্ত চলিল। সন্ধ্যার সময় মক্কেলদের কাগজপত্র লইয়া দেখিতে বসিতাম, আর তাহাদের সামনেই সাড়ে সাতটা আটটা বাজিতেই ঢুলিতে আরম্ভ করিতাম, তখন কাজ বন্ধ করিয়া দিতাম। ১৯১৪-১৫-তে যখন আমি এম. এল. পরীক্ষার জন্য তৈয়ারি হইতেছি, তখন এক ঘটনা ঘটিল। তখন আমি কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করিতাম। ল কলেজে প্রফেসারিও জুটিয়াছিল, কিছু কিছু মোকদ্দমাও হাতে থাকিত, এইজন্য সকালবেলা মোকদ্দমার দলিলপত্র তৈয়ারি করিতে ও ল কলেজে পড়ানোর তৈয়ারিতে চলিয়া যাইত। দিনের বেলা তো কাছারিতেই কাটিত। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মিলিত শুধু রাত্রির সময়টুকু। এই জন্য সন্ধ্যা বেলায়ই বই পড়িতাম, আর বই হাতে লইলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও আসিত। একদিন ভাবিলাম, এই প্রকারে চলিলে তো পরীক্ষার প্রস্তুতি ভাল করিতে পারিব না, কোনও প্রকারে সন্ধ্যার ঘুমটা বন্ধ করিতেই হইবে। অন্ততঃ রাত নয়টা পর্যন্ত তো পড়িতেই হইবে। ঘুম পাইলে বই হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। ইহাতেও যখন নিদ্রার আক্রমণ কমিল না, তখন ঘরের ভিতরে পাইচারি করিয়া পড়িতে লাগিলাম। এইভাবে কতক্ষণ কাটিল, ঠিক নাই, একবার হাত হইতে বই নীচে পড়িয়া গেল আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে ধড়াম করিয়া চিৎ হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেলাম। মাথা কাটিল না কেন, জানি না। কিছু চোট তো নিশ্চয় পাইয়াছিলাম। তখন হইতে এ চেষ্টায়

বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া ছাড়িয়া দিলাম এবং বসিয়া বসিয়া বিনা আয়াসে যেটুকু সময় পাইতাম সেটুকু পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম।

মৌলবী সাহেব

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে আমার বিদ্যারম্ভ করানো হইয়াছিল। ঐ সময় দাদাকে ছাপরায় ইংরেজী পড়িবার জন্য পাঠানো হয়। তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে মৌলবী সাহেব বিদ্যারম্ভ করান। যেদিন বর্ণারম্ভ হয়, সেদিন মৌলবী সাহেব আসিলেন। বিসমিল্লার সঙ্গে বিদ্যারম্ভ হইল, সিন্নি বিলানো হইল, মৌলবী সাহেবকে টাকাও দেওয়া হইল। আমাদের বিদ্যার্থী তিনজনকে তাঁহার নিকটে সঁপিয়া দেওয়া হইল। এক আমি, অন্য দুইজন আত্মীয় জ্যেঠতুতো ভাই, তাহাদের মধ্যে যমুনাপ্রসাদজী সবচেয়ে বড়, আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড়; তৃতীয় বিদ্যার্থী এখন বাঁচিয়া নাই, সেও আমার চেয়ে বড় ছিল। যমুনাভাই-ই ছিল আমাদের সকলের লীডার। সব রকমের খেলা ও ছেলেবয়সের চপলতায় অগ্রণী। তাহার এক কাকা আমারও কাকা হইতেন, বড় ফুর্তিবাজ ছিলেন। তিনি বাবার চেয়ে ছোট ছিলেন, কিন্তু বাবার কয়েকটা গুণও তিনি পাইয়াছিলেন। তিনিও ঘোড়ায় বেশ চড়িতে পারিতেন, ঔষধ তৈয়ার করিয়া দিতেন, আর বন্দুক ও গুলতি চালানো ভালই জানিতেন। ফারসিও পড়িয়াছিলেন, শতরঞ্চও খুব খেলিতেন। কিন্তু এসবের মধ্যে আমার বাবার শ্রেষ্ঠতা মানিয়া লইতেন, আর বড় হাসিখুশি, কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। মৌলবী সাহেব, যিনি আমাদের পড়াইতে আসিতেন, তিনি ছিলেন এক বিচিত্র ধরনের লোক। অনেক কিছু জানিতেন বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। বলদেব কাকার হাসিঠাট্টার পক্ষে মৌলবী সাহেব বিশেষ উপযোগী উপাদান ছিলেন। তিনি মৌলবী সাহেবকে নানা ধরনের কথা শোনাইতেন, আর তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া তাঁহাকে দিয়া বলাইয়া লইতেন যে তিনিও, যে কথাই বা যে কাজই হউক না কেন, সব জানিতেন, ও করিতে পারিতেন। এইভাবে মৌলবী সাহেব দাবি করিতেন যে তিনি শতরঞ্চ খেলিতে জানেন। বলদেব কাকা শতরঞ্চ খেলিতেন; দাবি সত্ত্বেও মৌলবী সাহেব তাঁহার সঙ্গে খেলায় কখনও জিতেন নাই। আমরা ছোটদের দল এসব ফুর্তির ব্যাপার ভয় ও কৌতূহলের সঙ্গে দেখিতাম। হাসিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও হাসা মুস্কিল। ফুর্তির খবর ঠাকুর-

দাদা অর্থাৎ চৌধুরলালজী পর্যন্ত পেঁাছিয়াছিল। তিনিও কখনও কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। এক দিন বলদেব কাকা মৌলবী সাহেবকে বলিলেন, বাগানে হনুমান আসিয়াছে, কোন প্রকারে তাড়াইয়া দিতে হইবে। গুলতি ছুঁড়িয়া তাহাদের তাড়ানো যায়। এই বলামাত্র মৌলবী সাহেব জাঁক করিয়া বলিলেন যে, তিনিও গুলতি চালাইতে বেশ জানেন। বলদেব কাকা তো বেশ বুঝিয়া গেলেন যে উনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তিনি হাসিঠাট্টার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে গেলেন, আর তাঁহার হাতে গুলি ও গুলতি দিয়া বলিলেন, খুব জোরে টানিয়া একটা হনুমান মারুন। মৌলবী সাহেব যেই খুব টানিয়া গুলি ছুঁড়িলেন ও দেখিতে চাহিলেন যে, হনুমানের কেমন চোট লাগিয়াছে, অমনি তাঁহার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল হইতে তর্ তর্ করিয়া রক্ত পড়িতে শুরু করিয়াছে, চোট পাইয়া তিনি ব্যথার ভরে বসিয়া পড়িলেন। গুলি হনুমানের গায়ে না লাগিয়া মৌলবী সাহেবেরই বুড়ো আঙ্গুলে আসিয়া লাগিল।

আর এক দিনের কথা। সন্ধ্যায় সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, ঠাকুরদাদাও সঙ্গে আছেন। মৌলবী সাহেব আর বলদেব কাকাও ছিলেন। নানা প্রকারের কথা চলিতেছিল, এমন সময় এক ষাঁড় দেখা দিল। লোকে বলিল, ষাঁড় অনেককে মারে। মৌলবী সাহেব পিছু হটিবার লোক ছিলেন না, বলদেব কাকার ইসারায় তিনি আগাইয়া আসিলেন; অমনই ষাঁড় তাঁহাকে ফেলিয়া দিল। এই ধরনের তামাসা বরাবর চলিত। একদিন বলদেব কাকা মৌলবী সাহেবকে বন্দুক চালাইতে অনুরোধ করিলেন। মৌলবী সাহেব কোনও জিনিস জানেন না স্বীকার করা নিজের মর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করিতেন, তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে, তিনি ভাল করিয়াই লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়িতে পারেন। মৌলবী সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বলদেব কাকা বন্দুক ছুঁড়িতে গেলেন। মৌলবী সাহেবের দুই ছেলে, তাহারা আমাদের সঙ্গেই পড়িত। আমরা সকলে আর ঐ দুই ছেলে, সকলকে সঙ্গেই লওয়া হইল। কিছু দূরে গিয়া নজরে পড়িল, এক উঁচু গাছের উপর একটা শকুনি বসিয়া আছে। বলদেব কাকা সেখানটাই লক্ষ্য করিতে বলিলেন। শকুনি ছিল অনেক উঁচুতে, বন্দুক প্রায় খাড়া করিয়া তবে লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল। মৌলবী সাহেবকে যে বন্দুক দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুরানো ধরনের, তাহাতে উপর হইতে বারুদ ভরা হইত; আর তাহা ভারিও ছিল। খুব সম্ভব মৌলবী সাহেব ইহার পূর্বে কখনও বন্দুক ছোঁড়েন নাই। তিনি বন্দুক প্রায় খাড়া করিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া লক্ষ্য করিলেন। ওদিকে বন্দুকের ঘোড়া পড়িল, আওয়াজ হইল, আর এদিকে শকুনের বদলে মৌলবী সাহেব

মাটির উপর চিৎ হইয়া পড়িলেন। বলদেব কাকা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, ছেলেদের পাঠাইলেন জল আনিতে। কোনও প্রকারে মৌলবী সাহেবকে বাড়িতে আনা হইল।

এই প্রকার ফূর্তির মধ্যে আমরা ফারসি পড়িতে লাগিলাম। ছয় সাত মাসের পর মৌলবী সাহেব চলিয়া গেলেন। আমরা সবে অক্ষর চিনিয়া 'করীমা'* পড়িতে শুরু করিয়াছিলাম। অন্য একজন মৌলবী আনা হইল. তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, আর পড়াইতেনও ভাল। তিনি দুই বৎসর ছিলেন আর করীমা, মামাকিমা, খালকবারী, খুশহালসীমিয়া, দস্তুরুলসীমিয়া, গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ পর্যন্ত আমাদের পড়াইতে পারিয়াছিলেন। ঐ সময়েই আমরা কায়েতী লিখিতে ও গুণিতে শিখিয়াছিলাম; কবে ও কিভাবে শিখিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই। সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ দিন ফারসি পড়িতাম। বৃহস্পতিবার দুপুর বেলার পর হইতে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ফারসি হইতে ছুটি হইত, তাহারই মধ্যে কায়েতী, গোণা ইত্যাদি শিখিতাম। এ ছাড়া খেলাধূলার জন্যও বেশ খানিকটা সময় দেওয়া হইত।

পড়িবার ব্যবস্থা ছিল এই—খুব ভোরে ভোরে আমরা উঠিয়া মক্তবে চলিয়া আসিতাম। আমাদের পাকা বাড়ি হইতে পৃথক অন্য এক বাড়ির বারান্দায় আমাদের মক্তব বসিত। একটা ঘর ছিল, তাহাতে মৌলবী সাহেব থাকিতেন আর তাহার সামনে বারান্দায় তক্তপোশের উপর বসিয়া আমরা পড়াশোনা করিতাম। মৌলবী সাহেব কখনও বা নিজের চার-পাইয়ের উপর, কখনও তক্তপোশের উপর বসিয়া পড়াইতেন। সকালে আসিয়া প্রথমে পুরানো পড়া একবার আওড়াইতে হইত, যে যত শীঘ্র পুরানো পড়া অভ্যাস করিয়া লইত তাহাকেই তত শীঘ্র নূতন পাঠ দেওয়া হইত। আমি প্রায়ই সঙ্গী দুজনের পূর্বে একা মক্তবে পৌঁছিয়া যাইতাম, আর আবৃত্তিও প্রথমে শেষ করিয়া, নূতন পড়াও প্রথমে পড়িয়া লইতাম। ইহা করিতে করিতে সূর্যোদয় হইয়া কিছু বেলাও হইয়া যাইত। তখন চাকর আসিত, আর সঙ্গে লইয়া গিয়া মুখ-হাত ধোয়াইয়া দিত। আর কিছু খাওয়াইবার জন্য বাড়িতে মার কাছে লইয়া হাজির করিত। এই-জন্য প্রায়ই আধ ঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টা ছুটি পাইতাম। জলখাবার খাইয়া ফিরিবার পর পাঠ মুখস্থ করিতে হইত, আর মুখস্থ করিয়া শোনাইয়া দেওয়ার পর মৌলবী সাহেব হুকুম দিতেন, বই বন্ধ কর। বই বন্ধ করিয়া তক্তি বাহির করিতে হইত। এই দুই কাজের মাঝে খানিকটা সময় খেলা-ধূলা করিবার জন্যও পাওয়া যাইত। অথবা আর একবার বাড়িতে গিয়া

* আয়েৎ, স্তোত্র।

কিছু খাইয়া লইবার সুযোগও পাওয়া যাইত। তক্তির উপর লিখিতে হইত, আর যখন তক্তি ভরিয়া যাইত তখন তাহা ধুইয়া লইতে হইত। এই কাজের মধ্যেও নিজেদের হাসিবার খেলিবার কিছুটা সময় পাওয়া যাইত। দুপুর বেলায় স্নান ও খাওয়ার জন্য এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ছুটি পাইতাম। খাইয়া আবার মক্তবেই ঐ তক্তপোশের উপর ঘুমাইয়া পড়িতাম। মৌলবী সাহেব খাটিয়ার উপর শুইতেন। আমাদের সর্বদা ঘুম আসিত না, আর তক্তপোশের উপর শুইয়া শুইয়া শতরঞ্চ খেলিতাম, মৌলবী সাহেবের জাগিবার সময় হইলে আগে থাকিতেই গুটি উঠাইয়া রাখিতাম। ঐ সময়ে কখন যেন শতরঞ্চ খেলাও শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, কিন্তু কবে কি করিয়া কাহার কাছে শিখিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। আবার বিকাল বেলায় অন্য পাঠ দেওয়া হইত। তাহার খানিকটা মুখস্থ করিয়া শোনাইবার পর, এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বেলা থাকিতে থাকিতেই খেলার ছুটি। তখন বল ও চিক্কা প্রভৃতি খেলা হইত। সন্ধ্যাবেলায় আবার আলো জ্বালা হইলে বই খুলিয়া পড়িতে বসিতে হইত। দিনে দুইটা পাঠ মুখস্থ করিয়া তাহা আবার শোনাইতে হইত, তবে হুকুম হইত—'বই বন্ধ কর', আর বই বন্ধ করিয়া নিয়মমত মৌলবী সাহেবকে নমস্কার করিয়া বাড়ি গিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ঘুম আসিত। এই জন্য সর্বদা ভয় থাকিত, যদি ঢুলিতে দেখিলে মৌলবী সাহেব মারিয়া বসেন। তাড়াতাড়ি ছুটি পাওয়ার দুইটি উপায় ছিল। খেলাধুলায় যমুনাভাই ছিল 'লীডার', তাড়াতাড়ি ছুটি পাওয়ার উপায়ও সে-ই করিত। পড়িবার জন্য তেল দিয়া বাতি জ্বালানো হইত। যমুনাভাই দিনের বেলায়ই কাপড়ে ছাই ধুলা বাঁধিয়া ছোট রকমের পুঁটলি তৈরি করিয়া লুকাইয়া রাখিত। যেদিন বাতিতে তেল বেশি দেখা যাইত, সেদিন কখনও বাতির পলিতা উস্কাইয়া দেওয়ার ছলে লুকাইয়া ছোট পুঁটলি বাতিতে রাখিয়া দিত। পুঁটলি দেখিতে দেখিতে তেল শুষিয়া লইত, আর আলো অমনি নিবু নিবু হইত। মৌলবী সাহেব ঝির উপর রাগ করিতেন, বলিতেন, কেন তেল কম লইয়া আসিয়াছ। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিবার হুকুম দিয়া দিতেন। কোন কোন দিন যমুনাভাই প্রস্রাব করিবার ছুটি চাহিয়া বাহিরে যাইত, আর প্রস্রাব না করিয়া ছুটিয়া কখনও আমার মায়ের কাছে, কখনও তাহার মায়ের কাছে, কখনও কখনও গঙ্গাভাইয়ের মায়ের কাছে গিয়া বলিয়া আসিত যে এখন ঘুম পাইতেছে, শীঘ্র ঝিকে পাঠাও ডাকিয়া আনিতে, না হইলে মার খাইব। তাহার প্রস্রাব করিয়া ফিরিবার অল্প পরেই ঝি চলিয়া আসিত, আর মৌলবী সাহেবকে বলিত, এখন ছুটি দিয়া দিন। মৌলবী সাহেব ছুটি দিয়া দিতেন। একদিন যখন যমুনা-

ভাই এভাবে দৌড়াইয়া যাইতেছে তখন গাঁয়ের একজন ভদ্রলোক, যিনি সম্পর্কে আমাদের কাকা হইতেন, তিনি দেখিয়া ফেলিলেন, আর আসিয়া মৌলবী সাহেবকে বলিলেন, যমুনা কোথায় ছুটে যাচ্ছে? তদন্ত করা হইল, আর যমুনাভাই কৈফিয়ৎ দিল যে, সে প্রস্রাব করিতে গিয়া অন্ধকারে ভয় পাইয়াছিল, তাই ছুটিয়া পালাইতেছিল। এই ভাবে রক্ষা পাইল। এক মৌলবী সাহেব ওখানে আমাদের যা কিছু ফারসির জ্ঞান তাহা দিয়াছিলেন আর আমরাও সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতে শুরু করিয়াছিলাম। বাড়ি ছাড়িয়া যখন ছাপরায় ইংরেজী পড়িতে যাইতে হইল, তখন মৌলবী সাহেবের ও আমাদেরও বড় দুঃখ হইল।

গ্রামের জীবন

সেকালে গ্রামের জীবন ছিল এখনকার চেয়েও অনেক সাদাসিধা। জীরাদেই আর জমাপুর দুইটা আলাদা গাঁ, কিন্তু দুই জায়গার বসতি এত মেশামিশি যে, কোথায় জীরাদেই শেষ হইয়াছে আর কোথা হইতে জমাপুর শুরু হইয়াছে, বলা কঠিন। এই জন্য বসতির দিক হইতে দুইটা গাঁকে একত্র ধরিলে কোন ক্ষতি নাই। দুইটা গাঁ মিলিয়া প্রায় সব জাতের লোক বাস করে। মোট লোকসংখ্যা হইবে দুই হাজারেরও বেশি। তখনকার দিনেও, যেসব জিনিস গাঁয়ে পাইবার কথা, সেসব সেখানে পাওয়া যাইত। এখন তো নতুন রকমেরও কিছু দোকান হইয়া গিয়াছে, সেখানে পান-বিড়িও বিক্রি হয়। সেকালে এসব পাওয়া যাইত না, যদিও কালো তামাক আর খৈনি বিক্রয় হইত। কাপড়ের দোকান ভালই ছিল, যেখান হইতে ভিন্-গাঁয়ের লোকেরা আর বাহিরের ব্যাপারীরাও কাপড় কিনিয়া লইয়া যাইত। চাল, ডাল, আটা, মসলা, নুন, তেল ইত্যাদি সবকিছু সেখানে বিক্রয় হইত, আর ওষুধের ছোট-খাট দোকানও ছিল, যেখানে হরীতকী, বহেড়া, পিপুল এইসব জিনিস পাওয়া যাইত। যতদূর মনে পড়ে, শুধু মিঠাইয়ের কোনও দোকান ছিল না। গাঁয়ে 'কোয়রী'দের অনেক বস্তি ছিল, এই জন্য শাকসব্জিও মিলিত প্রচুর। আহীরেরা সংখ্যায় কম ছিল, কিন্তু আশপাশের গাঁয়ে তাহাদের বসতি ছিল যথেষ্ট, এই জন্য দই দুধও পাওয়া যাইত। চরখা খুব চলিত, গাঁয়ে জোলাদেরও বসতি বেশ ছিল, তাহারা সুতা লইয়া কাপড় বুনিয়া দিত। চুড়িহার জাতি চুড়ি বানাইয়া দিত। মনিহারীরা টিকলির মত ছোট-খাট জিনিস বাহির হইতে আনিয়া বিক্রি

করিত, নিজেরাও কিছু তৈয়ারী করিত। মুসলমানদের মধ্যে চুড়িহার, মনিহারী, রাজমিস্ত্রী, দর্জী ও জোলা ছিল; শেখ-সৈয়দ পাঠান কেহ ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহার, কায়স্থ, কোয়রী, কুরমী, কামার, তুরা, গোন্দ, ডোম, চামার, দোসাদ ইত্যাদি সব জাতের লোক ছিল। মনে হয়, সবচেয়ে বেশি ঘর ছিল রাজপুতদের। তাহার মধ্যে কয়েকজন জমিদার শ্রেণীর, তাহাদের পুরানো খানদানী ঘর মনে করা হইত, আর কিছু ছিল মামুলি চাষী শ্রেণীর। জীরাদেইতেই পাঁচ ঘর কায়স্থ ছিল। তাহার তিন ঘর আমাদেরই জ্ঞাতি, আর দু ঘর বিবাহ-সূত্রে বাহির হইতে আসিয়া বাস করিতেছিল।

প্রায় সব কিছু গাঁয়েই পাওয়া যাইত। এজন্য গাঁয়ের বাহিরে যাওয়ার খুব কম সুযোগই হইত। গাঁয়ে হপ্তায় দুই বার বাজারও বসিত, সেখানে আশপাশের গাঁ হইতে কিছু দোকানদারও নিজেদের সওদা-পত্র মাথায় করিয়া, বা বলদ, ঘোড়া বা গোরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া আসিত। বাজারে মিঠাইয়ের দোকানও বসিত, আর যাহার ইচ্ছা মাছ মাংসও কিনিতে পারিত। যাহার প্রয়োজন এভাবে সিদ্ধ হইত না, সে সিওয়ানে চলিয়া যাইত। সেখানে থানা আছে, মেজিস্ট্রেট আছে, কাছারি আছে, দোকানও আছে। সে একটা বড় গ্রাম, পল্লীগ্রামের লোকেরা মনে করিত উহা খুব বড় একটা জায়গা, এবং সেইরূপ মর্যাদাও দিত। আমার মনে পড়ে, জ্ঞাতি কুটুম্ব ছাড়া বাহিরের খুব কম লোকই গাঁয়ে যাওয়া-আসা করিত। মৌলবী সাহেবের নিকট, দুই-চার মাসে একবার, একজন ফারসির ছোট-খাট বইয়ের এক ছোট গাঁঠরি আর দু এক বোতল লিখিবার কালি (আজ-কালকার উজ্জ্বল ব্লুব্ল্যাক নয়) লইয়া আসিত। সে আসিলে আমাদের ছোটদের কৌতূহলের অন্ত থাকিত না। শীতকালে কখনো কখনো কেহ কমলা লেবুর টুকরি লইয়া আসিত, আর আমরা ছোটরা তাহাতে এত খুশি হইতাম যে, মনে হইত যেন অদ্ভুত কিছু একটা লাভ করিয়াছি। একদিন এই রকম একজন লোক আসিল, আর আমি দৌড়িয়া মাকে বলিতে গেলাম, সেখান হইতে যেই বাহিরে দৌড়াইয়া আসিতেছিলাম অমনি পায়ে কি-একটা আটকাইয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। ঠোঁটে চোট লাগিল, রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল। অনেক দিন তাহার চিহ্ন ছিল। আর একবার আর কোনও জিনিসের জন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে পড়িয়া গেলাম, তাহার চিহ্ন এখনও ডান চোখের নীচে গালের উপর রহিয়াছে। গাঁয়ে ফলের মধ্যে আমের দিনে আম, কখনও কখনও বাগান হইতে সাধারণভাবে কলা পাওয়া যাইত। জেঠামহাশয়, যাঁহাকে আমরা নুনু বলিতাম, ছাপরা হইতে কখনও কখনও আঙ্গুর আনাইতেন। আজকালকার মত খোলা আঙ্গুরের গোছা বিক্রয় করিত না। কাঠের ছোট

বাক্সের মধ্যে তুলার গদির ভিতরে রাখিয়া বিক্রি করা হইত। দামও লাগিত প্রচুর। ফলের সময়ে গাঁয়ের লোক পাইত শুধু আম ও কলা।

গাঁয়ে দুইটি ছোট-খাট মঠ, সেখানে একজন করিয়া সাধু থাকিতেন। গাঁয়ের লোকেরা তাঁহাদের খাইতে দিত, তাঁহারা সকাল সন্ধ্যায় কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি করিতেন। আরতির সময় কিছু কিছু লোকও ছুটিয়া আসিত। কখনও কখনও আমরাও যাইতাম, আর বাবাজী তুলসীপত্র প্রসাদ দিতেন। রামনবমী আর বিশেষ করিয়া জন্মাষ্টমীতে উৎসবের আয়োজন হইত। আমরা সব ছেলের দল কাগজের ও রাংতার ফুল কাটিয়া ঠাকুরবাড়ির দরজায় ও সিংহাসনে সাঁটিয়া দিতাম, উৎসবে যোগ দিতাম, ব্রত পালন করিতাম, দধিকাদার দিন একজন আরেকজনার গায়ে খুব দৈ-হলুদ ফেলিয়া দিতাম। প্রায় প্রত্যেক বৎসর কার্তিক মাসে এক-জন না একজন পণ্ডিত আসিত। সে মাস-দেড়েক থাকিয়া রামায়ণ ভাগবত কি অন্য কোন পুরাণের কথা শোনাইত। যেদিন পড়া শেষ হইত, সেদিন গাঁয়ের সকলে একত্র হইয়া কিছু-না-কিছু পূজা দিত। আমাদের বাড়ি হইতে বেশি পূজা দেওয়া হইত। কারণ লোকে মনে করিত আমাদের বাড়ি সবচেয়ে বড়। 'কথা' তো বেশির ভাগ আমাদের দরজাতেই হইত। তাহার সমস্ত খরচ আমাদেরই দিতে হইত। গাঁয়ে যখন বারোয়ারি কথা হইত, তখন গাঁয়ের লোকে বাড়ি বাড়ি পালা করিয়া পণ্ডিতের সিধা দিত, আমাদেরও পালা পড়িত। আমরা ছেলেপিলের দল তো ক্বচিৎ কথকতার বেশি অংশ শুনিতে পাইতাম, কারণ আমি সকাল সকালই ঘুমাইয়া পড়িতাম। কিন্তু যখন আরতি হইত, তখন লোকে জাগাইয়া প্রসাদ খাওয়াইত। চিত্তবিনোদন ও শিক্ষার আর এক উপায় ছিল, রামলীলা। তাহা হইত আশ্বিন মাসে। রামলীলার দল কোথা হইতে আসিয়া জুটিত, আর পনের-কুড়ি দিন ধরিয়া খুব গোলমাল চলিত। কখনও জমাপুরে, কখনও বা জীরাদেইতে, রামলীলা হইত। উহাও হইত বিচিত্র ধরনের। যাহারা উহাতে রাম, লক্ষ্মণ ইত্যাদি সাজিত তাহারা লেখাপড়া জানা লোক ছিল না। একজন তুলসীদাসের রামায়ণ হাতে লইয়া বলিত : রামজী বল্লেন, হে সীতা—ইত্যাদি, আর রামজী বলিতেন : হে সীতা। এইভাবে যাহার যাহা কিছু বলিবার থাকিত, তাহা বলিয়া দিলে সে পর পর পুনরা-বৃত্তি করিয়া যাইত। এই কথাবার্তায় মানুষের মন তেমন খুশি হইত না, কারণ ভিড় হইত খুব, আর ব্যাপারটা হইত প্রায় দুই এক শত গজ লইয়া। লোকে তো খুশি হইত পাত্রদের দৌড়ধাপ, বিশেষতঃ লড়াই ইত্যাদির অভিনয়েই। উত্তর দিকে সাজানো হইত রামজীর গড়, দক্ষিণে রাবণের গড়, অথবা অযোধ্যা ও জনকপুর। যেদিন যে কথাই হউক কিছু না কিছু সং তো থাকিতই। সবচেয়ে বেশি হাঁকডাক হইত রামের বিবাহে,

লংকাকাণ্ডের যুদ্ধে, আর রামের অভিষেকে, গদিতে বসিবার দিনে। বিবাহে তো হাতী ঘোড়া চাহিয়া আনা হইত, বরের মিছিল পুরাপুরি সাজানো হইত। লংকাদহনের জন্য ছোট-ছোট বাসাও তৈয়ারি করা হইত, এবং তাহা সত্যসত্যই পোড়ানো হইত। হনুমান, বানর ও নিশাচরদের জন্য আলাদা আলাদা মুখোস ছিল। তাহা সময়মত পরিতে হইত, আর আমরা ছেলের দল সত্যসত্যই তাহা দেখিয়া ভয় পাইতাম। বানরদের কাপড় সর্বদা লাল রং-এর হইত। রাক্ষসদের হইত কালো। রাম লক্ষ্মণ জানকীর জন্য বিশেষ বিশেষ পোষাক থাকিত, তাহাদের বেশভূষায় প্রায়ই দুই এক ঘণ্টা লাগিয়া যাইত। রামলীলা হইত সন্ধ্যায় চারটা হইতে ছয়টা পর্যন্ত। রাম-লক্ষ্মণ সাধারণ লোকের মত চলিতেন না। তাঁহাদের পা খুব উচ্চে উঠিত। আর যুদ্ধে পাঁয়তারা কষিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইত। যেদিন অভিষেক হইত, সেদিন সে গাঁয়ের ও আশপাশের গাঁয়ের লোকে পূজা দিত, তাহা প্রণামীস্বরূপ রামের চরণে সমর্পণ করা হইত। রামলীলা যাহারা করিতে আসিত, তাহাদের খাওয়া-দাওয়া তো কয়দিন দেওয়া হইতই, তাহা ভিন্ন নগদ যাহা দিবার তাহা ঐ দিনই দেওয়া হইত। পরের দিন আবার রাম-লক্ষ্মণ জনকীকে সাজ-সজ্জা করাইয়া বড় বড় লোকের বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানকার মেয়েরা পরদার জন্য ভিড় ঠেলিয়া লীলা দেখিতে যাইতেন না, তখন তাঁহাদের পূজাও হইত। প্রণামী টাকাও দেওয়া হইত।

একটি জিনিসের প্রভাব আমার উপর ছেলেবেলা হইতেই পড়িয়াছিল—রামায়ণ পাঠ। গাঁয়ে তো অতি অল্প লোকেরই অক্ষরজ্ঞান ছিল। সে সময়ে একটাও প্রাইমারী বা অন্য রকমের ইস্কুল ঐ গাঁয়ে বা অঞ্চলের কোথাও ছিল না। মৌলবী সাহেব মাসিক তিন-চার টাকা আর আহারাদির বিনিময়ে আমাদিগকে পড়াইতেন। গাঁয়ে আর একজন মুসলমান ছিলেন যিনি জাতিতে জোলা, কিন্তু কায়েতী লিখিতে জানিতেন আর জানিতেন ধারাপাতের হিসাব, তার মধ্যে থাকিত সওয়া, দেড়া ইত্যাদির নামতা, মন-কষা, সেরকষা আর খেতের মাপজোখের হিসাব। তাঁহার এক পাঠশালা ছিল, সেখানে গাঁয়ের ছেলেপিলেরা কিছু কিছু পড়িত। অক্ষর পরিচয় ছিল খুব কম লোকেরই। কিন্তু প্রায় প্রত্যহই এইভাবে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন লোক কোন-না-কোন জায়গায়, মাঠে কি কোন বাড়ির দরজায় একত্র হইত আর একজন রামায়ণ হইতে চৌপাই পড়িয়া যাইত, অন্য সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করিত। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা করতাল ও ঢোলকও বাজাইত। রামায়ণ পাঠের আরম্ভে যখন বন্দনার গান হইত, তখন অবশ্যই সকলে যোগ দিত। এই প্রকারে অক্ষর পরিচয় না থাকিলেও গাঁয়ে এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা রামায়ণের চৌপাই

জানিত, আর সুর করিয়া বলিতে পারিত, বিশেষ করিয়া বন্দনার কিছু কিছু দোঁহা তো সকলেরই প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল।

পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল হোলি। উহাতে ধনী, নির্ধন আসিয়া জুটিত। বসন্তপঞ্চমীর দিন হইতেই হোলির গান গাওয়া শুরু হইত। গাঁয়ের ভাষায় উহার নাম দেওয়া হইত 'তাল ওঠা'। সেদিন হইতে হোলির দিন পর্যন্ত যেখানে-সেখানে করতাল ও ঢোলক লইয়া কিছু কিছু লোক একত্র হইত ও হোলির গান গাহিত। কখনও কখনও জীরাদেই ও জমাপুরের লোকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত, এক গাঁয়ের লোক যেমনি একটা গান শেষ করিত অমনি অন্য গাঁয়ের লোকেরা আর একটি শুরু করিত। কখনও কখনও গাঁয়ের আশে-পাশে অন্য গাঁয়ের লোকও ভিড় করিয়া আসিয়া জুটিত, এই ভাবের সরল প্রতিযোগিতা খুব উৎসাহের সঙ্গে হইতে থাকিত। আমার মনে আছে, একবার দুই গাঁয়ের মধ্যে বাজির মত লাগিয়া গেল। সারা রাত গান চলিল, সকালে সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত লোকে গাহিতেই থাকিল, তখন তাহাদের বলিয়া কহিয়া সরাইয়া দেওয়া হইল।

এই গানে যাহারা ঢোলক বাজাইত, তাহাদের যথেষ্ট মেহনত হইত, তাহারা ঘামিয়া ঘামিয়া শেষ হইত। এক গাঁয়ে ঢোলক বাজাইবার এক-জনই লোক ছিল। সে সারা রাত বাজাইতেই থাকিল। তাহাতে হাতে ফোস্কা পড়িল; কিন্তু সে কি আর থামিবার পাত্র, গাঁয়ের ইজ্জৎ নষ্ট হইবে যে! ফোস্কা পড়িল, হাতের চামড়া উঠিল, এইভাবে সারা রাত কতবার ফোস্কা পড়িল ও হাতের চামড়া উঠিয়া গেল, কিন্তু গাঁয়ের ইজ্জৎ সে নষ্ট হইতে দিল না। পরের দিন প্রতিযোগিতা শেষ হইলে সকালে একথা ধরা পড়িল, আর সকলে তাহার শক্তির প্রশংসা করিল। হোলির দিন খুব কুৎসিত গালি-গালাজ চলিত। তাহা বুড়া জোয়ান আর ছেলেরাও একসঙ্গে চালাইত। গাঁয়ের এক কোণ হইতে এক দল রওনা হইত, তাহারা প্রায় প্রত্যেক দরজায় দাঁড়াইয়া নাম করিয়া গানে গালাগালি দিত। আর নোংরা মাটি, ধুলা, ময়লা পরস্পরের গায়ে ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে গাঁয়ের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া যাইত। এই এক সময় ছিল যখন বড়-ছোট লাজলজ্জা একেবারেই উঠিয়া যাইত। শুধু বয়সের ব্যবধান নয়, জাতি ও শ্রেণীর বড়-ছোট ভেদও উঠিয়া যাইত। চামার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত একে অন্যকে গালি শোনাইত ও পরস্পরের গায়ে ধুলা মাটি ছুঁড়িত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনও নূতন লোকের দেখা পাইলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। তাহার গায়েও ধুলা মাটি ময়লা দিয়া জাতিতে ওঠানো সকলেই যেন নিজের নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। এই ঘোরাঘুরি চলিত দুপুর পর্যন্ত। তাহার পরে সকলে স্নান করিত, আর ঘরে ঘরে

পূজা হইত। ঐ দিনের বিশেষ আহার্য ছিল—পুরি ও মালপোয়া। গরিবেরাও কোন না কোন উপায়ে কিছু করিয়াই লইত। খাওয়ার পরে বিকালে লাল রং ও আবির লইয়া খেলা হইত। সকলে সাদা কাপড় পরিত। তাহার উপর লাল ও হলুদ রং দেওয়া হইত, আর অভ্রের গুঁড়া ও আবির ছোঁড়া হইত। শুকনা খেজুর ও নারিকেল, পান ও সুপারি ভাগ করিয়া দেওয়া হইত, আর জোর গলায় হোলির গান চলিত। শুনিয়াছি, অন্যান্য জায়গায় লোকে এই দিন মদ ও মাংসের কাবাবও খুব খাইত। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের গাঁয়ে আমি এরূপ কখনই দেখি নাই। আমাদের অঞ্চলে তো রাজপুত, ব্রাহ্মণ, ভূমিহার মদ খাওয়া পাপ বলিয়া মনে করিত। কোথাও কোথাও কায়স্থেরা অবশ্য খাইত। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এক অতি পুরাতন প্রথা চলিয়া আসিতেছে। লোকের বিশ্বাস, আমাদের বংশের যে কেহ মদ খাইবে তাহারই কুষ্ঠব্যাধি হইবে। এই জন্য ও অঞ্চলে কায়স্থের বাড়িতেও কখনও কেহ মদ খায় না। বড়কে দেখিয়া ছোটরাও ইহা হইতে দূরে থাকে। এই নিয়ম আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

জন্মাষ্টমী ও রামনবমীর প্রসঙ্গ আলোচনা তো করিয়াছি। দেওয়ালিও পালন করা হইত। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই সকলে নিজের-নিজের ঘর পরিষ্কার করিত। দেওয়াল লেপিত, কাঠের থাম ও দরজায় তেল লাগাইত। তখন কেরাসিন তেল জ্বালানো হইত না—হয়তো পাওয়াই যাইত না। সরিষা, তিসি, 'দানা' অথবা রেড়ির তেলই জ্বালিত। দেওয়ালিতে মাটির ছোট-ছোট বাতি জ্বালিয়া বড় লোক ও গরিব প্রায় সকলেই কিছু-না-কিছু আলোর ব্যবস্থা অবশ্যই করিত। বড়লোকের বাড়িতে অনেক বাতি জ্বলিত, আর কলাগাছ পোঁতা হইত। বাঁশের মেরাপ বানানো হইত, বাতি দিয়া রং বেরঙের ছবি তৈরি হইত, তাহা দেখিতে খুব সুন্দর লাগিত। বয়স্ক লোকেরা তো এই ছবি তৈয়ার করিতেন, আর আমরা, ছোটদের দল, তাঁহাদের কথামত জায়গায় বাতি রাখিতাম, তেল দিতাম, আলো জ্বালিতাম। আলো শেষ হইবার পূর্বে লক্ষ্মীপূজা হইত, আর লক্ষ্মী ও তুলসীর নিকটে আলো জ্বালিবার পরই আর সব জায়গায় বাতি দেওয়া হইত। বাতি নিভিয়া গেলে কড়ি খেলার নিয়ম ছিল। আমরা তো নাম মাত্র খেলিতাম, কিন্তু আমি দেখিয়াছি, কেহ কেহ খেলায় পয়সা হারিত ও জিতিয়া পয়সা পাইতও বটে। দেওয়ালির দিন বিশেষ বাতি তৈয়ারি হইত। কিন্তু সারা কার্তিক মাস ধরিয়াই কয়েকজন লোক তুলসীচত্বরের উপর, ও আকাশে কাগজের লণ্ঠন ঝুলাইয়া, বাতি দিত।

দশহরা বিশেষ করিয়া জমিদারদের উৎসব ছিল। কিন্তু নবমীতে

কখনও কখনও কালীপূজাও হইত। সেজন্য প্রতিমা আনা হইত, আর খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজা হইত। আমি নিজের গাঁয়ে তো কালীপূজা দেখি নাই, তবে আশপাশের গাঁয়ে কালীপূজা হইয়াছিল, খবর শুনিয়া আমাদের ছোটদের সেখানে দর্শনের জন্য পাঠানো হইল, আর আমরা গিয়া কালী দর্শন করিলাম—সত্য সত্যই কালী, হাতে লাল পানপাত্র আর খড়্গ। রামলীলার অভিষেকও প্রায়ই দশহরার দিনে কি তাহার আগে-পরে হইত। ঠিক দশহরার দিনটিতে আমাদের পূজনীয় ঠাকুরদাদা সব লোক-জন লইয়া এক ছোট মিছিল করিয়া বাহির হইতেন, নীলকণ্ঠ দর্শন করিয়া আসিতেন।

এসব ছাড়া আর একটি পার্বণ ছিল, তাহাতে সকলেই আসিয়া জুটিত। উহা ছিল অনন্ত চতুর্দশী ব্রত। এ ব্রত হইত ভাদ্র মাসের শুক্লাচতুর্দশীতে। দুই প্রহর পর্যন্ত ব্রত থাকিত। কথা শুনিবার পর দুই প্রহরে পুরি, পায়েস খাইবার প্রথা ছিল, সন্ধ্যায় কিছু খাওয়া চলিত না। সূর্যাস্তের পর জলটুকু খাওয়া পর্যন্ত ছিল বারণ। এ ব্রতে আমরা ছোটরাও সকলে আসিয়া জুটিতাম। কথা শেষ হইলে এক ক্রিয়া হইত, যাহা ছোটদের পক্ষে খুব ফুর্তির ছিল। একটা বড় থালায় একটা কি দুইটা শশা রাখিয়া দেওয়া হইত, আর কথক পণ্ডিত উহাতে অল্প একটু জল ঢালিয়া দিতেন। কথা শুনিবার জন্য যাহারা আসিত তাহারা সকলে ঐ থালায় হাত রাখিত। আর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিত—কি খুঁজছ—লোকে জবাব দিত, অনন্ত ফল। তখন পণ্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করিত—পেয়েছ—উত্তর হইত—পেয়েছি। পণ্ডিত বলিত—মাথায় রাখ—আর সকলে অমনি মাথার উপর জল ছিটাইত। ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে সকলকে অনন্ত দেওয়া হইত—এই অনন্ত ছিল একটা সূতায় চৌদ্দটি গিরা দেওয়া—সকলে তাহা নিজের নিজের বাহুতে বাঁধিয়া রাখিত। আমাদের ছোটদের জন্য সুন্দর রঙ্গীন কখনও কখনও রেশমের অনন্ত পটহেরাদের* নিকট হইতে কিনিয়া আনা হইত। কোনও কোনও লোক সারা বৎসর বাহুতে অনন্ত বাঁধিয়া রাখিত, এজন্য তাহারা নিজেদের অনন্ত নিজেদের হাতে মজবুৎ আর খুব লম্বা করিয়া তৈয়ার করিত, যাহাতে তাহা সুবিধামত বাঁধা যায়। যে এই-ভাবে অনন্ত বাঁধিত, সে মাছ মাংস খাইত না। এইভাবে যাহারা তুলসী-কাঠের মালা বা কণ্ঠী পরিত, তাহারাও মাছ মাংস খাইত না।

কথা, রামলীলা, রামায়ণ পাঠ আর এই সব ব্রত ও পার্বণের দ্বারা ধর্মজীবন সর্বদা জাগ্রত থাকিত। এসব ভিন্ন মহরমে তাজিয়া রাখারও রেওয়াজ ছিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলে আসিয়া মিলিত।

* জাতিবিশেষের নাম—যাহারা সূতা বিক্রি করে।

জীরাদেই ও জমাপুরে কয়েকজন হিন্দুই কিছু সম্পন্ন ছিল, এজন্য তাহাদের তাজিয়া গরিব মুসলমানদের তাজিয়া হইতে বেশি বড় ও জাঁক-জমকের হইত। সমস্ত মহরম ধরিয়া প্রায় রোজই লোকে গদকা, লাঠি ও দড়ি ইত্যাদি খেলিত, আর 'পহলামের' অঙ্গশেষের দিন তো খুব বড় রকমের ভিড় হইত। প্রত্যেক গাঁয়ের তাজিয়া কারবালা পর্যন্ত পেঁছানো হইত, আর সমস্ত রাস্তা শুদ্ধ 'ইয়া আলি, ইয়া ইমাম' এই ডাক ছাড়া হইত, গদকা ইত্যাদির খেলা হইত। লোকদের মনে খুব উৎসাহ থাকিত, হিন্দু এবং মুসলমানে কোনও ভেদ ছিল না। শিরণি আর তিচৌরী (ভিজা চাউল আর গুড়) বিতরণ করা হইত, সকলেই তাহা লইয়া খাইত; কিন্তু মুসলমানের ছোঁয়া জল বা সরবৎ হিন্দু খাইত না। মুসলমানরা ইহা খারাপ মনে করিত না। তাহারা বুঝিত যে হিন্দুদের ইহাই ধর্ম, তাই নিজেরাই সরিয়া যাইত। যেভাবে হিন্দু মহরমে যোগ দিত, মুসলমানও সেইভাবে হোলির ফুর্তিতে যোগ দিত। আমরা ছেলের দল দশহরা, দেওয়ালি আর হোলির দিন মৌলবী সাহেবের শুভাশীর্বাদ বড়দের পড়াইয়া শুনাইতাম, আর তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা চাহিয়া মৌলবী সাহেবকে দিতাম। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই পর্বদিনের কথা মনে হইত। আর কাগজের উপর মৌলবী সাহেবের সাহায্যে সুন্দর ফুল আঁকিয়া তাহা লাল, নীল, বেগুনি রং-এ রঙ্গাইতাম। তাহার পর মৌলবী সাহেব সুন্দর অক্ষরে শুভাশীর্বাদ লিখিয়া দিতেন। আমরা তাহাই পড়িয়া শুনাইতাম। উহাতে যাহা লেখা থাকিত, তাহাও এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি: যেমন, দেওয়ালিতে আশীর্বাদ লেখা হইত, দেওয়ালি আসিলে পর হাঙ্গাম কর 'দেওয়ালে আমদে হাঙ্গামা জুলা' ইত্যাদি। দশহরার কবিতা হইত, 'দশহরায় চলেছেন রামচন্দর, ধরেছেন রূপ যোগী বা কলন্দর' ইত্যাদি। মাসিক বেতন ছাড়া মৌলবী সাহেবের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কিছু পয়সা 'জুমরাতী' বা বৃহস্পতিবারের প্রাপ্য, এবং পার্বণে শুভ প্রণামীর হিসাবেও কিছু প্রাপ্য ছিল।

তখনকার দিনে গাঁয়ে মামলা-মকদ্দমা কম হইত। যেসব ঝগড়া হইত, গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। আর যদি কোনও বিবাদ পঞ্চায়েতের কথায় মীমাংসা না হইত তবে বাবা বা জ্যেঠামহাশয়ের সামনেই তাহা পেশ হইত, তাঁহারাও পঞ্চায়েতে বসিয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। হাঁ, কখনও কখনও চুরিও হইত বটে। বেনিয়াদের কিছু টাকাকড়ি ছিল। তাহাদের ঘরে রাত্রে সিঁধ দিয়া চোর কিছু টাকাপয়সা উঠাইয়া লইত। একবার আমার মনে আছে, অন্য গাঁয়ের বাজার হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যাবেলায় ডাকাত রাস্তায় টাকাপয়সা ও কাপড়চোপড় পর্যন্ত লুটিয়া লইয়াছিল। কোথাও এরূপ ঘটিলে থানা হইতে দারোগা

সিপাই আসিয়া পেঁাছিত, আর গাঁয়ে দুই এক দিন থাকিয়া যাইত। তাহাদের গাঁয়ে আসা ভারি হাঙ্গামার কথা; সমস্ত গাঁয়ে হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। যাহাদের উপর সন্দেহ হইত তাহাদের বাড়ি তল্লাসি করা হইত। আর দুই তিন জনকে, যাহাদের চোর বলিয়া কুখ্যাতি ছিল, দারোগা পেঁাছিতেই ধরিয়া বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া খুব পিটাইত। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আশেপাশের গাঁ হইতেও চোর বলিয়া মনে করিলে লোককে এইভাবে ধরিয়া আনা হইত ও বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখা হইত। এইভাবে পাঁচ সাত জন লোককে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা পড়িয়া আছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

আমাদের ছোটখাটো একটা জমিদারি ছিল। রায়তদের সঙ্গে মোকদ্দমা তো খুব কমই হইত। হয়তো কখনও কখনও কাছারি যাওয়ার দরকার পড়িত। কিন্তু অন্য একজন জমিদারের সঙ্গে, যাঁহার অংশও আমাদের এক গাঁয়ে ছিল, অনেক দিন ধরিয়া কিছু জমির জন্য মোকদ্দমা চলিতেছিল। ঠাকুরদাদার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাবার সময় পর্যন্ত এই মোকদ্দমা চলিতেছিল, আর তাঁহার মৃত্যুর পর দাদা পরামর্শ করিয়া উহার আপোষ করিয়া দিলেন। ছাপরায় দাদাকে পড়াইতে পাঠানো হইয়াছিল, নুনু ছাপরায় যাওয়া-আসা করিতেন, তাঁহার দেখাশুনা করিতে আর মকদ্দমার তদ্বির করিতে।

ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ

প্রথমেই বলিয়াছি, দাদার দরুণ আমার সব বিষয়েই রাস্তা সাফ হইয়া যাইতেছিল। আমি যখন নিতান্ত শিশু, তখনই দাদাকে পড়াশুনা করিবার জন্য সিওয়ানে পাঠানো হইল। দাদা কিছুদিন সেখানে থাকিল বটে, কিন্তু সেখানে কোনও বিশেষ সুবিধা হইল না। একে তো সেকালে সিওয়ানে কোনও হাই স্কুল ছিল না; অন্য কোনও স্কুল ছিল কি না, তাহা আমার মনে নাই। আর এক কারণ ইহাও বটে যে, যাঁহার সঙ্গে দাদাকে রাখা হইয়াছিল, তিনি দাদাকে সামলাইতে পারেন নাই। এক অগ্রবাল ভদ্রলোক সিওয়ানে থাকিতেন, তাঁহার সহিত বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। দাদাকে তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। কিছুদিন দাদা তাঁহার নিকট থাকিয়া গেল। ভদ্রলোকের বাড়ির নিকট এক নূতন কুয়া খোঁড়া হইতেছিল। তাহাতে জল আসিয়াছিল, কিন্তু উপরের দিকে তখনও পাকা করা

হয় নাই। একদিন জল দেখিতে কি খেলিতে দাদা সেই কুয়ার কাছে গিয়া তাহাতে পড়িয়া গেল। প্রায় ডুবিয়া যাইতেছিল, অনেক কষ্টে উপরে উঠানো হইল। সে ভদ্রলোক লিখিয়া পাঠাইলেন, এমন চঞ্চল প্রকৃতির ছেলের দেখাশুনা তাঁহাকে দিয়া চলিবে না। ইহার পরই দাদাকে ছাপরায় পাঠানো হইল, সেখানে জেলা স্কুলে নাম লিখাইয়া সে পড়িতে শুরু করিয়া দিল। ছুটির মধ্যে বাড়ি আসিলে আমাদের নিকট ছাপরা আর ইস্কুলের কথা বলে, আমরা ছেলেরা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া সেসব শুনি। সম্ভবত নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিতে তখনও পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ছাড়া, যেসব জায়গায় কখনও কখনও রামলীলা বা অন্য মেলা দেখিতে গিয়া থাকিব, আর কোথাও যাই নাই। হ্যাঁ, শুনিয়াছিলাম যে নিতান্ত শিশু বয়সে মার সঙ্গে মামাবাড়ি গিয়াছিলাম; সে জায়গাটা বালিয়া জিলায়, আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় আঠারো বিশ ক্রোশ দূরে। কিন্তু আমার সে কথা কিছুই মনে নাই।

ছাপরাতে আমার পড়ার কথা স্থির হইয়া গেল, নুনু মনে করিলেন একবার আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া সবকিছু দেখাইয়া দেওয়া ভাল, আর আমাকে সঙ্গে লইয়াও গিয়াছিলেন। আমি ছাপরায় কয়েকটা দিন দাদার সঙ্গে থাকিলাম, তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। যতদূর মনে পড়ে, এই আমার প্রথম রেলগাড়িতে চড়া। কিন্তু এ-যাত্রা স্কুলে ভর্তি হই নাই। জীরাদেইতে ফিরিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট আবার পড়িতে শুরু করিলাম। ইহার মধ্যে এক দুর্ঘটনা হইয়া গেল। নুনুর মৃত্যু হইল। আমাদের বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ আর এক পরিবার ছিল; বাবু ফুলনপ্রসাদ বর্মা সেই পরিবারের বংশধর। তাঁহার পিতা মামাবাড়িতে আসিয়া মামার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার মামার সঙ্গে আমাদের কিছু পুরানো সম্বন্ধও ছিল, কিন্তু তাহার চেয়েও ছিল তাঁহার নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হাতোয়া রাজসরকারে চাকুরি করিবার জন্য বহু-দিন হইতে এই দুই বংশের সম্পর্ক নিকট হইয়াছিল। ফুলনবাবুর পিতার বিবাহে নুনু বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তাঁহার কলেরা হয়। তিনি তো সারিয়া উঠিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গ্রামেও খুব একচোট কলেরার ধুম দেখা দিল। সারিয়া উঠিবার দুই তিন সপ্তাহ পরে তাঁহার আর একবার কলেরা হইল। সেদিনকার কথা আজও আমার মনে পড়ে। দুপুরে প্রায় এগারোটার সময় রোগ শুরু হইল, আর রাত্রেই তিনি চলিয়া গেলেন। বাবা যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইলেন। প্রায় ছয় ক্রোশের পথ দরৌলী হইতে ডাক্তার আনা হইল। প্রথমবার অসুখের সময় এই ডাক্তারই সারাইয়াছিলেন। কিন্তু সেকালে তো দ্রুত যানবাহন মিলিত না। ডাক্তার হাতিতে চড়িয়া রাত্রি বারোটার সময়

আসিয়া পেঁৗছিলেন, তিনি আসিয়া পেঁৗছিবার আগেই নন্দর মৃত্যু হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাড়িতে বড় হাহাকার পড়িল, ঠাকুরদাদার ঐ একই পুত্র। বাহিরের ও ভিতরের, বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম তিনিই সামলাইতেন। ঠাকুরদাদার বয়স তখন প্রায় ৭০ বৎসর। আর নন্দর বয়স তখনও ৪৫-এর বেশি হয় নাই। বাবা বাড়ির কাজকর্ম করিতে ভালবাসিতেন না। এই কারণে সব কিছু আরও বেবন্দোবস্ত ছিল, ফলে কিছুদিনের জন্য আমায় ছাপরা পাঠানো বন্ধ হইল।

এক বছর দেড় বছর পরে আমাকে ছাপরায় পাঠানো হইল। ছাপরায় মাসে তিন-চার টাকা ভাড়ায় একটি ছোট বাসা লওয়া হইল। সেখানে দাদা থাকিত, সঙ্গে থাকিত চাকর আর এক কায়স্থ রাঁধুনি, গোড়ায় কিছুকাল তাহাকে পড়াইবার জন্য মাষ্টারও রাখা হইয়াছিল, কিন্তু আমি গিয়া পেঁৗছিবার সময় আর কেহ ছিল না। আমিও তাহার সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করিলাম, আর ছাপরা পেঁৗছিবার কয়েকদিন পরেই জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে—সেকালে ইহাই ছিল সব চেয়ে নীচের শ্রেণী—আমার নাম লেখানো হইল। আমি সেখানেই এ বি.সি আর নাগরী অ আ ই ঈ একসঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিলাম; দাদা তখন দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ এণ্ট্রান্স ক্লাসে পেঁৗছিয়াছিল। আমার জন্য কোনও শিক্ষক রাখা হয় নাই। স্কুলের পড়া ছাড়াও অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। আমাকে বাড়িতে পড়াইবার জন্য মাষ্টার না রাখা খুব ভাল হইয়াছিল। স্কুলের বই খুব মন দিয়া পড়ার অভ্যাস হইয়া গেল। আর প্রথম হইতেই নিজের উপর খানিকটা বিশ্বাসও আসিল। বৎসরের শেষে দাদা এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য তৈয়ারি হইতেছিল, আর আমি বাৎসরিক পরীক্ষা দিতেছিলাম, পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পাইয়াছিলাম। আমি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম হইলাম, নম্বর এত বেশি পাইলাম যে হেডমাষ্টার আমাকে ডবল-প্রমোশন দেওয়ার কথা ভাবিলেন। তখন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি খুব নামডাকের হেডমাষ্টার ছিলেন, খুব বিদ্বান ছিলেন বলিয়া লোকে মনে করিত। স্কুলে তাঁহার প্রভাবও ছিল প্রচণ্ড, শুধু ছেলেরা নয়, শিক্ষকেরাও ভয়ে কাঁপিতেন। পরীক্ষার ফল শোনানো হইল। আমাকে অষ্টম শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হইল। তখন অষ্টম শ্রেণীর উপরে সপ্তম শ্রেণী থাকিত, তাহার উপরে ষষ্ঠ শ্রেণী, এইরূপ; নবম শ্রেণী সকলের নীচে, প্রথম শ্রেণী সকলের উপরে। আমরা ছেলেরা সব ফুর্তি করিতেছি, এমন সময় চাপরাশি আসিয়া ক্লাস-মাষ্টারকে বলিল যে হেডমাষ্টার মহাশয় আমাকে ডাকিতেছেন। হেড-মাষ্টার তাহাদেরই ডাকিতেন, যাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ

থাকিত। আমি খুব ভয় পাইয়া গেলাম, ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া ভয় দূর হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি ডবল-প্রমোশন নিয়ে সপ্তম শ্রেণীর বদলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে যাবে? আমি যেন একটু ঘাবড়াইয়া গেলাম, খানিকটা খুশি, খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা ভয়ও বটে যে, এক বৎসরের পড়াটা কেমন করিয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারিব। আমি উত্তর করিলাম : দাদাকে জিজ্ঞাসা করে বলবো। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার দাদা কে? নাম শুনিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। দাদাকে তিনি চিনিতেন, কারণ দাদাকে তো তিনিই পড়াইয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, সেজন্য দাদা ঘরে বসিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি বলিলেন : ও কি একথা আমার চেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যে ওকে জিজ্ঞাসা করতে চাও? আচ্ছা, গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস। আমি সেখান হইতে এক দৌড়ে দাদার কাছে আসিয়া পেঁৗছিলাম। স্বর্গীয় বাবু বাঁকেবিহারীলাল, মৌলবী শফী দাউদি আর দাদা—তিনজনে একসঙ্গে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমি সেখানেই গেলাম, আর তিনজনেই এই খবর শুনিয়া খুব খুশি হইল, নিজেদের মধ্যে কিছু সলা-পরামর্শও হইল, দাদার মনে হইল যে এক ক্লাস বাদ দিলে আমি পরে কাঁচা হইয়া পড়িব, পরে আর পড়াশোনা ঠিকমত হইবে না। দাদা আমার সঙ্গে হেডামষ্টার মহাশয়ের নিকট আসিল, তাঁহাকে নিজের মত জানাইল। হেডমাষ্টার হাসিয়া আবার ঐ কথাই বলিলেন : তুমি কি আমার চেয়ে এবিষয়ে বেশি বোঝ? ফলে আমাকে তিনি সপ্তম শ্রেণী ডিঙ্গাইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পদিন পরেই দাদা পরীক্ষা দিতে পাটনা চলিয়া গেল, আর পরীক্ষার পর গেল জীরাদেই গ্রামে। আমি ঐ সময় ছাপরার বাসায় চাকর ও রাঁধুনি লইয়া একলা থাকিতাম। হ্যাঁ, আমার মক্তবের সহপাঠী যমুনাভাই আর গঙ্গাভাইও আসিয়া ছাপরা স্কুলে নাম লিখাইল। আমরা তিনজন ওখানে একসঙ্গে থাকিতাম ও পড়িতাম। তখন আমার বয়স দশ এগার বৎসর। দাদা এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া গেল, পাটনা কলেজে তাহার পড়িবার কথা হইল, এবং সে পাটনায় যাইতে প্রস্তুত হইল। কথা হইল যে আমিও তাহার সঙ্গে পাটনায় চলিয়া যাই। তাহাই হইল। আমরা তিনজন সহ-পাঠী দাদার সঙ্গে পাটনায় গেলাম। দাদা পাটনা কলেজে নাম লেখাইল, আমরা ভর্তি হইলাম টি. কে. ঘোষ একাডেমিতে; সেকালে এই স্কুলের খুব সুনাম ছিল। অনেক ছেলে এখানে পড়িত। ঐ স্কুলে গিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, ডবল-প্রমোশনের ব্যাপারে দাদার মত হেডমাষ্টার মহাশয়ের মতের চেয়ে ঠিক ছিল; আমি প্রতিদিন অনুভব করিতাম যে অন্য ছেলেরা অনেক বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জানে। আমি এই অভাব

পূরণের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেখানেও বাসায় পড়াইবার জন্য কোনও মাষ্টার ছিল না। যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার, তাহা দাদা কি তাহার সঙ্গীদের মধ্যে কাহারও নিকটে জানিয়া লইতাম।

ছাপরায় যাইয়া আমার অভ্যাস হইয়াছিল, রোজ বিকালে স্কুল হইতে ছুটি হইলে ঘরে ফিরিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া করিয়া ফুটবল কি অন্য কিছু খেলিবার জন্য স্কুলে আবার চলিয়া যাওয়া। ফুটবল ও ক্রিকেট—বিশেষ করিয়া এই দুই খেলাই চলিত। উপরের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে ও মাষ্টার মহাশয়দের কেহ কেহ—বিশেষ করিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়—টেনিসও খেলিতেন। পাটনার স্কুলে খেলাধূলার কোনও ব্যবস্থা ছিল না—এই অভাব আমরা খুবই বোধ করিতাম। স্কুলের হাতা বড় ছিল না; কিন্তু যেটুকু জায়গা ছিল, তাহার মধ্যে আমরা বল লইয়া যাইতাম, আর খানিকটা দৌড়ধাপ করিয়া চলিয়া আসিতাম। দাদা খেলাধূলায় খুব পটু ছিল, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলায় অনেকটা আগাইয়া ছিল, পাটনা কলেজেও তাহার নাম ছিল। আমরা কখনও কখনও খেলা দেখিতে পাটনার মাঠে যাইতাম।

পাটনায় 'সোমবারী' মেলা শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার ধূমধামের সঙ্গে হইত। আমরা ঐ মেলায় খুব ফুর্তি করিয়া যাইতাম, আর ছোট-খাটো জিনিস কিনিবার জন্য দাদাকে ধরিতাম। মনে আছে, একবার একটা অতি সুন্দর মূর্তি কিনিবার জন্য আমি খুব জিদ করিয়াছিলাম, দাদাকে সেটা কিনিয়া দিতে হইয়াছিল। একবার ঐ সোমবারের মেলায় বাঁকে-বিহারীবাবুর পকেট হইতে চোর কিছু টাকা পয়সা বাহির করিয়া লয়। দাদাও সঙ্গে ছিল। চোর ধরা পড়ে। তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়, বাঁকেজী ও দাদা দুইজনকে এজাহার দিতে হইয়াছিল। ঐ মোকদ্দমা দেখিবার জন্য—যতদূর মনে পড়ে সেই প্রথমবার—কাছারি গিয়াছিলাম।

পাটনায় আমাদের গাঁয়ের একজন ভদ্রলোক চাকরির খোঁজে আমাদের বাসায় থাকিতেন। দাদার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ওখানেও আমরা একটা বাসা ভাড়া করিয়া বাঁকেজীবাবুর সঙ্গে একত্রই থাকিতাম। ঐ ভদ্রলোকটি ছিলেন ছোট-খাটো এক পালোয়ান। কসরতও জানিতেন। তিনি উঠানে ছোট এক আখড়া করিয়া সেখানে সকলকে দিয়া কসরত করাইতে ও সকলকে কুস্তি শিখাইতে শুরু করিলেন। একদিন কুস্তি শিখাইতে গিয়া বাঁকেজীর চোট লাগিয়া গেল, আর তাঁহার পায়ের ব্যথা বেশ কিছুদিন চলিল। ইহার পর কুস্তি ও আখড়ায় উৎসাহ কমিয়া গেল।

আমরা যখন পাটনায় ছিলাম তখন প্লেগের নাম প্রথম শুনি। তখন বোম্বাই হইতেই এই ভয়ঙ্কর রোগের খবর শুনা গিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিন পরে ছাপরা জেলায়ও ইহা আড্ডা জমাইয়া লইল, আর অল্প-

বিস্তর এখনও কিছু-না-কিছু রহিয়া গিয়াছে। এই সময়ে খুব দুর্ভিক্ষও হইয়াছিল; ছুটিতে গাঁয়ে গিয়া দেখিলাম, লোকের সাহায্যের জন্য সরকারি অফিসার আসিয়াছে, এবং আমাদের বাড়িতে উঠিয়াছে।

পাটনায় প্রায় দুই বৎসর কাটিল। দাদা এফ্. এ. পরীক্ষা দিল, আমি ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম, পঞ্চম হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। পরীক্ষা দিয়া দাদা বাড়ি চলিয়া গেল, আর আমি, গঙ্গাভাই, যমুনাভাই পাটনায় চাকরদের লইয়া নিজেরাই দুই তিন মাস থাকিলাম। গরমের ছুটি হইলে বাড়ি গেলাম।

বিবাহ

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িবার সময়, না চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিবার পর, কখন আমার বিবাহ হইয়াছিল ঠিক মনে নাই—বোধ হয় আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়িতাম। গরমের ছুটির সময়েই বিবাহ হয়। আমরা যখন ছাপরায় পড়িতাম তখনই ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। ইঁহাদের অসুখের খবর পাইয়া আমরা সকলে ছাপরা হইতে জীরাদেইতে আসি; আমাদের সকলের সামনেই দুইজনে অল্পদিনের তফাতে চলিয়া গেলেন। এজন্য এখন আমার পিতাই বাড়ির মালিক হইলেন, আমার বিবাহের বন্দোবস্ত তাঁহাকেই করিতে হইল।

আমার শ্বশুর মহাশয় আরায় মোক্তারি করিতেন। তাঁহার ছোট এক ভাই বালিয়াতে ছিলেন উকিল। দুইজনে জীরাদেই আসিলেন। বাবা আমাকে ভিতরে মার কাছ হইতে ডাকাইয়া আনাইলেন। উঁহারা আমাকে দেখিলেন, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, তাহার পর পছন্দ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে 'তিলক' হইল, প্রথামত কাপড়, বাসন ইত্যাদি ছাড়া টাকাও আসিল। যতদূর মনে পড়ে, টাকার জন্য বাবা বেশি কিছু চাপ দেন নাই। তাহা হইলেও তাঁহারা নগদ ও জিনিসপত্র মিলাইয়া প্রায় দুই হাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। আমার বয়স ছিল তখন বারো বছরের কিছু বেশি।

তখনকার দিনে দুই হাজার টাকার তিলক ভাল তিলক বলিয়াই লোকে মনে করিত। আজকাল তো পাঁচসাত হাজারও লোকে কম বলিয়া মনে করে। তিলক যতবেশি টাকার হয়, বরযাত্রীও ততবেশিই যাওয়া দরকার, মেয়ের জন্য ততই বেশি অলঙ্কার যাওয়া চাই। আমার বিবাহের

সময় বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। একে তো তিন চার বৎসরের মধ্যে পরিবারে একের পর এক তিনটি মৃত্যু ঘটিয়াছিল, প্রত্যেকের শ্রাদ্ধেই খরচ হইয়াছিল যথেষ্ট। তাহার উপর দুর্ভিক্ষের জন্য জমিদারদের আদায়পত্র কম হইয়া গিয়াছিল। খরচ বাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের পড়ার জন্য ছাপরা ও পাটনায় প্রতি মাসে কিছু-না-কিছু নগদ পাঠাইতে হইত। বহুদিন ধরিয়া এক মোকদ্দমার শুনানি চলিতেছিল, খরচও হইতেছিল বেশি। এইসব বাধা সত্ত্বেও বিবাহে খরচ করিতেই হইবে। কারণ তাহাতেই বংশের গৌরব।

অলঙ্কার প্রভৃতির বাবদ যাহা খরচ, তাহা তো তাঁহারা খুবই করিলেন। বরযাত্রীর আয়োজনও কম করিতে চাহেন নাই, কারণ তাঁহাদের সময়ে ইহাই প্রথম বিবাহ, আর যদি পুরানো মাত্রায় খরচ না হয় তাহা হইলে লোকে বলিবে, ভাইয়াজীর (আমার ঠাকুরদাদাকে সকলে এই নামেই ডাকিত) মৃত্যুর পরই বাড়ির মানসম্মান কমিয়া গেল; এইজন্য বাবার মত ছিল যে এই বিবাহে কোনও প্রকারেই আড়ম্বর যেন কম না হয়। আমাদের এখানে বিবাহে মিছিলের জন্য অনেক হাতি ঘোড়া চাহিয়া জোগাড় করা যায়। মিছিলের আরও জিনিসপত্র চাহিলে পাওয়া যায়। বিবাহের দিন ছিল 'কড়া লগনসা', অর্থাৎ গ্রহ ভাল থাকার জন্য দিনক্ষণ ভাল ছিল, তাহাকেই 'কড়া লগন' বা শুভলগ্ন বলা হইত। ঐ দিন বিবাহ করা অনেকে শুভ মনে করিত। লগনসার দিন চাহিয়া জিনিস পাওয়া কঠিন হইত, কারণ বহুলোক চাহিত; আমার বরযাত্রীর জন্য অনেক হাতি ঘোড়া চাওয়া হইল কিন্তু লগনসার জন্য সেসব কিছু পেঁাছিতে পারিল না। পেঁাছিল একটাই হাতি আর দুচারটা ঘোড়া।

আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল বালিয়া জেলার দলন-ছাপরা গ্রামে। জীরাদেই হইতে ১৮।২০ ক্রোশ দূরে। দুইদিনের রাস্তা। পথে সরযূ নদী (ঘর্ঘরা), নৌকায় পার হইতে হইত। বরযাত্রীরা জীরাদেইয়ের বিবাহসংক্রান্ত সব কাজকর্ম শেষ করিয়া রওনা হইল। হাতিঘোড়া কম বলিয়া পালকী লইতে হইল, জিনিসপত্র চলিল গোরুর গাড়িতে। বরের জন্য আনা এক বিশেষ পালকীতে আমি চলিলাম। বাড়িতে এক প্রকাণ্ড ঘোড়া ছিল; দাদা তাহাতে চড়িয়া চলিল। দাদা সকলকে রওনা করিয়া দিয়া সকলের শেষে সকলের পিছনে চলিল, আর দুপুরের খাওয়ার জায়গা যেখানে স্থির ছিল সকলের আগে সেখানে পেঁাছিল। বন্দোবস্ত অনেক-খানি দাদার হাতে ছিল। বাবা ছিলেন পালকীতে, অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বেরা পালকী বা অন্য যান-বাহনে চড়িয়া যাইতেছিলেন।

বরের পালকী হইত বড় কিম্ভূতকিমাকার ধরণের। উপরে ছায়ার জন্য ছাত থাকিত না, কাপড়ের ছই বাঁধিয়া লওয়া হইত। জ্যৈষ্ঠ মাসে

বিবাহ হইয়াছিল। খুব গরম পড়িয়াছিল। গরম হাওয়াও খুব জোর চলিয়াছিল। আমার ঐ পালকীতে যাওয়ার কথা। হাওয়ায় ঐ ছইও উড়িয়া যাইতেছিল। পালকী ছিল রুপার। তাই ওজনে বেশ ভারি, কাহারদের পক্ষে ভার সামলানোই কঠিন, তাহার উপর হাওয়ার জন্য ছই-গুলি বেলুনের মত কাজ করিত। বেচারিদের ভারি মুস্কিল। রোদ ও হাওয়া, আমি দুইয়েরই আক্রমণ সহ্য করিতে লাগিলাম।

কোনও মতে দিনটা কাটিল, রাত্রে সরযূর তীরে এক গ্রামে আড্ডা পড়িল। কাঁচাপাকা রসুই হইল। সকলে আহারাদি করিল। সকালে সরযূ পার হইলাম। জিনিসপত্র, পালকী, গোরুর গাড়ি, বলদ, ঘোড়া ইত্যাদি তো নৌকায় বোঝাই করা হইল, আর হাতি সাঁতরাইয়া পার করাইবার চেষ্টা শুরু হইল। হাতিও ছিল তেমনি, নদী পার হইতে চাহিতেছিল না। কিছু দূরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। আবার অনেকগুলি নৌকার মাঝে রাখিয়া পার করিবার চেষ্টা দেখা গেল, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। শেষে ঠিক হইল হাতি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, হাতি বিনা বরযাত্রী রওনা হইল। বাবার মনে এ বিষয়ে বড় দুঃখ, বরযাত্রীদের মিছিলে একটাও হাতি গেল না। আমার যেখানে বিবাহ হইতেছে, সেখান হইতে অল্প দূরেই বাবারও বিবাহ হইয়াছিল। তখন ঠাকুরদাদা ছিলেন হাতোয়ার দেওয়ান, আর সেই বরযাত্রায় পঞ্চাশটা হাতি গিয়াছিল। বাবার মনে এই কথাটাই বিঁধিতেছিল যে, যেখানে তাঁহার বিবাহে পঞ্চাশটা হাতি গিয়াছিল সেখানে তাঁহার ছেলের বিবাহে একটাও হাতি লওয়া গেল না। কিন্তু কি করা! বরযাত্রী তো ফিরিয়া আসিতে পারে না, হাতির ঝামেলায় এতটা সময় লাগিয়া গেল যে ঐ গ্রামে পেঁছিতে রাত হইবে বলিয়া ভয় হইতে লাগিল। বরযাত্রীরা খুব জোরে চলিল। দুপুর বেলায় যে জায়গায় পেঁছাইবার কথা ছিল সেখানে পেঁছিতে তিনটা চা'রটা বাজিয়া গেল। সেখানে আহারাদি করিয়া বরযাত্রীর দল অগ্রসর হইল। রাত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে এক ঘটনা ঘটিল। বরপক্ষ যখন গাঁ হইতে দুই-একমাইল দূরে, তখন দুই তিনটা হাতি আসিতে দেখা গেল। তাহারা অন্য কোনও বরযাত্রীর দলের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের কাজ শেষ করিয়া ফিরিতেছিল। মাহুতদের সঙ্গে কথা হইল। তাহাদের কিছু টাকা দিয়া বরযাত্রীর সঙ্গে যাইতে রাজি করানো হইল। এইভাবে হাতির আকাঙ্ক্ষা তো একপ্রকার মিটিল। কিন্তু বরযাত্রী পেঁছিতে পেঁছিতে রাত দশটা এগারটা বাজিয়া গেল।

ওদিকে লোকেরা ঘাবড়াইয়া যাইতেছিল—ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। শেষে বরযাত্রীরা পেঁছাইয়া গেল। আমার অভ্যাস ছিল ঠিক সন্ধ্যাতেই ঘুমাইয়া পড়া, বিবাহের জন্য যে সে অভ্যাসের কিছু ব্যতিক্রম হইল তাহা

নয়। বরযাত্রী পৌঁছিবার পূর্বেই আমি পালকীতে খুব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পৌঁছাইবার সময় কোনও প্রকারে জাগানো হইল; আর বর-পরিচর্যার কাজ শেষ হইল। বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠানও একে একে নির্বাহ হইল। গ্রীষ্মকালে দুইদিনের ভ্রমণ, আর তাহাও পালকীতে। সন্ধ্যায় ঘুমাইবার অভ্যাস, তাহার উপর এতটা ক্লান্তি। আমার পক্ষে জাগিয়া থাকাই ছিল একটা কঠিন সমস্যা। সব রীতি রক্ষা হইল। আমার শুভবিবাহও সেই রাত্রে নির্বাহ হইল। আজ আমার সেই রীতি সবটা মনে নাই। আমাকে কি করিতে হইয়াছিল তাহাও মনে নাই। ছেলেবেলায় আমার বোন পুতুলের বিয়ে দিত, আমিও তাহার সঙ্গে খেলিতাম। এ বিবাহ আমার পক্ষে ঐ রকমই একটা ব্যাপার হইয়াছিল। আমি না বুঝিলাম বিবাহের মহত্ত্ব, না অনুভব করিলাম যে আমার উপর কোনও দায়িত্ব আসিল। বিবাহ স্থির করা বা এইসব রীতি রক্ষা করা কোথাও আমার হাত ছিল না। পণ্ডিত, নাপিত, নিজের বাড়ির বা শ্বশুরবাড়ির মেয়েরা যেমন যেমন বলিয়াছে তেমন তেমন করিয়াছি, শেষটায় লোকে বুঝিয়া লইল যে আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার তো এইটুকুও জ্ঞান ছিল না যে কি হইল। এটুকু অবশ্য বুঝিলাম যে আমার বৌদিদি যেমনভাবে বাড়ি আসিয়াছিলেন, ঐভাবে একদিন কেহ আমার বধূ হইয়া আসিবে।

আমাদের এখানে এখনও চলন আছে যে কখনও কখনও বিবাহের পর পরই মেয়েকে লইয়া আসে না। কিছুদিন পর ছোট-খাটো এক বরপক্ষের দল যায়, গিয়া মেয়েকে লইয়া আসে। ইহাকে দ্বিরাগমন বলে। আমার বিবাহের পরেও বধূকে সঙ্গে সঙ্গে আনা হইল না, এক বৎসরের পর দ্বিরাগমনে বরপক্ষ গেল, তখন তাহাকে আনা হইল। বরপক্ষ দুই দিন থাকিয়া ফিরিয়া আসিল। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বরযাত্রী দেরি করিয়া যাওয়ায় আর আশানুরূপ পুরা আড়ম্বর না হওয়ায় কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু তাহারা যখন বরপক্ষ হইতে মেয়েকে ও অন্যান্য সকলকে দেওয়া কাপড়, মিঠাই ইত্যাদি দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের রাগ দূর হইল, আর সকলে খুব খুশি হইয়া গেল। আমার মনে হয়, বরকে দেখিয়াও বাড়ির মেয়েরা ও অন্যান্য অভ্যাগতেরা খুশি হইয়া থাকিবে, যদিও আমার কাছে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

এক বৎসর পরে দ্বিরাগমন হইল, বধূ বাড়িতে আসিল। দ্বিরাগমনে বরযাত্রীর দল বিবাহের দল অপেক্ষা ছোট হইত। এবার দুই একটা হাতি জুটিয়াছিল, সেগুলি বরযাত্রীদলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। আমাদের দেশে বড় কঠোর পর্দা, আমি দেখিয়াছি বধূঠাকুরাণী যখন আসিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে দুইজন দাসী আসিয়াছিল, তিনি কেবল ঐ দুইজনের সঙ্গেই

কথা বলিতে পারিতেন। জীরাদেইতে একটা কামরার মধ্যে থাকিতেন। কখনও বারান্দায় বাহির হইবার অনুমতি ছিল না। তখনকার দিনে কম-বয়সী পুরুষ চাকরই ঘরের ভিতর যাইতে পারিত। আর যাহাদের জন্ম আমাদের মা-জ্যেঠিমার সামনে গাঁয়ের মধ্যে, যাহারা নিতান্ত শিশুকাল হইতে নিজেদের মায়ের সঙ্গে আঙিনা দিয়া যাওয়া-আসা করিত, তাহারা যাইত। যাহারা বয়স্ক চাকর, তাহারা বাড়ির ভিতর যাইত না। একজন পাচক ছিল, সে রসুই করিতে আঙিনায় যাইত। কিন্তু সেও যাইবার পূর্বে ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিত, আর অমনি আমার মা-জ্যেঠিমা ঘরের মধ্যে চলিয়া যাইতেন, তখন সে গিয়া রসুই ঘরে ঢুকিত। সেখান হইতে কোনও জিনিসের দরকার হইলে সে কোনও দাসীকে ডাকিয়া চাহিয়া লইত। আর বাহিরে যাইবার সময় আবার সেইমত চিৎকার করিয়া সবাইকে সরাইয়া দিবার পরে তবে বাহিরে যাইত।

বধূঠাকুরাণী তো তাঁহার ঘর হইতে বাহিরেই আসিতেন না। নিত্য-ক্রিয়ার জন্য ঘরের বাহিরে আসিতে হইলে প্রথমে সকলকে সরাইয়া দেওয়া হইত। লোকের মধ্যে অন্য কেহ সঙ্গে থাকিত না, শুধু জীরাদেইয়ের মেয়েরাই থাকিত। পুরুষের মধ্যে তো কেহ আঙিনায় থাকিতই না, কোনও ছোট ছেলে থাকিলে তাহাকেও সরাইয়া দেওয়া হইত। ইহাতেও যথেষ্ট পরদা হইত না, তাঁহার বাপের বাড়ির ঝিরা কাপড়ের পরদা লাগাইয়া তাঁহাকে লইয়া যাইত। আমি খুব ছোট ছিলাম। এইজন্য আমি কখনও বা খেলাধূলা করিতে করিতে তাঁহার ঘরে চলিয়া যাইতাম। আর দুই একবার হয়তো তাঁহার মুখও দেখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার মা জ্যেঠিমা আর দিদিও যখন তাঁহার ঘরে যাইতেন তখন তিনি ঘোম্‌টা টানিয়া বসিয়া থাকিতেন। জীরাদেইয়ের কোন ঝিও সেখানে যাইতে পারিত না।

দ্বিরাগমনের পরে আমার স্ত্রী যখন আসিল তখন তাহার সঙ্গেও এসব গণ্ডগোল আসিল। সেসব অনেকদিন ধরিয়া চলিল; আর আস্তে আস্তে কমিয়া গেল। বাপের বাড়ির দাসীরা চলিয়া গেল। জীরাদেইয়ের একটি দাসী যাওয়া আসা করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা কহিবার অনুমতি হইল, আর মা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন না আমার বধূঠাকুরাণী, না আমার স্ত্রী, কেহই স্বাধীনভাবে নিজের নিজের ঘর হইতে আঙিনায় বেড়াইতে বা বসিতে পারিতেন না। আমার অবস্থা তো এই ছিল যে, আমি যখন ছুটিতে কখনও গাঁয়ে আসিতাম, তখন বাহিরেই শুইতাম। রাত্রে সকলে ঘুমাইলে মা ঝিকে পাঠাইতেন আমাকে জাগাইয়া আনিবার জন্য, আর সে আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া সঙ্গে করিয়া, আমার স্ত্রী যেখানে থাকিত সেই ঘরে রাখিয়া আসিত। ঘুমের

চোটে ঐ সময় আমার রাত্রি জাগা কঠিন হইত। আর শেষে যত চেষ্টাই হউক কিছুতেই জাগিতাম না। পরের দিন মা বা জ্যেঠিমা গালাগালি দিতেন যে রাতে জাগি না, ডাকিলেও আসি না। ভোরবেলা যখন সকলে ঘুমাইয়া থাকিত, তখন উঠিয়া চলিয়া আসিতে হইত। বাহিরে খাটিয়ার উপর ঘুমাইয়া পড়িতাম, যাহাতে কেহ টের না পায় যে রাত্রে অন্য কোথাও গিয়াছিলাম। এমন কি, আমার সঙ্গের চাকরও খুব সামান্যই টের পাইত রাত্রে আমি কোথায় যাই।

পর্দার জন্য স্বামী-স্ত্রীর দেখাসাক্ষাৎ এইরূপই হইত। আমি তো ছেলেবেলা হইতেই বাড়ির বাহিরেই বেশি থাকিয়াছি। কখনও ছুটিতে বাড়ি গেলে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ সুবিধা হইত। তাহাও হইত এই ভাবে। এই জন্য যদিও আজ প্রায় চুয়াল্লিশ-প'য়তাল্লিশ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সর্বদিন গণিলেও সম্ভবত আমরা দুজনে যত বৎসর তত মাসও একসঙ্গে থাকিয়াছি কিনা সন্দেহ। পড়িবার সময় কাটিল পাটনা, ছাপরা ও কলিকাতায়। ওকালতি করিবার সময়ও আমি কলিকাতায় বরাবর একলাই থাকিতাম। পাটনায় আসিবার পরও দুই একবার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে অল্পদিনই একত্র ছিলাম। অসহযোগ আরম্ভ হওয়ার পর তো বাড়ি যাওয়ার সময় আরও কম পাইতাম, আর কাজের ঝঞ্ঝাটে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে রাখিবার না ছিল সুবিধা, না ছিল অবসর।

হাতোয়া স্কুলে ভর্তি—ছাপরা স্কুলে প্রত্যাবর্তন

দাদা এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল কলিকাতায় গিয়া মেডিকাল কলেজে পড়েন। সেকালে বিহারীদের মধ্যে কেহ মেডি-কাল কলেজে পড়িত কিনা সন্দেহ। একে তো কলিকাতায় যাওয়া, তাহাতে সেখানকার খরচ জুটানো মুস্কিল। দাদার কলিকাতায় যাওয়ার কথা যখন স্থির হইয়া গেল, তখন প্রশ্ন হইল, আমি কোথায় পড়িব? আমার কলিকাতায় যাওয়া উচিত হইবে না মনে হইল। দাদা কলিকাতায় গেলেন, অমনি আমাকে পাঠনো হইল পাটনা হইতে নাম কাটাইয়া হাতোয়া স্কুলে নাম লিখাইবার জন্য। সেখানকার অবস্থা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। লেখাপড়া শিখাইবার প্রণালী ছাপরা জিলাস্কুল ও পাটনা টি. কে. ঘোষ একাডেমী—দুই জায়গা হইতে কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের। প্রথমে তো ভর্তি

হইতেই কিছু গোলমাল হইল। মাষ্টার বলিলেন তিনি পরীক্ষা করিয়া ভর্তি করিবেন।

কোনও প্রকারে ভর্তি তো হইলাম। পড়াইবার প্রণালী এইরূপ ছিল যে, যাহা কিছু পাঠ দেওয়া হইত, বিশেষ করিয়া ইতিহাসের পাঠ, তাহা পরের দিন কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতে হইত। মাষ্টার মহাশয় বলিতেন, পাঠটা শোনাও; আর সকলকে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বই বন্ধ করিয়া মুখে মুখে শোনাইতে হইত। এইরূপে না বুঝিয়া কোনও কিছু কণ্ঠস্থ শোনানোর অভ্যাস আমার ছিল না। শব্দ মনে রাখিবার শক্তিও আমার কম ছিল। প্রায় ছয় মাস ঐ স্কুলে থাকিলাম, কিন্তু হয়তো একদিনও পুরোপুরি পাঠ মুখস্থ করিতে পারি নাই। আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু আমি মুখস্থই করিতে পারিতাম না। আমাকে কেহ বলিয়া দিয়াছেন যে যদি কোন কিছু একশ কুড়িবার আবৃত্তি করা যায় তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই কণ্ঠস্থ হইয়া যাইবে। আমি খুব পরিশ্রম করিয়া একশ কুড়িবার আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তবু পাতার পর পাতা মুখস্থ করিতে পারিতাম না। আমার অভ্যাস-মতো সেই সন্ধ্যায় শুইয়া পড়িতাম আর গোটা চারেকের সময় বিছানা হইতে উঠিতাম। হাতোয়ায় একশ কুড়িবার আবৃত্তি করিবার জন্য কখনও কখনও রাত্রি দেড়টা-দুইটাতেই উঠিতাম। এত করিয়াও পাঠ সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম না। স্কুলে মাষ্টারমশাই অবস্থা দেখিয়া কখনও কখনও রাগ করিতেন, আর বলিতেন, এ ছেলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করিবার মতই নয়, আর ধমক দিতেন, তোমাকে পঞ্চম শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইবে। এসব আমার পক্ষে মর্মান্তিক কষ্টের কারণ ছিল; ওখানে আমার যত দুঃখে দিন কাটিত, পড়িবার সময় আর কোথাও অত কষ্ট পাই নাই। কখনও কখনও মনে হইত, হয়তো এক ক্লাশ ডিঙ্গাইয়া না গেলে এই অবস্থা হইত না।

শেষে খুব অসুখে পড়িলাম। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় পর্যন্ত অসুস্থই থাকিলাম। বাৎসরিক পরীক্ষা দিলে হয়তো কোনও রকমে পাশ করিয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পারিতাম, আর সমস্ত সমস্যার সমাধানও হইত। ছুটিতে দাদা বাড়িতে আসিলে সব কথা শুনিলেন। তাঁহার মত হইল, বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়া উপরের ক্লাশের প্রমোশন লওয়ার কোনও দরকার নাই। এ স্কুল ছাড়িয়া আবার ছাপরা জেলা স্কুলে ফিরিয়া আসাই ভাল হইবে। তাহাই ঠিক হইল, আর আমি সেখান হইতে আবার ছাপরা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতেই ভর্তি হইলাম।

ওদিকে দাদারও অদ্ভুত অবস্থা। কোনও কারণে মেডিকাল কলেজে তাঁর নাম লেখা হয় নাই। তিনি আবার পাটনায় ফিরিয়া বি. এ. ক্লাশে

পড়িতে শুরু করিলেন। যেহেতু আমার নাম হাতোয়া স্কুলে লেখা হইয়াছিল, সে জন্য সেখান হইতে আমাকে তাড়াতাড়ি আবার পাটনায় লইয়া যাওয়া উচিত বলিয়া মনে হয় নাই। আমি ছয় মাস পর্যন্ত হাতোয়াতেই থাকিয়া গেলাম।

স্কুলের পড়ানোর উপরই আমি ভরসা রাখিতাম, কখনও বাড়িতে পড়াইবার জন্য কোনও মাষ্টার রাখা হয় নাই। হাতোয়ায় পড়া শিখিতে গিয়া হয়রান হইয়া আমি একজন মাষ্টারমশায়ের বাড়ি যাইতাম; তিনি এক-প্রকার কুটুম্বও ছিলেন। তিনি পড়াও দিতেন, কিন্তু আমি একদিনও পাঠ শেষ করিতে পারি নাই। ঐ স্কুল হইতে চলিয়া আসায় আমার পক্ষে এক মস্ত লাভ হইল। ছাপরায় পেঁাছিয়াই যেন হারানো বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ছাপরা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে অনেক ছেলে ছিল; এজন্য উহা তিন ভাগে হইত। সেখানে একজন বাঙ্গালী মাষ্টার ছিলেন, তাঁহার নাম রসিকলাল রায়। আমি যে সেক্সনে ছিলাম তিনি ছিলেন তাহার ক্লাশ-মাষ্টার। লোকটি খুবই ভাল ছিলেন। পড়াইবার প্রণালীও ছিল চমৎকার। ছেলেদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। ছেলেরাও তাঁহাকে খুব মান্য করিত। যদিও তিনি আমাদের ক্লাশমাষ্টার ছিলেন, তবু অন্যান্য সেক্সনেও পড়াইতেন; আর চতুর্থ শ্রেণীতে প্রায় সব ছাত্রকেই জানিতেন। আমার উপর তাঁহার খুব অনুগ্রহ ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে শুধু যে ছাত্রসংখ্যাই বেশি ছিল তাহা নহে, ভাল ভাল ছাত্রও ছিল। তাহাদের কেহ মধ্য বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া ছাত্রবৃত্তি লইয়া আসিয়াছিল। গণিত, ভূগোল, ইতিহাসের জ্ঞান তাহাদের ছিল যথেষ্ট। কারণ এসব বিষয় তাহারা হিন্দীতে পড়িয়া ফেলিয়াছিল। আর পড়া জিনিসই ইংরেজীর মাধ্যমে এখানে আবার পড়িতে হইত। অল্পদিনের মধ্যেই মাষ্টারমশায় অনুভব করিলেন, আর আমার সঙ্গীরাও বুঝিতে পারিল যে আমিও একজন ধারালো ছেলে।

রসিকবাবু আমাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমি এতগুলি ছেলের মধ্যে কোনও পরীক্ষাতেই এখনও প্রথম হইতে পারি নাই। কিন্তু রসিকবাবু আমাকে বলিতেন : দেখ, পরিশ্রম কর, শেষে তোমার ও রামানুগ্রহের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্য সকলের ধার থাকিলেও তোমার চেয়ে নীচে পড়েই থাকবে। জানি না কেন তিনি এইরূপ বলিতেন। কিন্তু ফল তো দাঁড়াইল ঐরূপ—শুধু তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে দুই তিন বৎসর লাগিল। বাৎসরিক পরীক্ষায় আমার স্থান হইল চতুর্থ। কিছু পুরস্কার পাইলাম। কিন্তু অন্যেরা বেশি পাইল। তৃতীয় শ্রেণীতেও তিনি পড়াইলেন, আর একজন মাষ্টারও পড়াইলেন, যাঁহার স্মৃতি আজও তেমনই আছে, আর যিনি আজও জীবিত আছেন। তাঁহার নাম বাবু

রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি ইতিহাস পড়াইতেন। আর পড়াইবার ধরণ তাঁহার এমন সুন্দর ছিল যে সমস্ত বিষয় গল্পের মত মনে থাকিয়া যাইত। হাতোয়ায় পড়াইবার প্রণালীর ঠিক উল্টা ছিল তাঁহার ধরণ; যে নিজের ভাষায় সব বিষয় ভালমত প্রকাশ করিতে পারিত, তাহারই প্রশংসা হইত। আমি এ কাজ সহজে করিতে পারিতাম, আর হাতোয়ায় কণ্ট করিয়া যে কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইতে মাঝে মাঝে ভাল ভাল শব্দ ও বাক্য আসিয়া যাইত। নিজের বুদ্ধি ও কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা, দুইয়ে মিলিয়া ভাল জিনিস দাঁড়াইত; মাষ্টারমশাইএর তাহা খুব ভাল লাগিত।

তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম, বাৎসরিক পরীক্ষায় হইলাম তৃতীয়। এইভাবে দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পূর্বে যে পরীক্ষা হইল তাহাতে আমি প্রথম হইলাম। রামানুগ্রহ হইল দ্বিতীয়। রসিকবাবুর কথা ঠিক ঠিক ফলিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে রসিকবাবুরও যেন প্রমোশন হইতে থাকিল; তিনি চতুর্থ হইতে তৃতীয়ে, তৃতীয় হইতে দ্বিতীয়ে, দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে পড়াইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বদলি হইয়া গেলেন। আর রসিকবাবুও কয়েক-দিনের জন্য অন্য স্কুলে বদলি হইয়া চলিয়া গেলেন। রাজেন্দ্রবাবু আর ফিরিয়া আসিলেন না, কিন্তু রসিকবাবু ফিরিয়া আসিলেন। আর আমাদের সকলের, বিশেষ করিয়া আমার, আহ্লাদের সীমা থাকিল না।

রসিকবাবু শুধু যে শিক্ষাদানে পটু ছিলেন তাহা নহে। ছেলেদের চরিত্রের দিকেও দৃষ্টি রাখিতেন। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি ও গভীর ছাপ আমার উপর তাঁহারই পড়িয়াছিল। এদিকে তো বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও যিনি ফারসী পড়াইতেন সেই মৌলবী সাহেবের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, কিন্তু রসিকবাবু বাড়ির লোকের মত ছিলেন। তাঁহাকে ভয়ও করিতাম, ভালও বাসিতাম। তিনি পড়াইতেন যেমন, তেমনই আবার ভাল ভাল কথা বলিয়া চিন্তাধারাও মার্জিত করিতেন। যদিও আমি পাটনায় দুই বৎসর থাকিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এত কম বয়সে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম যে আমার তেমন কিছু জ্ঞানই হয় নাই। রসিক-বাবু কিছু কিছু দেশের কথাও বলিতেন, আর কেমন করিয়া পড়িয়া শুনিয়া লোকে উন্নতিশিখরে পেৌঁছিতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিতেন। আমি এণ্ট্রান্স ক্লাশে পেৌঁছিলে পর তিনি সোজাসুজি বলিয়া দিলেন : মেহনৎ কর, তুমি ইউনিভারসিটিতে উঁচু জায়গা পেতে পার। আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। তবে এইটুকুই বুঝিয়াছিলাম যে, হয়তো বৃত্তি পাইতে পারি।

যেবার আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা দিতেছিলাম, সেবার ছাপরায় প্লেগের খুব প্রকোপ। দুইদিন পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার

গলা ফ্বলিল ও খ্বব জ্বর আসিল। তৃতীয় দিনে আর পরীক্ষার জন্য বসিতে পারিলাম না। বাড়িতে খবর গেল। বাবা ঘাবড়াইয়া চলিয়া আসিলেন এবং আমাকে জীরাদেইতে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি নিজেই ঔষধ দিলেন, আর আমি আরাম হইয়া গেলাম। ব্বঝিলাম না যে, আমার প্লেগই হইয়াছিল, না শ্বধ্ব গলাফোলা! কিন্তু প্লেগ বলিয়াই সন্দেহ হইয়াছিল। সকলে খ্বব ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, আর এ অবস্থায় ঠিক সময়ে স্কুলের ফি দেওয়া হয় নাই, নাম কাটা গিয়াছিল। পরীক্ষার ফল দেখা গেল দ্বইটি বিষয়ে আমি প্রথম হইয়াছিলাম, আর এত বেশি নম্বর পাইয়াছিলাম যে, বাকি দ্বই বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়াই পাশ করার পক্ষে উহা যথেষ্ট মনে করা হইয়াছিল। সেই সময় বদলি হইয়া ন্বতন হেডমাষ্টার আসিয়া গেলেন, আর তিনি আমার অন্বপস্থিতিতেই প্রমোশন দিয়া দিলেন। কিন্তু প্রমোশন পাইয়াও ফি না দেওয়ার জন্য নাম তো গেল কাটা। আমি সারিয়া উঠিলে কয়েকদিন পর গিয়া আবার নাম লেখাইয়া পড়িতে শ্বর্ব করিলাম।

একদিন রসিকবাব্ব আমাকে বলিলেন : তোমার নাম কাটা যাওয়া ভাল হয় নি। নিয়ম অন্বসারে এণ্ট্রান্স পাশ করার পর সেই সব ছেলেদেরই ব্বত্তি পাওয়ার কথা, যারা অন্তত এক বছর একই স্কুলে পড়ে। এখন তুমি যথেষ্ট নম্বর পেলেও ব্বত্তি পেতে পারবে না। কিন্তু এক উপায় আছে, ডাইরেক্টর সাহেবের কাছে তোমার বাবাকে দিয়ে একটা দরখাস্ত পাঠাও, তিনি যেন তোমাকে এই নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেন। আমি এক দরখাস্ত পাঠাইলাম, তাহাতে লেখা হইল যে প্লেগ হওয়ার জন্য আমি বাড়িতে ছিলাম, ফি দিতে পারি নাই, তাই নাম কাটা গিয়াছে; এছাড়া পরীক্ষার ফল ইত্যাদি দেখাইয়া বলা হইল যে, আশা করা যায় যে ব্বত্তি পাইতে পারি, কিন্তু এই নিয়মে বাধা হয়। হেডমাষ্টার দরখাস্ত দেখিয়া বলিলেন : এর কোনও প্রয়োজন নেই। নিয়ম বদলাবার অধিকার ডাইরেক্টরের নেই, আর আমিই বা দরখাস্তের উপর স্বপারিশ করি কেমন করে? তোমার প্লেগ হয়েছিল, কি হয় নাই, তার আমি কি জানি! চিকিৎসা তো হয় নি। এজন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেটও আমি দিতে পারি না। কোনও স্বপারিশ না করিয়াই তিনি দরখাস্ত উপরে পাঠাইলেন।

রসিকবাব্বর আপশোষ থাকিল যে হেডমাষ্টার স্বপারিশ করিলেন না। আর তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই অবস্থায় ডাইরেক্টর ব্বঝি মঞ্জ্বর করিবেন না। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যে দরখাস্ত দিলে ক্ষতি তো কিছ্ব হইবে না। নিয়ম এইর্বপ ছিল যে, দরখাস্ত ইনস্পেক্টরের মারফতেই পাঠাইতে হইবে। সেইজন্য যদিও সে-দরখাস্ত ডাইরেক্টরের নামেই ছিল, তব্ব প্রথমে গেল ইনস্পেক্টরের নিকট; ইনস্পেক্টর দরখাস্ত পড়িয়া তাহা

আর ডাইরেক্টরের নিকটে পাঠানো প্রয়োজন মনে করিলেন না, তাহা নিজেই মঞ্জুর করিয়া পত্র লিখিয়া জানাইলেন। হেডমাষ্টারমহাশয় আমাকে ক্লাশেই বলিলেন : তোমার দরখাস্ত ইনস্পেক্টর মঞ্জুর করে ফেরত পাঠিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন : আমি জানি না, ইনস্পেক্টরের মঞ্জুর করার কোনও অধিকার আছে কি না, তবে তা নিয়ে তোমার চিন্তা করার কিছু নেই।

রসিকবাবু এ সংবাদ শুনিয়া খুব খুশি হইলেন, আর আমাকে বেশি করিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এমন কি, নিজে কিছু না লইয়াও নিজের বাড়িতে ডাকিয়া আমি যেখানে যেখানে কোনও অসুবিধা বোধ করিতাম তাহা বুঝাইয়া দিতেন, এবং রোজ রোজ তাগাদা করিতেন : তুমি এভাবে পড়, এটা পড়, ওটা পড়। তাঁহার মনে একথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিব। আমার মতো ছেলে ইউনিভারসিটিতে উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, আমার কিন্তু এ ধারণাই ছিল না।

তখনকার দিনে ছাত্রদের তিন প্রকার বৃত্তি দেওয়া হইত। সমস্ত জেলায় প্রথম দুই তিন জন ছেলের জন্য দশ টাকার দুই তিনটি বৃত্তি; দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিভাগে প্রথম দুই তিন জন ছেলের জন্য দুই তিনটি মাসিক পনেরো টাকার বৃত্তি, আজকালকার পাটনা ও ত্রিহুত বিভাগের সাতটি জেলা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম দশজনের জন্য মাসিক কুড়ি টাকার বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। বিহার ছিল বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত, আর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এলাকা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও বর্মা জুড়িয়া ছিল। একটাই পরীক্ষা হইত, আর এই সমস্ত প্রদেশের ছেলেদের মধ্যে যাহারা সকলের উপরের স্থান অধিকার করিত, সেই দশজন ছেলেরই বিশ টাকা করিয়া বৃত্তি মিলিত। আমার উচ্চাভিলাষ বড় জোর দশ কি পনের টাকার বৃত্তি পর্যন্ত উঠিত, ইহার উপর কখনও যায় নাই। কিন্তু ইহার জন্যও আমি মনে করিয়াছিলাম যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন, আর আমি যথেষ্ট পরিশ্রমও করিতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পূর্বে স্কুলের পরীক্ষা হইত; যাহারা পাশ করিত, তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইত। পরীক্ষায় আমি প্রথম হইলাম, এবং অনেক নম্বর পাইলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অনুমতি তো পাইলাম; কিন্তু এক হাঙ্গামা মিটাইতে হইল। একটা বিষয় ছিল ড্রইং, তাহাতে পরীক্ষা দেওয়া ছিল ইচ্ছাধীন। কিন্তু বৃত্তির জন্য ফল বিচার করিবার সময়ে তাহার নম্বরও যোগ করা হইত। যদিও আমি অন্য সব বিষয়ে যথেষ্ট নম্বর পাইয়া

গিয়াছি, কিন্তু ড্রইংয়ের মাষ্টার মহাশয় ইউনিভারসিটিতে ড্রইং পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেন। ড্রইং-এ বিশ-পঁচিশ নম্বর পাইতে পারিতাম, ইহাতে পরীক্ষাই যদি না দিই, তাহা হইলে তো আর এই বিশ-পঁচিশ নম্বর পাইবই না, বৃত্তি পাওয়াও কঠিন হইবে। অনেক বলা কওয়ার পর মাষ্টার মহাশয় এই সর্তে অনুমতি দিলেন যে, ঐদিন হইতে পরীক্ষার সময় পর্যন্ত আমি রোজ এক ঘণ্টা ড্রইং করিব। আমি এই সর্তে রাজি হইলাম, আর তাহা মানিয়াও চলিলাম। ফল ভালই হইল, কারণ হয়তো এইরূপ না করিলে ড্রইং-এ পঁচিশ নম্বর আসিত না, আর আমি যে স্থান পাইয়াছিলাম, তাহাও পাইতাম না। অবশেষে পরীক্ষার দিন নিকটে আসিল, আমি কয়েক দিন আগেই পরীক্ষা দিবার জন্য পাটনা চলিয়া গেলাম।

পরীক্ষা দিয়া পাটনা হইতে বাড়ি ফিরিলাম, দাদাও ছুটিতে বাড়ি আসিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া পাটনায় নাম লেখাইয়াছিলেন, কিন্তু খুব অসুস্থ হইয়া পড়ায়, ডাক্তারদের উপদেশে এলাহাবাদে পড়িতে যান। সেখান হইতে তিনি ম্যুর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে ঐ বৎসর বি. এ পাশ করিয়া এম্. এ ও বি. এল্ পড়িবার জন্য আবার কলিকাতায় গেলেন। এলাহাবাদে ও কলিকাতায় ছিলেন বলিয়া তিনি ছুটিতে বাড়ি আসিয়া অনেক কিছু গল্প করিতেন, আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সব শুনিতাম, যতদূর সম্ভব মনেও রাখিতাম। সম্ভবত ১৮৯৯ সালে তিনি এলাহাবাদ হইতে বাড়ি আসেন। স্বদেশীর কথা বলিলেন, আর সেখান হইতে স্বদেশী কাপড় লইয়া আসিলেন। তখন হইতেই আমি স্বদেশী কাপড় পরিতে শুরু করি, আর যতদিন গান্ধীজী খদ্দরের কথা বলেন নাই, ততদিন বরাবর স্বদেশী কাপড়ই পরিতাম। শুধু একবার কিছু বিলাতি কাপড় কিনিয়াছিলাম, সেকথা পরে বলিব। না হইলে তো ঐ সময় দাদা নিজে শুরু করিলেন, আমাকে দিয়াও স্বদেশী কাপড়ের ব্যবহার শুরু করাইলেন। তিনি তো আর কখনও বিদেশী কাপড় কেনেনেই নাই। খদ্দর চালু হইবার পর খদ্দর ভিন্ন অন্য স্বদেশী কাপড়ও কখনও কেনেন নাই।

স্বদেশীর বিচার শুধু কাপড় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, যথাসম্ভব অন্য জিনিস কেনার সময়েও ওকথা মনে রাখা হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য আমি বিশেষ করিয়া দেশী কলম ও নিব লইয়াছিলাম। দাদা বরাবর এলাহাবাদ ও কলিকাতা হইতে ঐ সমস্ত জিনিস আনিয়া দিতেন। এখন আমার সন্দেহ হয়, অনেক জিনিস যাহা আমি অজ্ঞতাবশত স্বদেশী বলিয়া কিনিতাম, তাহা হয়তো স্বদেশী ছিল না, দোকানদার আমাকে ঠকাইয়া দিয়া দিত। তবে আমার শ্রদ্ধা ছিল

গভীর, আর আমি নিজের জ্ঞানমত স্বদেশী মনে করিয়াই তাহা লইতাম।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা যখন সন্ধ্যার সময় একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় কে একজন আসিয়া বলিল, পরীক্ষার ফল গেজেটে বাহির হইয়াছে। আমরা সীউয়ানে গেলাম, কিন্তু শুধু এইটুকু জানিলাম যে, আমি প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি। তখনও বৃত্তির ফল বাহির হয় নাই। কয়েকদিন পরে ঐরূপ এক সন্ধ্যায় বেড়াইবার সময় একজন আসিয়া তার দিয়া গেল, তাহাতে লেখা ছিল যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়াছি। দাদা তার পড়িয়া খুব খুশি হইলেন, আর আমরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ি আসিয়া বাবাকে সে-কথা জানাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হওয়ার যে কি অর্থ তাহা দাদা বাবাকে বুঝাইয়া দিলেন, আর বাবা, মা ও বাড়ির অন্যান্য সকলের আনন্দের অন্ত রহিল না। দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, পাশ করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়িব। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দরখাস্ত পাঠাইবার সময়ে তাহাতে লিখিয়াও দিয়াছিলাম যে যদি বৃত্তি পাই তবে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়াই তাহা ভোগ করিব। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার কলিকাতায় যাওয়া শীঘ্রই স্থির হইয়া গেল।

ছাপরা স্কুলে পড়িবার সময় সেখানকার এক পণ্ডিতজীর সঙ্গে থাকিতাম। তিনি খুব প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী, আজও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার নাম হইল পণ্ডিত বিক্রমাদিত্য মিশ্র। তিনি ছিলেন আমার অভিভাবক-স্থানীয়। পণ্ডিতজী নিজে বিদ্যার্থীদের পড়াইতেন, আর প্রতিদিন সরযূতে স্নান করিতেন—অন্য কাহারও ছোঁওয়া জলও গ্রহণ করিতেন না। পূজা-পাঠ খুব হইত, সেখানে হাতোয়ারাজের এক ছোট ঠাকুরবাড়িও ছিল। আমাদের ছোটদের উপর এ সবের প্রভাব যতটা পড়া উচিত ততটা পড়িয়াছিল। আমরা নিজেদের কঠোর সনাতনী বলিয়া মনে করিতাম, আর কোনও আর্যসমাজীকে পাইলে তাহার সঙ্গে তর্কও জুড়িয়া দিতাম। স্কুল হেডপণ্ডিত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ত্রিপাঠী। স্কুলে আমি ফারসি পড়িতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে তাঁহার নিকট কিছু সংস্কৃত পড়িতেও আরম্ভ করিলাম। লঘুকৌমুদীর কয়েকটা সূত্র মুখস্থও করিলাম; কিন্তু চালাইতে পারিলাম না। ছাপরা স্কুলের স্মৃতি আজও জাগিয়া আছে, এখনও তাহা সুন্দর ও সুখময় হইয়া আছে। আমার মনে আছে, ছুটি ছাড়া কখনও বাড়ি যাইতাম না। ছুটিতে বাড়ি গেলে মা প্রায়ই আরও কিছুদিন আটকাইয়া রাখিতে চাহিতেন। কিন্তু আমি তাহাতে সহজে রাজি হইতাম না। ছুটিতে তো জীরাদেইতে প্রচুর খেলাধূলা করাই মস্ত কাজ ছিল, চিক্কা খেলিতেই সমস্তটা সময়

কাটিয়া যাইত। দাদাও বাড়িতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন।

ছাপরায় জীবনযাত্রা ছিল খুব সাদাসিধা। টাকা কখনও কাছে থাকিত কিনা সন্দেহ; ওখানে একজন মুদির সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে সে সমস্ত জিনিসপত্র আমাদের জোগাইবে। এই নিয়ম দাদার ছাপরায় পড়ার সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। রোজকার ফর্দ লিখিয়া পাঠাইলে ঐ মুদির কাছ হইতে চাল, ডাল, ঘি, কাঠ আর জলখাবারের জন্য কচুরি-মিঠাইও আসিত। সে জাতিতে ছিল হালুয়াই, তাই সব জিনিস জোগাইতে পারিত। ঐ রকম একজন ছিল যে তরকারি বাড়িতে পেঁছাইয়া দিত। মুদি জীরাদেইতে আসিত, ফর্দ দাখিল করিত, হিসাব হইত, আর তখনই সেখানে তাহার টাকাটা পাইয়া যাইত। তরকারির জোগানদারকে আর জীরাদেইতে আসিতে হইত না, পাওনা হিসাব করিয়া ঐখানেই একজন, যে মামলা-মকদ্দমা দেখিবার জন্য ছাপরায় যাওয়া-আসা করিত সে, প্রাপ্য টাকা দিয়া দিত। স্কুলের বেতনের টাকাও সে-ই দিয়া দিত। কাপড়ের দরকার হইলে সে-ই কিনিয়া দিত। এইরূপে ছাপরায় পড়িবার সময় আমার হাতে টাকাপয়সা বড় একটা আসিত না।

বাড়ির অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। জমিদারি তো ঠাকুরদাদা আর নুনুর সময়ে যেমন তেমনই ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতে বাবা খানিকটা মুস্কিলে পড়িলেন। আমাদের খরচের জন্য নগদ টাকা জোটাইতে তাঁহার কষ্ট হইত। জীরাদেইতে মুদির টাকাও সর্বদা মিলিত না। কখনও কখনও কোনও গ্রামের তহশীলদারের নামে চিঠি যাইত, আর সে জীরাদেই হইতে সেই গ্রামে গিয়া সেখান হইতে টাকা লইত। ছাপরার খরচ কম হইত, আর এইভাবে কোনও প্রকারে চলিয়া যাইত। আমি কখনও টাকার অভাব বুঝি নাই। তাহার এক কারণ এই ছিল যে, দাদা এদিকে নজর দিতেন এবং ছুটির মধ্যে আসিলে কিছু না কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু মাসে মাসে দাদার খরচ এলাহাবাদে পাঠাইতে হইত। ইহাতে বাবার প্রায়ই কষ্ট হইত। কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যাহাই হউক না কেন, ছেলেদের পড়াইবার খরচ কোনওরূপে জুটাইতেই হইবে।

একজন দেওয়ানজী ছিলেন যিনি জমিদারি দেখাশোনা করিতেন। তিনি ঠাকুরদাদার সময় হইতেই ছিলেন, জমিদারির অবস্থা সবকিছু জানিতেন। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতে বাবা জমিদারি দেখেন নাই, তাই তাঁহাকে দেওয়ানজীর উপর নির্ভর করিতে হইত। আমার মনে আছে, দাদার পরীক্ষার ফি জমা দিতে হইবে; তাঁহার পত্র আসিল যে কোনও নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে পঞ্চাশ কি ষাট টাকা ফি দাখিল করিয়া দিতে

হইবে, না হইলে এক বৎসরের জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে না। বাবার কাছে তো টাকা ছিল না; দেওয়ানজী মফস্বল হইতে টাকা দিতে পারিলেন না। বাবা বড়ই সংকটে পড়িলেন। মাতৃদেবীর সোনার হার বন্ধক রাখিয়া কোথাও হইতে টাকা আনাইয়া ঠিক সময়ে পাঠাইলেন। সবকিছু থাকিলেও এমন স্তরে অবস্থা আসিয়া পেৌঁছিয়াছিল যে কখনও কখনও রান্না চড়াইতেও দেরি হইয়া যাইত। দাদা বুঝিয়াছিলেন যে, এ সমস্ত দেওয়ানজীর অব্যবস্থার ফল আর সেজন্য রাগও করিতেন খুব, কিন্তু কিছু করিতে পারিতেন না। ছুটির মধ্যে একবার আসিয়া তিনি কিছু কিছু কাজকর্ম দেখিতে শুরু করিলেন; কিন্তু যতদিন এলাহাবাদে পড়িতেন, ততদিন বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

জমিদারির আয় বৎসরে প্রায় সাত-আট হাজার টাকা, তাহার মধ্যে সরকারি মালগুজারি দিয়া পাঁচ হইতে ছয় হাজার টাকা বাঁচিত। একশ বিঘা জিরাতের খেত ছিল, তাহাতে যথেষ্ট ধান, গম, মকাই, অড়হর, যব ইত্যাদি হইত, আর আখ হইতে গুড় তৈয়ার করিয়া কিছু নগদ টাকাও পাওয়া যাইত। এই খেতই আমাদের ছেলেবেলায় সর্বদা ঘরভরা ধান দিত। গোরু মহিষ প্রচুর দুধ দিত আর কয়েক জোড়া বলদও ছিল। কিন্তু এই সময় না জানি কি হইল। বাড়ির খরচের জন্যও পুরাপুরি ধান হইত না, চাল ও গম কিনিতে হইত। বাবা লোকসানের পর লোকসান দেখিয়া কয়েকদিনের জন্য চাষবাসের কাজ বন্ধও করিয়া দিয়াছিলেন। সে সময় খানিকটা কষ্টে গিয়াছিল, কিন্তু বাবা ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন, আর লোকদের কথায় কথায় বলিতেন: আমার দুই ছেলেই আমার ধন-দৌলত।

এ বিষয়ে আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। নুনুর মৃত্যুর সময়ে ঠাকুরদাদা ও বাবা রহিয়া গেলেন। আমরা ছিলাম ছোট। উপরে বলিয়াছি ঠাকুরদাদাই সমস্ত জমিদারিটা কিনিয়াছিলেন, আর সবকিছু ছিল তাঁহারই উপার্জন। নুনুর থাকিবার মধ্যে ছিল একটি মেয়ে, তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ আসিয়া ঠাকুরদাদাকে বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার দেহান্ত হইলে ঐ মেয়ে ও আমাদের জ্যেঠিমার কষ্ট হইতে পারে। এজন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন। ঠাকুরদাদা স্থির করিলেন যে, উইল করিবেন; সে উইল সীউয়ান হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিল। সেই অনুসারে, জ্যেঠিমার খরচের জন্য বৎসরে প্রায় হাজার টাকা আয় হয় এমন দুইখানি গ্রাম তিনি যাবজ্জীবন ভোগ-দখল করিবেন, আর বোনকে সমস্ত জমিদারির সাত আনা ভাগ দেওয়া হইবে। আমাদের সকলের জন্য বাকি রহিল নয় আনা।

পরিবার বরাবর একান্নবর্তী, ঠাকুরদাদা এইরূপ উইল করিতে পারেন

কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। উইল না করিয়া যদি তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে বাবাই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইতেন, জ্যেঠিমা শুধু খাওয়া-পরা পাইতেন, মেয়ে কোনও ভাগই পাইত না। এজন্য কোন কোন লোক পরামর্শ দিয়া ঠাকুরদাদাকে উইল করিবার কথা বুঝাইয়া দিয়াছিল। বাবাকে এসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। সমস্ত ব্যাপার ঠিক করিয়া রেজিষ্টার একদিন রেজিষ্টারি করিবার জন্য জীরাদেইতে আসিলেন। লোকদের মত হইল, যদি বাবাকে উইলের সাক্ষী করা হয় তবে আর তাঁহার উহা অস্বীকার করিবার অধিকার থাকিবে না, সব পাকা বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। রেজিষ্টার জীরাদেইতে পেঁাছিবার পরই বাবা সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরদাদা তাঁহাকে সাক্ষী হইতে বলিলেন। তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, বাবা হয়তো তাহাতে আপত্তি করিবেন। বাবা ঠাকুরদাদাকে পরিষ্কার বলিলেন : আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই পালন করব। আপনিই তো আমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন, আপনিই তো সমস্ত কিছু পত্তন করেছেন, আপনি যদি ষোল আনাই চন্দ্রমুখীকে দিয়ে দেন, তাতেও আমার কোনও আপত্তি নেই—আমার সম্পত্তি তো এই দুই ছেলেই, এদের আপনি আশীর্বাদ করুন। আমাদেরও সেখানে ডাক পড়িল। ঠাকুরদাদা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর যাহারা তাঁহাকে নানা মিথ্যা কথা বলিয়া নানা প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিলেন। বাবা সাক্ষী হইলেন। আর রেজিষ্টার উইল রেজিষ্টারি করিয়া চলিয়া গেলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, যখন আমি হাতোয়া স্কুলে পড়ি, তখন কয়েকদিন রোগে ভুগিয়া, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও, চন্দ্রমুখী কুমারী অবস্থায় মারা পড়িলেন। জ্যেঠিমা অনেক দিন বাঁচিয়া ছিলেন, আর তাঁহার যাহা আয় হইত তাহা তীর্থব্রতে ব্যয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমরা দুই ভাই পুরাপুরি পাইলাম। তিনি প্রায় সমস্ত তীর্থে গিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন আমার বিধবা ভগ্নী, যিনি বিধবা হওয়ার পর হইতে বরাবর আমাদের বাড়িতেই থাকিতেন এবং এখনও আছেন। দুইজনে যেন তীর্থব্রত লইয়া ডুবিয়া যাইতেন, আর এমন খুব অল্পই স্নানাদিকৃত্য ছিল, যাহাতে তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারিতেন না। দুইজনে জগন্নাথ, রামেশ্বর, দ্বারকা, বদরীনাথ এই চারিধাম দর্শন করিয়াছিলেন। বদরীনাথ তো দিদি দুই তিনবার গিয়াছিলেন। মা বাড়িতেই থাকিতেন, কখনও কখনও তীর্থে যাইতেন। আমার মনে আছে, স্কুলে পড়িবার সময়েই মা, জ্যেঠিমা ও দিদির সঙ্গে আমি অযোধ্যায় একবার ও মথুরা বৃন্দাবনে একবার দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম।

এইসব তীর্থযাত্রায় খরচ পড়িত অনেক, আর কষ্টও হইত যথেষ্ট। ঐ সময় বুঝিয়াছিলাম, পাণ্ডারা তীর্থে কত ভাল কাজ করে। তাহাদেরই বাড়িতে আমরা থাকিতাম। তীর্থে তাহারা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করাইত, আর কোনও প্রকারের কষ্ট হইতে দিত না। কোনও এক সময়ে, আমার মনে নাই, ঠাকুরদাদা, বাবা, জ্যেঠামশায়—ইঁহারা এইসব তীর্থে গিয়াছিলেন, এবং পাণ্ডাদের খাতায় ইঁহাদের নাম লেখা আছে। পাণ্ডাদের বাৎসরিক কিছু কিছু প্রাপ্যও ছিল, প্রতি বৎসর তাহারা জীরাদেইতে আসিয়া তাহা লইয়া যাইত। এই-সব কারণে তাহারা আমাদের বিশেষ খাতিরযত্ন করিত এবং আমাদের তীর্থযাত্রার সময়েও তাহাদের দান তো মিলিতই। দানধ্যান, পূজাপাঠ, তীর্থযাত্রা স্নানাদি বিষয়ে সমস্ত বাড়ির লীডার ছিলেন দিদি, আজও তাহাই আছেন। বাড়িতে কোনও না কোনও পূজা লাগিয়াই থাকিত, আজও কিছু না কিছু লাগিয়াই আছে।

স্কুলে পড়িবার সময় এইভাবে কাটিল। বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকিত অল্পই। শুধু ছুটিতে যাওয়া আসা হইত। বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কমই হইত। ছুটিতে বাড়ি আসিলেও রাত্রিবেলা দেখা মিলিত। একবার আমার স্ত্রীর কলেরা হয়; আমি তখন বাড়িতেই ছিলাম। বাবাই ঔষধপত্র দিলেন, তাহাতে ও সারিয়া ওঠে। কিন্তু বাবা খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমার মানসিক অবস্থাও কিছু ভাল ছিল না। নিজের স্ত্রীর বিষয়ে বেশি খোঁজ-খবর লওয়া তখনকার রীতি অনুসারে অনুচিত মনে করা হইত। আমার চিন্তা হইত, কেমন আছে জানিতে, দেখিতেও চাহিতাম, কিন্তু না পারিতাম কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে, না পারিতাম দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে। আমারও যে রোগিণীর সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ আছে, সেদিকে হয়তো বাড়ির লোকদের দৃষ্টিই পড়ে নাই। যাহা হউক, উহার আরোগ্যলাভের পর আর কোনও কথা রহিল না, আমিও শান্তিলাভ করিলাম। যদি অবস্থা খারাপ হইত, তাহা হইলে জানি না উচিত-অনুচিতের বন্ধন আমাকে কতদিন বাঁধিয়া রাখিত।

এইভাবে বাড়িতে বরাবর বন্ধ থাকিতে থাকিতে আমার বৌদিদি ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, আর হইলও তাই। একজনের পর আর একজন, দুইজনেই কিছুদিন পর্যন্ত বাতে কষ্ট পাইতে থাকিল। অনেক দিন পরে যখন উহারা আঙিনায় বেশ চলিতে ফিরিতে লাগিল, তখন সে কষ্ট দূর হইল।

পরীক্ষার ফল জানিতে পারার পর আমি ছাপরায় আসিলাম আর সেখানে খবর পাইলাম যে শুধু আমারই ফল ভাল হয় নাই, সমস্ত বিদ্যালয়ের ফলই খুব ভাল হইয়াছে। আমার সহপাঠী রামানুগ্রহও কুড়ি টাকার এক বৃত্তি পাইয়াছে, আর দুইজন পনেরো টাকা করিয়া ও দুই জন দশ টাকা হিসাবে পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রথম শ্রেণীতে অনেকে গিয়াছে; একেবারে ফেল হইয়াছে এমন ছিল হয়তো দুই একজন। ছাপরা জেলাস্কুলে এমন ভাল ফল কখনও হয় নাই। সমস্ত বিহারেই এমন ভাল ফল কোনও স্কুলের কখনও হয় নাই। এই কারণে, স্কুলের সকলের খুব আনন্দ হইয়াছিল। ছাপরার উকিলদের মধ্যেও খুব ফুর্তি হইয়াছিল। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ছাপরায় ওকালতি শুরু করিয়াছিলেন, সবে নূতন, খুব উৎসাহ ছিল; অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার সমাজে, বিশেষ করিয়া উকিলমহলে, তাঁহার কিছু প্রভাবও জন্মিয়াছিল। যদিও তাঁহার বাড়ি আমাদের গাঁ হইতে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে, তবুও আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। আমি ছাপরায় আসিলে তিনি দাদার মত করাইয়া এক ছোট 'পার্টি'র ব্যবস্থা করিলেন, আমিও তাহাতে আহূত হইলাম; কিন্তু আমি ঠিক সেই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়ায় যোগ দিতে পারিলাম না।

ছাপরায় পেঁীছিয়া আমি সর্বপ্রথমে রসিকবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি খুবই খুশি হইয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি আমাকে আম ও মিঠাই খাওয়াইলেন। আমাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে এই পরীক্ষার ফলের জন্য আমার দায়িত্ব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এই প্রথমবার একজন বিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়াছে। বাংলার ছেলেরা ইহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না। তাহারা খুব পরিশ্রম করিয়া আমাকে এফ্. এ. পরীক্ষায় হারাইবার চেষ্টা করিবে। কোনও কোনও খারাপ ছেলে আমাকে অন্য প্রকারেও নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিতে পিছপাও হইবে না। এইজন্য কলিকাতায় আমাকে খুব সাবধানে ও তৎপরতার সঙ্গে চলিতে হইবে; যে স্থান পাইয়াছি, পরিশ্রম করিয়া তাহা বজায় রাখিতে হইবে। তাঁহাকে আমার যাহা যাহা হয় সব কথা জানাইতে হইবে, কোনও মতেই ভুলভ্রান্তি করা চলিবে না। কলিকাতা খুব বড় শহর। সেখানে খেলা আমোদও প্রচুর আছে, আর খারাপ জিনিসও খুব আছে। এ সমস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে, আর কলেজে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া নিজের স্থান বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার মনে এই কথাটা বসিয়া

গিয়াছিল যে, কোন না কোন উপায়ে আমাকে এখন এফ্. এ.-তে ফার্স্ট হইতেই হইবে, তাহা না পারিলে খুবই খারাপ হইবে। এইজন্য এই কথাটার উপর তিনি নানা ভাবে জোর দিলেন, আর আমাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলেন। কিন্তু রওনা হইতে না হইতেই আমার জ্বর হইল, যাত্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পর সুস্থ হইলে দাদার সঙ্গে কলিকাতায় পেঁৗছিলাম।

কলিকাতায় দাদা প্রথম হইতেই ইডেন হিন্দু হস্টেলে থাকিতেন, আর ডাফ কলেজে এম্. এ. ক্লাসে ইতিহাস ও রিপন কলেজে বি. এল· পরীক্ষার জন্য আইন পড়িতেন। আমিও দাদার সঙ্গেই সেখানে গেলাম। কলি-কাতায় যাওয়ার আমার এই প্রথম সুযোগ। সেখানকার ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট, ট্রামগাড়ি ইত্যাদি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, আর যখন হস্টেলে পেঁৗছিলাম তখন আমার ছাপরার বাসাবাড়ির তুলনায় তাহা লাগিল প্রাসাদের মতো। আমি এত দেরি করিয়া পেঁৗছিলাম যে ছাত্রেরা হস্টেল ভর্তি করিয়া ফেলিয়াছিল, মোটেই জায়গা ছিল না। আমি কিছুদিন দাদার সঙ্গে তাঁহারই ঘরে থাকিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া জানিলাম, সেখানেও যথেষ্ট ছেলে আসিয়া গিয়াছে, নূতন ছাত্রদের ভর্তি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ডক্টর পি. কে. রায় ছিলেন প্রিন্সিপাল। দাদা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি আমাকে ভর্তি করিবার হুকুম দিলেন। কলেজে তো ভর্তি হইলাম, কিন্তু হস্টেলে যে জায়গাই ছিল না। তাহার জন্যও চেষ্টা করা হইল; যে ঘরে দাদা ছিলেন, সেই ঘরেই চারের জায়গায় পাঁচ খানা চৌকি পড়িল, আমি থাকিয়া গেলাম।

ক্লাসে গিয়া দেখি, সেখানেও এক ব্যাপার। খালিমাথায় এতগুলি বাঙ্গালী ছেলে একত্র আমি দেখিই নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোট-প্যাণ্টালুন-হ্যাটধারীও ছিল। তাহারা সেই সব বাড়ির ছেলে যেখানে বাপ বিলাত হইতে ফিরিয়া ব্যারিষ্টারি ডাক্তারি ইত্যাদি করিতেন। আমি এতদিন পর্যন্ত কোনও হিন্দুস্থানী ছেলেকে হ্যাট কোট পরিতেই দেখি নাই। তাই আমার মনে ধারণা হইল, ইহারা এংলো ইণ্ডিয়ান কি খ্রীষ্টান হইবে। কিন্তু যখন নাম ডাকা হইল, তখন বুঝিলাম যে ইহারা হিন্দুই বটে। সেকালে নিয়ম ছিল যে মুসলমান ছাত্রেরা নামে মাদ্রাসায় পড়িত, কিন্তু এফ. এ. ক্লাসে পড়িত প্রেসিডেন্সি কলেজেই। তাহাদের মাসিক ফি বারো টাকার জায়গায় চার টাকা দিতে হইত, আর তাহাদের নাম স্বতন্ত্র রেজিষ্টারিতে লেখা হইত। অন্য সব ব্যাপারে তাহারা কোন মতেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেদের হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। তাহাদের হস্টেল ছিল পৃথক্। টুপিওয়ালাদের মধ্যে তাহাদেরই চোখে পড়িল, আর দুই একজন মারোয়াড়ী ছেলেও দেখিলাম। কলেজেও সব ছেলে এক

ক্লাসে আঁটে নাই, তাই তিন বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। পড়ানো একই হইত।

তখনকার দিনে আমি চাপকান, পাজামা ও টুপি পরিয়া কলেজের ক্লাসে যাইতাম। এফ্. এ.-তে ইংরেজী, অন্য এক ভাষা ও ইতিহাস, লজিক, গণিত ভিন্ন সকলকে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পড়িতে হইত। এফ. এ.-তে ডক্টর জে. সি. বোস ফিজিক্স ও ডক্টর পি. সি. রায় কেমিস্ট্রি পড়াইতেন। আমি যখন কলেজে নাম লিখাইয়া প্রথম দিন গেলাম, তখন প্রথম ঘণ্টা ছিল কেমিস্ট্রির। সেখানে ডক্টর পি. সি. রায় আসিলেন। তিনি হাজিরি লইতে শুরু করিলেন। আমি সকলের পিছনে এক বেঞ্চে বসিয়াছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের সব ছেলের নাম ডাকা হইল, সকলে উত্তর দিল। আমার নিজের নম্বর জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করিয়াছিলাম। যখন সর্বশেষের নম্বরের ছেলেও উত্তর দিল, আর তিনি রেজিষ্টারি বন্ধ করিবেন, তখন আমি উঠিয়া বলিলাম, আমি আমার নম্বর জানি না। তিনি আমার দিকে চোখ তুলিয়া দেখিলেন আর বলিলেন, দাঁড়াও, এখনো আমি মাদ্রাসার ছেলেদের হাজিরি নিই নাই, এই বলিয়া চট্ করিয়া রেজিষ্টার উঠাইলেন। আমি বুঝিলাম, পাজামা-টুপি দেখিয়া তিনি আমাকে মুসলমান মনে করিয়াছেন। আমি বলিলাম, আমি মাদ্রাসায় পড়ি না, প্রেসিডেন্সী কলেজে আজই নাম লিখিয়েছি, তাই নম্বর জানি না। তিনি নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আর যখন আমি নাম বলিলাম, তখন সব ছেলে মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে দেখিতে লাগিল; কারণ তাহারা তো জানিত যে আমার নামের কোনও ছেলে সে বৎসর ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট হইয়াছে। ডক্টর রায় বলিলেন : এখনও নাম ওঠে নি, নাম উঠলে আজকের হাজিরিও দেওয়া হবে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : এত দেরিতে নাম লেখানো হল কেন। এই ভাবে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল, অন্যান্য সহপাঠীরাও আমাকে সর্বপ্রথম দেখিল।

ক্লাসে হিন্দী-জানা ছেলে খুবই কম ছিল। মারোয়াড়ী ছাত্র দেবী-প্রসাদ খয়তানের সঙ্গে আমার স্বভাবতই দুই এক দিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। ইহার বিশেষ কারণও ছিল, সেও আমার মতই বিহার হইতে পাস করিয়াছিল, বিহারে তাহার বাবা ছিলেন জেলার। বাঙ্গালী ছেলেদের সঙ্গেও পরিচয় শুরু হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন পাওয়া গেল, যাহাদের সঙ্গে শীঘ্র ঘনিষ্ঠতা হইল ও সে ঘনিষ্ঠতা আজ পর্যন্ত বজাইয়া আছে। এখানে শুধু দুই তিন জনের নাম উল্লেখ করি। যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ইনি এখন বঙ্গদেশের স্ট্যাণ্ডিং কৌনসেল; গিরিশচন্দ্র সেন, ইনি ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন, আর এখন গভর্ন-

মেণ্টের সেক্রেটারী; অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, ইনি গভর্নমেণ্টের ট্রান্স্লেটার। জে. এম. সেনগুপ্ত দুর্ভাগ্যবশত এখন জীবিত নাই; তিনিও আমার সঙ্গেই পড়িতেন এবং ঐ হস্টেলেই থাকিতেন।

আমি এক সপ্তাহ কলেজে যাইতে না যাইতেই আবার কম্প-জ্বর আরম্ভ হইল। ছাপরায় ম্যালেরিয়ার যে আক্রমণ হইয়া গিয়াছিল তাহা আবার আরও জোরে আসিল। আমি সেখানে এক মাস অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। হস্টেলের ডাক্তার হাজার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রোজকার কম্পজ্বর হইতেই থাকিল। কখনও দুই এক দিন ভাল থাকিলেও আবার তৃতীয় চতুর্থ দিন জোরে কম্প হইত। দাদা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এক দিনের কথা বলি; টাউন হলে বড় সভা বসিবে। লর্ড কর্জনের কোনও নীতি সম্বন্ধে জনমত ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলার বড় বড় নেতা ও বক্তা বক্তৃতা করিবেন, এই ছিল কথা। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতিরও বক্তৃতা করিবার কথা। দুই তিন দিন আমার জ্বর হয় নাই। সকলে মনে করিল, আমি এখন ভাল হইয়া গিয়াছি। দাদাও হস্টেলের অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে সভায় চলিয়া গেলেন। আমার নিজের ঘরে কি আশ-পাশের ঘরেও কেহ ছিল না। আমি একাই ছিলাম। কম্প আসিল, তাহার পর জ্বর বাড়িতে শুরু করিল। আমি শুইয়া শুইয়া থার্মোমিটার বার বার লাগাইয়া দেখিতে লাগিলাম, থার্মোমিটার কাছে পড়িয়াছিল। জ্বর বাড়িতে বাড়িতে ১০৬° ডিগ্রিরও বেশি বাড়িল। আমি ভয় পাইয়া গেলাম; কিন্তু কি করা যায়! কেহ নিকটে নাই। কখনও কখনও মনে হইতে লাগিল, এখন দাদার সঙ্গেও দেখা হইবে না। আস্তে আস্তে আবার জ্বর কমিতে লাগিল। দাদা ফিরিয়া আসিবার মধ্যে জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল, দাদা যখন চলিয়া যান তখন-কার মতো হইল। দাদা ফিরিলে সব বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি স্থির করিলেন, আমি এখন ভাল থাকিলেও আমাকে আর ছাড়িয়া যাইবেন না। এইভাবে অনেক দিন কাটিল। দশহরার ছুটি আসিয়া পড়িল। এত-দিনের মধ্যে আমি শুধু চার পাঁচ দিনই কলেজে যাইতে পারিয়াছিলাম।

ছুটিতে কোন প্রকারে বাড়ি আসিলাম। সেখানে ভাল হইয়া গেলাম। ছুটি ছিল প্রায় এক মাসের। তাহার মধ্যে সারিয়া উঠিয়া কলিকাতায় গেলাম, সেখানে পৌঁছিয়াই আবার জ্বর আসিল। খুব ভয় পাইলাম। দাদাও ভারি চিন্তিত হইলেন। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল যে কলেজে যত লেকচার হইবে তাহার মধ্যে এক নির্দিষ্ট অনুপাতে অবশ্যই হাজির থাকিতে হইবে, না হইলে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিবে না। ভয় হইতে লাগিল যে এতদিন অনুপস্থিতির জন্য হয়তো আমি নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিতে পারিব না। পরীক্ষা দিবার অনুমতিই

পাইব না। তাহা ছাড়া পড়া তো বন্ধই হইয়া গেল। কখনও মনে হইত যে কলিকাতা ছাড়িয়া এলাহাবাদ চলিয়া যাই। তাহাতেও বাধা ছিল; বৎসরের মাঝে এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার অনুমতি দুই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পাওয়া যাইবে কি না, আবার সেখানে গিয়াও সেখানকার হাজিরি পূরা না হইলে তো এক বৎসর অমনি চলিয়া যাইবে। রসিকবাবু নিজের জায়গা বাঁচাইয়া রাখিবার যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িত, আর মনে ভারি কষ্ট হইত। কিন্তু নাচার। কিছুই হইতেছিল না। শেষকালে দাদা নিয়া গেলেন ডাক্তার নীলরতন সরকারের কাছে। তিনি ব্যবস্থা দিলেন। জ্বর আসা বন্ধ হইল, আমি সারিয়া উঠিলাম। তাঁহার ঔষধ প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত চলিল। এই এক বৎসরের মধ্যে কত কুইনিন খাইয়াছিলাম তাহা জানি না। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের পর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা বলিলেন যে এখনকার হাঁপানি ঐ কুইনিনের ফল। জানি না, কোনটা সত্য।

ভাল হইয়া আমি খুব পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। তিন চার মাস পড়ায় পিছাইয়া ছিলাম। তাহা পূরণ করিতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাও মনে ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের জায়গা হারাইলে চলিবে না। প্রত্যেক বিষয়ে আমি এই মনোভাব লইয়া পড়িতে লাগিলাম যে তাহাতে যেন ফার্স্ট হই। ক্লাশে যে-পুস্তক পড়ানো হইত, প্রত্যেক বিষয়ে তাহা ছাড়া আরও প্রায় তিন চার খানা বই পড়িয়া লইলাম। আমি নিজেকে অঙ্কে দুর্বল মনে করিতাম, এইজন্য তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলাম, আর এলজেবরা, ট্রিগোনোমেট্রি, কনিক সেক্শনের যত বই পাইলাম পড়িলাম, আর তাহাতে যত অঙ্ক দেওয়া ছিল এক এক করিয়া সব কষিয়া ফেলিলাম। ঐ সময় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশ্ন একে একে এই ভাবে উত্তর করিলাম।

ইচ্ছা ছিল, এফ. এ. পাস করিয়া সায়েন্স পড়িব। ডক্টর জে. সি. বোস ও ডক্টর পি. সি. রায়, দুই জনেরই পড়াইবার প্রণালী এত ভাল ছিল যে তাহাতে অনুরাগ খুবই জন্মিয়াছিল, আর সেই দুইটি বিষয়ে অধিক জানিবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। আবার এদিকে ইতিহাসের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনও শুধু সুশিক্ষক ছিলেন না, খুব উঁচু ধরনের মানুষও ছিলেন; আমার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, আমার অসুখের সময়ে হস্টেলে আসিয়া আমাকে দেখিয়াও গিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের দিকেই ঝোঁক বেশি ছিল। ঐ দুই বিষয়ে মন বসিয়া গেল, আর যতদূর বইয়ে পাইলাম, সব পড়িয়া লইলাম। তখনকার দিনে এফ. এ.-র ছাত্রদের লেবরিটরিতে কোনও প্রয়োগের কাজ করিতে হইত না, পুস্তকের জ্ঞানই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত। আমি প্রায় বি. এস. সি. ক্লাস পর্যন্ত

বইয়ের জ্ঞান পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। একটা বাধা মনে হইতেছিল, উপরে গিয়া গণিতের দরকার হইবে, আর এত পরিশ্রমের পরেও গণিতে আমার মাথা ছিল না। তাই উহাতে বেশি পরিশ্রম করিতাম।

এই ভাবে দুই বৎসর কাটিল। পরীক্ষার দিন নিকটে আসিল। বাঙ্গালী সহপাঠীদের কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গেল। রসিকবাবু আমাকে যে ভয় দেখাইয়াছিলেন, কোথাও তাহার কোনই আভাস পাইলাম না। বন্ধুদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দে ও ভালবাসার মধ্য দিয়া দিন কাটিল। কোথাও কাহারও কুদৃষ্টিতে পড়ি নাই, কাহারও কুচিন্তার লক্ষ্য হইতে হয় নাই। সকলের সঙ্গে সৌহার্দ বাড়িয়া চলিল, কাহারও কাহারও সঙ্গে তো খুবই ঘনিষ্ঠতা হইল, তাহা আজও সাক্ষাৎ হইলে মনে হয়, যেন উহা কালিকার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পূর্বে ক্লাসে কলেজের দিক হইতে পরীক্ষা হয়। তাহা হইয়া গেল। প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই আর সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পাইলাম। দুই এক বিষয়ে লেকচারে যত হাজিরি হওয়ার কথা, তত ছিল না। প্রফেসরেরা অনুগ্রহ করিয়া কিছু বেশি লেকচার দিলেন, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে আমার পরীক্ষা দেওয়ার কোনও বাধা না হয়, হাজিরি নির্দিষ্ট অনুপাতের মতো হয়। পরীক্ষা দিবার অনুমতির পূর্বে এক মজার ঘটনা ঘটিল। আমি প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পাইয়াছিলাম, কিন্তু যখন কলেজের পরীক্ষার ফল বলা হইতেছিল তখন বলা হইল যে, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তখন এক ইংরেজ প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি নিজে পরীক্ষার ফল শুনাইতে আসিয়াছিলেন। ছেলেরা সব সেখানে একত্র হইয়াছিল। তিনি একে একে নাম পড়িতে শুরু করিলেন। আমার নামই বলিলেন না। যে-তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, ভুলক্রমে তাহাতে আমার নামই বাদ পড়িয়াছিল—লেখা হয় নাই। আমার নাম যখন পড়া হইল না, তখন সকলে আশ্চর্য হইল। আমি তো ঘাবড়াইয়া গেলাম। আমি বলিলাম : আমার নাম পড়া হয় নি। প্রিন্সিপাল তো এফ. এ.-তে পড়ান নাই; কোনও ছেলেকে চিনিতেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলে চট্ করিয়া উত্তর দিলেন : তুমি পাস কর নি, তাই তোমার নাম বলা হয় নি। আমি আবার বলিলাম : তা তো হতে পারে না, আমি নিশ্চয় পাস করে থাকবো। উত্তর আসিল : তা হতেই পারে না; পাস করে থাকলে নিশ্চয় নাম থাকতো। আমি আবার বলিতে চাহিলাম। তিনি চটিয়া গিয়া বলিলেন : তুমি চুপ কর, নইলে জরিমানা করবো। আমি আবার সাহস করিয়া কিছু বলিতে চাহিলাম। উত্তর আসিল : তোমাকে পাঁচ টাকা জরিমানা করছি। আমি আবার বলিলাম। উত্তর দিলেন : দশ টাকা জরিমানা। এই ভাবে

পাঁচ টাকা করিয়া বাড়িয়া নিলামের ডাক বাড়ার মত জরিমানা বিশ-পঁচিশ টাকা পর্যন্ত আসিয়া পেঁাছিল। সে এক তামাসা! কি করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এমন সময় কলেজের হেড্ ক্লার্ক, যিনি আমাকে চিনিতেন, প্রিন্সিপালের পিছন হইতে আমাকে চুপ্ করিতে ইশারা করিলেন, ইশারা করিলেন যে সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি চুপ করিয়া গেলাম।

পরের দিন ফর্ম ইত্যাদি যাহা পূরণ করিবার তাহা সব পূরণ করিয়া দিলাম, ফিও দাখিল করিলাম। কেহ কিছু জিজ্ঞাসাই করিল না। সেই কেরাণীবাবুটি ভুল শুধরাইয়া দিলেন, আর প্রিন্সিপালকে তাঁহার অথবা নিজের ভুল বুঝাইয়া দিলেন কি না তাহার কোনও খবর আমার জানা নাই। জরিমানা তো কেহ চাহেও নাই। আমিও নিজের হইতে দাখিল করিতে কোনও চেষ্টা করি নাই। হাঁ, তবে ছাপরার ড্রইংমাষ্টার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাওয়ার পথে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই ঘটনা হইতে সেই কথাটা আবার মনে পড়িল।

এফ. এ. পরীক্ষার জন্য আমি খুব তৈরি হইয়াছিলাম। পরীক্ষার ফলও একপ্রকার ভালই হইল। আমি উহা 'একপ্রকার ঠিকই হইল বলিতেছি, এই জন্য যে, যদিও আমি সকলের উপরে হইলাম তথাপি আমি সায়েন্স ও গণিতে যে সকলের উপরে হইব, আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হইল না। এই দুইটি বিষয়ে বেশি পরিশ্রম করিয়াছিলাম। ইংরেজী, ফারসি, লজিক ইত্যাদিতে উহাদের তুলনায় খুব কম পরিশ্রম করিয়াছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম, ইংরেজী, ফারসি ও লজিকে আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পাইয়াছি, অন্যান্য বিষয়ে আর সকলের চেয়ে অল্প নম্বরের জন্য পিছনে পড়িয়া গিয়াছি—যদিও সব মিলিয়া অন্যদের অপেক্ষা উপরে আছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সকলের অপেক্ষা বেশি নম্বর পাইয়াছিলাম বলিয়া মাসে কুড়ি টাকা বৃত্তি ভিন্ন ইংরেজীতে প্রথম হওয়ার দরুণ এক বৎসরের জন্য দশ টাকা মাসিক স্বতন্ত্র বৃত্তি পাইয়াছিলাম। এফ. এ.-তে সকলের উপরে হওয়ার জন্য দুই বৎসর মাসে পঁচিশ টাকার এক বৃত্তি পাইলাম। তাহা ছাড়া ইংরেজীতে প্রথম হওয়ার জন্য মাসে দশ টাকার বৃত্তি ও ভাষাগুলিতে প্রথম হওয়ার জন্য মাসে পনেরো টাকার বৃত্তি—যার নাম ডাফ স্কলারশিপ—পাইলাম, আর লজিকে ফার্স্ট হওয়ার জন্য বই পুরস্কার পাওয়া গেল। ফলে দাঁড়াইল এই, বুঝিতে পারিলাম, আমি গণিতে সফল হইতে পারিব না, তাই বিজ্ঞানও আমার পক্ষে কঠিন হইবে।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে আমি পূর্বের সিদ্ধান্ত বদলাইয়া বিজ্ঞানের দিকে না গিয়া বি. এ. ক্লাশে নাম লিখাইলাম। তখনকার দিনে

এফ. এ. পর্যন্ত পড়া সকলের পক্ষে একই ছিল। সব বিষয় পড়িতে হইত। তাহার পর কেহ কেহ বি. এস. সি.-তে নাম লিখাইয়া সায়েন্স পড়িত, কেহ বা বি. এ.-তে নাম লেখাইয়া ইংরেজী ও ফিলসফি পড়িত। বি. এ.-তে নাম লিখাইবার পর ডক্টর পি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি সায়েন্সে নাম লেখাও নি কেন? (Why have you deserted our standard?) আমি উত্তর করিলাম : আমি অঙ্কে কাঁচা তাই। তিনি বলিলেন : তুমি আমার মত নিলে না কেন? আমিও অঙ্ক কম জানি, তাই বলে বিজ্ঞান থেকে পালাই নি। তাঁহার দুঃখ রহিল, কিন্তু বেশি দেরি হইয়াছে বলিয়া বদলানো কঠিন হইল।

দুই বৎসর ধরিয়া আমি পুরা মনোযোগের সঙ্গে রসিকবাবুর কথা মনে রাখিয়া ফার্স্ট হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে কৃতকার্যও হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে রসিকবাবু বদলি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দেখা করিলে খুব খুশি হইলেন। কখনও কখনও গিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিতাম। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পরীক্ষায় অশ্রদ্ধা

বি. এ. ক্লাসে উঠিয়া আমার মনের অবস্থা খানিকটা বদলাইয়া গেল। পরীক্ষার দিক হইতে মন খানিকটা চলিয়া আসিল। অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি আরও কিছু প্রসারিত হইল। ছেলেবেলা হইতেই অভ্যাস ছিল, ক্লাসের পড়া যথাসাধ্য মন দিয়া শুনিতাম, ক্লাসের সময় কোনওরূপে নষ্ট হইতে দিতাম না। প্রথমটায় ইহার কারণ ছিল এই যে, বাড়িতে পড়াইবার কি বুঝাইবার মাস্টার ছিল না। তাই সব কিছু স্কুলের মাস্টার মহাশয়ের বুঝাইবার উপর নির্ভর করিত। পরে অভ্যাসই ঐরূপ দাঁড়াইয়া গেল। কলেজেও ঐ কথা। নাম লিখাইবার সময় প্রশ্ন উঠিল, কোন্ বিষয়ে অনার্স লইব। সেকালে বি. এ.-তে তিন বিষয় পড়িতে হইত, তাহার মধ্যে ইংরেজী ও ফিলসফি ছিল আবশ্যিক, তৃতীয় বিষয় ছাত্রকে ইচ্ছামত বাছিতে দেওয়া হইত; কিন্তু বাছিয়া লইবার পর উহাও আবশ্যিক অন্য দুই বিষয়ের মতই পড়িতে হইত, আর পরীক্ষায় পাসও করিতে হইত। আমি ইতিহাস ও ইকনমিক্‌স বাছিয়া লইলাম। সেকালে অনার্সের জন্য পাসের বই ছাড়া আরও কিছু পড়িতে হইত, তাহার পরীক্ষাও পৃথক

হইত। এইভাবে অনার্সের পরীক্ষা বেশি কড়া হইত। অনার্সের বিষয়ে ক্লাসের লেকচারও বেশি হইত। ছাত্র ইচ্ছা করিলে একাধিক বিষয়েও অনার্স লইতে পারিবে, নিয়ম ছিল। কোন্ কোন্ বিষয়ে অনার্স লইব, দুই বিষয়ে কি তিন বিষয়ে, তাহাই ছিল আমার প্রশ্ন। আমি প্রথমে কিছু স্থির করি নাই, তিন বিষয়েই অনার্স ক্লাসে যোগ দিতে লাগিলাম।

আমার সহপাঠী রামানুগ্রহ এফ. এ. ক্লাসে ছাপরা হইতে অন্য কলেজে চলিয়া গিয়াছিল; বি. এ. পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া জুটিল। তাহার মত ছিল যে আমরা দুইজন তিনটি বিষয়েই অনার্স লই। সে তিন বিষয়ে অনার্স লইয়াও ছিল। বি. এ. পরীক্ষায় দুইটি বৃত্তি ছিল—একটি মাসিক পঞ্চাশ টাকার, অন্যটি চল্লিশ টাকার। শুধু অনার্সের নম্বর যোগ করিয়াই বৃত্তি দেওয়া হইত। এই জন্য তাহার মত ছিল যে তিন বিষয়েই অনার্স লইতে হইবে। কিন্তু অনার্সে এক কি দুই বিষয়ে এত নম্বর হয়তো উঠিত যে তিন বিষয়ের নম্বর হইতেও তাহা বেশি হইত। সে অবস্থায় যাহারা দুই বিষয়ে অনার্স লইত, তাহারাই বৃত্তি পাইত। আমার ভয় ছিল, তিন বিষয়ে অনার্স লইলে খুব বেশি পরিশ্রম করিতে হইবে। কিছু দিন পর্যন্ত একটা অনিশ্চয়ের মধ্যে ছিলাম। তিনটি বিষয়ের ক্লাসেই যাইতে ছিলাম। ইহার মধ্যে তখন ফিলসফির প্রফেসর এমন নীরস ভাবে পড়াইতেন যে, তাহাতে আমার মন বসিত না। তাহার বদলে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ পার্সিভ্যাল ও বিনয়বাবু নিজেদের বিষয় অতিশয় সুন্দর রীতিতে পড়াইতেন। এই কারণে তাঁহাদের ক্লাসে মন বেশি বসিত।

আমি স্থির করিয়াছিলাম, ইংরেজী এবং ইতিহাস ও ইকনমিক্সেই অনার্স পড়িব। রামানুগ্রহ ও আর একজন ছাত্র, শুধু দুইজন ছাত্রই, তিন বিষয়ে অনার্স পড়িত। কয়েক দিন পরে ডক্টর পি. কে. রায় ফিলসফি পড়াইতে শুরু করিলেন। তাঁহার পড়াইবার ধরণ এত সুন্দর ও মনোগ্রাহী ছিল যে, দেখিলাম, ফিলসফি সবচেয়ে সহজ বিষয়। তাঁহার লেকচার এত ভাল হইত যে তাহা মন দিয়া শুনিলে বই পড়িবার বিশেষ দরকারই হইত না। পরীক্ষায় সব বিষয় পাস তো করিতেই হইবে, কিন্তু পূর্বে যাহা বলিয়াছি. অনার্সের নম্বর অনুসারেই বৃত্তি দেওয়া হইত, তাই লোকে স্বভাবতই অনার্সের উপর বেশি মন দিত। এইজন্য আমি ডক্টর রায়ের লেকচার শোনা ছাড়া ফিলসফির উপর খুব কমই জোর দিলাম। কিন্তু তাঁহার পড়ানো এত সুন্দর ছিল যে বই না পড়িয়াই আমি ঐ বিষয়ে এতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম যাহাতে পরীক্ষায় পাস করিতে পারি। পরে অনুতাপও হইল যে, ঐ বিষয়ে অনার্স লইলে বুঝি অল্প পরিশ্রমেই তৃতীয় বিষয়েও অনার্স পাইয়া যাইতাম।

কিছুদিন পর্যন্ত তো এইভাবে কলেজে খুব মন দিয়া পড়িতে থাকিলাম। কিন্তু এমন একটা কিছু ঘটিল যাহাতে মনটা পরীক্ষা হইতে সরিয়া পড়িল। দৃষ্টি গেল অন্য দিকে। সেকালে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'ডন সোসাইটি'। ছাত্রেরা তাহার সভ্য হইত। তাহাদের চাঁদা কিছু দিতে হইত না। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রদের পড়াশুনায় সাহায্য করা, তাহাদের চরিত্রের উন্নতিসাধন ও দেশের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনেও সাহায্য করা। তাহাদের দিয়া দেশসেবাও কিছু কিছু করানো হইত, তাহা সেখানকার শিক্ষার এক অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইত। নিয়ম ছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে সন্ধ্যাবেলায় দুইটি ক্লাসে দুইটি লেকচার দেওয়া হইবে। একটি লেকচার হইত নানা বিষয়ের উপর, অন্যটি হইত গীতার সম্বন্ধে। গীতা ক্লাস লইতেন একজন পণ্ডিত, তিনি অতিশয় সহজ ভাবে গীতা বুঝাইতেন। অন্য ক্লাসে সতীশবাবু নিজে লেকচার দিতেন। বাহিরের লোককে ডাকিয়াও লেকচার দেওয়াইতেন। সে ক্লাসে কখনও কখনও এক কলেজের প্রিন্সিপাল এন. এন. ঘোষ, কখনও সিস্টার নিবেদিতা, কখনও বা আর কেহ লেকচার দিতেন। ঠিক সময়ে যাইতে হইত। হাজিরি লওয়া হইত। লেকচারের পূর্বেই সব ছাত্রদের পেনসিল কাগজ দেওয়া হইত, যাহাতে লেকচারের নোট লওয়া যাইতে পারে। দুইখানি ভাল বাঁধানো খাতা পাইয়াছিলাম, তাহাতে দুই লেকচারের সারাংশ লিখিয়া দাখিল করিতে হইত। সতীশবাবু এইসব খাতা বাড়িতে লইয়া যাইতেন, পড়িয়া যাহা ভুলচুক দেখিতেন তাহা শুদ্ধ করিয়া দিতেন, এবং প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ডাকাইয়া ভুল সব বুঝাইয়া দিতেন। লেকচারের বিষয়বস্তু খুব ভাল থাকিত. যাহাতে দেশ ও জগতের অনেক বিষয়ে জ্ঞান বাড়ে এবং চরিত্রের উপরও প্রভাব পড়ে। শোনা লেকচারের নোটের সাহায্যে নিজের ভাষায় তাহা পুনরায় প্রকাশ করিবার অভ্যাস সর্বতোভাবে ভাল হইয়াছিল। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষারও সাহায্য হইত। বৎসরান্তে সতীশবাবু সমস্ত নোট বই কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পাঠাইতেন, তিনি আবার তাহা দেখিয়া যাহার কাজ সবচেয়ে ভাল তাহাকে বৃত্তি ও পুরস্কার দিতেন। সেবার প্রণালী ছিল কর্মের মাধ্যমে, দেশী কাপড় ও স্বদেশী অন্যান্য সব জিনিসের এক ছোট দোকান খোলা হইয়াছিল, তাহার দেখাশোনা করিবার ভার ছিল সভ্যদেরই উপর। এই দোকান খোলা হইত সন্ধ্যাবেলা, দুই ঘণ্টার জন্য—জিনিস বিক্রয় করিবার ও হিসাব রাখিবার ভার সভ্যদের উপর ছিল।

আমি কোনও প্রকারে এই সোসাইটির এক লেকচার শুনিতে আসিয়াছিলাম। সমস্ত কথাই খুব ভাল লাগিয়াছিল। আমি ইহাতে যোগদান

করিলাম। সতীশবাবুর স্নেহ ছিল, তাহা আজও পাইয়া আসিতেছি। সতীশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখার্জি যে বৎসর বি. এ. পাস করেন, সতীশবাবুও সেই বৎসর পাশ করেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন; ওকালতি শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের পরই তাহা ছাড়িয়া দিয়া এইরূপ সাধারণের কল্যাণকর্মে লাগিয়া গেলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, ছাত্রদের জীবন শুদ্ধ করিতে হইবে, তাই তিনি ডন সোসাইটি স্থাপন করিলেন। ইহাতে মিঃ এন. এন. ঘোষ, সিস্টার নিবেদিতা, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় মহাজনদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যাইত। সোসাইটিতে গিয়া আমার এমন অনেক ছাত্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল, যাঁহারা আমাদের ক্লাসে পড়িতেন না, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন—যেমন সুবিখ্যাত বিদ্বান ও লেখক বিনয়কুমার সরকার, রিপন কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ যিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন।

আমার মনে আছে, বৎসরান্তে ডন সোসাইটির বৃত্তি ও পুরস্কারও আমি পাইয়াছিলাম, সভায় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহা দিবার সময় আমাকে উৎসাহ দিয়া কিছু বলিয়াছিলেন। সোসাইটিতে যাওয়ায় চিন্তার আলোড়ন খুব হইয়াছিল। পরীক্ষায় শ্রদ্ধা দূর হইল, সর্বসাধারণের কাজে মন বেশি দিতে লাগিলাম। এমনিতেই ছেলেবেলা হইতে আমি এই ধরনের কথায় বেশি মন দিতাম। স্কুলে পড়ার সময় এক ডিবেটিং সোসাইটি ছিল তাহাতে আমরা প্রতি রবিবার একত্র হইতাম, নিজের নিজের লেখা পড়িতাম, অথবা বক্তৃতা দিতাম। কখনও কখনও মাষ্টার মহাশয়েরা ইহাতে নিমন্ত্রিত হইতেন, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্কুলের যোগ ছিল না, ইহা ছিল স্বতন্ত্র। ঐরূপে কলিকাতাতেও আমরা 'বিহারী ক্লাব' নামে বিহারীদের সমিতি স্থাপন করিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতে প্রতি রবিবার আমরা একত্র হইয়া লেখা পড়িতাম ও বক্তৃতা দিতাম। এ ছাড়া কলেজ ইউনিয়নেও আমরা যোগ দিতাম, এক বৎসর তো উহার সম্পাদকও নির্বাচিত হইয়াছিলাম। কলেজ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে এক মাসিক পত্র বাহির করা হইয়াছিল, তাহা পরিচালনের ভার আমার হাতে ছিল।

কিন্তু এসকল চেষ্টা সত্ত্বেও, ডন সোসাইটিতে যোগ দিবার পূর্বে এসকলের মধ্যে বলিতে গেলে বিশেষ কোনও লক্ষ্য ছিল না। এ সব কাজের কোনও স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল না, আমাদের সামনে কোন স্থির কার্যপদ্ধতিও ছিল না। খবরের কাগজ পড়িতাম, কংগ্রেসের নাম জানি-তাম, উহার বাৎসরিক অধিবেশনের বক্তৃতাগুলি মন দিয়া পড়িতাম।

এমন কি, কোথাও কোনও সাধারণ সভা হইলে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বড় বক্তার বক্তৃতা থাকিলে সেখানে গিয়া বক্তৃতা শুনিতাম। কিন্তু ডন সোসাইটিতে আমার অনুরাগ বেশি ছিল। স্বদেশী বস্তুর প্রতি অনুরাগ দাদা স্কুলে পড়িবার সময়েই সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও এখন পর্যন্ত পুরা ফুটিয়া ওঠে নাই। যে চিন্তা ও কর্ম প্রথম হইতেই অংকুররূপে সঞ্চিত ছিল, যাহা কোনও উদ্দেশ্য বিনা অথবা বুদ্ধির গহনদেশে কাজ করিতেছিল, তাহা ডন সোসাইটি ও সতীশবাবুর সংগলাভের ফলে খানিকটা পরিস্ফুট হইয়া গেল। আমি খানিকটা ভবিষ্যতের কথাও ভাবিতে লাগিলাম।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১৯০৪-এ আমি এফ. এ. পরীক্ষা পাস করিলাম। ১৯০৫-এ বংগভংগ আন্দোলন শুরু হইল। আমি প্রথম হইতে সমস্ত সাধারণ সভায় যাইতাম, বংগভংগ বিরোধী সভাতেও খুব যাইতাম। তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। ১৯০৫-এর ৭ই আগস্ট তারিখে মস্ত বড় এক সভা হয়। তাহাতে বিদেশী বয়কট ও স্বদেশী প্রচারের সংকল্প গ্রহণ করা হইল। আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম। উহাতে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিলাম। সকলে স্বদেশী ব্যবহার করিবে বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিল। আমার ইহাতে কোনই বাধা ছিল না; কারণ আমি বহুপূর্ব হইতেই শুধু স্বদেশী বস্তুই ব্যবহার করিতাম। খুব জোর আন্দোলন চলিল। প্রায় প্রত্যহ কোথাও না কোথাও জনসভা হইত। আমরা সকলেই যাইতাম। কোথাও সুরেন্দ্রবাবু, কোথাও বিপিনচন্দ্র পাল, কোথাও এ. চৌধুরী, কোথাও অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতা হইত। হস্টেলের ছেলেদের মধ্যে খুব উত্তেজনা ছিল। যে ছেলে কখনও স্বদেশী ব্যবহার করে নাই, সেও 'স্বদেশী' হইতে আরম্ভ করিল। বড়দের কথা তো বলিতে পারি না; কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে নবীন তেজ ও নবীন উৎসাহ জন্মিল।

এখানে একটি সামান্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। আমি তো স্বদেশীই ব্যবহার করিতাম; কিন্তু ক্লাসে এক অসুবিধা বোধ হইত। যে লেকচার হইত তাহা নিত্য নোট করিতাম। পেনসিলে লেখা নোট মুছিয়া যাইবে বলিয়া ভয় ছিল। এইজন্য দোয়াত কলম লইয়া যাইতাম, আর লিখিতাম। একদিন দেখিলাম, স্টাইলোপেন বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে কালি

ভরিয়া দেওয়া হইত, আর লোকের দোয়াত সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইত না। উহা ছিল বিদেশী, আর হোয়াইটওয়ে লেডলার দোকানে সেকালে অর্ধেক দামেই বিক্রয় হইত। আমি একটা কিনিলাম। হস্টেলের সঙ্গীরা তাহা জানিতে পারিল। তাহারা খুব চটিয়া গেল আর আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন এমনও ছিল যাহার সম্বন্ধে জানিতাম যে তাহার অনেক বিলাতি চিঠির কাগজ আছে। আর একজনের কাছে অল্প দিন পূর্বে তৈয়ারী বিলাতি কাপড়ের নতুন দামী কোট ছিল। ছাত্রেরা স্থির করিল, একদিন বিদেশী কাপড়ের বহ্নি-উৎসব করিবে, সেদিন হস্টেলের উঠানে ঐ সমস্ত জিনিস পোড়ানো হইবে। সকলের মনের ইচ্ছা, কিছু কিছু কাপড় পোড়ানো হইবে; হয়তো দুই একজনের মনেই সমস্ত বিদেশী কাপড় পোড়াইবার কথা উঠিয়াছিল; কারণ প্রায় সকলের নিকটেই বেশির ভাগ বিলাতি কাপড়ই ছিল।

ছেলেরা আমাকে খুব বিরক্ত করিলে আমি বলিলাম : সকলে নিজের নিজের ট্রাঙ্ক খোল। যার কাছে যত বিলাতি কাপড় আছে, আজই হোলিতে তা সব পুড়িয়ে ফেল। আমিও আমার ট্রাঙ্ক খুলছি, আমার কাছে যা কিছু বিলাতি বের হবে আমি সে সব এখনই পুড়িয়ে ফেলব। সকলে অবাক হইয়া গেল; তাহারা তো আর জানিত না যে ঐ কলম ছাড়া আমার কাছে আর অন্য কোনও বিলাতি জিনিস ছিল না! আমি ট্রাঙ্ক খুলিয়া একে একে সমস্ত জিনিস ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিলাম। তখন ভিড় দূরে সরিয়া গেল, কেহ আর কখনও আমার বিরুদ্ধে এ প্রকার অভিযোগ করে নাই। ঐ বন্ধুটি তো নিজের বিলাতি কাগজ পোড়াইয়া ফেলিল, কিন্তু যত দূর মনে পড়ে অন্য বন্ধুটি নূতন কোট তাড়াতাড়ি পোড়াইয়া ফেলা উচিত মনে করিল না, তবে কোন দিন পরিবার জন্য তাহা বাহির করে নাই। অন্য ছাত্রেরাও ঐরূপই করিল।

১৯০৫ সাল ছিল এইরূপ এক প্রচণ্ড আন্দোলন ও জাগরণের বৎসর। বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে এক নূতন জীবনের সঞ্চার হইল, অনেকে পড়াই ছাড়িয়া দিল। ঐ সময়ে কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় শিক্ষার এক বড় প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। সতীশবাবু তাহাতে যোগ দিলেন; ডন সোসাইটির কাজকর্মে কয়েক দিনের পর ঢিলা পড়িয়া গেল। সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিল। আমি বরাবর ঐ সব সভায় যাওয়া-আসা করিতাম। বক্তৃতা শুনিতাম, কিন্তু কলেজ ছাড়িয়া এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার ইচ্ছা আমার মনে কখনও হয় নাই। আমার সম্মুখে তাহার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিল না, আর কলেজ ছাড়িয়া ভবিষ্যৎকে এই ভাবে একেবারে বদলাইয়া দিব, তাহার জন্য নিজের মনও প্রস্তুত ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই আমার ভীরুস্বভাব, কোনও বিষয়ে

তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলা, সর্বদাই আমার পক্ষে কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সে সময় তো পা ফেলিবার প্রশ্নই জোর করিয়া আমার সামনে আসে নাই। যতদূর মনে পড়ে, বিদ্যালয় ছাড়িবার আন্দোলন ১৯২০-২১ সনের আন্দোলনের মত স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গবিচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের অতখানি অঙ্গীভূত হয় নাই। আমি এইভাবে ঐসকল ব্যাপারে একপ্রকার বাহির হইতেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া চলিতাম, কখনও ভিতরে প্রবেশ করি নাই।

কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনের ফল তো অবশ্য এই হইল যে বই পড়িবার সময় কম মিলিল, আর পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ে এক ধরনের উদাসীন ভাব আসিল। পরীক্ষা হইত মার্চ মাসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে ছুটি হইত, সে ছুটি প্রায় এক মাস কি তাহার চেয়েও বেশি লম্বা হইত। আমি এবারের ছুটিতে কলিকাতাতেই থাকিয়া গেলাম; কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে এখন কিছু পড়িতে হইবে, না হইলে পরীক্ষায় পাস করা কঠিন হইবে।

কলেজের পরীক্ষা হইল। এ পরীক্ষায় পাস করিতেই পারিব না, আমার মনে এ ভয় তো ছিল না। তবে সম্ভাবনা ছিল যে অন্যদের তুলনায় নম্বর পাইব কম। কয়েকজন সঙ্গী মিলিয়া পরামর্শ করিলাম, পরীক্ষার পূর্বে পাঁচ সাত সপ্তাহ বাহিরে কোথাও গিয়া কাটাইয়া আসিলে ভাল হয়, যেখানে আমরা শান্তিতে পড়িতে পারি, পরীক্ষার জন্যও তৈরি হইতে পারি। আমরা স্থির করিলাম, বিহারের সাঁওতাল-পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ায় গিয়া থাকিব। সেখানে একজন বন্ধু ছোটখাটো একটা বাড়ি ভাড়া ঠিক করিয়া দিলেন। কলেজের পরীক্ষা দিয়া ফলের অপেক্ষা না করিয়া আমরা সেখানে চলিয়া গেলাম।

বলিয়াছি যে ইংরেজী ও ইতিহাসে অনার্স লইয়াছিলাম; ইকনমিক্স ও পলিটিক্স অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাসের অনার্সের পরীক্ষক ছিলেন মিঃ পার্সিভ্যাল। তিনি তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করিয়া আমাদের নম্বর বলিয়া দিয়াছিলেন। আমার স্থান ছিল সকলের উপরে, আর নম্বরও খুব ভাল পাইয়াছিলাম। অন্যান্য বিষয়ের খবর জানিতাম না। তখন প্রিন্সিপাল সায়েন্স পড়াইতেন, তাই তাঁহার পড়ানোর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তিনি আমাদের চিনিতেনই না। তিনি নোটিস বাহির করিলেন যে কোন প্রফেসর যেন কোনও ছাত্রকে পরীক্ষার ফল বলিয়া না দেন।

তাহার পূর্বেই মিঃ পার্সিভ্যাল আমাদিগকে ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা জামতাড়ায় চলিয়া যাওয়ার পর পরীক্ষার ফল শোনানো হইল। প্রিন্সিপাল সাহেব ফল শোনাইবার সময় আমার বিষয়ে বলিলেন যে আমি

ইংরেজীতে অনার্স দিতে পারিব, ইতিহাসে নয়। আমার বন্ধুবান্ধব যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা অবাক হইয়া গেল। একজন সাহস করিয়া বলিল : কেন, ও তো নিশ্চয় পাস করেছে? উত্তর হইল : যদি পাসই করবে, তা হলে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি তো নিশ্চয় পেত। সেই বন্ধু আবার বলিল : ও ছেলে সমস্ত পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, বৃত্তিও পেয়েছে, ইতিহাসে পাস করবেনা এমন হতেই পারে না। প্রিন্সিপাল আবার বলিলেন, তাহার কথার পালটা জবাব দিয়াই বলিলেন, তাহার মুখের কথা কড়িয়াই বলিলেন : যে সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাস করেছে, তাই প্রথম হয়েছে, বৃত্তি পেয়েছে, ইতিহাসে পাস করে নি, এইজন্য এবার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাবে না। বন্ধু আর একবার আরও দৃঢ়ভাবে বলিল : আমরা খবর পেয়েছি, নম্বরও জানা গেছে—সে এ-বিষয়ে অনেক নম্বর আর প্রথম স্থান পেয়েছে। এই কথায় তিনি রাগ করিয়া বলিলেন : এমন হতেই পারে না। আমি নোটিস বের করে দিয়েছি যে কারো নম্বর বলা যাবে না। আর একথা বলিয়া জোরে ধমক দিলেন যে আমার অনার্স পরীক্ষা দিতে বসিবার অনুমতি পাওয়া যাইবে না। তিনি বারবার এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে খুব সাবধানে তিনি সব নম্বর দেখিয়া লইয়াছেন—কোনও ভুল হয় নাই।

আমার বন্ধু ঘাবড়াইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জামতাড়ায় আমার নিকট তার করিল। তার পাইয়া আমি আরও ধাঁধায় পড়িলাম। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় আসাই স্থির করিলাম। কলিকাতায় পৌঁছিয়া আমি সোজা পার্সিভাল সাহেবের বাড়ি গেলাম। সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার পড়াইবার ধরনও খুব ভাল ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনায় ছেলেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি অকৃতদার ছিলেন। বাড়িতে একলাই থাকিতেন। শুধু পুস্তকরাশি সঙ্গে থাকিত। তাঁহার প্রকৃতি ছিল শুষ্ক—কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। ঠিক সময়ে কলেজে আসা, ক্লাসে গিয়া পড়ানো, তাহার পর সোজা বাসায় ফিরিয়া যাওয়া, শুধু ইউনিভারসিটির সেনেট প্রভৃতি—যাহাতে তিনি সভ্য ছিলেন এইসব জায়গায় যাওয়া, আর, ঘরে বসিয়া পড়া। নিজের কর্মে খুব দক্ষ ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ছিলেন। পরে, অল্প দিনের জন্য প্রিন্সিপালও হইয়াছিলেন। এতদূর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল যে এক মিনিটকালও না ক্লাসে নষ্ট করিতেন, না আর কোথাও। সাদাসিধা পোষাক পরিতেন, কেহ বাবুগিরি করিলে তাহা ভালবাসিতেন না। শুধু পড়াইবার সঙ্গে ছিল তাঁহার সম্বন্ধ। তাঁহার সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, উপরের শুষ্কতা ও কঠোরতার প্রভাব আমাদের উপর খুব পড়িয়াছিল। আমরা তাঁহাকে ভয়ও করিতাম খুব।

তাঁহার বাসায় লোকে খুব কমই যাইত। তাঁহার এক ধরন ছিল এই যে, যে সকল পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষক হইতেন, তাহা কলেজেরই হউক আর ইউনিভারসিটিরই হউক, পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজে যে নম্বর দিতেন তাহা লিখিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিতেন। কখনও কোনও বিদ্যার্থী তাঁহার নিকটে চাকরি ইত্যাদির জন্য সার্টিফিকেট চাহিতে আসিলে, তাহার নিকটে নিজে যে সমস্ত বিষয়ে তাহার পরীক্ষক ছিলেন সেই সকল পরীক্ষার সময় জানিয়া লইতেন। নিজের রেজিস্টার দেখিয়া, পরীক্ষাফলকে ভিত্তি করিয়া, পরের দিন সার্টিফিকেট লিখিয়া লইয়া আসিতেন। তাঁহার সার্টিফিকেটের খুব মূল্য ছিল।

আমি সাহস করিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিলাম। ভয় তো করিতাম, কিন্তু উপায় ছিল না। তিনি প্রায় দুই বৎসর পড়াইয়াছিলেন: তাই আমাকে চিনিতেন। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আসিয়াছি। আমি আসিবার উদ্দেশ্য বলিলাম। পরীক্ষা লওয়ার পরে মাত্র কয় দিন গিয়াছে, ফলের কথা তাঁহার মনে ছিল। তিনি বলিলেন : আমার মনে আছে, তুমি সকলের উপরে হয়েছ, নম্বরও ভালই পেয়েছ, তবে এটা কেমন করে হল? আমি তো তার দেখাইলাম। তিনি নিজের রেজিস্টার বাহির করিলেন। দেখিয়া আবার বলিলেন : আমার ধারণা ঠিক, তুমি বেশ ভাল নম্বর পেয়েছ আর প্রথম হয়েছ, আমি নিজে হাতে নম্বর লিখে প্রিন্সি-পালকে দিয়ে এসেছি, তাতে কিছু ভুল ছিল না, ওখানে আফিসে কিছু ভুল হয়ে থাকবে, আমার সঙ্গে কলেজে দেখা করো।

আমার দেহে প্রাণ আসিল। আমি প্রথম হইতেই কলেজের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি যথাসময়ের দুই এক মিনিট পূর্বেই কলেজে পোঁছিয়া প্রিন্সিপালের ঘরে চলিয়া গেলেন। সেখানে দেখিলেন, আমার নম্বর আর একজন পরীক্ষার্থীর ঘরে লেখা রহিয়াছে, সে অনার্সে পুরা নম্বর না পাইয়া ফেল করিয়াছে, আর তাহার নম্বর লেখা রহিয়াছে আমার ঘরে। প্রিন্সিপাল নিজের ভুল স্বীকার করিলেন, দুঃখ করিয়া বলিলেন : ছেলেটিকে বলে দেবেন যে ভুল হয়ে গিয়েছিল, এখন সে পরীক্ষা দিতে পারবে।

আমি তো অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। প্রিন্সিপালের ঘর হইতে বাহির হইয়াই তিনি আমাকে সব কথা বলিয়া ক্লাসে পড়াইতে চলিয়া গেলেন। এই গোলমালের ফলে আমার দুই দিন অনর্থক কষ্ট হইল, জামতাড়া হইতে কলিকাতায় যাওয়াআসায় কিছু খরচ হইয়া গেল আর কিছুক্ষণ ধরিয়া খুব চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছিল। আর ইহাও দাঁড়াইল যে আমার সহপাঠী, যাহার নামের ঘরে আমার নম্বর উঠিয়াছিল, সেও অনার্স পরীক্ষা দিতে পারিল। ভুল সংশোধন করিবার পূর্বেই তাহার

দরখাস্ত, ফর্ম মাফিক, প্রিন্সিপালের সহি শুদ্ধ ইউনিভারসিটিতে পাঠানো হইয়াছিল। সেই অনুমতিপত্র ফিরাইয়া আনা এখন আর সম্ভব ছিল না। সে পরিশ্রম করিয়া পড়িতে লাগিল, ইউনিভারসিটির পরীক্ষায় সে-ও অনার্সের সঙ্গে পাস করিয়া গেল। উপরে যাহা বলিয়াছি, এণ্ট্রান্স, এফ. এ. ও বি. এ—তিনটি পরীক্ষাতেই আমার অনুমতি পাইতে একটু অসুবিধা হইয়াছিল, যদিও আমি তিনটিতেই কলেজের আর ইউনিভারসিটির পরীক্ষাতেও বরাবর প্রথম হইয়াছিলাম।

পরীক্ষার দিন কাছে আসিলে আমি তো খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেলাম। একটা ধারণা জন্মিল যে এবারও প্রথম না হইলে নিন্দা হইবে। কিন্তু এবারে তেমন তীব্র আগ্রহও ছিল না, সময়ও ছিল না যে সেজন্য এফ. এ. পরীক্ষার মত তৈয়ারি হইতে পারি। পরীক্ষাফলে স্থান শুধু অনার্সের নম্বর হইতেই পাইতে পারা যাইত। তাই আমি অনার্সের বিষয়েই মন দিলাম। ফিলসফিতে শুধু পাস করিবার কথা, তাহা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিলাম। পূর্বেও ডক্টর পি. কে. রায় মহাশয়ের লেকচারই মন দিয়া শুনিতাম। বই কম পড়িয়াছিলাম। ইহাতে একবার এক ঘটনায় উৎসাহ লাভও করিয়াছিলাম। এক দিন ডক্টর রায়ের অসুখ হইয়াছিল। সেদিন তিনি পড়ান নাই; কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন আর সকলকে ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। সকলে উত্তর লিখিল। আমি বই তো পড়ি নাই, শুধু লেকচারে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই যতদূর পারি উত্তর লিখিয়া দিলাম। ডক্টর রায় সমস্ত উত্তর বাড়ি লইয়া গিয়া পড়িলেন, আর পরের দিন তখনকার পরীক্ষার ফল শোনাইলেন যে আমিই সকলের উপরে হইয়াছি, যাহারা ও বিষয়ে অনার্স লইয়াছে তাহাদের চেয়েও বেশি নম্বর পাইয়াছি। ইহার পর হইতে আমার আরও বিশ্বাস হইল যে, ফিলসফির জন্য বেশি পড়ার দরকার নাই।

ইউনিভারসিটির পরীক্ষার পূর্বে কলেজের পরীক্ষায়ও আমি ঐ বিষয়ের প্রশ্নে অনার্সের ছেলেদের তুলনায় বেশি নম্বর পাইয়াছিলাম। তাই জামতাড়ায়ও এদিকে মন দিই নাই। পরীক্ষার দিন নিকটে আসিল। ইংরেজীর পরীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পর ছিল ফিলসফির পরীক্ষা। প্রায় দুই মাস হইল আমি ফিলসফির কোনও পুস্তক দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ ভয় হইল যে পরের দিন ফিলসফিতে কিছুই উত্তর করিতে পারিব না। এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল, কিছুই মনে নাই। ভাবিলাম, বই পড়িবার তো সময় নাই-ই, সারা রাত যাহা কিছু নোট ইত্যাদি আছে তাহা যদি একবার দেখিয়া যাই তো হয়তো পাস করিবার মত লিখিতে পারিব। ফিলসফিতে সাইকলজি (মনোবিজ্ঞান), এথিক্স (আচারশাস্ত্র) ও লজিক এই তিন বিষয়

পড়িতে হইত। সাইকলজি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। অভ্যাসমত সন্ধ্যা-বেলাতেই ঘুম আসিল। খানিক দেরিতে আবার ঘাবড়াইয়া উঠিয়া পড়িলাম; তখন ভাবিলাম, এখন ঘুমাইয়া লই, রাত দুইটা তিনটায় উঠিয়া সব কিছু একবার দেখিয়া লইব, সেই ভাল। এক বুড়া চাকর ছিল। তাহাকে বলিয়া দিলাম, ঠিক দুইটার সময় জাগাইয়া দিও। দুই তিন দিনের পরীক্ষাতে খুব মেহনত হইয়াছিল; খুব ক্লান্ত হইয়াছিলাম। গাঢ় নিদ্রা আসিল। চাকর বেচারি সারা রাত বসিয়া রহিল। যেমনি দুইটা বাজিল, অমনি জাগাইতে শুরু করিল। কিন্তু তাহার হাজার চেষ্টাতেও আমার ঘুম ভাঙিল না। প্রায় সাড়ে চারটার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া ঘড়ি দেখিলাম। খুব ঘাবড়াইয়া গেলাম। চাকরের উপর রাগ হইল, কিন্তু সে বলিল সে তো বরাবর জাগাইবার চেষ্টায় ছিল, আমি না উঠিলে তাহার কি দোষ। তাড়াতাড়ি নোট উলটাইতে লাগিলাম। সাইকলজি ও এথিক্স তো উলটাইয়া দেখা হইল। ডক্টর রায়ও এই দুইটি বিষয় পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু লজিক দেখিবার সময় হইল না। ঘাবড়াইয়া একজন বন্ধুর কাছে গেলাম। সব কথা বলিলাম। সে লজিকের সমস্ত অধ্যায়ের নাম বলিয়া দিল, আর প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়ে কিছু কিছু বুঝাইয়াও দিল। তখন মনে হইতেছিল, আমি কোন নূতন বিষয় প্রথম পড়িতেছি। এইসব করিতেই যাওয়ার সময় হইয়া গেল। ছুটির দশ পনেরো মিনিটে মুখ ধুইয়া স্নান করিয়া খানিকটা ভাত গিলিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে ইউনিভারসিটিতে পৌঁছিলাম। পৌঁছিবার পূর্বেই ঘণ্টা বাজিয়াছিল। দৌড়াইয়া নিজের জায়গায় বসিলাম, আর প্রশ্নপত্র হাতে আসিল। এতদূর ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম যে একটা প্রশ্নেরও উত্তর লিখিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছিল না। ভয় হইতেছিল যে অন্যান্য বিষয়ে অনার্স পাইয়াও কি হইবে—যদি এই বিষয়ে ফেল করিয়া যাই! কোনও একটা বিষয়ে ফেল করিলে সমস্ত পরীক্ষাতে লোকে ফেল করিত।

প্রশ্নপত্র পাইবার পর খানিকটা শান্ত হইবার চেষ্টা করিলাম। আস্তে আস্তে প্রশ্নগুলি পড়িলাম। মনে হইল যেন প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব। লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শেষ হইলে বুঝিলাম, উত্তর কিছু খারাপ হয় নাই। এই ভাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাহার পর তৃতীয় প্রশ্ন—ক্রমে সবগুলির উত্তর লেখা হইল। ওদিকে সময়ও শেষ হইয়া আসিল। এখন মনে বিশ্বাস হইল, ফেল করিব না। সমস্ত ভয় কমিয়া গেল। আধ ঘণ্টা ছুটির পর দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র পাইলাম। উহাতেও সেইরূপই হইল। প্রায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিলাম, শুধু একটা বাকি থাকিয়া গেল। উহারও উত্তর কিছুটা দিতে তো পারিতাম, কিন্তু সম্পূর্ণ পারিতাম না; কারণ

উহার সম্বন্ধে যে অধ্যায় তাহার শিরোনামা আমি দেখিয়াছিলাম, আর বন্ধুটি সংক্ষেপে কিছু বলিতেও শুরু করিয়াছিল, কিন্তু তাহা শেষ করিতে পারে নাই, আর আমি ঘড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি হস্টেল হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমি উহার উত্তর দিলাম না, সময় শেষ হইবার পূর্বেই চলিয়া আসিলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে এখন আর ফেল হইবার তো কোনও ভয়ই নাই। ফল বাহির হইলে দেখা গেল, ইতিহাসে অনার্সে প্রথম হইয়াছি; ইংরেজীতেও অনার্স পাইয়াছি, তবে প্রথম হইতে পারি নাই। ফিলসফিতে খুব ভাল নম্বর পাইয়াছিলাম। সমস্ত বিষয় লইয়া আমিই সকলের উপরে স্থান পাইয়াছিলাম, এবং সেই দুইটি বৃত্তি —একটি মাসিক পঞ্চাশ টাকার, অন্যটি মাসিক চল্লিশ টাকার—আবার পাইলাম। এবারকার পরীক্ষার ফল কোনও চেষ্টার পরিণামে নয়, কারণ আমি তো কোনও চেষ্টা করিই নাই।

সমুদ্রযাত্রার বিষয়ে আন্দোলন

১৯০৪ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন আমি এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া জারাদেইতে আসি, তখন দাদাও বাড়িতে ছিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অপেক্ষা। খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম যে বিদেশ হইতে শিক্ষা পাইয়া ডক্টর গণেশপ্রসাদ ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি ছিলেন বালিয়ার লোক, বালিয়া হইল আমাদের জেলা ছাপরার (সারণ) লাগালাগি। তাঁহার মামাবাড়ি ছিল ছাপরায়। তিনি জাতিতে কায়স্থ। এলাহাবাদ হইতে ডি. এস. সি. উপাধি পাইয়া তিনি পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে যান, সেখান হইতে যান জার্মানীতে। গণিত শাস্ত্রে তিনি খুব নাম করিয়াছিলেন। তিনি দেশে পৌঁছিবার পূর্ব হইতেই এক আন্দোলন হইয়াছিল যে তাঁহাকে জাতিতে গ্রহণ করা হইবে। ছাপরায় ইহা লইয়া দুই দল হইল। সংস্কারকদলের নেতা ছিলেন বাবু ব্রজকিশোরপ্রসাদ, তিনি ছিলেন তখন উদীয়মান নূতন উকিল। আর বিরোধী দলের নেতা ছিলেন সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান ও নামকরা দুইজন বুড়া উকিল। ব্রজকিশোরবাবু আমাদের বাড়ি আসিলেন। দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি বাবাকে বলিলেন যে ডক্টর গণেশকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে, আর তাঁহার বাড়িতে যে সামাজিক ভোজ হইবে তাহাতে বাবাকে যাইতে হইবে।

তখন পর্যন্ত সমস্ত বিহারে শুধু মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহই ছিলেন বিলাতফেরত কায়স্থ। তাঁহার ফিরিবার পর এগার বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার ফিরিবার সময়ও কিছু আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার পুরানো নিয়মে জাতিবন্ধন মানিতে রাজি হন নাই। এই জন্য প্রথা অনুসারে তাঁহাকে জাতিতে ফিরাইয়া লওয়া হন নাই। এইজন্য প্রথা অনুসারে তাঁহাকে জাতিতে ফিরাইয়া লওয়া লেখা পড়া করিয়া স্থির করা হইয়াছিল যে, তিনি জাতিবন্ধন মানিবেন। তিনি বিদেশেও অতিশয় নির্মল জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কখনও মৎস্য, মাংস, মদ্য স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার ও সংস্কারকদের ধারণা ছিল যে এইভাবেই তখনকার দিনে সমুদ্রযাত্রার রাস্তা খুলিয়া যাইতে পারে। মিঃ সিংহ ফিরিবার পর দশ বৎসরের মধ্যে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদেশে যাইবার সাহস কাহারও হয় নাই। তাই এখন শর্তকে মানিয়া লইয়াও রাস্তা খুলিতে হইবে।

ব্রজকিশোরবাবু কয়েকজন লোককে তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন, ডক্টর গণেশপ্রসাদের বাড়ি গিয়া ভোজে যোগদান করিবার জন্য। বাবাকে তিনি খুব আগ্রহ করিয়া ধরিয়াছিলেন যে তিনিও যেন যান। বাবা নিজে যাইতে রাজি হইলেন না, কিন্তু বলিয়া দিলেন যে তিনি আমাদের দুই ভাইকে পাঠাইবেন।

ডক্টর গণেশপ্রসাদ ফিরিলেন। বালিয়াতে ভোজের দিন স্থির হইল। বাহির হইতে বাবু ব্রজকিশোরের প্রেরণায় আমরা বিশ-একুশ জন লোক ছাপরা হইতে বালিয়ায় গেলাম। ইহাদের মধ্যে আমরা দুই ভাই, আর আমাদের দুই সংগী যমুনাভাই ও গঙ্গাভাইও ছিলেন। গাঁয়ের পাটোয়ারিও ডক্টর গণেশপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হইল। বালিয়ার কায়স্থদের মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

আমি লিখিয়াছি যে আমাদের বাড়ি প্রথমে বালিয়াতেই ছিল। সেখানে আমাদের জ্ঞাতিরা থাকিতেন। বিবাহে ও শ্রাদ্ধে আমাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত এপর্যন্ত বালিয়া হইতেই আসিতেন। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও বালিয়াতেই থাকিতেন। সে বাড়ির অনেকে ওখানে ওকালতি করিতেন। কেহ কেহ অন্য কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের পৌঁছিবার খবর ছড়াইয়া পড়িল। তাহা গোপন করিবারও অভিপ্রায় ছিল না। আমাদের এক জ্ঞাতিও উকিল ছিলেন। তিনি সম্পর্কে আমাদের ভাই হইতেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করিলেন, আর আমাদের ঐ ভোজে যোগ দেওয়াটা পছন্দ করিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে আমরা বুঝি বাবার হুকুম না লইয়াই চুপচাপ চলিয়া আসিয়াছি। যখন আমাদের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল যে সেরকম কিছু নয়, তখন তাঁহার আরও কষ্ট

হইল। তিনি বলিলেন : আমরা সকলে যখন এখানেই আছি তখন জ্যেঠা-মশায়ের আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও এ ব্যাপার বড় বেশি পছন্দ করেন নাই; কিন্তু তাহাদের দিক হইতে বেশি কিছু জোর করা হয় নাই। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হইল। ভাত খাইয়া আমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলাম। ডক্টর গণেশপ্রসাদ প্রথমে এলাহাবাদে গেলেন, পরে হিন্দু ইউনিভারসিটি ও কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে গণিত বিভাগের সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েক বৎসর পরে মারা যান। আমাদের দিক হইতে সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা তিনি কখনও ভোলেন নাই, আমার প্রতি তাঁহার খুব স্নেহ ছিল।

বালিয়া হইতে ফিরিবার পথে আমি ওখান হইতেই নিজের অন্য বোনের বাড়ি গেলাম, ছাপরা হইতে কিছু দূরে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। সেখানে যাওয়ার বিশেষ কোনও অভিপ্রায় ছিল না। প্রথম হইতেই তাহার ইচ্ছা ছিল যে আমি দুই চার দিন তাহার কাছে থাকি। ছাপরা হইতেই সেখানে যাইবার সুবিধা ছিল। এইজন্য বাড়ি না ফিরিয়া সেখানে গেলাম।

যাহারা ভোজে যোগ দিয়াছিল তাহাদের নাম খবরের কাগজে ছাপা হইল, আর ছাপরাতে খুব গোলমাল হইল। তাহাদের জাতিচ্যুত করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কাশী হইতে মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকটে সমুদ্রযাত্রাবিরোধী ব্যবস্থা চাওয়া হইল। সমস্ত জেলার কায়স্থদের লইয়া এক বিরাট সভার আয়োজন হইতে লাগিল। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না। আমি তো ছিলাম বোনের গ্রামে। ইহার মধ্যে পরীক্ষার ফলও বাহির হইল। ব্রজকিশোরবাবু গেজেট দেখিয়া জীরাদেইতে খবর দিয়া দিলেন। দাদা কথাটা জানিতে পারিলেন। বাবার খুব আনন্দ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সত্যনারায়ণের কথা শুনিলেন; ব্রাহ্মণভোজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। এসমস্ত হইল আমার অনুপ-স্থিতিতে।

আমি আমার ভগ্নীপতির বাড়ি হইতে জীরাদেই যাইবার জন্য রওনা হইয়া ছাপরায় পৌঁছিলাম। ভগ্নীপতিও সঙ্গে সঙ্গে ছাপরায় আসিলেন। ছাপরায় যে আন্দোলন সজোরে চলিতেছিল, তিনি সে খবরই রাখিতেন না। আমরা রাত্রে ছাপরায় পৌঁছিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। এইজন্য সেই রাত্রে কোনও খবর পাইলাম না। আমার পরীক্ষাফলেরও কিছু জানিতে পারিলাম না। খুব ভোরে জীরাদেই যাওয়ার ট্রেন ছাড়িত। ভোর-বেলাতেই আমি স্টেশনে পৌঁছিয়া গেলাম। ব্রজকিশোরবাবুর বাসা স্টেশনের কাছেই ছিল। চাকরকে পাঠাইলাম, পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে কি না জানিবার জন্য। তিনি খবর পাঠাইলেন যে পরীক্ষার ফল

তো বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া যেন ঐ গাড়িতে না যাই। আমি তাঁহার বাসায় গেলাম, কারণ পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য উৎসুক ছিলাম। সেখানে তিনি আটকাইলেন। সকালে সাতটায় কাছারি বসিত। তাঁহার সঙ্গে আমিও কাছারি গেলাম। আমার ভগ্নীপতি আমার ওখানে আটক পড়িবার খবর পান নাই। আমি যখন ব্রজকিশোরবাবুর সঙ্গে বার-লাইব্রেরিতে পেঁাছিলাম, তখন বিস্তর উকিল আমাকে আসিয়া ঘিরিল। কেহ কেহ পরীক্ষার ফলে খুশি হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, কেহ কেহ ডক্টর গণেশপ্রসাদের ভোজের ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা জানিতে চাহিল যে ভোজে কে কে যোগ দিয়াছিল, আর আমিই বা কোথা হইতে আসিলাম। আমি সব কথা বলিয়া দিলাম। ইহাও বলিলাম যে কয়েকদিন 'পায়গা'তে আমার ভগ্নীপতির নিকটে ছিলাম, আর সেখান হইতেই ফিরিতেছি। আমার ধারণা ছিল না যে আমার এইভাবে সত্য কথা বলার ফলে কিছু অনর্থ হইবে।

কথাটা এই—যাহারা ভোজে যোগ দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আন্দোলন দেখিয়া ভয় পাইয়া বাড়ির লোকদের পীড়াপীড়িতে ভোজে যোগ দেওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছিল, খবরের কাগজে ছাপা সংবাদ যে ভুল তাহা বলিয়াছিল। যেমনি আমার ভগ্নীপতি বার-লাইব্রেরীতে পেঁাছিলেন অমনি তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল। আমি যে ডক্টর গণেশ-প্রসাদের ভোজে যোগ দিয়াছিলাম, তাহা তিনি জানিতেন না। আমি যে জীরাদেই না গিয়া ছাপরাতে আটক পড়িয়াছিলাম, ও সেখানকার বার-লাইব্রেরীতে অন্য লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়াছিলাম, তাহাও তিনি জানিতেন না। প্রতিষ্ঠাবান বড় বড় উকিলদের কথা শুনিয়া তিনিও খানিকটা ভয় পাইলেন। তিনি আমার দিক হইতে কথাটা অস্বীকার করিলেন, বলিয়া দিলেন আমি যদি ভোজে যাইতামই, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় জানিতে পারিতেন। তখন লোকেরা তাঁহাকে বলিল যে আমি ওখানেই আছি, আর আমি নিজেই ভোজের খবর বলিয়াছি। তখন মোকাবিলা করার প্রশ্ন আসিল। কিন্তু আমি তখন ওখান হইতে ব্রজ-কিশোরবাবুর বাসায় গিয়া সেখান হইতে ট্রেনে জীরাদেই চলিয়া আসিয়া-ছিলাম। আমি গ্রামে পেঁাছিলে শুনিতে পাইলাম, একদিন পূর্বে পূজা ইত্যাদি হইয়া ব্রাহ্মণভোজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বদের ভোজ পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শুধু আমাদের গাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের কায়স্থেরাও, যাহারা নাকি বরাবর কুটুম্বভোজনে যোগ দিত, যোগদান করিয়াছিল। গাঁয়ে তো কোনও অসুবিধা ছিলই না, কারণ আমরা মাত্র তিন ঘর কায়স্থ ছিলাম, আর তিন ঘরের লোকেই বালিয়ার ভোজে হাজির ছিল। আমি ছাপরার ব্যাপার দাদাকে বলিলাম। ব্রজকিশোর-

বাবুর কথাও বলিলাম যে ছাপরার সভায় নিজেদের মতের লোকদের পাঠাইতে হইবে, আর সে সভায় সমুদ্রযাত্রার অনুকূলে প্রস্তাবও গ্রহণ করিতে হইবে।

ছাপরায় সভার জন্য জোর আয়োজন চলিল। সমস্ত জেলার কায়স্থদের ডাকা হইল। কাশী হইতে মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী ব্যবস্থা দিতে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলিতে লাগিল, যাহারা ভোজে উপস্থিত হইয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়াছিল তাহাদের দিয়া যদি অস্বীকার করানো যায়, কি প্রায়শ্চিত্ত করানো যায়। আমরা সভার দিন ছাপরায় যাই নাই। কিন্তু শুনিয়াছি যে বিস্তর কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত জেলা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। পূর্ব ছাপরা ছিল দুইজন বড় উকিলের পক্ষে, ইঁহারা ছিলেন বিরোধী; আর আমরা যেখানকার লোক, পশ্চিম ছাপরা, সেখানকার দাবি ছিল যে আমরা পক্ষে আছি। কথাটা হইল এই যে, অধিকাংশ জ্ঞাতির মত সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূলে। সামান্য কিছু লোক, যাহারা অনুকূলে ছিল, অধিকাংশই পশ্চিম ছাপরার, আর সেখানে আমাদের বাড়ির মর্যাদা সকলে স্বীকার করিত। ছাপরার পঞ্চ-মন্দির এক কায়স্থেরই তৈয়ারী এবং শহরের সব মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর; সেখানে সভা বসিল। বয়োবৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ উকিল সাহেবের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। লোকজন জুটিলে আমাদের দলের একজন লোক উঠিয়া প্রস্তাব করিল যে বাবু সরস্বতীপ্রসাদ উকিলকে সভাপতি করা হউক। এই ভদ্রলোকটি ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন, পশ্চিম ছাপরার অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু গোরখপুরে ওকালতি করিতেন। কেহ কেহ প্রস্তাবটির সমর্থন করিলেন। যাহারা সভা ডাকিয়াছিল তাহারা একটু ধাঁধায় পড়িয়া গেল। তাহারা তো বড় উকিল সাহেবের সভাপতি হইবার কথা নোটিসে ছাপিয়া দিয়াছিল। সংস্কারক দলের যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলে গোলমাল করিয়া উঠিল যে বাবু সরস্বতীপ্রসাদকে সভাপতি করা হউক। অন্য লোকেরা এই বিরোধের আশঙ্কা করে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, সকলে বুঝি তাহাদের দলেই আছে। সত্য কথা, বেশির ভাগই, সকলেই—অর্থাৎ জনমত—ঐ সভাতেও প্রবলভাবে তাহাদেরই পক্ষে ছিল। কিন্তু তাহারা বেশ খানিকটা ভয় পাইয়া গেল। এদিক থেকে জোর করা হইতে লাগিল যে সভাপতি-নির্বাচনে মত লওয়া হউক। ইহাতে তাহারা আরও ঘাবড়াইয়া গেল। তাহারা মত দিতে অস্বীকার করিল, আর বলিল যে যাঁহার নাম প্রকাশিত করা হইয়াছে তিনিই সভাপতি হইবেন। তিনি সভাপতির স্থানে বসিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এদিক হইতে বাবু সরস্বতীপ্রসাদও অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—উকিল সাহেব, সভা তো আমার নামই সভাপতির জন্য প্রস্তাব করেছে, আমিই সভাপতি। আপনি

কি করে এখানে বসতে পারেন? ইহাতে লোকে আরও ঘাবড়াইয়া গেল। তিনি বলিয়া দিলেন: এরা সভা হতে দেবে না। এইজন্য সভা ভঙ্গ করা হল।

সংস্কারকদের দল তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিল, আনন্দ প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিল যে তাহাদের জয় হইয়াছে, এই বলিয়া স্থানত্যাগ করিল। সংস্কারকদলের তো ইহাই করাইবার ছিল, কারণ তাহারা জানিত যে সত্য সত্য মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের হার হইবে। সেদিনের সভা ভঙ্গ হইল। পরের দিন আবার সভা আহ্বান করা হয়। তাহাতে প্রস্তাব করা হইল যে যাহারা যাহারা ভোজ খাইয়াছে তাহাদের জাতিচ্যুত করা হইবে। তাহাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, বিবাহাদি-সম্পর্ক, সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের নামও প্রস্তাবের মধ্যে দেওয়া হইল। সেই প্রস্তাব ছাপাইয়া সমগ্র জেলার মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হইল। সংস্কারকদের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, এই সভা তো সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুম্বদের দিয়া হয় নাই, আর আমাদের অর্থাৎ সংস্কারকদলের চলিয়া আসার পর অন্য দিন ডাকা হইয়াছে; তাই উক্ত প্রস্তাব আমরা মানি না, সমস্ত জেলার জ্ঞাতিকুটুম্বেরা ইহা স্বীকারও করে না। সামান্য লোকে সত্যই যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে আবার সভা করিয়া জ্ঞাতিকুটুম্বদের ডাকিতে হইবে, আর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে গন্ডগোল আরম্ভ হইল, খবরের কাগজে দুই পক্ষের বক্তব্যও হয়তো বাহির হইল। ফলে জাতিচ্যুত করাটা বেশি জোর পাইল না।

আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ যতদূর ছিল, তাহার মধ্যে জাতিচ্যুত করিবার কোনও প্রশ্ন ওঠে নাই; কারণ আমাদের আশপাশের সকলে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিত। আর ব্রাহ্মণপুরোহিত কখনও কোনও অসুবিধা হইতে দেয় নাই। হাঁ, বাবার একবার কিছু দুঃখ হইয়াছিল। বলিয়াছি, আমার ভগ্নীপতি ছাপরার নিকটে থাকিতেন। তাঁহার অঞ্চলে এই জাতিচ্যুতি আন্দোলন খানিকটা প্রবল ছিল। ছাপরার লোকেরা তাঁহার উপর জবরদস্তি করিয়া একবার তাঁহাকে দিয়া বাবার নিকটে এক অতি অভদ্র পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। চিঠি লইয়া একজন লোক আসিয়াছিল, আমাদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। সে বলিল, বাবার হাতেই পত্র দেওয়ার হুকুম, আমাদের হাতে নয়। আমরা বুঝিলাম যে পত্রে এবিষয়ের আলোচনা কিছু থাকিবে। পত্র পড়িয়া বাবার একটু ভয় হইল। আমাদের ঐ একজন ভগ্নীপতিই বাঁচিয়া ছিলেন। অন্য ভগ্নী তো অনেক পূর্বেই বিধবা হইয়াছিলেন। ভগ্নীপতিরও কোনও সন্তান ছিল না, নিজের বাড়িতে একলাই ছিলেন। না ছিল অন্য কোনও ভাই, না ছিল আত্মীয় স্বজন। যাহা কিছু সম্পর্ক তাহা আমাদের সঙ্গেই ছিল।

ইনি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, ইঁহার অন্য কেহ আত্মীয় তো ছিলই না, এখন আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধও যাইতে বসিয়াছে। যদি আমরা সম্বন্ধ বজায় রাখিতে চাই তাহা হইলে হয় ভোজে যোগ দেওয়াটা অস্বীকার করিয়া ঘোষণা করিতে হয়, নয় তো প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বাবা ঘাবড়াইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি এরূপ মনে করিলেন না যে আমরা কোনও ভুল করিয়াছি। তিনি এই পর্যন্ত বলিলেন যে আমরা নিজেরা যদি ভোজে যোগ দিয়া এই ঝগড়ায় না জড়াইতাম, তাহা হইলে তিনি হয়তো অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অই কর্মে অধিক সাহায্য করিতে পারিতেন। এরূপ পত্র আসিয়াছে শুনিয়া মা তো সাফ বলিয়া দিলেন : অস্বীকার করার কথা তো উঠতেই পারে না—সে তো একেবারে মিথ্যা কথা হবে, ওরকম করলে ভাল হবে না। হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্তের কথা যদি ওঠে, তখন দেখা যাবে।

এই মর্মে পত্রের উত্তর পাঠানো হইল। সে সময়ে আমার দিদির আসিবারও কোনও কথা ছিল না, এইজন্য ব্যাপারটি বেশিদূর গড়াইল না। বাবা ছাপরায় গিয়াছিলেন। একটা মোকদ্দমা চলিতেছিল। তাহাতে আমাদের উকিল ছিলেন সেই বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তের উপর খুব জোর দিলেন। আমরা কলিকাতায় আছি, বাড়ি আসিলে পরামর্শ করিবেন—এই বলিয়া বাবা কথাটা চাপা দিয়া দিলেন।

এইভাবে যতদূর সম্ভব পরোক্ষ রীতিতে আন্দোলন জোর চলিতে লাগিল। সাধারণ সভা ডাকিবারও চেষ্টা হইল। আমাদের নিকটে সিউয়ান শহর, সেখানে এক সভা আহ্বান করা হইল, তাহাতে ছাপরার সভায় গৃহীত প্রস্তাব প্রচার করিবার কথা ছিল। একজন ভদ্রলোককে ছাপরা হইতে পাঠানো হইল যেন সিউয়ানের যাহারা ভোজে যোগ দিয়াছিল তাহাদের জাতিচ্যুত করার কথাটা যথারীতি সভায় শুনাইয়া দেওয়া হয়। এই সভায় আমরাও গিয়াছিলাম। কিন্তু সিউয়ানের কুটুম্বদের মধ্যে বহুলোক আমাদের দলে ছিলেন; কারণ ব্রজকিশোরবাবু, সরস্বতী-প্রসাদবাবু ও আমরা—সকলেই এই সিউয়ান মহকুমার অধিবাসী। ঐ সভায় আমরা প্রস্তাব করিয়া দিয়াছিলাম যে, ছাপরার সভা আমরা মানি না—সিউয়ানের জ্ঞাতিরা আমাদের দলে।

আমাদের গাঁয়ের দুইজন, যমুনাপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ, আমাদের সঙ্গে বালিয়ার ভোজে যোগ দিয়াছিল, তাহারা ছাপরায় পড়িত। তাহারা অন্য কয়েকজন ছেলের সঙ্গে এক বাসায় থাকিত। তাহাদের কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ঐ মেসের ছেলেরা তাহাদের ছোঁয়া জল লইত না—তাহাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করিত না। বামুন ঠাকুর রান্না করিয়া

তাহাদের থালায় আলাদাভাবে আহার্য দিত। এই অপমান তাহারা হাসি-মুখে সহ্য করিল। কয়েকমাস এইভাবে চলিল। পরে আস্তে আস্তে ইহার উগ্রভাব কমিয়া আসিল। সকলে একত্র হইল। ছাপরায় যাঁহারা বিরোধীদলের প্রধান ছিলেন, তাঁহাদের'ও এমন সব পরিবারে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল যাহারা সমুদ্রযাত্রার পক্ষে ছিল। তাঁহাদের নিজেদের বাড়িরও কেহ কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী হইল। তাহারা নিজেদের জীবনে তো এই কথার মীমাংসা করিল, কিন্তু যে বন্ধন ছিঁড়িল তাহা আর জোড়া লাগিল না। কায়স্থদের সমুদ্রযাত্রার রাস্তা খুলিয়া গেল!

ছাত্র সম্মেলন ও কংগ্রেস

বি. এ. পাস করিয়া আমি কলিকাতায় এম. এ. ও বি. এল. পড়িতে লাগিলাম। সে সময় স্বদেশী আন্দোলন খুব জোর চলিতেছিল। কলি-কাতায় আমরা যে কয়েকজন বিহারী ছাত্র পড়িতেছিলাম, তাহাদের উপরেও ইহার প্রভাব পড়িতই। আমরা বিহারী ক্লাবে সর্বদা বসিতাম, মিশিতাম ও আলাপ-আলোচনা করিতাম। বাংলার ছাত্রসমাজ এইভাবে স্বদেশী প্রচার করিতেছে, আমাদের বিহারেও ছাত্রদের সংগঠন হইলে তাহার দ্বারা স্বদেশীর প্রচার হইতে পারে, আমাদের মনে এই উৎসাহ আসিল। আমরা এক গানও তৈরি করিলাম, তাহা ছাপাইয়া যেখানে-সেখানে বিলি করিলাম। এই বিলি করার ব্যাপারে সংগঠনের অভাব আরও বোঝা গেল।

আমরা মনে করিলাম, বিহারের ছাত্রদের এক সম্মেলন করা যাক। এই ধরনের এক প্রস্তাব বিহারী ক্লাবের সামনে রাখা হইল। শুধু ছাত্ররা নয়, বড়রাও ঐ প্রস্তাব অতিশয় উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করিল। আমাকে পাটনায় পাঠানো হইল। সেখানে প্রথমে ছাত্রদের সঙ্গে, পরে অন্য লোকদের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, আর স্বগীয় বাবু মহেশনারায়ণ—যিনি তখন 'বিহার টাইম্‌স্' সম্পাদনা করিতেন। ইঁহারা সকলে সহানুভূতি দেখাইলেন। স্থির হইল, পাটনাতেই প্রথম সম্মেলন আহ্বান করা হইবে, তাহাতে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ শরফুদ্দিনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হইবে। পাটনার ছাত্রেরা এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া সমস্ত ব্যবস্থাও করিল।

প্রথম সম্মেলন হইল পাটনা কলেজের বড় হল ঘরে। বিহারের সমস্ত কলেজ ও অনেক স্কুলের ছাত্রেরা ঐ সম্মেলনে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ

দিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য বুঝাইবার ভার আমার উপর দেওয়া হইল। আমি এক দীর্ঘ বক্তৃতা ইংরেজীতে লিখিয়া তৈরি করিয়াছিলাম, উহাই পাড়িয়া শুনাইলাম। অন্য সকলের বক্তৃতাও সর্বদা ইংরেজীতেই হইত। সম্মেলনে স্থির হইল যে-সমস্ত শহরে কলেজ আছে এবং যেখানে যেখানে স্কুল আছে, প্রথমে সে-সব শহরে ছাত্রসমিতি গঠন করা হউক, ইহারা সম্মেলনের সহিত যুক্ত থাকিবে। দীর্ঘ নিয়মাবলী তৈরি হইল। তাহার অনুসারে সমস্ত বিহারের ছাত্রদের প্রতিনিধিস্বরূপ এক স্থায়ী সমিতি পাটনাতে স্থাপিত হইল। তাহাতে সব জায়গার ছাত্রদের প্রতিনিধি লওয়া হইল। এই সমিতিই সমস্ত ছাত্রসমিতি নিয়ন্ত্রণ করিত এবং সারা বৎসর সম্মেলনের কাজকর্ম চালাইত।

আমার মনে আছে, নিয়ম রচনা করিবার সময় দুটি প্রশ্ন লইয়া নিজেদের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। এক, এই সম্মেলন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু কাজ করিবে কি না। এবিষয়ে ছাত্রদের মধ্যেই খুব মতভেদ ছিল। বয়স্ক লোকেরা তো সকলেই ইহার বিরোধী ছিলেন। শেষে ইহাই স্থির হইল যে সম্মেলন কোনও প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকিবে না, তা সে আন্দোলন জাতীয়তাবাদী, রাজভক্তিবাদী কি অন্য যে প্রকারেরই হউক না কেন। এখন বুঝিতে পারিতেছি, ঐরূপ স্থির করিয়া আমরা বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছিলাম। এই সময় বিহার বাংলারই অন্তর্গত ছিল। প্রদেশ স্বতন্ত্র হয় নাই। শিক্ষার দিক দিয়া বিহার অনেক পিছনে পড়িয়াছিল। সাধারণের হিতে জীবনযাপন তো না থাকার মধ্যেই। বিশেষত ছাত্রেরা বাহিরের কোনও খবরই রাখিত না। অল্প লোকই কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। এপর্যন্ত বিহারের কোনও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও ছিল না, না ছিল বিহারের স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটি, না ছিল বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস। ইহাই হইল প্রথম প্রতিষ্ঠান, যাহাতে সমস্ত বিহারের অধিবাসী, হউক না কেন তাহারা কিশোরবয়স্ক ছাত্র, স্বতন্ত্রভাবে একত্র হইয়া নিজেদের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে বসিল। এই অবস্থায় আমরা সামলাইয়া না চলিলে হয়তো এই প্রতিষ্ঠান হইতেই পারিত না।

তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে আর কোথাও ছাত্রসম্মেলন হয় নাই। একদিক হইতে আমাদের এক নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে, যাহার কোনও আদর্শ সামনে নাই; তাহার উপর আবার দ্বিতীয় সমস্যা, যাহা লইয়া মতান্তর ছিল, এই সম্মেলন শুধু বিহারী ছাত্রদেরই প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকিবে, না ইহাতে বাঙালী ছাত্রেরাও যোগ দিতে পারিবে। এ বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ ছিল। আমার মনে আছে, অনেক বৎসর ধরিয়া বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব আসিত যে বিহারী ছাত্রসম্মেলনে বাঙালীকেও গ্রহণ

করা হউক, কিন্তু উহা কখনও গৃহীত হয় নাই। সম্মেলনের নাম তো প্রথম হইতেই বিহারী-ছাত্র-সম্মেলন। কয়েক বৎসরের পর নিয়মাবলীতে জুড়িয়া দেওয়া হইল যে বিহারী ছাত্র অর্থে বুঝিতে হইবে যে সব ছাত্র বিহারে শিক্ষা পায়। আমরা যাহারা কলিকাতার ছাত্র ছিলাম, প্রথম হইতেই ইহার অনুকূলে ছিলাম; কিন্তু অন্য সকলে ইহার বিরোধী ছিল।

ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান খুব ভাল হইয়া দাঁড়াইল। প্রায় সমস্ত শহরেই ইহার শাখা স্থাপিত হইল। কলিকাতায় বিহারী ক্লাবে তো ইহার শাখা হইয়াই গিয়াছিল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে সেখানকার বিহারী ছাত্রেরাও এক শাখা স্থাপিত করিল। সব শাখাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে সভা হইত, তাহাতে ছাত্রেরা নানা বিষয়ে লেখা পড়িত, বক্তৃতা করিত, খেলা-ধূলায় যোগ দিত। এইজন্য যেখানে সেখানে ক্লাব গড়িয়া উঠিল। বাৎসরিক সম্মেলনে প্রবন্ধ বক্তৃতার প্রতিযোগিতা হইত। প্রবন্ধ রচনায়, বক্তৃতা করায়, খেলা-ধূলায় যে সবচেয়ে ভাল হইত, তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইত। কলেজের ছেলেদের স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতা হইত, স্কুলের ছাত্র ও মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের লেখা ও বক্তৃতা ছাড়া সেলাই-ফোঁড়াই-এর উৎসাহ দিবার জন্য স্বতন্ত্র পুরস্কার দেওয়া হইত। এইভাবে সারা বৎসর কাজ চলিত। সম্মেলন হইত পূজার ছুটিতে, বিহারের কোনও না কোনও শহরে। এই বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিতেন বিহার ও বিহারের বাহিরের অনেক বড় বড় লোক; যেমন, বিহারের মিঃ শরফুদ্দিন, মিঃ হাসান ইমাম, ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, বাবু পরমেশ্বরলাল, বাবু দীপনারায়ণ সিংহ, বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ প্রভৃতি; আর বাহিরের মধ্যে শ্রীমতী এনি বেসান্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ এণ্ড্রুস প্রভৃতি।

এই সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে, আর ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হয় তখন পর্যন্ত প্রতি বৎসর ইহার বাৎসরিক অধিবেশন হইতে থাকে। তাহার পর একটু ঢিলা পড়িয়া যায়, কারণ ইহার উৎসাহী কর্মীরা সকলেই সেই মহা-আন্দোলনে লাগিয়া গেল। তাহার পর আবার ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পুরাতন সেই জীবন ও তেজ ইহাতে আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না। এখন যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহা এক প্রকার নূতন প্রতিষ্ঠান। তাহার কার্যকর্তা হয়তো এখন প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অবগতই নহেন। যত দিন ইহা সক্রিয় ছিল, ততদিন অত্যন্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত সমস্ত প্রদেশের ছাত্র ইহাতে যোগদান করিত। ইহার সাহায্যে ছাত্রেরা প্রতিষ্ঠান চালাইতে শিখিল। অনেকে বক্তৃতা দিতে শিখিল। ঐ পনেরো বৎসরে বিহারে যত সবল ও উৎসাহী যুবকের আবির্ভাব হয় তাহারা সকলে ইহার দ্বারাই

অনুপ্রাণিত ছিল। সকলে নিজের নিজের স্বার্থ ছাড়া দেশবিদেশের কিছু কিছু কথা শিখিয়াছিল, আর দেশের জন্য কমবেশি কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকারের প্রবৃত্তিও জন্মিয়াছিল। তাহারা যাহা কিছু শিখিয়াছিল বা পাইয়াছিল, তাহাতে দেশের লাভই হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী যখন বিহারে আসেন, তখন এই ছাত্রসম্মেলনের ভূতপূর্ব কার্যকর্তাই তাঁহার সঙ্গী হন এবং অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহারা যতদূর আগাইয়া যান, তাহা ইহারই ফলে। যাঁহারা ছাত্রসম্মেলনে দীক্ষা পাইয়াছিলেন আজ তাঁহারাই প্রায় প্রদেশের নেতৃত্বভার বহন করিতেছেন।

অসহযোগ আন্দোলন ছাত্রদের নিকট হইতে খুব বেশিরকম ত্যাগ চাহিয়াছিল। ছাত্রসম্মেলন সেজন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রস্তাব তো পাস হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অল্প ছাত্রই তাহাতে টিঁকিয়া থাকিতে পারিল। যাহারা টিঁকিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই ছিল সম্মেলনের কার্যকর্তা। আর যাঁহারা উকিলশ্রেণী হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও বেশির ভাগ সম্মেলনের কার্যকর্তাদের মধ্যে ছিলেন। এইভাবে ১৯২০ পর্যন্ত নিজের কাজ পুরা দমে চালাইয়া প্রতিষ্ঠান জীবন্মৃত ভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। ইহা একভাবে নিজের কাজ শেষ করিয়া দিয়াছিল: সমস্ত প্রদেশে নব জাগরণ, নব জীবন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, আর ভবিষ্যতের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করিয়া বীজও বপন করিয়া দিয়াছিল, যাহার ফল অসহ-যোগ আন্দোলনে পাওয়া গেল, আজ পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে পাওয়া যাইতেছে।

১৯০৬-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস কলিকাতায় হইবে কথা ছিল। আমি তো কংগ্রেসের খবর কিছু পূর্ব হইতেই পড়িতাম, কিন্তু এ পর্যন্ত কংগ্রেস দেখিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ জোটে নাই। ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে যখন কাশীতে কংগ্রেস হয়, তখন আমি বি. এ. পরীক্ষার গোলমালে ছিলাম, নিকটে হইলেও সেখানে যাইতে পারিলাম না। ১৯০৬-এর কংগ্রেসে আগেভাগে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দিলাম। কংগ্রেসের অধিবেশন হইল খুব উৎসাহের সঙ্গে। গরম দল ও নরম দলের আবির্ভাব হইয়াছিল। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতিকে গরম দলের নেতা বলিয়া লোকে মনে করিত। নরম দলের নেতা ছিলেন স্যর ফিরোজশাহ মেহতা, গোখলে প্রভৃতি। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মাঝা-মাঝি ছিলেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মিটাইবার বা কম করিবার জন্য বিলাত হইতে দাদাভাই নওরোজিকে ডাকাইয়া সভাপতি করা হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশে আমার ডিউটি মিলিয়াছিল কংগ্রেস প্যান্ডালে। ফলে আমি বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে সবকিছু আলোচনা শুনিতে পাইয়াছিলাম

কংগ্রেস প্যাণ্ডালে অধিবেশনের সময় প্রথম দিন কিছু দূরে আমার স্থান হইয়াছিল, তাই সভাপতির অভিভাষণ শুনিতে পারি নাই। আমি দেখিলাম অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবক নিজের জায়গা ছাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমি এরূপ করা উচিত মনে করিলাম না। নিজের নির্দিষ্ট স্থানেই স্থির রহিলাম। সরোজিনী দেবী, মালব্যজী ও মিঃ জিন্নার বক্তৃতা সর্বপ্রথম এই কংগ্রেসেই শুনি। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রদর্শনীও খুব ভাল হইয়াছিল। অধিবেশন দেখিয়া কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু কয়েক বৎসর পর্যন্ত আমি ইহাতে যথারীতি যোগ দিতে পারি নাই। কংগ্রেসের অধিবেশন যখন আবার ১৯১১ সালে কলিকাতায় হয়, তখন এই সুযোগ পাই, সেই হইতে আজ পর্যন্ত নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভ্য হইয়া আছি, অল্পবিস্তর কংগ্রেসের কাজ করিয়া যাইতেছি।

তখনকার দিনে কংগ্রেসের সংগঠন ঢিলে-ঢালা ছিল। বিহারের অতি সামান্য লোকই ইহার সহিত যোগ রাখিত। তাহাও বেশির ভাগ উকিল-শ্রেণী হইতেই। প্রাদেশিক এক কংগ্রেস কমিটি ১৯০৭ কি ১৯০৮ সালে পৃথক করিয়া করা হয়, তাহা ছিল বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় প্রদেশ তো ১৯১৮ সালে পৃথক হইল। কিন্তু এই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বড় একটা নির্দিষ্টরূপে গড়িয়া ওঠে নাই। যাহারা প্রতিনিধি হইত তাহারাও কোনও নির্দিষ্ট ধরনে নির্বাচিত হয় নাই। একটা অধিবেশন হইত, তাহাতে কোনও কোনও লোক নির্বাচিত হইত। অধিবেশনের সময়ে পেঁছাইলে তো কোনও কথাই নাই, না পেঁছাইতে পারিলে যাহারা পেঁছিত, মন্ত্রী তাহাদের নামেই প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট দিয়া দিতেন। এইভাবে বিহার কখনও ফাঁক যায় নাই, প্রতি বৎসর অধিবেশনে কিছু কিছু লোক অবশ্যই যোগদান করিত। যেসব প্রতিনিধি যাইত, তখনকার নিয়মমত তাহাদিগকে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত করা হইত। এই ভাবেই আমি ১৯১১ সালে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হই; কংগ্রেসের বিশেষ কোনও সেবা করিয়া নয়। ঐ বৎসর আমি সর্বপ্রথম প্রতিনিধি হইয়াছিলাম। কিন্তু ছাত্র-সম্মেলনের জন্য ও ইউনিভারসিটির পরীক্ষায় ভাল ফল হইয়াছিল বলিয়া বিহারের সকলেই আমাকে জানিত। সকলে এক ধাক্কাতেই আমাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পেঁছাইয়া দিল। ১৯২০ সালের পর এসব ব্যাপারের অনেক কিছু বদলাইয়া গেল। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

ডন সোসাইটি ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব আমার উপর এই হইয়াছিল যে আমার মনে হইল, দেশের জন্য একটা কিছু করিতে হইবে। দাদার সঙ্গে থাকার ফলেও এমন কিছু একটা প্রভাব হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই যে এই ইচ্ছা কি প্রকারে হইবে; বিশেষ কি সেবা করিব, ও তাহার জন্য কি করিতে হইবে, ইহাও পরিষ্কার বুঝিতে পারি নাই। এটা শুধু একটা ইচ্ছা মাত্র ছিল, তাহা কখনও কখনও উঠিত, আবার নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। ছাত্র-সম্মেলন গঠনে একটা পথ দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু উহাও স্থায়ী হইবে, না তাহার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসিয়া যাইবে, তাহা না পারিয়াছিলাম বুঝিতে, না পারিয়াছিলাম বলিতে। তবে একটা কথা স্থির হইয়া গিয়াছিল—সরকারি চাকুরি করা চলিবে না। এইজন্য বি. এ. পাস করিবার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্য দরখাস্ত দিই নাই। দাদাও চান নাই যে দিই। বাবার ইচ্ছা ছিল যে ওকালতি করি। দুর্ভাগ্যবশত দাদা এম. এ. পাস করিতে পারেন নাই; বাড়ি হইতে বেশি টাকা খরচ লইয়া কলিকাতায় কি আর কোথাও এখন থাকিতে চাহিতেন না, ডুমরাও রাজস্কুলে শিক্ষকের কাজ করিতে লাগিলেন। আমি ডেপুটিগিরির খেয়াল ছাড়িয়া কলিকাতায় এম. এ. ও বি. এল. পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

ছাত্রসম্মেলন শেষ হইয়া যাইবার পর আমার মাথায় এক রোখ চাপিল। কি করিয়া এরূপ মত হইল, কাহার উৎসাহে হইল, বলিতে পারি না; কিন্তু ধারণা জন্মিল যে এখন কোনও প্রকারে বিলাতে গিয়া আই. সি. এস. পরীক্ষা পাস করিতে হইবে। সরকারি চাকুরির ইচ্ছা ছিল না, তাহা হইলেও ইহা করণীয় বলিয়া কেমন করিয়া যে মনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল তাহা জানি না। দাদা ও এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছিলেন। বিলাতের খরচ কুলাইবার মত টাকা বাড়ি হইতে পাওয়া যাইতে পারে না, তাই অন্য কোনও ব্যবস্থা চাই। মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ আমার এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে জানিয়া খুশি হইলেন এবং ব্রজকিশোরবাবু তো এজন্য সর্বদা তৈয়ারই ছিলেন। ডক্টর গণেশপ্রসাদের ভোজের পর অম্বিকাচরণবাবুকে তিনি জাপানে যাইবার জন্য খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমার পক্ষে বিলাত যাওয়া একপ্রকার অনিবার্য বলিয়াই তিনি মনে করিলেন, অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় তিনি লাগিয়া গেলেন। মুন্সী ঈশ্বর-শরণও ইহাতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। আরা হইতে রায় বাহাদুর

হরিহরপ্রসাদ কিছু টাকা দিলেন। মনে করা হইল যে, আমার চলিয়া যাওয়ার পর ইঁহাদের সাহায্যে, অথবা বাড়ি হইতে কোনও প্রকারে, দাদা আরও টাকা পাঠাইতে থাকিবেন। বাবা ও মা ইহা অনুমোদন করিবেন না, এবং বাড়িতে খুব গোলমাল হইবে, আমাদের সে ভয় ছিল। আমি এই প্রসঙ্গে পাটনা ও এলাহাবাদেও গিয়াছিলাম। দাদাও সঙ্গে ছিলেন। বাবার কাছ হইতে একথা গোপন রাখা হইয়াছিল, কারণ তাঁহার অনুমতি পাইবার কোনও আশা ছিল না। আমার যাওয়ার দিন পর্যন্ত স্থির করিলাম। কলিকাতায় কাপড়-চোপড়ও তৈয়ারী করাইয়া লইলাম।

এ পর্যন্ত আমি ইংরেজী ধরনের কোনও পোশাক পরি নাই। কিন্তু বিলাতে অন্য কাপড়-চোপড় যে পরা চলিবে না, সে ধারণা ছিল। তাই ইংরেজী ধরনের পোশাক এক ইংরেজী দোকানেই তৈরি করিতে দিয়াছিলাম। ১৮৯৮-এর পর হইতে আজ পর্যন্ত এই একবারই আমি বিদেশী কাপড় কিনিলাম। পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দেওয়া হইল। আয়োজন চলিতেছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এ সব চেষ্টা সফল হইবে, যাওয়ার পূর্বে বাবা খবর পাইবেন না, বাড়ির দিক হইতে কোনও বাধা আসিবে না। এই ষড়যন্ত্রে কলেজসঙ্গীদের মধ্যে আরও তিন চার জন ছিল, যাহাদের মধ্যে একজন ছিল আমার বিহারী বন্ধু শুকদেবপ্রসাদ বর্মা, আর সকলে ছিল বাঙ্গালী। আমার আপনার লোকের মধ্যে ছিলেন দাদা, ব্রজকিশোরবাবু, মিঃ সিংহ, মুন্সী ঈশ্বরশরণ ও রায় বাহাদুর হরিহরপ্রসাদ সিংহ।

দাদা ও ব্রজকিশোরবাবুর সঙ্গে আমি এলাহাবাদ গেলাম। মুন্সী ঈশ্বরশরণের বাড়িতে উঠিলাম। সেখানে আমার শ্বশুরবাড়ির ছেলেরা কলেজে পড়িত। তাহাদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে দেখা তো হয় নাই, কিন্তু কি ভাবে যেন তাহারা খবরটা পাইয়া গেল। তাহারা খুঁজিতে খুঁজিতে মুন্সী ঈশ্বরশরণের বাড়ি আসিয়া পেঁীছিল। সেখানে লোকেরা বলিয়া দিল যে আমি সেখানে নাই। তাহারা বাড়িতে তার করিয়া দিল যে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া বিদেশে যাইতেছি; আর সেদিন প্রয়াগে আছি। তার পাইয়াই বাবা ও বাড়ির সকলে খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন। বাবার শরীর অসুস্থ ছিল, তাই তিনি আসিতে পারিলেন না; মা ও দিদি সোজা এলাহাবাদ আসিলেন। তাঁহাদের এই ভুল ধারণা ছিল যে আমি বুঝি এলাহাবাদ হইতেই চলিয়া যাইব। আমি তো এখন পরামর্শ করিতে ও টাকার জোগাড়ে গিয়াছিলাম, সেখানে এক দিন থাকিয়া সোজা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

মা যখন এলাহাবাদে পেঁীছিলেন তখন আমি সেখানে ছিলাম না। মুন্সী ঈশ্বরশরণের বাড়ি খোঁজ করিবার পর তিনি খবর পাইলেন যে আমি

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি কলিকাতায় আছি বলিয়া এইসব কথা কিছু জানিতে পারি নাই। সেখানে তার গেল যে বাবা অসুস্থ হইয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাড়ি আসিয়া সব কথা জানিতে পারিলাম। তিনি সত্য সত্যই অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত রোগ তেমন কিছু প্রবল হয় নাই; অবশ্যই দুঃখিত হইয়াছিলেন। ঘরে কান্না-কাটি পড়িয়া গেল। দাদাও আসিলেন। বাবা তাঁহার উপর খুব রাগ করিলেন যে তিনি আমাকে বিদেশে পাঠাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। আমি বাড়ি পৌঁছিতেই সকলের শোক উথলিয়া উঠিল। খুব জোর কান্না-কাটি চলিল। আমার যাওয়ার কথা সকলে সোজা বারণ করিয়া দিল, বলিল, আমি বিলাত গেলে তাঁহারা বাঁচিবেন না। যে সব কথাবার্তা হইয়াছিল আমি সব খুলিয়া বলিলাম। কথাও দিলাম যে যাইব না। আমার কথায় বাবার যখন বিশ্বাস হইল, তখন তিনি আমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন।

কলিকাতায় যখন সব ব্যবস্থা একপ্রকার হইয়া গিয়াছিল, তখনকার একটি সামান্য ঘটনার এখানে উল্লেখ করিতেছি। আমার যে-সব সঙ্গী বিলাতযাত্রার খবর রাখিত তাহারা এই বিলাতযাত্রার কল্পনায় আমার সাথী ছিল। সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে তাহারাও যায়, কিন্তু তাহাদের সুযোগ সুবিধা তখনও জোটে নাই। আমরা সকলে ইহাই ভাবিতাম, আমার যাওয়ার পরে তাহারাও কোন-না-কোন উপায়ে কিছু দিন পরে বিলাত যাওয়ার চেষ্টা করিবে। একদিন ল কলেজ হইতে বাহির হইয়া একজন সঙ্গীর মত হইল, চল, এক জ্যোতিষীর সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া লই। একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে তাহার জানাশোনাও ছিল। আমরা সকলে তাঁহার বাড়ি গেলাম। জ্যোতিষী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বয়স হইবে প্রায় ষাট বৎসর। তিনি বাড়িতে বসিয়াছিলেন। আমাদের যাওয়ার অল্প পরেই তিনি বলিলেন: বুঝেছি, তোমরা কেন এসেছ। তাহার পর আমাদের মধ্যে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিল। প্রশ্ন তো একটাই—বিলাত যাত্রা হবে তো? প্রশ্ন আমরা মুখে বলি নাই, মনে মনে রাখিয়াছিলাম। আমাকে তিনি উত্তর করিলেন: এখন নয়, অনেক দিন পরে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। শুকদেবকে তিনি উত্তর করিলেন: তোমার ইচ্ছা এখন খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ হবে। তৃতীয় বন্ধুকে বলিলেন: তোমার ইচ্ছাও কিছু দিন পরে পূর্ণ হবে। চতুর্থ বন্ধুকে বলিলেন: তোমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।

আমরা একটা টাকা দিলাম। প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিলাম। সমস্ত রাস্তা এই লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে আসিলাম যে এই বুড়া তো কিছুই জানে না। আমার তো সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে তবু আমার

যাওয়া হইবে না, আর শুকদেব, যাহার যাওয়ার কোনও কথাই হয় নাই, সে খুব তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই চলিয়া যাইবে—এ কেমন করিয়া হয়! আমরা হাসিতে হাসিতে-ফুর্তি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পরই বাড়ি হইতে তার আসিয়া গেল। আমার যাওয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। যখন বাড়ি হইতে ফিরিলাম আর 'যাইব না' এই মীমাংসাই হইয়া গেল, তখন শুকদেবের যাওয়ার কথা উঠিল। আমার কাপড় ও টাকাকড়ি লইয়া সে একদিন চলিয়াই গেল! কাপড় ও টাকা এত গোপনভাবে হস্টেলে রাখিয়া গিয়াছিলাম যে আমাদের কোনও সংগীও তাহার খবরটুকু জানিত না। শুকদেবের বেলাতেও ভয় ছিল যে তাহার বাবাও তাহার যাওয়া এই ভাবে বন্ধ করিয়া না দেন। এইজন্য তাহা গোপন রাখা হইল। তাহার কোথাও যাইবার ছিল না, কাহারও সংগে দেখা করিবার ছিল না। এইজন্য তাহার কথা একেবারে গোপনে থাকিল। যাওয়ার দিন বন্ধুদের বলিল : বাড়ি যাচ্ছি। আমরা দুই তিন জন বন্ধু স্টেশন পর্যন্ত আসিলাম। তাহাকে রেলে চড়াইয়া বোম্বাইয়ে রওনা করিয়া দিলাম। যতক্ষণ বোম্বাই হইতে জাহাজ রওনা হইবার খবর না আসিল ততক্ষণ আমাদের মনে আশংকা রহিয়াই গেল যে হয়তো উহাকেও ধরিয়া ফিরাইয়া আনা হইবে, কিন্তু জাহাজ চলিয়া যাওয়ার পরেই তাহার বাড়ির লোকেরা খবর পাইল। এমন কি, কলিকাতাবাসী নিকট-আত্মীয়েরাও—যাহাদের সংগে তাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল—খবর পায় নাই।

ছাত্রজীবনের অবসান

শুকদেবকে রওনা করিয়া আমি তো কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারি কাজে আটক হইয়া রহিলাম ও কংগ্রেসের অধিবেশনের পর আবার পড়িতে লাগিলাম। বাবার অসুখ বাড়িয়া চলিল। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। খবর পাইয়া আমি কলিকাতা হইতে ও দাদা ডুমরাঁও হইতে দুইজনে জীরাদেই গেলাম। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার আয়ু শেষ হইয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্বে আমাদের সকলের সংগে তাঁহার দেখা করানো হইল। তখন পর্যন্ত দাদার দুই মেয়ে ও জনার্দন নামে এক ছেলের জন্ম হইয়াছিল। আমার ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্মও সেই বৎসরই হয়। নাতিদের মুখ দেখিয়া তিনি খুব খুশি হইয়াছিলেন। রোগের বৃদ্ধি হইলে সকলকে একত্র করিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বাবার মৃত্যুতে বাড়িতে বিশৃঙ্খলা হইল, আমাদের সকলের দুঃখ হইল; কিন্তু এক বিষয়ে আমার মন খুশিও হইল। বিলাত না গিয়া ভালই করিয়াছি; যদি যাইতাম ও তাঁহার এভাবে মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমার কত কষ্ট যে হইত তাহা বলিতে পারি না। আবার কলিকাতায় গেলাম। দাদা ডুমরাঁওয়ে গেলেন। দাদা তো কিছুকাল হইতেই বাড়ির সব ব্যাপার দেখাশোনা করিতেন। এখন সমস্ত ভার তাঁহার উপরই আসিয়া পড়িল। যখন-তখন ডুমরাঁও হইতে আসিয়া তিনি বাড়িঘর দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন। আমার খরচ প্রভৃতির ব্যবস্থাও তিনিই করিতেন। তাঁহার পড়ার সময় সদাসর্বদা খরচের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। বাড়ি হইতে খরচ যাইতে দেরি হইত। কিন্তু বাবা বাঁচিয়া থাকিতে, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও, দাদা কখনও আমায় খরচের ভাবনা ভাবিতে দেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমি যখন পড়াশোনায় ভাল ও সমস্ত পরীক্ষা এত ভাল করিয়া পাস করিয়াছি, তখন আমাকে শুধু পড়াতেই মন দিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে, কোনও মতে অন্য চিন্তা আসিতে দেওয়া হইবে না।

আমি বরাবর যথেষ্ট বৃত্তি পাইয়াছি। বাবা ও দাদা খরচের মধ্যে তাহা হিসাব করিতেন না। খরচের টাকা তো সর্বদা আলাদাই পাঠাইতেন। সেই টাকা হইতে আমি কলেজের মাহিনা দিতাম। বাকি টাকা বই কিনিতেই খরচ হইয়া যাইত। বি. এ. পাস করিবার পর দুইটি বৃত্তি পাইয়াছিলাম। একটি হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকার, তাহা প্রতি মাসে পাইতাম। ইহা তো আমি খরচ করিয়া যাইতাম। দ্বিতীয় বৃত্তি মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া, তাহার শর্ত ছিল যে এম. এ. পাস করিবার পর একত্র হিসাব করিয়া পাওয়া যাইবে। এম. এ. পাস করিবার পর যখন একসঙ্গে ৪৮০৲ পাইলাম, তখন বিলাত যাত্রার জন্য যাহা কিছু কর্জ করিয়াছিলাম, তাহা শোধ করিয়া দিলাম।

পূর্বে বলিয়াছি, এফ. এ. পাস করিবার পরই পরীক্ষার বিষয়ে কেমন একটা উদাসীন ভাব আসিয়া গিয়াছিল। বি. এ.-তে কেমন করিয়া জানি না আবার প্রথম হইয়া গেলাম। এম. এ.-র সময়ে এই উদাসীন ভাব আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। এই বৎসর বিলাত যাত্রার জন্য ও পিতার মৃত্যুর জন্য অন্য কাজে সময় গেল। মনও বিচলিত ছিল। বাবা মারা গেলেন ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাসে। পরীক্ষা হইবার কথা ছিল তাহার পরের নভেম্বর কি ডিসেম্বরে। গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছুকালের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে কারসিয়ং গেলাম। সেখানে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এম. এ. পরীক্ষায় আমার স্থান প্রথম হয় নাই। অনেক বন্ধু আমার উপরে ছিলেন। আমার এ ব্যাপারে মোটেই দুঃখ হয় নাই। কারণ

আমি কোনও আশাও করি নাই, বিশেষ কোন চেষ্টাও করি নাই।

ইহার পর প্রশ্ন হইল, কি করা যায়। পরীক্ষা দিয়া আমি দাদার নিকট ডুমরাঁও-এ চলিয়া গেলাম। কিছুদিন সেখানেই কাটিল। ওকালতি পরীক্ষা দিব, কি দিব না, ভাবিতে লাগিলাম। সেদিকে যাইতে মন চাহিতেছিল না। ইহাও অনুভব করিতে লাগিলাম, আমি ওকালতি করিতে পারিব না। নিজের শক্তিতে কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের মত হইয়া গিয়াছিল। সরকারি চাকরি করিব না বলিয়া তো প্রথমেই স্থির করিয়াছিলাম।

ইহারই মধ্যে বাবু বৈদ্যনাথনারায়ণ সিংহ নামে এক বন্ধু লিখিলেন যে আমি যদি মজঃফরপুর কলেজে প্রফেসর হইয়া যাই তবে খুব ভাল হয়। তিনি ঐ কলেজে প্রফেসরি করিতেছিলেন। তিনি বলায় আমি দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলাম। আমার নিয়োগ হইয়া গেল। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে কলেজ খুলিলে আমি সেখানে চলিয়া গেলাম। ঐ কাজে প্রাণও সাড়া দিয়াছিল। ওখানকার লোকদের সঙ্গে জানাশোনাও হইয়া গেল। কিন্তু দাদা ইহাতে খুশি হইলেন না। ধীরে ধীরে কলেজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া যাইতেছিল। শেষে স্থির হইল যে, আমি পুনরায় ওকালতির জন্য তৈরি হইব। কলেজের পড়া তো আমি শেষ করিয়া লইয়াছিলাম; কিন্তু পরীক্ষা দিই নাই। দাদার মত হইল যে আমি আবার কলিকাতায় যাই, পরীক্ষা দিই এবং ওকালতি শুরু করি।

এইভাবে ছাত্রজীবন শেষ হইল। সংসারে প্রবেশ করিবার সময় আসিয়া পড়িল। যখন সেদিনের কথা মনে পড়ে তখন বোধ হয় যেন উহা সুখের সময় ছিল। কখনও কখনও দুঃখ হয় যে সেই দিনগুলির যত সদ্ব্যবহার করিতে পারিতাম তাহা করি নাই। দাদা পথপ্রদর্শক ছিলেন, এই সুবিধা তো পাইয়াছিলাম। অন্তরে যত সুচিন্তা বা সৎ প্রবৃত্তি উঠিত, তাহার বীজ দাদাই বপন করিয়াছিলেন। পড়িবার সময় আমার কোনও কষ্ট না হয়, দাদার সর্বদা সে চেষ্টা ছিল। বাড়িতে টাকা পয়সার যে কোনও টানাটানি আছে তাহা দাদা কখনও বুঝিতে দেন নাই। কলিকাতায় ও তাহার পূর্বে ছাপরায় আমার সঙ্গীদের সহিত সর্বদা ভালবাসা ছিল। যতদূর মনে পড়ে, কাহারও সঙ্গে কোনও প্রকার খিটিমিটিই লাগে নাই, ঝগড়ার তো কথাই ওঠে না। বরং সকলের সঙ্গে ব্যবহারে ভালবাসাই প্রকাশ পাইত। অল্প কয়েকজনের সঙ্গে তো খুব ঘনিষ্ঠতাই হইয়াছিল, তাহা সর্বদা স্থির বা অক্ষুণ্ণ ভাবে ছিল। পড়িবার সময় প্রতিযোগিতা ছিল যথেষ্ট, তবু কখনও কেহ আমার সঙ্গে শঠতা করে নাই, চালাকি করে নাই, কখনও কাহারও সঙ্গে মনান্তর হয় নাই। যদি কোথাও কাহারও

কোনও অসুবিধা বা বাধা সহ্য করিতে হইত তাহা হইলে আমরা সর্বদা একে অন্যের সাহায্য করিতাম; এমন কি, যে-সঙ্গীরা আমাদের প্রতিযোগী হইত, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া পরীক্ষার জন্য তৈরি হইতাম। আমি যখন এফ. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হইতেছিলাম, তখন আমাদের যে-বন্ধুটি আমাদের বৎসর এন্ট্রান্সে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন, তিনি ও আমি একসঙ্গে পরীক্ষার জন্য তৈরি হই। এইভাবে অন্য পরীক্ষাতেও সকলে মিলিয়া মিশিয়া পড়িতে থাকি।

কলিকাতায় ও ইডেন হিন্দু হস্টেলে থাকা আমার পক্ষে খুব লাভের হইয়াছিল। কলিকাতায় গিয়াই আমার চোখ খুলিল। যদি সেখানে না যাইতাম তো কি হইত—একথা ভাবিয়া কোনও ফল নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আর কোথাও গেলে আমার এতখানি লাভ হইত না। ইডেন হিন্দু হস্টেলে থাকিয়া বাঙ্গালী সঙ্গীদের মধ্যে মিশিবার যেমন সুযোগ পাইয়াছিলাম ঐরূপ অন্য কোথাও থাকিলে পাইতাম না হয়তো। বাঙ্গালী সঙ্গীদের স্মৃতি অত্যন্ত সুখকর। আমার কাহারও বিরুদ্ধে কোনও চিন্তা হয়ই নাই, আর তাহাদের মধ্যে কেহ আমার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে নাই। কখনও কেহ কটু কথাও বলে নাই। আমি স্বীকার করি যে তাহাদের সঙ্গে যে কয়দিন কাটিয়াছিল তাহা ছিল অত্যন্ত সুখের দিন, অতিশয় লাভের দিন। তাহাদের মধ্যে থাকিয়া বিনা চেষ্টায় আমি বাংলা বলিতে শিখিয়া ফেলিলাম। আজও সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া আমার বিস্তর বন্ধু আছেন। অনেক দিন পরে আমি যখন অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে পরিক্রমা করিতে যাই তখন যেখানেই গিয়াছি সেখানেই পুরানো পরিচয়ের বন্ধু কাহাকেও কাহাকেও পাইতাম, পুরাতন স্মৃতি অমনি জাগিয়া উঠিত।

আমি যখন কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট হই, তখন বিহারে আবার ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গালী-বিহারী প্রশ্ন উঠিল। তাহার পর কংগ্রেসে আমায় এমন কাজ করিতে হইল যাহা বাংলার কেহ কেহ পছন্দ করিল না। আমার উপর অনেক আক্রমণ হইল। কটুকাটব্য মন্তব্য করিল। গালাগালিও হইল যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু এখনও আমি ইহা অনুভব করি না যে, তাহাদের প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ আছে, কি তাহাদের প্রতি কখনও অন্য কোনও ধরনের চিন্তা মনে উঠিয়াছে। তাহা হইবেই বা কেমন করিয়া? এতদিনের সুন্দর শোভন সঙ্গ, প্রেমের আদান-প্রদান, পুরানো সুখস্মৃতি—মানুষ কি এসব ভুলিতে পারে? কর্তব্যের বশে যদি কখনও কাহারও প্রতি এমন আচরণ করিতেও হয় যাহা তাহার ভাল লাগে না, তাহা হইলেও আমি নিজের মনে যখন জিজ্ঞাসা করি তখন সর্বদা এই উত্তরই পাই যে আমি কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই। জানিয়া বুঝিয়া

অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কিছু করি নাই। যাহা হউক, এসব কথা তো লোকে ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু আমার হৃদয়পটে যে চিত্র বাল্যকালেই আঁকিয়াছি তাহা কখনও মুছিবে না। ওসব স্মৃতি কখনও বিলীন হইতে পারে না, আর বাংলাদেশে পনেরো বৎসরের জীবনে আমি যাহা পাইয়াছি আমি তাহা ভুলিতে পারি না।

কলিকাতায় অনেক বিহারীদের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আমি যখন কলিকাতায় পড়িতে যাই, তখন অল্পই বিহারী ছাত্র সেখানে পড়িত। আস্তে আস্তে তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। পরে তো তাহারা দলে দলে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। আমরা নিজেদের বিহারী ক্লাব গঠন করিয়াছিলাম। প্রত্যেক সপ্তাহে সেখানে সকলে একত্র হইতাম। জাতি-পাঁতির ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছিল যে হিন্দু হস্টেলে আমরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র উনন রাখিয়াছিলাম, যাহাতে বিহারী ব্রাহ্মণ রান্না করিত। যদিও আমি ডক্টর গণেশপ্রসাদের সঙ্গে ভোজে যোগ দিয়াছিলাম, তথাপি জাতির বন্ধনকে খুব স্বীকার করিতাম। তিনি তো ছিলেন আমার স্বজাতি, কায়স্থ; অন্য কোনও জাতির লোকের ছোঁয়া অন্ন, যাহা নিজের দেশে খাওয়া চলে না, তাহা সেখানে খাওয়া হয় নাই। এত দিন ওখানে ছিলাম, কিন্তু বাঙ্গালী মেসে ডাল, ভাত ইত্যাদি একদিনও খাই নাই।

বিহারী সঙ্গীদের অনেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা আজ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ছড়ানো, নিজের নিজের জায়গায় কিছু না কিছু কাজ করিতেছে। তাই যেখানেই যাই, কলিকাতার কোনও না কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ই। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে চম্পারন জেলার শিকারপুর গ্রামের শ্রীঅবধেশপ্রসাদ ও জগন্নাথপ্রসাদ, শাহাবাদের শ্রীশুকদেবপ্রসাদ বর্মা, ভাগলপুরের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ, রাঁচীর বদ্রীনাথ বর্মা, বলভদ্রপ্রসাদ জ্যোতিষী, ডক্টর সাধু সিংহ, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বটুকদেবপ্রসাদ বর্মা, বিন্ধ্যবাসিনীপ্রসাদ বর্মা প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ চলিয়া গিয়াছেন; কয়েকজন আজও রহিয়াছেন। অবধেশবাবুর বন্ধুতায় খুব সুফল ফলিয়াছিল, আর তাহাতে লাভ হইয়াছিল। পরে তাঁহার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধও হইয়া গিয়াছিল।

মজঃফরপুর কলেজে নয় দশ মাস কাজ করিবার পর ১৯০৯-এর মার্চ মাসে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গেলাম। সেকালে বি. এল.-এর দুইটি পরীক্ষা দিতে হইত। একটি পরীক্ষা আমি তাড়াতাড়ি পাস করিলাম, দ্বিতীয়টির জন্য তৈরি হওয়া বাকি ছিল। হাইকোর্টে ওকালতি করিতে গেলে কোনও উকিলের সঙ্গে দুই বৎসর ধরিয়া কাজ করিতে হইত। ছোটখাটো পরীক্ষাও পাস করিতে হইত, তাহাতে জজেরা স্বয়ং কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আমি যদি চাহিতাম তবে বি. এ. পাশ করিবার পর, কোনও উকিলের সেরেস্তায় নাম লেখাইয়া ১৯০৮ সালেই এই দুই বৎসর পূর্ণ করিতে পারিতাম। কিন্তু সে সময় এইদিকে মন ছিল না। এইজন্য যখন আমি ১৯০৯ সালে কলিকাতা গেলাম তখন আরও দুই বৎসর শিক্ষানবিশ হইয়া থাকিবার কথা। ইচ্ছা ছিল, কোনও ভাল উকিলের নিকট কাজ শিখি। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ শামসুল হুদার নিকট এক বন্ধুর সাহায্যে উপস্থিত হইলাম। ঐ সময়ে তাঁহার নিকটে দুইজন শিক্ষানবিশ ছিল, এবং নিয়মমত দুইজনই মাত্র থাকিতে পারিত। তিনি বলিলেন, জায়গা খালি হইলেই তোমাকে আমার আর্টিকেল-ক্লার্ক করিয়া রাখিব, ততদিন আমার কোনও বন্ধুর নিকটে তোমাকে রাখিয়া দিই। তিনি আমাকে জহাদুর রহিম জাহিদের নিকট রাখিয়া দিলেন। এই ভদ্রলোকটিও ভাল উকিল ছিলেন। কিছুদিন পরে ইনি বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসিলেন। পরে হাইকোর্টের জজও হইলেন। নামের সঙ্গে ইনি পরে 'সাহোবর্দী' জুড়িয়া দিয়াছিলেন, তাই জাস্টিস সাহোবর্দী নামেই ইনি প্রসিদ্ধ হইলেন।

আমি ভাবিলাম, যখন দুই বৎসর পর্যন্ত আমার অন্য কাজ কিছু নাই, তখন খুব পরিশ্রম করিয়া আইন ভালমত পড়িয়া লইব (প্রথমে আমি তো এই বিদ্যাকে খুব ভয়ই করিতাম), আর উকিলের কাছে কাজও শিখিয়া লইব। আমি দাদার উপর খরচের ভার দিতে চাহি নাই। তাই প্রথমটায় কিছুদিনের জন্য কলিকাতাতেই সিটি কলেজে প্রফেসরিও করিয়াছি; কিন্তু তাহাও অল্পদিনের জন্যই। পরে কয়েকজন ছাত্রকে বাড়িতে পড়াইতাম, তাহা হইতে সেখানকার খরচ চলিয়া যাইত। আমি একটি ছেলেকে পড়াইতাম, সে ছিল জাস্টিস দিগম্বর চ্যাটার্জির ছেলে। এইরূপে ওকালতি শুরু করিবার পূর্বেই, একজন জজের সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেল।

যখন শামসুল হুদা সাহেবের কাছে জায়গা খালি হইল, তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে লাগিলাম। আমি সে সময়টা ভালমতই কাজে লাগাইলাম। সাধারণত যাহারা এইভাবে নাম লেখাইত, তাহারা অতি সামান্যই কাজ করিত, শেষটায় দুই বৎসর কাটাইয়া 'দায়সারা' ভাবে পরীক্ষা পাশ করিয়া উকিল হইয়া যাইত। আমি সেরূপ করিলাম না। আমি রোজ সকালে শামসুল হুদা সাহেবের ঘরে হাজির হইতাম, এবং দশটা পর্যন্ত তাঁহার হাতের মকদ্দমার কাগজপত্র পড়িতাম। উহার উপর আমার নোট তৈরি করিতাম, তিনি যেমন বলিয়া দিতেন সেইভাবে। আইনের নজির ইত্যাদি পড়িয়া তাঁহার জন্য সমস্ত কিছু তৈয়ারি করিয়া দিতাম। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেখিয়া লইলেন যে আমি তাঁহার জন্য ভাল নোট তৈয়ার করিয়া দিতেছি, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ সাহায্য হইতেছে, জুনিয়র উকিলের আর বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে না।

আমি এক মেসে থাকিতাম, সে মেস তাঁহার বাড়ি হইতে অনেক দূরে। সেখানে যাইতে হইলে কিছু দূর পর্যন্ত ট্রামে যাইতে হইত। ট্রাম হইতে নামিয়া প্রায় এক মাইল ছিল হাঁটাপথ। তিনি নিজে খুব সকালে উঠিয়া কাগজপত্র পড়িতেন। আমি গিয়া পোঁছিতাম সাতটায়, আর দশটা পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতাম। তাহার পর ঐ ভাবেই নিজের মেসে আসিতাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বেলা একটায় হাইকোর্টে যাইতাম। সেখানে মকদ্দমার তর্ক শুনিতাম। বিশেষ করিয়া সেই সমস্ত মকদ্দমার দিকে মন যাইত বেশি, যাহাদের বিষয়ে আমি তাঁহাকে নোট তৈরি করিয়া দিতাম। সন্ধ্যাবেলায় হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া আবার আমাদের মেস হইতে প্রায় চার মাইল দূরে ভবানীপুরে গিয়া রাত্রে ছেলে পড়াইতাম, আর রাত ৯-১০টায় মেসে ফিরিয়া ঘুমাইতাম। এইভাবে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতাম। কাজও আমি ভাল করিয়া শিখিলাম। পরে শামসুল হুদা সাহেব বলিলেন : তোমার আসা-যাওয়ায় অনেক কষ্ট হয়, সময়ও যায়; তুমি আমার বাড়িতেই চলে এস, তোমার জন্য যে বন্দোবস্ত বল, করে দেব। তিনি থাকিবার জন্য একটি ঘর, রান্নার জন্য পৃথক এক ঘর, আমাকে দিলেন। আমি সেখানে বাস করিতে লাগিলাম। তখন তিনি রাত্রে এবং সকালেও (চারটা পাঁচটায় উঠিতেন, এবং প্রয়োজন বোধ হইলেই) আমাকে ডাকিয়া লইতেন। আমাকে রোজ সঙ্গে করিয়া নিজের গাড়িতে কাছারি লইয়া যাইতেন। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা এতই বাড়িয়া গেল যে আমাকে বাড়ির ছেলের মত মনে করিতে লাগিলেন।

আজকাল যখন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অতি উগ্র হইয়া দেখা দেয়, তখন সামান্য একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া দিলে ভাল হয়। শামসুল হুদা সাহেব প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। লোকে তাঁহাকে মুসলমান সমাজের এক-

জন নেতা বলিয়া মনে করিত, তিনি মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্টও হইয়াছিলেন। ইউনিভারসিটি-সেনেট ও লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সভ্যও ছিলেন। পরে তো বঙ্গের গভর্নর বাহাদুরের কার্যকরী সমিতির সভ্য হইলেন। হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হইয়া গেলেন। লেজিসলেটিভ কাউনসিলের প্রেসিডেণ্টও হইয়া গেলেন। 'স্যর' এই উপাধিও পাইলেন, তখন তিনি শুধু খাঁবাহাদুর ছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টে মক্কেল ও জজ সকলেই তাঁহাকে খুব খাতির করিতেন। তাঁহার হাতে মকদ্দমাও থাকিত বিস্তর। তাঁহার মনও ছিল ভারি সুন্দর। তিনি স্বভাবে ধার্মিক ছিলেন; মুসলমান ছাত্রদের কিছু বৃত্তিও দিতেন। কিছু কিছু ছাত্র শুধু খাওয়ার সময় আসিয়া তাঁহার বাড়িতে খাইয়া যাইত।

আমি তাঁহার বাড়িতে থাকিতাম। বকরিদের দিন আসিল। পাড়া ছিল মুসলমানদের, অধিকাংশ লোক ছিল মুসলমান। আমি ভাবিলাম, হয়তো এই উপলক্ষে তাঁহার নিজের বাড়িতে বা প্রতিবেশীর বাড়িতে গোহত্যা বা গোরুর কোরবানি হইবে। আমি ছিলাম সনাতনী হিন্দু, ভাবিলাম, এই উপলক্ষে দুই-চার দিন কোথাও সরিয়া পড়িলে ভাল হয়। আমি চুপ-চাপ, তাঁহাকেও কিছু না বলিয়া ওখান হইতে চলিয়া গেলাম। মেসে গিয়া বন্ধুদের সঙ্গে থাকিলাম। তিন চার-দিন পরে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলাম। আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম না। এইটুকুই বলিলাম যে দুই-তিন দিনের জন্য বন্ধুদের নিকটে গিয়াছিলাম।

তিনি বলিলেন : বুঝেছি। তুমি বকরিদের জন্য চলে গিয়েছিলে। তুমি হয়তো ভেবেছ, এখানে হবে গোরুর কোরবানি, এজন্য এখানে থাকা চলবে না। তুমি কি আমার সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার করলে না? তুমি মনে করলে, তোমার কি রকম মনে হবে সে বিষয়ে আমার চিন্তা নাই! তুমি তো তুমি, আমার বাড়ির অনেক চাকর হিন্দু। ফুলবাগিচার মালি হিন্দু, গোরুর চাকর হিন্দু; ওদের মনের দিকে কি আমি দেখি না? ওদের মনে কি ব্যথা লাগে না? তোমার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা করা। আমার নিজের বাড়ির হিন্দু চাকরদের কথা বিবেচনা করে, আমার বাড়িতে গোরুর কোরবানি হয় না।

আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তখনকার দিনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলিতেই ছিল। বাঙ্গালী মুসলমান এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিতেছিল। পূর্ববঙ্গে, শামসুল হুদা সাহেব যেখানকার অধিবাসী, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাও খুব হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। এসব সত্ত্বেও তাঁহার মনোভাব ছিল এই প্রকারের, আমার সঙ্গে ব্যবহার ছিল এই ধরনের!

ইহার মধ্যে আমি বি. এল. পরীক্ষাও পাশ করিয়া ফেলিলাম। আমি এদিকে কখনও মনই দিই নাই, কোনও রকমে শুধু পাশ করিয়াছি মাত্র। আমার শিক্ষানবিশির দুই বৎসর যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন তিনি বঙ্গদেশের গভর্নরের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য হইবেন, এই খবর আসিতে লাগিল। তিনিও এবিষয়ের খবর পাইলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, এখন তো অনেক দিন পর্যন্ত তিনি ওকালতি করিতে পারিবেন না, তাই আমি ওকালতি শুরু করিবার পর তাঁহার সাহায্য কিছু পাইব না। কিন্তু আমি ভাবিলাম, অনেক কাজ তো শিখিয়া লইয়াছি, আমি নিজেই সব করিয়া লইব।

১৯১১ সালের আগস্ট মাসে আমি ওকালতি শুরু করি। যেদিন নাম লিখিলাম, সেইদিন তিনি আমাকে এক মকদ্দমা দেওয়াইলেন। নিজে আমার সঙ্গে গিয়া জজদের সামনে বসিলেন ও আমাকে যুক্তি প্রদর্শন করিতে দিলেন। আমি হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করিবার পর কেবল কয়েকদিনের জন্য হাইকোর্ট খোলা ছিল। তাহার পর পড়িল দুর্গাপূজার লম্বা ছুটি। ছুটির আরম্ভেই আমি বিহার চলিয়া গেলাম। পূজনীয় মালব্যজী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তখন বিহার পরিভ্রমণ করিতেছেন; কিছুদিন ঐ কাজে লাগিয়া রহিলাম। যখন হাইকোর্ট খুলিলে আমি কলিকাতায় ফিরিলাম, তখন শামসুল হুদা সাহেবের নিয়োগের সংবাদ খুব প্রচারিত হইয়াছে। মক্কেলরাও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, এখন ইনি আর ওকালতি করিবেন না। আড়াই মাস কি তিন মাস ছুটির পর হাইকোর্ট যখন খোলে তখন এই তিন মাসের জমা অনেক মকদ্দমা নূতন করিয়া দায়ের হয়। শামসুল হুদা সাহেবের নিকট যে সব মকদ্দমা আসিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি তিনি আমার নামে করিয়া দিলেন। টাকা কম মিলুক কি মোটেই নাই মিলুক, কিন্তু তিনি বলিলেন : এখন তো আমি থাকিব না, এ মকদ্দমা সব তোমার হাতেই থাকবে। যদি ঠিকমত কাজ কর তা হলে মক্কেল তোমার কাছ থেকেই কাজ নিতে থাকবে। এই কথাটি শুধু তাঁহার স্নেহ দেখাইবার জন্যেই উল্লেখ করিলাম না, অন্য কারণেও একথা বলার প্রয়োজন ছিল।

কিছুদিন পরে এইসব মকদ্দমার মধ্যে একটি পেশ হইল। মক্কেল আমাকে আইনমত ফি দিয়া তো রাখে নাই, কিন্তু যেহেতু ওকালতনামায় আমারও দস্তখত ছিল, তাই তালিকায় আমার নামও উঠিল। অন্য একজন উকিলকে সে পরে রাখিয়া লইল। এইসব যত মকদ্দমায় শামসুল হুদা সাহেব আমার নামও লিখিয়া দিয়াছিলেন সেই সমস্ত পেশ হওয়ার সময় আমি তাঁহার কাগজপত্র খুব পড়িয়া লইতাম. আর আইন ইত্যাদি

দেখিয়া তৈয়ারি হইয়া যাইতাম। ঐ দিনও ঐভাবে তৈয়ারি হইয়া গেলাম। আইনের প্রশ্ন ঐ মকদ্দমায় অনেক উঠিল। আমার সিনিয়র উকিল অত খাটিয়াও ঠিক রকম উত্তর দিতে পারিলেন না। মকদ্দমা ছিল স্যর আশুতোষের এজলাসে। আমি উকিল সাহেবকে সাহায্য করিতেছিলাম, আর পেশ করিবার জন্য নজীরের পর নজীর তাঁহার হাতে দিয়া যাইতেছিলাম। স্যর আশুতোষ সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকেই প্রশ্ন করিলেন : এখানে আর কি নজীর আছে বলে দাও তো বই চেয়ে নিই। পরে এক সুন্দর রায় দিলেন, তাহা রিপোর্টে প্রকাশিত হইল।

এ ব্যাপার তো চুকিয়া গেল। আমি এই মকদ্দমার কথা ভুলিতেই বসিয়াছিলাম। দুই দিন পরে আর একজন উকিল, যাঁহার সঙ্গে সর্বদাই কাজ করিতাম ও যিনি ইউনিভারসিটির সিণ্ডিকেটের একজন সভ্য ছিলেন, তিনি আমাকে বলিলেন : তুমি ল কলেজে প্রফেসর হইতে রাজি আছ? আমার আশ্চর্য লাগিল, আমি এজন্য কাহাকেও কিছু বলি নাই। স্যর আশুতোষের কাছে উকিলদের দরবারের মত লাগিয়াই থাকিত, তিনি ছিলেন ভাইস-চ্যানসেলার, তাঁহার সঙ্গে আমি দেখাও করি নাই, কিছু বলিও নাই। আমি ইহাও জানিতাম না যে, আমার মত দুই বৎসরের উকিলেরও এই পদ পাওয়া যাইতে পারে। আমি আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : আমি একাজ কি করে পেতে পারি, আমি তো কারও সঙ্গে দেখাও করি নি, দরখাস্তও দিই নি। তাহাতে তিনি বলিলেন : কোনও মকদ্দমায় তুমি স্যর আশুতোষের এজলাসে কাজ করেছ, তাতে তিনি খুব খুশি হয়েছেন; তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। আমি সেই অনুসারে দেখা করিতে গেলাম ও দুই চার দিনের মধ্যে ল কলেজের অধ্যাপকপদ পাইলাম। কেস করিয়া টাকা বেশি পাইতাম না, কিন্তু পড়াইবার কাজে আইন খুব পড়িতে হইত, তাহাতে পুরাপুরি লাভ হইত। এইরূপে বিনা চেষ্টায় ও বিনা টাকার মকদ্দমায় আমার এই সম্মান লাভ হইল।

ওকালতি শুরু করিবার পূর্বে আর এক ঘটনার কথা এখানে লিখি। উপরে বলিয়াছি, আমি জাস্টিস দিগম্বর চ্যাটার্জির বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইতাম। তাঁহার সঙ্গে চেনা-পরিচয় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি জানিতেন যে আমি ইউনিভারসিটির পরীক্ষাগুলি ভাল করিয়া পাশ করিয়াছি, তাই ছেলেকে পড়াইবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি এখন ওকালতি শুরু করিব, তখন একদিন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার কোনও উকিল আত্মীয় আছে? আমি বলিলাম : কেউ নেই। সত্য কথা, আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় অনেকে

উকিল ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সংযুক্তপ্রদেশে, বালিয়া জেলায় ওকালতি করিতেছিলেন। বিহারে আমার কোনও আত্মীয় এই ব্যবসা করিতেন না। আমার এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন : একথা খুব ভাল। আমার আশ্চর্য লাগিল, কারণ আমার ধারণা ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহ উকিল থাকিলে সে প্রথমে খুব সাহায্য করে, আর তাহার নিকট মকদ্দমাও পাওয়া যায়; এইভাবে মকদ্দমা হাতে আসে।

আমি মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন : তুমি এটা নিজের ভাগ্য বলে জেনো যে, তোমার কোনও আত্মীয় উকিল নেই, বিশেষত বড় উকিল নেই। কেউ উকিল থাকলে হয়তো তার খাতিরে দু-চারটে মকদ্দমা তুমি পেয়ে যেতে; কিন্তু মক্কেল তোমাকে উকিল রাখতো না। সে এই কথাই ভাবতো যে, বড় উকিল সাহেবের খাতিরে একটা অকর্মণ্য লোককেও সে রেখেছে। তোমার ওপর তার কখনই বিশ্বাস হোত না, তোমার জন্যে তার মনের মধ্যেও কোনও স্থান থাকতো না। এইজন্য সেও নিশ্চয় আর একজন উকিল রাখতো। তুমিও মনে করতে, আর একজন তো ওকালতি করবেনই, তাই তোমার দিক থেকে বিশেষ কিছু তৈরি করতে না। এইভাবে তুমি কাজে ঢিল দিতে। তোমার ওকালতি করবারও কম সুযোগ মিলতো। যদি তুমি নিজে উন্নতি করে পরিশ্রম করে ভাল উকিলও হতে, আর ঐ মক্কেলই আসত, তাহলেও সে তোমাকে মনে করিয়ে দিত যে, গোড়াতে ঐ তো তোমাকে উকিল রেখে-ছিল। এইজন্য তোমারও সংকোচ হতো, আর তুমি তার কাছ থেকে টাকা নিতে পারতে না। বড়লোক মক্কেল তো এমনিধারাই হয়। হয়তো তোমার কাছে গরিব কেউ এসে হাজির হোল, তখন তুমি নিজের অভ্যাস-বশে তার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারলে না, কারণ তোমার কাছে তো ধনী মক্কেল এসেই থাকে, এবং তুমি সেজন্য গর্বও অনুভব কর—তা চাই সে টাকা দিক আর নাই দিক, চাই তুমি নিজে ভার নিয়ে তার মকদ্দমা চালাবার সুযোগ পাও আর নাই পাও। সাহায্য করার মত আত্মীয়-কুটুম্ব উকিল না থাকলে এই ধরনের কোনও মক্কেল তুমি পাবে না। তুমি লেখাপড়ায় ভাল, একথা জেনে গরিব মক্কেল তোমার কাছে আসবে, টাকা দেবে কম, কিন্তু তোমাকেই নিজের সর্বস্ব বলে মনে করবে, আর কেউ তার উকিল হবে না; তার মকদ্দমায় তোমাকেই সব কিছু করতে হবে। এইজন্য যতদূর হয় নিজেকে ভাল করে তৈরি করে নাও। এইভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। মকদ্দমা জিতে গেলে সে দশদিকে গরিবদের মধ্যে তোমারই প্রশংসা করবে। সে তোমার বিজ্ঞাপনের কাজ করবে। অন্য গরিব মক্কেল আসবে। এইভাবে তোমার নাম হবে। এতে কারো সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে না, কারো কাছে কৃতজ্ঞ হতে

হবে না। এইভাবে ওকালতি চলতে থাকলে বড় মক্কেল নিজেই এসে হাজির হবে। সে তোমার খোসামোদ করবে। কৃতজ্ঞতার ধুঁয়ায় পুরোনো খাতির জমাতে পারবে না, আর তুমি সম্মানের সঙ্গে তার কাছ থেকে টাকা নিতে পারবে। এইজন্য খেটে কাজ করতে শেখো। ওকালতি ভালই চলবে।

ইঁহার কথায় আমার মনে খুব সাহস জন্মিল। ইনি যেসব কথা বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল। প্রথমটা শুধু গরিব মক্কেল পাইয়াছিলাম। আমার ভাগ্যে প্রথম হইতেই অন্য কোনও উকিলের সাহায্য বিনা কাজ করিবার সুযোগ জুটিয়াছিল। ইহাতে মেহনতও করিতে হইত, নিজের বুদ্ধিও খুলিত। দুই একজন এমন মক্কেল পাইয়াছিলাম, যাঁহাদের ধনী বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের সঙ্গে পুরাতন সম্বন্ধ। এইজন্য তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছিলেন; না হইলে আর সব ছিল গরিব।

আমি যখন ওকালতির জন্য তৈয়ারি হইতেছিলাম তখন আর একটি ঘটনা ঘটে, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। যদি সেই ঘটনার সম্ভাবনা সত্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে জীবনপ্রবাহ আজ অন্য দিকে চলিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। হয়তো ভালই হইয়াছে, তখনকার অপরিণত স্বপ্ন সার্থক হয় নাই। সে ঘটনা হইল মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

১৯১০ সালে ওকালতি পরীক্ষার জন্য পড়িতেছিলাম। কলিকাতায় এক মেসে থাকিতাম। সেখানে আরও দুই চারিজন বিহারী সঙ্গীও ছিলেন। আমার দাদাও সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন হাইকোর্টে, যেখানে আমি প্রায় নিত্যই যাইতাম, মিঃ পরমেশ্বর লাল ব্যারিস্টার আমায় বলিলেন : তুমি আর শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে মাননীয় গোখেলের সঙ্গে দেখা কর, তিনি তোমাদের দুইজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি একথা শুনিয়া খুবই আশ্চর্য হইলাম। কারণ মাননীয় গোখেলের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য ইহার পূর্বে কখনও আমার হয় নাই। তাঁহারও আমাকে জানিবার কোনও কারণ ছিল না। মিঃ পরমেশ্বর লাল বলিলেন : তিনি বিহারের দু-চারজন কৃতী ছাত্রের সঙ্গে দেখা করতে চান, আর আমি তোমাদের দুজনের নাম তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি। কথাটা কি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ—দুর্ভাগ্যবশে কিছু-কাল হইল অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন—ও আমি, দুই-জনেই ছাত্র-সম্মেলনে প্রধান কর্মী ছিলাম। এইজন্য আমাদের দুইজনকে

অনেকে চিনিত। মিঃ পরমেশ্বর লালও এইজন্য আমাদের দুইজনের নাম বলিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা দুইজনে মাননীয় গোখেল যেখানে ছিলেন সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। তিনি তাহার কিছু কাল পূর্বে 'সার্ভ্যাণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন। তাঁহার ইচ্ছা, বিহারের কয়েকজন ভাল ছেলে উহাতে যোগ দেয়। তিনি দেশসেবার উপর জোর দিয়া আমাদিগকে উহাতে যোগ দিতে বলেন। তিনি জানিতেন যে, আমরা দুইজনে ইউ-নিভারসিটির পরীক্ষা ভাল করিয়া পাশ করিয়াছি আর এখন ওকালতির জন্য তৈয়ারি হইতেছি। তিনি বলিলেন: হতে পারে যে তোমাদের ওকালতির পশার ভাল হল, অনেক টাকা তোমরা রোজগার করতে পারলে, অনেক আরামে ও বিলাসে দিন কাটালে। বড় কোঠাবাড়ি, গাড়ীঘোড়া, চাকরবাকর ইত্যাদি বড়লোকদের যেমন থাকে তোমাদের সব ঠিক ঠিক তেমনি হোল। কিন্তু কোনও কোনও ছেলের উপর দেশেরও দাবি আছে, তোমরা লেখাপড়ায় ভাল বলে তোমাদের উপর এই দাবি আরও বেশি। নিজের কথায় তিনি বলিলেন: আমার সামনেও এই প্রশ্ন এসেছিল। আমি গরিবের ছেলে। আমার বাড়ির সকলে খুব আশা করেছিলেন যে, আমি পড়াশোনা করে মানুষ হব। টাকা রোজগার করব, সকলকে সুখী করতে পারব। আমি যখন সকল আশায় ছাই দিয়ে দেশসেবার ব্রত নিলাম তখন আমার দাদা এত দুঃখিত হলেন যে, কয়েকদিন ধরে আমার সঙ্গে কথাও বলেননি; কিন্তু কিছুদিন পরে সব কথা তিনি বুঝতে পারলেন। আমার সঙ্গে খুব সস্নেহ আচরণও করতে লাগলেন। হতে পারে যে এ সমস্ত তোমার ক্ষেত্রেও হবে, কিন্তু এতে বিশ্বাস করায় শেষে সকলে তোমাকে সম্মান করতে আরম্ভ করবে। লোকের সব আশা-ভরসা তোমাতে আছে, কিন্তু কে জানে, যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তাও তো সমস্ত লোক সহ্য করে নেবে।

এইভাবে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা ধরিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিলেন। কথা বলিবার পদ্ধতিও এমন ছিল যে, আমাদের মনের উপর তাহার অতি গভীর প্রভাব পড়িল। শেষকালে তিনি বলিলেন: ঠিক এখনই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বিষয়টি গভীর, ভেবে-চিন্তে আর একদিন আমার সঙ্গে আবার দেখা করো, তখন নিজের নিজের মত বলো। আমরা সেখান হইতে একপ্রকার আত্মহারা হইয়া ফিরিলাম। নিজেদের মেসে ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার কথা মনের ভিতর এমনি দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল যে, অন্য চিন্তা ঢুকিতেই ছিল না।

আমরা দুই ভাই জীরাদেই পৌঁছিলাম। বাড়ির মেয়েরা যখন সমস্ত কথা শুনিল দু'দিন ধরিয়া ঘুমই আসিল না। খাওয়া-দাওয়া সবকিছু বন্ধ

হইবার উপক্রম হইল। স্বদেশীযুগে দেশের কথা সকলের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইত। দেশসেবার চিন্তাও যখন তখন জাগিয়া উঠিত। কিন্তু ইহার পূর্বে কখনও এইভাবে এ প্রশ্ন সামনে আসে নাই। কখনও এত বড় একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাতে এইসব মর্মকথা শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই। একদিকে তাঁহার কথামত দেশের জন্য আমাদের মত লোকের সেবার প্রয়োজন; অন্যদিকে দাদার উপর বাড়ির সমস্ত বোঝা চাপানো! আমারও দুইটি ছেলে হইয়াছিল, তাঁহার নিজেরও তিন মেয়ে ও এক ছেলে! মা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি কি বলিবেন, বাড়ির অন্য লোকদের কেমন দুঃখ হইবে, ইত্যাদি ভাবনা এত পীড়া দিতেছিল যে, উপরে যেমন বলিয়াছি, খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত প্রায় ছুটিয়া গিয়াছিল। আমরা দুইজন ছাড়া আর কেহ একথা জানিত না। দাদা সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও কিছু বলি নাই। অন্য কোনও সঙ্গীকেও কিছু বলি নাই। হাইকোর্ট যাওয়াও বন্ধ। বেড়ানো ঘুচিয়া গেল। কোথাও-না-কোথাও একটা নিভৃত কোণ খুঁজিয়া লইয়া সেখানে বসি, আর ভাবি, এই হইল কাজ। প্রায় দশ বারো দিন এইভাবে চলিল। দাদার মনে হইল, শরীর বুঝি ভাল নাই। তাঁহাকে কিছু একটা বলিয়া ফিরাইয়া দিলাম। এখনও নিজের মনই ঠিক হয় নাই, তাঁহাকে বলিব কি!

কয়েকদিন এই প্রকার চিন্তার পর একদিন স্থির করিলাম যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখেলের কথা শুনিয়া তাঁহার সোসাইটিতে যোগ দিতেই হইবে। দাদাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সাহস ছিল না, কারণ ভয় ছিল যে, তিনি ইহাতে বড় কষ্ট পাইবেন। আমি এক লম্বা চিঠি লিখিলাম, তাহাতে সব কথা খোলাখুলি লেখা ছিল, আর আমাকে যাহাতে যাইতে অনুমতি দেন সেজন্য প্রার্থনা ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঐ পত্র তাঁহার বিছানার উপর রাখিয়া দিলাম; তিনি তখন কোথাও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি নিজে কাছেই কলেজ স্কোয়ারে গিয়া বসিয়া রহিলাম। চিঠি পড়িবামাত্র তিনি আমার খোঁজ করিতে লাগিলেন। দেখা পাইলেন না। আমি ফিরিয়া দেখিলাম তাঁহার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। সেদিন রাত্রে তিনি কোনও কথা বলিতেই পারিলেন না। আমি দেখিলাম, যে-চিন্তা আমাকে পীড়া দিতেছে, উহা তাঁহাকেও কষ্ট দিতেছে। তাঁহার প্রাণ চাহিতেছিল যে, আমাকে না আটকান, কিন্তু নিজের পরিবারের এত ভারি বোঝা উঠাইবেন এমন সামর্থ্যও নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও নিজেকে সংযত রাখিতে পারিলাম না, আমিও কাঁদিতে লাগিলাম।

আমি তো তাঁহার ঐ কান্না হইতেই মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বেশি কিছু বলিবার আমার সাহসও হইল না। স্থির হইল, বাড়ি গিয়া

মা-জ্যেঠিমা ও দিদির সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। আমি মাননীয় গোখেলের নিকট গিয়া এ অবস্থা জানাইয়া আসিলাম। বুঝিতে পারিলাম যে, এখন আমি ইঁহাদের স্নেহবন্ধন কাটাইতে পারিব না। তাঁহাকে ঐরূপ বলিয়া দিলাম। তিনিও আশা ছাড়িয়া দিলেন। আমার সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ চরম সিদ্ধান্ত করার পূর্বে কিছুদিন পুনায় গিয়া সেখানকার সব অবস্থা দেখিয়া আসিতে চাহিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখেলের একথা ভাল লাগিল। পুনায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ কয়েকদিন থাকিয়াও আসিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারও স্থির হইল, ঐ সোসাইটিতে যোগদান করা ঘটিবে না।

আমরা দুই ভাই জীরাদেই পৌঁছিলাম। বাড়ির মেয়েরা যখন সমস্ত কথা শুনিল তখন সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। মা তো এত ভালবাসিতেন যে কখনও কিছু বলিতেনই না। কিন্তু আমার দিদি, যিনি সর্বদাই মুখর ছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন : তুমি বিলেত যাওয়ার কথা তুলে বাবাকে কাঁদিয়েছ আবার এখন এই বয়সে সাধু হতে চেয়ে দাদাকে কাঁদাচ্ছ। বাস, এই পর্যন্ত বলিয়া দিদি নিজেও কাঁদিতে লাগিলেন। সমস্ত বাড়িশুদ্ধ কান্নাকাটি শুরু হইল। ঐ গোলমালে, আমার কলিকাতাতেই তো সাহস কমিয়া গিয়াছিল, যেটুকু বাঁচিয়াছিল তাহা এখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

বাড়িতে কিছুদিন থাকিয়া আমি আবার কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। বাড়ির লোকদের বিশ্বাস হইল যে আমি তাহাদের সকলের মতের বিরুদ্ধে এরূপ কাজ করিব না। এই দোটানায় প্রায় চার পাঁচ সপ্তাহ কাটিল। আমি চলিয়া যাওয়ার চিন্তা তো ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু মনে ব্যথা বিঁধিয়া রহিল। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া একটু অস্থির মতো হইয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে ঐ অস্থিরতা দূর হইল। ইহার এক ফল ইহাই হইল, যে বি. এল. পরীক্ষা অল্প কয়েকদিন পরেই হইবার কথা, তাহা আমার নিকট কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। পড়াশোনায় মন লাগে না। পরীক্ষার দিন কাছে আসিল। কোনও প্রকারে পরীক্ষায় পাস করিলাম। উচ্চস্থান পাইবার তো প্রশ্নই ছিল না, কারণ পড়া হয় নাই। পাস করার বিষয়েও মনে ভয় ছিল, কিন্তু কোনও রকমে পাস করিয়া গেলাম। ইহার এক বৎসর পরে ওকালতি শুরু করিলাম; কারণ শিক্ষানবিশির সময় তখনও শেষ হয় নাই। ওকালতি আরম্ভের কথা উপরে লিখিয়াছি।

উপরোক্ত ঘটনার অল্পদিন পরেই মার মৃত্যু হইল। পূজার দীর্ঘ ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কার্তিক মাসে তাঁহার অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যাবেলাতেও স্নান করিয়া তুলসী পূজা করিতেন আর প্রদীপ দিতেন। ইহাতে একদিন ঠান্ডা লাগিয়া গেল। জ্বর আর কাসি হইল। আমরা দুভাই বাড়িতেই ছিলাম। অনেক ঔষধপত্র করা হইল, কিন্তু বাঁচাইতে পারা গেল না। চার পাঁচ দিন রোগে ভুগিয়াই মা চলিয়া গেলেন। তখন দাদার পায়ে একটা ব্যথা ছিল। লোকের মধ্যে এমন একটা ধারণা ছিল যে, বাপের শ্রাদ্ধ বড় ছেলেকে আর মাতৃশ্রাদ্ধ ছোট ছেলেকে করিতে হয়। এইজন্য সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আমিই করিলাম।

দাদার বড় মেয়ে এই সময় এত বড়সড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার শীঘ্র বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইল। মা বাঁচিয়া থাকিতেই কথাবার্তা চলিতেছিল। আমাদের সমাজে মেয়ের বিবাহ দেওয়া খুব হাঙ্গামার কথা। একে তো পছন্দসই ছেলে মেলা ভার; তাহার মধ্যে জাতি-পাঁতির গোল-মাল থাকেই। তা ছাড়া ছেলের বাড়িতে সম্পত্তিও কিছু থাকা চাই, যাহাতে মেয়ের সেখানে গিয়া কষ্ট না হয়। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার জন্য ছেলে তখন স্বাবলম্বী হইতে পারে না। এইজন্য বাড়ির কর্তাদের উপরই মেয়ের ভরণপোষণের ভার পড়ে, আর কর্তারা তাহাতে সমর্থ কি না তাহা দেখা দরকার হয়। আমার নিজের বিবাহ প্রায় এগারো বছর বয়সে হইয়াছিল। যখন আমার পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়স, তখনও পড়াশোনাই করি। মজঃফরপুর কলেজে যখন প্রফেসরি করি, সেই কয় মাস ছাড়া এ পর্যন্ত কিছু রোজগার করি নাই। দাদাও কিছু উপার্জন করেন নাই। স্কুল মাষ্টারি করিয়া তিনি অল্প যাহা কিছু পাইতেন তাহা ওখানেই খরচ হইয়া যাইত। এইজন্যে বাড়িতে যা জমিদারি ছিল তাহার আয় দিয়া সব কাজ চলিত। দাদা ভাল ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। তাই বাবার মৃত্যুতে যতখানি কষ্ট হইয়াছিল এখন ততটা কষ্ট লাগিত না। তাহা হইলেও মেয়ের বিবাহে তো অনেক খরচ হইয়াই থাকে।

মেয়ের বিবাহে ভাল ঘর ভাল বর মিলিলেও পাত্রপক্ষকে রাজি করানো বড় সহজ কর্ম নয়। তখনকার দিনে ছেলেকে রাজি করাইবার কথা উঠিতই না, কারণ ছেলের বয়স প্রায়ই কমই থাকিত, আর বাপ-মায়ের রাজি-গররাজিকেই তাহার রাজি-গররাজি বলিয়া মনে করা হইত। সেদিন ও এখনকার দিনে অনেক তফাৎ। এখনকার দিনে ছেলের বিয়ে একটু বেশি

বয়সেই হয়। বিশেষ করিয়া কিছুটা লেখাপড়া জানে এমন কায়স্থ সমাজে। ছেলের বাপ-মার মত করিয়া লওয়া বড় সহজ ছিল না। তাঁহাদেরও মেয়ের পক্ষের বাড়িঘর কুলশীল সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইত যে, কন্যাপক্ষ তাঁহাদের মর্যাদার উপযুক্ত কি না। এই সমস্ত ব্যাপার ঠিক ঠিক পরীক্ষা করিবার পর তবে পাকা দেখা আশীর্বাদ ইত্যাদির কথা উঠিত।

কন্যাপক্ষের পাত্রবরণের সময়—যাহাকে আমাদের সমাজে তিলক বলে—টাকা, বাসনপত্র, কাপড় ইত্যাদি দিতে হয়। আবার বিবাহকালে বরযাত্রী আসিলে সব জিনিসপত্র ও নগদ টাকা দিতে হয়। মেয়েকে টাকা দেওয়া পিতার ধর্ম হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে আপন ইচ্ছায় ও ভালবাসিয়া পিতার টাকা দেওয়ার কথা থাকে না। বিবাহের পূর্বেই কথাবার্তা বলিয়া স্থির করা হয় যে, আশীর্বাদের সময় এত দিতে হইবে, আর বিবাহের সময় বরযাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলে অত যৌতুক দিতে হইবে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রথা এ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সকল জাতির সভায় এ প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রথা বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেসব জাতির মধ্যে এই প্রথা চলিত ছিল না, তাহাদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে চলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে 'তিলক-দহেজে'র অর্থাৎ আশীর্বাদী যৌতুকের পরিমাণ এখন অনেক বাড়িয়া উঠিতেছে।

আজ যদি আমার বিবাহ হইবার কথা উঠিত, আর আমি উক্ত প্রথা মতো আশীর্বাদী যৌতুক লইয়া বিবাহ করিতে চাহিতাম, তাহা হইলে আমার মতো পাস-করা বিদ্যার্থীর ক্ষেত্রে, যেখানে আমার বিবাহে প্রায় দেড়-দুই হাজার পাওয়া গিয়াছিল, সেখানে আজকার দরে দশ পনেরো হাজার টাকাও বেশি বলিয়া কেহ মনে করিত না। এখনকার দর তো এত চড়িয়া গিয়াছে ও চড়িয়া যাইতেছে যে, তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। যাহার ঘরে কিছু নাই, কিন্তু যে পড়াশুনায় খানিকটা ভাল, সেও মামুলি ধরনে তিন চার হাজারের তো ফরমায়েস করিয়াই থাকে।

তবে একটা প্রভেদ আছে। আমার বিবাহের সময় বরকে খুশি করিবার কোনও কথা ছিল না, কারণ দশ-বারো বৎসর বয়সের ছেলেকে তো খেলনা দিয়াও খুশি করা যাইতে পারে, আর ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, কি ছেলের স্বয়ং নিজের বিবাহের আলাপ-আলোচনা করা, লোকে অত্যন্ত খারাপ মনে করিত। এইজন্য বাপ-মা রাজি হইলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলেদের আলাদা রাজি করাইতে হয়। তাহারা আলাদা করিয়া ফরমায়েস করে, আর এইভাবে চাহিদা, অথবা খরচ, খুব বাড়িয়া যায়।

ভাইঝির বিবাহ জানা-শোনা ঘরে হইবার কথা ছিল, কারণ বরের দাদা আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় পড়িত, আর বরও সেখানে পড়িত। এইজন্য আশা ছিল যে, সব কথার মীমাংসা সহজে হইবে। কিন্তু পুরাতন প্রথা তাড়াতাড়ি যায় না। তাই আমাদেরও বাধা পাইতেই হইল। ভগবানের দয়ায় সম্বন্ধ বেশ ভালই হইল। দুই পক্ষই খুব সন্তুষ্ট হইল। সবকিছু হইলেও ঘরে তো টাকা ছিল না; খাওয়ার ধান-গম ক্ষেতে উৎপন্ন হইত, এইজন্য তাহার ভাবনা ছিল না। কিন্তু নগদ খরচের জন্য আমাদের দুই ভাইকে কর্জ করিতে হইল।

ওকালতি আরম্ভ ও এম্. এল্. পরীক্ষা

ভাইঝির বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই আমি কলিকাতায় ওকালতি শুরু করিয়া দিলাম। শুরু যে কেমন, সে বিষয়ে কিছু কিছু পূর্বেই লিখিয়াছি। কাজ শুরু করিতে না করিতে মকদ্দমা আসিতে লাগিল। আমি যে দিন ওকালতি শুরু করি, সেই দিন হইতে বাড়ি হইতে খরচের জন্য কখনও কিছু লই নাই। আমার ভাবনা ছিল, বাড়ি হইতে কিছু চাহিয়া পাঠাইলে দাদার উপর বোঝা ভারি হইবে, বিশেষত মেয়ের বিবাহের খরচের পর তাঁহার কষ্ট এখন আরও বাড়িবে। কিন্তু এমনই সুবিধা হইয়া গেল যে, প্রতি মাসে অল্পবিস্তর আয় হইতে লাগিল, তাহাই হইল খরচের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট শহরের তুলনায় কলিকাতায় খরচ পড়িত বেশি, তাহা হইলেও চলিয়া যাইত। জাস্টিস চ্যাটার্জি যেমন বলিয়াছিলেন, আমার নিকটে ধনী মক্কেল আসিল না। শুধু একজন—রায় বাহাদুর হরিহরপ্রসাদ সিংহ—আমি যেদিন ওকালতি শুরু করি সেইদিন হইতে নিজের জমিদারির ছোট বড় মকদ্দমার ভার আমাকেই দিলেন। তিনি আমাকে জানিতেন, বিলাতে যাওয়ার আয়োজনে কিছু টাকাও দিয়াছিলেন। এমনই ঘটিল যে, তাঁহারই মকদ্দমা আমার শেষ মকদ্দমাও হইল, কারণ ওকালতি ছাড়িবার সময় তাঁহারই খুব বড় এক মকদ্দমায় আমি নিযুক্ত ছিলাম।

গরিব মক্কেলের মকদ্দমায় দ্বিতীয় উকিলও থাকে না, সর্বদা আমাকেই তদারক করিতে হইত। পরিশ্রম করিয়া কাজ করিতাম; এইজন্য জজেরাও অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে চিনিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকের অভ্যাস থাকে, জজদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করার; আমি কখনও তাহা

করি নাই। আমার সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইত শুধু এজলাসে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে—যাঁহাদের সম্মুখে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম—আমার প্রতি খুশি ছিলেন। স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স ছিলেন চিফ জাস্টিস। আমি ওকালতি শুরু করিবার দুই এক বৎসর পরেই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু এত অল্পদিনের ওকালতির ফলেই আমার প্রতি এত প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, যাওয়ার সময়ে তাঁহার নিজে হাতে সই করা একটি ফটো আমাকে দিয়া যান। স্যর আশুতোষের কথা উপরে লিখিয়াছি যে, এক মকদ্দমায় আমাকে জুনিয়র উকিলরূপে কাজ করিতে দেখিয়া তিনি ল কলেজের প্রফেসরি আমাকে দিয়া দেন। এই ভাবে নিজের কাজকর্মে আমি নিজে খুশি ছিলাম।

আমার মজঃফরপুর কলেজের পুরাতন বন্ধু বৈদ্যনাথনারায়ণ সিংহও কলিকাতা আসিয়া আমার সঙ্গেই হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করিয়া দেন। আমাদের দুইজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে বিহার প্রদেশও, ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে সম্রাটের দরবারের সময়, বাংলা হইতে পৃথক হইবার ঘোষণা হইল, আর ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে বিহার এক নূতন প্রদেশ হইয়া গেল। তখনও হাইকোর্ট ও ইউনিভারসিটি আলাদা হইবে বলিয়া স্থির হয় নাই। বিহারের মকদ্দমা কলিকাতাতেই দাখিল হইত, আর বিহারের ছাত্রেরা কলিকাতা ইউনিভারসিটির পরীক্ষা দিতেই বসিয়া যাইত। কিন্তু প্রদেশ পৃথক হইবার অল্পদিন পরেই হাইকোর্ট আলাদা করিয়া দিবার কথাও হইতে লাগিল। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া কিছু দেরি হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না; মনে হইল, বাড়ি-ঘর তৈরি হইলে হাইকোর্টও খোলা হইবে।

বৈদ্যনাথবাবু আমাকে বলিলেন, এম. এল. পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি তখন ওকালতিতে মনে-প্রাণে লাগিয়া গিয়াছিলাম, আর সফল হইতেও চাহিয়াছিলাম। তাঁহার কথা মানিয়া লইলাম। আমরা দুজনে একসঙ্গে এম. এল. পরীক্ষার জন্য তৈয়ারি হইতে লাগিলাম। লোকে মনে করিত, কলিকাতা ইউনিভারসিটির পরীক্ষার মধ্যে ইহা সবচেয়ে কঠিন। আমাদের দুজনের কাছারিতেও যথেষ্ট কাজ থাকিত; এইজন্য পড়িবার সময় পাওয়া যাইত খুব কম। তাহার উপর ল কলেজের প্রফেসর হইবার পর তো আমি সময়ের অভাব আরও বেশি অনুভব করিতে লাগিলাম। কখনও কখনও প্রাণ চাহিত, এই পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচিয়া যাই; কিন্তু বৈদ্যনাথবাবু ছাড়িতে চাহিতেন না। তিনি বারবার জোর দিয়া আমাকে পড়িতে বলিয়াই চলিতেন। কখনও কখনও মাস্টার যেমন ছাত্রদের পড়ান, তেমনই আমায় পড়াইতেন। আমাকে বারবার বলিতেন : এণ্ট্রান্স থেকে

বি. এ. পর্যন্ত সব পরীক্ষায় আপনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, শুধু এম. এ.-তে কিছু নীচে, আর বি. এল. তো কোনও প্রকারে পাশ করেছেন। এই শেষ পরীক্ষার ফল আপনার বিদ্যার্থী-জীবনের কলঙ্ক। এটা ধুয়ে মুছে ফেলতে হইবে, এবং আপনি এম. এল. পাশ করেই তা ধুয়ে মুছে ফেলতে পারেন। এইসব যুক্তি ও তাঁহার মাষ্টারীর ফল এই হইল যে, আমরা দুইজনে খুব খাটিতে লাগিলাম, স্থির হইল যে, ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে যে পরীক্ষা হইবে আমরা দুইজনে তাহা দিব, এবং আমাদের আয়োজন বা প্রস্তুতিও সেইমত হইতে থাকিল।

আমি এই পরীক্ষার জন্য যত পরিশ্রম করিয়াছি তত পরিশ্রম কখনও কোনও পরীক্ষার জন্যই করি নাই। এন্ট্রান্স তো যেন না জানিয়াই সফল হইলাম। এফ. এ.-তে প্রথম হইবার জন্য জানিয়া শুনিয়া প্রযত্ন করিতাম। তবু তাহাতেও কোথাও এত পরিশ্রম কখনও করিই নাই। বি. এ.-তে তো পরিশ্রম করিতেই হয় নাই। এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষার সময়ে শেষের দুই তিন মাস আমি পনের ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত পড়িতাম। কাছারি, ল কলেজ ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, সব মিলাইয়া এত মেহনত পড়িয়াছিল যে, একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হই, ভয় হইয়াছিল যে, সমস্ত হাঙ্গামা বুঝি এখন শেষ হইয়াই বা যায়!

১৯১৬-র মার্চে পাটনায় হাইকোর্ট খোলার কথা ছিল। আমরা দুই-জনে বুঝিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় থাকিতে যদি আমরা পাশ না করি তবে পাটনায় গিয়া আমাদের দ্বারা ইহা হইবে না; ১৯১৫-র পরীক্ষাই আমাদের পক্ষে প্রথম ও শেষ পরীক্ষা হইবে; এজন্য আমাদের পাশ করিতেই হইবে। পরীক্ষার সময় জজদের বলিয়া কয়েকদিনের ছুটি লইয়াছিলাম; নিজেদের মকদ্দমা সব মুলতুবি করাইয়াছিলাম। আমাদের মকদ্দমা প্রায় বিহারেই থাকিত; এইজন্য কয়েকদিন হইতে সেসব মকদ্দমা কলিকাতাতেও সেই সব জজের কাছে পেশ করা হইত, যাঁহারা পাটনায় আসিবেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছিল। আমরা বলিতেই তাঁহারা খুশি হইয়া মকদ্দমা মুলতুবি করিয়া দিলেন।

হাইকোর্ট চলিয়া আসিতে আসিতে পরীক্ষা দিয়া আমরাও সেই সঙ্গে পাটনায় চলিয়া আসিলাম। পাটনায় আসার পর পরীক্ষার ফল জানিতে পারিলাম। আমরা দুইজনেই পাশ করিয়াছিলাম। আমি ফার্স্ট ক্লাশে, আর বৈদ্যনাথবাবু সেকেণ্ড ক্লাশে। সর্বপ্রথম বিহারের আমরা দুইজনই এই পরীক্ষা পাশ করিলাম। পরে জানিতে পারি যে, আমি অনেক নম্বর পাইয়াছিলাম। ইউনিভারসিটির নিয়ম অনুসারে এম. এল. পরীক্ষা পাশ করার পর মৌলিক নিবন্ধ রচনা করিলে তবে ডি. এল. উপাধি পাওয়া যায়, আর এইভাবে লোকে আইনের ডাক্তার হইতে পারে। আমরা দুই-

জনে পাটনায় পরামর্শ করিতে লাগিলাম যে, কোনও ভাল বিষয় লইয়া গবেষণা করিব। এ বিষয়ে স্যর গুরুদাস ব্যানার্জির সঙ্গেও দেখা করিয়া তাঁহার পরামর্শ লইয়াছিলাম।

কলিকাতায় ওকালতির সম্বন্ধে কিছু হাসির গল্প আছে। ওকালতি শুরু করিবার কয়েকদিন পরেই এক মক্কেলের মোক্তার আমার কাছে এক আপিল দায়ের করিতে আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একজন সিনিয়র উকিলও রাখা হয়। তিনি আমাকে এক সিনিয়র উকিলের নামও দিলেন, যাঁহার খুব জোর পশার ছিল আর যাঁহার হাতে বিহারের অনেক মকদ্দমা থাকিত। বড় উকিলের সঙ্গে কাজ করিবার সুবিধা সুযোগ মিলিবে ভাবিয়া আমি খুশি হইলাম। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না।

আমরা দুইজনে তাঁহার বাড়ি গেলাম। আমি কাগজ পড়িয়া নিজের বুদ্ধিমত আপিলের দরখাস্ত লিখিয়া লইয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় দুই-জনে গিয়া পৌঁছিলাম। তিনি কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, রাত্রে কাজ করিতেন না। সন্ধ্যা হইলেই কাজ শেষ করিতেন, পরের দিন সকালবেলায় আরম্ভ করিতেন। তিনি কাগজপত্র গুটাইতেছিলেন, এমন সময় আমরা গিয়া পৌঁছিলাম। মোক্তারকে তিনি পূর্ব হইতেই জানিতেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দরকার? মোক্তার উত্তর করিলেন—একটা দ্বিতীয় আপিল দায়ের করিতে হইবে। পরের দিন তিনি মোক্তারকে ডাকিলেন, আর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও জুনিয়রকে দিয়া দরখাস্ত ইত্যাদি লেখানো হইয়াছে কিনা। মোক্তার উত্তর করিলেন, সব কিছু তৈয়ারি আছে। তখন তিনি জুনিয়রের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মোক্তার আমার নাম বলিলেন। আমি তো কাছেই চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তিনি চটিয়া বলিলেন : জানি না, কেমন উজবুক উকিল তোমরা রেখেছ, যাকে আমি চিনিও না। সমস্ত কাজ আমাকেই করতে হবে। সে জানবেও না কিছু, বুঝবেও না কিছু। মক্কেল বলিল : লোকটি নূতন বটে, কিন্তু খুব বুদ্ধি আছে। ইহার পর তিনি আবার 'উজবুক' ইত্যাদি বলিলেন। আমি চুপচাপ বসিয়া। মক্কেল তখন আমার দিকে ইশারা করিয়া বলিল, ইনিই তো সেই। এই কথা শুনিয়াই তাঁহার দেহে সেই শীতকালেও যেন কেহ হাজার ঘড়া জল ঢালিয়া দিল, তিনি ঘাবড়াইয়া গিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন : এখানে এসেই আমার সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া উচিত ছিল। আমি তোমাকে চিনতাম না। তোমাকে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; আমি তো তোমাকে চিনতাম না, তাই বলেছি যে নতুন উকিল হয়তো ঠিক ঠিক কাজ জানবে না। এই ধরনের কথা বলিয়া তিনি মাপ চাহিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম : আপনার ওর্‌প বলা স্বাভাবিক; আপনি আমাকে চিনতেনই না, আর আমি তো এখন একেবারে নতুন। তখন তিনি সব ব্‌ত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; পরের দিন কাছারিতেই কাগজপত্র দেখাইতে বলিয়া আমাদের দ্‌ইজনকে বিদায় করিলেন। পরের দিন যখন কাছারিতেই আমি আমার লেখা দরখাস্ত তাঁহাকে দেখাইলাম, তখন তিনি খ্‌বই খ্‌শি হইয়া মক্কেল ও অন্য উকিলদের সামনে আমার খ্‌ব প্রশংসা করিয়া দিলেন। ইহার পরে তাঁহার সঙ্গে কাজ করিবার অনেক স্‌যোগ পাইয়াছিলাম, আর তিনি আমাকে অনেক খাতিরও করিতেন। আমার সঙ্গে তাঁহার এক বিষয়ে অনৈক্য ছিল। বেশভূষায় আমি ছেলেবেলা হইতেই অগোছালো ছিলাম। তিনি ইহা পছন্দ করিতেন না, এবং যখন তখন পোশাকে শৌখীন হইবার উপদেশ দিতেন।

ইহার বিপরীত অন্য এক ঘটনা ঘটিল। আমি নিজের অভ্যাসের বশ। কাজ না থাকিলে কাহারও সহিত আগাইয়া পরিচয় করিবার শক্তি আমার কখনও ছিল না, আজও নাই। যদিও দ্‌ই এক বৎসর হইল ওকালতি করিতেছি, তব্‌ ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তাঁহার বির্‌দ্ধে ওকালতি করিয়া এক বড় মকদ্দমা তো জিতিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কাজ করিবার স্‌যোগ পাই নাই। একটা মকদ্দমায় সেই স্‌যোগ উপস্থিত হইল। অন্য পক্ষে ছিলেন স্যর এস. পি. সিন্‌হা। আমাদের দিকে ছিলেন স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও বাব্‌ কুলবন্ত সহায়; কুলবন্ত সহায় পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ হন। মকদ্দমা ছিল গয়ার, গয়ার এক উকিলও আসিয়াছিলেন।

বড় উকিল ও ব্যারিস্টারদের রীতি ছিল যে, অন্য পক্ষের বক্তৃতা হইতে থাকিলে তাঁহারা অন্য কাহারও এজলাসে বক্তৃতা করিতেন, জবাব দেওয়ার সময় আসিয়া পৌঁছিতেন। হাতে অনেক মকদ্দমা থাকিলে এই রকমই পরিণাম দাঁড়ায়। কখনও হয়তো এমন হইত যে, তাঁহারা আসিতেই পারিলেন না। সের্‌প অবস্থায় জ্‌নিয়রকেই কাজ করিয়া দিতে হইত। যে মকদ্দমা আমি স্যর রাসবিহারী ঘোষের বির্‌দ্ধে ওকালতি করিয়া জিতিয়া লইয়াছিলাম, তাহাতে ঐর্‌পই ঘটিয়াছিল। আমার সিনিয়র অন্য এজলাসে ফাঁসিয়া গিয়াছিলেন, আমাকেই বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। যখন অন্য পক্ষের বক্তৃতা চলিত আর সিনিয়র গরহাজির থাকিতেন, তখন জ্‌নিয়রকেই বক্তৃতার নোট লইয়া সিনিয়রকে দেখাইতে হইত। ঐ নোট পড়িয়া অন্যপক্ষের য্‌ক্তি তিনি ব্‌ঝিতেন ও তাহার জবাব দিতেন। এটা ছিল একটা ভারি মকদ্দমা, তাহাতে তিন চারি দিন ধরিয়া বক্তৃতা চলিতেছিল। স্যর সিন্‌হার বক্তৃতার নোট করিবার ভার ছিল আমার উপর; কারণ আমিই ছিলাম সবচেয়ে জ্‌নিয়র। স্যর সিন্‌হা আস্তে আস্তে

আর খুব ভাল করিয়া বক্তৃতা করিতেন। এইজন্য নোট লিখিবার সময় আমার বিশেষ কষ্ট হয় নাই। প্রথম হইতেই আমার একটু তাড়াতাড়ি লিখিবার অভ্যাস ছিল। কলেজে মিঃ পার্সিভ্যাল খুব তাড়াতাড়ি পড়াইয়া যাইতেন, আর আমি প্রায় সব কিছুই নোট করিয়া লইতাম। ইহাতে আমার ঐ অভ্যাস আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। ডন সোসাইটির ক্লাসেও এদিকে যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছিলাম।

স্যর সিন্‌হার বক্তৃতার ভালমতই নোট লইয়াছিলাম। সারাদিন ধরিয়া বক্তৃতা চলিল, তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইল। সন্ধ্যাবেলায় আমরা সকলে স্যর রাসবিহারী ঘোষের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি খুব মন দিয়া বক্তৃতার সমস্ত নোট পড়িলেন। আমি কিছুটা ভয়ও পাইয়াছিলাম, কি বলেন তাহা দেখিবার জন্য খানিকটা উৎসুকও ছিলাম। তিনি কোপন-স্বভাব ছিলেন, এবং জুনিয়রদের ভুল দেখিলে খুব চটিয়া উঠিতেন। জজসাহেবরাও একথা খুব জানিতেন। কখনও কখনও এজলাসের উপরেই কাগজ বই সব ছুঁড়িয়া ফেলিতেন। ইহাতে জুনিয়রেরা বড় ভয় পাইত। আমার তো এই ছিল প্রথম সুযোগ। নোট পড়িয়া তিনি মাথা উঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নোট কে তৈরি করিয়াছে। আমি ভাবিলাম, এখন হয়তো রাগ করিবেন; উঁহার মনের মত নোট তৈরি হয় নাই। বাবু কুলবন্ত সহায়ের মনেও এমন একটা সন্দেহ হয়তো জাগিয়াছিল। তিনি আমার দিকে ইশারা করিয়া দেখাইলেন। তখন স্যর রাসবিহারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : কদিন থেকে কাজ কোরছ? আমি তোমাকে তো চিনি না। এইসব কথা চলিতেছিল, আর মনে মনে কাঁপিতেছিলাম যে, এখন কিছু একটা ঘটিবে। বাবু কুলবন্ত সহায় বলিলেন : অল্পদিন থেকেই কাজে ঢুকেছে। রাগ করা দূরে থাক তিনি আমার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন, আর বলিলেন যে, নোট খুব ভাল তৈরি হইয়াছে। বাবু কুলবন্ত সহায়ের সাহস বাড়িল, তিনি আমার ইউনিভারসিটির পরীক্ষার কথাও বলিয়া দিলেন। খুব খুশি হইয়া স্যর রাসবিহারী বলিলেন : এমনি ধারা পরিশ্রম করে কাজ করো, তোমার খুব ভাল হবে।

আমার মনে খুব আনন্দ হইল। ইহার পর যখনই তাঁহার সঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইত, তখনই তিনি আমার নোটের উপর খুব বিশ্বাস করিতেন, আর উহা ঠিক বুঝিয়া পুরাপুরি উহা কাজে লাগাইতেন। ঐ মোকদ্দমায় আমি অন্য এক দৃশ্যও দেখিয়াছি। তিনি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং জানিতে চাহেন যে, ঐ কথার কোনও সাক্ষী আছে কিনা। আমি তো চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু গয়ার উকিল বলিল যে, সাক্ষী কেহ নাই। তখন তিনি বলিলেন : সিন্‌হা যখন বলেছে যে সাক্ষী আছে, তখন নিশ্চয় কেউ থাকবে—মন দিয়া আজ রাত্রে

সব কাগজপত্র দেখো, কাল সকালে আমাকে বলবে। পরের দিন সকালে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উকিল একই উত্তর দিল। রাত্রে তিনি কাগজপত্র পড়িয়াছিলেন আর চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। উকিলের জবাব পাইয়া তাঁহার মেজাজ গেল বিগড়াইয়া, কাগজ ও তাঁহার তৈরি নোট ছুঁড়িয়া ফেলিলেন : তোমার নোটের উপর ভরসা করে আমি বক্তৃতা করি। এখন আমি ভরসা করি কি করে? নোটের চিহ্নিত অংশ খুলিয়া দেখাইলেন, ভালমন্দ অনেক কিছু শুনাইয়া দিলেন। একটা মোকদ্দমাতেই দুই জিনিস দেখিয়া লইলাম, আমার ভুল হয় নাই বলিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলাম।

এম. এল. পরীক্ষা দিয়াছি। ফলের সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। পাটনায় আসিবার অল্প কয়দিন মাত্র বাকি আছে। এক সামান্য কিন্তু পেঁচালো মকদ্দমা হাতে আছে। দুইজন জজের সামনে সওয়াল-জবাব করিতে হইল, এই দুইজনেরই পাটনায় আসিবার কথা। একজন তখনও পাকা জজ হন নাই। অল্পদিনের জন্য হাইকোর্টে গিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবার কিছুদিনের জন্য পাটনায় আসিবেন। এই বক্তৃতা দুই তিন দিন ধরিয়া চলিল। আমরা জিতিলাম, আর তাঁহাদের উপর আমার বক্তৃতার প্রভাব ভাল হইল। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, এম. এল. পরীক্ষাও দিয়াছি। পাটনায় আসিয়া হাইকোর্ট খুলিবার পূর্বেই তাঁহারা অন্যদের কাছে আমার প্রশংসা করিলেন, কলিকাতা হইতে যে উকিল আসিতেছে সে বেশ কাজের লোক, এবং এখানকার বড় উকিলদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে। যখন হাইকোর্ট খুলিল, তখন আমি ইহা জানিতে পারিলাম।

দ্বিতীয়বার আপিলে কেবল আইনের বক্তৃতা। অন্যান্য বিষয়ে নীচের আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হয়। ছোট ছোট মোকদ্দমাতেই দ্বিতীয়বার আপিল হয়। আমার মক্কেলেরা হইত গরিব। কলিকাতায় বেশির ভাগ দ্বিতীয়বার আপিলই আসিত আমার হাতে। তাই তাহাদের বক্তৃতায় আইনগত বক্তৃতা করিবার জন্যই আমাকে আইন পড়িতে হইত বেশি। আমি নিয়ম করিয়া লইয়াছিলাম, যে সমস্ত মকদ্দমা নিজে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, আইনের দিক দিয়া বিচারে ভুল নাই এবং আমি জিতিতে পারিব না, সেসব মকদ্দমা দায়েরই করিব না। এইজন্য দ্বিতীয়বার আপিলের মকদ্দমায় আমি সর্বদা জয়লাভ করিতাম। পাটনায় আসিয়া আমি এই নিয়ম অনুসারেই চলিতাম।

দ্বিতীয়বার আপিল মঞ্জুর হইবে কি না তাহা দেখিবার জন্য বক্তৃতা হয়। জজসাহেব যখন বুঝিতে পারেন যে, ভুলচুক হইয়াছে এবং অন্তত [illegible] প্রয়োজন আছে, তখন শুনানি মঞ্জুর করেন, আর অন্য

পক্ষকে হাজির হইবার জন্য নোটিশ দেন। পাটনার রেজিস্ট্রার আইন কিছু কম জানিতেন, সব দ্বিতীয় আপিলই নামঞ্জুর করিতেন। আমার আপিলও নামঞ্জুর করিতেন। কিন্তু নিয়মমত তাঁহার এইটুকুই অধিকার ছিল যে, কোনও আপিল মঞ্জুর করা সঙ্গত না মনে করিলে তিনি জজদের সামনে তাহা পাঠাইয়া দিবেন। আমার অনেক আপিল এইভাবে তিনি জজের নিকট পঠাইতেন আর ওখানে প্রায় সবই মঞ্জুর হইত। যে জজের কথা বলিয়াছি তিনি তো কাগজ পড়িয়াও প্রায় দেখিতেন না; আমি দাঁড়াইতেই মঞ্জুর করিয়া দিতেন। রেজিস্ট্রারেরও যখন বিশ্বাস হইল যে, আমি টাকা লইয়াছি বলিয়া যে বাজে মোকদ্দমা দায়ের করিব তাহা নয়, তখন তিনিও ঐরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমার ইহাও অভিজ্ঞতা হইল যে, আমি যে মকদ্দমায় সার কিছু নাই মনে করিয়া দাখিল করিতাম না, মক্কেল তাহা অন্য উকিলের মারফত দাখিল করাইত ও শেষে হারিয়া যাইত।

পাটনায় আগমন ও পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল

ইংরেজী ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে পাটনায় হাইকোর্ট খোলা হয়। সমস্ত বিহারী উকিল, যাহারা কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিত, আর অনেক বাঙ্গালী উকিলও যাহাদের বিহারের মকদ্দমা জুটিত—পাটনায় চলিয়া আসিল। আমিও পাটনায় চলিয়া আসিলাম। তখনকার দিনে পাটনায় বাসা পাওয়া কঠিন হইয়া গিয়াছিল। একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমি বাস করিতে লাগিলাম। কলিকাতাতেই আমার হাতে বিস্তর মকদ্দমা থাকিত; পাটনায় আসিয়া পসার আরও বাড়িয়া চলিল। আমিও খুব মন দিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন থাকিল না।

কয়েক মাস পরে পাটনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য দিল্লীর কাউনসিলে এক বিল পেশ করা হয়। আমরা ঐ বিল খুবই খারাপ বলিয়া মনে করিলাম। তাই উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করা হইল। ইতিপূর্বেই এক কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহা এক রিপোর্ট প্রস্তুত করে। রিপোর্টের প্রধান প্রধান সুপারিশের মধ্যে ইহাও ছিল যে, শহর হইতে তিন-চার মাইল দূরে, ফুলওয়ারি শরিফের কাছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হউক। এই বাড়ির খরচই প্রায় এক কোটির কাছাকাছি হইবে, বলা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতেই আমি ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলাম।

আবার আমি যখন বিহারী ছাত্রসম্মেলনের সভাপতি হইলাম, তখন সভাপতিরূপেও তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করি। আমরা বুঝিয়াছিলাম, এরূপ হইলে গরিব ছেলেদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাওয়া অসম্ভব না হইলেও কঠিন তো নিশ্চয় হইবে। ওখানে খরচও পড়িবে বেশি, আর শহর হইতে দূরে বলিয়া সব ছেলেদের বেশি খরচ দিয়া হস্টেলে থাকিতে হইবে। ওখানে তাহাদের কোনই স্বাধীনতাও থাকিবে না।

এই প্রতিবাদে সর্বসাধারণের দিক হইতে খুব সমর্থন পাওয়া গিয়াছিল। ঐ পরিকল্পনা এক প্রকার স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। নূতন বিলের সম্বন্ধে অন্যপ্রকার বাধা ছিল। আমরা দেখিলাম যে, সেনেট ও সিণ্ডিকেট যেভাবে গঠিত হইতে চলিতেছে ঐরূপভাবে গঠিত হইলে তাহাতে তো জনসেবকদের স্থানই মিলিবে না—সকলে হইবে সরকারি চাকুরে, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে হাতে রাখিয়া সরকারি হুকুম-মাফিক ইচ্ছামত কাজ চালানো হইবে।

আমাদের সামনে ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার ভাইসচ্যানসেলারেরা শিক্ষাপ্রচারে অত্যন্ত নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেন। বিশেষ করিয়া আমাদের চোখের সামনে ছিলেন স্যর আশুতোষ। কিন্তু সেখানকার সেনেট ও সিণ্ডিকেট যদি তাঁহাকে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে তিনি অনেক কিছু করিতে পারিতেন না। আমরা বুঝিয়াছিলাম, আমাদের এখানে তো প্রথমত তাঁহার মত লোক তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইবে না। আর যদি পাওয়াও যায় তাহা হইলেও সেরূপ লোক সেনেট ও সিণ্ডিকেটের বিরোধের সামনে কিছু করিতে পারিবেন না। এইজন্য আমরা চাহিয়াছিলাম যে সেনেট ও সিণ্ডিকেটে শিক্ষক ভিন্ন জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে অন্য লোকেদেরও যথেষ্ট স্থান দেওয়া হয়।

ইউনিভারসিটি বিলের বিরুদ্ধে আমরা প্রচণ্ড আন্দোলন চালাইলাম। এই আন্দোলনে আমার বন্ধু বাবু বৈদ্যনাথ নারায়ণ সিংহ ও আমি পুরোভাগে ছিলাম। আমরা দুইজনেই একপ্রকার ইহার পরিচালক ছিলাম। প্রত্যেক জেলায় সভা হইল। আমরা দুইজনে খবরের কাগজেও অনেক কিছু লিখিলাম। বিল দিল্লীর কাউনসিলে পেশ করা হইল, তাই আমরা অন্যান্য প্রদেশের মেম্বরদেরও বিহারের জনমত জানাইবার কথা আশু প্রয়োজনীয় মনে করিলাম। রাষ্ট্রবাদী সংবাদপত্র সকলগুলিই বিরোধিতা করিল। আমরা এ-বিষয়ে পাঁচ-ছয়টি ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিয়া ছাপাইলাম। শেষে বিহার প্রাদেশিক কনফারেন্সের বিশেষ অধিবেশন করিয়া এ-বিষয়ে আলোচনা করা হইল, এবং প্রবল প্রতিবাদ করা হইল। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন পাটনার প্রসিদ্ধ উকিল রায়বাহাদুর

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। তিনি তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এবং তদনুরূপ প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে, ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে, লখনৌয়ে কংগ্রেস হইল। সেখানে আমরা সকলে দলবলে গেলাম। যদিও ঐ বিল বিশেষ করিয়া একটি প্রদেশ সম্বন্ধে ছিল, আর কংগ্রেসে সেই সকল বিষয়েই আলোচনা হইত যাহাদের প্রভাব সর্বদেশের উপর পড়ে, তথাপি আমি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপরাঞ্জপে প্রভৃতি নেতাদের বলিয়া এই বিলের বিরোধী প্রস্তাব উপস্থিত করিবার আয়োজন করিলাম। শ্রীপরাঞ্জপে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, আর তাহা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হইল। এইভাবে বিলের বিরুদ্ধে একপ্রকার সর্বভারতীয় আন্দোলন করা হইল।

বিল উপস্থিত করিবার ভার ছিল স্যর শঙ্কর নায়রের উপর। তিনি বিহারের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। বিলের প্রচুর পরিমাণে সংশোধন করা হইল। যেসব কথার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহাদের কিছু পরিবর্তন করা হইল। মজহর-উল-হক সাহেব ছিলেন বিহারের প্রতিনিধি। তিনি সর্বদা আমাদের মত লইতেন। শেষটায় আমাদের সম্মতিক্রমে অনেক পরিবর্তিত রূপে বিলটি গৃহীত হইল।

এই প্রথমবার আমি বিহার সরকারের বিরুদ্ধে এত বড় আন্দোলন দাঁড় করাইয়াছিলাম ও তাহা সফল করিয়া তুলিয়াছিলাম। এই সময় হইতে আমি কংগ্রেসের কাজে বেশি যোগ দিতে লাগিলাম। এমনিতেই তো আমি ১৯১১ হইতেই বরাবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মেম্বর হইয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু যতদিন কলিকাতায় ছিলাম, ততদিন বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। যখন বিহারে আসিলাম তখন লোকের নজরও আমার দিকে পড়িল, আমি অনুভব করিলাম যে, জনসাধারণের কার্যে আরও অনুরাগী হওয়া জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এই পদে ছিলাম। যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইল, আর পুরাতন কংগ্রেসী লোক সরিয়া দাঁড়াইল, তখন আমি সম্পাদক হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে গভর্নর আমাকে সেনেটের সদস্য করিয়া লইলেন।

১৯১৬ সালের কংগ্রেসে বিহারের বিষয়ে অন্য এক প্রস্তাবও পাস হইয়াছিল—চম্পারনের নীলকর শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা হইতে পাটনা আসিবার পূর্বেকার আরও এই একটা কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ছাত্রসম্মেলনের প্রসঙ্গ তো ইতি-পূর্বেই করা হইয়াছে। ছাত্রাবস্থা শেষ হইয়া গেলেও, যখন ওকালতি করিতাম, তখনও ছাত্রসম্মেলনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বজায় থাকিত। ছাত্রেরাও আমাকে খুব বিশ্বাস করিত, আমিও নিজেকে তাহাদেরই এক-জন মনে করিতাম।

ছাত্রসম্মেলনের মুঙ্গের অধিবেশনে আমাকে সভাপতি করা হইল। উহাতে ইউনিভারসিটির বিষয়ে নেথন কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদ করা হয়। ইহা ছাড়া যেখানে যেখানে অধিবেশন হইত, অন্যভাবেও ছাত্রসংগঠনে সাহায্য করিতাম।

ঐ সময়ে হিন্দীতেও অনুরাগ বাড়িল। স্কুলে, এক কি দুই বৎসর পর্যন্ত, নীচের ক্লাসে আমি সংস্কৃত পড়িতাম। তাহার পর ফারসি পড়িতে লাগিলাম। সংস্কৃত ছাড়িয়া দিবার প্রধান কারণ ইহাই ছিল যে, বাবা চাহিতেন আমি উকিল হই। তাঁহার ধারণা ছিল, মকদ্দমার কাগজ-পত্র লেখা থাকিবে ফারসিতে, তাই ফারসি পড়িলে ওকালতির সুবিধা হইবে। পরে আমি বাড়িতে কিছু সংস্কৃত পড়িবারও চেষ্টা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু তাহা বেশি দিন চলিল না। তাই স্কুল কলেজে আমি বরাবর ফারসিই পড়িয়াছিলাম। ফারসিতে নম্বরও উঠিত খুব। ফারসির নম্বর না হইলে আমি এণ্ট্রান্সে প্রথম হইতাম না, কারণ অঙ্কে আমার নম্বর উঠিয়াছিল কম। হিন্দী পড়িবার তো কখনও সুযোগই আসে নাই। হিন্দীর অক্ষর মাত্র জানিতাম। বাড়িতে মায়েরা রামায়ণ পাঠ করিতেন। তাহাতে আমারও রামায়ণ পড়ার আগ্রহ হইয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত তো সকালে রামায়ণ পাঠ করিয়া পরে কিছু খাইতাম। এই নিয়ম কিছুদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। হিন্দীর অন্য বই দেখিবার সুযোগ কখনও পাওয়া যায় নাই।

পরীক্ষায় এক প্রশ্নপত্র আসিত তাহাতে ইংরেজী হইতে কোনও দেশী ভাষায়, আর দেশী ভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার জন্য দেওয়া হইত। এণ্ট্রান্স ও এফ. এ. পরীক্ষায় আমি উর্দুই দেশী ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। বি. এ.-তে পৌঁছিয়া ইচ্ছা হইল, হিন্দী লইব। বি. এ.-তে এক প্রবন্ধও লিখিতে হইত। আমি হিন্দী লইলাম। হিন্দীতে পাসও করিয়া গেলাম। এইভাবে হিন্দীর সঙ্গে যোগ আরম্ভ হইল।

কলিকাতায় হিন্দীর লেখক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সেবক অনেক সজ্জন থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত জগন্নাথপ্রসাদ চতুর্বেদী ছিলেন বিহারের লোক। বিহারী ক্লাবে তাঁহার সর্বদা আসা-যাওয়া ছিল। বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত উমাপতি দত্ত শর্মাও ছিলেন বিহারের। তাঁহার সহিতও ঐ ক্লাবেই আলাপ হইয়াছিল। ইঁহাদের মাধ্যমে অন্যান্য লোকদের সঙ্গেও পরিচয় হইল। কলিকাতায় হিন্দী সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হইল। তাহাতে আমি যথেষ্ট মন দিতে লাগিলাম। উহার প্রতিষ্ঠা-বৎসর তো মনে নাই, কিন্তু এইটুকু মনে আছে যে, উহার অধিবেশনে আমিও কখনও কখনও প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, এবং তাহা পণ্ডিতদের ভালও লাগিয়াছিল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে হইল, নিখিল-ভারত-হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন করিতে হইবে; এই বিষয়ে লেখালেখি হইল। হিন্দী সাহিত্যসেবীরা এই প্রস্তাবকে সাদরে বরণ করিয়া লইল; কাশীতে প্রথম অধিবেশন হইল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পূজনীয় মালব্যজী ছিলেন সভাপতি। এইজাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ উহার আরম্ভ হইতেই হইল।

তৃতীয় সম্মেলন যখন কলিকাতায় হইবার কথা, তখন আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান সম্পাদক করা হইল। আমি ওকালতি আরম্ভ করিবার পর তখনও এক বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনাই ছিল না। তথাপি লোকদের এরূপ ইচ্ছা হইল, আমাকে ঐ ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই উপায়ে সম্মেলনের প্রধান নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেল। কলিকাতায় বড়বাজারের লোকদের সঙ্গে তো বিশেষ করিয়া পরিচয় হইল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় পণ্ডিত বদরীনারায়ণ চৌধুরী 'প্রেমঘন' মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মেলন খুব সফলতার সঙ্গে হইয়া গেল। নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনের ব্যবস্থা আমাকে এই প্রথম করিতে হইল। কঠোর পরিশ্রম করিতে হইল, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় সমস্ত কাজ ঠিকভাবে হইয়া গেল।

ঠিক ঐ সময়েই পাটনায় কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল। বিহারী বলিয়া আমার উহাতে যোগ দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে হইতেছিল, আমিও তাহাই চাহিতেছিলাম। সম্মেলনের দিনও এভাবে ফেলা হইয়াছিল যে, কেহ ইচ্ছা করিলে সম্মেলনের কাজ শেষ করিয়া পাটনা কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান সম্পাদক ছিলাম বলিয়া আমার উপর এত দায়িত্ব ছিল যে আমি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতে পারিলাম না। এইজন্য পাটনা কংগ্রেসে যোগ দিতে পারি নাই।

পাটনায় পেঁৗছিয়া আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া গরিব ছাত্রদের সাহায্যের জন্য এক তহবিল খুলিলাম, তাহা হইতে কয়েকজন ছাত্রের

সাহায্য দেওয়া হইত। এই কাজ ছাত্রসম্মেলনই আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু পরে আমি ইহা নিজের হাতে লইয়াছিলাম।

১৯১৩ সালে বাংলা ও বিহারে খুব ভয়ানক বন্যা হয়। প্রথম বন্যা হয় বর্ধমান জেলায়। বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় অর্থসংগ্রহ করা হইল। অনেক স্বেচ্ছাসেবক সেখানে গেল। সংবাদপত্রে এবিষয়ের খবর খুব ছাপা হইল। অল্পদিন পরেই তেমনই এক ভয়ংকর বন্যা 'পুনপুন' নদীতে হইল, পাটনায়ও আসিল। আমাদের মনে হইল, বন্যাপীড়িতদের জন্য কিছু সাহায্য প্রয়োজন। কলিকাতাতেই কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল। সঙ্গীদের লইয়া পাটনায় পেঁৗছিলাম। পাটনায় তো ছাত্র-সম্মেলনের কার্যালয় ছিলই। সেখান হইতে উৎসাহী ছাত্রদের সাহায্যে এক স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিলাম। বন্যাপীড়িত স্থানে খাদ্যদ্রব্য লইয়া লোকদের সাহায্যের জন্য পেঁৗছিলাম। অবস্থা ভয়ানক হইয়াছিল। কতক-গুলি গ্রামে ভিতর-বাড়িতেও জল উঠিয়াছিল। আমরা যখন পেঁৗছিলাম তখন তাহাদের ঘরে যে খাদ্য ছিল তাহা পচিয়া যাইতেছিল। এইজন্য আমরা ছাতু, চিঁড়া, ছোলাভাজা, তৈরি খাদ্যই বেশির ভাগ বিতরণ করিতাম। নৌকায় করিয়া দূরে দূরে যাইতাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া রেলওয়ে স্টেশন কাছে পড়িলে প্ল্যাটফরমে গিয়া শুইয়া থাকিতাম। মনে আছে, কত রাত্রি প্ল্যাটফরমে ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। বিহারে হয়তো ইহাই প্রথম সেবাসমিতি। ইহা কোনও প্রতিষ্ঠিত সমিতি ছিল না। সাময়িকভাবে এই প্রতিষ্ঠান লোকসেবার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেবাসমিতির সূচনা তো এইভাবেই হইল। আমরা পাটনায় আসিয়া সোন-পুরের মেলায় যাত্রীদের সাহায্য করিবার জন্য ঐ সমিতি রীতিমত কায়েম করিলাম। সেবাসমিতির কার্যে দাদার খুব আগ্রহ ছিল। প্রতিবৎসর সোনপুরের মেলায় তিনি নিজে অনেক সেবা করিতেন। মৃত্যু পর্যন্ত অনেক বৎসর ধরিয়া তিনিই উহার অধ্যক্ষ ছিলেন।

বন্যাপীড়িতদের সেবা করিবার সময়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরম ঘিরিয়া এক অতি সুখের স্মৃতি আছে। সারাদিন কাজ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙিল। বোধ করিলাম, কে যেন খুব আদর করিয়া আমার পা ও গা টিপিয়া দিতেছে, আমার ক্লান্তি যাহাতে দূর হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে। চাহিয়া দেখি, আমার বন্ধু শম্ভুশরণ। সে-ও সারাদিন আমারই সঙ্গে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নিজের ক্লান্তি সে গ্রাহ্য না করিয়া আমাকে আরাম দিতেছিল।

১৯১৬ সালে লখনৌয়ের কংগ্রেস খুব সমারোহে হইয়া গেল। যখন ১৯০৭ হইতে কংগ্রেসে দুই দল হইয়া গেল, আর গরম দল কংগ্রেস হইতে পৃথক হইল, তখন হইতে লোকসমাজে কংগ্রেসের আদর কমিয়া গেল। তাহার বাৎসরিক অধিবেশনেও কমলোক আসিত। এমন কি, ১৯১২ সালে যখন পাটনায় কংগ্রেস হয়, তখন প্রতিনিধিদের সংখ্যা খুব কম ছিল। দেশহিতৈষীরা চেষ্টা করিতেছিলেন দুই দলের মধ্যে মিলন স্থাপন করিতে, যাহাতে কংগ্রেসে আবার প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এই চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু ইহা সার্থক হয় ১৯১৬ সালের কংগ্রেসেই। ইহাতে সকল দলের লোকই উপস্থিত ছিলেন। একদিকে লোকমান্য তিলক আসিয়াছিলেন সদলবলে; অন্যদিকে নরম দলের প্রায় সকল নেতাই উপস্থিত ছিলেন। মিসেস বেসাণ্টও আসিয়াছিলেন। ঐ বৎসর মুসলিম লীগের সঙ্গেও বোঝাপড়া হইল। মুসলমানেরাও বহুসংখ্যক উপস্থিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীও এই কংগ্রেসে আসিছিলেন। তিনি তো ১৯১৫ সালেই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া সারা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু এই কংগ্রেসে তিনি কোনও প্রস্তাব সম্বন্ধেই কিছু বলেন নাই।

বিহারের প্রতিনিধিরাও দলে ভারি হইয়া লখনৌয়ে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল চম্পারনের। রাজকুমার শুক্ল ছিল চম্পারনের একজন গ্রামের চাষী। সে হিন্দী জানিত সামান্য, অন্য কোনও ভাষা জানিত না। যাহারা স্বয়ং নীলকর গোরার অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল সে ছিল তাহাদের মধ্যে একজন। চম্পারন জেলার উৎপীড়িত প্রজাদের তরফ হইতে সে কংগ্রেসে গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় কিছু পূর্ব হইতেই ছিল, কারণ কখনও কোনও মকদ্দমা হাই-কোর্ট পর্যন্ত উঠিলে ফিয়ের কথা না ভাবিয়াই আমি তাহাদের উকিল-রূপে কাজ করিয়া দিতাম। কিন্তু একাজে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ তাহা-দিগকে বেশি সাহায্য করিতেন। তাই তাঁহারই সঙ্গে ইহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। চম্পারন জেলার অবস্থা তিনি খুব বেশিরকমই জানিতেন।

তখন বিহারের প্রতিনিধিরা দুইটি বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন এবং কংগ্রেসে উহাদের সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে চাহিতেন—এক, পাটনা ইউনিভারসিটি বিল; দুই, চম্পারনের নীলকর গোরাদের সমস্যা। রাজ-কুমার শুক্ল, ব্রজকিশোরবাবু প্রভৃতির খুবই ইচ্ছা যে, কংগ্রেস এই দুই বিষয়েও প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে

ব্রজকিশোরবাবু এই দুই বিষয়ের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনে এক প্রস্তাবও গ্রহণ করা হইয়াছিল। তিনি ছিলেন কাউন্সিলের সভ্য। সেখানেও তিনি এবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও এক প্রস্তাবও আনিয়াছিলেন। কাউনসিলের মধ্যে ও তাহার বাহিরেও এক প্রকার এই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া, আইনের গণ্ডির মধ্যে এবিষয়ে যে কাজ হইতে পারে তাহা তিনি করিতেছিলেন। যতদূর সম্ভব, মকদ্দমাতেও সেখানকার চাষী রায়তদের সাহায্য করিতেন।

বিহারের লোকদের জানা ছিল যে, কর্মবীর গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক কিছু করিয়া হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন, তাই তাঁহাকে দিয়া এই কাজে সাহায্য লইতে হইবে। রাজকুমার শুক্ল প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া চম্পারনের অবস্থা কিছু কিছু শোনাইলেন। তিনি খানিকটা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এদিক হইতে বলা হইল, কংগ্রেসে তিনি এক প্রস্তাব উপস্থিত করুন। তিনি অস্বীকার করিলেন। বলিলেন যে, যতক্ষণ ওখানকার অবস্থা তিনি নিজে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া নিজে সন্তুষ্ট না হইতেছেন, ততক্ষণ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না। জোর দিলে পর তিনি বলিলেন, সেখানে গিয়া অবস্থা দেখিবার জন্য তিনি প্রস্তুত, কয়েকদিনের পর তিনি সেখানে যাইবেনও বটে। ব্রজকিশোরবাবু কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। রাজকুমার শুক্লও ওবিষয়ে কিছু বলিলেন। একজন নিতান্ত গ্রাম্য চাষী কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে কোনও প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বলিল, সম্ভবত এই প্রথম। কংগ্রেসে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

বিহারের প্রতিনিধিগণ ব্রজকিশোরবাবুকে লইয়া যখন গান্ধীজীর কাছে যান তখন আমি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম না। এ কাহিনী আমি পরে শুনিলাম। আমি গান্ধীজীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন আমি তাহার খবরও খুব কমই রাখিতাম। শুধু এইটুকু জানিতাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি কোনও বড় ও ভাল কাজ করিয়াছেন। একথা জানিতাম না যে, তিনি দেশের প্রসিদ্ধ নেতাদের মধ্যে এক বড় নেতা। জানি না কেন, রাজকুমার শুক্ল তাঁহার উপর এতখানি নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া চম্পারন আসার কথায় তাঁহাকে রাজি করাইল।

কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনের কয়েকদিন পরে গান্ধীজী কলিকাতায় আসিলেন। তিনি রাজকুমার শুক্লকে চিঠি লিখিলেন : তুমি কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা কর—সেখান থেকে আমরা দুজনে একসঙ্গে চম্পারন যাব। মফস্বলে চিঠি দেরি করিয়া পৌঁছিল, রাজকুমার শুক্লের নিকট পত্র পৌঁছিবার পূর্বেই গান্ধীজী কলিকাতা হইতে ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজকুমার শুক্ল আবার চিঠি লিখিলেন; গান্ধীজী উত্তরে জানাইলেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেসের বৈঠক কলিকাতায় হইবে, তিনি ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন, রাজকুমার শুক্ল যেন সেখানেই তাঁহার সংগে দেখা করেন। আমিও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, দৈবক্রমে আমি গান্ধীজীর পাশেই এক চেয়ারের উপর বসিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ইহা জানা ছিল না যে, রাজকুমার শুক্লের সংগে তাঁহার পত্রের আদানপ্রদান হইয়াছে, আর তিনি ওখান হইতে বিহারে আসিবেন। নিজের অভ্যাসবশে আমি কাহারও সংগে জোর করিয়া অথবা আগাইয়া গিয়া আলাপ করিতে জানিতাম না। আমি গান্ধীজীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, একটা কথাও আমি বলিলাম না। উক্ত কমিটির লোকেরা, বিশেষ করিয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সম্পাদক হইবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাহা অস্বীকার করিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া সব দেখিতে থাকিলাম, কখনও কখনও ইহাও ভাবিতেছিলাম যে, লোকের যখন এতখানি আগ্রহ, তখন তাঁহার অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু আমি মুখে কিছু বলিতে পারি নাই।

কমিটির কাজ শেষ হইলে গান্ধীজী বাহিরে গেলেন; রাজকুমার শুক্ল তাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন, সেই রাত্রেই তিনি রাজকুমার শুক্লের সংগে সোজা পাটনায় চলিয়া আসেন। আমি কিছু দেরি করিয়া বাহিরে আসিলাম, এইজন্য তাঁহাদের সংগে দেখা হয় নাই। গান্ধীজীও জানিতেন না যে, আমি বিহারের অধিবাসী এবং রাজকুমার শুক্ল পাটনায় আমারই বাসায় তাঁহাকে লইয়া যাইবে, এইজন্য তিনিও আমাকে কিছু বলিলেন না।

এই বৈঠক ইস্টারের ছুটিতে হইয়াছিল। আমি কলিকাতা হইতে পুরী চলিয়া গেলাম। গান্ধীজী পাটনায় আসিলেন, রাজকুমার শুক্ল তাঁহাকে আমার বাসায় লইয়া গেল, কিন্তু সেখানে এক চাকর ছাড়া আর কেহ তো ছিল না। চাকর ভাবিল মফস্বল হইতে কোন মক্কেল আসিয়াছে, এইজন্য সে তাঁহাকে বাহিরের এক ঘরে থাকিতে দিল, আর কোন প্রকার সমাদর করার পরিবর্তে খানিকটা অনাদরের ভাবই দেখাইল। গান্ধীজী খানিকক্ষণ থাকিলেন, ততক্ষণ মজহর-উল-হক্ সাহেব খবর পাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে আসিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় গান্ধীজী মজঃফরপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেখানে আচার্য কৃপালনীর নিকটে গিয়া উঠিলেন। সেখানে কয়েকজনের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চম্পারন যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ব্রজকিশোরবাবু দ্বারভাঙ্গায় ওকালতি করিতেন, তাঁহাকে তার দিয়া ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছিল।

গান্ধীজীর অভিপ্রায় ছিল, তিনি চম্পারনে গিয়া সেখানকার চাষীদের

সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবেন, এবং তাহাদের দুঃখের কথা তাহাদের মুখ হইতেই শুনিবেন। কিন্তু সেখানকার গ্রাম্য কথা তিনি বুঝিতে পারিবেন না। তাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দোভাষীর কাজ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কেহ যায়। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দুই-চার দিনেই সব কথা বুঝিতে পারা যাইবে। রাজকুমার শুক্লও ঐরূপ বুঝাইয়াছিল। তাই তিনি দুই-চার দিনের জন্যই তৈরি হইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রজকিশোর-বাবুর ঠিক ঐ সময়ে কলিকাতায় কিছু কাজ ছিল। তিনি নিজে গান্ধীজীর সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি দুইজন বন্ধুকে গান্ধীজীর সঙ্গে থাকিবার জন্য দিলেন; তাঁহারা উকিল। তিনি ইহাও ভাবিলেন যে, কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর তিনি নিজে চম্পারন যাইবেন, প্রয়োজন হইলে আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

মোতিহারী হইল চম্পারন জেলার সদর শহর। গান্ধীজী সেখানে আসিয়া পেঁাছিলেন। পেঁাছিবার পর তিনি গ্রামে যাইবেন ভাবিলেন। কোনও গ্রামের এক প্রতিষ্ঠাপন্ন কৃষকের বাড়ি দুই-চার দিন পূর্বেই নীল-করদের তরফ হইতে লুঠ করা হইয়াছিল। সেই লুট-পাটের চিহ্ন তখনও বর্তমান ছিল। সে আসিয়া সমস্ত কাহিনী বলিল। গান্ধীজী সেখানে যাইতে চাহিতেছিলেন। পথেই কলেক্টরের হুকুম আসিল : আপনি এই জেলা ছাড়িয়া বাহিরে যান। তিনি জেলা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে অস্বীকার করিলেন। ঐ বে-আইনি হুকুমের মকদ্দমার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেইদিন ইহাও বোঝা গেল যে, মকদ্দমা চলিবে। আমি সেইদিন পুরী হইতে পাটনায় ফিরিয়াছিলাম। কাছারিতে তিনি এ-সমস্ত কথা আমার নিকট তার করিয়া জানাইয়াছিলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে আমার কোনপ্রকার সম্পর্কের সুযোগ এই প্রথম হইল। আমি কলিকাতায় তার করিয়া ব্রজকিশোরবাবুকে ডাকিয়া লইলাম। পরের দিন সকালের গাড়িতে মিঃ মজহর-উল্-হক্ ও মিঃ পোলক— যিনি ঐ সময় ভারতবর্ষেই ছিলেন—পূর্ব রাত্রে গান্ধীজীর তার পাইয়া পাটনায় আসিয়া পেঁাছিয়াছিলেন। ব্রজকিশোরবাবু, অনুগ্রহনারায়ণ আর শম্ভু-শরণের সঙ্গে আমি মোতিহারী রওনা হইয়া গেলাম। আমরা বিকাল-বেলায় প্রায় তিনটার সময় সেখানে পেঁাছিলাম। তখন পর্যন্ত মামলা আদালতে পেশ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু শুনানির পর রায়ের জন্য তিন-চার দিন মুলতবী রাখা হইয়াছিল।

গান্ধীজী বাবু গোরখপ্রসাদের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন। আমরা সকলে যখন সেখানে পেঁাছিলাম, তখন গান্ধীজী এক কুর্তা পরিয়া বসিয়া ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার আগে পরিচয় ছিল না। পরিচয় করানো হইলে আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন : আপনি এসে গেছেন, আপনার

বাড়িতেই তো আমি গিয়েছিলাম। আমি সেই কাহিনী খানিকটা শুনিয়া-ছিলাম, এইজন্য একটু লজ্জা হইয়াছিল। কাছারিতে যাহা কিছু হইয়া-ছিল তিনি তাহা সমস্ত শুনাইলেন।

'চম্পারনে মহাত্মা গান্ধী' নামক পুস্তকে, যাহা কিনা উক্ত আন্দোলনের সফল সমাপ্তি হইবার অল্প দুই-চার দিনের মধ্যেই লেখা ও প্রকাশ করা হইয়াছিল, আমি চম্পারনের সমস্ত কথা সবিস্তারে দিয়াছি। এখানে শুধু নিজের সম্পর্ক কতখানি, তাহাই উল্লেখ করিতে চাই।

গান্ধীজীকে প্রথম প্রথম দেখার সময়ে আমার উপর বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নাই। আমি চম্পারনের অবস্থা অল্পবিস্তর জানিতাম। কিন্তু বিশেষ করিয়া ব্রজকিশোরবাবুর আদেশ মান্য করিবার জন্যই প্রথমে সেখানে গিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, যাহা কিছু কাজ পড়িবে, করিব। স্বপ্নেও এ কথা মনে আসে নাই যে, সেখানে পৌঁছিতে না পেঁাছিতে জেলে যাওয়ার জটিল প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে।

গান্ধীজী সমস্ত কথা বলিয়া আমাদের জানাইলেন যে, অন্য সব কথা যেন তাঁহার সঙ্গী ধরণীধর ও রামনবমীবাবুর নিকট হইতে শুনিয়া লই। এই বলিয়া তিনি মিঃ পোলকের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা ঐ দুই বন্ধুর নিকট সবিস্তারে সমস্ত কথা শুনিলাম, বুঝিলাম যে, গান্ধীজী প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়া ভাইসরয় ও নেতাদের নিকট পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখিতেছিলেন এবং আদালতের জন্য তাঁহার বিবৃতিও রাত্রেই প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা দোভাষীর কাজ করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন সেই দুই জনকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন : আমার কারাদণ্ড হলে আপনারা কি করবেন? তাঁহারা হয়তো প্রশ্নের গভীরতা পুরাপুরি বুঝিতে পারেন নাই। ধরণীধরবাবু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন : দোভাষীর কাজ আর থাকবে না—আমরা যার যার বাড়ি চলে যাব। এ-কথা শুনিয়া গান্ধীজী প্রশ্ন করিলেন : আর এই কাজ এমনিই ছেড়ে দেবেন? ইহার পর তাঁহাদের কিছু ভাবিতে হইল। ধরণী-ধরবাবু বয়সে বড় ছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন, ঐ তদন্তের কাজ চালু রাখিবেন, তাহার উপর যখন সরকারের তরফ হইতে নোটিশ হইয়া যাইবে তখন তিনি জেলে যাইতে তৈরি নন বলিয়া নিজে তো চলিয়া যাইবেন, আর অন্য উকিল পাঠাইবেন। সেই উকিল তদন্তের কাজ করিবেন, আর তাঁহার উপরও যদি নোটিশ হয় তাহা হইলে তিনিও চলিয়া যাইবেন আর তাঁহার বদলী আর একজন আসিবেন— এই প্রকারে কাজ চালু রাখা হইবে।

ইহা শুনিয়া গান্ধীজী কিছু খুশি হইলেন, কিন্তু পুরাপুরি হইলেন না; উঁহাদেরও মন খুশি হইল না। উঁহারা রাত্রে এই কথাই ভাবিতে থাকিলেন, না জানি এই লোকটি কোথা হইতে আসিয়া এখানকার

রায়তদের কষ্ট দূর করিবার জন্য জেলে যাইতেছেন; আর আমরা যাহারা এখানকার অধিবাসী হইয়াও রায়তদের সাহায্য করিতেছি বলিয়া গর্ব করিতেছি, আমরা যদি এইভাবে বাড়ি ফিরিয়া যাই তবে তাহা ভাল হইবে না।

কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সময়ে জেলের কথা কেহ কখনও মনেও স্থান দেন নাই। লোকে মনে করিত, জেলখানা একটা ভয়ংকর জায়গা। গ্রেপ্তার হইবার পর সেখান হইতে বাঁচিবার জন্য লোকে হাজার টাকা খরচ করিয়া ও জামিন দিয়া মুক্তি পাইত। যদি কেহ বাধ্য হইয়া জেলে যায় তাহা হইলেও সে টাকা খরচ করিয়া সেখানে আরামের চেষ্টা করে। আর এখানে এই লোকটি, যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এতখানি কাজ করিয়া আসিয়াছে, সে-ই অজানা চাষীদের জন্য সমস্ত কষ্ট সহিতে প্রস্তুত। এ-অবস্থাতেও আমরা বাড়ি ফিরিয়া যাইব, ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়! এদিকে সংসারের কথাও তো ভাবিতে হইবে।

সারা রাত্রি আলোচনার পর পরের দিন সকালে যখন গান্ধীজীর সংগে ইঁহারা আদালতে যাইতেছিলেন, তখন এই সমস্ত চিন্তা চরমে উঠিল। ইঁহারা স্পষ্ট বলিয়া দিলেন : আপনি জেলে যাওয়ার পর যদি দরকার হয় তো আমরাও জেলে যাব।

ইহা শুনিয়াই গান্ধীজীর মুখ উৎফুল্ল হইল, তিনি খুব খুশি হইয়াই বলিয়া উঠিলেন : এখন যুদ্ধে জয় হবে।

সেখানে পৌঁছিয়াই এই সমস্ত কথা আমরা ঐ দুই ভাইয়ের নিকট শুনিলাম। এখন তো আমাদের সামনে জেলে যাওয়ার প্রশ্ন আসিয়া গেল। আমরা স্থির করিয়া লইলাম, প্রয়োজন হইলে আমরাও জেলে যাইব। আমরা গান্ধীজীকে এই সংকল্প শুনাইলাম। তিনি কাগজ-কলম লইয়া সকলের নাম লিখিয়া লইলেন। আমাদের তিনি কয়েকটা দলে ভাগ করিলেন; ইহাও স্থির করিয়া দিলেন, কোন্ দলের পর কোন্ দল জেলে যাইবে। প্রথম দলের সর্দার ছিলেন মজহর-উল্-হক্ সাহেব। পরেরটির ছিলেন ব্রজকিশোরবাবু। আমাকেও একদলের সর্দার করা হইল। সেখানে পৌঁছাইবার তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই এইসব কথা স্থির হইল। মকদ্দমায় তিন-চার দিনের পর রায় দিবার কথা ছিল। ঐদিন গান্ধীজীর জেলে যাওয়ার কথা। মজহর-উল্-হক্ সাহেবের হাতে গোরখপুরের কয়েকটি মকদ্দমা ছিল। তিনি সেখানে চলিয়া গেলেন—যাহাতে মামলা শেষ করিয়া নির্ধারিত দিনের পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়া নেতৃত্ব করিতে পারেন।

ব্রজকিশোরবাবু নিজের বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা করিবার জন্য দারভাংগা চলিয়া গেলেন। আমরা মোতিহারীতেই থাকিয়া চাষীদের বক্তব্য শুনিতে ও লিখিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, যখন ইঁহারা দুই জন ফিরিয়া

আসিবেন, তখন আমরাও একে একে বাড়ি গিয়া বাড়ির লোকদের বুঝাইয়া-সুঝাইয়া জেলযাত্রার আয়োজন করিয়া ফিরিব।

গান্ধীজী তাঁহার আত্মকথায় লিখিয়াছেন যে, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ঐদিন হইতে তাঁহার বিহারের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল, আর আমরা তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়া গেলাম।

চম্পারনের তদন্ত শুরু হইয়া গেল। চাষীরা হাজারে হাজারে তাহাদের বক্তব্য লিখাইল। আমরাই এইরূপ বিশ-পঁচিশ হাজার বিবৃতি লিখিয়াছিলুম। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ম্যাজিস্ট্রেট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সরকারি হুকুমে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল, আর তাঁহাকে জেলায় তদন্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। তদন্ত হইতে জানা গেল যে, আমরা যে-সব জুলুমের কথা শুনিয়াছিলাম, ওখানকার অবস্থা তাহা হইতেও অনেক পরিমাণে খারাপ। আগামী অধ্যায়ে এ-বিষয়ে সংক্ষেপে বলিব; এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রথম সাক্ষাতেই আমরা স্বেচ্ছায় গান্ধীজীর বন্ধনে ধরা দিলাম। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই আমাদের শুধু তাঁহার প্রতি প্রেম নয়, তাঁহার কার্য-পদ্ধতির উপর বিশ্বাসও বাড়িয়া চলিল। চম্পারনের অধ্যায় সমাপ্ত হইতে হইতে আমরা সকলে তাঁহার একান্ত ভক্ত ও তাঁহার কার্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ অনুসরণে ব্রতী হইয়া পড়িলাম।

চম্পারন আন্দোলনের পূর্বে

চম্পারন জেলায় ইংরেজ প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব হইতে নীল চাষ করিত ও করাইত। প্রায় সমস্ত জেলায় যেখানে যেখানে নীল হওয়া সম্ভব ছিল সে-সব জায়গায় নিজেরা নীল তৈরি করিবার কারখানা খুলিয়াছিল, তাহা ছাড়া অনেক জমি দখল করিয়া লইয়া নিজেরাই লাঙল-বলদ দিয়া নীল চাষ করাইত। জেলার অনেকখানি অংশ বেতিয়ারাজের জমিদারির মধ্যে। তাহারা অনেক গাঁয়ের মালগুজারি আদায় করিবার জন্য বেতিয়ারাজের নিকট হইতে ঠিকা লইয়াছিল, আর এইভাবে ঐ সব গ্রাম তাহাদের দখলে আসে। যে-সব গ্রামের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব হইল, সেখানকার অধিবাসী রায়তদেরও নিজের নিজের জমিতে নীলকরদের জন্য নীল বুনিতে বাধ্য করিত। ক্রমশঃ তাহারা ইহা আইনের নামে চালাইতে লাগিল—দাবি করিতে লাগিল যে, নিজের নিজের খেতে বিঘা প্রতি পাঁচ কাঠা বা তিন কাঠা

জমিতে অবশ্য নীল বপন করিবে, রায়তদের এ বিষয়ে বাধ্য করিবার অধিকার তাহাদের আছে। এই প্রথাকে তাহারা পাঁচ-কাঠিয়া বা তিন-কাঠিয়া বলিত। নীল বুনিতে অস্বীকার করিবে, এমন সাহস কোনও রায়তের ছিল না। যদি কেহ সাহস করিয়া সে-কথা বলিতও, তবে তাহার উপর হাজারো রকমের জুলুম চলিত, সে বাধ্য হইত নীল বুনিতে। বাড়ি-ঘর খেত-খামার লুঠ করিত, খেতে গো-মহিষ চরানো হইত, মিথ্যা মকদ্দমা বাধানো হইত, জরিমানা আদায় করা হইত, মারধরও করা হইত। এই ভয়ে প্রায় সব রায়তেরাই তিন-কাঠিয়া মানিয়া লইয়া প্রতি বিঘায় তিন কাঠা করিয়া নীল বুনিয়া দিত। খেতের মধ্যে সবচেয়ে যে খেত ভাল, নীলকর তাহা বাছিয়া লইয়া সেখানে নীল বুনিতে বলিত। নীল বোনার কাজ চাষীকে অন্য সব কাজের আগেই শেষ করিতে হইত। নীল তৈরি হইলে উহা কাটিয়া কুঠিতে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। এইজন্য নীলকর বিঘা পিছু রায়তকে কিছু দিত, তাহাতে কখনও পুরাপুরি খরচ কুলাইত না। গভর্নমেণ্টের অফিসার ঐ গোরাদেরই সাহায্য করিত। যদি কোনও অফিসার সাহস করিয়া ন্যায় বিচার করিতে চাহিত, তবে, সরকারের উপর নীলকরদের প্রভাব এতখানি ছিল যে, সে বিপন্ন হইত। অফিসার খাঁটি হইলে নীলকরদের জুলুম ও তিন-কাঠিয়ার বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইত কিন্তু তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না। কখনও কখনও কোন রায়ত ঘাবড়াইয়া গিয়া হাঙ্গামা করিয়া ফেলিত, হয়ত কোনও নীলকরকে ধরিয়া মারিত, কিংবা নিজেদের মধ্যে একত্র হইয়া অন্য কোনও প্রকারের বিদ্রোহ শুরু করিত। কিন্তু তাহাতেও তাহারা নীলকরদের প্রতিরোধ করিবে কেমন করিয়া? ফলে গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করা হইত। পুলিশ ও কাছারির আমলাদের সাহায্যে বেচারি রায়তকে সর্বপ্রকারে জেরবার করা হইত।

গভর্নমেণ্টের উপর নীলকর গোরাদের এত প্রভাব ছিল যে, তাহারা ভূস্বত্ব আইনের এক ধারা প্রস্তুত করিল; জমিদারের ইচ্ছামত রায়তকে যেখানে কোনও বিশেষ ফসল বুনিতে বাধ্য করা যাইতে পারে, সেখানে যদি সে নিজে তাহা হইতে রেহাই চায়, তবে জমিদারের অধিকার আছে যে, এই রেহাইয়ের বদলে তাহার খাজনা যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারে। সাধারণ-ভাবে ইচ্ছামত খাজনা বাড়াইবার অধিকার জমিদারের ছিল না। আইন-সংগত রেজিস্টারি পাট্টা হইতে সে টাকায় দুই আনার বেশি খাজনা বাড়াইতে পারিত না, একবার বাড়াইলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খাজনা আর বাড়ানো যাইত না। নীলকরের লাভের জন্য এই অধিকারের সীমা বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

বেতিয়ারাজের টাকার দরকার। তাহারা কিছু টাকা ধার করিল। এই

ধার পাওয়া গেল ইংলন্ড হইতে, নীলকরদের সাহায্যে। সুদে-আসলে শোধ করিবার জন্য গ্রামের উপর নীলকরদের দখল দেওয়া হইল, অনেক গাঁয়ে তাহাদের মোকররী স্বত্ব দেওয়া হইল। মোকররী স্বত্বের অর্থ এই যে, তাহারা একরকম গাঁয়ের জমিদার হইয়া গেল। শুধু প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তাহাদের রাজসরকারে মালগুজারি দিতে হইত। ঐ-সব গাঁয়ে তাহারা ইচ্ছামত ফসল উৎপাদন করিতে পারিত; রাজ-সরকারের সে-বিষয়ে কোনও অধিকার ছিল না। তাহাদের শুধু ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাই প্রাপ্য ছিল। এই ধরনের মোকররী গাঁয়ের যদি খাজনা বাড়ানো হয়, একগুণের বদলে যদি দ্বিগুণ আয় হয়, তাহা হইলে মোকররী স্বত্ব যাহার তাহারই আয় বাড়িবে, রাজসরকারের যাহা প্রথমে জুটিত তাহাই জুটিবে। যে-সব গাঁয়ে ঐ নীলকরদের মোকররী স্বত্ব ছিল না, সে-সব গাঁয়ের তাহারা শুধু নির্দিষ্ট কালের জন্য ইজারা লইয়াছিল। সেখানেও নির্দিষ্ট টাকা রাজসরকারে দিতে হইত। কিন্তু সময় পূর্ণ হইলে আবার ইজারা দেওয়া না দেওয়া, দিলে নূতন শর্তে দেওয়া, ইজারা-দার যে-মালগুজারি দিত তাহা ইচ্ছা করিলে বাড়াইয়া দেওয়া— রাজ-সরকারের এ-সব ক্ষমতা ছিল। যদিও কোনও ইজারা দেওয়া গাঁ, মেয়াদ পূর্ণ হইলেও নীলকরের হাত হইতে বাহিরে আসিত কিনা সন্দেহ, অথবা তাহার মালগুজারি কদাচিৎ বাড়ানো হইত, তাহা হইলেও এ-সব করিবার অধিকার তো রাজসরকারের ছিলই।

বেতিয়ার মহারাজা মারা গেলেন। মহারানীকে পাগল স্থির করিয়া দিয়া সমস্ত রাজসরকার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আসিল। ঐ-সব নীলকরদের মধ্য হইতে কোর্টের এক ম্যানেজার নিয়োগ করা হইল। এই-ভাবে প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া নীলকরদের দখলেই রাজসরকার থাকিল। গান্ধীজী যখন চম্পারনে পৌঁছিলেন তখন এক সিভিলিয়ান ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার পরে আর কোনও নীলকর ম্যানেজার হন নাই। এই-ভাবে নিজেদের খেতে আর রায়তদের খেতে তিন-কাঠিয়ারূপে নীলের চাষ করাইয়া চারাগাছ হইতে নীল তৈরি করা হইত। এই নীল বুনিবার প্রথা বিহারের অন্যান্য জেলাতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চম্পারনে ইহার যত জোর ছিল ততটা আর কোথাও নয়। যদি তাহারা নিজেরাই নীলের চাষ করিত, জোর করিয়া রায়তদের এইভাবে নীল না বোনাইত, তাহা হইলে উহাদের এ-কাজে লাভ হইত না। এইজন্য এ-জবরদস্তির প্রথা স্থায়ী করিয়া রাখিবার অতিশয় প্রয়োজন হইল, আর সেই প্রথা চলিতে থাকিল।

ইহার মধ্যে জার্মানী অন্যপ্রকার উপায়ে রং প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা নীলের রং হইতে সস্তা পড়িত।

নীলের দাম কমিয়া গেল। জুলুম আর জবরদস্তি করিয়া নীল তৈরি করা হইলেও নীলে আর লাভ হইত না। নীলকরেরা নিজেদের এই লোকসান গরিব রায়তের মাথায় চাপাইয়া নিজেদের জমিদারির লাভ বজায় রাখিতে চাহিল। এইজন্য তাহারা আইনের সেই দফার শরণ লইল, যাহাতে রায়তদের নীলের চাষ হইতে রেহাই দিয়া তাহাদের খাজনা ইচ্ছামত বাড়াইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। রায়তদের তাহারা বলিল, নীল বোনা হইতে তাহাদিগকে রেহাই দিবে, যদি রায়ত বর্ধিত হারে খাজনা দিতে রাজি থাকে। রায়ত জানিত, নীল হইতে নীলকরদের এখন লাভ থাকে না, তাই এখন নীলকর এই কারবার নিজেই ছাড়িয়া দিবে; এইজন্য তাহার খাজনা বাড়াইবার কথা স্বীকার করিয়া এই রেহাই লইবার প্রয়োজন নাই। যতদিন নীলে লাভ ছিল ততদিন তো নীলকরেরা তাহাদিগকে হাজার চেষ্টাতেও এই রেহাই দেয় নাই; এখন তাহারা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য জবরদস্তি রেহাই দিতে আরম্ভ করিল। মোকররী গাঁয়ে বাড়তি খাজনার লাভ গোরাদেরই মিলিত, বেতিয়ারাজের উহার উপর কোনও অধিকার ছিল না। এখন গোরারা হাজারে হাজারে খাজনা বৃদ্ধির দলিল করাইয়া লইল। এই সব দলিল করা হইল মার-পিট, মিথ্যা ধাপ্পাবাজি ও জবরদস্তির সাহায্যে। এই উপায়ে তাহারা ঐ-সব গাঁয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার আয় বাড়াইয়া লইল। যেখানে তাহাদের স্বত্ব শুধু ঠিকাদারের, সময় পূর্ণ হইলে পর বর্ধিত হারের জন্য লাভ বেতিয়ারাজেরই হইবে, সেখানে তাহারা খাজনা না বাড়াইয়া নগদ টাকা উশুল করাইল। যে-সব রায়তের কাছে টাকা ছিল না, তাহাদের দিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইল, অন্য উপায়েও টাকা লইল। এইভাবে প্রায় বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা নগদ আদায় করিল।

চম্পারনের খানিকটা অংশ এমন যে, সেখানে নীলের চাষ হইতেই পারে না। সেখানকার গাঁয়ে নীলকর নীলের চাষ না করাইয়া অন্য কোনও উপায়ে টাকাটা আদায় করিত। সেই সব গাঁয়ে পঞ্চাশ রকমের আবোয়াব আদায় করিত, যাহা আইনবিরুদ্ধ, অবৈধ। যখন জেলার নীল চাষের অংশে বর্ধিত হারে খাজনা বা নগদ সেলামি অনেক আদায় হইতে লাগিল, তখন নীলবর্জিত অংশেও তাহারা কিছু আদায় করিতে চাহিল, সেখানেও একটা না একটা বাহানায় হয় খাজনা বাড়াইল, নয় তো নগদ আদায় করিল। খাজনা বাড়াইবার একটি উপায় ছিল— কোনও রায়তকে পাট্টা দেওয়া হইলে তাহাতে এমন জমির বন্দোবস্ত তাহাকে দেওয়া হইল যাহা বাস্তবিক ছিলই না— এমন কি, মিথ্যা করিয়া জমির নাম ও চৌহদ্দি দেওয়া হইত, আর তাহার জন্য যে খাজনা বৃদ্ধি করিতে চাহিত তাহা রাখিত খাজনা হিসাবে। আইন অনুসারে খাজনা বাড়াইবার সীমা ছিল

টাকায় দুই আনা পর্যন্ত, কিন্তু নূতন জমির মালগুজারি জমিদার ইচ্ছা-মত লইতে পারিত। এইজন্য খাজনা বৃদ্ধির সীমাবন্দী অপেক্ষা নিশান-গাড়া করিয়া নূতন জমি বন্দোবস্ত দিয়া তাহারা নিজেদের বাঁচাইতে চাহিত, আর তাহাদের আশা ছিল, অল্পকালের মধ্যেই পুরাতন জমি ও নিশানগাড়া জমি দুইয়েরই খাজনা সমান করিয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে, নীল কেহ বুনুক আর নাই বুনুক, গাঁয়ে মোকররী বন্দোবস্ত হউক আর শুধু মেয়াদী ঠিকা বন্দোবস্তই হউক, সমস্ত গাঁ হইতে তাহারা হয় খাজনা বাড়াইয়া আয় বাড়াইত, নয় তো নগদ টাকা উশুল করিয়া লইত। গভর্ন-মেণ্ট তাহাদের পুরা সাহায্য করিল। যখন বৃদ্ধির পাট্টা লেখানো হইতে-ছিল, তখন গভর্নমেণ্ট ঐ-সব পাট্টা রেজিস্টারি করিবার জন্য বিশেষ রেজিস্টার নিযুক্ত করিল, যাহাতে রেজিস্টারি কাজ সহজে হইয়া যায়।

এ-সবই সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালে জার্মান যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বিদেশ হইতে রং আনা বন্ধ হইল। মনে হইল, নীলের চাষে আবার লাভের আশা আছে। নীলকরেরা, নিজেদের দেওয়া রেহাই গ্রাহ্য না করিয়া আবার জবরদস্তি তিন-কাঠিয়া নীল বুনিতে রায়তদের বাধ্য করিল। অনেক স্থলে তাহাতে ইহারা কৃতকার্যও হইতে-ছিল। এই সময় গভর্নমেণ্ট ঐ জেলার পুনরায় সার্ভে (মাপ জোখ) করাইতে আরম্ভ করিল। এই কাজ যখন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, তখন গান্ধীজী চম্পারনে পদার্পণ করিলেন। সার্ভেতে রায়তরা খাজনায় বেশি হারের পাট্টার সম্বন্ধে এজাহার দিল যে, জোর করিয়া তাহাদিগকে দিয়া পাট্টা লেখানো হইয়াছে। সার্ভে-সেটেলমেণ্ট অফিসার রায় দিল যে, পাট্টা জোর করিয়া লেখানো হয় নাই, সুতরাং সমস্ত খাজনা বৃদ্ধিই আইনমতে সিদ্ধ। রায়তদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ হইয়াছিল। ওদিকে জার্মান যুদ্ধ চলিতেছিল। রায়তদের কথা সাধারণত শোনাই হইত না, যুদ্ধে যখন নীল-করেরা যোগ দিয়াছিল তখন তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনার আরও কম সম্ভাবনা ছিল। রায়তরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোথাও কোনও উপায় তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িতেছিল না। তখন তাহারা গান্ধীজীর কাছে গেল। এই উপলক্ষে গান্ধীজী সেখানে আসিলেন।

রাজকুমার শুক্ল যখন গান্ধীজীকে চম্পারনে রায়তদের উপর জুলুমের কথা জানাইল, তখন তাহা সত্য বলিয়া গান্ধীজী বিশ্বাস করেন নাই। তাই তিনি তদন্তের জন্য চম্পারন আসিলেন। তিনি চম্পারনে আসিবার পূর্বেই জনগণের মধ্যে এক অদ্ভুত জাগরণের সৃষ্টি হইল। সেখানকার রায়তেরা এমনই দমিয়া গিয়াছিল যে তাহাদের কাছারি গিয়া নালিশ করিবার সাহসও ছিল না। যদি কেহ খুব সাহস করিয়া নালিশ করিত তাহা হইলেও কুঠির সেপাই এজলাস হইতে তাহাকে ধরিয়া টানিয়া নামাইত, এবং খুব মার লাগাইত। গান্ধীজী যখন চম্পারনের পথে মজঃফরপুর পৌঁছিলেন, তখন বিস্তর রায়তও মজঃফরপুর পর্যন্ত আসিল। তাহারা নিজেদের দুঃখের কথা তাঁহাকে শুনাইল। সেখানে নীলকরদের প্রতিষ্ঠান (প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন)-এর সম্পাদক এবং ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার গান্ধীজীকে চম্পারন যাইতে বারণ করে; তাহারা বলে, গভর্নমেণ্ট নিজেই রায়তদের ক্ষতির কথা ভাবিতেছেন— সার্ভে সেটেলমেণ্টের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় আছেন। তাহারা এ কথার উপরও জোর দিল যে, এই যুদ্ধের সময়ে ওখানে গিয়া গোলমাল শুরু করিলে তো ভাল হইবে না—দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবে। আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরাও বলিল যে, লড়াইয়ের সময়, কখন কি যেন হয়, ফ্যাসাদ হইলে কোনও দিকে ভাল হইবে না। কিন্তু গান্ধীজী যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা আরও প্রবল হইল। তিনি স্থির করিলেন, চম্পারন যাইতেই হইবে।

গান্ধীজী চম্পারনে পৌঁছিবামাত্র রায়তদের মনের ভয় না জানি কোথায় চলিয়া গেল। যাহারা আদালতে যাইতেও ভয় পাইত তাহারা দলে দলে গান্ধীজীর নিকট আসিয়া নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল। তাহাদের সরল হৃদয়ে না জানি কোথা হইতে এই দৃঢ় ভরসা আসিল যে, তাহাদের উদ্ধারকর্তা আসিয়া গিয়াছেন, এখন তাহাদের দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

যে-দিন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা আরম্ভ হইল আর তিনি আদালতে গেলেন, সে-দিন গাঁ হইতে হাজারে হাজারে রায়ত সেখানে আসিল। এতই ভিড় হইল যে, আদালতের দরজা ভাঙিয়া গেল। আদালতে গান্ধীজী বিবৃতি দিলেন। মকদ্দমা শেষ হইয়া গেল। তিন-চার দিন পরে গান্ধীজী অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল, তিনি তদন্ত করিতে পারিবেন। এখন হাজারে হাজারে রায়ত

আসিতে থাকিল। সকলে নিজের নিজের বিবৃতি লিখাইল। আমরা বিবৃতি লেখায় লাগিয়া গেলাম। গান্ধীজী আমাদের বলিয়া দিয়াছিলেন : তোমরা উকিল, খুব খোঁজ করে বুঝে জেরা করে বিবৃতি লিখবে। যা লিখবে তা যেন সত্য হয়।

আমরা সকাল ছয়টায় স্নানাদি শেষ করিয়া বিবৃতি লিখিতে শুরু করিতাম। বেলা এগারটা পর্যন্ত লিখিতাম। আবার খাওয়া ও খানিকটা বিশ্রামের পর একটা দেড়টা হইতে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত। সন্ধ্যার খাওয়া শেষ করিতাম ও গান্ধীজীর সঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম। মধ্যে যদি এমন কোনও বিবৃতি আসিত যাহা গান্ধীজীকে শীঘ্র বলা প্রয়োজন মনে হইত, তবে তাঁহাকে উহা শীঘ্র বলা হইত। নতুবা বিবৃতি লিখিয়া লিখিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইত, তিনিও পড়িয়া যাইতেন। এইভাবে আমরা কয়েক দলে ভাগ হইয়া অনেক দিন ধরিয়া বিবৃতি লিখিতে লাগিলাম। প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার রায়তের বিবৃতি লেখা হয়। ইহাতে সমস্ত জেলায় তোলপাড় হইল। আমরা কখনও থাকিতাম বেতিয়ায় কখনও মোতি-হারীতে। কিছুদিনের পর দুই দলে বিভক্ত হইয়া মোতিহারী ও বেতিয়া দুই জায়গাতেই বিবৃতি লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। কখনও কখন মহাত্মাজী গাঁয়েও চলিয়া যাইতেন অথবা আমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কোনও বিশেষ কথা ঠিক কিনা জানিবার জন্য গাঁয়ে পাঠাইতেন। আমাদের সকলের উপর গান্ধীজীর হুকুম ছিল যে, কেহ যেন কোথাও সভা করিয়া বক্তৃতা না দিই। আমাদের মধ্যে কেহই তখনকার দিনে চম্পারনে কোনও সভায় বক্তৃতা করে নাই, গান্ধীজী নিজেও করেন নাই।

তখনকার দিনে দেশে হোমরুল আন্দোলন খুব প্রবল ছিল। গান্ধীজী আমাদিগকে বলিতেন : তোমরা এই যা করছ তা হোল হোমরুলের সব-চেয়ে বড় কাজ। তোমরা ও-আন্দোলনে যোগ না দিলে কোনও ক্ষতি হবে না।

আমাদের তদন্তের ফলে চম্পারনের স্থানীয় অফিসারেরা খুব ঘাবড়াইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অনেকের মনে এই ধারণা হইল যে, চম্পারনে ইংরেজের রাজত্ব উঠিয়া যাইতেছে— লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, গান্ধীজীই সবচেয়ে বড় অফিসার, তাঁহার সম্মুখে জেলা কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যায়— নীলকরদের প্রভাব তো উঠিয়াই গিয়াছে, আমাদের অফিসারদের হাঁকডাকও উঠিয়া যাইতেছে। এইজন্য তাহারা ঘাবড়াইয়া প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইল। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীকে লিখিল সরকারের এক মেম্বরের সঙ্গে দেখা করিতে। গান্ধীজী পাটনায় আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন। তখন পর্যন্ত যত অভিযোগ আসিয়াছিল সবগুলির

এক পরিষ্কার সারসংক্ষেপ করিয়া তাহাকে দিলেন। সরকারি মেম্বর উহা গভর্নমেণ্টের নিকট পেশ করিল। এ বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। এদিকে আমাদের তদন্তের কাজ চলিতে থাকিল। এ পর্যন্ত বহু বিবৃতি লেখা হইয়াছিল। এজন্য বিবৃতি লেখার কাজ খানিকটা সংক্ষিপ্ত করা হইল। কিন্তু মফস্বলে গিয়া দেখাশোনার কাজ বাড়িল। গান্ধীজীর সঙ্গে নীলকরদের কিছু কথাবার্তা চলিল। তাহারাও তাঁহাকে কোথাও কোথাও লইয়া যাইত, নিজেদের কথা কহিত, কিছু দেখাইবার থাকিলে দেখাইত।

আমাদের পক্ষে গান্ধীজীর কার্যপ্রণালী একেবারে নূতন। ঐ ভাবের কাজ আমরা ইতিপূর্বে কখনও করিই নাই। আমরা জানিতাম, কংগ্রেসে অথবা কোনও সভায় কোনও বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া, যে-সব কথা আদালতে যাইতে পারে তাহা সেখানে পেশ করা, কি কাউন্সিলে যে-ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারে তাহাকে দিয়া কোনও কিছু সম্বন্ধে সেখানে প্রশ্ন করিয়া দেওয়া বা প্রস্তাব উপস্থিত করা— ইহাই যথেষ্ট। ইহার অপেক্ষা বেশি আর কি হইবে? গান্ধীজী ইহার কিছুই করিলেন না। তিনি রায়তদের বিবৃতি লইলেন। এইভাবে তিনি সর্বপ্রথমে সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিলেন। এইভাবে বিবৃতি লইতেই রায়তদের ভয় কিছুটা ছুটিয়া গেল। আমরাও এমন সব কথা বুঝিতে পারিলাম যাহা স্বপ্নেও সম্ভব বলিয়া মনে করি নাই। আমরাও নির্ভয় হইয়া গেলাম। দুই-একটা বিশেষ ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

উপরে বলিয়াছি, আমরা কয়েক দলে ভাগ হইয়া বিবৃতি লিখিতাম। পুলিশের লোক আশেপাশে লাগিয়া থাকিত। তাহারা রায়তদের নাম ইত্যাদি নোট করিয়া লইত। এইভাবে নীলকরের লোকেরাও রায়তদের নাম প্রভৃতি জানিয়া মালিকের কাছে সব কথা রিপোর্ট করিয়া আসিত। কাজ শুরু করিবার দুই-তিন দিনের মধ্যেই এক ঘটনা হইল। আমাদের একজন সঙ্গী বিবৃতি লিখিয়া লইতেছিলেন, সেখানে পুলিশের সব-ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া বসিয়া গেল। তখন তিনি ঐ জায়গা হইতে উঠিয়া রায়তদের সঙ্গে লইয়া খানিকটা দূরে অন্য জায়গায় গিয়া বিবৃতি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টর সেখানেও আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গীটির কিছু রাগ হইল। তিনি এক ধমক দিয়া সব-ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন : আপনার যা কিছু দেখবার শোনবার, দূর থেকেই দেখুন শুনুন. এত কাছে আসবেন না। সব-ইন্‌স্পেক্টর মহাত্মাজীর কাছে গিয়া ইহা লইয়া অভিযোগ করিল, বলিল : আমাদের উপর হুকুম আছে, যা-কিছু হচ্ছে তার খবর যেন রাখি। আপনার লোক যখন কাছে থাকতেই দিচ্ছে না তখন আমরা কি করে সে-হুকুম পালন করি!

গান্ধীজী বিবৃতিলেখক ভদ্রলোকটিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি? সব-ইন্‌স্পেক্টর যাহা-কিছু বলিয়াছিল, ভদ্রলোক সব স্বীকার করিলেন। তখন গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি একা ছিলেন, না সঙ্গে অন্য লোকও ছিল? তিনি বলিলেন: বিস্তর রায়ত ঘিরে বসেছিল, এক-একজন করে বিবৃতি লেখাচ্ছিল। গান্ধীজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি লুকিয়ে কিছু করছিলেন না তো? তিনি উত্তর দিলেন, না। গান্ধীজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তবে সব-ইন্‌স্পেক্টরের কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করছিলেন কেন? তিনি বলিলেন: লুকোবার কোনও কথা ওঠে নি; কিন্তু লোকটা এসে কাছেই বসে যেত। আমি তাকে একটু দূরে থেকে দেখাশোনা করতে বলেছিলাম। গান্ধীজী বলিলেন. এতগুলো রায়ত যখন আপনাকে ঘিরে রেখেছিল, আর আপনার কাজে তাদের দিক থেকে কোনও বাধা দেওয়া হচ্ছিল না, তখন যদি আরও একজন লোক ওখানে এসে বসে, তা হলে আপনি কেন অসুবিধা বোধ করবেন? আপনি একেও কেন ঐ-সব রায়তেরই একজন মনে করলেন না?

এই কথা শোনা মাত্র যেন সব-ইন্‌স্পেক্টরের রাগ জল হইয়া গেল। কিন্তু সে কিছু বলিতেও পারিল না। সে তো আসিয়াছিল নিজের পসার জমাইতে। এদিকে গান্ধীজী বলিয়া দিলেন, কোনও রায়তের চেয়ে তাহার মর্যাদা বেশি নয়, তাহার সঙ্গেও রায়তের মতই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার পর আমাদের মধ্য হইতে কেহ কোনও পুলিশ অফিসার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে ঘাবড়াইয়া যাইত না, কোনও পুলিশ অফিসারও বেশি কাছে আসিতে চেষ্টা করিত না।

গান্ধীজীর নামে মকদ্দমা রায়ের জন্য মুলতুবী আছে এমন সময় দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ আসিলেন। তিনি স্টেশন হইতে এক্কা চড়িয়া আসিলেন। এক্কায় কি করিয়া চড়িতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না, এইজন্য তাঁহার জুতা গাড়ির চাকায় লাগিয়া খইয়া গিয়াছিল। এই ধরনের ইংরেজ, যিনি এলোমেলো পোশাক পরেন, এক্কা চড়েন এবং ভারতবর্ষের লোকদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেশেন, আমি নিজের জ্ঞানে কখনও দেখি নাই। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, তিনি একজন অতিশয় পদস্থ ব্যক্তি, ভাইসরয় পর্যন্ত তাঁহার দৌড়, তিনি সারা দুনিয়ায় চক্কর দিয়া বেড়ান। ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে যে-পরিচয় হইল, তাঁহার স্বচ্ছতা ও সত্যনিষ্ঠার যে-ছাপ আমার মনে পড়িল, তাহা দিন দিন গভীর হইতে থাকিল। আমার সঙ্গে তো তাঁহার যেন একপ্রকার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল, আর তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার ফিজি দ্বীপে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান হইতে তাঁহার ডাক আসিয়াছিল। তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিয়া

সেখানে যাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে চম্পারনে মহাত্মাজীর নামে মকদ্দমা রুজু হইল। তিনি আসিলেন মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিতে। আমাদের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা হইল। আমরা চাহিতেছিলাম যে, তিনি ওখানে থাকিয়া যান। তখনও গান্ধীজীর মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় নাই। কি যে হইবে তাহাও জানা নাই। আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, শাস্তি হইবে। এইজন্য যদি অ্যান্ড্রুজের মত দরদী লোক থাকিয়া যান তবে ভবিষ্যতের কাজে সাহায্য পাওয়া যাইবে। এ-সব কথা আমরা তাঁহাকে জানাইলাম ও তাঁহার থাকার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তিনি খানিকটা রাজিও হইলেন যে, কয়েকদিন পরে ফিজি যাইবেন। কিন্তু সেজন্য গান্ধীজীর অনুমতি চাই। তাঁহার অনুমতি বিনা তিনি থাকিতে পারেন না। তাই এ-কথা গান্ধীজীকে বলা হইল। এইজন্য তাঁহার নিকট খুব আগ্রহ প্রকাশ করা হইল।

সব কথা শুনিয়া গান্ধীজী বলিলেন : আপনারা যতই আগ্রহের সঙ্গে বলছেন যে অ্যান্ড্রুজের থাকা চাই ততই আমার মনে হচ্ছে যে, তাঁর থাকা চাই না। তাঁর শীগ্‌গীর চলে যাওয়া দরকার। আপনাদের মনে আছে গভর্ন-মেণ্ট ও ইংরেজ নীলকরদের ভয়। আপনারা মনে করছেন যে, একজন ইংরেজ থাকলে আপনাদের সাহায্য হবে। আপনারা এই কারণে অ্যান্ড্রুজকে আটকাতে চাচ্ছেন। আমি চাই যে, এই ভয়টা আপনাদের মন থেকে চলে যায়, এবং আপনাদের ও ইংরেজদের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে, এই ভাবটাও চলে যায়। আপনাদের নিজেদের উপর ভরসা করতে হবে। তাই কালকেই অ্যান্ড্রুজকে এখান থেকে যেতে হবে।

অ্যান্ড্রুজকে তিনি বলিলেন যে, ফিজির কাজও জরুরি, তাহা কিছুতেই বন্ধ করিতে পারা যাইবে না। এইজন্য অ্যান্ড্রুজ পরের দিন সকালবেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরা বুঝিলাম যে, মহাত্মাজীর কথা সত্য, আমাদের মনের কথা তিনি ঠিক ধরিয়াছেন।

পরের দিন রওনা হইবার পূর্বে অ্যান্ড্রুজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। তিনি বলিলেন : গভর্নমেণ্টের হুকুম এসেছে, মকদ্দমা উঠিয়ে নিতে হবে। আমি খানিকটা পরে তুলে নেওয়ার যথাবিধি নোটিশ পাঠিয়ে দেব। এণ্ড্রুজ রওনা হওয়ার পূর্বে এই খবর আমাদের শুনাইয়া দিলেন। আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল।

একবার একজন নীলকর মহাত্মাজীর সামনে নিজের প্রশংসা করিল। বলিতে লাগিল যে, তাহার এলাকায় রায়তেরা খুশি থাকে, তাহাদের কোনও অভিযোগ নাই। সে মহাত্মাজীকে সেখানে নিজে গিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। মহাত্মাজীর সঙ্গে আমিও গেলাম। সে ব্যবস্থা করিয়াছিল যে, কিছু কিছু লোক আসিয়া তাহার কথাই সমর্থন

করিবে। আমরা হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। সে যেখানে ডাকিয়াছিল, সে-গ্রাম ছিল চার-পাঁচ মাইল দূরে। পথেই অনেক রায়তের সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা বলিল, সাহেব কিছু কিছু লোক জড় করে রেখেছেন, তারা তাঁর প্রশংসা করবে। মহাত্মাজী বলিলেন : যদি তোমাদের কোনও অভিযোগ থাকে, তা হলে তোমাদেরও ওখানে সাহেবের সামনেই বলতে হবে। আমরা ঐ এলাকার রায়তদের বিবৃতি দেখিয়া লইয়াছিলাম, আর কিসের যে অভিযোগ তাহা মহাত্মাজীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। ঐখানে দুই-তিন শত লোকের এক সভা বসিয়া গিয়াছিল। ঐ নীলকর ছাড়া ওখানকার সব-ডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেটও হাজির ছিলেন। দুই-চারি জন রায়ত বলিল তাহারা খুব সুখে আছে, তাহাদের কোনও অভিযোগ নাই। তাহারা এই বলিতেই অন্য লোকেরা হৈ হৈ করিয়া উঠিল যে, উহাদের শিখাইয়া-পড়াইয়া আনা হইয়াছে, মিথ্যা কথা বলিতেছে। মহাত্মাজী তাহাদের থামাইলেন, আর তাহাদের বক্তব্য পরে বলিতে বলিলেন। তাহাদের পালা আসিলে তো তাহারা সেই সব অভিযোগই করিল যাহা আমাদের নিকটে বিবৃতিতে লেখা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের নামেও একজন অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। বলিতে লাগিল যে, এ-সব লোক একদলের, ইহাদের কাছে ন্যায় বলিয়া কিছু হইতে পারে না। সে এক বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটেই প্রশ্ন করিয়া ফেলিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাড়া-তাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরের দিনই সাহেব নিজে এক ছোট বাংলোয় আগুন লাগাইয়া দিল। ইচ্ছা যে, আগুন লাগাইবার মকদ্দমায় সমস্ত রায়তকে জড়াইবে, আর গাঁ লুঠ করাইবে। আগুন রাত্রে লাগানো হইয়াছিল। সে নিজে এই আশায় বসিয়াছিল যে, খবর পাইলে পুলিশের সাহায্য লইয়া লুঠপাট করাইবে। কিন্তু যে লোকের উপর খবর দিবার ভার ছিল, সে জানিয়া শুনিয়া খবর দেয় নাই, টালবাহানা করিয়া পরের দিন খবর দিতে গেল। ইতিমধ্যে আমরা খবর পাইয়া গেলাম। মহাত্মাজী সব কথা গভর্নমেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেটও এক লম্বা রিপোর্ট পাঠাইল। তাহাতে লেখা ছিল যে, সর্বত্র অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িতেছে— মনে হইতেছে যে, ব্রিটিশ রাজ্য বুঝি উঠিয়া গেল। এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই হইত।

এই রিপোর্টের উপর গভর্নমেণ্ট কাজ করিলেন। বিহারের গভর্নর গান্ধীজীকে রাঁচিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পত্রের তাৎপর্য এই ছিল যে, গান্ধীজী চম্পারনে থাকায় অরাজকতা বড় ছড়াইয়া পড়িতেছে, এজন্য গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইয়া দিতে চাহিতেছেন : কিন্তু কোন হুকুম দেওয়ার পূর্বে গভর্নর একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চান। গান্ধীজী রাঁচি যাওয়ার পূর্বে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে,

হয় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে, নয়তো প্রদেশ হইতে বহিষ্কার করা হইবে, হয়তো আমরাও এখন বাহিরে থাকিতে পারিব না। মহাত্মাজী আমাদের মোতিহারী ও বেতিয়ায় দুই দলে রাখিয়া দিলেন। গ্রেপ্তার হইলে কি ভাবে কি করিতে হইবে সে-বিষয়ে তিনি পুরাপুরি নির্দেশ দিলেন। আমাদের কাছে এতজন রায়তের বিবৃতি আসিয়া গিয়াছিল, এত কাগজপত্র জমা হইয়াছিল যে, রায়তদের অভিযোগের সম্পূর্ণ প্রমাণ হাতে আসিয়া গিয়াছিল। ঐগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার কথা। আমরা গোড়া হইতেই সব নকল করিয়া লইয়াছিলাম। নকলগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইল। নিজের নিজের জায়গায় আমরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বেতিয়া আফিস ছিল আমার জিম্মায়। অনেক অপেক্ষার পর রাঁচি হইতে তার আসিল যে, তখনও গভর্নরের সংগে কথাবার্তা চলিতেছে। ফলে এই হইল যে, দু-তিন দিন ধরিয়া কথা চলিতে থাকিল। শেষটায় গভর্নর এক কমিশন নিযুক্ত করিলেন। গান্ধীজীকেও তাহার এক মেম্বার নিয়োগ করা হইল। রায়তদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার ঐ কমিশনকে দেওয়া হইল। কমিশন সরকারি অফিসার, নীলকর ও রায়তদের এজাহার লইল। অন্য যে-সব কাগজপত্র পেশ করা হইয়াছিল তাহা দেখিল। অনেক কুঠিতে আসিয়া তাহাদের কাগজপত্র দেখিল। রায়তদের সংগেও দেখা করিল।

কমিশন নিযুক্ত হইয়া গেলে মহাত্মাজীর নির্দেশমতো, রায়তদের তরফ হইতে যে কাগজপত্র পেশ হইয়াছিল সে-সব খুব ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ও অন্য সাক্ষ্য একত্র করিয়া, আমরা কমিশনের জন্য এক বিবৃতি প্রস্তুত করিলাম। কমিশনে সরকারি কর্মচারী ছিলেন, নীলকরদের প্রতিনিধি ছিলেন, জমিদারদের প্রতিনিধি ছিলেন, আর রায়তদের দিক হইতে প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন গান্ধীজী। যখন রিপোর্ট লিখিবার সময় আসিল, তখন মহা বাধা আসিয়া উপস্থিত। গান্ধীজী ও কমিশনের সভাপতি সার ফ্রাঙক স্লাইয়ের খুব ইচ্ছা ছিল, সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট দেওয়া হয়। গভর্নরও বলিয়াছিলেন যে, সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট হইলে তিনি তাহার উপর কিছু করিতে পারেন, না হইলে কিছু করা কঠিন হইবে।

চাষীদের অভিযোগ খানিকটা উপরে বর্ণনা করিয়াছি। শেষে মহাত্মাজী ও নীলকরদের মধ্যে অনেক কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, যে-খজনা বাড়ানো হইয়াছে তাহার সামান্য কিছু অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হউক, প্রায় সিকির কিছু কম হইবে, বাকি তিন-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি যেমনকার তেমন থাকিয়া যাক। যে-নগদ টাকা আদায় করা হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতেও শতকরা পঁচিশ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, আর বাকি ভাগ রায়ত ছাড়িয় দিক। প্রধান অভিযোগ ছিল এই দুইটি ও তিন-কাঠিয়া প্রথা। অন্যান্য

অভিযোগ দূর করা অফিসারদের যথাযথ কর্তব্য পালন ও ন্যায়পরায়ণতার উপরই নির্ভর করিত। এই সব সুপারিশ রিপোর্টে সর্বসম্মতিক্রমে মানা হইল। পরের অভিযোগ সম্বন্ধে রিপোর্টে বিশেষ কিছু লেখা হইল না, শুধু অভিযোগগুলির উল্লেখ করিয়া তাহা দূর করিবার উপায় বলা হইল। খাজনা-বৃদ্ধির হার কম করা ও নগদ জরিমানার শতকরা পঁচিশ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া ছাড়া তিন-কাঠিয়া প্রথার আইন রদ করার সুপারিশও করা হইল।

আমরা নিজেদের মধ্যে ইহা লইয়া তর্ক করিতাম যে, খাজনা-বৃদ্ধি ও জরিমানা যদি অনুচিত হয় তবে পুরাপুরি খাজনা-বৃদ্ধি হইতে রায়তদের অব্যাহতি পাওয়া উচিত, আর জরিমানার সব টাকা ফেরত দেওয়া চাই-ই। নীলকরেরা আইনগত বাধাও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। যাহারা জরিমানার টাকা আদায় করিল তাহারা কুঠি অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিয়া ফেলিল আর টাকা লইয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইল! এখন জরিমানার টাকা অন্য মালিকের নিকট হইতে, যে টাকা লয় নাই এবং যে দাম দিয়া কুঠি নূতন কিনিয়াছে, কিভাবে আদায় করা যাইবে! এইরূপ, খাজনা-বৃদ্ধি রদ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। আইন তৈরি করিয়া উহা দূর না করিলে উহা হয়তো দূর হইত না। আইন অনুসারে প্রত্যেক রায়তকে দেওয়ানি মকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহাকে দিয়া খাজনা-বৃদ্ধি কবুলিয়তে জোর করিয়া লেখানো হইয়াছে, তাহাতে নীল বুনিবার শর্ত ছিল না, ইত্যাদি। এইসব কথার সাক্ষ্য গরিব সাদাসিধা নিরীহ রায়ত কোথা হইতে দিবে?

মহাত্মাজীর চম্পারনে যাওয়ার পূর্বে এক জায়গায় এগার জন রায়ত মকদ্দমাও দায়ের করিয়াছিল। নীলকরেরা নিজেদের দিক হইতে খুব বড় ব্যারিস্টার দিয়াছিল। মকদ্দমা মাসের পর মাস রুজু হইয়া রহিল। শেষটায় পাঁচটিতে রায়ত জিতিল আর ছয়টিতে নীলকর। আপীলে অল্প-বিস্তর হেরফেরও হইল। সেখানে লক্ষ লক্ষ না হউক, হাজার হাজার পাট্টার সম্বন্ধে এই প্রকার মকদ্দমা করিতে হইত। এক অসম্ভব ব্যাপার। এই অসুবিধার কথা মনে রাখিয়া পরামর্শ করিয়া কিছু স্থির করা উচিত মনে হইল। তাই সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। রিপোর্টের সুপারিশগুলি গভর্নমেণ্ট মঞ্জুর করিয়া লইলেন। আইন করিয়া তিন-কাঠিয়া রদ করা হইল। রায়তদের খাজনা-বৃদ্ধিও কমাইয়া দেওয়া হইল। নীলকরদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া, নির্ধারিতমত বেতিয়ারাজ (কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্) রায়তদের জরিমানার টাকা ফেরত দিল।

চম্পারনের এই ব্যাপারে আমরা সর্বপ্রথম গান্ধীজীর কাজের ধরন দেখিলাম। জনসাধারণের হিতকল্পে জীবনযাপনের অপূর্ব এক শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিল। হোমরুল আন্দোলনে যোগ না দেওয়ায় কখনও কখনও আমাদের মধ্যে কাহারও খুব খারাপ লাগিত; কিন্তু আমরা খুব সাবধানে ও সংযমের সহিত গান্ধীজীর আদেশ পালন করিলাম— যে কাজে লাগিয়া ছিলাম, লাগিয়াই থাকিলাম। আমরা ইহাই দেখিলাম যে, গান্ধীজী কেমন করিয়া নীলকরদের খুব বড় ক্ষতি করিয়াও তাহাদের বন্ধু হইয়া রহিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার খুব ভাল ছিল। তাহারা গান্ধীজীকে নিজেদের বাংলোতে ডাকিয়া লইয়াও যাইত। কয়েকজন অবশ্যই প্রবলভাবে তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কটু হয় নাই। কমিশনের কাজ শেষ হইয়া গেলে গান্ধীজী জায়গায় জায়গায় স্কুল খুলিবার কথা ভাবিলেন, নীলকরদের নিকটে সাহায্যও প্রার্থনা করিলেন। একজন ছাড়া নীলকরেরা কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি করিল না।

কমিশনের পরামর্শের ফলে যাহা স্থির হইল রায়তদের দাবির তুলনায় তাহা খুব কম; কিন্তু সমস্ত আন্দোলনের ফলে চম্পারনে নীলকরদের প্রভাব দূর হইয়া গেল। এখন তাহাদের জুলুম করিবার সে শক্তি আর রহিল না। রায়তদের মধ্যে সাহস ও প্রাণ আসিল। এখন তাহারা চুপ-চাপ থাকিয়া জুলুম বরদাস্ত করিবার পাত্র আর রহিল না। আর, বিনা জুলুমে, চম্পারনের কারবার হইতে লাভ হওয়া সম্ভব হইল না। সে জুলুম এখন বন্ধ হইয়া গেল। নীলকরেরা এ-কথা অবিলম্বে বুঝিতে পারিল। তিন-চার বৎসরের মধ্যে সকলে নিজের নিজের জমি ও কুঠি বিক্রয় করিয়া ফেলিল। যাহা কিছু পাইল, সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের জমি আসিল রায়তদের হাতে। এখন উহারা সেখানে চাষআবাদ করিতেছে। যেখানে নীলকরদের সুন্দর বাগিচা ও বাংলো ছিল সেখানে আজ রায়তদের গো-মহিষ বাঁধা আছে। সেই সত্তর-পঁচাত্তর কুঠির মধ্যে দুই-একটি আজও দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে এখন জুলুম চলিতে পারে না। তাহারা সেই সাপের মত দিন কাটাইতেছে, যাহার দাঁত কেহ ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে, যে এখনও ফোঁস করিতে পারে, কিন্তু কামড়াইতে পারে না।

চম্পারনে সত্যাগ্রহের আমরা সেই রূপ দেখিয়াছি যাহা গান্ধীজী

অল্পদিন পরেই দেশব্যাপী রূপে, খুব বড় আয়তনে, প্রকাশিত করিলেন। একটা জেলার দুঃখ দূর করিতে প্রায় এক বৎসর লাগিল। সমগ্র হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্য এই অনুপাতে যত সময় লাগা দরকার, তাহা হয়তো এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

চম্পারনের আন্দোলনে কোনও মতভেদ ছিল না। গান্ধীজীর কথা সকলেই মানিয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে রায়তই হউক আর আমার মত কর্মীই হউক, কেহই কোন কিছু করে নাই। গান্ধীজী নীলকরদের জুলুম বন্ধ করিতে চাহিতেছিলেন; কিন্তু তিনি কোনও প্রকারের দ্বেষ-ভাব মনে পোষণ করেন নাই। আমাদের মনেও সেইরূপ কোনও ভাব ছিল না। বলিতে গেলে, সত্যাগ্রহের এক উৎকৃষ্ট আদর্শ সেখানে উপস্থিত করা হইল, এইজন্য ফলও খুব সন্তোষজনক হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের স্বরাজ্যের প্রশ্নও এইভাবে সমাধান হইয়া যাইবে। অনেক কিছু ছাড়িয়া মিটমাট করিলেও আমরা ষোল আনা তাড়াতাড়ি পাইতে পারিব না। কিছু দূর পর্যন্ত এইরূপই হইয়া আসিয়াছে। বিলম্বের কত কারণ আছে। ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত। চম্পারনের রায়তদের মধ্যে যে অটল বিশ্বাস ছিল সমস্ত জনগণের মধ্যে তাহা নাই। নিঃসংকোচে বিশ্বস্ত-ভাবে কর্তব্য পালন করিবে এমন কর্মীও যথেষ্ট নাই। দেশ অহিংসার সেই সীমা পর্যন্ত পালন করে নাই, চম্পারনে তাহা যতদূর পালন করা হইয়া-ছিল। তথাপি গত পঁচিশ বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহা কিছু কম নহে। গান্ধীজীর অদ্ভুত শক্তি ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তখনই বুঝিবে যখন আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হইবে। চম্পারনেও আমরা পুরাপুরি সন্তুষ্ট হই নাই। কিন্তু যখন তিন-চার বৎসরের ভিতরই নীলকরেরা চলিয়া গেল, তখন সেই অদ্ভুত শক্তির পুরা ফল আমরা দেখিতে পাইলাম। ভারতে কাজ তো হইয়াছে। ব্রিটিশের প্রভাব তো অনেক অংশে শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত আমরা পুরা ফল দেখিতে পাইতেছি না। এইজন্য সেই অদ্ভুত শক্তির মহিমা অনুভব করিতে পারি না।

চম্পারনে আমাদের জীবনের উপরও খুব বড় প্রভাব পড়িয়াছিল। সেখানেই আমরা জাতিভেদ ছাড়িলাম। ঐ পর্যন্ত আমি জাতিভেদ খুবই মানিতাম, মানিয়া আচরণও করিতাম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও জাতির ছোঁয়া দাল-ভাত ইত্যাদি, যাহাকে এখানে কাঁচা রান্না বলে, কখনও খাই নাই। গান্ধীজী বলিলেন: এখানে আলাদা আলাদা উনন করলে কাজ চলবে কি করে, যারা এক কাজে লেগে আছে মনে কর তারা একই জাতের। বাস, আমরা সকলে একে অন্যের রান্না খাইতে লাগিলাম—যদিও আমাদের মধ্যে নানা জাতির লোক ছিল। জীবনে সরলতাও অনেকটা আসিল। আমাদের সঙ্গে চাকর ছিল। তাহাদের সকলকে একে একে বিদায় করা

হইল। শুধু বাসন মাজার জন্য একজন চাকর থাকিয়া গেল। নিজেদের হাতে কুয়া হইতে জল তোলা, স্নান করা, কাপড় কাচা, নিজেদের এঁটো বাসন ধোওয়া, রান্নাঘরে তরকারি কোটা, চাল ধোওয়া ইত্যাদি সব কাজ আমরা নিজেরা করিয়া লইতাম। কোথাও যাইতে হইলে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া, আর যতদূর সম্ভব পায়ে চলা— সমস্ত কিছু আমরা ওখানে গান্ধীজীর কাছে শিখিয়াছিলাম। আরামের জীবন ছাড়িয়া দিতে হইল। যতদিন আমরা চম্পারনে থাকিলাম, এইভাবে থাকিলাম।

এই কাজ শেষ হইয়া গেলে গান্ধীজী চম্পারনের তিন দিকে তিনটি স্কুল খুলিলেন। আমি ঐ স্কুলগুলির কোনওটিতে থাকিতে পারিলাম না। পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া আমি আবার ওকালতিতে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু বরাবর ঐ-সব স্কুল দেখিবার জন্য বৎসরে দুই-একবার যাইতাম।

চম্পারনে অন্য প্রদেশের কিছু কিছু ভাল ত্যাগী কর্মীদের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন তো আজ পর্যন্ত দেশের কাজে উৎসাহ করিয়া লাগিয়া আছেন। ঐ সময়ের পরিচয় ও সমস্ত উপলব্ধির মূল্য খুব, আজও তাহা হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি।

চম্পারনে যে-জয়লাভ হইল তাহার প্রভাব বিহারের উপর খুব পড়িল। বিহার ছিল এক অনুন্নত প্রদেশ, যেখানে জনসাধারণের জীবনের স্রোত অতি ক্ষীণ ধারায় বহিত। শিক্ষারও পুরাদস্তুর অভাব ছিল। সব ব্যাপারেই বিহারের লোকদের অন্য প্রদেশের তুলনায় খুব পিছনে আছে বলিয়া মনে করা হইত। ইংরেজ শাসনে প্রথম হইতেই বিহার ছিল বাংলার সঙ্গে জোড়া। কত বৎসর ধরিয়া তাহা বাংলাদেশেরই এক অংশ হইয়া ছিল, এমন-কি বিহারের স্বতন্ত্র নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। বাংলা ছিল উন্নত প্রদেশ, কিন্তু সেই উন্নতির প্রভাব বিহার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না। ইংরেজী শিক্ষায়ও বিহার এতদূর পিছনে পড়িয়া ছিল যে, বিহারীরা সরকারি দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিত না, উচ্চ পদের কথা কি বলিব।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কয়েকজন বিহারীর হৃদয়ে বিহারের শোচনীয় দশা দেখিয়া গ্লানি হইল। ফলত বাংলা হইতে বিহারকে পৃথক করার আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন স্বর্গীয় বাবু মহেশনারায়ণ ও ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা। ডক্টর সিন্‌হার চেষ্টার ফলেই বিহারকে কংগ্রেসের এক স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া ধরা হইল। ১৯১১ সালে যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে দরবারের জন্য আসিলেন, তখন বিহারকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন। এই ঘোষণা হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলস্বরূপ। পূর্ব

ও পশ্চিম বঙ্গকে আবার এক করিয়া দেওয়া হইল। বিহার ও উড়িষ্যাকে একত্র করিয়া পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করা হইল। পৃথক প্রদেশের কথা উঠিতেই খানিকটা নবজীবনের সঞ্চার হইল। তাহার চিহ্ন চোখে দেখিতে পাওয়া গেল। বিহারী ছাত্র সম্মেলনের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনও প্রতি বৎসর হইতে লাগিল। বিহারের স্কুল-কলেজের ছাত্রসংখ্যাও বাড়িতে আরম্ভ করিল। উচ্চ-শিক্ষার্থী ছাত্র আরও অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় যাইতে লাগিল। নূতন প্রদেশ হওয়ার পর সর্বপ্রকারে বিহার প্রদেশ উন্নতি করিতে লাগিল। কিন্তু এতদূর হইয়াও ১৯১৭ সাল পর্যন্ত দেশসেবার কোনও প্রতিষ্ঠান-গত কাজকর্ম নিয়মিতরূপে চলিত না। তখনকার কংগ্রেস কমিটি, আজকার কমিটির তুলনায়, খেলার জিনিস ছিল। আমি তখনকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলাম। যে-সব প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইত— বিশেষ করিয়া নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য— তাঁহারাই কিছু চাঁদা দিতেন, তাহা হইতে প্রাদেশিক কমিটির কাজ চলিয়া যাইত এবং অল ইণ্ডিয়া কমিটির বাৎসরিক চাঁদা দেওয়া হইত। এই বাৎসরিক চাঁদা সর্বদাই বাকি পড়িয়া থাকিত। আমার মনে আছে, তখনকার কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুব্বারাও কখনও কখনও পাটনায় আসিতেন। তিনি আসিলে প্রধান সভ্যেরা নিজেদের মধ্যে একত্র হইয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া দিয়া দিতেন। নবাব সরফরাজ হুসেন খাঁ অনেকদিন ধরিয়া প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সেক্রেটারি ছিলাম। আফিসের খরচ বেশির ভাগ আমরা দুজন নিজেদের পকেট হইতেই চালাইয়া যাইতাম। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না যে, আফিসের খরচ বড় একটা কিছু ছিল। কেবল ডাকের আর তারের খরচ লাগিত, তাহা আমরা সহজে দিতে পারিতাম।

গান্ধীজী যখন চম্পারনে আসিয়া পেঁাছিলেন তখন বিহারে সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এইরূপই ছিল। সেদিন হয়তো একজনও এমন ছিলেন না, যিনি নিজের সমস্ত সময় দিয়া দেশের কাজ করিতেন। যাঁহারা কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন, অথবা অন্য প্রকারে সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন, তাঁহারা নিজের কাজ করিবার ফাঁকে দেশসেবার কাজও করিতেন। অন্যান্য প্রদেশেরও অবস্থা অনেকটা এইরূপই ছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে কিছু কিছু কর্মী তো নিশ্চয় এইরূপই ছিলেন যে, দেশের কাজে নিজেদের সমস্তটা সময়ই ব্যয় করিতেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে যত লোক এখানে আসিয়াছিলেন, প্রায় সকলেরই পেশা ছিল ওকালতি। তাঁহাদের মধ্যে একজনও পেশা ছাড়িয়া দিবার সংকল্প করিয়া তাঁহার সঙ্গে কাজ শুরু করেন নাই। আমরা তো ইহা ভাবিয়া গিয়াছিলাম যে, কয়েকদিনের মধ্যেই ছুটি পাইব। কিন্তু সেখানে পেঁাছিয়া দেখিলাম, কাজ বাড়িয়াই

চলিয়াছে। তাহা শেষ না করিলে ঐস্থান হইতে চলিয়া যাওয়াও ছিল কঠিন। তাই, যাহারা গিয়াছিল দশ-পনেরো দিনের কড়ারে, তাহারা চম্পারনে প্রায় দশ মাস ধরিয়া থাকিয়া গেল। কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা যখন নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেলাম, তখন সঙ্গে লইয়া গেলাম নূতন মত, নূতন স্ফূর্তি, নূতন কার্যক্রম। সমস্ত প্রদেশে এক নূতন জীবন আসিয়াছিল, তাহার ফল অল্পদিনের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া গেল। আমাদের চোখ অনেকখানি খুলিল। আমরা বুঝিতে লাগিলাম যে, যতক্ষণ আমাদের মধ্যে এরূপ কেহ কেহ বাহির না হইবে যাহারা নিজেদের সমস্তটা সময় দেশের কাজে লাগাইবে, ততক্ষণ বিহারের সর্ব-জনীন জীবন শিথিল হইয়াই থাকিবে।

একদিন গান্ধীজীর সঙ্গে এক গ্রাম হইতে ফিরিতেছিলাম। পথে কথাবার্তা হইতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনি সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দেশসেবার দিক থেকে আপনি কোন্ জায়গাটাকে সব-চেয়ে উপরে স্থান দেন? তিনি প্রায় সমস্ত প্রদেশের কথাই বলিলেন। শেষে বলিলেন : দেশসেবকের পক্ষে পুনা হল তীর্থস্থান। সেখানে একটা শহরের ভিতরে এত ত্যাগী রয়েছেন, অন্য কোনও জায়গায় তত নেই। ত্যাগের দিক দিয়ে সেখানকার সব প্রতিষ্ঠান দেশের সামনে আদর্শ উপস্থিত করেছে— নতুন সংস্থাও বরাবর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে।

আমরা পূর্বেই ফার্গুসন কলেজের নাম শুনিয়াছিলাম। মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলিবার পর একবার পুনা যাওয়ার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। আমরা চম্পরনে বসিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলাম, এখানকার কাজ শেষ করিয়া এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে ত্যাগী কর্মী শুধু জীবন নির্বাহের খরচ লইয়া দেশ সেবায় লাগিয়া থাকিবে। স্থির হইল, ফার্গুসন কলেজের ধরনে এক কলেজ খুলিতে হইবে। ব্রজকিশোর-বাবুই ছিলেন আমাদের সকলের নেতা ও উৎসাহদাতা। তিনি এই কথা এতদূর অগ্রসর করিলেন যে আমরা নিজের নিজের নাম পর্যন্ত লিখিলাম, যখন এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তখন আমরাও ইহাতে জীবিকাব্যয় মাত্র লইয়া যোগ দিব। কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার কথাও হইল। কাহারও কাহারও নিকট হইতে প্রতিশ্রুতিও লওয়া হইল।

মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা হওয়ার পর তিনি প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা তো ভালই বলিলেন, কিন্তু উহাকে কলেজের রূপ দেওয়াটা তেমন পছন্দ করিলেন না। আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। যখন ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়, তখন আমি সেখানে গেলাম। সেখান হইতে আমি পুনাতেও গেলাম। সেখানকার সব প্রতিষ্ঠান ভাল করিয়া দেখিলাম। তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয়ও পাইলাম।

কলিকাতা কংগ্রেস হইতে দিল্লী কংগ্রেস

১৯১৭ সালে, যখন আমরা চম্পারনে কাজ করিতেছিলাম, তখন দেশে হোমরুল আন্দোলন চলিতেছিল। পূর্বে বলিয়াছি, মহাত্মাজী আমাদের সকলকে কোনও আন্দোলনে যোগ দিতে না দিয়া আটক রাখিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে চম্পারনের কাজই হোমরুলের সব চেয়ে বড় কাজ। ইহারই মধ্যে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টকে নজরবন্দী রাখা হইল। তাহাতে আন্দোলন আরও প্রবল হইল। আমরা এ-সব কথা খবরের কাগজে পড়িতাম, কিন্তু মন পড়িয়া থাকিত চম্পারনেই। অন্য কোনও বিষয়ে আমরা মন দিতাম না। চম্পারন ছাড়া বিহারের অন্যান্য জেলায় হোমরুল আন্দোলন চলিল। আমার মনে হয়, বিহারে এই প্রথম যে লেখাপড়া জানা লোক গাঁয়ে গিয়া সভা করিতে লাগিল, জনসাধারণের নিকটে রাজনীতির কথা বলিতে লাগিল। ইহার ফল ভাল হইল।

এই বৎসর বিহারের শাহাবাদ জেলায় এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হয়। বকরিদের সময় গোরু কোরবানির জন্য হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া হয়। বাগ্‌বিতণ্ডা অনেক দূর গড়াইল। জেলার অনেকখানি অংশে, সংলগ্ন গয়া ও পালামৌ জেলাতেও ভীষণ হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। কয়েকদিন তো মনে হইল যে ইংরেজ রাজত্ব যেন একেবারে নাই। কতক কতক হিন্দু মার খাইল; কিন্তু মুসলমানদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর আচরণ করা হইল। বিস্তর লোক মারা পড়িল; কত লোকের বাড়ি লুটপাট করা হইল। শেষে যখন মিলিটারি আসিয়া পৌঁছিল তখন হাজার হাজার হিন্দু গ্রেপ্তার হইল। তাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু হইল। সে মকদ্দমা বহুদিন পর্যন্ত চলিতে থাকিল। হাজার হাজার লোকের কঠোর দণ্ড হইল। ফলে প্রথমে মুসলমান বিপর্যস্ত হইল, পরে হিন্দুও হইল। তখনকার দুর্ঘটনার স্মৃতি আজও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরূক। তখনকার দিনে সাধারণ জাতীয় জীবন এতখানি উন্নত ছিল না যে উভয়ের মধ্যে মিলনের অথবা হাঙ্গামা বন্ধ করিবার কোনও চেষ্টা করা যায়। যখন মকদ্দমা চলিতে শুরু হইল তখন উকিলেরা আসামীদের অল্পবিস্তর সাহায্য করিল। কিন্তু ইহা হইতে বেশি কিছু ফল হইল না। এই দুর্ঘটনার সহিত আমার সাক্ষাৎ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু মনের উপর ইহার প্রভাব তো অবশ্যই পড়িয়াছিল।

কলিকাতার কংগ্রেসে বিহার হইতে— বিশেষ করিয়া চম্পারন হইতে— প্রতিনিধিদের বড় বড় দল গেল। আমি এক বড় দলের সঙ্গে গেলাম। শেঠ

যমুনালাল বাজাজ মহাত্মাজীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চম্পারনের দলও সেখানে আসিয়া জুটিল। শেঠজীর সংগে প্রথম পরিচয় হয়তো ওখানেই হইয়া থাকিবে। যতদূর মনে আছে, মহাত্মাজী এই কংগ্রেসে বিশেষ কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই।

আমরা চম্পারনে থাকিতেই ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে তিনি ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করিবার অংগীকার করেন। তাহার পর তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কিছুদিন পরে তাঁহার ও লর্ড চেম্‌সফোর্ডের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে রিপোর্ট বাহির হইল। এই রিপোর্ট বাহির হইবার পর সমস্ত দেশ জুড়িয়া এ বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও যাঁহারা রাজনৈতিক আলোচনা বা কর্ম করেন তাঁহারা নিজের নিজের মত প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। বিহারেও ইহার আলোচনা হইতে লাগিল। আমরা চম্পারনের কাজ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলাম। এইজন্য এদিকে এখন মন দেওয়ার অবসর ছিল। আমার স্বভাব প্রথম হইতেই মৃদু, উগ্র মনোভাব তাড়াতাড়ি জাগে না। এই বিষয় লইয়া ভাবিবার পর আমি নরম দলের পক্ষই সমর্থন করিয়াছিলাম। বিহারে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইল। আমি উহাতে যোগ দিলাম; কিন্তু আমি সর্বদা চরম মতের বিরোধিতাই করিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের এখনও এতদূর শক্তি হয় নাই যে গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিয়া আমরাও কিছুটা করিতে পারি। ইহাও আমি পুরাপুরি বিশ্বাস করিতাম না যে দেশের সমস্ত শাসনভার আমাদের হাতে আসিলে আমরা তাহা সুচারুরূপে বহন করিতে পারিব। এইজন্য আমি মনে করিতাম যে ঐ রিপোর্ট সংগতই হইয়াছে। উহার ভিত্তিতে যাহা-কিছু হইতে পারে আমি তাহা স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। উহা গ্রহণে আমাদের অনিচ্ছা বা অস্বীকার বোঝায়, উহার এরূপ আলোচনা আমার ভাল লাগিত না। প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে মতভেদ হইল। যতদূর মনে পড়ে, এই রিপোর্ট গৃহীতও হইল; তবে স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্তন করা হইবে স্থির করা হইল।

এই রিপোর্ট আলোচনা করার জন্য বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। আমিও সেখানে গেলাম। নিজের প্রকৃতি ও অভ্যাসের জন্য আমি তর্কে যোগ দিই নাই। কিন্তু বিষয়নির্বাচনী সমিতি ও কংগ্রেসের তর্কবিতর্ক খুব মন দিয়া শুনিতেছিলাম। পাটনার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার সৈয়দ হাসান ইমামই ছিলেন সভাপতি। তাঁহার অভিভাষণ হইয়াছিল খুব জোরালো। কংগ্রেসের কাজকর্ম তিনি খুব যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার অভ্যর্থনাও হইয়াছিল খুব

জাঁকজমকের সহিত। বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে দেখিলাম, কতবার এমন হইল যে দুই দলের মধ্যে বুঝি ঝগড়া বাধে। একদিকে ছিলেন লোকমান্য তিলক, গরম মতের সমর্থক, অন্যদিকে অন্য একজন নেতা, দুই জনে তর্ক করিতেন। সভাপতি এইসব বড় বড়দের ঝগড়ার মাঝে মাঝে দুই-চার শব্দ দিয়া অথবা ভাবভঙ্গি দিয়া নিষ্পত্তি করিতেন।

১৯১৮ সালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহাত্মাজী যখন চম্পারনে ছিলেন তখনই গুজরাটের 'খেড়া' জেলায় চাষীদের খাজনা সম্বন্ধে আন্দোলন শুরু হইল। মহাত্মাজী চম্পারন যাইবার পূর্বেই সবরমতীতে, কুঁড়েঘরে, সত্যাগ্রহ আশ্রম একপ্রকার স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, চম্পারন হইতে দশ-পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরিয়া উহা যথাবিধি সাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিবেন। কিন্তু যখন চম্পারনে আটকাইয়া গেলেন তখন খবর পাঠাইলেন আশ্রমের লোকেরা সেখানকার কাজ যেন আরম্ভ করিয়া দেয়। আমার বড় আগ্রহ হইয়াছিল যে আমিও গিয়া আশ্রম দেখিব।

১৯১৮-র এপ্রিলে ইন্দোরে নিখিল ভারত হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধী উহার সভাপতি হইলেন। বিহার হইতে আমরা কয়েকজন প্রতিনিধিরূপে সেখানে গেলাম। চম্পারনের পর আমরা বুঝিয়াছিলাম যে মহাত্মাজীর উপর আমাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। এই ধারণায় ইন্দোরে আমরা সভাপতির সঙ্গেই অবস্থান করিয়াছিলাম। ঐ সম্মেলনে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, দক্ষিণ ভারতে হিন্দী প্রচারকার্য আরম্ভ করিবার সংকল্প গ্রহণ। মহাত্মাজীর পক্ষে ইহা কিছু নূতন কথা নয়। তিনি চম্পারন হইতেই ঐ কাজ শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। একবার স্বামী সত্যদেবজী তাঁহার সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে আসেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, কয়েক দিন সবরমতী আশ্রমে থাকার পর তিনি দক্ষিণ ভারতে হিন্দী প্রচার করিবার কাজটা নিজের হাতে গ্রহণ করুন। ইন্দোর সম্মেলনের কিছু পূর্ব হইতেই দক্ষিণে এ কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল। স্বামী সত্যদেবের সঙ্গে তিনি নিজের কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস গান্ধীকে এই কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দোর সম্মেলনে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল আজ সমস্ত দক্ষিণ ভারতে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেখানে লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ হিন্দী শিখিয়া লইয়াছে।

সম্মেলন হইতে মহাত্মাজীর সঙ্গে সোজা সবরমতী চলিয়া গেলাম। তখনও আশ্রমের বাড়ি তৈয়ার হয় নাই। বাঁশের চাটাইয়ের ঝুপড়ি, তাহাতে আশ্রমবাসীরা থাকিতেন। আশ্রমে বেশিদিন থাকিবার সুযোগ হইল না। মহাত্মাজী শীঘ্রই 'খেড়া'র গ্রামে চলিয়া গেলেন। সেখানে

খাজনাবন্ধের আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল। সর্দার বল্লভভাই, শ্রীশংকরলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতী অনুসূয়াবাঈ সারাভাই ও অন্যান্য কর্মী গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেখানে প্রচারকার্য করিতেছিলেন। মহাত্মাজীর সংগে দুই-তিন দিন পর্যন্ত সেখানকার গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইলাম। গুজরাটের লোকদের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আরম্ভ হইল; চম্পারনে গান্ধীজীর সংগে যাহারা গিয়াছিল ও যাহাদের তিনি পরে পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের সংগে পরিচয়েই ইহার সূত্রপাত হয়। মহাত্মাজী পায়ে হাঁটিয়াই গ্রাম ভ্রমণ করিতেন। আমাকেও ঐরূপ করিতে হইল। সেকালে তিনি জুতা পরিতেন না। এপ্রিলের শেষে প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছিল। একদিন প্রায় দুপ্রহর বেলায় আমাদের বালির রাস্তা দিয়া চলিতে হইল। বালি গরম হইয়া গিয়াছিল। পা পুড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু গান্ধীজীর গ্রাহ্য নাই। যেখানে যাওয়ার ছিল, সেখানে চলিয়াই গেলাম। খেড়ার সত্যাগ্রহ সফল হইল। চম্পারন ও খেড়া, দুই জায়গার কাজ প্রায় এক বৎসরের মধ্যেই শেষ হইল।

আমি আবার ওকালতিতে লাগিয়া গেলাম। মধ্যে মধ্যে কংগ্রেস ও কনফারেন্সে যোগ দেওয়া তখনকার দিনে উকিলেরা আপন কর্তব্য মনে করিত। আমিও তাহাদের একজন। চম্পারনের পর আমাদের মতের অনেক পরিবর্তন হইল। এই প্রকারের কাজ ছুটির দিনে চিত্তবিনোদনের উপায় না মনে করিয়া ইহাতে বেশ সময় দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু এপর্যন্ত তাহার কোনও পথ স্থির হয় নাই। তাই এখন পুরানো ধরনেই কাজ হইতে থাকিল। ইন্দোরের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, আবার দিল্লীতে তাহারই ডিসেম্বর মাসের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিলাম। বাস্, এইটুকু করিয়াই নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে করিলাম।

গান্ধীজী চম্পারন যাওয়ার পরে বিহারের নাম এখানে ওখানে শোনা যাইতে লাগিল। কিন্তু এখনও বিহারের কোনও বিশেষ স্থান জুটিল না। তাই কলিকাতায় কংগ্রেসের কোনও পৃথক স্থান না পাওয়ার জন্য আমাদিগকে বেশির ভাগ গান্ধীজীর ছাউনিতেই থাকিতে হইল।

দিল্লী কংগ্রেসে এক ভারি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা সেখানে পেঁাছিলাম। স্টেশনে ভলাণ্টিয়ারেরা আসিয়া দেখা করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারিল না, বিহারের প্রতিনিধিদের থাকিবার জন্য কোথায় জায়গা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নায়ক বলিল : আপনারা পটৌদী হাউসে চলে যান। আমরা সেখানে গেলাম। তখন প্রায় ভোর পাঁচটা। খানিকটা রাত্রি ছিল। যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। এক ছোট্ট কুঠরিতে আমরা পনের-কুড়ি জন লোক বসিয়া বসিয়া কাটাইলাম। যখন

ভোর হইয়া গেল ও খোঁজ করা হইল, তখন সেখানেও কেহ আমাদের জায়গা দেখাইয়া দিতে পারে নাই। আমরা ভাবিলাম, বাস্, এখন এখানেই থাকিয়া যাই। দোতলায় এক ভাল ঘর ছিল। আমরা তাহাও দখল করিলাম। খানিক পরে অভ্যর্থনা সমিতির কোনও ভদ্রলোক আসিলেন। তিনি হুকুম দিলেন, আমাদের ঘর খালি করিয়া দিতে হইবে। আমরা তবে কোথায় থাকিব, সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি এইটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করিলেন যে, ঐ ঘর বাংলার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট আছে, উপরের কামরা শ্রীযুক্ত বি. চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশের জন্য, তাই আমরা যেন অন্য কোনও জায়গায় গিয়া থাকি। অনেক কথাবার্তার পরও তিনি আমাদের অন্য কোনও জায়গায় ঠিক করিয়া দিবার ভার নিজে গ্রহণ করা অথবা অন্য কাহাকেও ভার দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিলেন না। আমরাও স্থির করিয়া লইলাম যে, অন্য জায়গা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত নড়িব না। খানিক পরে আমরা আবার হুকুম পাইলাম যে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। আমরা সোজাসুজি অস্বীকার করিলাম। সে ভদ্রলোক রাগ করিয়া হুকুম দিলেন, যদি আমরা তাঁহার কথা না শুনি আমাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির রন্ধনশালায় আহার ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হইবে না। এই ধমক আমাদের ভালই লাগিল। অভ্যর্থনা সমিতিকে রোজ প্রায় দুই টাকা দিতে হইত। আমরা তাড়াতাড়ি কিছু হাঁড়িকুড়ি কিনিয়া লইলাম, আর ইটের উনন তৈয়ারি করিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া লইলাম; তাহাতে সম্ভব চার-ছয় আনার বেশি পড়িল না। বাস্, আমরা ওখানেই জমিয়া গেলাম। অনেক জোর করা হইল, কিন্তু যখন নিজেদের উনন জ্বলিতেছে, তখন কে সরিয়া যাইবে? শেষে পদাধিকারীরা আসিয়া আমাদের দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

সি. আর. দাশ আমাকে কলিকাতায় ওকালতির সময় হইতেই জানিতেন। কয়েকটি মকদ্দমায় একসঙ্গে কাজ করিবারও সুযোগ পাইয়া-ছিলাম। তাঁহার সহিত দেখা হইল কংগ্রেসে। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন : শুনেছি যে আমার জন্য যে কুঠরি ছিল তা তোমরা জোর করে নিজেরা দখল করে নিয়েছ। আমি খুব লজ্জা পাইলাম। আমি সব কথা খুলিয়া বলিলাম। ইহাও বলিলাম : আপনি চাইলে এখনই ঘর খালি করে দিই। তিনি বলিলেন : তোমরা ঠিকই করেছ; তোমাদের জন্য কোনও জায়গাই যখন ছিল না তখন তোমরা আর কি বা করতে পারতে? নিজের কথায় তিনি বলিলেন, আমার জন্য ভেবো না, আমি খুব আরাম করে হোটেলে আছি।

এইভাবে ১৯১৮ শেষ হইল। আমি আবার পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি করিতেই লাগিলাম।

পঠদ্দশার সময় হইতেই রায় বাহাদুর হরিহরপ্রসাদ সিংহ আমাকে চিনিতেন। আমি যখন বিলাত যাইবার কথা ভাবিতেছিলাম, তখন তিনি কিছু সাহায্যও করিয়াছিলেন। আমি যখন ওকালতি শুরু করি তখন তিনি আমাকে নিজের উকিল করিয়া লইলেন। হাইকোর্টে তাঁহার যত মকদ্দমা উঠিত তাহাতে আমিই তাঁহার উকিল হইতাম। ব্রহ্মদেশেও তাঁহার এক প্রকাণ্ড সম্পত্তি ছিল। ঐ সম্পত্তির জন্য ডুমরাঁওয়ের মহারাজা বাহাদুর আদালতে দাবি করিলেন। তাঁহার যাহা-কিছু সম্পত্তি বিহারে ছিল, তাহাও ঐ নালিশের মধ্যে জুড়িয়া দিলেন। দুই পক্ষ হইতে কয়েক-জন নামকরা বড় বড় উকিল রাখা হইল। হরিজী আমাকেও কাজ করিতে বলিলেন। ১৯১৮-এর দুর্গাপূজার ছুটিতে তিনি আমাকে কাগজপত্র পড়িবার জন্য প্রয়াগে ডাকিলেন— তখন তিনি প্রয়াগেই থাকিতেন। আমি ছুটিতে প্রয়াগেই কাগজপত্র পড়িতে থাকিলাম। ছুটিতে আমার বন্ধু বাবু বৈদ্যনাথনারায়ণ সিংহও প্রয়াগেই দারাগঞ্জে বাসা ভাড়া করিয়া নিজের আত্মীয়-বন্ধু সঙ্গে লইয়া দিন কাটাইতেছিলেন। আমরা দুই জন প্রায়ই সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াইবার সময় একত্র হইতাম।

একদিন দুপুর বেলায়ই তিনি আমার নিকটে চলিয়া আসিলেন। নানা প্রকারের কথাবার্তা হইতে থাকিল। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি মকদ্দমার কোনও কাজ করিতে পারিলাম না। যাওয়ার সময় আবার আর এক দিন আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরের দিন প্রথম দিনকার চেয়েও আগেই চলিয়া আসিলেন। আবার অনেক রকম অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিলেন। আমার সন্দেহ হইল, ইঁহার মাথার অবস্থা ঠিক নাই। আমি কোনও বন্ধুর উন্মাদ রোগের প্রথম অবস্থা দেখিয়াছিলাম। ইঁহার মধ্যেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। যাওয়ার সময় আমিও তাঁহার সঙ্গেই গেলাম। তাঁহার বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার ঘুম খুব অল্প হইতেছে। আর দিনরাত এই ধরনের কথা বলিতেছেন। আমি আরও ভয় পাইয়া গেলাম। তৃতীয় দিন দেখিলাম, তিনি একরকম পাগল হইয়া গিয়াছেন। আমাকে তাঁহার সঙ্গেই থাকিতে হইল। তাঁহার ভাইকে আসিতে টেলিগ্রাম করা হইল। দিন দিন তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকিল।

একদিন তিনি বাক্স খুলিয়া ওকালতির গাউন বাহির করিলেন। তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ইউনিভার্সিটির কোনও

পরীক্ষায় তিনি সোনার পদক পাইয়াছিলেন। উহাও তিনি এইভাবে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। নিজের ছোট মেয়ে, যে ছিল তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান, তাহাকে একদিন মারিয়া ফেলিতে গেলেন।

আমরা খুব ঘাবড়াইয়া গেলাম। ওখানে যাহা কিছু চিকিৎসা হইবার হইয়া গেল; কিন্তু স্থির হইল যে, উঁহাকে পাটনায় লইয়া যাওয়াই ভাল হইবে। দুই-চার দিনের মধ্যে খানিকটা ভাল হইতেছেন বলিয়া মনে হইল। একদিন স্থির হইল যে, আমি তাঁহার সঙ্গে পাটনায় চলিয়া যাইব, আর তাঁহার ছোট ভাই জগন্নাথজী পরিবারসহ পরের দিন পাটনায় গিয়া পোঁছিবেন। হাইকোর্টের ছুটি সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দুই জনের পাটনায় যাওয়া দরকার হইয়াছিল। ছুটিতে বরাবর প্রয়াগেই ছিলাম বলিয়া বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখাও হয় নাই; কারণ আমার পরিবারের সকলে ছাপরায় অথবা আমাদের গ্রাম জীরাদেইতেই থাকিত, আমার সঙ্গে পাটনাতে থাকিত না। আমি ভাবিয়াছিলাম, ছুটির শেষে দুই-চার দিনের জন্য বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিব; কিন্তু বৈদ্যনাথবাবুর শরীর অসুস্থ বলিয়া এই চিন্তা ছাড়িয়া দিতে হইল।

যখন আমরা দুই জনে প্রয়াগ হইতে পাটনা রওনা হইলাম, তখন বৈদ্য-নাথবাবু একেবারে সুস্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। কাপড়-চোপড় ঠিক-ভাবে পরিয়া স্বাভাবিক কথাবার্তা করিতে করিতে আমার সঙ্গে রেলে চড়িয়া বসিলেন। পথে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে বাড়ি যাইতে চাহিয়াছিলাম, সে কথা কেন ছাড়িয়া দিলাম, আর বলিলেন যে, এখন তাঁহার শরীর একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে, কোনও চিন্তা নাই। যাহা কিছু ঘটিয়াছে সে কথা মনে করিয়া তিনি দুঃখ ও লজ্জার ভাব দেখাইলেন, আর আমাকে বলিলেন যে, আমি যেন সোজা বাড়ি চলিয়া যাই, তিনি পাটনায় চলিয়া যাইবেন, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই।

তাঁহার কথা শুনিয়া খুব খুশি হইলাম। আমার বিশ্বাস হইল, তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে আমি lucid moments (পাগলামির মাঝে মাঝে স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা) কথাটার অর্থ জানিতাম না। কাশী স্টেশনে তাঁহাকে পাটনার গাড়িতে বসাইয়া আমি ছাপরার গাড়িতে ছাপরা চলিয়া গেলাম। পরের দিন সকালে তিনি যখন পাটনায় পোঁছিলেন তখন তাঁহার অবস্থা আগেকার অনুযায়ী পাগলের মত। স্টেশনের কর্মচারীরা তাঁহাকে চিনিল। এই অবস্থায় তাঁহাকে একা দেখিয়া কয়েকজন বন্ধুকে খবর দিল। তাহারা আসিয়া কোনও মতে তাঁহাকে বাড়ি লইয়া গেল। পরের দিন আমি যখন পাটনায় পোঁছিলাম তখন তাঁহাকে অসুস্থ অবস্থায়ই দেখিতে পাইলাম। আমার খুব দুঃখ হইল যে, আমি মহা ভুল করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি খুব

হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন: আপনি নিজেকে খুব হুঁশিয়ার মনে করেন, আমাকে চোখে চোখে রাখবার জন্য— জগন্নাথজীর সঙ্গে ষড়্যন্ত্র করে— আমার সঙ্গে এসেছিলেন; কেমন ফাঁকি দিয়ে বেকুব বানিয়েছি! এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার সেই অসংলগ্ন কথা আরম্ভ হইল।

পাটনাতেও আমরা বরাবর দেখাশোনা করিতে থাকিলাম; কিন্তু তিনি কখনও সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইলেন না। কখনও কখনও ভাল হইয়া যান, এমন কি হাইকোর্টে যাইতে আরম্ভ করেন। 'পাটনা ল' উইকলি', আমি আর তিনি একত্রে যাহা বাহির করিতাম, তাহা বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অসুখ যেমনকার তেমনই থাকিল। কিছুদিন পরে তিনি আকস্মিকভাবে মারা গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর আঘাত আমার মনের উপর খুব বাজিল। কিন্তু তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় থাকার চেয়ে মৃত্যু হওয়া ভাল হইল। তাঁহার পক্ষে মৃত্যু ছিল একপ্রকার মুক্তি। আমার সঙ্গে তাঁহার যতখানি ভালবাসা ছিল ও তিনি আমার যতখানি উপকার করিয়াছেন তাহা মনে পড়িলে আজও দুঃখ হয়; আর এই কথা ভাবিয়া অনুতাপ হয় যে, তাঁহার জন্য অথবা তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিলাম না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ১৯১৭ হইতেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জাগরণের ঢেউ উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চম্পারনে গান্ধীজীর শুভাগমন ও রায়তদের সেবার প্রভাব চারিদিকে পড়িয়াছিল— যদিও খবরের কাগজে খুব কম খবর ছাপাইবার জন্য দেওয়া হইত, আর কোথাও সভায় বক্তৃতা দেওয়ার তো আমাদের বারণই ছিল। শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসাণ্ট হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র দেশে ১৯১৭ সালে প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। প্রায় সকল প্রদেশেই উহার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। লোকে খুব জোরে প্রচার-কার্যে লাগিয়াছিল। গভর্নমেণ্ট তাহাতে যেন খানিকটা ঘাবড়াইয়া যাওয়ার মত হইয়া অ্যানি বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই জন সহকর্মীকে নজরবন্দী করিয়া রাখিল। ইহার পর আন্দোলন আরও প্রবল হইল। ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ১৯১৭ সালেও তাহার দ্বৈধ নীতি চালাইতেছিল। একদিকে সে আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তককে এইরূপে নজরবন্দী করিল, অন্যদিকে

পার্লামেণ্টে নবনিযুক্ত ভারতমন্ত্রী মণ্টেগু সাহেব এক ঘোষণা করিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে যে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাইবে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল; কিন্তু ভারতীয়দের হাতে কবে ও কতখানি অধিকার আসিবে, সে বিষয় পার্লামেণ্টই স্থির করিতে পারিবে। তাহার পর মণ্টেগু ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে এখানকার ভাইসরয় লর্ড চেম্‌সফোর্ডও ছিলেন। দুই জনে মিলিয়া এক রিপোর্ট তৈয়ার করিলেন, তাহার ভিত্তিতে পার্লামেণ্ট ১৯২০ সালে এক আইন পাশ করিল। অ্যানি বেসাণ্টকেও কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাঁহাকে ১৯১৭ সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা, তাহার সভানেত্রী নির্বাচন করা হয়। দেশে প্রবল উৎসাহ ছিল। আমরাও চম্পারন হইতে গান্ধীজীর সঙ্গেই কংগ্রেসে গিয়াছিলাম। শেঠ যমুনালালজীর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। তিনি গান্ধীজীর থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই বাসা-বাড়িতে গান্ধীজীর সহকর্মী বিহারনিবাসী আমরা অনেকে শেঠজীরই অতিথি হইলাম। অন্যান্য অনেক বিহারীও আমাদের সঙ্গে আসিয়া উঠিল, আর তাহারা হইল আমাদের অতিথি—অতিথিরও অতিথি। যমুনালাল-জীর আতিথ্য গ্রহণ করিবার প্রথম অবসর সেইখানেই পাইয়াছিলাম।

জার্মান যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ গভর্নমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিল। সব সরকারি কর্মচারী খুব জোরে ইহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু লোকে বা তখনকার কাউন্সিল যাহা-কিছু সাহায্য নিজের খুশিমত করিয়াছিল, তাহা ছাড়া জোর-জবরদস্তিতেও অনেক সাহায্য লওয়া হইয়াছিল। সেজন্য দেশময় বিশেষ অসন্তোষও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবে তখন লেফটেনাণ্ট গভর্নর ছিলেন স্যর মাইকেল ওডায়ার। তিনি ছিলেন খুব জবরদস্ত সিভিলিয়ান। তিনি রংরুট ও চাঁদা সংগ্রহে খুব কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের উপর ইহার প্রভাব খুব খারাপ হইয়া-ছিল। সেখানকার লোকেরা—হিন্দু, মুসলমান, শিখ— বড়ই কষ্ট পাইয়া-ছিল। গভর্নমেণ্টও জানিত যে, পাঞ্জাবের বাহিরে অন্যান্য স্থানেও যথেষ্ট অসন্তোষ আছে। লড়াই শুরু হইতেই, কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, এই সুযোগে যদি ভারতবর্ষে বিপ্লব সংঘটন করা যায়। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে কার্যতও কিছু করিয়াছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে এই কথা লইয়া খুব চঞ্চলতা দেখা গিয়াছিল যে তাহাদের খলিফা—তুর্কির বাদশাহ— লড়াইয়ে জার্মানীর পক্ষে হইল, আর তুর্কি সেনার বিরোধিতা করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য পাঠানো হইল, সেই সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাও বেশ ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এইসব কারণে প্রভাবিত হইয়া নিজের দ্বৈত নীতি চালাইতেছিল। মুসলমানদের

সন্তুষ্ট করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট কতকগুলি প্রতিশ্রুতিও করিল, তাহার মধ্যে উহাদের ধর্মস্থানগুলি রক্ষা করিবার ও তুরস্কের ক্ষমতা ও রাজ্যের বেশি ক্ষতি না করার কথাও ছিল। অন্যদিকে গভর্নমেণ্ট ইহাও ভাবিতেছিল যে, ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োজন ইহার পরেও হইবে (আপাতত যুদ্ধশেষের পরে ছয় মাস পর্যন্ত উহা প্রচলিত থাকিতে পারে), কারণ উহা না থাকিলে যাহারা নজরবন্দী আছে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর অসন্তোষ যদি একটা বিকট আকার ধারণ করে তাহা হইলে উহা সামলাইবার জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে আদালতে মকদ্দমা শুনানির সময় সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিবার ঝঞ্ঝাট না পোহাইতে হয়। এই ব্যাপারে এক কমিটি নিযুক্ত করা হইল। তাহার সভাপতি ছিলেন লণ্ডন হাইকোর্টের এক জজ, স্যর সিডনি রাউলট। কমিটি এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া সুপারিশ করা হইল যে, এমন একটা আইন করা প্রয়োজন যাহার দ্বারা ষড়যন্ত্রকারীদের উপদ্রব হইতে নিবৃত্ত করিবার ও বিপ্লব হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারের পুরা আইনসম্মত ক্ষমতা থাকিবে— অর্থাৎ প্রায়ই সেই সমস্ত অধিকারই থাকিবে যাহা লড়াইয়ের বিপন্ন অবস্থা সামলাইবার জন্য ভারতরক্ষা আইনের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে বাহির হইল একদিকে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-রিফর্ম-স্কিম, অন্য দিকে ১৯১৮ সালের শেষাশেষি রাউলট-রিপোর্ট।

রাউলট-বিল-বিরোধী আন্দোলন

রাউলট-রিপোর্ট বাহির হইতেই সমস্ত দেশে ভীষণ অসন্তোষ উৎপন্ন হইল, তাহাতে পূর্ব হইতেই যে অসন্তোষ ছিল তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আগুনে ঘি পড়িল। চম্পারন হইতে ফিরিবার পর আমি আমার ওকালতিতে লাগিয়া গেলাম। ছয়-সাত মাসের অনুপস্থিতির পরেও তাহাতে কোনও রকমে ভাঁটা পড়ে নাই। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে আমার হাইকোর্টে জোর পসার। মকদ্দমা ও টাকাও খুব পাইতেছিলাম। গান্ধীজী চম্পারনেই আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন যে, আমরা যদি চম্পারনে সততার সহিত কাজ করি, তাহা হইলে এক প্রকারের পুঁজি অর্জন করিব, তাহা হইতে ভবিষ্যতে বিস্তর লাভ করিতে পারা যাইবে।

সেখানে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে কাজ হইয়াছিল। আজও যখন আমি আমার গত পঁচিশ বৎসরের জীবন আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে, সেখানকার রোজগার করা পুঁজিই দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। কখনও কখনও ইহা জানিয়া খুব সন্তোষ হয় যে, গান্ধীজী সত্যের যে শিক্ষা সেখানে দিয়াছিলেন তাহার অন্যতম ফল হইল, জীবনে আমি কর্তব্যের অনুরোধে যাহার ঘোর বিরোধিতা করি, সেও আমার কথায় বিশ্বাস করে। কিন্তু এই প্রকারের সাধারণ জীবনে সততা হইতে যে লাভ হইয়াছে, তাহা ছাড়া ওকালতিতেও সর্বদা উহা হইতে লাভই হইয়াছে—কিছু লাভ নিজের পেশায় সাফল্যে, কিছুটা তাহার ফলস্বরূপ টাকা পয়সা রোজগারে। আমি এই বলিয়া গর্ব করিতাম যে, ওকালতির যুগে জজেরা আমাকে বিশ্বাস করিতেন। একজন ইংরেজ জজ তো কখনও কখনও এমনই তামাসা করিতেন যে, প্রতিপক্ষের উকিল দুর্বল বলিয়া জানা গেলে তিনি আমাকেই বলিতেন, তুমিই ওকে বলে দাও, তোমার বিরুদ্ধে যা সব চেয়ে খারাপ নজির। আমি এজন্যে প্রস্তুতও থাকিতাম। ঐ নজির পেশ করিয়া তাহার খণ্ডনে যে নজির পেশ করিবার কথা তাহাও পেশ করিয়া দিতাম। কখনও ব্যর্থ দলিল পেশ করিতাম না। যে মকদ্দমায় তর্কের অবকাশ থাকিত না, তাহা কখনও লইতামই না। মক্কেলকে পরিষ্কার বলিয়া দিতাম, এতে কিছু হবে-টবে না, এ মকদ্দমা দাখিল করে পয়সা নষ্ট কোরো না। কোনও কোনও মক্কেল অন্যের কাছে গিয়া আপিল দায়ের করাইত, আর পয়সা খরচ করিয়া হারিয়া যাইত। যাহাদের আমি আপিল দায়ের করিতে বারণ করিয়া কাগজ ও পয়সা ফিরাইয়া দিতাম, তাহাদের অন্যের মারফত আপিল দায়ের করিতে ও হারিতেও দেখিয়াছি। এমনও এক মকদ্দমা দেখিয়াছি, যাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অন্য উকিল দায়ের করিয়া হাইকোর্টে জিতিয়াও লইয়াছে। এমনটা হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। কারণ মকদ্দমাবাজি এক-প্রকার জুয়া তো বটেই। হইতে পারে যে, আমি ঐ মকদ্দমার সূক্ষ্ম কথাগুলি ধরিতে পারি নাই, অথবা বিচারক ধোঁকায় পড়িয়া ভুল রায় দিয়া ফেলিয়াছেন। যাক সে কথা।

আমি তো জোর ওকালতি করিতে থাকিলাম; কিন্তু এখন গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্কও ঘুচিবার নয়। রাউলট-রিপোর্ট বাহির হইবার পর দেশে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। তাহার নেতৃত্ব গান্ধীজী নিজের হাতে লইলেন। বিহার হইতে ফিরিবার পর গান্ধীজী খেড়ার যে-সব কৃষকদের উপর মালগুজারি বাড়িয়াছিল, তাহাদের নেতৃত্ব করিয়া বর্ধিত হার বন্ধ করিয়া দিলেন। এইজন্য সেখানে সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষে কথাটার মীমাংসা হইয়া গেল। গান্ধীজী যখন খেড়াতে

ঘুরিতেছিলেন, তখন আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গুজরাটের কৃষকদের ঐ জেলায় (১৯১৮) দুই-তিন দিন ঘুরিয়াছিলাম। এপ্রিল মাস তখন; প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছিল। রৌদ্র খুব কড়া হইত। ঐ গরমের মধ্যেও গান্ধীজী গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিতেন। তখনকার দিনে তিনি জুতা পরিতেন না। তাই বালি তপ্ত হইলে খালি পায়ে চলিতে তাঁহার খুব কষ্ট হইত। একদিন এমন এক দৃশ্য আমাকে দেখিতে হইল। গরমের চোটে পা পুড়িয়া যাইতেছিল। খানিকটা দূর পর্যন্ত বালি ছিল। আমার তো পায়ে জুতা ছিল, আমার কোনও কষ্ট হয় নাই। কিন্তু গান্ধীজীর খুব কষ্ট হইয়াছিল। এক জায়গায় আমি চাদর বিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, যাহাতে তাঁহার সামান্য কিছু আরাম হয়। কিন্তু তিনি তাহা করিতে দিলেন না। সে যাত্রা সর্দার বল্লভভাইয়ের গ্রাম কামসদেও যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহার পৈতৃক বাড়ি দেখিয়াছিলাম। ঐ সত্যাগ্রহের নেতা একপ্রকার সর্দার বল্লভভাই-ই ছিলেন। ঐ সত্যাগ্রহের জন্য তাঁহার গান্ধীজীর সঙ্গে যে যোগ হইল তাহা আজ পর্যন্ত অটুট আছে এবং দিন দিন এই দুই শক্তির মিলনের সুফল দেশ পাইয়া আসিতেছে।

খেড়া সত্যাগ্রহের পর গান্ধীজী ভারত সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য খেড়া জেলার লোকদের ফৌজে ভর্তি হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেজন্য জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখনও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। গভর্নমেণ্ট যে ভুল কর ধার্য করিত ও স্থানে স্থানে জুলুমও করিত, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন, কিন্তু সমস্ত কথা আলোচনা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেন যে ব্রিটিশনীতি ন্যায়ানুগত, তাহা হইতে ন্যায় বিচার হইবে, এরূপ আশা পোষণ করা যায়। তাই তিনি সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য লোককে ফৌজে ভর্তি হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজের অভ্যাসমত এই কাজেও তিনি খুব জোরে লাগিয়া গেলেন। খেড়া পরিভ্রমণের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। তিনি রোগে বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলেন। ঐ নীতি অনুসারে আমিও, ফৌজে রংরুট ভর্তির বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য বিহারে যে সরকারি বোর্ড গঠিত হয়, তাহার সভ্য হইলাম। তাহার সেক্রেটারি ছিলেন রাসেল সাহেব, যিনি আজ বিহার গভর্নরের পরামর্শদাতা। যতদূর জানি, গান্ধীজীর প্রাণপণ পরিশ্রমের পরেও রংরুট ভর্তির বিষয়ে খুব সফলতা হয় নাই। বিহারে আমি বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই।

গান্ধীজীর অসুখ এত বাড়িয়া গেল যে তিনি বোম্বাইয়ে সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টের বিষয়ে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হইল, তাহাতে যোগ দিতে পারিলেন

না। কিন্তু আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম, সেখান হইতে ফিরিবার সময় আমি আমেদাবাদ ও সবরমতীতে অনেকদিন গান্ধীজীর সঙ্গেও ছিলাম। তাঁহার মত যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে বলিতে পারি যে তিনি যদি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে নরম দলের সঙ্গেই ভোট দিতেন। কংগ্রেসের কাজ তো শেষ হইয়া গেল, কিন্তু দুই দলের মতভেদ খুব স্পষ্ট হইল। কিছু লোকের কংগ্রেস ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে লিবারেল দল সংগঠন করিবার সূত্রপাত ওখানেই হইয়া গেল। তিন মাস পরে, দিল্লীতে বাৎসরিক অধিবেশনে, বোম্বাইয়ের প্রস্তাবগুলিই কংগ্রেস বহাল রাখিল।

আমি যখন বোম্বাই হইতে আমেদাবাদে গিয়া পেঁৗছিলাম, তখন দেখিলাম যে, গান্ধীজী আমেদাবাদ শহরের মির্জাপুর মহল্লায় শেঠ আম্বালাল সারাভাইয়ের এক প্রকাণ্ড বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। শেঠজী সে সময়ে নিজের অন্য একটা নূতন বাড়িতে থাকিতেন, আর ইহা খালি পড়িয়া ছিল। গান্ধীজীর শরীর খুব খারাপ ছিল। ডাক্তারেরা তো দেখাশোনা করিতেন, কিন্তু তিনি কোনও ঔষধপত্র খাইতেন না। মলের প্রকোপ ছিল। জ্বরও খুব ছিল। সবরমতীতে আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত ঘরবাড়ি হইয়াছিল কম। থাকিবার লোকের সংখ্যা কিন্তু বাড়িয়া যাইতেছিল। একদিন গান্ধীজীর জ্বর খুব বাড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি বলিলেন: এখন এখানে আর থাকা চলবে না, শীগ্‌গির সবরমতী আশ্রমে চলো। সঙ্গীরা থামাইতে খুব চেষ্টা করিল; কিন্তু তিনি কাহারও একটা কথাও শুনিলেন না। ঐ অবস্থাতেই আশ্রমে চলিয়া গেলেন। যে সময়ে এইরূপ ঘটে, তখন আমি আমেদাবাদ শহরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম যে, সকলে আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। আমি সন্ধ্যাবলায় সেখানে গেলাম।

পরের দিন সকালবেলায় যখন আমি গান্ধীজীর কাছে বসিয়া, তখন আমি যে দৃশ্য দেখিতে পাইলাম আর যে কথা কানে গেল, সেই দৃশ্য ও সেই কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। গান্ধীজীর জ্বর খানিকটা কম হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছিলেন। ছোটখাটো এক কুঠরিতে চারপাইয়ের উপর তিনি পড়িয়া ছিলেন। নীচেই চাটাই বিছানো ছিল, আমি তাহাতে বসিয়াছিলাম। তিনি ছগনলাল গান্ধীকে ডাকইয়া তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তিনি এতই আবেগভরে কথা বলিতেছিলেন যে, তাহার প্রভাব না পড়িয়া থাকিতে পারিল না। যদিও আমি গুজরাটী ভাল বুঝিতাম না, তাহা হইলেও কথার মর্মগ্রহণ তো করিতে পারিতাম। তিনি বলিলেন: কাল যখন জ্বরের প্রচণ্ড বেগ ছিল, তখন জিদ করে এখানে চলে আসবার জন্য বলি। আমি

বুঝেছিলাম যে, এখানে চলে এলেই জ্বরের বেগ কম হবে। এই জ্বর তো ছিল শরীরে, কিন্তু ঐ বড় বাড়িতে পড়ে পড়ে আমার হৃদয়টা পুড়ে যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম—গান্ধী! তোর এত বড় বাড়ি দিয়ে কি দরকার? তুই এখানে কেন উঠেছিস? তোর জায়গা তো গরিবের কুটিরে —আশ্রমে। এখান থেকে শীগ্‌গির চলে যা। যতক্ষণ তা না করছিস ততক্ষণ শান্তি পাবি না। এইজন্য আমি এত জিদ করেছি যে, তোমাদের মধ্যে কারও কারও খারাপও লাগতে পারে। সেখান থেকে চলে আসার পরও রাত্রে ঘুমাই নি। বরাবরই ভাবছি। নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার জীবন কি এইভাবেই কেটে যাবে, কোনও কিছুতেই সফলতা পাব না? দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ আসার পর থেকে একটার পর একটা কাজ হাতে নিয়েছি, কিন্তু কোনটাই পূর্ণ করতে পারি নি; আধাআধি করেই সব ছেড়ে দিয়েছি। কলের মজুরদের মধ্যে হরতাল হোল; হরতাল তো এবার সফল হয়ে শেষ হোল, তাদের দাবি মঞ্জুর হোল; কিন্তু মজুরদের মধ্যে এখনও এমন সব ত্রুটি আছে যা দূর করা চাই। আমার ইচ্ছা ছিল, তাদের মধ্যে কাজ করে ঐ সব ত্রুটি দূর করবার চেষ্টা করব। কিন্তু তা করতে পারলাম না, গেলাম চম্পারনে। চম্পারনেও নীলকরের সমস্যা তো একরকম সমাধান হোল; কিন্তু সেখানকার চাষীদের মধ্যে অনেক কাজ করার প্রয়োজন আছে। এইজন্য সেখানে কিছু কিছু পাঠশালা খোলা হয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি ঐ ধরনের কাজে যোগদান করতে থাকব, আর ঐ জেলায় এই ধরনের কাজের সূত্রপাত করে খুব জোরে তা চালাব। এই কাজের জন্য সত্যশীল ধীর ত্যাগী কর্মীও মিলেছিল, ভবিষ্যতেও মিলবার কথা ছিল; কিন্তু ওকাজও আধাআধি রেখে আমাকে লেগে যেতে হোল খেড়ের সত্যাগ্রহে। আবার খেড়ের চাষীদের কাজ শেষ হতেই ফৌজে ভর্তির কাজে লেগে গেলাম। খেড়েতেও জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাও সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। এর মধ্যে গেলাম অসুখে পড়ে। জানি না, এই অসুখ থেকে সেরে আবার খাড়া হয়ে উঠব কি না। যদি উঠিও, তবে কতদিনে উঠব কে জানে। তোমরা, যারা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই আমার সঙ্গে কাজ করে আসছ, আমার এই অবস্থার জন্য কোনও কাজ ভাল করে করতে পার না। তোমাদের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গেছে। এই আশ্রমটাই আমি অনেক আশা ভরসা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু এতেও আমি এ-পর্যন্ত মন দিতে পারি নি। চম্পারন থেকেই আমাকে এর উদ্‌ঘাটনের জন্য খবর পাঠাতে হোল, নিজে তখন আসতেও পারিনি। তখন থেকে কোনও না কোনও কাজে আটকে পড়ে বাইরেই আছি। এখন আমার এই দশা। জানি না ভগবান কি বিধান করবেন।

এই বলিতে বলিতে তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। ওখানে আমরা দুইজনই ছিলাম। কে তাঁহাকে চুপ করাইবে, কি করিয়াই বা করাইবে। আমরা বুঝিলাম তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা এখন চোখের জলের রূপে পাপের জল হইয়া বাহির হইতেছে, কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই চুপ করিবেন। বলিলেন : এই জ্বালায় প্রাণ জ্বলে যাচ্ছিল, সারা রাত ঘুমাইনি। খানিকটা চোখের জল পড়ে যাওয়ার পর সে জ্বালা খানিকটা শান্ত হয়েছে। ইহার পর তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও নীরবে বসিয়া থাকিলাম, ভাবিতে থাকিলাম, ঈশ্বর আমাকে মহা সৌভাগ্য দান করিয়াছেন, এমন একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমাকে জুটাইয়া দিয়াছেন। ছুটি লইয়া দুই-একদিন পরে আমি নিজের কাজে ফিরিয়া আসিলাম।

এই রোগ হইতে সারিয়া উঠিবার পর, যাহার মধ্যে তিনি হয়তো কখনও কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তিনি রাউলট রিপোর্টের বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রিপোর্ট বাহির হইবার কিছু পরেই গভর্নমেণ্ট তাহার অনুমোদনের অনুযায়ী দুইটি বিল দিল্লীর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে পেশ করিলেন, যাহাতে গভর্নমেণ্টের অনেক ব্যাপকভাবে জুলুম করিবার ক্ষমতা থাকে, যাহাকে ইচ্ছা, আদালতে না গিয়াও, নজরবন্দী করিয়া রাখিতে পারে। জনসাধারণ দেখিল, লড়াইয়ের দিনে ব্রিটিশ সরকার স্বরাজের সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহা পূরণ করিবার কোনও সম্ভাবনা তো নজরে পড়ে না, কিন্তু এই কালা আইন আমাদের মাথার উপরে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। সমস্ত দেশ জুড়িয়া অত্যন্ত ক্ষোভের সৃষ্টি হইল। সর্বত্র প্রতিবাদ সভা হইতে লাগিল। কাউন্সিলের বেসরকারি সভ্যেরা প্রবলভাবে এই বিলগুলির বিরোধিতা করিলেন; কিন্তু কে তাঁহাদের কথা শোনে! শেষকালে একটা বিল পাস হইল। নির্বাচিত ভারতীয় সভ্যেরা সকলেই তাহার বিপক্ষে, শুধু সরকারি কর্মচারী ও গভর্নমেণ্টের নিযুক্ত কোনও কোনও সভ্যের সম্মতি থাকায়, ভোটাধিক্যে ইহা পাস হইয়া গেল। গান্ধীজী প্রথমেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই আইন পাস হইলে আমরা ইহা মানিব না, সত্যাগ্রহ করিব।

তখনকার ঐ যে-সব প্রতিবাদ সভা দেশের আনাচে কানাচে হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছিল, দেশে নবজাগরণ হইয়াছে, নব-জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। এত সব বড় বড় সভা, যেখানে সকল শ্রেণী সকল জাতি সকল ধর্মের লোকে বিপুল সংখ্যায় আসিয়া যোগ দিত, পূর্বে কখনও বিশেষ দেখা যায় নাই। প্রথম বিল পাস হইতেই গান্ধীজী, নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সত্যাগ্রহের প্রশ্ন তুলিলেন। দেশের হাওয়া

দেখিয়া গভর্নমেণ্ট দ্বিতীয় বিলটি উপস্থিত করিলেন না, তাহা প্রত্যাহারও করিলেন না। এইভাবে উহা ঝুলিতে থাকিল। না হইল পাস, না হইল নামঞ্জুর। হয়তো প্রথানুযায়ী কয়েকদিন পরে উহা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু যে বিল পাস হইয়া গিয়াছিল, তাহাও কিছু কম ছিল না। তাহা দিয়া সরকারের কাজ চলিয়া যাইতেছিল। যে আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল তাহার ফল এই হইল যে, সেই আইন তো পাস হইয়া গেল, কিন্তু কখনও কার্যত প্রয়োগ করা হয় নাই। কয়েক বৎসরের পর উহা রদ করিয়াও দেওয়া হইল।

৬ই এপ্রিল ও সামরিক আইন

ঐ সময়ে গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সম্পাদনের ভার নিজের হাতে লইয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকিল, সমস্ত দেশ জুড়িয়া তাহা অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। তিনি অহিংস সত্যাগ্রহের কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন। একটা দিনও স্থির করিয়া দিলেন, ঐ দিনটিতে দেশবাসীরা সকলে উপবাস করিবে, নিজের নিজের ধর্মমন্দিরে ও মসজিদে প্রার্থনা করিবে, মিছিল বাহির করিয়া সন্ধ্যাবেলায় সভা করিবে, সেখানে সকলে কালা আইনের প্রতিবাদ করিবে। প্রতিবাদ সভা তো বরাবর হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই দিনটির খুব একটা গুরুত্ব ছিল। প্রথমবারের আন্দোলনে ক্ষেত্র বেশ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। ঐ দিনের হরতাল এত প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, ইহার পূর্বে ঐরূপ হরতাল কখন দেখা গিয়াছিল কি না সন্দেহ। শহরের সব দোকানপাট বন্ধ ছিল, যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। গ্রামবাসীরা সেদিন গোরুর গাড়ি ও লাঙ্গল চালানো বন্ধ রাখিয়াছিল। এই খবর কিভাবে সর্বত্র পৌঁছিয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। তখনও তো কংগ্রেসের শাখা-প্রশাখা এতদূর ছড়াইয়া পড়ে নাই, কংগ্রেস এত শক্তিমান প্রতিষ্ঠানও হয় নাই যে দূরতম গ্রাম পর্যন্ত ঐ সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে পারে; তবু এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল!

পাটনায় প্রতিবাদ সভা প্রভৃতি কাজ তৎপরতার সঙ্গে করিতে থাকিলাম। গান্ধীজীর চিঠিপত্রও যখন-তখন পাওয়া যাইত। কিন্তু বিশেষ সব কথা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে পাইতাম। মজহর-উল-হক সাহেব আর সৈয়দ হাসান ইমাম যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেন। মজহর-উল-হক সাহেব

তো সে সময়ে দিল্লী কাউন্সিলে গিয়াছিলেন; কিন্তু হাসান ইমাম সাহেব সভাসমিতিতে যাইতেন। ঐদিন হরতালের কথা প্রথম হইতেই সব দোকানদারদের বলা হইয়াছিল। সকলে রাজি হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু একজন বড় দোকানদার রাজি হইতেছিল না। এই কথা হাসান ইমাম সাহেব পর্যন্ত পেঁাছিয়া গেল। আমাকে সঙ্গে করিয়াই তিনি ঐ দোকানদারের দোকান পর্যন্ত গেলেন। সেখানে পেঁাছিয়াই তিনি নিজের টুপি খুলিয়া বুড়া দোকানদারের পায়ের উপর রাখিলেন। সে তো ভোঁ হইয়া গেল। বলিতে লাগিল : আপনি এ কি করলেন, আপনার হুকুমই আমার পক্ষে যথেষ্ট হোত। ফলে হইল এই, সমস্ত শহরে হিন্দুরই হউক কি মুসলমানেরই হউক, একটা দোকানও খুলিল না। শহরের সমস্ত দোকান বন্ধ থাকিল, তা চাই সে সোনা-রুপারই হউক আর শাক-শবজিরই হউক। ঐদিন যে মিছিল বাহির হইয়াছিল তাহাও ছিল অদ্ভুত। গুলজারবাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় শহরের কেল্লা পর্যন্ত— যেখানে সভা হইবার কথা ছিল— লম্বা মিছিল বাহির হইল, সকলের আগে খালি পায়ে হাসান ইমাম সাহেব ছিলেন, পিছু পিছু আমরা সকলে। কেল্লার ছোট ময়দানে যে সভা হওয়ার কথা ছিল, তাহা সেখানে হইতে পারিল না; কারণ জায়গা ছিল কম। গঙ্গার ধারে বালুর উপর সভা করিতে হইল। আমরা সকলে ভয় পাইয়াছিলাম যে এত বড় সভায় কোথাও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ না হয়; কিন্তু কিছুই হইল না। সেদিনের কাজ খুব শান্তি ও উৎসাহের সঙ্গে শেষ হইল।

কয়েকদিন পূর্বে হইতেই গান্ধীজী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, এই সব সত্যাগ্রহীদের নিকট হইতে এক প্রতিজ্ঞাপত্র সই করাইয়া লইতে হইবে, যাহাতে এ কথা থাকে যে, উহারা অহিংসা পালন করিতে গিয়া সেই সব আইন মানিবে না যাহা ভাঙিবার আদেশ এক মনোনীত কমিটি দিবে, আর এজন্য যে সাজা হইবে তাহা খুশি হইয়া ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। এ পর্যন্ত কমিটি কোন্ কোন্ আইন ভাঙিতে হইবে তাহা বলে নাই। ইহার পরে দেশে নরম দলের কেহ কেহ ও সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে কেহ কেহ খুব টীকাটিপ্পনীও কাটিলেন। কিন্তু গান্ধীজী বিচলিত হইলেন না। বিহারের সেই প্রতিজ্ঞাপত্র আমার নিকটেই আসিল। হাসান ইমাম সাহেব তাহাতে সই করিলেন। আমি এবং অন্যান্য কেহ কেহও সই করিলাম।

৬ই এপ্রিলের দেশময় সভা ও হরতাল খুব সফলতা ও সমারোহের সঙ্গে হইল। দিল্লীতে যে সভা হয় তাহা খুব উচ্চ শ্রেণীর। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সরকারি গুলি খাইল। মিছিলের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিজের বুক

পাতিয়া দিলেন, সরকার যদি চাহেন তো গুলি মারুন। মুসলমানদের উপর এতটা প্রভাব পড়িল যে, তাহারা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে লইয়া গিয়া জুম্মা মসজিদে তাঁহাকে দিয়া বক্তৃতা করাইল। সেখানে ছোটখাটো যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইল, তাহা শান্ত করিবার জন্য গান্ধীজী দিল্লী রওনা হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই, দিল্লীর নিকটবর্তী পালোয়াল স্টেশনে সরকারি হুকুম অনুসারে তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠানো হইল। মহাদেব দেশাই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি সেখান হইতে একা বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে তিনি আমাকে তার করিয়া জানাইলেন যে, গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন, আমি যেন শীঘ্র বোম্বাই পেঁীছিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র মিলিত হই। টেলিগ্রাম পাইয়াই আমি বোম্বাই রওনা হইয়া গেলাম। পথেই যে খবরের কাগজ পাইলাম তাহা হইতে জানিতে পারিলাম যে, সংবাদ পেঁীছামাত্র কয়েক জায়গায় দাঙ্গা শুরু হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে পাঞ্জাবের কয়েকটি শহর, আমেদাবাদ ও বোম্বাই আছে। দুই দিন পরে আমি যখন বোম্বাইয়ে আসিয়া পেঁীছিলাম ততক্ষণে সেখানে শান্তি স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজীকে পালোয়াল হইতে বোম্বাই লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে গিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। গান্ধীজী বোম্বাই পেঁীছিলেন বলিয়া দাঙ্গা জোর হইল না, শীঘ্রই ঠান্ডা হইয়া গেল। কিন্তু আমেদাবাদ হইতে খারাপ খবর আসিল। গান্ধীজী সেখানে যাইবার জন্য রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। মহাদেবভাইও বোম্বাই পেঁীছিয়া তাঁহার সঙ্গই লইলেন। বোম্বাইয়ে পেঁীছিয়া শুনিলাম যে, উঁহারা দুই জনে আমেদাবাদ চলিয়া গিয়াছেন। আমিও ঐদিন সন্ধ্যার গাড়িতে আমেদাবাদ রওনা হইলাম। পরের দিন সকালবেলা স্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, গোরা সেপাইদের পাহারা বসিয়াছে আর শহরে সামরিক আইন জারি হইয়াছে। কোনও প্রকারে টাঙ্গা করিয়া সবরমতী আশ্রমে পেঁীছিলাম। সেখানেও গান্ধীজী আসায় লোকে শান্ত হইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা কমিয়া গিয়াছিল। আমি পেঁীছিবার কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই সামরিক আইনও উঠাইয়া লওয়া হইল, কিংবা হয়তো প্রথমেই উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সেখানে শান্তি বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গান্ধীজী ঐদিন কি তাহার পরের দিন রাত্রের গাড়িতে বোম্বাই রওনা হইলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম।

ইহার মধ্যে পাঞ্জাবে দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর আসিতে থাকিল, গান্ধীজী তাহাতে খুব ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড ইহার মধ্যেই হইয়া গিয়াছিল। সামান্য কিছু খবর পাওয়া গেল, সম্পূর্ণ অবস্থা কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ঠিক ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। এইটুকু অবশ্য জানিতে পারিয়াছিলাম যে, পাঞ্জাবের

অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ করিয়াছে। গান্ধীজী ভাবিতে লাগিলেন, এই অবস্থায় সত্যাগ্রহ চালানো ঠিক হইবে না। তিনি সেই রাত্রে আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের রাস্তায় রেলগাড়িতেই নিজের অভিমত লিখিয়া ফেলিলেন, তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে অহিংসার অভাবের জন্য সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার কথা বুঝাইয়া বলেন। আমরা রেলগাড়িতেই তাহা পড়িয়া ফেলিলাম। বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য তাহা দেওয়া হইল।

বোম্বাইয়ে বেশ কিছুদিন থাকিলাম। সেখানে নিখিল ভারত হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দিলাম, উহা তখন বোম্বাইয়েই হইতেছিল। তাহার পর পাটনায় চলিয়া আসিলাম। সত্যাগ্রহ স্থগিত হইয়া গেলে আবার আমি নিজের ওকালতিতে লাগিয়া গেলাম।

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ

সত্যাগ্রহ তো বন্ধ হইল, কিন্তু দেশে অসন্তোষ বাড়িয়াই চলিল। ওদিকে পাঞ্জাবে সামরিক আইনের নামে অত্যাচার-অবিচার হইল। জনসাধারণকে অপমান করা হইল। হাজার হাজার লোককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল। সব খবরই কিছু কিছু বাহিরে আসিল; কিন্তু পুরা খবর কেহ পাইত না। নিজেদের মধ্যে মিলনের ভাব এত বেশি ছিল যে, হিন্দু মুসলমান শিখ সকল বিষয়ে পুরাপুরি একত্র থাকিত। একসঙ্গে গুলি খাইত, লাঠির আঘাত সহ্য করিত, জল খাইত, মাটিতে বুকে হাঁটিত, অথবা হাওয়াই জাহাজের গোলায় মারা পড়িত। এখানে সেই হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে না। উহা তো কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট হইতে পড়া চাই। সাহসী পাঞ্জাবীদের উপর অত্যাচার হইতেছে, এই সংবাদ পাঞ্জাবের বাহিরে আসিতে পারিত না। না পারিত কেহ পাঞ্জাবে যাইতে, না পারিত সেখান হইতে বাহিরে আসিতে, টেলিগ্রাম কি পত্র সেখানে যাইতেই পারিত না। সামরিক আইন উঠাইয়া লইলে তবে সব কথা জানা গেল। দেশে ভয়ংকর রোষাগ্নির সৃষ্টি হইল।

ঐ বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন অমৃতসরে হইবার কথা ছিল, যেখানে জালিয়ানওয়ালা বাগে হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সামরিক আইনের ফলে সমস্ত পাঞ্জাব বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভয় হইতেছিল যে, হয়তো সেখানকার লোকেরা কংগ্রেসের আয়োজন করিতে পারিবে না। কিন্তু

স্থির হইল যে, যেরূপেই হউক কংগ্রেসের অধিবেশন অমৃতসরেই করিতে হইবে। হইলও সেইরূপ। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। আমি এই কংগ্রেসে যোগ দিই নাই। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেস হইবে, আর দোসরা জানুয়ারি হইতেই বাবু হরিজীর মকদ্দমা আরম্ভ হইবার কথা। তিনি আমাকে আটকাইলেন। পণ্ডিতজীরও ঐ মকদ্দমায় কাজ করিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি কিছু দেরি করিয়া—কয়েক দিন পরে—আসিয়া পৌঁছিলেন। ততদিন নৃপেন্দ্রনাথ সরকারই (স্যর এন. এন. সরকার) অন্য কয়েকজন উকিল ও ব্যারিস্টার লইয়া কাজ শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯২০ সালের জানুয়ারি হইতে অক্টোবর পর্যন্ত আমি আরাতে ঐ মকদ্দমার জন্য হাজির ছিলাম। কখনও কখনও দুই-একদিনের জন্য ছুটি পাইলে পাটনায় যাওয়া-আসা করিতাম, বিশেষ করিয়া আমার বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিতে আসিতাম, সে তখন কালা-জ্বরে ভুলিতেছিল, তাহার চিকিৎসা পাটনাতে হইতেছিল। কখনও বা মক্কেলের কাজেই আসিতাম। কিন্তু এই দশ-মাস প্রায় বর্মার মকদ্দমাতেই লাগিয়াছিলাম।

পাঞ্জাবে সামরিক আইন উঠিয়া যাইবার পর গভর্নমেণ্ট এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন, সেখানকার সমস্ত ঘটনা তদন্ত করিবার ভার এই কমিটির হাতে দেওয়া হইল। লর্ড হাণ্টার বিলাতের এক জজ ছিলেন, তাঁহাকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। কংগ্রেসের দিক হইতে প্রথমে এই কমিটির সমক্ষে অত্যাচারের বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করার কথা স্থির হয়। কয়েকদিন ধরিয়া এই কাজ হইলও বটে। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ হইলে কংগ্রেস এই তদন্ত হইতে সরিয়া গেল। কংগ্রেস এক স্বতন্ত্র তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তাহার হাতে এই কাজের ভার দিল; গভর্নমেণ্টের দিক হইতে হাণ্টার কমিটি এই কাজ করিতেছিল। হাণ্টার কমিটির নিকট যখন ঘটনার পর ঘটনার কাহিনী আসিতে লাগিল এবং সব কথা খবরের কাগজে ছাপা হইতে থাকিল, তখন প্রথম লোকে বুঝিতে পারিল যে কী ভীষণ অত্যাচার পাঞ্জাবে হইয়াছে। পাঞ্জাবের অত্যাচারের সংবাদ বাহিরে যতই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, দেশে অসন্তোষ ও রোষ ততই বাড়িতে থাকিল। কংগ্রেস কমিটির তদন্তও প্রায় এই সময়েই হয়। এজন্য গান্ধীজী, দেশবন্ধু দাশ, জয়াকর, আব্বাস তৈয়বজী প্রভৃতি পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় খুব ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুইটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে।

ওদিকে তুর্কির সঙ্গে ইংরেজের ব্যবহারে মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ চঞ্চলতা আরম্ভ হইল। অমৃতসর কংগ্রেসের সময়েই মৌলানা সৌকত আলি, মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি

মুসলমান নেতা, যাঁহারা লড়াইয়ের জন্য নজরবন্দী ছিলেন, সকলে ছাড়া পাইলেন। ইঁহারা খিলাফত সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের জন্য সমস্ত দেশময় খিলাফত কমিটি স্থাপিত করিলেন। মুসলমানেরা এতই ক্রুদ্ধ ছিল যে, সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহিতেছিল; কিন্তু কি করা যাইবে, কিভাবে করা যাইবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। এদিকে পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের দরুন অন্য সকলেও অসন্তুষ্ট ছিল। রাউলট আইনও লোকে ভোলে নাই। ইহারা সকলে মিলিত হওয়ায় দেশে এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হইল। খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেস কমিটি, একে অন্যের আরও নিকটে আসিয়া যাইতেছিল। অনেক হিন্দুও খিলাফত কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করিল, অর্থ দিয়াও তাহার সাহায্য করিল। ওদিকে মুসলমানেরাও অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগিল। যখন হাণ্টার কমিটি ও কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট বাহির হইল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন কাশীতে হইল। আমিও সভ্যরূপে তাহাতে যোগ দিলাম।

আলি-ভাইদের সঙ্গে গান্ধীজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি খিলাফত কমিটিতে যোগদান করিলেন। কাশীর অধিবেশনের অল্পই পূর্বে, প্রয়াগে খিলাফত কমিটির বৈঠকে তিনি অহিংস অসহযোগের কার্যক্রম, সর্বপ্রথম ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে পেশ করেন। খিলাফত কমিটি তাহা মঞ্জুর করিল এবং স্থির করিল যে, উহা কার্যত গ্রহণ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে মৌলানারাও ধর্মের দিক দিয়া ইহাকে সজোরে সমর্থন করিলেন এবং এক ফতোয়া বাহির করিয়া সরকারের সঙ্গে কোনও প্রকার সহযোগকে 'হারাম' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাশীতে কংগ্রেস কমিটি স্থির করিলেন যে, সমস্ত কথা বিচার করিয়া দেশকে কি করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন করা হইবে। ঐ অধিবেশন কলিকাতায় হইবে বলিয়া স্থির হইল। লালা লাজপত রায় অনেক কালের পর অল্পদিন হইল বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সভাপতি নির্বাচন করা হইল। সমস্ত দেশে অসহযোগের আলোচনা হইতে লাগিল। গান্ধীজী খানিকটা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, খানিকটা লিখিলেনও বটে। এই সব আয়োজন হইতে হইতেই ১৯২০ সালের ১লা অগস্ট লোকমান্য তিলকের দেহান্ত ঘটিল।

১৯২০ সালের এপ্রিলে মৌলানা সৌকত আলি পাটনায় আসিলেন, তখন এক বড় সভা হইল। ঐ দিন পাটনায় ছিলাম বলিয়া আমিও এই সভায় যোগদান করিলাম। গান্ধীজীর মত ও কার্যপন্থার সঙ্গে তো আমার পরিচয় ছিলই। আরাতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু

দাশ দুই জনেই ডুমরাঁও রাজ ও হরিজীর 'ব্র্মার' মকদ্দমায় দুই পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। আমি তো পণ্ডিতজীর সঙ্গেই কাজ করিতেছিলাম, তাঁহার সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়েও আলাপ-আলোচনা করিতাম। তিনি কখনও কখনও দেশবন্ধুর সঙ্গেও আলাপ করিতেন। এইজন্য আমি সমস্ত কথাই জানিতাম। পাটনায় যখন মৌলানা সৌকত আলি অসহ-যোগের কার্যক্রম বর্ণনা করিলেন, তখন তিনি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা এজন্য কতদূর তৈরি আছে; আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে আমি ঐ সভায় সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিব বলি। এ পর্যন্ত কংগ্রেস কোনও সিদ্ধান্ত করে নাই, কার্যক্রমও সম্পূর্ণভাবে স্থির হয় নাই। কিন্তু আমি বলিয়া দিলাম, দেশ যদি অসহযোগ করিবে স্থির করে, আর তদনুসারে যদি অসহযোগ আরম্ভ হয়, তবে আমিও পিছাইয়া থাকিব না। তখন পর্যন্ত প্রকাশ ছিল যে, অসহযোগে ওকালতি ছাড়িতে হইবে, কাউন্সিলে যাওয়া চলিবে না। আমি উকিল তো অবশ্যই ছিলাম। ইহাও আমার ইচ্ছা ছিল যে, ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে, নূতন মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড বিধান অনুসারে যে নির্বাচন হইবে তাহাতে চম্পারন হইতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-পদের জন্য প্রার্থী হইব। এই অভিপ্রায় অনুসারে আমি চম্পারনে দুই-একবার কোনও কোনও জায়গা ঘুরিয়াও আসিয়াছিলাম। এক জায়গায় তো মজহর-উল-হক সাহেব পর্যন্ত আমার সদস্যপদ প্রার্থনার সমর্থনে গিয়াছিলেন। অসহযোগ আরম্ভ হইলে দুই-ই ছাড়িতে হইবে! আমি ঐ সভায় ঘোষণা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম যে, আমি দুই-ই ছাড়িব। মৌলানা সৌকত আলির সঙ্গে আমার পূর্বের দেখাশোনা ছিল না; গান্ধীজী তাঁহাকে আমার বিষয়ে কিছু বলিয়া থাকিবেন। সভা শেষ হইতেই আমি চলিয়া আসিলাম। সেখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না। কিন্তু তিনি আমার খোঁজ করিয়াছিলেন। যখন তিনি রওনা হইবেন, আমি তখন স্টেশনে গেলাম। সেখানেই তাঁহার সঙ্গে প্রথম কথা হইল। সভার কথা ও গান্ধীজী যাহা বলিয়াছিলেন সে কথা তাঁহার মনে ছিল। এইজন্য তিনি খুব আদর করিয়া কথা বলিলেন। আমার উৎসাহও বাড়াইলেন। এইভাবে হঠাৎ এই সভায় আমার ক্ষেত্রে অসহযোগের সূত্র-পাত হয়, আর আমি ঐ দিন ঘটনাক্রমে পাটনায় উপস্থিত ছিলাম বলিয়াই সে সভায় যাইতে পারিয়াছিলাম।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সেপ্টেম্বরে হইবার কথা ছিল। বিহারের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনও অগস্ট মাসে হইবার কথা। অসহযোগের প্রবল আলোচনা হইতেছিল। বিহারে প্রশ্ন উঠিল, প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি কাহাকে করা হইবে? লোকে আমাকেই নির্বাচিত করিল। আমি

অসহযোগের পক্ষপাতী ছিলাম; কিন্তু বলিতে পারিতাম না, প্রদেশের লোকে ইহা মঞ্জুর করিবে কি না; যদি মঞ্জুর করেও, তবে সময় আসিলে কতজন ইহাতে যোগ দিবে। এইজন্য আমি শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই অবস্থায় আমার মত সভাপতির অভিভাষণে প্রকাশ করিয়া বলা, আর সম্মেলন যদি আমার কথা স্বীকার না-করে তাহা হইলে এক সংকট উপস্থিত করা, আমার পক্ষে উচিত হইবে কি না? তিনি বলিলেন: নিজের মত ব্যক্ত করিয়া বলার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে, তাহা গ্রহণ করা বা না-করার অধিকারও সম্মেলনের আছে; এই-জন্য সভাপতির পদ গ্রহণে আমার কোনও বাধা নাই।

আমি আরাতে মকদ্দমায় জড়াইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে নিজের অভিভাষণ হিন্দীতে লিখিতে শুরু করিলাম। প্রাদেশিক সম্মেলনের মতো প্রতিষ্ঠানে বা সভায় তখনকার দিনে হিন্দীতে অভিভাষণ হইত না; ইংরেজীতেই প্রায় সব কাজকর্ম নিষ্পন্ন হইত। একদিকে মকদ্দমার ভিড়, অন্যদিকে সম্মেলনের অভিভাষণ-লেখা ও অবস্থার আলোচনা, সব মিলাইয়া আমি জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত হইলাম। ভয় হইতে লাগিল, প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য বুঝি ভাগলপুর যাইতে পারিব না। কিন্তু সময় আসিতে আসিতে এতটা ভাল হইয়া গেলাম যে কোনও প্রকারে নিজের লিখিত বক্তৃতা লইয়া যথাসময়ে ভাগলপুরে পোঁছিলাম। সেখানে সম্মেলনে যোগ দিতে পারিলাম। কিন্তু সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থিত কঠিন সমস্যা এমন ছিল, যাহা যে-কোনও কর্মীর মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিত। আমার স্পষ্ট ও দৃঢ় ধারণা ছিল যে, অসহযোগ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমি ইহা জানিতাম যে, প্রদেশের সব পুরানো ও অনুভবশীল রাজনৈতিক নেতা উহার বিপক্ষে। যদিও রাউলট বিলের প্রতিবাদের সময় হইতে সভায় লোকজন অনেক বেশি সংখ্যায় আসিত, তবু অসহযোগের পথে তাহারা কতদূর সঙ্গে থাকিবে সে-কথা বলা কঠিন ছিল। সম্মেলনে বড় বড় নেতাদের অনেকে উপস্থিতই হন নাই। তাই যদি সম্মেলন আমার কথায় অসহযোগের নীতি গ্রহণ করে তবে তাহার অর্থ ইহাই হইবে যে, তাহাকে কার্যে পরিণত করার ভার বেশির ভাগ আমাদেরই উপর পড়িবে—আমরা কতদূর তাহা চালাইতে পারিব? এই ধরনের অনেকানেক প্রশ্ন মনকে মথিত করিতেছিল। কিন্তু আমি জানিতাম, নবীনেরা অধিকাংশই আমার সঙ্গে।

বাবু ব্রজকিশোরপ্রসাদ, ধরণীধরবাবু প্রভৃতি অসহযোগ প্রবলভাবে সমর্থন করিতেছিলেন। ইঁহারা ছাড়া মুসলমান তো প্রায় সকলে খুব উন্মাদনার সঙ্গে ইহাতে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। মজহর্-উল্-হক্ সাহেব ছাড়া শাহ্ মোহম্মদ জুবৈর, মৌলবী মোহম্মদ শফী, মৌলানা

নুরুল্ হাসান্ প্রভৃতিও অবশ্যই সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেও হাসান্ ইমাম্ সাহেব, নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ প্রভৃতি যাঁহারা সর্বদা জনসাধারণের কাজে আসিয়া জোটেন, তাঁহারাও বিরোধী দলে ছিলেন। একদিকে ছিল অধিক অভিজ্ঞতা ও বহুদিনের জনসাধারণের সেবা, অন্যদিকে উৎসাহ, দেশের অবস্থাজনিত অসহ্য অস্থিরতা, আর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িবার তৎপরতা। ঈশ্বরের নাম লইয়া আমি এই সেবার ভার গ্রহণ করিলাম ও খোলাখুলি অসহযোগ সমর্থন করিলাম।

সম্মেলন আমার কথা মানিয়া লইল, বিপুল ভোটাধিক্যে অসহযোগের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিল, আর বিহারের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্যক্রম প্রস্তুত করিবার জন্য এক কমিটি গঠন করিল। বাবু ব্রজকিশোরপ্রসাদই ছিলেন তাহার নেতা। তাঁহার দৃঢ় মত ছিল যে, এই অসহযোগ, খিলাফতের অন্যায়কে দূর করা ও পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবি পূরণ করা ছাড়াও, স্বরাজের জন্যও সংকল্প গ্রহণ করা যাক। তখন পর্যন্ত যত সভাসমিতি হইত, অথবা সংবাদপত্রে যাহা কিছু লেখা বাহির হইত, তাহার মধ্যে খিলাফত ও পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডকেই অসহযোগের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইত। ব্রজকিশোরবাবু তাহাতে 'স্বরাজ' জুড়িয়া দিয়া (যতদিন স্বরাজ না পাওয়া যায়) তাহাকে একপ্রকার স্থায়িত্ব দিতে চাহিতেছিলেন। হইলও তাহাই। গুজরাটে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হইল, আর সেখানে ভাগলপুর সম্মেলনের দুই চার দিন পূর্বেই অসহযোগ সমর্থন করা হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, বিহার ও গুজরাটই দুইটি প্রদেশ, যাহাদের প্রাদেশিক সম্মেলন, কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পূর্বে অসহযোগ সমর্থন করিয়াছিল। ভাগলপুর সম্মেলনের সময় গান্ধীজী সম্মেলন যাহাতে অসহযোগ সমর্থন করে সেজন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে আমি যাইতে পারি নাই। দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলালজী গিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার আমাদের পক্ষ হইতে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য আমার আরাতে থাকা আবশ্যক ছিল। কংগ্রেস খুব আড়ম্বরের সঙ্গে হইল। শেষে পণ্ডিতজী অসহযোগ সমর্থন করিলেন এবং তাহা বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। সেখানে খিলাফত ও পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড ছাড়া স্বরাজকেও অসহযোগের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইল।

এই সময়ে বেতিয়াতে বিহার প্রদেশের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। আমি তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। সুরুজপুরার রাজা রাধিকারমণপ্রসাদ সিংহজী তখনকার দিনে এক সাহসী প্রভাবশালী গদ্যলেখক ছিলেন, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে যে

অভিভাষণ দেন তাহা এত মনোহর ও সুন্দর, তাহার ভাষা ও ভাব দুইয়ের এত ভাল সংমিশ্রণ ছিল যে, তাহার প্রভাব আজও আমার হৃদয়ে আছে। বেতিয়াতেই আমাকে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করে। ছাপরায় পৌঁছিয়া আমি খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলাম।

কলিকাতা কংগ্রেসের অল্পদিন পরেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক হইল, তাহাতে অসহযোগ বিষয়ে প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার কথা আলোচনা হয়। অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেলে আমার নিকট এখন ওকালতি ছাড়িয়া দিবার প্রশ্ন বাস্তবরূপে দাঁড়াইল। পণ্ডিতজী ও আমি যে মকদ্দমায় কাজ করিতেছিলাম, তাহাও প্রায় শেষ হইতে চলিল—অল্প দিন পরে শেষ হইয়াও গেল। তখনকার মত তো তাহা হইতে ফুসরত পাইলাম, কিন্তু সে মকদ্দমা ঐ পর্যন্ত গিয়া থামিবার নয়। যে পক্ষেরই হার হউক, উহার আপিল হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিল পর্যন্ত অবশ্য গড়াইবে। বাবু হরিজী চাহিতেছিলেন যে, আমি অন্তত তাঁহার এই মকদ্দমায় প্রয়োজনমত তাঁহার কাজ করিয়া দিই। আমি উহা লইয়া যথেষ্ট কাল কাজ করিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে টাকাও পাওয়া গিয়াছে, অতএব আমি তাঁহার এই অনুরোধ ঠেলিতে পারি নাই। কিন্তু ঐ সময় স্থির করিলাম যে, উহা ছাড়া নূতন মকদ্দমা হাতে লইব না। হ্যাঁ, হাতে যেসব পুরানো মকদ্দমা ছিল বিশেষত যাহার জন্য কিছু টাকা লইয়াছিলাম—তাহার বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।

দাদার নিকট হইতে আমি কোনও মত লই নাই। কিন্তু দাদা বুঝিয়াছিলেন যে, আমি এখন ওকালতি ছাড়িয়া দিব। তাঁহার আশা ছিল আমি কিছু টাকাপয়সা রোজগার করিয়া, বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না, তাহার একটু উন্নতি করি। কিন্তু তিনি আমার সংকল্পের কথায় তখন কিছুই বলিলেন না। অন্যান্য বহুলোকেও ওকালতি ছাড়িয়া দিল। সাধারণত লোকে বুঝিয়াছিল যে, এক বৎসরের পর সকলে নিজের নিজের কাজে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। এই ভাবিয়া লোকের আরও একপ্রকারের সাহস বাড়িয়া গেল। যখন হইতে ভাগলপুর কনফারেন্সে ও তাহার পরে কলিকাতা কংগ্রেসে অসহযোগের কারণের মধ্যে স্বরাজের কথাও জুড়িয়া দেওয়া গেল, তখন হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে এখন দীর্ঘদিন ধরিয়া অসহযোগ চলিবে; কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বরাজে তাড়াতাড়ি রাজি হইবে না। মহাত্মাজী বলিতেন, যদি খিলাফত ও পাঞ্জাবের বিষয়ে গভর্নমেণ্টকে আমাদের দাবি পূরণ করিতে বাধ্য করিতে পারি, তাহা হইলে উহাই হইবে স্বরাজের সূচনা, তাই তিনি প্রস্তাবে প্রথমে স্বরাজের কথা রাখেন নাই। এইজন্য তাঁহার দৃষ্টিতে 'স্বরাজ' কথাটা জুড়িয়া দেওয়ার জন্য আন্দোলনের সীমা বা উগ্র রূপ বাড়ে নাই।

বোম্বাই হইতে ফিরিবার পর পাটনায় আমার বাড়িতেই কয়েকজন অসহযোগী বন্ধুর সভা হইল। সেখানে ওকালতি ছাড়িবার কথা উঠিল। আমি বলিলাম, যে মকদ্দমা হাতে আছে তাহার বিষয়ে অসুবিধা হইতে পারে; কারণ আমরা মক্কেলের কথায় বাঁধা আছি, বিশেষত যেখানে পয়সা লইয়া ফেলিয়াছি সেখানে তো ছাড়িতেই পারি না। কয়েকজন বন্ধু ইহাকে একপ্রকার ওকালতি চালাইবার বাহানা বলিয়া মনে করিলেন। আমি শুধু নিজের জন্য এরূপ বলি নাই; তাঁহারা কিন্তু মনে করিলেন, আমি নিজের বেলায়ই এই সুবিধা অন্যের নামে লইতে চাই। কথাটা এই, এক বৎসর আরায় চলিয়া যাওয়ায় হাইকোর্ট হইতে প্রায় গর-হাজির থাকিতাম। এইজন্য এত দিনে প্রথমকার মকদ্দমা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল; নূতন মকদ্দমা তো হাতে আসেই নাই। এইভাবে আমাদের হাতে যত মকদ্দমা আসিত, তাহার সংখ্যা খুব কম হইয়া গিয়াছিল, তাহা হইলেও বেশি সংখ্যায় মকদ্দমা পাইতাম বলিয়া কমিয়া গিয়াও যাহা ছিল তাহাই যথেষ্ট। আমি নিজের কথা ধরিয়া থাকিলাম; কিন্তু বাস্তবিক ঐ বর্মার মকদ্দমা ছাড়া আর কোনও মকদ্দমায় আমার হাইকোর্ট যাইবার ডাক আসিল না। হয় মক্কেল আমাকে ছাড়িয়া দিল, নয়তো আমি টাকা লইয়া থাকিলে তাহা ফিরাইয়া দিয়া ছুটি লইলাম, না হইলে অন্য কোনও বন্ধুকে আমার জায়গায় কাজ করিতে বলিয়া দিলাম, তাহাতে মক্কেলও রাজি হইয়া গেল।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ও সরকার-সম্পর্কিত স্কুল কলেজ বর্জন। আমার মন বলিতেছিল, ইহাতে আমরা বিশেষ সফল হইব না। বঙ্গভঙ্গের সময় কলিকাতায় আমি সরকারি স্কুল বর্জনের আন্দোলন ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম। সেখানেও রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সেই 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন' যাহাদের সাহায্য পাইয়াছিল তাঁহারা শুধু রাজনীতিজ্ঞ নহেন। স্যর গুরুদাস ব্যানার্জি ইহার এক প্রধান উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্বে কলিকাতা ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যানসেলরও ছিলেন। এইজন্য তিনি গভর্নমেন্টের বিরোধিতাও বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না। কংগ্রেসে ও আন্দোলনের কার্যসূচীতেও বর্জনের কথা ছিল না। তাহাতে কয়েকজন ভাল ভাল উৎসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা যুবক ইহাতে যোগ দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত লেখক বিনয়কুমার সরকার, যিনি এম্. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। ইহাতেও ঐ জাতীয় বিদ্যালয়ে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না, কারণ সেখানকার শিক্ষা পাইয়া ছাত্রেরা কোনও প্রকারে জীবিকা নির্বাহের রাস্তা পাইত না। এইজন্য আমার ভয়

ছিল এখানেও যদি আমরা এবিষয়ে জোর দিই, তাহা হইলে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষত অভিভাবকদের মধ্যে বেশি উৎসাহ দেখা যাইবে না, আর এই কার্যক্রমও তাই জোরে চলিতে পারিবে না। বৈঠকে আমার এই মতও আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু কয়েকজন বন্ধু আমার কথা তলাইয়া দেখিলেন না; তাঁহারা মনে করিলেন, আমি বড় ভীরু, মিছামিছি অনাবশ্যক ভয়ের কথা বলিতেছি।

কথাটা এই যে, আমাদের দেশে বিদ্যা অর্থকরী। যে পড়িতেছে তাহাকে কিছু রোজগার করিতে হইবে। তাহার জীবন এমন হইয়া যায় যে, সে পুরানো ধারায় থাকিতে পারে না। তাহার নিজের থাকা-পড়ায়ও বেশি খরচ লাগিতে থাকে। বাড়ির লোকেরা আধুনিক শিক্ষা দিবার জন্য বেশি খরচ করে, আশা যে, ঐ শিক্ষা পাইয়া সে মূলধন বাড়াইতে যদি নাও পারে, অন্তত তাহা বজায় রাখিতে পারিবে। সে শিক্ষাও এমন যে, শিক্ষার শেষে সরকারি চাকরি বা ওকালতির মত পেশা ছাড়িয়া অন্য কোনও কাজও জুটিত না। গোড়ার দিকে, যখন এই বিদ্যায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ছিল, তখন লোকদের রোজগারও ছিল বেশি। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রচার যতই বাড়িতে লাগিল, শিক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িতে থাকিল, ততই টাকাকড়ি রোজগারের সুযোগ কমিয়া যাইতে থাকিল। কারণ যাহারা এই সব চাকরি ও পেশা গ্রহণ করিবে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া গেল, ফলে জীবনসংগ্রাম কঠিন হইতে থাকিল। এইজন্য, যদিও সরকারি ইংরেজী শিক্ষা হইতেও ততখানি আশা করা যাইত না, তথাপি জাতীয় বিদ্যালয়ের পথে অর্থার্জন এখনও খুব কঠিন কথা ছিল। তাই আমার কথা ছিল, আমরা প্রথমে কার্যক্রম অনুসারে ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়িতে বলিব, যখন দেখিব তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট হইয়া যাইতেছে তখন নিজেদের দিক হইতে বিদ্যালয় প্রভৃতির চেষ্টা করিব। ইহাও ভাবিতেছিলাম যে, বিদ্যালয় খুলিবার পর তাহা চালাইতে হইবে। যদি আমরা তাহা না করিতে পারি তাহা হইলে ইহার প্রভাব ভাল হইবে না। এইজন্য আমি প্রথমে বিদ্যালয় খোলার বা পরীক্ষা লইবার পক্ষে ছিলাম না।

উপরে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আমি আধুনিক শিক্ষার ত্রুটি বুঝিতে পারিতাম না। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আধুনিক শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয় বলিয়া ইহাতে সময় ও শক্তি খুব নষ্ট হয়। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিলে যে স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ হয়, ইহাতে তাহা হইতে পারে না। একথা স্পষ্ট যে, যেখানে শব্দের অর্থ মনে রাখিতেই সারা সময় লাগিয়া যায় সেখানে তাহা বুঝিবার ও ভাবিবার সময় কি করিয়া পাওয়া যায়? এই-জন্য আর কিছু না হইলেও শুধু এই এক দোষের জন্যই সেই শিক্ষা

সর্বথা ক্ষতিকর। বিদেশী ভাষা শেখায় ও জানায় দোষ নাই। জানা ভাল। আজকার দুনিয়ায় অন্তত কোনও একটি ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে পরিচয় একপ্রকার অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও ভাষা জানা ও তাহা দিয়া কাজ চালানো এক কথা, আর বিদেশী ভাষাকে সমস্ত শিক্ষার মাধ্যম করা একেবারে অন্য কথা। আমরা উহাকে মাধ্যম করিবার বিরোধী, শিখিবার বিরোধী নই। আমি ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরেজ হাকিমদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য এই শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন ছিল ইংরেজী-জানা দেশী লোকদের, নিজেদের কার্য পরিচালনে যাহাদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাহারা মনে করিত। তাহারা এমন কয়েকজন ভারতবাসীর সহযোগিতা চাহিত, যাহারা আকারে ভারতীয় কিন্তু মতে ও মানসিক বৃত্তিতে ইংরেজই হইবে। তাহারা ইহাও চাহিত যে, আফিসে কাজ চালাইবার জন্য এমন সুলভ ভারতীয়দের সৃষ্টি হউক, যাহারা ইংরেজী শিখিয়া তাহাদের সব কাজ ইংরেজীতেই করিয়া দেয়। এইভাবে, ইংরেজদের ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিবার ও ভারতবাসীদের উপর রাজত্ব করিবার জন্যও ভারতীয় ভাষা জানার প্রয়োজন হইবে না। তাই শিক্ষাপদ্ধতিও এইরূপ করা হইল যে, বিশেষ করিয়া ঐ প্রয়োজন অনুসারে লোক তৈয়ার করা যাইতে পারে। হাঁ, যাহারা এইভাবে তৈয়ারি হইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো নিশ্চয় এমন বাহির হইবে যাহারা স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার শক্তিও অর্জন করিবে এবং গভর্নমেণ্টের উপর মোটেই নির্ভর করিবে না। যদি এমন কয়েকজন বাহির হয় তো হউক; কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আফিসের কাজ চালাইবার জন্য লোক তৈরি করাই। তাহার ফলও হইল তেমনই। এইজন্য আমি কোনও মতেই এই শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলাম না; কিন্তু জাতীয় শিক্ষায় যে-সব অসুবিধা দেখিতাম তাহাতে খানিকটা ভীত হইয়া আস্তে আস্তে পা বাড়াইতে চাহিয়াছিলাম। সবচেয়ে আমার ভাবনা ছিল যে, কোনও কাজ শুরু করিয়া শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দিলে, পরিণাম পর্যন্ত না পৌঁছিলে, লোকের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। এইজন্য, যদি আমরা অল্প কাজও করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহা করি তাহা পাকাপাকি হওয়া চাই।

পূর্বে বলিয়াছি, চম্পারনে থাকিতেই আমরা বিহারে পুনা ফার্গুসন কলেজের আদর্শে এক কলেজ খুলিবার কথা ভাবিতেছিলাম। কিছু টাকাও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই চেষ্টা থামাইয়া রাখা হইয়াছিল; কারণ গান্ধীজী বলিয়াছিলেন : সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া বিদ্যালয় খুলিলে তাহাতে কিছু লাভ নাই—যদি তাহা করিতেও চাও, তাহলে একেবারে নতুন পদ্ধতিতে পড়ানো হয় এমন ধারা জাতীয় বিদ্যালয় খোলো। তাঁহার সেই কথাও আমরা ভুলি নাই। এইজন্য হৃদয়ের মধ্যে একদিকে জাতীয়

শিক্ষার অনুকূল চিন্তা বহিতেছিল, অন্যদিকে কঠিনতার শিলা দেখিয়া মনে সন্দেহ জাগিতেছিল। তাই আমি কিছুকাল থামিয়া ইহা দেখা সঙ্গত মনে করিলাম যে, সমগ্র দেশ, বিশেষত ছাত্রগণ, অসহযোগ রঙ্গভূমিতে কেমন করিয়া অবতীর্ণ হয়। কোনও কোনও বন্ধুর মত, যতক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করিয়া না রাখি, ততক্ষণ তাহারা সরকারি বিদ্যালয় ছাড়িয়া আসিবে না। এইজন্য ছাত্রদের সরকারি বিদ্যালয় হইতে সরাইতে গেলে, অসহযোগ করাইতে হইলে, জাতীয় বিদ্যালয় হওয়া প্রয়োজন। আমি এই প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অসহযোগ করানো পছন্দ করিতাম না। আমি চাহিতে-ছিলাম, দেশের নামে ও সরকারি শিক্ষার ত্রুটি বুঝাইয়া ছেলেদের সরাইয়া আনিলে ভাল হইবে। যখন তাহারা এইভাবে সবকিছু বুঝিয়া সুঝিয়া অসহযোগ করিবে তখনই তাহাদের অসহযোগ টেকসই হইতে পারিবে। আর যদি তাহারা এই কথা মনে করিয়া অসহযোগ করে যে, সেখানেও তাহাদের চাকরি দেওয়ার শিক্ষা মিলিবে, আর এইভাবে তাহাদের কোনও লোকসান হইবে না, তাহা হইলে তাহাদের সংকল্প টিকিবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে আসিয়া যখন তাহারা দেখিবে যে, তাহাদের ততটা সুবিধা নাই যতটা সরকারি বিদ্যালয়ে ছিল, তখন তাহারা নিরাশ হইয়া আবার ফিরিয়া যাইবে। আমি চাহিতেছিলাম, শুধু তাহারাই আসুক যাহারা ইহা বুঝিয়া লইবে যে পথ কণ্টকাকীর্ণ, ইহাতে কষ্ট আছে, আর সেই কণ্টকে বিদ্ধ হইবার জন্যই আমরা যাইতেছি, সহযোগ করিলে যে সুখসুবিধা সামান্য কিছু পাওয়া যায় তাহার জন্য নয়।

যখন এই সব তর্ক চলিতেছিল, আর আমরা ভাবিতেই ব্যস্ত, তখন মজহর-উল-হক সাহেব এক জাতীয় বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। তাহার অধ্যক্ষ হইলেন লাট বাবু (শ্রীরামকিশোরলাল নন্দক্যুলিয়ার); ইনি সবে বিলাত হইতে এম্. এ. ও ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ফিরিয়াছিলেন। ডিসেম্বরের আরম্ভে গান্ধীজী, মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা আজাদকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি বিহারেও আসিলেন। তাঁহারা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও আক্রমণ করিলেন। সামান্য সফলও হইলেন, পুরাপুরি নয়। ঐ আক্রমণের ফলস্বরূপ কাশী বিদ্যাপীঠ ও জামিয়া মিলিয়ার (দিল্লী) জন্ম হইল। তাঁহারা আসিলে বিহারে খুব উৎসাহ দেখা গেল। বিহারের ছাত্রেরাও ঐ ঢেউতে ভাসিয়া চলিল।

সরকারি শিক্ষা হইতে অসহযোগের অর্থ ছিল, কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখা। আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যথেষ্ট আগ্রহও দেখাইতাম। বিশ্ববিদ্যালয় এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নিযুক্ত স্যাডলার কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার অনুমোদন করিবার ভার ঐ কমিটিকে দেওয়া হইয়াছিল। আমিও ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। উহাতে আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলাম। আমার বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়, অন্তত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য, মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে। ইহা লইয়া কমিটির মধ্যে যথেষ্ট বাদবিতণ্ডা হইল। প্রশ্নটি সেনেটের সামনে আসিবার কথা ছিল। সেনেটের বৈঠক নভেম্বর মাসে হইবার কথা ছিল। আমি ভাবিলাম যে, সেনেটে যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে পারি তাহা হইলে ইহাও জাতীয় শিক্ষারই কাজ হইবে। এইজন্য আমি মনে মনে স্থির করিলাম, যদিও আমি অসহযোগী হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি তথাপি সেনেটের বৈঠক পর্যন্ত সেনেট ও সিণ্ডিকেট হইতে সরিব না। আমি জানিতাম, দেশের বড় বড় লোক সেনেটে ইহার বিরোধী। এ পর্যন্ত লোকের মনে ইংরেজী ভাষার প্রতি এতই মোহ যে, ছেলেবেলা হইতে ইহা না পড়িলে বুঝি ইহার পুরা জ্ঞান হইতে পারে না, আমাদের যুবকেরাও সংসারের সংগ্রামে পিছনে পড়িয়া থাকিবে। যদিও স্যাডলার কমিশনও মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিয়াছিল, তথাপি আমাদের নিজের দেশের লোকেরা ছিল ইহার বিরুদ্ধে।

প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া সেনেটের সামনে আমি খুব জোর এক বক্তৃতা করিলাম, তাহাতে প্রমাণপত্র ছাড়া ভাবুকতার মাত্রাও যথেষ্ট ছিল। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, উহার প্রভাব লোকের উপর পড়িয়াছিল যথেষ্ট। আমাদের বিরুদ্ধ দলে ছিলেন মিঃ সুলতান আমেদ, মিঃ খাজা মহম্মদ নূর, জাস্টিস জ্বালাপ্রসাদ, প্রফেসর যদুনাথ সরকার প্রভৃতি। কেহ কেহ বক্তৃতা করিয়া প্রতিবাদ জানাইলেন, কেহ কেহ চুপ করিয়া থাকিলেন, কিন্তু প্রতিবাদের পক্ষে ভোট দিলেন। আমাদের সমর্থনকারী বাহির হইল দুইজন ইংরেজ। প্রফেসর হ্যামিলটন ও প্রফেসর ডিউক। ইঁহাদের আমি কিছু বলিও নাই, ইঁহাদের সঙ্গে ইহা লইয়া কখনও মতের বিনিময়ও হয়

নাই। কিন্তু দুইজনেই, শুধু শিক্ষার উপযোগিতার দিক হইতে, দৃঢ়ভাবে আমার প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। সেনেটের সুপারিশ হইল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এরূপ পরিবর্তন করা হউক, যাহাতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত যে শিক্ষা তাহা মাতৃভাষা দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইয়া আমার খুব আনন্দ হইল। কিন্তু সেনেটের বৈঠক শেষ হইতেই আমি সেনেট ও সিণ্ডিকেট হইতে ইস্তফা দিলাম।

তখনকার দিনে স্যর হ্যাভিল্যাণ্ড লিমেজারার গভর্নরের কাউন্সিলের জনৈক সদস্য ছিলেন। তিনি সেনেটেরও মেম্বার ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি আমার ইস্তফা দেওয়ায় রাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, আমি ইউনিভারসিটিতে ভাল কাজ করিতেছি। আমাকে কোনও মতে ইউনিভারসিটি হইতে অসহযোগ না করিতে দেওয়ার জন্যই, তাঁহারই অনুমতি অনুসারে অনেক সরকারি কর্মচারী আমার ঐ প্রস্তাবের পক্ষে সম্মতি দিয়া উহা পাস করাইয়া দিলেন। এ কথা আমার ইস্তফা পাঠাইবার পরে জানিলাম। আমি যাহাতে পদত্যাগপত্র ফিরাইয়া লই সেজন্য আমার উপর জোর করাও হইল, কিন্তু আমি তাহা করিলাম না। আমি ভাবিলাম, একদিকে জাতীয় শিক্ষা প্রচার করা—সরকারি শিক্ষার দোষ দেখানো এবং ছাত্রদের সরকারি বিদ্যালয় বর্জন করিতে উৎসাহ দেওয়া—অন্যদিকে সরকারি শিক্ষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) বসিয়া থাকা, পরস্পরবিরোধী কথা। ইহা একেবারে ভুল পথ হইবে। এইজন্য আমি ইস্তফাপত্র ফিরাইয়া লইতে রাজি হইলাম না।

যদি আমি ইউনিভারসিটিতে থাকিয়া যাইতাম তাহা হইলে যে প্রস্তাবকে এতটা পরিশ্রম করিয়া সেনেটে পাস করাইয়াছিলাম, তাহা কার্যে পরিণত করিতেও হয়তো কৃতকার্য হইতাম। আজ নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়; কিন্তু ইহা দুঃখের কথা যে, সেনেটের প্রস্তাব গ্রহণের পরও তদনুসারে কাজ করা হইল না। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকিল। সম্প্রতি ম্যাট্রিক পর্যন্ত ইংরেজী ও অঙ্ক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা হইয়াছে। এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে দেশের অবস্থা কতদূর ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা সে-ই জানে যে বিশ বৎসর পূর্বে সাধারণ হিতকর কর্ম করিয়াছে, ও আজও করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও শেষে এই প্রয়োজনীয় সংস্কার বেশি দিন বন্ধ রাখিতে পারিল না। কুড়ি বৎসর পরে সে-ও ইহা স্বীকার করিয়াই লইয়াছে।

কলিকাতায় অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরই আমি কাউন্সিলে আমার সদস্যপদের জন্য চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল নভেম্বর মাসে। এইজন্য সর্বপ্রথমে এই কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন মনে হইল। আমরা বিহারে অনেক কাগজ ছাপাইলাম। তাহাতে জনসাধারণের নিকট অনুরোধ করা হইল যে, যাঁহারা এই নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদিগকে যেন কেহই ভোট না দেয়। কেহ কেহ দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন। স্থানে স্থানে সভা করিয়া লোকদের এই কথাই বলা হইল। আমিও খানিকটা ঘুরিলাম। মনে আছে, কার্তিকী পূর্ণিমার মেলার সময়ে আমি সারণ জেলার দরৌলী গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল, কেহ যেন নির্বাচনের প্রার্থী না হয়; কিন্তু আমাদের চেষ্টা সফল হইল না, সকল স্থানেই প্রার্থী দাঁড়াইয়া গেল। কয়েকজন তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইল; কিন্তু যেখানে ভোট দেওয়ার সুযোগ হইল সেখানে জনসাধারণ অতি অল্প সংখ্যায় ভোট দিল। আমার ধারণা, বিহারে হয়তো শতকরা বিশ-পঁচিশ জনের বেশি ভোটার ভোট দেয় নাই।

মহাত্মাজী যখন ডিসেম্বরে বিহার ভ্রমণে আসিলেন, তখন তাহার প্রায় অল্প দিনের মধ্যেই বিহারে এক ঘটনা ঘটিল, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। উপরে বলিয়াছি, চম্পারনে নীলের তদন্ত শেষ হইয়া গেলে গান্ধীজী কয়েক জায়গায় পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ঐ জাগরণের ফল প্রদেশের কয়েক জায়গায় কোনও না কোনও রূপে দেখিতে পাওয়া গেল। এই জাগরণে হোমরুল আন্দোলনও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ইহার একটা রূপ হইল, সর্বত্র কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা; সভায় জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা অভিযোগ প্রকাশ করিতে লাগিল। চম্পারনেও এক কৃষকসভা হইল, কৃষককে সাহায্য করা সেখানে কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। ওদিকে নূতন আইনের জন্য ইহাও স্পষ্ট হইতে লাগিল যে, জনসাধারণের মত প্রকাশের অধিকার খানিকটা থাকিবে এবং কাউন্সিলের নির্বাচনে কৃষকদের ভাগ লইতে হইবে। ইহাতেও কৃষকসভা উৎসাহ পাইয়া গেল। জমিদারও খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, তাহারা এরূপ সংগঠন করিবে যাহাতে নূতন আইনের নির্বাচনে সফলতা লাভ করিতে পারে। তাহারা নীলকরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিল, নীলকর-জমিদারদের যুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিল। ইহাতে কৃষক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে

খানিকটা চঞ্চলতা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ের সংবাদপত্র দেখিলে বোঝা যাইবে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই সংগঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। বিহার প্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলনে খোলাখুলি বিরোধের কথাই বলা হইল। এই নীলকর-জমিদারদের প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইল মজঃফরপুরে, কিন্তু অন্যান্য স্থানেও ইহার শাখা-প্রশাখা হইতে থাকিল। দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ ছিলেন ইহার সভাপতি।

এই সময়ে রামরক্ষ ব্রহ্মচারী চম্পারন জেলার বেতিয়া মহকুমায় মাছর-গাঁওয়া গ্রামে গিয়া কাজ শুরু করেন। তিনি চাহিতেছিলেন, স্থায়ীরূপে গ্রাম-সংগঠনের কাজ করিবেন। সেখানকার লোকেও উৎসাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। বহু স্বেচ্ছাসেবক কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সেখানে তিনি যাহা কিছু করিতেছিলেন, তাহা আমার পরামর্শ লইয়াই করিতেছিলেন। আমি একবার সেখানে গিয়া সেখানকার সংগঠন দেখিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। লোকের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া মিটাইবার জন্য পঞ্চায়েত বসানো, ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠশালা খোলা, গ্রামের সাফাই, কৃষকদের অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা—ইহাই ছিল প্রধান কার্যক্রম। সেখানে এক আশ্রম খোলা হইল, যাহার খরচ জনসাধারণ মুষ্টিভিক্ষা দিয়া জুটাইত। সংগঠনের কাজ ভাল চলিতেছিল। লোকের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। পুলিশ ও নীলকর গোরা এরূপ সংগঠন ভাল চোখে দেখিত না—বিশেষত পুলিশের লোকে। কারণ তাহাদের ধোঁকা দেওয়ার মতলব সেখানে চলিতে পারিত না। সেই এলাকায় পুলিশ এক মহা কাণ্ড করিয়া ফেলিল।

একজন লোক কাহারও বিরুদ্ধে পুলিশ দারোগার নিকটে নালিশ করিয়া দিল। যেখানে এই ঘটনা হয় তাহার পাশের গ্রামেই দারোগা অন্য কোনও মকদ্দমার তদন্ত করিতেছিলেন। তিনি পুলিশের সিপাহী ও গাঁয়ের দফাদারকে পাঠাইলেন, যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হইয়াছিল তাহাকে ও অন্য কয়েকজনকেও ধরিয়া আনিতে। তাহারা এইভাবে যাইতে অস্বীকার করিল। জোর করিলেও গেল না। দারোগাজীর রাগ হইল। বিস্তৃত ঘটনার সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। দারোগা সদর হইতে মিলিটারি পুলিশ আনাইলেন। পুরানো রীতি অনুসারে কয়েকটা গ্রাম লুঠ করাইলেন। লোকদের উপর খুব উৎপীড়ন হইল। এমন কি স্ত্রীলোকেরাও রক্ষা পাইল না। ব্রহ্মচারী রামরক্ষের সঙ্গী সর্বশ্রী ধ্বজা-প্রসাদ, রামবিনোদ সিংহ ও মনোরঞ্জন প্রসাদ স্থানীয় গণ্ডগোলের সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দিলেন। রামরক্ষকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। অনুসন্ধানের জন্য বিহার প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি শ্রীমজহর্-উল্-হক্ সাহেবকে সভাপতি করিয়া এক কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি সাধারণের

অভিযোগকেই ঠিক বলিয়া মানিয়া লইল, গভর্নমেণ্টের সাফাই গাওয়া ভ্রান্ত বলিয়া বিচার করিল।

আন্দোলন জোরেই চলিতেছিল, এমন সময় গান্ধীজী বিহারে আসিয়া পৌঁছিলেন। চম্পারনে যাইবার পর তিনি ঘটনাস্থলেও গেলেন। ঐ গ্রামের লোকদের সঙ্গেও তাঁহার দেখা হইল। এ যাত্রায় তিনি অহিংসার এমন এক ব্যাখ্যা দিলেন যাহা এখন পর্যন্ত সর্বত্র লোকদের বুঝাইয়া দিতে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—পুরুষেরা মেয়েদের ছাড়িয়া, ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া যে পলাইয়াছে তাহাতে বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রাণ দিয়া তাহাদের রক্ষা করাই ছিল তাহাদের ধর্ম। কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে এইভাবে হাত না-তুলিয়া মরিবার শক্তি না-ই ছিল, তবে যে-ভাবেই হউক প্রতিরোধ তো করা উচিত ছিল। নিজের ধর্মে থাকিয়া হাত না-তুলিয়া মরিয়া যাওয়া সত্যসত্যই অহিংসা; কিন্তু ভয়ে পলাইয়া যাওয়া বড়ই হিংসার পরিচয়। যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই হাতে লইয়া বিরোধিতা করা পলানোর চেয়ে ভাল। আমি ইহা মহাত্মাজীর ভাষায় বলিলাম না। ইহা সারাংশ মাত্র। ব্রহ্মচারী রামরক্ষ ও অন্য সকলের বিরুদ্ধে যে-মকদ্দমা রুজু হইয়াছিল অনেক মাস ধরিয়া তাহার শুনানি চলিতে লাগিল। শেষকালে সব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। সকলে মুক্তি পাইল।

আসাতে আন্দোলন আরও প্রবল হইল। কাউন্সিলের নির্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন স্কুল কলেজ খুলিয়া দেওয়ার উপর বেশি জোর দেওয়া হইল। আমরাও স্থির করিলাম যে, এক রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় (কলেজ) খুলিতে হইবে। পাটনা-গয়া রোডের উপর একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া কলেজ খোলা গেল। আমি যে-বাড়িতে থাকিতাম এই বাড়িও তাহার নিকটেই ছিল। তখন আমি স্থির করিলাম যে, যখন ওকালতি ছাড়িয়াই দিলাম তখন ভাড়া বাড়ি নিজের জন্য রাখা অনাবশ্যক, প্রতি মাসের এই দেড় শ টাকা ব্যয় বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইজন্য আমি নিজের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। মহাবিদ্যালয়েই গিয়া থাকিতে লাগিলাম। আইনের বইগুলি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শম্ভুশরণ বর্মার নিকট রাখিয়া দিলাম। সে-বইগুলি যাবজ্জীবন তাহার সঙ্গেই ছিল। তাহার অকাল-মৃত্যুর পর অন্য এক বন্ধুর নিকট চলিয়া গিয়াছিল। আজ পর্যন্ত সেখানে তাহারই কাজে লাগিতেছে।

পাটনার ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে সেখানকার প্রিন্সিপালের কোনও বিষয়ে মতভেদ হইয়াছিল; ছাত্রেরা হরতাল করিল। একসঙ্গে মিছিল করিয়া গেল মজহর-উল্-হক্ সাহেবের কাছে, তিনি তখন ফ্রেজার রোডের উপর সিকন্দরমঞ্জিলে থাকিতেন। তাঁহাকে বলিল : আমরা স্কুল

ছাড়িয়া দিয়াছি, আমাদের জায়গা দিন। মজহর্-উল্-হক্ সাহেব বড় ভাবুক ও নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ত্যাগের শক্তিও ছিল অপূর্ব। ঐ সময়ে তিনি খুবই আরামে ঐ বড় বাড়িতে থাকিতেন। নিজের জন্য আরও একটা বড় বাড়ি তৈয়ার করিতেছিলেন। সব কিছু ছাড়িয়া, ঐ ছেলেদের সঙ্গে লইয়া, পাটনা-দানাপুর রাস্তার উপর এক বাগানে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার পরিচিত এক ভদ্রলোকের ছোট-খাট এক বাড়ি ছিল। সেখানেই থাকিতে লাগিলেন। তখন শীতকাল। খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। ঐ জায়গাটি গঙ্গার ধারে বলিয়া একটু বেশি ঠাণ্ডা ছিল। ঘন গাছপালায় ঘেরা ছিল বলিয়া সেখানকার মাটিতে কিছু শেওলাও ছিল। তাহা হইলেও মজহর্-উল্-হক্ সাহেব কিছু দিনের জন্য ঐ ছোট বাংলোতেই থাকিতেন। আস্তে আস্তে সেখানে তালের চাটাইয়ের কয়েকটি ঝুপড়িও হইয়া গেল। ছেলেরাও ছিল খুব উৎসাহী, কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করিল না, তাঁহার সঙ্গে আনন্দে থাকিতে লাগিল। ঐ জায়গাটির নাম তিনি 'সদাকত আশ্রম' রাখিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে ঐ দুর্গম স্থান, যেখান দিয়া রাত নয়টার পর পথ চলিলে পথিকের কেমন যেন ভয় ভয় করিত, তাহা মুখর হইয়া উঠিল। সেখানে চরখার এক কারখানা খোলা হইল। সমস্ত ছেলেরা চরখা তৈয়ারি করিতে লাগিয়া গেল। আস্তে আস্তে হক্ সাহেব নিজের পয়সা খরচ করিয়াই বাড়ি তৈয়ার করিতে শুরু করিয়া দিলেন। অন্য কয়েকটি ছেলেও গিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিতে লাগিল। তিনি নিজে সেখানেই থাকিতেন, ছেলেদের পড়াইতেন, আর ছেলেরা যাহা খাইত তিনিও তাহাই খাইতেন। ছেলেরা অধিকাংশই হিন্দু। হক্ সাহেবের দৃষ্টি ছিল যাহাতে কোনও ছেলে যেন না বুঝিতে পারে যে, তিনি মনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ কোনও প্রকারেই রাখিয়াছেন। এজন্য তিনি সকলকে একদৃষ্টিতে দেখিতেন। ছেলেরাও তাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিত। তাঁহার প্রতি সেইরূপ বিশ্বাসও রাখিত।

এ-বিষয়ে এখানে একটা কথার উল্লেখ করিয়া দিলে ভাল হয়। এই কথা হইতে ঐ মহান ব্যক্তির প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। হক্ সাহেবের সঙ্গে এক খুব গরিব ঘরের মুসলমান ছেলে বাস করিত। তিনি দেখিলেন যে, ছেলে পড়াশোনায় বুদ্ধিমান। তাঁহার মনে ইহাও কাজ করিয়াছিল যে, মুসলমান হইয়াও সে হিন্দী ও সংস্কৃত পড়িয়াছিল। সে পড়িত কলেজের ফার্স্ট কি সেকেণ্ড ইয়ারে। নাম ছিল মহম্মদ খলীল। হক্ সাহেব তাহাকে খুব আদর করিতেন। অসহযোগ আরম্ভ হইলে সে কলেজ ছাড়িয়া দিল। হক্ সাহেবের সঙ্গেই তাঁহার কুঠি ছাড়িয়া সদাকত আশ্রমে গিয়া থাকিতে লাগিল। দুই-এক বৎসর পরে

শুনিলাম যে, হক্ সাহেব তাহাকে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। মহম্মদ খলীলও আসিয়া আমাকে বলিল : উনি রাগ করেছেন, আপনি বলে-কয়ে ওঁকে শান্ত করে দিন। আমার প্রতি হক্ সাহেবের বরাবর অনুগ্রহ ছিল। তিনি অন্তর হইতে আমাকে ভালবাসিতেন। এইজন্য আমি মহম্মদ খলীলের বিষয়ে তাঁহাকে বলিলাম। সেই সময়ে মহম্মদ খলীল সমস্ত বিহারে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিল। অসহযোগ আরম্ভ হইতেই সে এক রাষ্ট্রীয় গান তৈরি করিয়াছিল, তাহা তখনকার দিনে খুব প্রচলিত ছিল। উহা বাস্তবিকই খুব সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী গান। তাহার গোড়ায় ছিল—"ভারতজননি, তেরি জয় তেরি জয় হো।" সে-সময় এরূপ সভা খুব কমই হইত, যেখানে এই গান খুব উৎসাহের সহিত গাওয়া হইত না।

আমি যখন হক্ সাহেবকে বলিলাম যে, মহম্মদ খলীলের কোন দোষ হইয়া থাকিলে মাপ করুন, তখন তিনি খুবই দুঃখ করিয়া আমাকে বলিলেন : আমি তোমার কথা কখনও ঠেলতাম না, কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে ঠেলছি। তুমি জান না, খলীল কতখানি খারাপ কাজ করেছে। এইজন্য তুমি তার হয়ে কথা বলছ। আমি যা সমস্ত জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করে নিয়েছি, যার জন্য আজ পর্যন্ত সব কিছু করে আসছি আর আজ ফকির হয়ে গেছি, তার ওপর ও আঘাত করেছে। আমি আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবন ধরে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনের জন্য কাজ করেছি। আজও সেই কাজে লেগে আছি। আশ্রমে থেকে হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে ও এমন ব্যবহার করেছে যে, ঐসব ছেলে, যারা আমাকে বিশ্বাস করে ও আমাকে ভালবেসে আমার কাছে এসেছে, তারা হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ভাব বুঝতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত জীবন ধরে যে-সব কাজ করেছি ও করছি, ও চেষ্টা করেছে তা নষ্ট করে দিতে। ও চেষ্টা করেছে যাতে ছেলেদের মুসলমান করে নিতে পারে। আমি সব কিছু মাপ করতে পারি; কিন্তু এইভাবে ইসলামের নামে বিশ্বস্ত ছেলেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা বরদাস্ত করতে পারি না। এখন আমি জেনে গেছি যে, ও উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দী ও সংস্কৃত পড়েছে। একদিন হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামাও ও করিয়ে দেবে। আমি ওকে আশ্রমে কখনও থাকতে দেব না।

এই সেই মহম্মদ খলীল, যে কিছুদিন পরে 'খলীল দাস' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহার বিষয়ে লোকে বুঝিয়াছে যে, বহু জায়গায় এ হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য সংঘটন করিয়াছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামারূপে ইহার অত্যন্ত কুফল দেখা গিয়াছে। এইসব দাঙ্গায় অনেক হিন্দু ও মুসলমান নিজের নিজের প্রাণ দিয়াছে। আমি যখন কয়েক বৎসর পরে ইহার বিষয়ে এই ধরনের অভিযোগ শুনিলাম তখন হক্ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী আমার মনে

পড়িল। তাঁহার সেই উক্তি—সেই মর্মস্পর্শী শব্দ—কানে আবার যেন শুনিতে পাই।

রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় খোলা হইল। আমাকে করা হইল তাহার প্রিন্সিপাল। তাহার অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বদরীনাথ বর্মা—যিনি সে সময় বিহার ন্যাশনাল (বি. এন.) কলেজে (পাটনা) ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন—শ্রীযুক্ত জগন্নাথপ্রসাদ, এম্. এ., কাব্যতীর্থ—যিনি পাটনা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন—শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু—যিনি ভাগলপুরের টি. এন্. জুবিলী কলেজে ফিলসফির অধ্যাপক ছিলেন—নিজ-নিজ কর্মে ইস্তফা দিয়া আসিয়া জুটিলেন। ইঁহারা ছাড়া শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লাল, শ্রীযুক্ত রামচরিত্র সিংহ, আবদুল বারি প্রভৃতিও আসিলেন। কলেজের যে-সব ছেলে পড়িতে চাহিত আমরা তাহাদিগকে পড়াইতে শুরু করিলাম। সরকারি কলেজে যে-সমস্ত বিষয় পড়ানো হইত এখানেও প্রায় সেইসব বিষয় পড়ানো হইত। যে-টাকা চম্পারন যাত্রার সময় মহাবিদ্যালয়ের জন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা এজন্য খরচ করা হইতে লাগিল।

ওদিকে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলির সময় নিকটে আসিল। কয়েকজন ভাইয়ের, বিশেষত মৌলবী শফী দাউদীর, মত ছিল যে, যাহারা সরকারি পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে চায় না সেইসব ছেলেদের পরীক্ষাও আমাদের লইতে হইবে। এইজন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন হইয়া পড়িল। মহাত্মা গান্ধীও বিহার হইতে যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে বিহারেও বিদ্যাপীঠ হওয়া চাই। আমাদের কাছে টাকা নাই একথা বলায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, ভাবিও না, যদি কাজকর্ম ঠিক ঠিক চলিয়া যায় তাহা হইলে টাকার অভাব হইবে না। নাগপুর কংগ্রেসের পর যখন তিনি আবার বিহারে পরিভ্রমণ করিতে আসেন তখন ঝরিয়ায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা একত্র করিয়া আমাকে তার করিলেন : পাটনায় আসছি, বিদ্যাপীঠ খোলার ব্যবস্থা করো। আমরা যেখানে মহাবিদ্যালয় খুলিয়া রাখিয়াছিলাম সেই বাড়িতেই তিনি আসিয়া বিদ্যাপীঠ উদ্ঘাটন করিলেন। মজহর-উল্-হক্ সাহেব তাহার চ্যানসেলর নিযুক্ত হইলেন। আমরা রীতিমত সেনেট প্রভৃতিও গঠন করিলাম। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার কাজে লাগিয়া গেলাম।

এ-সব দেখিয়া সরকারি কলেজের ছাত্ররাও খুব উৎসাহিত হইল। একদিন পঞ্চাশ-ষাট জন ছেলে মিছিল করিয়া, পাটনা কলেজ ও সায়েন্স কলেজ ছাড়িয়া, সোজাসুজি পাটনা-গয়া রোডে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত। ইঁহাদের মধ্যে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছাত্রেরাও আসিয়াছিল। কেহ কেহ থাকিয়া গেল, তাহারা আজ সমস্ত

প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আজও প্রদেশের প্রধান কর্মীদের মধ্যে আছে। কেহ কেহ অবশ্য কিছুদিন কাজ করিল; কিন্তু আন্দোলন একটু ঢিলা হইলে আবার সরকারি কলেজে ফিরিয়া গেল। সেখান হইতে তাহারা ভাল করিয়া পাশ করিয়া সরকারি চাকরি লইয়া চলিয়া যায়। আজ তাহারা উচ্চ পদে পৌঁছিয়া সরকারি কাজ করিতেছে। কেহ কেহ শীঘ্রই ফিরিয়া গেল, এবং পুনরায় নিজেদের পুরানো ধরনের কাজ করিতে লাগিল।

পূর্ণ অসহযোগ

অসহযোগের প্রধান অঙ্গ হইল চারটি বর্জন : (১) সরকারি উপাধি ও খেতাব বর্জন; (২) সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ত্যাগ অর্থাৎ নিজেও সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করিব না, ছেলেপিলেদেরও সেখানে শিক্ষা পাইতে দিব না; (৩) কাউন্সিল বর্জন এবং তাহা হইতে কোন প্রকারের লাভ গ্রহণ না-করা; (৪) সরকারি আদালত বর্জন অর্থাৎ তাহাতে মকদ্দমা দায়ের না-করা, ওকালতি, মোক্তারি বা সরকারি আদালতের কোন চাকরি না-করা। আশা করা যাইতেছিল যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে যতদূর যাহার সম্পর্ক আছে এই চারিটি বর্জনের ব্রত পালন করিবে। আমি তো কোন খেতাব বা উপাধি পাই নাই, কিন্তু আমার দাদা কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করিবার জন্য ও তাহার বিষয়ে যত্ন লইতেন বলিয়া, রায় সাহেব খেতাব পাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কখনও খেতাব ছাড়িতে বলি নাই, কিন্তু তিনি নিজেই নাগপুর কংগ্রেসের কিছু পরে উহা ফেরত দিয়াছিলেন। ব্যাপারটি এইরূপে ঘটিয়াছিল : যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল হইতে লাগিল, তখন বিহার-উড়িষ্যা সরকারের মন্ত্রী মিষ্টার হ্যালেট (যিনি পরে যুক্ত প্রদেশের গভর্নরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন) এক গোপন পত্রে প্রচার করিয়াছিলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডও একপ্রকার সরকারের অঙ্গবিশেষ। এইজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির সদস্য ও কর্মচারী কোনরূপ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে না। এজন্য লোকের মনে আরও রাগ হইল। দাদা সেই সময়ে ছিলেন ছাপরা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্। তিনি খেতাব ফেরত দিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের কাজেও ইস্তাফা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে, তিনি জনমতের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছেন, সেজন্য ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ ছাড়িবেন না; সে-কাজ করিতেই থাকিবেন।

দাদার ছেলে জনার্দন অল্পদিন পূর্বে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া হিন্দু ইউ-নিভারসিটির ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে নাম লেখাইয়াছিল। আমার দুই ছেলের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় অল্পদিন পূর্বে কালাজ্বর হইতে বাঁচিয়া এখন সারিয়া উঠিয়া ম্যাট্রিক পড়িতেছিল। কিন্তু বয়স কম বলিয়া তাহাকে ইউনিভারসিটির নিয়মমত পরীক্ষায় বসিতে দেওয়া হয় নাই। কনিষ্ঠ ধনঞ্জয় স্কুলে কোন নিম্নশ্রেণীতে পড়িত। তিন ছেলেকে কলেজ ও স্কুল হইতে সরাইয়া লওয়া হইল। তিনজনের মধ্যে কেহই আর সরকারি স্কুল কলেজে গেল না। জনার্দন কীর্ত্যানন্দ আয়রন স্টীল ওয়্যার্কসের লোহার কারখানায় কয়েকদিন পরে কাজ শিখিতে লাগিল। সেখানে প্রায় এক বৎসরের কিছু বেশি কাজ শিখিয়া বিলাত চলিয়া গেল। বিদেশে লোহার কাজ শিখিবার জন্য তাহার এক বৃত্তি জুটিল। ঐ বৃত্তির টাকাতেই সে নিজের সব কাজ চালাইয়া লইত। বাড়ি হইতে দাদাকে অল্পই খরচ করিতে হইত। মৃত্যুঞ্জয় বিহার বিদ্যাপীঠে পড়িতে লাগিল, আর সেখান-কার স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট হইল। ছাপরায় যতদিন রাষ্ট্রীয় স্কুল চালু ছিল, ধন্নুও ততদিন সেখানে পড়িত। তাহার পর সে বাড়িতেই যাহা কিছু শেখার সম্ভাবনা ছিল তাহাই শিখিল। উপরে বলিয়াছি, নিজেও কিভাবে ইউনিভারসিটির সহিত যোগ ত্যাগ করিয়াছিলাম। ওকালতি তো আমি ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম। এইরূপে ঈশ্বরের দয়ায় আমরা নিজের মেহনত দিয়া ও ব্যক্তিগতভাবে অসহযোগের কার্যক্রম যথাসম্ভব পালন করিলাম।

তখন পর্যন্ত বিহারে কংগ্রেসের সংগঠন ছিল না বলিলেও চলে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ছিল। তাহার মন্ত্রী ছিলেন নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ। আমিও তাঁহার সাহায্যকারী ছিলাম। এইভাবে সমস্ত জেলাতেও কোথাও কোথাও জেলা কমিটির বহু মন্ত্রী বা সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু সেকালে রীতিমত সভ্য করিয়া লইবার প্রথা ছিল না। যে চাহিত, সেই নিজেকে মেম্বার বলিয়া মনে করিত। প্রতিনিধিদের নির্বাচনও নিয়ম-মত হইত না। কংগ্রেসের বৈঠকের সময় যাহারা গিয়া পেঁাছিতে পারিত তাহারাই নির্বাচিত হইয়া যাইত। জেলা বা প্রদেশের স্বনামখ্যাত মন্ত্রী বা সম্পাদক তাহাদের প্রমাণপত্র দিয়া দিতেন। তাহারা দশটাকা ফি দাখিল করিয়া প্রতিনিধি হইয়া যাইত। এমনধারা প্রতিনিধি কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচন করিত। এই নির্বাচনে বেশি ভিড় হইত না। সর্বদাই প্রদেশে কংগ্রেসের অনুরক্ত এমন কিছু কিছু প্রধান লোকদের বাছিয়া লওয়া হইত। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিয়মে বিহার প্রদেশকে বার্ষিক চাঁদা দিতে হইত পনেরো শ টাকা। একথা একরকম স্বীকার করা হইয়াছিল যে, যাহারা একশত

টাকা চাঁদা দিবে তাহারাই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হইবে। এইজন্য যাহারা এই শর্ত পালন করিতে পারিত না, তাহারা কখনও নিজেরা প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার সাহস করিত না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না যে, নির্বাচিত সব সদস্যরাই একশত টাকা জমা দিয়া দিত। তখনকার দিনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন রাজমহেন্দ্রীর বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী সুব্বারাও পান্তলু। আমার মনে আছে, ইনি সর্বদা পাটনায় এই চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। তাহা হইলেও প্রত্যেক বছর ইহা আদায় হইত না। ১৯২০ সালে বিহারের হিসাবে অনেক হাজার টাকা বাকি পড়িয়াছিল।

নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের নিয়মাবলী বদলাইয়া দেওয়া হয়। সর্বত্র কংগ্রেসের সভ্য করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি লক্ষ অধিবাসী হইতে এক একজন করিয়া প্রতিনিধি বাছিবারই অধিকার দেওয়া হইল। এইভাবে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়া গেল। নাগপুরে ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, প্রতিনিধি নির্বাচন কেবল কংগ্রেসের সভ্যরাই করিতে পারেন, তাহাও কংগ্রেস কমিটির আইনসঙ্গত অধিবেশনে।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তালিকা অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বেই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির দপ্তরে পৌঁছাইবার কথা। ঐ তালিকায় যাহাদের নাম দেওয়া হইত, তাহারা ছাড়া, বিশেষ কারণ বিনা, অন্য কেহ প্রতিনিধি হইতে পারিত না। তালিকার নামের মধ্যে উলটপালট তখনও হইতে পারিত; যখন কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি ইস্তফা দিয়া দিত ও তাহার শূন্য স্থানে নির্বাচন হইত। প্রাদেশিক মন্ত্রী বা সম্পাদককে ইহার প্রমাণ দিতে হইত।

এ-সব নিয়মের জন্য এখন কংগ্রেসের নির্বাচনে বড় কড়াকড়ি হইবার কথা—প্রাচীন রীতি আর চলিবার নয়। তাই নূতন ভাবে সংগঠন করিয়া যথারীতি নির্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া গেল। কংগ্রেস তাহার জন্য সময়ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। প্রাদেশিক কমিটিকে নূতন নিয়ম অনুসারে নিজের নিজের নিয়মও তৈরি করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এইজন্য ঠিক হইল যে যতক্ষণ নূতন সংগঠন না হয়, ততক্ষণ একটা ছোট কমিটি তৈরি করিয়া দেওয়া হউক, তাহাই সব কাজ করিবে। পুরানো অনেক কংগ্রেসী নেতা এখন কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেহ কেহ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত (creed) বদলাইবার জন্য, আর কেহ কেহ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেও অসহযোগের কার্যক্রমের বিরোধী। এই কারণেও পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল। আমাকে এই কমিটির সম্পাদক করা হইল। সভাপতি হইলেন মৌলানা মজহর্-উল্-হক্ সাহেব। ইহার নাম দেওয়া হইল পুনঃসংগঠন সমিতি। কমিটি খুব উৎসাহ করিয়া কাজ

আরম্ভ করিল। যেখানে যাই, কংগ্রেসের সভা করিবার কথা বলি, অসহযোগ প্রচার তো করিয়াই থাকি।

অনেক উকিল, মোক্তার ও ছাত্র—যাহারা নিজের নিজের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল—সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে-সব স্থানে কংগ্রেসের বার্তা পেঁছাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় সকল জেলায় রাষ্ট্রীয় পাঠশালা খোলা হইল; কিছু কিছু ম্যাট্রিক পর্যন্ত, কিছু নীচের শ্রেণীর জন্য। সবগুলির সম্বন্ধ হইল বিহার বিদ্যাপীঠের সঙ্গে। আমি মনে করি ম্যাট্রিক পাঠশালার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হইবে, আর প্রাইমারি পাঠশালার সংখ্যা দুই শ আড়াই শ। বিহার বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পাঠশালায় যে-সব ছাত্র শিক্ষা পাইতে লাগিল তাহাদের সংখ্যা হইবে বিশ পঁচিশ হাজার। অন্য কাজ যাহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহাদের অনেকে এই সকল পাঠশালায় শিক্ষক হইয়া গেল।

তখন সমস্ত প্রদেশ জুড়িয়া যে-সব সভা হইত, তাহাদের সংখ্যা নিশ্চয় অগণ্য ছিল। কর্মকর্তারা যানই নাই, বা সভা করিয়া কংগ্রেসের কার্যক্রম ও বাণী লোকের কাছে বোঝানো হয় নাই, কোনও জেলার এমন অংশ কমই ছিল। আমি সমস্ত প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ১৯২১ সালেই সর্বপ্রথম সমস্ত প্রদেশের সঙ্গে পরিচয় হইল। অসংখ্য কর্মীর সঙ্গে চেনা-পরিচয়ও হইয়া গেল।

আমি ওকালতি তো করিতাম, কিন্তু বড় বড় সভায় বলিবার বেশি অভ্যাস ছিল না, যদিও ছেলেবেলা হইতেই সভাসমিতিতে যোগ দিতাম। অসহযোগ প্রচার করিতে গিয়া অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করিতে হইল। ফলে, সভায় বলিতে সামান্য যেটুকু সঙ্কোচ হইত, তাহা দূর হইয়া গেল। আমি এখন প্রস্তুত না-হইয়াও বক্তৃতা করিতে পারিতাম। যে-সব জেলায় ভোজপুরি বলা হইত, সে-সব জায়গায় গেলে ভোজপুরিতেই বক্তৃতা করিতাম। অন্যত্র শুদ্ধ হিন্দীতে। ঐ বৎসর পুরুলিয়াতে আমি বাংলাতে বক্তৃতা দিয়াছিলাম কি না তাহা মনে নাই, যদিও এ-ধারণা আছে যে আমি পুরুলিয়াতে কোন-না-কোন বার বাংলাতে বক্তৃতা দিয়াছি। সভাও কিছু ছোটখাটো হইত না। পাঁচ-দশ হাজার লোক জমা হওয়া একটা বড় কিছু ব্যাপার ছিল না। দশ হাজার লোকের সভার মধ্যে আমি সহজে সব লোকের কাছে নিজের কণ্ঠস্বর পেঁছাইতে পারিতাম। তাহার বেশি সংখ্যা হইলে পরিশ্রম হইত। আমার অনুমান, পনের হাজার পর্যন্ত লোকের সভায় লোকেরা শান্ত ভাবে থাকিলে আমার কণ্ঠস্বর সকলে শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহার জন্য বেশ পরিশ্রম করিতে হইত, আর পেটে ব্যথা ধরিত। আমার ইহাও মনে আছে যে বিশ-পঁচিশ হাজার লোকের সভাতেও আমি ঐ বৎসর বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ছাপরা জেলায় হাতোয়ায় একটা সভা হয়, সেখানে

জানি না কিভাবে একটা খবর রটিয়া গিয়াছিল যে, সভায় মহাত্মা গান্ধী আসিবেন। এইজন্য সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র হইয়াছিল। হাজার চেষ্টাতেও সভা ঠিক জমিতে পারিল না। আমি নিজের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া উচ্চ স্বরে ছোট খাটো একটা বক্তৃতা দিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে খুব অল্প লোকই তাহা শুনিয়াছিল বা বুঝিয়াছিল।

বক্তৃতা করিবার সময় দেখিতাম যে সভায় উপস্থিত জনগণের উপর তাহার কেমন প্রভাব পড়িতেছে। প্রভাব ভাল হইতেছে দেখিলে এবং জনতা শোনার জন্য আগ্রহান্বিত ও বুঝিতে পারিতেছে মনে করিলে সেখানকার বক্তৃতাও আমি নিজে বুঝিতে পারিতাম যে ভালই হইতেছে। যেখানে তাহা না হইত সেখানকার বক্তৃতা যেমন-তেমন হইত। বক্তৃতাও এমন কিছু ছোট-খাটো হইত না। কংগ্রেসের ইতিহাস, খিলাফত আন্দোলন, পাঞ্জাবের অত্যাচার ও স্বরাজের প্রয়োজন ব্যতীত অসহযোগের কার্যক্রম আমি সমস্ত সভায় বেশ বিস্তার করিয়া ব্যাখ্যা করিতাম। ইহাতে প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা লাগিয়া যাইত। যেখানে দশ হাজার পর্যন্ত লোক একত্র জমা হইত সেখানে তো পুরাপুরি বিস্তার করিয়া দেড় ঘণ্টা কি তাহারও বেশি সময় বলিয়া লইতাম। যেখানে ইহার চেয়েও বেশি লোক একত্র হইত সেখানে খানিকটা সংক্ষেপ করিতে হইত। বিশ হাজারের বেশি লোকের সভায় আধ ঘণ্টার চেয়ে বেশি বলিতে পারিতাম না। এইভাবে সমস্ত প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতাম। অন্যান্য সঙ্গীরাও ইহাই করিতেছিলেন।

'দেশ' ও 'সার্চলাইট'

অসহযোগ আন্দোলনে সব নেতা যোগ দেন নাই। কংগ্রেসের পুরাতন ও বয়োবৃদ্ধ নেতারা, যাঁহারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নাই, তাঁহারা বিহার প্রাদেশিক লীগ নামে অন্য এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। দেশের নরম দলের সংবাদপত্রে ইহার খুব আলোচনা হইল, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান কিছু করিতে পারিল না। ইহার বিষয়ে পরে আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই। আমাদের প্রদেশ এক বিষয়ে ঠিক ছিল—মতভেদ থাকিলেও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয় নাই। আমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারও আগের মতই থাকিল। কিন্তু এতগুলি লোক আলাদা হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া নাগপুরে কংগ্রেসের নিয়মাবলী ও তাহার গঠন বিষয়ে অনেক অদল-বদল হইল বলিয়া, কংগ্রেস কমিটি আবার গঠন করা আবশ্যক হইয়া

পড়িল। কয়েকমাস কাজ করার ফলে এই সংগঠন সম্পূর্ণ হইল। জুনের শেষ পর্যন্ত জেলা কমিটিগুলি রীতিমত গঠিত হইয়া প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচন করিতে পারিল। তখন আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নূতন সদস্যেরা নির্বাচিত হইলেন।

কংগ্রেস পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্ন উপস্থিত হইল। সংবাদপত্রের পক্ষে বিহার উপযুক্ত প্রদেশ নয়। প্রথমে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া 'বিহার টাইমস্' ও 'বিহারী' বাহির করা হয়। কিন্তু আর্থিক অনটন বশত দুইটি পত্রিকাই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 'বিহার টাইমস্'-এর প্রবর্তক ও প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন বাবু মহেশনারায়ণ। ইনি এখন পরলোকগত। তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন পত্রিকাখানি চালাইয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ সিংহ ও সংবাদপত্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে খুব ঘাওয়া-আসা ও আদান-প্রদান ছিল। তাঁহার নিজের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' ছাড়া তিনি এই সমস্ত সংবাদপত্রকে অর্থ ও লেখনী দিয়া সাহায্য করিতেন। 'বিহারী' বনেলীর রাজসরকার হইতে অনেক সাহায্য পাইত। উহা বন্ধ হইয়া যাওয়ার কারণও একপ্রকার তাহাই। আর একটি সংবাদপত্র বাহির হইত, নাম 'একস্‌প্রেস্'—বাহির হইত হাতোয়ার মহারাজের পক্ষ হইতে। অনেকদিন ঘাট্‌তির উপর চলিয়া তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। ১৯১৮ সালে পাটনার সকল নেতা মিলিয়া, বিশেষ করিয়া সচ্চিদানন্দ সিংহ ও হাসান্ ইমাম, সংবাদপত্রের অভাব বিশেষ অনুভব করিয়া স্থির করিলেন যে, একখানি সংবাদপত্র বাহির করা হউক। শ্রীযুক্ত সিংহের মতানুসারে তাহার নাম হইল 'সার্চলাইট'। উহা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইত। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত সিংহ, হাসান ইমাম প্রভৃতি। নূতনদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ—আমিও ছিলাম। আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর 'সার্চলাইট'-এর সম্মুখে এই প্রশ্ন আসিল, উহা অসহযোগ সমর্থন করিবে কিনা। যাহারা পয়সা খরচ করিবে তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীযুক্ত সিংহ ও হাসান ইমাম। তাঁহারা অসহযোগের পক্ষপাতী ছিলেন না। এদিকে সমস্ত প্রদেশে অসহযোগের ঢেউ এমন-ভাবে উঠিতেছিল যে, তাহার বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ হইত 'সার্চলাইট'-এর পক্ষে চিরকালের জন্য সাধারণের সমর্থন হারানো। তাছাড়া, পরিচালকদের মধ্যেও আমরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম। উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুরলীমনোহর প্রসাদও সম্পূর্ণভাবে অসহযোগের পক্ষপাতী ছিলেন। এই অবস্থায় নিজেদের মধ্যে মতভেদের নীতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িল।

১৯২০ হইতে, 'সার্চলাইট' প্রেস হইতেই, হিন্দী সাপ্তাহিক 'দেশ'ও বাহির হইত, তাহার প্রকৃত সম্পাদক আমি বলিয়াই লোকে জানিত।

ইংরেজী পড়া কয়েকজন উকিল-ব্যারিস্টার ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের, ইংরেজী কায়দায় সাজানো ঘর হইতে বাহির করিয়া অসহযোগ, গাঁয়ের বটগাছের ছায়ার নীচে আর গাঁয়ের খেত-খামার পর্যন্ত রাজনীতিকে লইয়া আসিয়াছিল। সেখানে ইংরেজীর প্রবেশ ছিল না। জনসমাজের মধ্যে যে প্রবেশ করিতে চাহিত, তাহাকে দেশী ভাষায় আশ্রয় লইতে হইত। এইজন্য আমরা ভাবিলাম, 'সার্চলাইট' হইতে 'দেশ' বেশি কাজে লাগিবে। আমরা হাসান ইমাম ও শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে 'সার্চলাইট' ও 'দেশ'-এর বিষয়ে এই মীমাংসা করিয়া লইয়াছিলাম যে 'সার্চলাইট' তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্যে না করিবে অসহযোগের বিরোধ, না করিবে সমর্থন। কিন্তু অন্য লোকের লেখা যে পক্ষেই হউক অন্যলোকের নামের সঙ্গে থাকিতে পারিবে। 'দেশ' হইয়া যাইবে আমাদের পত্র। এখন হইতে তাহার লাভ-লোকসান আমাদের হইবে। উহার নীতি আমরা যেমন চাহিব তেমনি হইবে, কিন্তু উহা সার্চলাইট প্রেসে পয়সা দিয়া ছাপাইতে হইবে।

এইভাবে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক আমাদের হাতে আসিয়া গেল। ইংরেজী 'সার্চলাইট'ও অনুকূল না হইলেও বিরোধী তো হইল না। আমরা ইহাও মনে করিয়াছিলাম যে উহাতে লেখা দিব, কিন্তু এ আশা পূর্ণ হইল না। কারণ আন্দোলনে এতটা কাজ বাড়িয়া গেল যে লিখিবার সময়ই পাইলাম না। এ প্রচারকার্যে 'দেশ' অনেক সহায়তা করিল। গ্রাহকদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। বিজ্ঞাপনও অনেক পাইতে লাগিলাম। আমরা তো আন্দোলনে লাগিয়াছিলাম, পরিচালনা বিষয়ে মন দিতে পারি নাই। গ্রাহকদের সংখ্যা যেমন যেমন বাড়িতে লাগিল, পরিচালকের ভুলে অর্থাভাবের মাত্রা তেমনি বাড়িতে থাকিল। কিছুদিন পরে আমরা যখন হিসাব দেখিলাম তখন বুঝিতে পারিলাম যে বিজ্ঞাপনের হার এতটা কম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে যতটা খরচ পড়িত তাহাও বিজ্ঞাপন হইতে পাওয়া যাইত না। এইজন্য বিক্রেয় কপির সংখ্যা যেমন বাড়িল ঘাট্‌তিও তেমন বাড়িতে থাকিল। আমরা দেখিলাম যে অনেকের জিনিস-পত্রের প্রচার আমাদের নিজেদের খরচায় সারা প্রদেশে সবেগে করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু এই জ্ঞান অনেক ক্ষতি স্বীকার করার পর আসিল। এইভাবে তখন 'দেশ'-এর উপর যে বোঝা চাপানো হইল, তাহা যেন চিরকাল এক ভারি পাথরের মতো তাহার গলায় বাঁধা রহিল।

জন-আন্দোলনে কিছুদিন পর ঢিলা পড়িল। 'দেশ'-এর বিক্রয়ও কিছু কম হইতে থাকিল। পরে আর্থিক অসুবিধার জন্য উহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইল। যতদিন ধরিয়া আন্দোলনের জোর ছিল, ততদিন কাজ খুব হইত, লোকসমাজে আদরও খুব ছিল।

'সার্চলাইট' নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। কিছুদিন

পরে হাসান ইমাম ও শ্রীযুক্ত সিংহ উহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। উহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের অধিকারে আসিয়া গেল। এখানে না বলিয়া পারি না যে, উঁহারা দুই জন যদিও অর্থ ও পরিশ্রম দিয়া গোড়া হইতে ইহাতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন তথাপি অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে আমাদের হাতে পত্রিকাখানি আসিতে দিলেন। এখন হইতে অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, 'সার্চলাইট' একেবারে কংগ্রেসী পত্র হইয়া গেল। ইহাই ছিল উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুরলীমনোহর প্রসাদের প্রকৃতির অনুকূল। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত যখন সত্যাগ্রহ চলিতে লাগিল ও কংগ্রেসের নির্দেশ বাহির হইল যে, সংবাদপত্র যতদিন স্বাধীনভাবে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ ছাপিতে পারিবে না ও নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিবে না, ততদিন সরকারি হুকুম মানার পরিবর্তে নিজের প্রকাশই বন্ধ করিয়া দিবে, তখন যে-অল্পসংখ্যক পত্র কংগ্রেসের আদেশ পুরাপুরি পালন করিতেছিল, 'সার্চলাইট' ছিল তাহাদের অন্যতম। এসব সত্ত্বেও 'সার্চলাইট' আর্থিক অনটন হইতে মুক্ত হয় নাই। শেষে আমাদিগকে উহা সত্বর বিড়লা ব্রাদার্সকে এই শর্তে দিয়া দিতে হয় যে উহার আর্থিক ব্যবস্থা তাঁহারাই করিবেন, কিন্তু উহার সম্পাদকীয় নীতিতে অধিকার আমাদেরই থাকিবে। ১৯৪১-এর শেষে ইহা স্থির হয়। তখন বিড়লা বন্ধুগণ অনেক কিছু খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা অর্থসঙ্কট হইতে মুক্তি পাইতেছিলেন এমন সময় গভর্মেণ্ট ১৯৪২ সনের আন্দোলনে উহা বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ জারি করিলেন। সম্পাদকও আমাদের সঙ্গে নজরবন্দী হইলেন। আজ আমি যেখানে এই পঙ্‌ক্তি কয়টি লিখিতেছি সেখানে তিনিও আছেন।

আন্দোলনের জোর ও সরকারি দমননীতি

উপরে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে হইয়াছিল। আমি অসুস্থ ছিলাম বলিয়া এই অধিবেশনেও যোগ দিতে পারি নাই, কিন্তু শুনিয়াছিলাম যে উহাতে যত প্রতিনিধি আসিয়াছিল কখনও কোন অধিবেশনেও তত আসে নাই। তাহার কারণও ছিল। কেহ কেহ ভাবিয়াছিল, নাগপুরে অসহযোগ প্রস্তাব আবার আলোচনা করা হইবে; তাই দুই পক্ষের লোকেরা আপন আপন শক্তি দেখাইবার জন্য অধিক সংখ্যায় সেখানে আসিয়াছিল। কিন্তু

দুপক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা হইল; শেষে খানিকটা হেরফের করিয়া সংকল্প গ্রহণ করাই স্থির হইল। এই প্রস্তাব দ্বারা দেশকে ক্রমশ অসহযোগ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। সরকারি খেতাব ছাড়িয়া দেওয়া, কাউন্সিল বর্জন করা, যাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে গিয়াছে কোনপ্রকারে তাহাদের সাহায্য না দেওয়া, সরকারের সংশিলষ্ট শিক্ষালয় হইতে সরিয়া দাঁড়ানো ও আদালত বর্জন, প্রথমে ইহাই ছিল প্রধান কার্যক্রম। কিন্তু ক্রমে সরকারি চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া ও কর বন্ধ করার আদেশ পাওয়ায় তাহাও করা স্থির হইল। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার জন্য সরকার হইতে পৃথক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মিটাইবার জন্য পঞ্চায়েত স্থাপন, চরখা প্রচার ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন, ইহাও আবশ্যক বলা হইল। হিন্দু-মুসলিম্ ঐক্য ও অহিংসার উপরও জোর দেওয়া হইল।

যাহারা প্রথমে খানিকটা দোমনা ছিল, নাগপুরের সংকল্পের পর তাহারা সকলে এখন দৃঢ় হইয়া অসহযোগে লাগিয়া রহিল। মহাত্মাজী ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের কার্যক্রম লোকে যদি পুরাপুরি পালন করে তাহা হইলে এক বৎসরের ভিতরেই স্বরাজ হইয়া যাইবে। লোকেরা এক বৎসরের কথাটা ধরিয়া লইল। শর্ত পূরণ করিবার চেষ্টায় প্রাণপণ করিয়া সকলে লাগিয়া গেল। উপরে যে-সব সভার কথা বলা হইয়াছে, সেখানে প্রচারে ইহাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

উপরে বলা হইয়াছে, সমস্ত বিহার প্রদেশে অসংখ্য কর্মী কাজ করিতে লাগিল এবং স্বরাজ ও অসহযোগের কথা গ্রামে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিতে থাকিল। অল্পদিনের মধ্যেই অদ্ভুত জাগরণ দেখা গেল। সরকারও তাঁহাদের দিক হইতে চুপ করিয়া ছিলেন না। তাঁহারা দেখিতেছিলেন যে প্রচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রভাব ক্রমেই চরমে উঠিতেছে, লোকেরা নির্ভীক হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসের তরফ হইতে আমরাও সতর্ক ছিলাম যে উৎসাহের বেগে জনসাধারণের দিক হইতে কোথাও বাড়াবাড়ি না হয়। এজন্য নাগপুরের পর প্রাদেশিক কমিটি যে আদেশ জারি করিলেন, তাহাতে শান্তি ও অহিংসার উপর সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হইল, পরিষ্কার বলা হইল যে কাহারও সঙ্গে কোনপ্রকারের জবরদস্তি না করা হয়। আমরা বুঝিতাম, কর্মীরা এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিত। বলপ্রয়োগে আমরা সরকারের নিকট হারিব, কারণ সরকারের নিকট অস্ত্র আছে, আমাদের নিকট নাই। তাহা ছাড়া অহিংসা হইল অসহযোগের মুখ্য শর্ত। তাহার দ্বারা জনসাধারণকেও আমরা নিজের দিকে টানিয়া আনিতে পারি। আমাদের দিক হইতে জোর-জবরদস্তি হইলে ফল হইবে উলটা। আমাদিগকে একদিন পস্তাইতে হইবে। এজন্য যেখানে বক্তৃতা দেওয়া হইত,

এই কথার উপর জোর পড়িত; যে প্রচার পত্র প্রকাশ করা হইত, তাহাতেও ইহার উপর জোর দেওয়া হইত। গভর্মেণ্ট খোঁজ রাখিতেন, কোথাও কোন অশান্তি হইলে দমন করিবেন। কিন্তু তাহার সুযোগই পাইতেন না।

মজঃফরপুর জেলায় দুর্মূল্যতার কারণ অনেক জায়গায় হাট লুট হইয়াছিল। দারভাঙা জেলা ও চম্পারন জেলার এক-আধ জায়গায় অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। সরকার যে বাহানা খুঁজিতেছিলেন, তাহা পাইলেন। আমরা মদ বন্ধের কথাও প্রচার করিতাম। ইহার প্রভাবও যথেষ্ট হইতেছিল। আবগারি দোকানের ঠিকা মার্চ মাসে দেওয়া হইত। বিক্রয় কম হইয়া যাইতেছিল। সরকার ভয় পাইয়া গেলেন, নিশ্চিত আয়ের স্থলে বেশি লোকসানের মধ্যে বুঝি পড়িয়া গেলেন। এই দুই কারণে দমননীতি জারি হইল। দমন আরম্ভ হইল মজঃফরপুর জেলা হইতে। তাড়াতাড়ি অন্যান্য জেলায়ও ছড়াইয়া পড়িল। চম্পারনের লৌরিয়ার কাণ্ডের সময় হইতেই কিছু-কিছু দমন চলিতেছিল। সেখানে এখন আরও জোরে চলিতে লাগিল। দণ্ডনীতির প্রথম রূপ হইল, কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে মুচলেকা দিবার জন্য মকদ্দমা রুজু করা চলিল। ফৌজদারী দণ্ডনীতির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী কর্মীদের সভায় বক্তৃতা করা ও মিছিল ইত্যাদিতে যোগ দেওয়া বারণ হইয়া গেল। এই ধরনের মকদ্দমা কত জনার উপর চালানো হইয়াছিল, তাহা এতদিন পরে বলা তো কঠিন; কিন্তু এইটুকু নিশ্চয়ই বলা যায় যে লোকে জামিন দেয় নাই। যাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করা হইত তাহারা জেলে চলিয়া যাইত। তবে মকদ্দমায় যেখানে সেখানে লোকেরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিল। কোথাও কোথাও শেষটায় মকদ্দমা খারিজ করিতেই হইল, কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না। কথাটা এই, সভা করা ছাড়া আমাদের লোকেরা অন্য কিছু করিতও না, আর সে সভায় অসহযোগের কার্যক্রম বুঝানো হইত। হাট লুটের যে ঢেউ চলিতেছিল তাহা বন্ধ করিতে আমাদের লোকেরা খুব সাহায্য করিয়াছিল। যেখান হইতেই খবর আসুক, তাহারা শুনিবামাত্র ছুটিয়া যাইত, আর লোকদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া সামলাইয়া লইত। লুঠেরাদের সামনে দাঁড়াইবার জন্য লোকদের তৈয়ারও করিত। কিন্তু সরকার তো চাহিতেন আন্দোলন বন্ধ করিতে। এইজন্য তাঁহারা লুঠেরাদের বদলে কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার করাটাই বেশি জরুরি ও সংগত মনে করিতেন।

অল্প দিনের মধ্যেই শত শত কর্মী এইজাতীয় মকদ্দমায় ঘায়েল হইয়া গেল। প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি মিঃ টেনী এক সার্কুলার বাহির করিলেন, তাহাতে জেলার পদাধিকারীদের আন্দোলন দমন করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইল। আর একটি সার্কুলার বাহির করিলেন স্বায়ত্ত-

শাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ হ্যালেট, তাহাতে বলা হইল যে মিউনিসি-প্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সরকারেরই অংগ, সুতরাং উহাদের সদস্য ও কর্মচারী কাহারও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত হইবে না। 'হাঁকে ভীম হোঁহি চৌগুনা'—জেলার পদাধিকারীরা তো ইহাই চাহিতে-ছিলেন। তাঁহারা ১০৭ ও ১৪৪ ধারার নোটিশের ঝড় উঠাইলেন। শত শত লোক গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠানো হইল।

মজহর-উল-হক সাহেবের সংগে আমার আরা যাইবার কথা ছিল। কি কারণে যেন হক সাহেব সেখানে যাইতে পারিলেন না। আমি একাই গেলাম। আরা স্টেশনে নামিতেই আমি ১৪৪ ধারার নোটিশ পাইলাম, ৯টা হইতে ৫টা পর্যন্ত কোনও মিছিল ও সভায় আমি শহরের ভিতরে যোগ দিতে পারিব না। আমার সম্মুখে এক সংকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নোটিশও ছিল খুব মজার। তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হইতেছিল। আরাও ছিল তাহার একটা কেন্দ্র। নোটিশে নিষেধের কারণ বলা হইয়া-ছিল যে মিছিল ও সভা করিলে পরীক্ষার্থীদের কাজে ক্ষতি হইবে ও তাহারা রাগ করিবে।

নাগপুর কংগ্রেস স্থির করিয়াছিল, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সত্যাগ্রহ করা হইবে না। সরকারের তরফ হইতে যখন এই ধরনের কান্ডকারখানা হইতে লাগিল, অথবা তাহার সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন আমরা প্রাদেশিক কমিটির তরফ হইতে আদেশ বাহির করিয়া দিয়াছিলাম যে এই ধরনের হুকুম মানিয়া লইতে হইবে; কারণ কংগ্রেস এখনও সত্যাগ্রহ করিবার আদেশ দেয় নাই। হ্যাঁ, তবে যেখানে আত্মসম্মানের কথা আসিবে, সেখানে অন্য কথা।

আমি নোটিশ পাইয়া স্থির করিলাম যে উহা মানিয়া লইতে হইবে, সেই জন্য স্টেশন হইতে শহরের মধ্যে গেলাম না। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম। স্টেশন হইতে মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে নিকটেই এক গ্রামে চলিয়া গেলাম। দুপুরটা সেখানেই থাকিলাম। সেখানে এক বড় সভা হইল। তাহাতে কেবল গ্রামেরই নহে শহরেরও অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আবার সন্ধ্যা পাঁচটার পর শহরে গেলাম। সেখানেও এক বড় সভা হইল। সেখানে আমি নিজের কার্যক্রম সম্পন্ন করিলাম। এইভাবে এই নোটিশের ফল হইল এই, একটা সভার জায়গায় দুইটা সভা হইল। লোকদের উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। আমার ভভুয়ায় যাওয়ার কথা ছিল। সেখানেও আমরা যাইবার পূর্বে একটা নিষেধাজ্ঞা বাহির হইয়া গেল। আমি সেখানেও গিয়াছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু নোটিশের কি হইল তাহা মনে নাই।

ঐ সময়ে প্রাদেশিক কাউন্সিলের বৈঠক হইতেছিল। যাহারা

কাউন্সিলে যোগ দিয়াছিল তাহারা কংগ্রেসের আদেশের বিরুদ্ধে ঐখানে গিয়াছিল। কিন্তু সরকারির সার্কুলার লইয়া ও আমার নামে যে নোটিশ বাহির হইয়াছিল তাহা লইয়া তাহারা তর্ক জুড়িয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণভাবে যে-দমননীতি চলিতেছিল, তাহারও কঠোর সমালোচনা হইল। সংবাদপত্রে এই-সব কথা ছাপা হইলে প্রদেশের বাহিরের সাময়িকপত্রগুলিও বিহার সরকারের কাণ্ডকারখানা— বিশেষ করিয়া তাহার সার্কুলার ও দমন-নীতির—কড়া সমালোচনা করিল। কথা খুব ছড়াইয়া পড়িল। মজঃফর-পুর জেলার সীতামারীর সবডিভিজনাল অফিসার মিঃ লী, যিনি এই ধরনের ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কয়েকদিন পরে সেখান হইতে বদলি লইয়া গেলেন। জানি না, এই দেশব্যাপী আন্দোলনের জনই তিনি বদলি হইলেন, না অন্য কোনও কারণে; কিন্তু লোকের মধ্যে ধারণা জন্মিল যে আন্দোলনই তাঁহার বদলির কারণ।

মদ বন্ধ করার জন্য কোথাও কোথাও সরকারি অফিসারেরা গণ্ডগোল করিয়াছিল। হাজারিবাগ জেলের 'চতরা'তে খেতের মধ্যেই মদ বিক্রি হইতে লাগিল। জনসাধারণের মধ্যে মদের প্রচার তো অফিসরেরাই বেশির ভাগ করিত। কোথাও কোথাও মদ বন্ধ করায় সাহায্য করার জন্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নামে মকদ্দমাও রুজু করা হইল।

পঞ্চায়েত স্থাপন করাও আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে এক প্রধান কার্য ছিল। অনেক জায়গায় পঞ্চায়েত স্থাপিত হইল। অনেক মকদ্দমার মীমাংসা হইতে লাগিল। কোথাও কোথাও লোকে পঞ্চায়েতী সিদ্ধান্ত মানাইবার জন্য 'একঘরে'র সাহায্য লইত। আমরা প্রাদেশিক কমিটির তরফ হইতে ইহা বন্ধ করিয়া দিলাম, তাহা হইলেও এখানে-ওখানে খানিকটা হইয়াই গেল। এক জায়গায় তো পঞ্চায়েতের প্রভাব এতদূর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে তাহা সরকারি আদালতের মতো কাজ করিত। লোকে যথারীতি মকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য ও তাহার মীমাংসা করাইবার জন্য ফিও দিত। লোকে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইত; কিন্তু কোথাও কোথাও অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এক অসুবিধা হইল যে পুরানো, বহু-কাল ধরিয়া যে-মকদ্দমা চলিতেছে তাহাও লোকে পঞ্চায়েতের সামনে দিতে শুরু করিল, ফলে দাঁড়াইত এই যে খুব পুরানো বলিয়া পঞ্চায়েত যদি তাহা না-ই শুনিত, তবে অভিযোগ হইত যে ইহাও সরকারি আদালতের মতো ন্যায়ের দিকে না দেখিয়া তামাদির কথা বলে, আর যদি একটা মীমাংসা করিতে চাহিত তবে উহার মীমাংসা গ্রহণ করাইবার উপায় ছিল না।

পঞ্চায়েত লইয়াই গিরিডিতে এক মহা কাণ্ড হইয়া গেল। সেখানে পঞ্চায়েতের বিচার না মানার জন্য একজনকে একঘরে করা হয়। একঘরে লোকটিকে কুয়া হইতে জল ভরিতে দেওয়া হইল না। তাহার ঘড়া ভাঙিয়া

দেওয়া হইল। পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিল যে ঘড়া ভাঙিয়াছিল তাহাকে। তাহার সঙ্গে বহু লোক থানা পর্যন্ত আসিল। সেখানে ও জেলের সামনে হাঙ্গামা হইল। পুলিশের বলিবার ছিল না যে লোকে ঢিল ছুঁড়িয়াছে ও পুলিশের উপর চড়াও হইয়াছে। দারোগা তাঁহার পিস্তল লইয়া গুলি ছুঁড়িলেন। অনেক লোক আহত হইল। জেল ও থানার খানিকটা ক্ষতি হইল। কয়েকজন লোকের নামে মকদ্দমা চলিল। এবিষয়ে খবর পাওয়ামাত্র ডক্টর মামুদের সঙ্গে আমি সেখানে গেলাম। লোকদের শান্ত করা হইল। মকদ্দমায় শহরের বিস্তর ধনী লোকদের ফাঁসানো হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো মাপ চাহিয়া লইল; কিন্তু অন্যদের নামে মকদ্দমা চলিল। শেষে যে কি হইল, তাহা আমার মনে নাই।

এক মজার ঘটনা

অল্প কয়দিনের পরেই, ১৯২১-এর মার্চে বেজওয়াড়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হইল। সেখানে স্থির হইল যে লোকমান্য তিলকের স্মৃতিরক্ষায় এক কোটি টাকা স্বরাজের কাজের জন্য, তিলক স্বরাজ ফণ্ড নামে, ৩০শে জুন পর্যন্ত জমা করা হইবে, বিশ লক্ষ চরখা চলিবে ও কংগ্রেসের এক কোটি সভ্য করা হইবে। বেজওয়াড়া পেঁৗছিবার পূর্বে মহাত্মাজী দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমি কলিকাতা হইতেই মহাত্মাজীর সঙ্গে উড়িষ্যায় যাই। সেখানে তখন দুর্ভিক্ষ। মহাত্মাজী প্রথম হইতেই তাহার সংবাদ পাইয়াছিলেন। লোককে দিয়া তিনি কিছু সাহায্যও করাইয়া দেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতেরা মহাত্মাজীর আগমন সংবাদ পাইয়াছিল। অনেকে বহু দূর হইতে আসিল। মহাত্মাজী তাহাদের অস্থি-পঞ্জর দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে খুবই আঘাত লাগিল। একটি প্রবন্ধে তিনি উড়িষ্যার নগ্ন বুভুক্ষু কঙ্কালদের কথা জোর করিয়া উল্লেখ করিলেন। আমি বহুবার ঐ-সব গরিবের কথা মনে করিয়া তাঁহার চোখে জল আসিতেও দেখিয়াছিলাম। একটা বড় বাড়িতে তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। একদিকে জগন্নাথজীর বিশাল মন্দির, পাণ্ডা ও ধনী মানী লোকদের সুখময় জীবন, মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার জন্য ধুমধাম, অন্য দিকে এই-সব নগ্ন বুভুক্ষু নরকঙ্কাল!

উড়িষ্যারই কোনও সভায় মহাত্মাজী খুব উঁচু সুরে এক বক্তৃতা দেন, তাহার প্রভাব আজ পর্যন্ত আমার মনে আছে। সভায় কেহ মহাত্মাজীকে

প্রশ্ন করে, আপনি ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে কেন—ইংরেজী শিক্ষাই তো রাজা রামমোহন রায়, লোকমান্য তিলক ও আপনাকে সৃষ্টি করেছে?—গান্ধীজী উত্তরে বলেন, "আমি তো কিছু নই, কিন্তু লোকমান্য তিলকও যা আছেন তার থেকে কত বড় হতে পারতেন যদি ইংরেজী শিক্ষার বোঝা তাঁকে বইতে না হত। রাজা রামমোহন আর লোকমান্য তিলক, শঙ্করাচার্য, গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ সিং আর কবীরদাসের সামনে কি? আজ তো দেশভ্রমণের ও প্রচারের কত উপায় হাতের কাছে রয়েছে। তাঁদের সময়ে তো এ-সব কিছু ছিল না, তবু তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করে দুনিয়ায় কত বড় বিপ্লব এনে ফেললেন।" ইংরেজী রাজ্যশাসন বিষয়েও তিনি বলিয়াছিলেন, মোগল শাসনে আকবরের সময় রানা প্রতাপ ও আউরংগজেবের সময় শিবাজীর মতো বীরপুরুষের যে সুযোগ ছিল, আজ তাহা কোথায়? এই ধরনের এক খুব জোরালো বক্তৃতাদান প্রসংগে তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষাই দেশোন্নতির কারণ এই যে আমরা বলি, ইহা আমাদের মোহ। হাঁ, ইংরেজী জানা খারাপ নহে; আমাদের মধ্যে অনেককেই ইহা জানিতে হইবে। আমরা উহা শিখিবও বটে; কিন্তু আজকার মতো উহা শিক্ষার মাধ্যম ও উপায় হইয়া থাকিতে পারিবে না।

উড়িষ্যা হইতে মহাত্মাজীর সংগে আমি বেজওয়াড়ায় গেলাম। পথের দৃশ্য অবর্ণনীয়। আমাদের প্রদেশে যেরূপ উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, অন্ধ্র দেশেও সেইরূপ দেখিতে পাইলাম। সেই লোকের ভিড়, সেই দশ দিক হইতে জয়ধ্বনি উঠিতেছে! স্টেশনে সেই জনসমুদ্র, চলতি রেলগাড়ির ধারে লাইনের উপর লোকদের সেই ভিড় ও সেই বিরাট সভা! মনে আছে, বিজয়নগরে আমরা প্রায় রাত তিনটায় রেল হইতে নামিলাম। সারা শহরের লোকে যেন দেওয়ালি উৎসবে মাতিয়াছিল!

আমরা যে-কয়জন বিহারের প্রতিনিধি ছিলাম, বেজওয়াড়া হইতে ফিরিবার সময় রেলে বসিয়া কার্যক্রম সম্পূর্ণ করিবার বিষয়ে পরস্পর কথা বলিতে লাগিলাম। পাটনায় পেঁাছিতে পেঁাছিতে একপ্রকার স্থির করিয়া লইলাম, কাজ কিভাবে নির্বাহ করিব। অর্থ-সংগ্রহে ও চরখা চালানোর দিকে বিশেষ মন দেওয়া হইল। আমিও রাতদিন সমস্ত প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম ও টাকা সংগ্রহে লাগিয়া রহিলাম। সমস্ত জেলার কর্মীরা প্রাণপণ করিয়া এই কাজ করিতে থাকিল। টাকা যেমন যেমন আদায় হইত, অমনই ব্যাংকে জমা হইত। আমরা কয়েক প্রকারের রসিদ ছাপাইয়া লইয়াছিলাম, তাহাতে এই সুবিধা হইত যে প্রত্যেক লোককে রসিদ লিখিয়া দিবার প্রয়োজন হইত না। সবচেয়ে কম ছিল চার আনার রসিদ। বেশি টাকার রসিদ হাতে লিখিয়া দেওয়া হইত। বিহারে ইহার পূর্বে সাধারণের

কাজের জন্য জনসাধারণের নিকটে এইভাবে কখনও টাকা চাওয়া হয় নাই। কতদূর কৃতকার্য হইব তাহা আমরাও জানিতাম না। কিন্তু লোকের উৎসাহ দেখিয়া আশা বাড়িয়া যাইতেছিল। খুব বড় ও ধনী লোকদের নিকট হইতে আমরা বেশি কিছু পাই নাই। কিন্তু প্রত্যেক জেলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা খুব উৎসাহ করিয়া চাঁদা দিয়াছিল। শেষে ৩০ জুন পর্যন্ত আমরা প্রায় সাত-আট লাখ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ৩০ জুন তারিখে গান্ধীজীকে তারযোগে ইহা জানানো হইল। এ-কাজে ত্রিহুত বিভাগের লোকেরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখাইয়াছিল, যদিও অন্য জেলাগুলিও তেমন কিছু পিছনে পড়িয়া ছিল না।

বিহারের কয়েকটা জেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে খুব অভিজ্ঞতা লাভ হইল। কোথাও কোথাও মনোরঞ্জক ঘটনাও হইল। পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করি :

জুন মাস। আমি রাঁচি জেলায় তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডারের জন্য টাকা উঠাইতে গিয়াছি। স্থানীয় কর্মীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে যাইবার জন্য আমার দুই দিনের কর্মতালিকা তৈয়ারি করিয়াছিল। প্রথম দিন রাঁচি হইতে মোটরযোগে দশটায় বুণ্ডু পৌঁছিয়া সেখানকার কাজ শেষ করিবার কথা ছিল। রাঁচিতে ফিরিয়া দুপুরের খাওয়া খাইব, সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। বিকালবেলায় খুঁটী যাওয়ার কথা। রাত্রে আবার রাঁচি ফিরিয়া আসিবার কথা। পরের দিন সকালে লোহারডাগা গিয়া দুপুরবেলায় সেখান হইতে ফিরিয়া বিকালবেলার গাড়িতে পাটনা রওনা হইব, এই ঠিক ছিল।

আমরা সকালবেলায়ই রাঁচিতে স্নানাদি করিয়া তৈয়ারি হইলাম। ট্যাক্সি আসিতে একটু দেরি হইল। আমরা সাত জন, তাহার মধ্যে একজন ড্রাইভার আর একজন ক্লীনার, তাহাতে চড়িয়া রওনা হইলাম। দুপুরে রাঁচিতে ফিরিয়াই খাইতে হইবে, তাই সঙ্গে কিছুই লইলাম না। গায়ে যে জামা ও চাদর ছিল, তাহাই মালপত্র। স্থানীয় নেতা ডাক্তার পূর্ণ মিত্র সঙ্গে এক ছোট ব্যাগ লইয়াছিলেন। তখন তাহার বিষয়ে জানিতে পারি নাই। কিছুদূর গিয়া এক জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছিলে মোটরের কি একটা ভাঙিয়া গেল। ড্রাইভার মেরামত শুরু করিয়া দিল আর বলিল, 'বাস্, দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে সেরে নিচ্ছি।' মেরামত করিতে দেরি হইতে লাগিল। আমরা যত ঘাবড়াই, ও ততই ভরসা দেয়। দুই-তিন ঘণ্টার পর সে বলিল, কামারের দরকার হইবে। খোঁজ করিয়া একটা গ্রাম পাওয়া গেল, সেখানে কামারবাড়ি গিয়া কিছু ঠুকঠাক করিয়া দুরস্ত করিয়া লইল। জঙ্গলে খাওয়াদাওয়ার কোনও কিছু নজর পড়িল না। তেঁতুল গাছ ছিল। তাহাতে গোছা গোছা তেঁতুল ঝুলিয়া ছিল। আমরা তাহা ভাঙিয়া জিভ ও দাঁত টক করিতে লাগিলাম। দুপুরের পর জোর পিপাসা

লাগিল। আবার গ্রাম খুঁজিয়া ঘটি ও বালতি চাহিয়া আনা হইল। অনেক দূর হইতে জল আনিয়া পিপাসা মিটানো গেল।

যখন গাড়ি মেরামতের কাজ চলিতেছিল, তখন আর একটা মোটর গাড়ি করিয়া পুলিশের লোকেরা যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। আমাদের দেখিয়া তাহারা গাড়ি থামাইল। আমরা তাহাদের বলিয়া দিলাম, 'শীঘ্রই বুণ্ডুতে পৌঁছে যাব, আপনারা সেখানে জানিয়ে দেবেন যে গাড়ি খারাপ হয়েছে বলে আমাদের আসতে একটু দেরি হচ্ছে।' তাহারা গাড়ি থামাইয়া আমাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্টাচার করিল; কিন্তু এই সংবাদ সেখানে পৌঁছাইয়া দিবার ভদ্রতাটুকু করিল না! সেখানে যে-সব লোক খানিকটা দূরের গ্রাম হইতেও আসিয়াছিল, তাহারা আমাদের জন্য তিনটা-চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এখানে-ওখানে চলিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি মেরামত হইল। আমরা সন্ধ্যা পাঁচটা-ছয়টায় বুণ্ডুতে পৌঁছিলাম। গ্রাম হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা তো চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খাস বুণ্ডুতে লোকদের মধ্যে আমাদের পৌঁছিবার খবর কথায় কথায় ছড়াইয়া পড়িল। সভা বসিল। প্রাণ খুলিয়া সেখানেও বক্তৃতা হইল। টাকা সংগ্রহ করা হইল। যতদূর মনে পড়ে, সেখানে প্রায় সাত-আট শ টাকার মতো সংগ্রহ হইয়াছিল।

কাজ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু সমস্ত দিন শুধু তেঁতুলের উপরই কাটিয়াছিল, তাই সেখানকার লোকেরা খাইবার জন্য আগ্রহ করিল। আমরাও রাজি হইলাম। রান্না শেষ করিতে প্রায় নয়টা-দশটা বাজিল। খাওয়া শেষ হইলে ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি করা যায়। সেদিনকার মত 'খুঁটী'র প্রোগ্রাম ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু পরের দিন লোহারডাগার প্রোগ্রাম যেন কোনও মতে বাদ না পড়ে। বিকালের গাড়িতে পাটনা রওনা হওয়াও অত্যন্ত দরকারি ছিল। কাহারও কাহারও মত হইল, বিশেষ করিয়া মোটরওয়ালার, রাত্রে যাওয়া ঠিক নয়, রাস্তায় জঙ্গল আছে, বিপদ আছে, মোটরও কে জানে কোথাও বিগড়াইয়া গেলে রাত্রে ভয়ানক অবস্থা হইবে। আমি বুঝিলাম যে সে একটা বাহানা করিতেছে— এতক্ষণ ধরিয়া গাড়ি মেরামত করা হইল, এখনও ঠিক চলিতেছে, আবার গাড়ি বিগড়াইবে কি! বিশেষ করিয়া আমার পরের দিনের কার্যক্রমের চিন্তা ছিল। আমি খুব জোর দিয়া বলিলাম, 'না, যেতেই হবে।'

শেষে প্রায় রাত এগারোটা-বারোটার সময় ঐ ভাঙা গাড়িতে চড়িয়া আমরা সাত জন রওনা হইলাম। মাঝপথে, অল্প দূর পরেই, একটা 'ঘাট' আছে সেখানে চড়াইটা একটু খাড়া। সেই চড়াইতে উঠিতে গিয়া মোটর আবার ভাঙিল। যেখানে ভাঙিল সেখান হইতে আরও প্রায় দুই শত

আড়াই শত গজ উপরে উঠিতে হইবে। তাহার পর নামা বা উত্‌রাই। নামিবার সময় এঞ্জিন যদি না-ও কাজ করে, তাহা হইলেও মোটর সহজে চলিয়া যাইবে, ড্রাইভার আমাদিগকে এইরূপ বুঝাইল। আমরাও সেইরূপই বুঝিলাম। ঘাট হইতে নামিয়াই এক ডাকবাংলো ছিল; ভাবিলাম যে যদি কোনও রকমে ডাকবাংলো পর্যন্ত পৌঁছাই, তাহা হইলে রাতটা সেখানে আরামে কাটিবে, ঘুমাইতে পারিব। নিজেদের বেকুবি ও উৎসাহের চোটে আমরা স্থির করিলাম যে, অল্প যেটুকু চড়াই আছে, তাহা আমরা মোটর ঠেলিয়াই পার করিতে পারিব। এইজন্য আমরা মোটর সামনে ঠেলিতে শুরু করিলাম। বিশ-ত্রিশ গজ পর্যন্ত মোটর ঠেলিয়া লইলাম। সেখানে ঢালু খুব কম ছিল, আর উঁচু ছিল বেশি। মোটরের পক্ষে উপরে চড়া কঠিন ছিল; কিন্তু আমরা জোর লাগাইলাম। ফলে হইল এই যে, কয়েক গজ উপরে ঠেলিবার পর মোটর উলটাইয়া পিছনের দিকে ঝুঁকিল। আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা আটকাইতে লাগিলাম। কোনও মতে আমরা এক খদে পড়া হইতে তাহা বাঁচাইতে পারিলাম। ইহার পর আর মোটর ঠেলিবার চেষ্টা করিতে সাহস হইল না।

রাত প্রায় বারোটা একটা বাজিয়াছে বোধহয়। জঙ্গলের মাঝখানে আমরা সাত জন লোক কোনও প্রকারে মোটরে বসিয়া আসিতেছিলাম। সারাদিন ক্লান্তির পর রাত্রে ঘুমানোটাও দরকার ছিল। সেই নির্জন জায়গায় ভয়ানক সব কথা বলিয়া ড্রাইভার আমাদিগকে ভয়ও দেখাইতেছিল। সে বলিল যে এখানে হিংস্র জানোয়ার ও চোর-ডাকাত, দুইয়েরই ভয় আছে। আমরা বলিলাম, চোর-ডাকাত আমাদের নিকট হইতে লইবেই বা কী, আমাদের নিকট তো কিছুই নাই; তবে হাঁ, যদি জঙ্গলী জানোয়ার আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আমাদের ভয় অবশ্যই আছে। আমি মুখে তো এ-কথা বলিয়া দিলাম; কিন্তু ইহা জানিতাম না যে ডাক্তার বন্ধুর সংগ্রহের টাকাটা নিজের ব্যাগে রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা সঙ্গেই ছিল। সে সময় আমার কথা শুনিয়া ডাক্তারও কিছু বলিলেন না। আমিও পরের দিন সকালবেলা পর্যন্ত, আমাদের হাত একেবারে খালি এই ভুল ধারণাই করিয়াছিলাম।

আমরা যখন পরামর্শ করিতেছিলাম তখন জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা আওয়াজ শোনা গেল। ড্রাইভার তো খুব ভয় পাইল; বলিতে লাগিল, এই ভয়ানক আওয়াজ বনের জানোয়ারের। খানিক পরে আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল। আমরা সকলে শান্তভাবে কোনও প্রকারে মোটরে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মন যখন খানিকটা শান্ত হইয়াছে তখন আমরা ভাবিলাম যে মোটর ওখানেই রাখিয়া দিয়া ডাকবাংলো পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া সেখানে ঘুমাইয়া থাকিব, আবার ভোর বেলায় মোটরের জন্য কিছু চেষ্টা

করা যাইবে। কিন্তু ড্রাইভার তাহাতে রাজি হইল না। আমরা যখন বললাম, 'আমরা চলে যাচ্ছি, তুমি মোটরের সঙ্গে এখানেই থেকে যাও', তখন সে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষকালে স্থির হইল যে, তিন জন লোক মোটরের সঙ্গে থাকিয়া যাইবে, বাকি চার জন ডাকবাংলোতে চলিয়া যাইবে। চাঁদিনী রাত, এই একটি কারণ যাহার দরুণ কিছুটা সাহস মনে সঞ্চিত ছিল। ডাকবাংলোতে পৌঁছিয়াই আমরা পিপাসায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ডাকবাংলোতে কেহ ছিল না; দরজা বন্ধ ছিল। আমরা ভাবিলাম, দরজা কোনও রকমে খোলা যাইবে। তাহাতে আমরা সফলও হইলাম। ভিতর হইতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া একটা বালতি বাহির করা হইল। দুইটা চৌকি ও দুইটা টেবিল ছিল। তাহা বাহিরে আনা হইল। কিন্তু বালতিতে তো আর পিপাসা মিটিবার নহে, কুয়া ও দড়ির আবশ্যকতা থাকিয়াই গেল। আমরা আর একবার চৌকিদারের খোঁজে ডাকবাংলোর আশেপাশে বাহির হইলাম। খানিকটা দূরে দেখিতে পাইলাম, একজন লোক একটি শিশুকে পাশে লইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছে। ঐ ঘোর জঙ্গলে শিশুর সঙ্গে তাহাকে এই প্রকার নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। অনেক ডাকাডাকির পর তাহাকে উঠানো গেল। চোখ মুছিতে মুছিতেই সে বলিল যে দড়ি তো নাই, কিন্তু জঙ্গলে অল্প দূর অগ্রসর হইলেই কুয়া পাওয়া যাইবে।

আমরা পিপাসায় ক্লান্ত ছিলাম। তাই আবার কুয়ার খোঁজে গেলাম। এবার কুয়া পাওয়াও গেল। নিজেদের চাদর একত্র করিয়া পাকাইয়া দড়ি বানানো গেল। তাহা দিয়া বালতি করিয়া জল তোলা হইল। জল খাইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ চৌকির উপর, কেহ বা টেবিলের উপর, ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইবার সময় পাওয়া গেল অল্পই। সকালে উঠিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, আমরা ভাবিলাম যে এখানে তো যানবাহন কিছু পাওয়া যাইবে না, সুতরাং রাঁচির দিকে পায়ে হাঁটিয়াই অগ্রসর হই; পথে কোনো গ্রাম পাওয়া গেলে কিছু আহারেরও ব্যবস্থা হইতে পারে।

সকলে পায়ে হাঁটিতে রাজি ছিল না। এইজন্য আমি ও আর একজন, দুই জন হাঁটিতে লাগিলাম। তিন-চার মাইল গেলে একটা গ্রাম পাইলাম, সেখানে কিছু চানা পাওয়া গেল। প্রায় নয়টার সময়ে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। চানা চিবাইয়া আমরা খানিকটা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কড়া রৌদ্র উঠিয়াছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। শীঘ্রই ঘুম আসিল। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে কেহ আসিয়া জাগাইয়া দিল। বুঝিলাম, রাঁচির ভাইয়েরা কাল দুপুর পর্যন্ত আমাদের পথ চাহিয়া ছিলেন। আমরা না পৌঁছানোয় অন্য ট্যাক্সি করিয়া আমাদের খোঁজে কয়েকজনকে

পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা এই ভুল করিয়াছেন যে ট্যাক্সির উপরই প্রায় পুরা বোঝা লইয়া তিন্-চার জন লোক আসিয়াছিলেন। মোটরওয়ালাদের ছাড়া আমরা পাঁচ জন, প্রথম হইতে এক গাড়ির বোঝা! আমরা বলিলাম যে আমাদের মধ্যে যাহারা এখনও পিছনে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে প্রথমে রাঁচি পৌঁছাইয়া পরে আবার মোটর লইয়া আসিলে আমরা দুই জন যাইব। তাহাদেরও এই ব্যবস্থা ভালো লাগিল। আমরা আরও প্রায় দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা আরাম করিয়া শুইয়া রহিলাম। প্রায় একটার সময় আবার যখন মোটর আসিল, তখন রাঁচি গেলাম। সেখানে কিছু খাওয়া-দাওয়া করিয়া, সন্ধ্যার গাড়িতে সোজা পাটনা রওনা হইয়া গেলাম।

এতটা মজার নয়, কিন্তু এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা, সেবারকার ভ্রমণে ঘটিয়াছিল।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও খাদি-প্রচার

১৯২১-এর জুলাই মাসে বোম্বাইতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইল। সেখানে বিহারের অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমিও গেলাম। অধিবেশনে প্রচুর উৎসাহ ছিল, কারণ অল্পকাল পূর্বেই এক-কোটি টাকা সংগ্রহের কর্মভার বেশ সফলতাপূর্বক পালন করা হইয়াছে। চরখারও যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য পূর্ণরূপে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। এই ঐক্য যে আবার কখনও ভাঙিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এই-সব কারণে ঐ অধিবেশনে কেহ কেহ সত্যাগ্রহ শুরু করিবার উপর খুব জোর দিয়াছিলেন।

এদিকে গভর্নমেণ্টের তরফ হইতেও কিছু কিছু উপদ্রব হইতেছিল, তাহাতে অনেকে বিচলিত হইয়াছিলেন। যদিও সমস্ত দেশময় আমরা খুব বড় আন্দোলন চালাইয়াছিলাম, তথাপি তাহা ছিল বৈধ আন্দোলন। আইনভঙ্গ করা হয় নাই— যদিও বক্তৃতার মধ্যে স্বাধীনতার কথা যথেষ্ট বলা হইত। কংগ্রেসের লোকদের আচারব্যবহার ও চালচলনে সাহস, উৎসাহ ও সবচেয়ে বেশি নির্ভয় ভাব বাহির হইয়া পড়িত। গভর্নমেণ্ট যেখানে-সেখানে কর্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া লইতেন। এইভাবে শত শত লোক জেলখানায় গিয়াছিল। বিহারে যে গ্রেপ্তার ও দমন করা হয়, তাহার কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই-সব কারণেও সত্যাগ্রহ শুরু করার উপর লোকেরা খুব জোর দিল।

মহাত্মা গান্ধী এখন ধৈর্যধারণ করিতে পরামর্শ দিলেন। চরখা প্রচার ও তাহার দ্বারা বিদেশীবস্ত্র বর্জন ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পালন করিবার সংকল্প ছিল। তিনি বলিলেন, যে-কার্যক্রম কংগ্রেস ঠিক করিয়া দিয়াছে তাহা পালন করিতে হইবে, তবে সত্যাগ্রহে সফলতা আশা করা যায়। এইজন্য এখন প্রস্তুতির উপর জোর দিয়া সত্যাগ্রহের সংকল্প স্থগিত রাখা হউক। কিন্তু এমন দু-একটি ঘটনা ঘটিল, যাহা সত্যাগ্রহের বীজ বপন করিল।

গভর্নমেণ্টের দিক হইতে ঘোষণা করা হইল যে শীতকালে ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আসিবেন। তাঁহারা নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এতটা প্রচার হইতেছে, লোকের মধ্যে উৎসাহ ও ফুর্তি এতটা বাড়িয়া গিয়াছে, যে যুবরাজের ভারতাগমন তাহা বন্ধ করিবার পক্ষে সাহায্য করিবে। ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড আন্দোলনের বিষয়ে একবার বলিয়াছিলেন : আমি এতে ঘাবড়ে গিয়েছি, ধোঁকায় পড়ে গেছি (puzzled and perplexed)। এখন লর্ড রেডিং এখানে ভা[illegible] হইয়া আসিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে চতুর হইতেও চতুর নীতিজ্ঞদের মধ্যে একজন, ইহাই লোকে মনে করিত। তিনি কিছুকাল পূর্বে আমেরিকায় রাজদূতের পদে থাকিয়া, যুদ্ধে আমেরিকাকে ইংলণ্ডের পক্ষে লইয়া আসিবার নীতিকৌশল দেখাইয়াছিলেন। আর এখন ইংলণ্ডের চীফ জাস্টিসের পদে নিযুক্ত ছিলেন। হইতে পারে যে যুবরাজের ভারতাগমন উঁহার চাতুরীর ফল। হইতে পারে, নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গবিচ্ছেদের পরে যখন বাংলায় ব্যাপকভাবে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল ও কোনও প্রকার দমননীতিতে তাহা বন্ধ করিতে পারা যায় নাই, তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ অভিষেকের জন্য ভারতবর্ষে আসিলেন, এখানকার সাধারণ লোকেরা, এমন-কি সকলেই, খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল; তেমনই এবারও যুবরাজের আগমনে হিন্দুস্থানের লোকদের মধ্যে রাজভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে এবং আন্দোলন আপনা-আপনি দুর্বল হইয়া পড়িবে। এ-সময়ে যুবরাজের ভারতাগমনের অন্য কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে গভর্নমেণ্ট যুবরাজকে এখানে আনিবার সংকল্প ছাড়িয়া দিন। তাহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছিল যে গভর্নমেণ্টের পক্ষে, নিজের বিলীয়মান লোকপ্রতিষ্ঠা পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য, সম্রাটের পুত্র ও ভাবী সম্রাটকে এইভাবে প্রয়োগ করা সংগত নহে। ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে দেশের এই কথা যদি গভর্নমেণ্ট স্বীকার না করে তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই আগমনকে বর্জন করিতে

হইবে— যদিও যুবরাজের সঙ্গে আমাদের কোনও ব্যক্তিগত ঝগড়া নাই, বরং আমাদের হৃদয়ে তাঁহার জন্য সমাদরই আছে, তথাপি তাঁহার বর্জনও অনিবার্য হইবে। এই প্রস্তাবের দ্বারা পরিষ্কার জানাইয়া দেওয়া হইল যে গভর্নমেণ্টের এই চালবাজির ফল ভালো হইবে না এবং দেশকে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইল।

বক্‌রিদের সময়ও নিকটে আসিয়া গেল। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই সময় সর্বদা অতি সংকটপূর্ণ মনে করা হয়; কারণ যেখানে-সেখানে গো-কোরবানির জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধিয়া থাকে। এবার ভাবা গিয়াছিল যে, এই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যুগেও যদি দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হয় তাহা হইলে ইহার ফল খুব খারাপ হইবে। বরং এই সুযোগে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বাড়ানো উচিত। এই বিষয়ে প্রচার হইয়াছিল খুব। মহাত্মাজীর পথ এই ছিল যে, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়িয়া তাহাদের হাত হইতে গোরক্ষা করিতে পারি না, আর তাহাদের মারিয়া আমরা গোরক্ষার সুফলও পাইতে পারি না। এইজন্য ব্যাপারটি তাহাদের উপরই ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহারা যাহাতে নিজেদের হিন্দু ভাইদের ধর্ম-বিশ্বাসকে আঘাত না দিয়া, ভাইবন্ধুর মতো ব্যবহারে আপনা হইতেই গোবধ বন্ধ করে, হিন্দুদের জোর জবরদস্তিতে নয়, নিজেদের প্রেমভাব ও উদার মত হইতে।

এই ব্যবস্থা অনুসারে আলি বন্ধুদের সঙ্গে মহাত্মাজী কয়েকটা জায়গায় ঘুরিয়াও গেলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিহারেও আসিলেন। এই পর্যটনে মহাত্মাজী সাহাবাদ, গয়া ও পাটনা জেলাতেই গেলেন, সেখানে বক্‌রিদের সময় কিছু গোলমালের ভয় ছিল। মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা আজাদ সোভানী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মহাত্মাজীর কার্যক্রম ছিল খুব সঙ্গীন—একদিনের মধ্যে বিস্তর জায়গায় সভা, আর অনেক দূর পর্যন্ত মোটরে করিয়া ঘোরা। আমার মনে আছে, একদিন তিনি সন্ধ্যার সময় খাইতেই পারেন নাই, কারণ তিনি সূর্যাস্তের পরে ভোজন করিতেন না এবং সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়ার সময় জোটে নাই। দেশ ঘুরিবার সময়ে আমি সঙ্গে ছিলাম। সব জায়গায় নিজেদের মধ্যে মিলনের কথাই বলা হইল। সঙ্গে সঙ্গে চরখা ও খাদি প্রচারের কথাও হইল। অত্যন্ত সন্তোষ ও গৌরবের কথা এই যে, মুসলমান নেতৃবর্গ—যদিও তাঁহারা নিজেদের কোরবানি করার অধিকার ছাড়িতে চাহেন নাই, তথাপি —জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন যে লোকে সত্ত্ব রাখিয়াও তাহা ব্যবহার করিবে কি না করিবে সে বিষয়ে নিজেরা মীমাংসা করিতে পারে। এইজন্য আত্মীয়বন্ধুর দৃষ্টিতে যতদূর সম্ভব মুসলমানদের এমন কিছু না করা উচিত যাহাতে হিন্দুরা মনে কষ্ট পায়।

এই সময়ে হাকিম আজমল খাঁ ও অন্য নেতারাও খুব অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইলেন। ফলে সে বৎসর বক্‌রিদ শুধু শান্তিতেই কাটিল, তাহা নহে; গো-কোরবানিও এত কম হইল যে, পূর্বে কখনও এরূপ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে একে অন্যের বিশ্বাসের মূল্য দিল। কোনও দিক হইতে শক্তি-পরীক্ষার চেষ্টা হয় নাই। উভয়ে পরস্পরের সাহচর্য ও ভ্রাতৃত্বে ভরসা রাখিল। তাহাদের এই ভরসা নিষ্ফল হয় নাই।

বিহারের কোনো কোনো অংশে, বিশেষ করিয়া উত্তর-বিহারের জেলা-গুলিতে, চরখা চলা কখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই—যদিও চরখার সংখ্যা খুব কম হইয়া গিয়াছিল। এই আন্দোলনে তাহা নবজীবন লাভ করিল। চরখা প্রচারের জন্য তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার হইতে টাকাও পাওয়া গেল। আমাদের প্রদেশেও কাজ শুরু করা হইল। কাজ তো আমরা শুরু করিলাম; কিন্তু চরখাশাস্ত্রের জ্ঞান আমাদের কিছুই ছিল না। উৎসাহ ছিল, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি ছিল না। এইজন্য সেই সময়ে যে-কাজ হইয়াছিল তাহার একমাত্র ফল এই হইল যে খাদির প্রচার তো হইল, কিন্তু পয়সার লোকসানও হইল খুব। গান্ধীজী আন্দোলনের আরম্ভেই যে-কথা বলিয়া-ছিলেন, এখনও যখন তাঁহার সেই কথা আলোচনা করি, তখন তাঁহার দূরদর্শিতা ও কার্যকৌশলের আরও এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের জাতীয় স্কুলকে করিয়া তুলিতে হইবে চরখা-শালা। আর ইহার জ্ঞান অর্জন করা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করার কাজে জাতীয় বিদ্যালয়ের লাগিয়া থাকিতে হইবে— চরখার দ্বারাই আমরা সহস্র সহস্র যুবককে কাজ দিতে পারিব, আর জনসাধারণের ধনবৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারিব। তিনি সবরমতী আশ্রমে উদ্যোগশালা খুলিয়া চরখার বিষয় অনুসন্ধানের কাজও আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শিক্ষার অধিকারীরা উহার মর্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা বিদ্যা-পীঠ ও তাহার অধীনস্থ পাঠশালাগুলিকে চরখাশালায় পরিণত করিলেন না— যদিও সর্বত্র চরখা চালানো আবশ্যিক বিষয় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

চরখা চলিতে লাগিল; কিন্তু চরখার শাস্ত্রের জ্ঞান শিক্ষকেরই তো ছিল না; শিশুদের তিনি কোথা হইতে সে-জ্ঞান দিবেন? এইভাবে 'অন্ধের হাতে পড়িল অন্ধকে শিখাইবার ভার! তাই চরখা কিছুদিন পর্যন্ত ঠিক পথে আসিতে পারিল না। আমরা এই অদূরদর্শিতার জন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না; কারণ এরূপ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। সকলের চক্ষু ভাবী স্বরাজের দিকে নিবদ্ধ ছিল, স্বরাজকে তখন মনে করা হইত রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ বস্তু। কংগ্রেসের মধ্যেও কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা, খাদি ও চরখার বিরোধিতা করিতেই

ছিল। কিন্তু এই-সব ত্রুটি সত্ত্বেও খাদির প্রচার হইল খুব। এখনও শুদ্ধ ও অশুদ্ধ খাদির ভেদ লোকে বেশি কিছু বলিয়া মনে করিত না। হাতে-চালানো তাঁতের সাহায্যে যে-মোটা কাপড় বোনা হইত, খাদি মনে করিয়া লোকে তাহাই কিনিত। মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে সত্যাগ্রহের জন্য খাদিপ্রচার অত্যন্ত আবশ্যক, আর প্রচারের সাক্ষ্য চোখেই পাওয়া চাই। অর্থাৎ যখন চারিদিকে লোকে খাদি পরিতেছে দেখিতে পাইব, তখন বুঝিব যে ইহার প্রচার হইয়া গিয়াছে—এজন্য বই, প্রবন্ধ ও খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে, অথবা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া, সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।

বিহারের এই ভ্রমণে গান্ধীজী খাদির উপর খুব জোর দিয়াছিলেন। কোকটির কাপড়, যাহা দারভাঙ্গা জেলার মধুবনী এলাকায় হইত, তাহা খুব মিহি, সুন্দর ও মোলায়েম হইত। দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত। এই ব্যবসায় এখনও মরে নাই। তাহার বিশেষ কারণ এই যে এ-কাপড়ের আদর নেপাল দরবারে ও সেখানকার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ছিল। সেখানকার জন্যই এই কাপড়, বিশেষ করিয়া নেপালের সীমান্ত অঞ্চলে খুব তৈয়ারি হইত। ঐ অঞ্চলের তৈয়ারি কিছু ধুতিও উপস্থিত করা হয়, বিশেষ করিয়া আমার মনে আছে যে মৌলানা মহম্মদ আলি তাহা দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মোমিনদের প্রধান কেন্দ্র বিহার শরিফে গান্ধীজী গিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন কথাও দিয়াছিলেন।

বিহার-ভ্রমণ সমাপ্ত করিবার পূর্বে গান্ধীজী তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া পাটনায় আসিয়া সদাকত আশ্রমে অবস্থিতি করেন। ঐখানেই নিখিল-ভারত কংগ্রেসের নবগঠিত কার্যকরী সভার বৈঠক হয়। বোম্বাইয়ের নিখিলভারতীয় কমিটিতে ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচন হয়। আমাকেও সভ্য নির্বাচন করা হয়। এইজন্য আমিও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। এই বৈঠকে বিশেষ করিয়া এই কথার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল যে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়া উচিত এবং তাহার জন্য চরখা প্রচারের প্রয়োজন।

বিহার হইতে গান্ধীজী কলিকাতা হইয়া আসাম চলিয়া গেলেন। আমি বিহারে খাদি-সংগঠন ও চরখা-প্রচারের জন্য ঘুরিতে লাগিলাম। প্রাদেশিক কমিটি এই কাজের জন্য কয়েকজন লোক দিয়া এক সমিতি গঠন করিয়াছিল। জেলায় জেলায় এই কাজের জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করা হয়। কাজ খুব জোর চলিতে লাগিল। সরকার তাঁহার দিক হইতে নীরব রহিলেন না। সরকারের ভয়, বিদেশী কাপড়ের দোকানের উপর বুঝি বা পিকেটিং হয়। কংগ্রেস বস্ত্রব্যবসায়ীদের অনুরোধ করিয়াছিল

যে তাহারা বিদেশী কাপড়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিক, আর যে-বিদেশী মাল তাহাদের নিকট মজুত আছে তাহা বিদেশেই বিক্রয় করিবার চেষ্টা করুক, এইখানের তৈয়ারি কাপড়ই ভারতবর্ষে বিক্রয় করুক। এই সংকল্পে ভয় পাইয়া বিহার সরকারের নূতন মুখ্য সচিব (চীফ সেক্রেটারি) মিঃ সিফ্টন এক বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রকাশ করিলেন। তাহাতে জেলার অফিসারদের উৎসাহ দেওয়া হইল যে তাহারা বিদেশী বস্ত্রের কথা যেন প্রচার করে এবং জনসাধারণকে বলে যে বিদেশী বস্ত্র না হইলে লোকের খুব কষ্ট হইবে, কাপড়ের দাম খুব বেশি হইবে। আর, যেখানেই কংগ্রেসের লোকেরা জোর করিবে, সেখানেই তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইবে। ইতিপূর্বে এই ধরনের এক বিজ্ঞপ্তি চীফ সেক্রেটারি রেণী অসহযোগের বিষয়ে প্রকাশই করিয়াছিলেন। এখন বিদেশী বস্ত্র সম্বন্ধে আরও জোরের নীতি সরকার ঘোষণা করিলেন। বোঝা গেল যে একদিন না একদিন সংঘর্ষ হইবেই। কিন্তু আমরা নিজেদের কাজ দৃঢ়তা, অথচ সহিষ্ণুতার সঙ্গে করিতে থাকিলাম। কাজ খুব জোর অগ্রসর হইতে লাগিল।

আসাম-ভ্রমণ শেষ করিয়া গান্ধীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে আবার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল, আমি তাহাতে যোগ দিবার জন্য সেখানে গেলাম।

মোপলা-বিদ্রোহ ও হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন

গান্ধীজী কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজের দিকে চলিয়া গেলেন। এই যাত্রায় কোথাও তিনি কৌপীন পরিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। এ-যাত্রায় মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে ওয়ালটেয়ার স্টেশন হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মৌলানা সৌকত আলি, ডাঃ কিচলু, মৌলানা হুসেন অহমদ, মৌলানা নিসার অহমদ, পীর গোলাম মজীদদ ও শ্রীভারতী কৃষ্ণতীর্থ শংকরাচার্য প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে তাঁহাকে করাচীতে, খিলাফত সম্মেলনের বক্তৃতা ও এক ফতোয়া প্রচারের জন্য, আদালতে উপস্থিত করা হয়। এই মকদ্দমাতেও দেশে খুব চঞ্চলতার সৃষ্টি হইল। মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁহার কৈফিয়ত বলিতে গিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার জন্য এবং যাঁহারা ইহাতে অভিযুক্ত ছিলেন সেই-সব নেতাদের ব্যক্তিত্বের জন্য, সেখানে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মকদ্দমা হয়। পরিণামে শ্রীশংকরাচার্য ছাড়া বাকি সকলের সাজা হইল।

ইহার পর বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় এবং তাহা হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, যে-ফতোয়ার জন্য এই সকল নেতার সাজা হইয়াছে বড় বড় সভা ডাকিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইবে। বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বরেরা ও অন্য নেতারা নিজেদের হস্তাক্ষরে এক যুক্তবিজ্ঞপ্তি বাহির করিলেন, তাহাতে ঐ-সব কথাই আবার বলা হইল যাহার জন্য করাচির মকদ্দমা চলিয়াছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে আমি দস্তখত করিয়াছিলাম। সমস্ত দেশে অসংখ্য সভা হইল। তাহাতে অসংখ্য লোক ঐ ফতোয়া আওড়াইল। সরকার কিছু করিলেন না, হতভম্ব হইয়া রহিলেন। যে-ফতোয়া শুধু মুসলমানেরাই জানিত, সেই ফতোয়া জানি না কত হিন্দুও আবার পড়িল, দেখাইয়া দিল যে, যে-কাজ অল্প লোক করিলে আইনের চোখে অপরাধ হয়, তাহা সারা দেশ সংঘবদ্ধরূপে করিলে অপরাধ হয় না। সত্যাগ্রহের এই এক সুন্দর নমুনা দেশের সামনে ধরা হইল!

ঠিক এই সময়ে আরাতে মৌলবী মহম্মদ শফীর সভাপতিত্বে বিহার প্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলনের বৈঠক খুব ধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হইল। আমি তাহাতে একদিনই যোগ দিতে পারিয়াছিলাম; কারণ আমাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দিবার জন্য বোম্বাই চলিয়া যাইতে হয়। তাহার পরেও আরাতে খুব উৎসাহ বজাইয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্সও হইল। তাহাতে অনেক হিন্দু খিলাফত ফণ্ড ও স্মার্ণা ফণ্ডের জন্য টাকা সংগ্রহ করিবে বলিয়া কথা দিয়াছিল এবং অর্থসংগ্রহও হইয়াছিল।

মহাত্মাজীর এইবার ভ্রমণের সময় খবর আসিল যে মালাবারে মোপলারা সরকারের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করিতেছে। প্রথম হইতে এদিকে পুরা খবর আসিতে পারে নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে খবর আসিতে লাগিল। মৌলানা মহম্মদ আলি যখন গ্রেপ্তার হন তখন তাঁহার ঐদিকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। মহাত্মাজীও যাইতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারও অনুমতি আসিল না, তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হইল না। যদি ইঁহারা সেখানে যাইতে পারিতেন তাহা হইলে এই আন্দোলন যে-রূপ গ্রহণ করিল তাহা হয়তো হইতে পারিত না, এতখানি প্রচারও ইহার হইত না। শুরুতে মোপলারা সরকারি কর্মচারী ও রেল, কাছারি প্রভৃতির উপরই আক্রমণ করিল; কিন্তু কিছুকাল পরে খবর ছড়াইয়া পড়িল যে তাহারা হিন্দুদের উপরও আক্রমণ করিতে শুরু করিয়াছে— তাহাদিগকে মারিতেছে অথবা জোর করিয়া মুসলমান করিতেছে। এই খবরে হিন্দুদের মধ্যে খুব উত্তেজনার সঞ্চার হইল। একপ্রকার নিজেদের মধ্যে মন কষাকষির বীজবপনও হইয়া গেল। যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য মোটামুটি স্থাপিত হইতে দেখা গিয়াছিল, এই ঘটনা হইতে দৃষ্টি পড়িল যে তাহা টলিতেছে। কয়েকজন হিন্দুর বিশেষ

করিয়া সরকারের, প্রচার হইতে ইহার উপর বেশি প্রভাব পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত ব্যাপার বেশি দূর গড়ায় নাই। কয়েক মাস পরে যদি অন্যান্য ঘটনা না-ঘটিত (যাহা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রূপ ধারণ করিল) তবে ১৯২১-এর ঐক্যের দৃশ্য আমাদের সামনে আসিতেই থাকিত। কিন্তু অদৃষ্টে ছিল অন্যপ্রকার।

গান্ধীজীর মত এই যে, তিনি খিলাফতের বিষয়ে মুসলমানদের যাহা-কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার আজ একটুও অনুতাপ নাই। তিনি যাহা-কিছু করিয়াছিলেন, অথবা হিন্দুরা তাঁহার প্রেরণায় যাহা-কিছু করিয়াছিল, তাহা ছিল উচিত ও ন্যায়সংগত। এক বাড়িতে দুই ভাই থাকে, তাহার মধ্যে একজনের যদি কোনও প্রকারের আপদ-বিপদের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে অন্যের ধর্ম হইল তাহার সাহায্য করা। এই সাহায্যের বিনিময়ে বিপন্ন ভাই সাহায্যকারীর সংগে কিরূপ ব্যবহার করিবে, কিংবা এই উপকার ভুলিয়া যাইবে কি না, এ-আলোচনা করাই উচিত নয়। তাহার পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা বৃথা। এ ছাড়া আমি মনে করি যে তিনি মুসলমানদের সাহায্য খানিকটা দেশের জন্য স্বার্থবুদ্ধিতেও করিয়াছিলেন; কারণ তিনি মনে করিতেন যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দেশোদ্ধারের পক্ষে আবশ্যক এবং এই সেবার দ্বারা তিনি হিন্দুদের জন্য মুসলমানদের দিয়া গোরক্ষা হইবে, এ আশাও পোষণ করিতেন।

অন্য পক্ষে, কাহারও কাহারও এই মত যে, খিলাফত আন্দোলন ধর্মবিষয়ক এক আন্দোলন, তাহাকে এই প্রকার সাহায্য করিলে ধর্মের গোঁড়ামিকেই সাহায্য করা হইল। ফলে সাধারণ মুসলমানদের গোঁড়ামি বাড়িয়াছে; সময় পাইয়া এই গোঁড়ামি এত ভয়ানক হইয়া গিয়াছে যে সমস্ত দেশে—যেমনই এই আন্দোলনে ভাঁটা পড়িয়াছে—হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-ফ্যাসাদ শুরু হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মুসলমানদের মধ্যে এত প্রবল জাগরণ দেখা দিয়াছে যে তাহারা ধর্ম ছাড়া রাজনীতিতেও নিজেদের গোঁড়ামি দেখাইতে শুরু করিয়াছে। আর কিছু দিন পরে যখন তুরস্কই খলিফাকে বাহির করিয়া দিল, আর এভাবে খিলাফতের মূলই কাটিয়া ফেলা হইল, তখন এই জাগরণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানকে গোঁড়া করিয়া তুলিতে সমর্থ হইল। এই পর্যন্ত হইলে কোনও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই গোঁড়ামি ধর্মবিষয়ক বলিয়া মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত করিবার চিন্তা জন্মিতে লাগিল।

যে-কোনো ক্রিয়া হইলেই তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে। গোঁড়ামি হিন্দুদের মধ্যেও দেখা দিতে লাগিল। একদিকে মুসলমানেরা 'তবলীগ্'—ধর্ম-পরিবর্তনের জন্য সাধারণে প্রচার করিতে শুরু করিল, অন্যদিকে হিন্দুরা

শুদ্ধি ও সংগঠনের বিউগ্‌ল বাজাইল। ফলে হইল এই যে ধীরে ধীরে মন কষাকষি বাড়িয়া চলিল। দুই দলের মধ্যে এক অতি বিস্তৃত ও গভীর খাত যেন সৃষ্টি হইয়া গেল, এখন তাহা কোনও রকমে বুজাইয়া দেওয়া বা পার হওয়া কঠিন। ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগ হারায় কি করিয়া! ঠিক সময় সে নিজের কূটনীতি প্রয়োগ করিতে ইতস্তত করে না। আগুনের ফুলকি সে চালাকি করিয়া বরাবর ফুঁ দিয়া জ্বালাইয়া রাখে। যখন সে আগুন শিখার রূপ ধারণ করিয়াছে, তখন তাহাতে ঘি ঢালিতে তাহার বাধে না।

উপরে অল্পকথায় দীর্ঘকালের কাহিনী বলিয়া ফেলিয়াছি। যাহা-কিছু লিখিয়াছি তাহা সমস্তই ১৯২১-এই হইয়া গিয়াছিল, এরূপ যেন কেহ না বুঝেন। ঐ সময় কোনও প্রকারে মাটিতে বীজ পড়িয়া গিয়াছিল, অনেকে হয়তো তাহা পড়িতেও দেখে নাই, দেখিলেও তাহাতে এতটা গুরুত্ব আরোপ করে নাই, কারণ মোপলাবিদ্রোহ সত্ত্বেও সমস্ত দেশে এ পর্যন্ত ঐক্যই শুধু চোখে পড়িত; সারা দেশময় ফতোয়া পুনরাবৃত্তির জন্য সভা ডাকা হইয়াছিল, সেই-সব সভায় এই ঐক্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখা যাইত। যুবরাজ এদেশে আসিলে পরে সর্বব্যাপী বহিষ্কারে সেই ঐক্যই লোকের চোখে পড়িয়াছিল।

এই দুই বিচারধারার সম্বন্ধে এখানে এইটুকুই বলিতে চাই যে, উভয়ের দৃষ্টিকোণে অনেক প্রভেদ আছে। মুসলমান যেদিক দিয়াই ভারতে আসুক-না কেন, যে ভাবেই তাহার সংখ্যা বাড়ুক-না কেন, আজ সে হিন্দুর মতোই ভারতের অধিবাসী। তাহার জন্যও দ্বিতীয় কোনও দেশ নাই। অন্য দেশের মুসলমানের প্রতি তাহার সহানুভূতি যতই থাক, আর তর্কের খাতিরে যদি ইহাও মানা যায় যে বাছিয়া লইবার সুযোগ পাইলে বিপৎকালে অমুসলমান প্রতিবেশী ছাড়িয়া দূরবর্তী বিদেশী মুসলমানের প্রতিই তাহার সহানুভূতি থাকিবে ও তাহা বেশি করিয়া দেখাইবে, তাহা হইলেও এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই দেশের ভিতর তাহারও জীবনমরণ, সুখদুঃখ ভোগ, জীবনের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করা, কষ্ট সহ্য করা, সবই করিতে হইবে। মৃত্যুর পরও সে দেশের খানিকটা অংশে দখল সাব্যস্ত রাখে। হিন্দুরা মরিলে পোড়ানো হয়, তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহের চিহ্ন কোথাও থাকে না, যাহা এক-আধটু ছাই-রূপে থাকে, হাওয়া তাহাও উড়াইয়া লইয়া যায় অথবা জল ধুইয়া লয়। কিন্তু মুসলমানেরা তিন-চার হাত মাটি লইয়া স্থায়ীরূপে এখানকার ধরণীর উপর পড়িয়া থাকে। এ কথা কে না জানে যে এই সমস্ত কবরের জন্য কতই-না ঝগড়া হয়! তাই আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে আমরা এদেশে মুসলমানদের স্থান নাই বলিতে পারি না।

এখন প্রশ্ন এই যে মুসলমান যদি বাহিরের না হয় তাহা হইলে তাহারও এই দেশের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ আছে যাহা অন্য সকলের আছে; এজন্য তাহারও এখানকার সমস্ত বিষয়ে ভাগ পাওয়া চাই। রাজনৈতিক অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারাতেও তাহাদের ন্যায়সংগত অংশ আছে। তাহা অস্বীকার করার একই অর্থ আছে, একই অর্থ হইতে পারে, তাহাদিগকে দাবাইয়া ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা।

মুসলমানদের বিষয়ে যে সব কথা বলা গিয়াছে সেই-সব কথা সকল মত, ধর্ম ও বিচারের লোকদের সম্বন্ধে খাটে। যে দেশে এতগুলি জাতি, এতগুলি ধর্মাবলম্বী, এত ভাষাভাষী, এত মত-মতান্তরের লোক বাস করে, সেখানে নিজেদের মধ্যে একতা স্থাপিত না হইলে পরস্পরে বিশ্বাস ও প্রেমের ভিত্তিতে শান্তি কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। যে যখন ইচ্ছা অনকে দাবাইতে পারিবে, নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়া লইবে; কিন্তু যাহাকে দাবানো হইল সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেই থাকিবে, না নিজে শান্ত হইবে, না অন্যকে শান্ত থাকিতে দিবে। এই পৃথিবী-ব্যাপী মহাযুদ্ধে আজ আমরা যুধ্যমান শক্তিসমূহের মধ্যে যে দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি সেই দৃশ্য ক্ষুদ্রতর আয়তনে ভারতবর্ষে বরাবরই থাকিবে। ইহাতে কোনও বুদ্ধি বা দূরদর্শিতার পরিচয় নাই। আজিকার এই ভয়ংকর সংহারমূর্তি দেখিয়াও যদি আমরা এই রহস্য না বুঝিতে পারি, আর এই দেশকে ঐ প্রকার সংহার হইতে রক্ষা করিবার উপায় ভাবিয়া না পাই, তাহা হইলে ইহা আমাদের লজ্জা ও দুঃখের কথা হইবে। গান্ধীজী এই চিন্তাধারা অনুসারে শুরু হইতেই অহিংসার উপর জোর দিয়াছেন। ভারতের মতো দেশের পক্ষে তাহার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

অহিংসাতত্ত্ব অতিশয় গহন। জীবনে ইহার প্রয়োগ বড়ই কঠিন। ইহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়াই লোকে ইহার শক্তি ও মর্যাদাকে হাসিয়া উড়াইতে চায়। তাহারা বলে, ইহার দ্বারা লোকে ভীরু হয়, এ পর্যন্ত সংসারে কোনও দেশ ইহাকে নিজের রাষ্ট্রীয় কর্মপদ্ধতিতে স্বীকার করে নাই। লোকে বলে, ইহার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। গতানুগতিক জনসাধারণের আর কথা কি, বড় বড় সমঝদার ও সংযমী পুরুষও ক্রোধকে দমন করিতে পারেন না। ক্রোধই তো হিংসার জন্মদাতা, অথবা দ্বিতীয় স্বরূপ। তাই এই নীতি কখনও প্রচলিত হইতে পারে না। ইহা অব্যবহার্য, ইত্যাদি।

এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে যে হিংসাতে কাপুরুষতা আছে, অহিংসাতে নাই। ভীরুতা আসিয়া গেলে আর অহিংসা থাকিল না। যদি আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় করি এবং ভয় করি বলিয়া তাহার ক্ষতি করিতে না চাই, তাহা হইলে ইহাতে অহিংসা

হয় কি করিয়া? তাহার ক্ষতি না করিবার প্রবৃত্তি কি ভয়ের জন্য, না ক্ষতি করা খারাপ বলিয়া? যে ব্যক্তি এইভাবে ভয়ে ক্ষতি করিতে না চায়, সে আজ সুযোগ পাইলে, কোনও প্রকারে অন্যের শক্তির সাহায্য পাইয়াও যদি তাহার ভয় দূর হইয়া যায় তাহা হইলেও, নিঃসংকোচে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবিলম্বে আক্রমণ করিবে, যথাসাধ্য তাহার ক্ষতি করিবে। ইহা কদাপি অহিংসা নহে। অহিংসা তাহার পক্ষেই সম্ভব যে অনুভব করিবে যে, ক্ষতিসাধন অন্যায়, অন্যকে দুঃখ দেওয়া অন্যায়, আর এই বিশ্বাসের জন্যই পীড়ন করিতে সংকুচিত হইবে। পীড়ন করিবার শক্তির উপর তাহার এই প্রবৃত্তি নির্ভর করে না। তাহার শক্তি যদি না-ও থাকে, আর এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া সে যদি পীড়ন করিবার কথা চিন্তা পর্যন্ত না করে, তাহা হইলেও উহার প্রবৃত্তি হইবে অহিংসাত্মক। আর যদি শক্তি সত্ত্বেও ক্ষতি করিতে প্রবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রবৃত্তি যে অহিংসার, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। মানুষ যখন এই প্রকারে ও এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া অন্যকে কষ্ট দিতে না চায়, তখন ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিপক্ষ যদি কিছু বাড়াবাড়ি ও জুলুমও করে, তবে উহা সহ্য করিবার তাহার অবশ্যই শক্তি থাকা চাই। কেহ যদি কোনও অন্যায় এইজন্য সহ্য করিয়া লয় যে, ঐরূপ না করিলে অন্যায়কারী আরও কষ্ট দিতে পারে, আর তাই বলিয়া মনকে শক্ত করিয়া তাহা সহ্য করিয়া লওয়াই ঠিক, তাহা হইলে উহা অহিংসার মনোবৃত্তি নহে, উহা ভীরুতা। আমি যাহা ঠিক ও ন্যায়সংগত মনে করিব তাহাই করিতে থাকিব—নির্ভয় হইয়া আপনার কর্তব্যে দৃঢ় থাকিব, অন্যায়কারী যতই জুলুম করুক-না কেন কিছুতেই কর্তব্যচ্যুত হইব না, অন্যায়কারীর উপর প্রতিশোধ লইবার চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া তাহার প্রতি কোনও বলপ্রয়োগ করিব না— ইহারই নাম অহিংস মনোবৃত্তি। যেখানে এইরূপে নিজের নির্ধারিত পথ হইতে আমরা সরিয়া যাই না, আপন পথে দৃঢ় হইয়া থাকি বলিয়া অন্যায়কারী যে জুলুমই করুক-না কেন তাহা সহ্য করিয়া লই, অথচ তাহাকে কষ্ট দিই না, সেখানে আমাদের আচরণ হয় প্রকৃত অহিংসাবাদী মানুষের মতো। ইহা হইতে স্পষ্ট হইতেছে যে, অহিংস কর্মে ভীরুতা নাই। তাহাতে কষ্ট সহ্য করিতে ভয় নাই। ইহা তখনই সম্ভব যখন নিজের পক্ষ ন্যায়সংগত বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহা সমর্থনের জন্য দৃঢ়সংকল্প আছে, বিপক্ষকে কষ্ট না দিবার সুচিন্তিত অভিপ্রায় আছে। পরিণামে অহিংস ব্যক্তিরই জয় হয়।

যদি বলা হয় যে এই প্রকারের সহ্যশক্তি মানুষের মধ্যে, বিশেষ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে, সৃষ্টি করা কঠিন, তাহা হইলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাহারা যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করে

তাহাদের মধ্যেও তো সাধারণ শ্রেণীর লোকই থাকে, যাহাদের এখানেই ছাড়িয়া দিলে ততটা বাহাদুরি দেখাইতে পারে না যতটা রণভূমিতে দেখায়। শুধু অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ফৌজের সিপাহির সাহসও অভ্যাস দিয়াই সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু সেই সাহস হইল ভয়কে অবলম্বন করিয়া; প্রতিপক্ষকে মারিতেই হইবে, না হইলে সে-ই যে মারিয়া ফেলিবে! প্রতিপক্ষের হাতে মার খাওয়ার ভয়ই সাহসিকতার এক প্রবল কারণ। তা ছাড়া, সমস্ত সংগঠিত সেনাবাহিনীর মধ্যে শাসনেরও ভয় তো আছেই। যে কথা তুলসীদাসজী মারীচের সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহা এখানেও খাটে "দুই দিকেই রহিয়াছে মরণের ভয়।" তবে লোকে এক-প্রকার স্বভাবত সাহসীও হয়। এই সাহস আসে বার বার অভ্যাস হইতে। অহিংসার সাহসও এইভাবে অভ্যাস করা প্রয়োজন।

অহিংসার অভ্যাস হয় অন্য প্রকারে। ফৌজের মধ্যে প্রত্যহ কুস্তি, কসরত, নিষ্ঠুরতাপূর্ণ শিকার ইত্যাদি করানো হয়; অহিংসার অভ্যাস ইহা হইতে একেবারে ভিন্ন। তাহার উপায় এককথায় বলিতে গেলে, সংযম। হিন্দুদের ও অন্য সকলের ধর্মে ও ধর্মগ্রন্থে যে-সব নিয়মের উল্লেখ আছে সেই সমস্ত নিয়মের ব্যাপক অর্থে এখানে 'সংযম' কথাটা প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাতে সাধারণ সদাচারের নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করিতে শেখানো হয়। এই সকল নিয়মের প্রবণতা হয় অহিংসা ও সত্যের দিকেই। গান্ধীজী বারবার লিখিয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস অহিংসার পক্ষে অতি বড় সহায়। এই অহিংসার প্রবৃত্তিকে যদি জাগ্রত ও পুষ্ট করিতে সময় দেওয়া যায়, শৈশব হইতেই অভ্যাস করানো যায় এবং এইদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অভয় ইত্যাদি অহিংসার যত মুখ্য বাহ্য রূপ দেখিতে পাই সে সব অবশ্যই লাভ করিতে পারা যায়। 'মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে', এ কথা বলার কোন ভিত্তি নাই।

এক সময় ছিল যখন সকল দেশে জনসাধারণের মধ্যে অল্প লোকই যুদ্ধকে বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করিত অথবা নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করিত, আর সাধারণ লোকে সেনাদল ও যুদ্ধ হইতে সরিয়া থাকিত। ভারতবর্ষে যুদ্ধ ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম বলিয়া মনে করা হইত। ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টও ভারতবর্ষে কোনও বিশেষ জাতি বা প্রদেশের লোকদেরই 'লড়িয়ে' বলিয়া গণ্য করিতেন এবং তাহাদের মধ্য হইতেই ফৌজে লোক ভর্তি করা হইত। কিন্তু বর্তমান যুগের বিধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, যুদ্ধের জন্য সকলকেই তৈয়ার করা যায়, আর যে দেশ এই কথাটার মর্ম যত তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারিয়াছে ও লোকদের যুদ্ধশিক্ষা দিবার যতটা সুবন্দোবস্ত করিয়াছে, সে দেশ তত শীঘ্র ও তত অধিক প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। হিন্দুস্থানেও এই মহাযুদ্ধে ভর্তির সময়

পূর্বের নিয়মই চলিত ছিল। যে-সব জাতি ও প্রদেশ যুদ্ধপ্রবণ বলিয়া প্রথমে মনে করা হয় নাই তাহাদের মধ্যেও অনেকে কিন্তু ভর্তি হইয়াছিল। এ কথা স্পষ্ট যে, আজকার সেনাবাহিনী যেমন সকল শ্রেণী ও বিভাগের লোক লইয়া গঠিত এবং বাহাদুরির সঙ্গে লড়িতে পারে, তেমনই অহিংসার সৈন্যদলও জনসাধারণ দিয়া তৈয়ারি করা যায়, বরং এই অহিংস সৈন্যদলে ভর্তির ক্ষেত্রে আরও অধিক বিস্তৃত হইতে পারে। সশস্ত্র সৈন্যের মধ্যে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, তাই বৃদ্ধ, অল্পবয়স্ক, শিশু ও অধিকাংশ স্ত্রীলোক তাহার যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। অহিংস সৈন্যের মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রী, এমন-কি, অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গও যোগ দিতে পারে; কারণ ইহাতে শারীরিক শক্তির ততটা প্রয়োজন নাই—মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মার বলই যথেষ্ট।

অহিংসক্রিয়ার এক অতি মহত্ত্বপূর্ণ ফল এই যে, ইহাতে যে যোগ দেয় সে নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনে। অন্যে যদি প্রতিদ্বন্দ্বীও হয় তাহা হইলেও সে কষ্ট ও দুঃখের ভাগী হয় না; কারণ অন্যকে কষ্ট দেওয়া অহিংস ব্যক্তির কাম্য নয়, আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে কষ্ট দিয়া সে নিজের অভীষ্ট কর্ম সাধন করিতেও চায় না। তাহার উদ্দেশ্য তো হইল, প্রতিদ্বন্দ্বীকেও নিজের বশে আনিয়া লওয়া, আর তাহা বলপ্রয়োগে নয়, নিজের প্রেমের প্রয়োগে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেও অনুরূপ ভাব জাগ্রত করিয়া। এইজন্য অহিংস কর্মে কষ্ট হয় সবচেয়ে কম। যেখানে বলপ্রয়োগ, সেখানে দুই পক্ষেরই কষ্ট। ইহাতে শুধু একপক্ষই নিজের উপর কষ্ট ডাকিয়া লয়। কষ্টের মাত্রা এইভাবে অর্ধেক হইয়া যায়। বরং এই মাত্রা অর্ধেকের চেয়েও কত কমিয়া যায়; কারণ যেখানে বিপক্ষ বলপ্রয়োগ দ্বারা কষ্ট দেয় না, সেখানে এপক্ষের হাতও দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহার হাতিয়ার ভোঁতা হইয়া যায়। বাহুতে বলপ্রয়োগের শক্তি বাড়ে অন্তরের ক্রোধ হইতে, আর বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিকার করিলে সেই ক্রোধ যতটা জাগ্রত হয় অহিংস প্রতিকারে তেমনটি হয় না। এইজন্য, যদি উভয় পক্ষের দুঃখকষ্টের হিসাব করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে অহিংসা কর্মে কষ্টের মাত্রা খুবই কম হইতে থাকিবে।

অহিংস কর্মে কোনও বিশেষ সাধন ও উপায়ের প্রয়োজন হয় না। আজকার যুদ্ধে নিত্য নূতন অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগ হইতেছে। আজ যতটা ধন ব্যয় হইতেছে তাহার অঙ্ক বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। এই যুদ্ধে আমেরিকা প্রতিদিন প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা খরচ করিয়াছে, আর ইংলণ্ড করিয়াছে প্রায় পনেরো ষোল কোটি টাকা। গরিব ভারতবর্ষও প্রতিদিন এক কোটি টাকা খরচ করিয়াছে। অন্য দেশের তো কথাই নাই। কিন্তু রুশ ও চীনের খরচেরও কিছু আন্দাজ এই-সব অঙ্ক হইতে করিতে

পারা যায়। এই-সব রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানি, ইটালি ও জাপান রোজ কত খরচ করে, তাহাও আমরা ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি। যে খরচ করা হইয়াছে এই-সব অঙ্কে তাহার কথাই বলা হইয়াছে। শত্রুদের কাণ্ডকারখানা হইতে প্রতিদিন যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব হয়তো ইহাতে নাই। এইভাবে নরহত্যাও বেহিসাবে হইয়াছে। আর, যুদ্ধ হইতে উৎপন্ন যে-সব দুঃখকষ্ট ঐ সকল যুধ্যমান দেশকে ভুগিতে হইয়াছে এবং যে-সব দেশ লড়াইয়ে যোগ দেয় নাই তাহাদের লোকদেরও খানিকটা ভুগিতে হইয়াছে, অঙ্কের দ্বারা তাহার কোনও হিসাবই হয়তো করা যায় না। অন্য পক্ষে অহিংস কর্মে বাহ্য সাধনের কোনও বিশেষ প্রয়োজন নাই, জনসাধারণের জীবনযাত্রায় কোনও বিপর্যয়ও আবশ্যক করে না। এইভাবে কষ্ট, অর্থব্যয়, রক্তপাত ও জনসাধারণের দুর্দশা— অহিংস ক্রিয়ায় এসমস্তই অনেক কম, প্রায় নাই বলিলেই চলে; বলপ্রয়োগে ইহাই আবার এত অধিক হইয়া উঠে যে তাহার হিসাব করা যায় না। এইজন্য গরিব দেশেও ইহার প্রয়োগ সহজে করা যায়, আর প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধেও দাঁড়ানো যায়।

ইহা তো হইল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে-সব সম্বন্ধ তাহাতে অহিংস আচরণের মাহাত্ম্য। যেখানে একই দেশে বিভিন্ন ধর্মের পূজক, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন মতবাদের লোকে বাস করে সেখানে যদি হিংসার শরণ লওয়া যায় তাহা হইলে সেখানকার লোকে একটা দিনও শান্তিতে থাকিতে পারে না। যদি ভারতের লোকে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বজায় না রাখে, একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা না দেখায়, নিজের অধিকারকেই মুখ্য মনে করিয়া অন্যকে তাহা স্বীকার করাইবার জন্য ব্যস্ত হয় অথচ অন্যের প্রতি নিজের কর্তব্য গৌণ মনে করিয়া তাহা পালনের জন্য সর্বদা চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সেরূপ মনোবৃত্তির ফলে দিন দিন খুনখারাবি বাড়িয়াই যায়, অন্য কিছু হইতেই পারে না। যতক্ষণ হিংসাপ্রবৃত্তি এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে চলে, ততক্ষণ দেশের রাষ্ট্রশক্তি পুলিশ ও আদালতের দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু যখন সেই প্রবৃত্তি জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় ও দেশের বিভিন্ন বিভাগে একে অন্যকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পুলিশ ও আদালত ব্যর্থ হয়, আর এই কলহ গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করে। ইহা হইতে বাঁচিতে হইলে অহিংস কর্মের উপর ভরসা রাখা ছাড়া অন্য কোনও পথ ভারতবর্ষের মতো দেশের থাকিতে পারে না।

এবিষয়ে আর একটা কথা মনে রাখা উচিত। যখন আমরা হিংসা অহিংসার কথা বলিতে থাকি এবং 'হিংসা তো আমাদের রোমে রোমে ভরিয়া আছে' একথা বলিয়া বসি, তখন আমরা কিরূপে আশা

করি যে উত্তেজনার সময় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করিয়া জনসাধারণ, অহিংস থাকিতে পারিবে? এইরূপভাবে কথা বলিবার সময় আমরা ভুলিয়া যাই যে, যদি কোনও ব্যক্তি বা জনসমূহের জীবনে প্রতিদিনের কাজকর্ম দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাহার মধ্যে হয়তো দুই-একটি এমন কাজ আছে যাহাতে হিংসার প্রয়োগ হইয়াছে। শতকরা নিরানব্বইটি কাজই এমন যে, বলপ্রয়োগ না করিয়া, হিংসার কিছু না করিলেই তাহা শেষ করা যায়। অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া বাকি শতকরা দুই-একটি কাজের সাধন-ব্যাপারে সর্বদা অহিংসভাবেই চলাফেরা করা এমন কিছু অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। হাঁ, চেষ্টা না করিলে বনের পশুর চেয়েও আমাদের জীবন খারাপ হইতে পারে।

চম্পারনে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, 'আমি নীলকরদের মন্দ হোক তা চাই না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দ্বারা যে জুলুম, বাড়াবাড়ি ও অন্যায় রায়তদের উপর হচ্ছে সে-সব বন্ধ করাব, এবং দুই পক্ষের মিত্র হয়ে থাকব।' খানিকটা তাহা হইয়াছিলও বটে। কারণ সব কিছু শেষ হইয়া গেলে সেই নীলকরেরাই গান্ধীজীর পাঠশালা খুলিবার কাজে ও অন্যপ্রকারে রায়তদের উন্নতির কাজে সাহায্য করিবার কথাও দিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও কাছে অল্পস্বল্প সাহায্যও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী দেশের অন্যকর্মে লাগিয়া গেলেন, এ কাজ আর অগ্রসর হইল না। তিনটি পাঠশালা অল্পদিন ধরিয়া চলিল। কিন্তু কিছুদিন পরে সবগুলি বন্ধ হইয়া গেল। একটি ছাড়া অন্য দুইটি পাঠশালার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

দেশ যদি অহিংসার পথ শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে ইহার প্রয়োগ বিপুল আয়তনে ইংরেজ সরকারের সম্বন্ধেও সম্ভব। কিন্তু আজ সংসারে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের পরেও— যেখানে হিংসার পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে— ইহাই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে মানুষমাত্রকেই যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় ও সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোনও না কোনও পথ বাহির করিতে হইবে যাহাতে রাষ্ট্রকে প্রতি বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে নিজেদের যুবকদের মাথা না কাটিতে হয়, মাতাদের শুধু নিহত হইবার জন্যই শিশুসন্তান প্রসব করিতে না হয়, ধনরাশি শুধু আগুনে পোড়াইবার জন্যই অথবা সমুদ্রগর্ভে ডুবাইবার জন্যই সৃষ্টি না করিতে হয়। আমি দেখিতেছি যে দেশের, কংগ্রেসীদের এবং কংগ্রেস-কর্মীদেরও— যাহারা অহিংসার সাহায্যেই আজ পর্যন্ত কাজ করিয়া আসিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মে সফল হইয়াছে, তাহাদেরও— ঐ অহিংসায় বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে।

হিন্দু-মুসলমান একতার বিষয়েও অনেকে বলিয়া বসেন যে, 'ইহা

কেবল শক্তির সাহায্যেই স্থাপিত হইতে পারে, ভ্রাতৃভাবের দ্বারা নহে'—অর্থাৎ জোর-জবরদস্তি করিয়া একপক্ষকে দাবাইয়া রাখা আবশ্যক। কোনও কোনও মুসলমান ভাবিয়া থাকেন, এখনকার তুলনায় অতি অল্প-সংখ্যক হইয়াও আমরা প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থানে শত শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছি, আজও আবার করিতে পারি। ঐরূপ হিন্দুও নিশ্চয় এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, আমাদের সংখ্যা এত অধিক; আমরা বিদ্যায়, ধনে, বলে, কোনও প্রকারেই মুসলমানদের চেয়ে কম নই, বরং বেশি অগ্রসর, আর এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ হয় নাই বলিয়া অল্প কয়েকজন মুসলমান রাজত্ব করিত; এখন হিন্দুজাতি জাগ্রত ও সংগঠিত হইয়া যাইতেছে; দেশ ছিল হিন্দুদের, অন্যেরা তো শুধু সংখ্যালঘু জাতিমাত্র; এইজন্য এদেশে অধিকার হিন্দুদেরই হওয়া উচিত— তবে মুসলমান ও অন্য সব সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্পূর্ণ সুবিচার হওয়া চাই।

এই দুই দল ভরসা রাখে নিজের নিজের বলের উপরেই। অহিংসার কথা, একমাত্র যাহা এই কঠিন সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহার কথা ইহারা একেবারে ভুলিয়া যায়। ক্রিয়া ও তাহার প্রতিক্রিয়া সাধারণ নৈসর্গিক নিয়ম। হিংসাত্মক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিংসাত্মক হয়। অহিংস ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয় অহিংস। এইজন্য এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান করিতে যদি আমরা হিংসাত্মক ভাবনা প্রয়োগ করিয়া হিংসাত্মক কার্য পর্যন্ত নামিয়া যাই, তাহা হইলে সমাধানের বদলে তাহা আরও জটিল হইয়া যাইবে। হাঁ, আমাদের ক্রিয়া প্রকৃত অর্থে অহিংস ক্রিয়া হওয়া চাই। তাহাতে ক্রোধ থাকিবে না, বলপ্রয়োগ থাকিবে না, ভয় থাকিলে চলিবে না, ভীরুতা থাকিলে চলিবে না। সত্য ও ন্যায়ের উপর ভরসা ও নিষ্ঠা, প্রকৃত অহিংস কর্মেরই প্রয়োগ। হইতে পারে, এই ধরনের অহিংস কর্মের ফল শীঘ্র ও সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু যদি আমাদের আচরণ আত্মবিশ্বাস, সত্তা ও সাহসের ভিত্তিতে হয়, আত্মলাঘব, ভয় ও ভীরুতার ভিত্তিতে নয়, তাহা হইলে ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার কথা লইয়া অহিংসার বিষয়ে অনেক কিছু লিখিলাম। এ আলোচনা কোথাও না কোথাও করিতেই হইত—না হয় এখানেই করা গেল; বোধ করি, অসংগত হয় নাই।

এই বৎসর আশ্বিন মাসে ছাপরা জেলায় একদিন খুব বৃষ্টি হইল—২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩৬ ইঞ্চি বৃষ্টি। ফলে সমস্ত জেলা জলে ডুবিয়া গেল, ভয়ানক বন্যা হইল। দাদা লোকসেবায় বরাবর নিযুক্ত থাকিতেন। এই সুযোগে তিনি লোকদের সাহায্যের জন্য খুব পরিশ্রম করিয়া সেবার কাজ করেন।

ছাপরা শহরে এই বানের জন্যে লোকদের খুব কষ্ট সহিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা জিনিস দেখিতে পাওয়া গেল, যাহার উল্লেখ করা এখানে অসংগত হইবে না। স্থানীয় সরকারি কর্মচারীগণ লোকের দুঃখকষ্টে খুব উদাসীন ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষার ভাব; তাহাতে লোকদের মধ্যে খুব অসন্তোষ হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, যখন জলের তোড়ে লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল, তখন কয়েকজন অফিসার নৌকায় চড়িয়া জল লইয়া খেলিতেছিল। ক্লান্ত মুহ্যমান লোকদের, এমন-কি স্ত্রীলোক ও শিশুদের বাঁচাইবার জন্যও, তাহাদের মধ্যে বেশির ভাগই সাহায্য করে নাই; বরং সেখানকার ইংরেজ জজ ও বাঙালী সবজজ সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কালেক্টর, পুলিশ অফিসার ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নড়িয়াও বসেন নাই। এই কথা লইয়া ছাপরায় সাধারণ সভা ডাকা হয়, তাহাতে ইঁহাদের খোলাখুলিভাবে নিন্দা করা হয়, আর যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে, বিশেষ করিয়া বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ ও কংগ্রেসকর্মীদিগকে, খুব প্রশংসা করা হয় ও তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

মফস্বলেরও এই অবস্থা। এক জায়গায় একটা মজার ব্যাপারও হইয়া গেল। ছাপরায় মশারু হইতে যে রেলের লাইন আসিতেছে তাহা কাটিবার জন্য লোকে কলেক্টরকে খুব ধরে; কিন্তু তিনি সে কথায় মোটে কান দেন নাই। পরে ঐ লাইন ভাঙিয়া গেল। অথবা আমরা যেমন পরে শুনিয়াছি, কেহ আগে উহা একটুখানি কাটিয়া ফেলে, পরে জলের তোড় নিজেই অনেকখানি মাটি কাটিয়া লম্বা-চওড়া এক বড়ো গর্ত করিয়া লয়। এই প্রসঙ্গে দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সীউয়ান হইতে পশ্চিমে এক জায়গায় অনেকটা জল জমিয়া গিয়াছিল। গাঁয়ের লোকেরা রেলের লাইন কাটিয়া ফেলিতে চাহিল; কিন্তু সশস্ত্র পুলিশের পাহারা ছিল। প্রথমটায় তাহাদের সাহস হইল না, কষ্ট সহ্য করিয়াই থাকিল। কিন্তু যখন কষ্ট সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল তখন গাঁয়ের দুই-চার জন লোক বাঁধে কোদাল লইয়া জলে

সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে লাইনের দিকে আসিল। পুলিশের লোকেরা উহাদের দেখিয়া ধমক দিল। তাহারা জবাব দিল, "আমরা জলে ডুবে মরছি আর তোমরা লাইন কাটতে দিচ্ছ না! এপর্যন্ত আমরা বরদাস্ত করেছি, এখন আর পারি না। দুই অবস্থায়ই মরতে হবে, ডুবেই মরি আর গুলি খেয়েই মরি। আমরা ঠিক করেছি, গুলি খেয়ে মরাই ভালো। তাই আমরা লাইন কাটবই, মারো তোমরা গুলি।"

এই বলিয়া তাহারা লাইন কাটিতে লাগিল। পুলিশের সাহস হইল না যে গুলি চালায়। লাইন কাটা হইল। জল বাহির হইয়া গেল, বহু গ্রাম রক্ষা পাইল। শুনিয়াছিলাম যে পুলিশের লোকেরা রিপোর্ট করিয়াছে, লাইন জলে ভাসিয়া গিয়াছে, কেহ কাটে নাই! সেখানে এখন এক প্রকাণ্ড পুল হইয়াছে। লাইনের উত্তরের গাঁয়ে জল আটকাইয়া থাকে না বলিয়া তখন হইতে আর বান হয় না।

দ্বিতীয় ঘটনা, দরৌলি থানার ভিতরে কোনও গ্রামের। জেলাবোর্ডের রাস্তা হইল উঁচু। এইজন্য রাস্তা জলকে আটকাইয়া রাখে, রেল-লাইনের মতো। গাঁয়ের লোকেরা দারোগার নিকটে গিয়া বলিল, "রাস্তাটা কাটিয়ে দিন, অনেকগুলো গাঁ বেঁচে যাবে।" তখনকার দিনে গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হইয়া গিয়াছিল। থানার সমস্ত গ্রাম মিলিয়া থানা-কমিটি করা হইয়াছিল। থানা-কমিটির প্রধান কর্মীকে, তিনি থানা-কমিটির সভাপতিই হউন আর সম্পাদকই হউন, লোকে ডাকিত 'স্বরাজী দারোগা' বলিয়া। জানি না লোকে এ নাম কেমন করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ইহা বহু স্থানে প্রচলিত হইয়া পড়ে। সরকারি দারোগা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "আমার কাছে এসেছ কেন, স্বরাজী দারোগার কাছে কেন যাও না!" ছাপরাতেও কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এইরূপই বলিয়াছিল, "সাহায্যের জন্য আমার কাছে এসেছ কেন, গান্ধীর কাছে যাও!" ছাপরার লোকেরা গান্ধী—অর্থাৎ কংগ্রেসের লোকদের কাছে— সাহায্য পাইয়াছিল। দরৌলি থানার গ্রাম্য লোকেরাও থানার কংগ্রেসের সম্পাদকের নিকটে আসিয়া দারোগার সঙ্গে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা শোনাইল। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দারোগা যদি এ কথা বলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তবে আমি বলছি, যেখানে দরকার মনে করবে, রাস্তা কেটে ফেলো, যাতে জলটা চলে যায়। কিন্তু সাবধান, দরকার না হলে রাস্তাটা নষ্ট করো না।" লোকেরা তাহাই করিল। রাস্তা কাটিয়া জলটা সরাইয়া দিল।

আমিও সেবার কাজে জুটিয়া গেলাম। কিন্তু আমি যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন ছাপরা শহর হইতে জলটা সরিয়া গিয়াছিল। গোলদারদের গোলায় যে ধান জলে পড়িয়া পচিয়া গিয়াছিল, তাহার দুর্গন্ধে এ-সব মহল্লায় হাঁটা ছিল কঠিন। আমি অর্থসংগ্রহে ও অন্যান্য সাহায্য-

কর্মে কিছুটা যোগ দিলাম। আমার এই ধরনের সেবার প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই ছিল। ১৯১৪ সালের বন্যায় আমি কলিকাতা হইতেই সাহায্য করিবার কাজ শৃঙ্খলার সহিত আরম্ভ করিয়াছিলাম। গান্ধীজীর সংস্পর্শ-গুণে এই প্রবৃত্তি আরও খানিকটা দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। যখন নিজের প্রদেশে কোথাও কখনও বন্যা আসে, তখন আমি কিছু-না-কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করি। ১৯২৩-এ শাহাবাদে শোণের ভয়ংকর বন্যা আসিল। আমি তখন পতাকা সত্যাগ্রহের কাজে নাগপুর গিয়াছিলাম। খবর পাইয়াই সেখান হইতে চলিয়া আসি। এইভাবে দারভাঙা জেলার মধুবনী সার্বডিভিসনে ভয়ংকর বন্যা হইলে সেখানেও সাহায্যের জন্য যাইতে হইয়াছিল। এই-সব জায়গায় খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আরায় পৌঁছিতে খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ কৈলোয়ার ও আরার মাঝখানে রেললাইন— খুব উঁচু করিয়া তৈরি— একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল, তাহার বাঁধে এক-এক জায়গায় দেড় শো-দুই শো ফুট চওড়া জায়গা ফাঁক হইয়া গিয়াছিল। নীচের রাস্তা একেবারে জলে ডুবিয়া ছিলই। লাইনের পাটাতনের নীচের বাঁধ তো কাটিয়াই দেওয়া হয়; উপরের লোহার পাটাতন, কোথাও কোথাও কাঠের পাটাতনও, যাহার উপর লোহার লাইন জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা ঝুলিতেছিল। নীচে কোথাও জল জোরে বহিয়া যাইতেছিল, কোথাও কুণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত জল জমিয়াছিল। এই-সব ফাঁকা জায়গা পার হইবার একমাত্র উপায় ছিল ঐ-সব পাটাতনের উপর দিয়া কোনও রকমে হাঁটিয়া বা ঝুলিয়া পার হওয়া! আমার সঙ্গে প্রফেসর আবদুল বারি ছিলেন। আমরা দুই জন এই সব পাটাতনের উপর কোথাও গুঁড়িসুড়ি মারিয়া চতুষ্পদ জন্তুর মতন, কোথাও হাত দিয়া ধরিয়া নীচে বাঁদরের মতো ঝুলিতে ঝুলিতে, ফাঁকগুলি পার হইয়া আরাতে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে গিয়া সাহায্যের কাজ গুছাইয়া লইলাম। এই-সব সময়ে টাকার অভাব হয় নাই। আবেদন জানাইলে লোকে টাকা পাঠাইয়া দিত। বিশেষ করিয়া গান্ধীজীর সম্পর্কের জন্য গুজরাটী ভাইদের কৃপা ছিল। বোম্বাই ও গুজরাট হইতে পয়সা আসিয়া যাইত। শেঠ যমুনালাল বাজাজের সর্বদা এ বিষয়ে দৃষ্টি ছিল। প্রায় সর্বত্র নৌকায় চড়িয়া দূর দূর জায়গায় যাইতে হইত; কারণ অন্য কোনও যান চলাচল করিতে পারিত না। মধুবনী অঞ্চলে এক জায়গায় কমলা নদী নৌকা করিয়া পার হইতে হইত। নদীর স্রোত খুব প্রবল ছিল। নৌকা খুব কষ্টে ওপারে পৌঁছিতে পারিয়াছিল।

ছাপরাতেই হউক, শাহাবাদেই হউক, দারভাঙাতেই হউক, সর্বত্র একই দৃশ্য দেখিলাম। পল্লীগ্রামের ঘর বিশেষ করিয়া মাটিরই হইয়া থাকে,

তাহা পড়িয়া গিয়াছে দেখিলাম। ঘরে যা-কিছু ধান সব পচিয়া আছে। গোরু মহিষ মরিয়া জলে ভাসিতেছে, আর লোকদের দেখিলাম ক্ষুধায় ক্লান্ত। গ্রামের কুকুরও ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া ধুঁকিতেছে! মহিষও তেমনই ক্ষুধায় বোবা হইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে! বান নামিয়া গেলে পর অসুখের—বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়ার—প্রকোপ! কয়েক দিন পরে, রবিশস্য (বৈশাখী) বুনিবার সময় বীজের অভাব ও চারদিকে তাহার চাহিদা! আমার মনে আছে, ছাপরায় বানের পর যখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িল তখন আমরা ছাপরার ডাক্তারদের একত্র করিলাম। সকলে মিলিয়া এক মিক্সচার তৈরি করিল, তাহাতে ম্যালেরিয়া ছাড়া পেট পরিষ্কার রাখিবার ও মামুলি কাশি বন্ধ করিবারও ঔষধ ছিল। আমরা ইহা বেশি পরিমাণে তৈয়ার করাইলাম এবং বোতলে ভরিয়া সমস্ত জেলায় বিলি করাইলাম। ইহার ফল খুব ভালো হইল। ডাক্তার ছাড়াই আমরা নিজেদের কংগ্রেসী কর্মীদের দিয়া ঔষধ বিলি করিয়া অনেক রোগী আরাম করিলাম। ঔষধ যে খুব কাজের তাহা প্রমাণিত হইল। পরে যেখানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হউক-না, আমরা অনেক দিন ধরিয়া ঐ মিক্সচার চালাইতাম।

শাহাবাদে, গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে, যেখানে বন্যার খুব প্রকোপ ছিল সেখানে রবিশস্যেরই ফসল হইত। সেখানে বীজের খুব প্রয়োজন ছিল। আমার মনে আছে, আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া বীজের জন্য টাকা বিলি করিতাম। কর্মীরা প্রথম হইতেই, যাহারা বীজ চাহিত তাহাদের ফিরিস্তি করিয়া রাখিত। আমরা দুই-তিন জন লোক টাকা লইয়া এক দিন গাঁয়ে গিয়া উপস্থিত হইতাম। সকলে সেখানে একত্র সমবেত হইত। ফিরিস্তির তদন্ত হইত প্রকাশ্য সভায়, সেখানেই টাকাটা ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। আরাতে যখন বান হয়, তখন তাহার প্রভাব ছাপরা জেলার উপরও পড়িয়াছিল; কারণ গঙ্গাতেও বান ছিল, আর শোণের জল গঙ্গা টানিতে পারিতেছিল না। ফলে সংগমের কাছে কয় ক্রোশ ধরিয়া দুই নদীর জল একত্র হইয়া গেল, আর গঙ্গার অপর পারেও ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হইল। সেখানেও সাহায্যের চেষ্টা করা গেল। যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার একভাগ ছাপরাতেই খরচ হইল; কিন্তু আমি আরায় কর্মব্যস্ত ছিলাম বলিয়া, কাজ করিতে পারি নাই। স্থানীয় লোকেরাই কাজ চালাইয়া লইল, ইহাদের মধ্যে আমার দাদা ছিলেন অগ্রণী।

উপরে বলা হইয়াছে যে রেল-লাইনের জন্য বন্যার ভয়ংকরতা বাড়িয়া যাইতেছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের প্রদেশে যত ভয়ংকর ও প্রচণ্ড বান আসিয়াছে, সে সমস্তগুলির বিষয়েই আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা

আছে। আমার দৃঢ় মত এই যে রেলওয়ে লাইন আর জেলা-বোর্ডের অন্যান্য উঁচু রাস্তা বন্যার কারণের মধ্যে প্রধান। যদি ইহাদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যায় চওড়া পুল তৈরি করা থাকিত তবে এই-রূপ অবস্থা হইত না। আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি যে লাইনের এক এক দিকে সাত-আট ফুট গভীর জল, অন্য দিকে দুই-এক ফুটও হয় কি না সন্দেহ। জল যদি সুবিধা পায় ও অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া যায়, তবে স্বভাবত তাহার গভীরতা কমিয়া যায় ও স্রোতও ক্ষীণ হয়। কিন্তু যখন ঐ জলকে সংকীর্ণ রাস্তায় বাহির হইতে হয় ও উহা সামনের বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইতে পারে না, তখন স্বভাবত উহা জমা হইয়া থাকে, কোনও দিক দিয়া বাহির হইতে পারিলে তাহার বেগ হয় খুব প্রবল। এইজন্য ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, গভর্নমেণ্টের এ বিষয়ে মন দেওয়া উচিত। কিন্তু এদিকে তো লাভের প্রতিই রেল-কোম্পানির অধিক দৃষ্টি, পুল তৈরি করিবার জন্যই তাহাদের বাধ্য করানো যায় না, লাইন কাটা তো দূরের কথা। কতবার বন্যায় লোকদের ভয়ানক কষ্ট সহিতে হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তো শাহাবাদের প্রবল বন্যার পর কৈলোয়ার হইতে আরার মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পুল তৈরি করিয়া দিয়াছে। এইভাবে সেখানকার লোকের ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন যে সরকারি রাস্তা তৈরি হইয়াছে তাহাতেও ঐভাবে জল বহিয়া যাওয়ার জন্য কয়েকটা পুল ও রাস্তার নীচের ছোটো সাঁকো তৈরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বি. এন. ডব্লিউ. রেলওয়ে (এখন নাম বদল হইয়াছে) এ ব্যাপারে খুব কৃপণতা দেখাইয়াছে। যদিও তাহার পর কয়েক জায়গায় পুল তৈরি করিয়া দিয়াছে, তথাপি এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পুলের প্রয়োজন। তাহারা যে পুল তৈরি করিয়াছে, তাহা সাধারণের কষ্ট দূর করিবার চিন্তায় নয়, নিজেদের আয়বৃদ্ধির ভাবনায়; কারণ যতক্ষণ শুধু সাধারণের কষ্ট দূর করিবার ব্যাপার ছিল, ততক্ষণ কোনও কথাই শোনে নাই; কিন্তু যখন প্রকৃতি আসিয়া লাইন এমনভাবে ভাঙিয়া দিল যে মাসের পর মাস রেল চলা বন্ধ থাকিল, তখন বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুল তৈরি করিতে হইল। যখন ও লাইন গভর্নমেণ্টের হইয়া গিয়াছে, তখন আশা করা যাইতে পারে যে এদিকে হয়তো আরও দৃষ্টি পড়িবে। আমরা শুনিয়াছি, সরকারি কর্মচারীরাও বলিতেছেন যে, এই লাইনের মালিক জবরদস্ত, তাঁহাদের একটা কথাও শোনে না। জেলা-বোর্ড ও পি. ডব্লিউ. ডি.-রও এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

এই-সব ঘটনার আমি একই স্থানে উল্লেখ করিলাম, যদিও এগুলি ঘটিতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল।

একদিকে দেশে জোর অসহযোগ আন্দোলন, অন্য দিকে গভর্নমেণ্ট ও সরকারি পক্ষের লোকেরা যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজনে ব্যস্ত। মনে হইতেছিল, এই অবস্থায় সংঘর্ষ না হইয়া যায় না।

অক্টোবরের প্রথম দিকে বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল। তাহাতে স্থির হইল যে, নভেম্বরের প্রথম দিকে দিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির বৈঠক ডাকা হইবে। এই বৈঠক বিশেষ করিয়া সত্যাগ্রহ শুরু করিবার প্রশ্ন বিচারের জন্য রাখা হইবে। কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিজয়-রাঘবাচারী ও সম্পাদক পণ্ডিত মতিলালজী উভয়ের মধ্যে কিছু মতভেদ হইল। সভাপতি ঘোষণা করিলেন, দিল্লিতে যে বৈঠক হইবার কথা ছিল, তাহা হইবে না। সম্পাদক ঘোষণা করিলেন, 'ওয়ার্কিং কমিটির ব্যবস্থা রদ করিবার অধিকার সভাপতির নাই; আর যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচার করিবার জন্য এই বৈঠক ডাকা হইয়াছে, সেই কারণে ইহা স্থগিত রাখা যাইতে পারে না।' মহাত্মাজীও পণ্ডিতজীর সঙ্গে একমত। অব-শেষে দিল্লিতে বৈঠক হইল। শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারী আসিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে লালা লাজপত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। আমি ছাপরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়া রহিলাম, যাইতে পারিলাম না।

বোম্বাইতে যে-সব লোক একত্র হইয়াছিল তাহারা একপ্রকার ফতোয়া সম্বন্ধে ঘোষণা প্রকাশ করিয়া ব্যক্তিগতরূপে সত্যাগ্রহ করিয়াই গিয়াছিল। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, অনেক বড়ো বড়ো সভায় উহার পুনরাবৃত্তি করা হইল। ওয়ার্কিং কমিটি ইহাও স্থির করিয়া দিয়াছিল যে, যেখানে যেখানে বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও খাদিপ্রচারের কার্যে সরকারের তরফ হইতে বাধা উপস্থিত করা হইবে কংগ্রেসকর্মী—যদি সে চরকা চালায় ও খাদি পরে—নিজের প্রদেশের প্রাদেশিক কমিটির আদেশ লইয়া সেই সরকারি বাধাকে অবহেলা করিতে পারিবে। দিল্লির নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি স্থির করিল যে, প্রাদেশিক কমিটিগুলি নিজের নিজের প্রদেশে যেখানে উচিত মনে করিবে সেখানে সত্যাগ্রহের অনুমতি দিতে পারিবে। কর বন্ধ করাও এই সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অনুমতির শর্তের মধ্যে ছিল, অসহযোগের সব শর্ত পূর্ণ হওয়া চাই; অর্থাৎ, খাদি পরিতে হইবে; হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্বীকার করিতে হইবে, অস্পৃশ্যতা ছাড়িতে হইবে, ইত্যাদি। এইভাবে কোনও অঞ্চলের অনুমতি পাইবার

শর্ত ছিল—ঐ অঞ্চলে বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন, সেখানকার জনসাধারণ দ্বারা স্বদেশী বস্ত্র ও খাদি গ্রহণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, জাতীয় শিক্ষার প্রচার, ইত্যাদি। এই-সব শর্তের মধ্যে কোনও কোনওটি ছাড়িয়া দিবার অধিকার ওয়ার্কিং কমিটিকে দেওয়া হইল। ইহা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, কোনও সত্যাগ্রহীর পরিবারের ভরণপোষণের ভার কংগ্রেসের উপর থাকিবে না, অহিংসাতে বিশ্বাস সকলের পক্ষে আবশ্যক এবং সত্যাগ্রহ হইলে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হইবে না। কিন্তু সত্যাগ্রহের শর্ত এত কঠোর ছিল যে, কোনও ব্যক্তির বা অঞ্চলের পক্ষে তাহা পালন করা অত্যন্ত দুরূহ। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বোঝা গেল যে, সত্যাগ্রহ তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা হইবে না, আর যদি অন্য সমস্ত প্রদেশ আয়োজন করিতে লাগিয়া যায় তথাপি তাহারা গুজরাটের জন্য অপেক্ষা করিবে; সেখানে বিস্তর আয়োজন হইতেছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে বিহারেও আয়োজন চলিতেছিল। ছাপরা জেলার লোকেরা চাহিতেছিল যে, বসন্তপুর থানায় সত্যাগ্রহের অনুমতি যেন পাওয়া যায়। খাদি প্রচার ও অন্যান্য উপায় দ্বারা লোকেরা যে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও বোঝা যাইতেছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কয়েকজনকে পরীক্ষা করিতেও পাঠাইলেন; ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, মৌলবী মহম্মদ শফী সাহেব। তাঁহারা এই অঞ্চলকে প্রস্তুত বলিয়া মনে করিলেন।

যখন এই-সব কথা চলিতেছে, তখন নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি, যুবরাজ বোম্বাইয়ে আসিয়া পেঁাছিলেন। সরকারের দিক হইতে অভ্যর্থনার আয়োজন, জনসাধারণের দিক হইতে বর্জনের। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই এক মত। তাহারা একত্র হইয়া বর্জননীতির পোষকতা করিতেছিল। কিন্তু কয়েকজন পার্শী অভ্যর্থনায় যোগ দিল। বর্জন সম্পূর্ণ সফল হইল। যখন কয়েকজন পার্শী অভ্যর্থনা করিয়া ফিরিতেছিল, তখন কংগ্রেসীদের সঙ্গে ঝগড়া হইল। কংগ্রেসীদের মধ্যে মুসলমানেরাই বেশি অগ্রসর হইয়াছিল। খুব হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া গেল। আরম্ভ তো করিল হিন্দু-মুসলমান, পরে পার্শী ও খ্রীষ্টানেরা ইহাকে চালু রাখিল। দৈবক্রমে গান্ধীজী তখন বোম্বাইতেই ছিলেন। তিনি প্রথমে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শেঠ উমর শোভানী, শেঠ ছোটানী, শংকরলাল ব্যাঙ্কার প্রভৃতিকে দাঙ্গা থামাইবার জন্য পাঠাইলেন। পরে যেখানে মারপিট হইতেছিল, নিজে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কয়েক দিন পরে দাঙ্গা কোনও মতে শান্ত হইল। এইজন্য গান্ধীজীকে উপবাসও করিতে হইল। এই দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক মারা গেল, তিন শতের বেশি আহত হইল। হতাহতের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশের বেশি ছিল কংগ্রেসী। এই দাঙ্গার প্রভাব তাঁহার মনের উপর পড়িল।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বোম্বাইতে হইল। সেখানে তিনি জোর দিয়া বলিলেন যে সর্বত্র সত্যাগ্রহ করিলে ক্ষতি হইবে; কারণ এ পর্যন্ত লোক অহিংস সংগ্রামের ধরন ও নীতি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই। এজন্য ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিলেন এবং প্রাদেশিক কমিটি আদেশ দিলেন যে, শান্তিরক্ষার জন্য ও জনসাধারণের ভিড় সামলাইবার জন্য সংঘবদ্ধ সেবকের প্রয়োজন, এইজন্য সকল কমিটি যেন সেবকদল গঠন করে— তাহারাই সেবক হইতে পারিবে যাহারা শপথ করিবে যে 'কর্মণা মনসা বাচা', অহিংস থাকিবে এবং কংগ্রেসের অনুশাসন মানিবে। মনে করা হইয়াছিল যে এইরূপ সংগঠিত সেবকদল প্রস্তুত থাকিলে বোম্বাইয়ের মতো দুর্ঘটনা হইবে না। বোম্বাইতে গান্ধীজীর উপবাসের ফলে শুধু দাঙ্গাই থামে নাই, সেখানকার সব জাতির লোক নিজেদের মধ্যে একতার ভাব বাড়াইবার জন্য একপ্রকার প্রতিজ্ঞাও করিল। এইভাবে দেশময় শান্তিস্থাপনের চিন্তা ছড়াইয়া পড়িল।

শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসাণ্ট শুরু হইতেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বিরোধিতা করিতেছিলেন। একবার তিনি এ পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন যে— 'Gandhiji represents the forces of darkness'—অন্ধকারের শক্তির প্রতিনিধি তিনি! বোম্বাইয়ের দাঙ্গার পরে তিনি খুব কড়া প্রবন্ধ লেখেন। কোনও দাঙ্গার সম্বন্ধে তিনি এ পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন যে, ইটপাথর ছোঁড়ার জবাব গভর্নমেণ্ট গুলি দিয়াই দিতে পারেন। ওয়ার্কিং কমিটির সময়েও তাঁহার ঐরূপ এক লেখা বাহির হইয়াছিল। আমার মনে আছে, দেশবন্ধু দাশ সংবাদপত্রের সেই সংখ্যা নিজের হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন। মহাত্মাজীকে তিনি বলিলেন, "আশা করি ইয়ং ইণ্ডিয়ার আগামী সংখ্যায় এর স্পষ্ট ও তীব্র আলোচনা দেখতে পাব।" মহাত্মাজী উত্তর দিলেন, "এমন আশা করবেন না।" আমরা দেখিয়াছি, গান্ধীজী এরূপ গালিগালাজের ফাঁদে পড়েন নাই। এই ধরনের লেখা তিনি হয়তো পড়েনই নাই। তাই তাঁহার লেখার মধ্যে কটুতা আসে না। অত্যন্ত কড়া কথাও তিনি চোস্ত অথচ সংযত ভাষায় বলিয়া ফেলেন। তাঁহার সঙ্গলাভের গুণেই আমিও নিজের আশৈশব কলহভীরু স্বভাবকে অধিক দৃঢ় করিতে পারিয়াছি— নিজের লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে কটুতা যাহাতে না আসে যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করি।

বোম্বাইতে যুবরাজ নামিবার সময়ে যাহা ঘটিল তাহাতে সারা দেশে উত্তেজনা দেখা দিল। গভর্নমেণ্টও স্থির করিয়া লইলেন যে দমননীতির প্রয়োগ করিবেন। এইজন্য এখন যেখানে সেখানে ধর-পাকড় চলিতে লাগিল। ডিসেম্বরের কয়েকদিনের মধ্যেই, প্রায় সর্বত্র একসঙ্গে কংগ্রেসের অনেকের—বিশেষ করিয়া বড়ো বড়ো নেতাদের—ধর-পাকড় শুরু হইয়া গেল। এই-সব ধর-পাকড়ের বিশেষ কারণ এই যে, গভর্নমেণ্ট সেবকদল-গুলিকে বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১৯০৮-এ দুইটি আইন তৈরি হয়। তখন অনেক জায়গায়, বিশেষত বাংলায়, বিপ্লবীর দল কাজ করিতেছিল, তাহাদের সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট বলিতেন যে, তাহারা বোমা তৈরি করিতেছে—সরকারি কর্মচারীদের বোমা ও গুলি মারিতেছে ইত্যাদি। তাহাদের দাবাইবার জন্য ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট (Criminal Law Amendment Act) পাশ হয়। সিডিশাস মিটিংস অ্যাক্ট (Seditious Meetings Act) নামে অন্য এক বিদ্রোহী সভা নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ করিবার জন্য তৈরি করা হয়। গভর্নমেণ্টের কথা অনুসারে এই দুই আইন প্রবর্তনের কারণ ছিল হিংসাত্মক দলের চেষ্টা, কিন্তু এই সময়ে যদিও কংগ্রেস সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিষ্ঠান ছিল, আর তাহার সেবাদলও ঐরূপই অহিংস দল, তথাপি গভর্নমেণ্ট সেই পুরানো আইনই সমস্ত প্রদেশে—যেখানে উহা প্রথমে প্রবর্তিত হয় নাই সেখানে—প্রবর্তিত করিয়া দিলেন। পাঞ্জাব, দিল্লি, বঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের শাসনতন্ত্র সেবকদলগুলিকে যাহারা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রদেশে সংঠিত হইয়াছিল—একে একে 'অবৈধ' ঘোষণা করিলেন। এই-ভাবে খিলাফত সেবকদল ও কংগ্রেস সেবকদলে যোগ দেওয়াই দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইল। সভা ডাকাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

কংগ্রেস কমিটিগুলি স্থির করিল, আমরা এই আইনের জুলুম মানিব না। তাহারা সেবকদল সংগঠিত করিবার জন্য জোর দিয়া কাজ করিতে লাগিল। এইজন্য যে কেহ সেবকদলে যোগ দিত অথবা তাহা সংগঠিত করিবার জন্য কাজ করিত, তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত। দেশের সামনে সরকার এক নূতন প্রশ্ন আনিয়া দিলেন। আমাদের সামনে এখন আর খিলাফতের কথা, পাঞ্জাবের কথা, স্বরাজপ্রাপ্তির কথাও থাকিল না। এখন প্রশ্ন হইল এই যে, আমাদের নিজেদের দেশ সংগঠন করিবার—পরস্পর মিলিয়া জুলিয়া কাজ করিবারও—অধিকার থাকিবে কি না।

সরকার এই স্বত্বও আইন-কানুন প্রবর্তন করিয়া হরণ করিয়া লইলেন। এখন কংগ্রেসের সর্বপ্রথমে ইহার জন্য লড়াই করা দরকার হইয়া পাড়ল। গান্ধীজী বলিলেন, 'এই লড়াইয়ে আমরা যে সত্যাগ্রহ করিতে চাই তাহা করিতেছি না—এখন শুধু কথা বলিবার স্বাধীনতা ও সম্মেলনের স্বাধীনতার জন্যই লড়িতেছি—এই স্বাধীনতা আমরা শুধু কংগ্রেস কমিটি ও খিলাফত কমিটির জন্য চাই না—আমরা এই অধিকার চাই সকল প্রতিষ্ঠান ও সকল ব্যক্তির জন্য, এইজন্য এ লড়াই সকলের জন্য এবং সকলের তরফ হইতে। কিন্তু সরকার কখনও কথা শুনিবার পাত্র? দমননীতি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলীভাই প্রভৃতি করাচির মকদ্দমার সময় হইতেই গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ড পাইয়াছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল, লালা লাজপত রায়, মোলানা আজাদ, শ্রীরাজাগোপালাচারি প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতা গ্রেপ্তার হইয়া গেলেন। হাজারে হাজারে অন্যান্য কংগ্রেসকর্মীকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু যেখানে যেখানে যুবরাজ যান, সেখানেই তাঁহাকে বর্জনের ব্যবস্থা আরও দৃঢ়ভাবে হইতে লাগিল। তাঁহার কলিকাতায় যাওয়ার দিন কাছে আসিল, লর্ড রীডিং চিন্তিত তো ছিলেনই; তাঁহার আইনসচিব ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু। কিভাবে মীমাংসা করা যায় যাহাতে কলিকাতায় যুবরাজের যথোচিত অভ্যর্থনা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই চেষ্টায় অগ্রণী হইলেন মদনমোহন মালব্যজী। তিনি কলিকাতায় গিয়া সেখানকার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের সহিত দেখা করিলেন; দেশবন্ধু দাশের সঙ্গেও দেখা করিলেন; দেশের কয়েকজন কংগ্রেসী ও খিলাফতের নেতাদের সঙ্গেও—যাঁহারা কারাকক্ষের বাহিরে ছিলেন—কথাবার্তা বলিলেন। ভাইসরয় লর্ড রীডিং-এর নিকটে এক ডেপুটেশন লইয়া যাওয়ার কথা হইল। দেশবন্ধু দাশ ছিলেন কলিকাতা জেলে। তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হইল। মনে হইতে লাগিল, এবার বুঝি কথাবার্তা ঠিক হইয়া যাইবে।

বিহারেও গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল। প্রাদেশিক কমিটির বৈঠক ছাপরায় হইল। বৈঠকের সময়ই পুলিশ সেখানকার কমিটির অফিস খানাতল্লাস করিল। যখন আমরা এক সর্বজনীন সভায় যোগ দিয়াছি, তখন পুলিশের আয়োজন দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল যে আমাদের সেখানেই গ্রেপ্তার করা হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। সভায় একজন, পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্টের দিকে হাত ইশারা করিয়া তুলসীদাসের এক চৌপাই বার বার জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিল; তাহাতেও পুলিশ কিছু করিল না। চৌপাইটি এই—"গাধি-সুবন মন চিন্তা ব্যাপী, কব মরিহহি এ নিশিচর পাপী।"

সকলে বৈঠক ও সভার পর নিজের নিজের জায়গায় চলিয়া গেল। সব জেলায় কংগ্রেস কমিটি খানাতল্লাস হইতে লাগিল। লোকদের গ্রেপ্তার চলিল। আমিও পাটনায় আসিলাম। আমরা সকলে গ্রেপ্তারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সমস্ত জেলায় কংগ্রেসের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পাটনাতে মৌলবী খুরশেদ হোসেনেরা, বাবু জগৎনারায়ণ লাল, আর কৃষ্ণপ্রকাশ সেন সিংহ গ্রেপ্তার হইলেন। অন্যান্য জায়গায় মৌলবী মহম্মদ শফী, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ বর্মা, বাবু রামনারায়ণ সিংহ ইত্যাদি কংগ্রেসের কয়েকজন লোককে জেলে পাঠানো হইল। আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না। হক সাহেব, ব্রজকিশোর-বাবু ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি এক বিবৃতি ছাপাইলাম, তাহাতে আমরা জনসাধারণকে সেবকদলে যোগ দিতে উৎসাহ দান করিলাম, গভর্নমেণ্টের নীতির নিন্দা করিলাম, আর নিজেদের সেবকদলের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিলাম। তবু আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না। এইরূপে সর্বত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য হাকিমের নিকটে লোকেরা নিজের নিজের হাতের লেখা লম্বা লম্বা ফিরিস্তি পাঠাইতে লাগিল, তাহাতে সেবকদের নাম থাকিত। পাটনাতে আমি গ্রেপ্তারের অপেক্ষায়ই ছিলাম, এমন সময়ে মনে হইল ব্যাপার মিটিয়া যাইতেছে।

লোকের গ্রেপ্তার বন্ধ হইয়া গেল। লর্ড সিংহ বিহারের গভর্ণরের পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে গভর্ণর হইয়া গিয়াছিলেন মিঃ লে মেজুরিয়ার। বিহার কাউন্সিলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন মিঃ হাসান ইমাম, রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ প্রভৃতি—গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন লইয়া গিয়া বলিলেন যে, বিহারে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। এখানকার সেবকদল অবৈধ ঘোষণা করিলেই বেশি গোলমালের সম্ভাবনা। এইজন্য গ্রেপ্তার বন্ধ করিয়া দেওয়া চাই। গভর্নর তাঁহাদের এমন কিছু বলিলেন যাহাতে বোঝা গেল যে সমস্ত কাজকর্ম ভুল ভিত্তির উপর হইতেছে। আমরা তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তিনি গ্রেপ্তার বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। যদিও সেবাদলের বিরুদ্ধে প্রচারিত হুকুম রদ করা হইল না, তথাপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের গ্রেপ্তার বন্ধ করিবার হুকুম দেওয়া হইল।

ভাইসরয়ের কাউন্সিলের বৈঠকের জন্য স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু লর্ড রীডিং-এর নিকটে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তিনি পাটনা হইয়া যান। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজনের দেখা হইল, তাহাতে এই কথাটা ছড়াইয়া গেল যে এখন মীমাংসা হইয়া যাইবে। বিহারে গ্রেপ্তার করা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কথাটা আরও বাড়িয়া গেল। ওদিকে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে দেশবন্ধু দাশের জেলখানায় থাকিতে যে-সব কথা হয় তাহাতে মনে হইয়াছিল যে সরকারের

পক্ষ হইতে যে সকল শর্ত উপস্থিত করা হয়, দেশবন্ধু তাহাতে রাজি ছিলেন। মহাত্মাজীর মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তিনি কিছু শর্ত প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ের সকল কথা তখন প্রকাশ হয় নাই। এই পর্যন্ত বোঝা গিয়াছিল যে গান্ধীজী, দেশবন্ধু দাশের শর্তগুলি মানিয়া লইবার সুপারিশ নামঞ্জুর করিলেন। সব কথা বিস্তারিত জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণদাসের 'মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাত মাস',—'Seven months with Mahatma Gandhi' বইখানি পড়িতে হয়।

কয়েকটি শর্ত এই ধরনের ছিল— কংগ্রেস যুবরাজকে 'বয়কট' করাটা বন্ধ করিয়া দিবে। গভর্নমেণ্ট এক সম্মেলন ডাকিবেন, তাহাতে এ-সব কথা আলোচনা করা হইবে। রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাচির ফতোয়ার জন্য বন্দী হইয়াছেন, অর্থাৎ আলীভাই প্রভৃতি, তাঁহাদে ছাড়া হইবে না।

গান্ধীজী চাহিতেছিলেন যে সম্মেলনের দিন ও কার্যক্রম স্থির করা হউক, আর করাচির দরুণ যাঁহারা বন্দী হইয়াছেন তাঁহাদেরও অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক। আরও দুই-এক দিন সময় পাইলে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া কোনো কিছু মীমাংসায় আসা সম্ভব ছিল। কিন্তু ওদিকে যুবরাজের কলিকাতায় পেঁৗছিবার দিন আসিয়া গিয়াছিল, কথাটার আর মীমাংসা হইতে পারিল না। গভর্নমেণ্ট দেখিলেন যে অভ্যর্থনার ব্যাপারে তাঁহারা যখন কৃতকার্য হইতে পারিলেন না তখন আর এই মীমাংসার কথাও কোনও কাজের নয়। তাঁহারা স্থির করিলেন, দমননীতি আরও জোরে চালাইবেন। যে ডেপুটেশন গিয়াছিল তাহাকেও কড়া উত্তর দেওয়া হইল। তাহার সঙ্গে এমন কিছু গোলমেলে কথা বলা হইল যাহাতে কয়েকজনের, বিশেষত পণ্ডিত মালব্যজীর মনে এই ভাব জন্মিল যে, যদিও তখনও কিছু হয় নাই তথাপি রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্স করিবার চেষ্টা চালানো উচিত হইবে এবং ভাইসরয় যে-সব শর্ত উপস্থিত করিয়াছেন সেগুলি পূরণ করিতে হইবে।

মহাত্মাজীর এই সিদ্ধান্তে দেশবন্ধু দাশ খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সেইসময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এতখানি নামিয়া আসাই প্রধান কথা, ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলে কংগ্রেসের শক্তি বাড়িত এবং কাজ বেশি জোরে চলিত। গভর্নমেণ্ট তাহা দাবাইয়া রাখিতে পারিত না। মহাত্মাজী ভাবিলেন, লর্ড রীডিং-এর ইচ্ছা ছিল, কোনও প্রকারে কলি-কাতার মত শহরে যুবরাজকে ভালোভাবে অভ্যর্থনা করিলে বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের ঘটনাবলীতে কিছু গুরুত্ব থাকিত না এবং তিনি ভারতের রাজভক্তির ঘোষণা করিতে পারিতেন। সম্মেলনের নীতি ও তিথি দুই-ই ছিল অনিশ্চিত। উহা কবে হইবে এবং উহাতে কি হইবে কিছুই জানিতাম

না। উহার উপর ভরসা করা ঠিক হইবে না এবং কংগ্রেসের শক্তি না বাড়িয়া কমিবে, যখন দেশ দেখিত আমরা কেমন ঠকিয়াছি। তা ছাড়া আলীভাইদের আমরা কি করিয়া জেলে ছাড়িয়া আসিতে পারিতাম? যাহারা সকল কথায় আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জনসাধারণের উপর যাহাদের এতটা প্রভাব, যাহারা আমাদের সঙ্গী, তাহাদিগকে জেলে আটক করিয়া রাখা তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হইত। এইজন্য লর্ড রীডিং-এর শর্ত আমাদিগকে কেবল ধোঁকা দিত, কাজ কিছু হইত না।

দেশবন্ধু দাশ যে খুব ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দণ্ডকাল শেষ হইলে যখন তিনি ছুটি পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজী খুব ভারি খারাপ ধরনের ভুল করিয়াছেন, bungled and blundered। এ বিষয়ে তটস্থভাবে ভাবী কোনও ইতিহাসলেখককেই বিচার করিতে হইবে। আমি এইটুকুই বলিতে পারি যে, ঐসময় হইতে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে বোঝাপড়ার যে অভিজ্ঞতা আমাদের হইয়াছিল তাহা অতীব কটু। শব্দাড়ম্বরে আসল কথাটা সর্বদা ঢাকা পড়িত। মীমাংসা ইংরেজী ভাষাতেই লেখা হইত, আর তাহার অর্থে অনর্থের যথেষ্ট অবকাশ থাকিত। ১৯৩১-এর মার্চ মাসে লর্ড আরউইনের সঙ্গে যে বোঝাপড়া হইয়াছিল তাহার শর্ত পালনে লর্ড উইলিংডনের গভর্নমেণ্ট ও সিভিলিয়ানগণ যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা যাহারা ঐবিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার বা পত্রব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহারা জানিত। মহাত্মাজী নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেন যে, কোনও শর্তের মধ্যে গোল-মালের কিছু রাখিয়া দেওয়া অথবা তাহাতে কোনও প্রকারের অনিশ্চয়তা থাকিতে দেওয়ার ফলে শেষে অনিষ্ট হয়। তাঁহার ব্রিটিশ সরকারের খোশমেজাজের উপরও বিশ্বাস ছিল না। এইজন্য তিনি এই সকল শর্ত মানা ঠিক মনে করিতেন না। আর কংগ্রেসের নির্ধারিত নীতিতে এবং নিজের সাথীদের এই অনিশ্চিত শর্তের ভরসায় জেলখানায় ছাড়িয়া আসিতে অস্বীকার করিলেন। কোনও দেশের স্বাধীনতা যদি সস্তাদরে পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অতটা কদর আর হয় না। বিশেষত ভারতবর্ষের তো ইহা উচিত মূল্য দিয়াই লওয়া উচিত; কারণ আমরা এত-দিনের দাসত্বের ফলে ইহার উচিত মূল্য হিসাব করিতেও ভুলিয়া গিয়াছি।

এদিকে এ সব কথা চলিতেছে, ওদিকে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের দিনও আসিয়া গেল। দেশবন্ধু দাশই সভাপতি মনোনীত হইলেন। তিনি ছিলেন জেলখানায়। কংগ্রেসের অধিবেশন আমেদাবাদে হইবার কথা ছিল। সেখানে সরদার বল্লভভাই ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বিপুল আয়তনে আয়োজন হইতেছিল। বিহারে যখন গ্রেপ্তার বন্ধ হইল, তখন আমরা যাহারা বাহিরে ছিলাম, সকলে আমেদাবাদ রওনা হইলাম।

আমেদাবাদের কংগ্রেস অনেক দিক দিয়া অপূর্ব ছিল। এখানেই সর্বপ্রথম কংগ্রেস হইতে চেয়ার উঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রতিনিধিদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইল ফরাশের উপর। এইভাবে ঐস্থানেই অনেক বেশি প্রতিনিধি ও দর্শক বসিতে পারিল। নাগপুরের পরিবর্তিত নিয়ম অনুসারে প্রতিনিধিদের নির্বাচন এই প্রথম। এখন হইতে আমরা বলিতে পারি যে কংগ্রেস হইল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভা। নির্বাচিত প্রতি-নিধিদের অনেকে ছিলেন জেলখানায়, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান তো মনোনীত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেনই। অনেক নেতা— যাঁহারা সমস্ত বৎসর ধরিয়া আনন্দ, উৎসাহ ও পরিশ্রমের সঙ্গে দেশকে জাগাইয়া সংগঠিত করিয়াছিলেন তাঁহারা— এই অধিবেশনে আসিতে পারিলেন না, গভর্ন-মেণ্টের নীতির জন্য। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এবং সমস্ত দেশের মধ্যে উৎসাহ উছলিয়া পড়িতেছিল, যেন ভরা নদীর কিনারা ছাপাইয়া জলপ্রবাহ চারদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এত যে গ্রেপ্তার হইল, তাহাতে কোথাও মৃত্যুর ছায়া পড়ে নাই। দমননীতি দমন না করিয়া কার্যত লোকদের মধ্যে অধিকতর উৎসাহসঞ্চারই করিয়াছিল। গান্ধীজীর মনও আশা ও উৎসাহে ভরা। সকলে সত্যাগ্রহের স্বপ্ন দেখিতেছিল। লোকে এই আশায় ছিল যে কংগ্রেস সত্যাগ্রহের আদেশ দিবে ও তাহার আয়োজন করিবে। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীও ছিল, তাহার মধ্যে নবজাত—বরং পুনর্জীবিত—খাদির খুব প্রাধান্য ছিল। প্রতিনিধিদের থাকার জন্য কংগ্রেস-প্যাণ্ডালের নিকটেই 'খাদিনগর' নামে এক ছোটো নগর বসিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সকলে আসিয়া উঠিয়াছিল। এই-সব ব্যাপার কংগ্রেসের পক্ষে ছিল নূতন। নিকটেই ঐরূপ খিলাফত সম্মেলনের জন্য প্যাণ্ডাল ইত্যাদি তৈয়ারি করা হইয়াছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশনও হইয়াছিল অনাড়ম্বর। পুরাতন প্রথার মতো

নয়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ খুব সংক্ষিপ্ত ছিল, তাহাতে দেশের উপস্থিত প্রতিনিধিদের কার্যক্রমের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। তাহাতে শুধু উপস্থিত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনামাত্র ছিল, আর ছিল গুজরাটে যে কাজ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মনোনীত সভাপতি উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁহার স্থানে হাকিম আজমল খাঁ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতি, উভয়েরই বক্তৃতা রাষ্ট্রভাষা হিন্দী অথবা উর্দুতেই হইয়াছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল সত্যাগ্রহের। অধিবেশনে একটি প্রস্তাবই গৃহীত হয়, তাহাতে অবস্থার চুম্বক দিয়া সত্যাগ্রহ প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল। এইজন্য গান্ধীজীকে করা হইল সর্বেসর্বা বা 'ডিক্‌টেটর'। এই নামের মধ্যে আশংকা ছিল যে, অন্যান্য নেতার মতো গান্ধীজীকেও গ্রেপ্তার করা হইবে: এইজন্য প্রস্তাবে তাঁহাকে ঐ অধিকারের সঙ্গে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার অধিকারও দেওয়া হইল। কিন্তু ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে কংগ্রেসের আদর্শ বদলাইবার অধিকার তাঁহার থাকিবে না। হাঁ, যদি গভর্নমেণ্টের দিক হইতে কোনও সমাধান হয় তবে তাহার মঞ্জুরি লইতে হইবে কংগ্রেসের নিকট। সেবকদল গঠনের উপর জোর দেওয়া হইল এবং যে প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদের সই করিবার কথা ছিল, তাহা আরও কঠিন করা হইল।

এই অধিবেশনে এক বিশেষ কথা এই ছিল যে, মৌলানা হজরত মোহানী প্রস্তাব করেন, স্বরাজের বদলে স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করা হউক। গান্ধীজী ইহার বিরোধিতা করেন। সুতরাং প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তাহার পর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে এইপ্রকার প্রস্তাব আসিতে থাকিল। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী বিরুদ্ধতা সংবরণ করিতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজী বিপক্ষে ছিলেন বলিয়া উহা নামঞ্জুরই হইতে থাকিল। আর এক কথা: পণ্ডিত মালব্যজীর গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়া দেওয়া হইল। পণ্ডিতজী কলিকাতা হইতে সরাসরি আমেদাবাদ আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে পরামর্শ দিলেন ও প্রস্তাব করিলেন যে, যদি গভর্নমেণ্ট গোলটেবিল বৈঠক করে তাহা হইলে কংগ্রেস যেন তাহাতে যোগ দেয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, এই সময় তাহার কোনও সুযোগই ছিল না। এইজন্য কংগ্রেস সে কথা স্বীকার করিল না। পরে বোঝা গেল, পণ্ডিত মতিলালজীও কোনওপ্রকার বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে ছিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেলে সকলে নিজের নিজের জায়গায়

রওনা হইলেন। এখানেই বোঝা গেল যে, মহাত্মা গান্ধী একটি জায়গায় সত্যাগ্রহ করিবেন, আর সেই জায়গা হইবে বারদোলি। অন্যেরাও আদেশ পাইলেন, নিজের নিজের জায়গায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন করিতে হইবে, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কাজ করিতে হইবে, কংগ্রেসের কার্যক্রম পূরণ করিতে হইবে, বিশেষত সেবকদল সংগঠনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

পণ্ডিত মালব্যজী এবং অন্য কয়েকজন নেতা স্থির করিলেন যে এমন একটি সম্মেলন করা হইবে যাহাতে কংগ্রেস ও গভর্নমেণ্টের ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা হইতে পারে। তাঁহারা আমেদাবাদ কংগ্রেস শেষ হইতেই এবিষয়ে ঘোষণা করেন। দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেস ও খিলাফতের নেতারাও ছিলেন, বোম্বাইতে আমন্ত্রিত হইলেন। এই সভা বোম্বাইতে হইল জানুয়ারির মাঝামাঝি। স্যর শংকরন নায়ার ইহার সভাপতি হইলেন। অন্যান্য কংগ্রেসীর মতো আমিও সেখানে গেলাম। আমাদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীরই বলার কথা ছিল। আমরা স্থির করিয়া লইলাম যে, যাহা-কিছু বলিবার সকলের দিক হইতে তিনিই বলিবেন। মহাত্মাজী পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে, গভর্নমেণ্ট এই যে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করিতেছে ইহাতে আমাদের কোনও আশা করিবার কিছু নাই: তাহা হইলেও যদি বৈঠক হয় এবং গান্ধীজীকে ডাকা হয়, তবে তিনি বিনা শর্তে সেখানে যোগ দিবেন: কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে। হাঁ, যদি কংগ্রেসকে আহ্বান করা হয় তবে বৈঠকের কার্যক্রম ও দিনক্ষণ স্থির করিয়া লইলে কংগ্রেসও যোগ দিতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে ঘোষণায় সেবকদলকে অবৈধ করা হইয়াছিল সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করা হউক এবং তাহা অমান্য করিবার জন্য যাহাদের সাজা দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ফতোয়ার জন্য যাহারা বন্দী হইয়াছিল তাহাদিগকে অবশ্যই ছাড়িয়া দিতে হইবে। খিলাফত, পাঞ্জাব ও স্বরাজ বিষয়ে কংগ্রেসের দাবি তো প্রকাশ করাই ছিল; কংগ্রেস সে-সব দাবি সেখানে পেশ করিয়া তাহা প্রমাণ করাইবার চেষ্টা করিবে। আমাদের দিক হইতে আমরা সত্যাগ্রহ স্থগিত করিয়া দিব।

সম্মেলনের উদ্‌যোগীদের দিক হইতে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল: কিন্তু গান্ধীজী তাহা গ্রহণ করিলেন না। এইজন্য তাহা আলোচনা করিয়া রদ-বদল করিয়া আবার উপস্থিত করিবার জন্য এক উপসমিতি গঠিত হইল। সেইদিন যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদের বক্তৃতা হইল। আমার মনের উপর একটি বক্তৃতার খুব প্রভাব পড়িয়াছিল। তাহা স্যর হরমুসজী ওয়াডিয়ার বক্তৃতা। তিনি ছিলেন এক বয়োবৃদ্ধ বড়ো ব্যবসায়ী, লিবারেল দলের মতাবলম্বী একজন পার্শী। তিনি গভর্নমেণ্টের সমগ্র

নীতির তীব্র নিন্দা করিলেন। ইহা সত্যাগ্রহের বিরোধী হইলেও তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলেন যে এই অবস্থার সমস্ত জবাবদিহির ভার সরকারের উপর।

পরের দিন উপসমিতির বৈঠক ছিল। তাহাতে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। সকলের মত লইয়া এক প্রস্তাব রচিত হইল। কিন্তু স্যর শংকরন নায়ার খুব চটিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি সম্মেলন হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সংগে অন্য কেহ গেল না। তখন স্যর বিশ্বেশ্বরাইয়া হইলেন সম্মেলনের সভাপতি। তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। গান্ধীজী আবার নিজের সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা তিনি ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির লোক প্রায় সকলেই ছিলেন। বোম্বাইতে স্থির হইল যে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকের কথা ও প্রস্তাবের অন্যান্য শর্ত গভর্নমেণ্ট যদি নামঞ্জুর করেন তবে যতদিন তাহার কোনও মীমাংসা না হয় ততদিন সর্বব্যাপী সত্যাগ্রহ বন্ধ থাকিবে, আর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুধু যেখানে অবশ্যকরণীয় বলিয়া মনে হইবে সেখানেই করা হইবে। কিন্তু সেবকদলের সংগঠনের কাজ চলিতে থাকিবে। কন্‌ফারেন্স কমিটি ভাইসরয়ের নিকট তারযোগে কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব পাঠাইয়া দিলেন। এক দীর্ঘ তার দিয়া ইহাও জানানো হইল যে কলিকাতার ডেপুটেশনের উত্তরে লর্ড রীডিং যে সকল শর্ত দিয়াছিলেন প্রায় সেই সমস্ত শর্তই মঞ্জুর করা হইয়াছে। এখন গভর্নমেণ্টকে গোলটেবিল বৈঠকের কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ওদিক হইতে অসম্মতি জানাইয়া উত্তর আসিল! ইহার পরে আবার তারযোগে কথা চলিতেছিল, এমন সময় ৩১ জানুয়ারি আসিয়া পৌঁছিল। এখন কংগ্রেসের দিক হইতে একটা কিছু স্থির না করিলে চলে না।

কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পর আমি নিজের প্রদেশে ঘুরিতে আরম্ভ করিলাম। এই ৩১ জানুয়ারি কাটিয়া গেলে, বারদোলির এক সাধারণ সভায়, মহাত্মাজী ও হাকিম আজমল খাঁর উপস্থিতিতে, বারদোলিতে সত্যাগ্রহ শুরু করা স্থির হইল। এ কথা ঘোষণাও করা হইল। শ্রীযুক্ত বিঠ্‌ঠলভাই প্যাটেল ও সরদার বল্লভভাই এখন ওখানেই থাকিতে লাগিলেন। মহাত্মাজীও আসিয়া পড়িলেন। সেখানে জনসাধারণের সভায় মহাত্মাজী সত্যাগ্রহের অর্থ ও তাহা হইতে যে-সব কষ্ট হইতে পারে তাহা লোকদের বুঝাইয়া বলিলেন। তাহাদিগকে দিয়া শপথও করাইয়া লইলেন যে তাহারা সত্য ও অহিংসাতে দৃঢ় থাকিয়া সমস্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের আত্মসাৎ করিয়া দিবে। সুরাটে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল। তাহাতে

কমিটি সেখানে সত্যাগ্রহ করিবার অনুমতি দিয়া দিলেন। ইহার পরেই গান্ধীজী ভাইসরয়কে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি সত্যাগ্রহের সংকল্পের কথা জানাইতে গিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার দিনও নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

চৌরিচৌরা, সত্যাগ্রহে বিরতি, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার

আমি বিহার প্রদেশে পরিভ্রমণ করিবার সময় মজঃফরপুরের গাঁয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে পুপরী গাঁয়ের সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় তার পাইলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বারদোলিতে হইবে এবং আমাকে তাড়াতাড়ি সেখানে যাইতে হইবে। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি রওনা হইলাম। প্রথমে যে গাড়ি পাইলাম তাহাতে পাটনা হইয়া সেখানে চলিয়া গেলাম। ইহার মধ্যে এক অতিশয় দুঃখকর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গেল, গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গাঁয়ে জনসাধারণ ও পুলিশে সংঘর্ষ হইল। জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া পুলিশের থানায় আগুন লাগাইয়া দিল। কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে মারিয়াও ফেলিল।

মহাত্মাজীর মনের উপর ইহার অতিশয় গভীর প্রভাব পড়িল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে দেশ এখনও অহিংসার তত্ত্ব ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। এইজন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে এইপ্রকার ঘটনা অনেক জায়গায় হইতে থাকিবে, ফলে সরকারের তরফ হইতেও দমননীতি বাড়িতে থাকিবে; আর জনতা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না; এইজন্য যদিও ভাইসরয়কে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার কথা জানানো হইয়াছিল, তথাপি সত্যাগ্রহ থামাইয়া দিতে হইল।

দেশের নাড়ী চিনিতেন মহাত্মাজী। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তিনি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকিলেন।

যদিও আমি খুব তাড়াতাড়ি রওনা হইয়াছিলাম, তথাপি যখন বার-দোলি স্টেশনে পৌঁছি, তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি ঐ ট্রেনে ফিরিবার জন্য রওনা হইতেছিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শেষ হইয়াছে, সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইয়াছে। আমি শুনিবামাত্র মনের উপর যেন একটা ধাক্কা খাইলাম। গান্ধীজী যেখানে ছিলেন আমি সেখানে গেলাম। আমি যাইতেই তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি স্থির হয়েছে শুনেছ তো?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ।' ইহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বিষয়ে তোমার মত কি?' আমি তখন কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে। তিনি তখন সমস্ত কথা আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। আমি শুনিয়া গেলাম, কিন্তু তখনও কোনও কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। শেষকালে তিনি বলিলেন, 'আমি যা সব বলেছি ভেবে দেখো।'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। রাত্রে সমস্ত কথা ও বিভিন্ন দিক হইতে মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহার আলোকে বিচার করিয়া দেখিলাম। আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে যাহা স্থির হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে। পরের দিন গান্ধীজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাবলে?' উত্তরে জানাইলাম, সমস্ত কথা বুঝিয়াছি এবং নির্ধারণ ঠিকই হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাকে কিছু প্রসন্ন দেখাইল।

এই নির্ধারিত প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ামাত্র সমস্ত দেশে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইল। সাধারণ কর্মীদের কথা কি, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি যাঁহারা জেলে ছিলেন সেই-সব বড়ো বড়ো নেতাও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। সংবাদপত্রেও প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিল। হাকিম আজমল খাঁ ও ডাঃ আনসারি বারদোলির এই বৈঠকে পৌঁছিতে পারেন নাই, ইঁহারাও সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার পক্ষে মত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে একপ্রকার মৃতবৎ অবস্থা দেখা গেল, যেন কেহ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাধা পাইয়া পড়িয়া গেল।

বারদোলিতেই গান্ধীজী সর্বপ্রথম গঠনমূলক কার্যপদ্ধতিকে স্পষ্ট ও স্থির রূপ দিয়াছিলেন; আজ তাহা কংগ্রেসের প্রধান কার্যপদ্ধতি। এই প্রস্তাবের এতখানি গুরুত্ব আছে যে, ইহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। নীচে উহার ভাষান্তর দেওয়া গেল—

"যেহেতু গোরখপুরের (চৌরিচৌরা) ভীষণ কাণ্ড প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করিতেছে যে দেশের জনসাধারণ এখনও এ কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে অহিংসা, আইন অমান্য আন্দোলনের এক প্রয়োজনীয়, সক্রিয় ও প্রধান অংশ; আর যেহেতু স্বেচ্ছাসেবকদের ভর্তি করিবার সময় ভালো করিয়া না দেখিয়া শুনিয়া কংগ্রেসের নির্দেশের বিরুদ্ধেও লোক লওয়া হইয়াছে, তাহার দরুন সত্যাগ্রহের মূলতত্ত্বের জ্ঞানও লোকদের মধ্যে কম আছে বলিয়া মনে হয়; আর যেহেতু এই কার্যকরী সমিতির মতে জাতীয়তা পর্যন্ত পৌঁছিবার দেরি হওয়ার প্রধান কারণ হইল কংগ্রেসের অনুশাসন প্রয়োগে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা, এইজন্য কংগ্রেসের ভিতরকার গঠন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এই-ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের সকল সংগঠিত

অঙ্গকে পরামর্শ দিতেছে যে, তাহারা যেন নিম্নলিখিত কার্যপদ্ধতিকে রূপ দিতে সমবেতভাবে চেষ্টা করে—

১। কংগ্রেসের অন্তত এক কোটি সভ্য করা। যেহেতু শান্তি (অহিংসা ও বৈধতা) এবং সত্য কংগ্রেসের নীতির মূলতত্ত্ব বা সার, এইজন্য এমন কোনো ব্যক্তিকে সদস্য করা না হয়, যে স্বরাজ পাইবার জন্য সত্য ও অহিংসাকে আবশ্যিক বলিয়া মনে করে না। এই ধারণা অনুসারে যাহাদিগকে কংগ্রেসের সভ্য হইতে বলা হইবে তাহাদের প্রত্যেককে কংগ্রেসের নীতি খুব ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। যে-সব কর্মী সভ্য করিবে তাহাদিগকে এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, বাৎসরিক চাঁদা না দিলে কংগ্রেসের উপযুক্ত সভ্য বলিয়া কাহাকেও গণ্য করা হইবে না। এইজন্য পুরাতন সভ্যদের আবার নূতন বৎসরের জন্য নিজের নিজের নাম ভর্তি করাইতে হইবে।

২। চরকাকে জনপ্রিয় করিতে হইবে, হাতে-কাটা সূতায় হাতে-বোনা খাদি তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা বা আয়োজন করিতে হইবে। এই কার্যে সফলতার জন্য সমস্ত কর্মী ও কংগ্রেসের পদাধিকারীদের খদ্দরের পোশাক পরিতে হইবে, আর অন্য সকলের আগ্রহ বাড়াইবার জন্য তাহাদের নিজেদেরও চরকায় সূতা কাটা শিখিতে হইবে।

৩। ন্যাশন্যাল স্কুল অথবা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। গভর্নমেন্ট স্কুলে 'ধরনা' দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রীয় স্কুলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়াইতে গেলে এই-সব স্কুলে ভালো পড়াশোনা করানোর উপরই ভরসা রাখা উচিত।

৪। পতিত, দলিত জাতির থাকার ধরনধারণ ভালো করিবার জন্য এবং তাহাদের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থা ভালো করিবার জন্য তাহাদিগকে সংগঠিত করা। তাহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাদের শিশুদের স্কুলে পড়াইবার জন্য পাঠানো ও যে-সব সুবিধা সকলে পায় তাহা ইহাদেরও দেওয়া। যেখানে কোথাও 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায়ের নিকট হইতে লোক বেশি পৃথক থাকে এবং ছোঁয়াছুঁয়ির ভাব থাকে প্রবল, সেখানে এই-সব ছেলেদের জন্য কংগ্রেসের পয়সায় স্বতন্ত্র স্কুল পাঠশালা চালাইতে হইবে এবং লোককে বুঝাইয়া সুঝাইয়া অস্পৃশ্যদেরও সাধারণের কুয়া হইতে জল ভরিতে দিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। নিবারণের জন্য মদ্যপায়ীদের তে ঘরে ঘরে গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, নেশা বন্ধ করিবার জন্য সংগঠনের কার্য করা। এই কাজের জন্য পিকেটিং করিলে চলিবে না। কিন্তু বুঝাইয়া সুঝাইয়া অনুনয়-বিনয়ের সাহায্যেই কাজ চালাইতে হইবে।

৬। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মকদ্দমা ঘরোয়াভাবেই মীমাংসা করাইবার আগ্রহে শহরে ও গাঁয়ে পঞ্চায়েত স্থাপন করা। পঞ্চায়েতের মীমাংসা

লোককে গ্রহণ করাইবার শক্তি, পঞ্চায়েতের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, বিচারশীলতা ও লোকপ্রিয়তা হইতেই সৃষ্টি করিতে হইবে। কোনও প্রকারের জোর-জবরদস্তির ছায়াও যেন না পড়িতে পায়। এইজন্য এরূপ যেন না হয় যে, পঞ্চায়েতী মীমাংসা কেহ না মানিলে তাহাকে সমাজ বা জাতি হইতে বর্জন করা হইবে।

৭। সমস্ত জাতি বা শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মিলনের ভাব বাড়াইবার জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার প্রয়োজনের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টায় মেলামেশা বাড়ানো অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিক সেবাবিভাগ এরূপভাবে সংগঠিত করা, যে কোনও ভেদজ্ঞান না করিয়া রোগ-শোক বা আপদ-বিপদে একই রূপে একই-ভাবে সকলের সেবা করা হয়। নিজের নীতির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও অসহযোগীর পক্ষে লোকের অসুখে বা কোনও বিপদের সময়, ইংরেজ হউক, বা ভারতীয় হউক, অর্থাৎ সকলেরই সমভাবে সেবা করা নিজের গৌরবের বা সৌভাগ্যের কথা মনে করিতে হইবে।

৮। তিলক স্বরাজফণ্ড সংগ্রহ করিবার কাজ চালু রাখা এবং প্রত্যেক কংগ্রেসীর নিকট অথবা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট দাবি করা যে, তাহারা নিজেদের ১৯২১ সনের আয়ের ১/১০০ শতাংশ তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে দান করিয়া দেয়। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এই জমা টাকার এক-চতুর্থাংশ প্রতি মাসে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

৯। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিলে, সমর্থনের জন্য নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আগামী বৈঠকে পেশ করা হইবে।

১০। ওয়ার্কিং কমিটির মতে এমন কিছু ব্যবস্থা করা দরকার মনে হয়, যাহার সাহায্যে যাহারা সরকারি চাকরি ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহাদের জন্য কিছু রোজগারের উপায় করিয়া দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে এই কমিটি সর্বশ্রী মিয়া মহম্মদ হাজীজান মহম্মদ ছোট্টানী, শেঠ যমুনা-লাল বাজাজ এবং ভি. জে. প্যাটেলকে নিযুক্ত করিতেছে যে, ইঁহারা যেন ঐভাবের এক পরিল্পনা প্রস্তুত করিয়া আগামী নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বিশেষ বৈঠকে আলোচনার জন্য পেশ করেন।

বারদোলিতেই ইহা স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে নিখিল ভারতীয় কমিটির অধিবেশন শীঘ্রই হইবে। দিন স্থির করিয়া দিল্লিতে বৈঠকের ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। এই বৈঠকে বারদোলির গৃহীত প্রস্তাব লইয়া আলোচনা হইবার কথা ছিল।

গান্ধীজী পাঁচ দিন উপবাস করিলেন। সেখানকার জনসাধারণের

সভায় তিনি নিজে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা বলিলেন। আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা কথাটা তো মানিয়া লইল। কিন্তু এখানেও নিরাশার ভাব আছে বলিয়া মনে হইতেছিল।

দিল্লিতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হয় তাহাতে লালাজী, পণ্ডিত মতিলালজী ও অন্যান্য সকলের সরোষ মন্তব্য পাওয়া গেল—"এই সংকল্প দেশের পক্ষে বড়ো হানিকর হইয়াছে, ইহাতে জনসাধারণ শুধু নিরুৎসাহই হইবে না, দেশের মর্যাদাতেও আঘাত লাগিবে।" এই মর্মে লিখিত কয়েকজন নেতার পত্রও জেল হইতে গান্ধীজীর নিকটে আসিল। মনে হইতেছিল যে, ঐ সকল নেতা যেন বাহিরে আসিলে গান্ধীজীকে পদচ্যুত করিয়া সত্যাগ্রহ চালাইতেন। কিন্তু গান্ধীজী একটুও টলিলেন না। তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, 'যাঁহারা জেলে আটক আছেন সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে থাকিতেই পারে না, এইজন্য তাঁহাদের মত দিবার কোনও অধিকার নাই। আর যদি তাঁহারা মত দেনও তাহা হইলেও সে মতের বিশেষ গুরুত্ব থাকিতে পারে না।' ওয়ার্কিং কমিটিতেই আমি দেখিয়াছি যে, গান্ধীজী যখন কোনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করেন তখন কেমন অটল থাকিতে পারেন—আর অতি তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও অটল থাকিতে পারেন!

হাকিম আজমল খাঁ ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হইল। গান্ধীজী বারদোলির সিদ্ধান্ত সমর্থন ও গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ইহার পর ডাঃ মুঞ্জে তাঁহার সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, অসহযোগের কার্যক্রম ও তদনুসারে প্রত্যেক কাজ পরীক্ষা করিয়া দেশকে উচিত পরামর্শ দিবার জন্য এক কমিটি গঠিত হউক। এই প্রস্তাব এবং ইহার সমর্থনে যে বক্তৃতা তিনি করেন তাহা গান্ধীজীর প্রতি অনাস্থার রূপ (No confidence or censure) ধারণ করিল। গরম গরম তর্ক চলিল। এই সময়ে হাকিম সাহেবের শরীর হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল। তিনি সভায় বসিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি গান্ধীজীকে নিজের স্থানে সভাপতি করিয়া দিলেন। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন যে, ব্যথা কম হইলেই তিনি হাজির হইবেন, ততক্ষণ মহাত্মাজী সভার কাজ চালাইবেন। আমাদের ইহা ঠিক মনে হইতেছিল না যে, যাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব উপস্থিত এবং সেই প্রস্তাবের উপর তর্ক চলিতেছে, তিনি সভাপতির পদে বসিয়া থাকিবেন। কিন্তু গান্ধীজী নিঃসংকোচে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার আকারে প্রকারে একটুও সংকোচের আভাস দেখা গেল না। আমরা ভাবিয়া লইলাম, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, সভাপতির কাজ সমস্ত সদস্যের বিশ্বাসভাজন হওয়া এবং নিজের কোনও কাজকর্মে

বিরোধী পক্ষের মনে এ ভাব আসিতে না দেওয়া যে, তিনি শুধু নিজের সমর্থকদের পক্ষপাতী। গান্ধীজী সেখানে যে নীতির অনুসরণ করিলেন তাহাও অদ্ভুত। যখন কেহ বলিতে উঠিত তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আপনি ডাঃ মুঞ্জের পক্ষে বলবেন, না বিপক্ষে?' যদি তিনি বলিতেন, 'বিপক্ষে,' তাহা হইলে গান্ধীজী বলিতেন, 'আপনি বসুন।' যদি তিনি বলিতেন, 'পক্ষে', তাহা হইলে তাহাকে বলিতেন, 'আপনার যা বলবার বলুন।' এই প্রকার অনেক বক্তৃতাই ডাঃ মুঞ্জের পক্ষ হইতে হইল, আর তিনি নিজের পক্ষে একটাও বক্তৃতা হইতে দিলেন না। আমাদের একটু ভয় হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, গান্ধীজী এভাবে নিজের পক্ষকে কিছু বলিবার সুযোগই বা দিতেছেন না কেন? শেষকালে তিনি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সভার সামনে উপস্থিত করিলেন। হাত উঠাইলে জানা গেল যে, প্রায় ততগুলি হাত ডাঃ মুঞ্জের পক্ষে উঠিল যতটি বক্তৃতা তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল! অনাস্থার প্রস্তাব অনেক বেশি ভোটে অগ্রাহ্য হইল। বারদোলির নির্ধারণ নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা হইল—

১। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এই বৈঠকে বারদোলির—১৯২২ সালে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারির ওয়ার্কিং কমিটি বৈঠকে গৃহীত, গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতির প্রস্তাবকে পূর্ণ আলোচনার পর গ্রহণ করিতেছে, আর সেই সঙ্গে সংকল্প করিতেছে যে, ব্যক্তিগত সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স, তাহা আত্মরক্ষার্থই হউক আর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই হউক, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ আইনের বিরুদ্ধে, স্থানীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি লইয়া করা যাইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে যে, উহা তখনই করিতে পারা যায় যখন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি অথবা ওয়ার্কিং কমিটির কথামত, সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স চালাইবার পূর্বেই সমস্ত শর্ত পুরাপুরি ঠিকমত পালন করিতে পারা গিয়াছে।

২। কয়েক স্থান হইতে রিপোর্ট আসিয়াছে যে, মদের দোকানে যেভাবে পিকেটিং করা হইতেছে, কাপড়ের দোকানেও সেইরূপ পিকেটিং করা প্রয়োজন। এইজন্য এই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কাপড়ের দোকানেও এরূপ পিকেটিং-এর অনুমতি দিতেছেন। তাহা শুভ সংকল্প হইতে প্রসূত, বারদোলির প্রস্তাবে বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং সেই সকল শর্তের সঙ্গে করা যাইবে।

৩। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের অর্থ তাহার নিজের পূর্বের অসহযোগ বা সামগ্রিক সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্সের প্রোগ্রাম ছাড়িয়া দেওয়া নহে। উহার শুধু উদ্দেশ্য এই যে, বারদোলির প্রস্তাবে বর্ণিত গঠনমূলক

কার্যপদ্ধতি লইয়া কর্মীরা মনপ্রাণ দিয়া কাজ করিলে ও তাহা সফল করিলেই তবে সামগ্রিক সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের জন্য আবশ্যক বা অনুকূল ক্ষেত্র তৈয়ার করিতে পারা যাইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ইহাই সিদ্ধান্ত যে এই অবস্থায় কার্যত সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স করিবার পুরা অধিকার ও কর্তব্য জনসাধারণের— বিশেষ করিয়া যখন শাসনকর্তা ও অধিকারিবর্গ জনসাধারণের নির্ধারিত মতের বিরোধিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসরে নামিয়াছেন।

মন্তব্য—ব্যক্তিগত আইন অমান্য তাহাকেই বলে, যখন একজন বা নির্দিষ্টসংখ্যক লোক (যাহাদের সীমা বা সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে) দলবদ্ধ হইয়া আইনের বিরুদ্ধে, বা গভর্নমেণ্টের হুকুম না মানিয়া, আইন অমান্য করে। এইজন্য এমন মিটিং বা সভা, যেখানে টিকিটের সাহায্যেই লোকে যাইতে পারে আর যেখানে অনধিকারী দর্শক কেহ যাইতে পারে না, সরকার যদি এরূপ সভা বারণ করিয়া দিয়া থাকেন, সেরূপ সভায় যোগদান করায় ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করা হয়। আর যদি সভা হয় জনসাধারণের, যেখানে যাহার ইচ্ছা অবাধে যোগ দিতে পারে, হইলে ঐরূপ সভা মাদেশের বিরুদ্ধে গেলে তাহাকে ব্যাপক বা সামগ্রিক আইন অমান্য বলে। আত্মরক্ষার জন্য আইন অমান্য তখন বলিব, যখন সভা কোনও কার্যক্রম নির্বাহ করিবার জন্য ডাকা হইয়াছে। আইন অমান্যকে তখনই বিনাশাত্মক বলিব যখন সভা কোনও বিশেষ কাজের জন্য নয়, গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা ভাঙিবার জন্যই আহ্বান করা হইয়াছে, অথবা গ্রেপ্তার, জেল, কি অন্য কোনও শাস্তি গ্রহণ করিবার জন্যই ডাকা হইয়াছে।

এই কমিটি বারদোলির নির্ধারণ অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু সামগ্রিক সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স ছাড়া, তখন যে-সব স্থগিত করা হইয়াছিল লোকদের প্রয়োজনীয় সেই সকল কার্যক্রমও পালন করিবার জন্য নির্দেশ করিতেছে।

গান্ধীজী প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময়েই এমন বক্তৃতা করিলেন যে, তাহার প্রভাব লোকে দূর করিতে পারিল না: সত্যাগ্রহ স্থগিত হইয়া গেল।

এই বৈঠকের বিষয়ে দুইটি কথা, অবশ্য সামান্য, বলিলে অনুচিত হইবে না। দিল্লির বৈঠকের দিন স্থির করিবার সময় পঞ্জিকা দেখা হয় নাই। ঘটনাক্রমে যেদিন স্থির করা হইল সেইদিন ছিল ফাল্গুনের শিব-রাত্রির পর্ব। হিন্দুদের তরফ হইতে তার আসিতে লাগিল যে, দিন বদল করিয়া দেওয়া হউক। গান্ধীজী তাহাতে রাজি হইলেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, শিবরাত্রি খুব বড়ো পর্ব বলিয়া মনে করা হয়, অনেকে পূজা উপবাস ইত্যাদি করে; তাই দিন বদল করিয়া দেওয়া হইবে

না কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন, "উপবাস আর বৈঠকে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না; কারণ লোকে উপবাস করেও সভায় যোগ দিতে পারে; আর এ কথা কোথায় কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে যে, ব্রতের দিন কোনও ভালো কাজ করা যাবে না? এটা হল দেশসেবার এক মহৎ কর্ম। যদি হিন্দু তার ধার্মিক প্রবৃত্তির সঙ্গে এতে যোগ দেয়, যা এরূপ পবিত্র দিনে তার কাছ থেকে আশা করা যায়, তা হলে এর চেয়ে বড়ো কথা আর কি থাকতে পারে?" তিনি দিন পরিবর্তন করিলেন না।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ছিলেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় (কে. সি. রায়). কলিকাতায় পড়িবার সময় হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি তখন ডেলি নিউজ নামে কলিকাতার এক ইংরেজী পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতেন। তখনকার দিনে তিনি খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না। এইজন্য আমার মতো একজন ছাত্রের সঙ্গেও তাঁহার ভালোমতোই জানাশোনা হইয়া গিয়াছিল। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস স্থাপিত হইলে সাংবাদিক জগতে তাঁহার খুব নাম হইয়া গেল। সবচেয়ে উঁচু পদের লোক পর্যন্ত তাঁহার সহজ গতিবিধি ছিল। সরকারি মহলে তো তাঁহার যাওয়া-আসা ছিল আরও বেশি। তাঁহার সঙ্গে দিল্লিতে দেখা হইল। খুব আদর করিয়া তিনি আমাকে নির্জনে বলিলেন, "এখন তোমাদের সঙ্গে সরকার কঠোর আচরণ করবেন. তাঁরা জেনে গেছেন যে. তোমরা এখন দুর্বল হয়ে গেছ, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভাঙন ধরেছে, একমত নাই। তাই গান্ধীজীকে এখন শীগগিরই গ্রেপ্তার করা হবে।" তিনি বলায় আমার এমন কিছু মনে হইল না যে এ-সব কথা তিনি কাহারও নিকটে সংবাদ পাইয়া তাহার ভিত্তিতে বলিতেছেন। আমি বুঝিলাম, অবস্থা দেখিয়া ইহা তাঁহার অনুমানমাত্র। যাহা হউক, দিল্লিতে বৈঠকের পর যেই আমরা নিজের নিজের জায়গায় গেলাম অমনই খবর আসিল— গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া সবরমতী জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে! আমি তাড়াতাড়ি সবরমতী রওনা হইলাম। সেখানে যেদিন মকদ্দমা দায়রা সোপর্দ হইবার কথা ছিল, সেদিন পৌঁছিলাম।

কোর্টের দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারিব না। গান্ধীজীর বিবৃতি তো 'যথাপূর্বং তথাপরং' অর্থাৎ একই ধরনের। জজের চালচলনও সেই মহাক্ষণের অনুকূলই ছিল। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লিখিত রচনাগুলির সম্বন্ধে। গান্ধীজী তো তাঁহার বিবৃতিতে অভিযোগ স্বীকারই করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি স্বাধীন থাকেন তবে, এ পর্যন্ত যেমন তখনও তেমনই, আগুনের সঙ্গে খেলিতে থাকিবেন। জজের পক্ষেও দুইটি রাস্তার মধ্যে একটি লইতেই হইবে, তৃতীয় পথ থাকিতে পারে না। যদি তিনি গান্ধীর সঙ্গে

একমত হন তাহা হইলে তাঁহাকে কাজে ইস্তফা দিতে হইবে, একমত না হইলে যত কঠোর দণ্ড তিনি দিতে পারেন তাহাই দেওয়া তাঁহার উচিত হইবে; কারণ গান্ধীজী যাহা-কিছু করিয়াছেন তাহা জানিয়া বুঝিয়াই করিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলে আবার করিবেন।

একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় (তাহা হইলেও ভাব নিঃসৃত হইতেছিল) জজ বলিলেন যে, অভিযোগ স্বীকার করিয়া লওয়ায় তাঁহার কাজ তো একপ্রকার হালকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্যভাবে, যে কাজ বাকি রহিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সাজা দেওয়া, তাহা খুবই কঠিন। গান্ধীজীর অসংখ্য দেশবাসী তাঁহাকে পূজ্য মনে করে। জজের এমন কোনও ব্যক্তির মকদ্দমা দেখিবার শুনিবার সুযোগ পূর্বে কখনও হয় নাই, হয়তো হইবেও না। জজের অধিকার আছে শুধু আইনমতো কাজ করিবার। আইন মানুষে মানুষে ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন লইয়া ভেদ করে না। এইজন্য তাঁহাকে সাজা তো দিতে হইবেই। গান্ধীজীর স্থান লোকমান্য তিলকেরই মতো। অনুরূপ অবস্থায় তাঁহাকে যে সাজা দেওয়া হইয়াছিল তাহাই, অর্থাৎ ছয় বৎসর কারাদণ্ড, গান্ধীজীকেও দিলে অনুচিত হইবে না।

জজ এই আদেশ শুনাইয়া দিলেন। তিনি যে গান্ধীজীকে লোকমান্য তিলকের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছেন সেজন্য গান্ধীজী তাঁহাকে ধন্য-বাদ দিলেন। জজ উঠিয়া যাইবার পর আমরা যতক্ষণ সেখানে ছিলাম সকলে একে একে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। সেই দৃশ্য অতি করুণ। আমার মন দুর্বল। শিশুদের কান্নাও আমি সহ্য করিতে পারি না। মন করুণাভাবাপন্ন হইলে আমি নিজেকে থামাইতে পারি না। আমি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত কেলকারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া খুব বুঝাইলেন এবং বলিলেন যে, যখন লোকমান্য তিলক দণ্ডিত হন তখন তাঁহাদেরও এই অবস্থা হইয়াছিল। খানিক পরে আমিও নিজেকে সামলাইয়া গান্ধীজীর নিকট বিদায় লইলাম।

ঐ মকদ্দমাতে শ্রীশংকরলাল ব্যাঙ্কারও অভিযুক্ত ছিলেন। তিনিই ছিলেন ইয়ং ইণ্ডিয়ার প্রিণ্টার ও প্রকাশক। তাঁহারও এক বৎসর দণ্ড হইল। তাঁহার সৌভাগ্য, তিনি সাজা পাইয়া গান্ধীজীর সঙ্গেই জেলে গেলেন এবং নিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গেই থাকিলেন।

জেলে যাওয়ার সময় মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের গঠনকর্মে লাগিয়া যাইতে হইবে; উহার দ্বারাই দেশ সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই গঠনকর্মের মধ্যে খাদিপ্রচার দ্বারা বিদেশী বস্ত্র বর্জন, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সংস্থাপন ইত্যাদি ছিল প্রধান। দেশকে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত দেখিতে না পাইয়াই তিনি বারদোলিতে সত্যাগ্রহ থামাইয়া দিয়াছিলেন। স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল যে, এখনও তিনি সত্যাগ্রহের জন্য অনুমতি দিতে রাজি নহেন। তাঁহার জেলে যাওয়ার পর দেশে এক প্রকারের কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা আসিয়া গিয়াছিল। উৎসাহ ও আবেগের বশে লোকেরা চাহিয়াছিলেন যে, সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াই দেওয়া যাক। কেহ কেহ এ কথা বলিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে, গান্ধীজী সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছেন এবং এখন এ-সব আন্দোলন শেষ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ভাবিতে আরম্ভ করিলেন যে, যখন সত্যাগ্রহ করিতে হইবে না, তখন কাউন্সিল বর্জনের কোনও অর্থ রহিল না— সেখানে যাওয়ার যে বাধা আছে তাহা দূর করিয়া দিতে হইবে। আবার কেহ কেহ গান্ধীজীর প্রবর্তিত গঠনকর্মের উপর জোর দিতেছিলেন এবং সেজন্য জোর দিয়া কাজ করিতে চাহিতেছিলেন।

যে ফাটলের বীজ ডিসেম্বর মাসে লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে বোঝাপড়া না করার জন্য বপন করা হইয়াছিল, আর যাহা বারদোলি সংকল্পের সময় বেশ খানিকটা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা দ্রুতবেগে পল্লবিত হইতে থাকিল। বড়ো বড়ো নেতারাও জেলে ছিলেন। বারদোলি ও দিল্লিতে গৃহীত সংকল্প উপরে দেওয়া হইল। তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ব্যাপক সত্যাগ্রহ তো থামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের অভিযানও বন্ধই ছিল; কিন্তু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সত্যাগ্রহের অনুমতি ছিল।

কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রের কয়েকজন, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট ছিল। দেশের অবস্থার প্রভাবে কংগ্রেস যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অনুযায়ী কাজ তো তাহারা অবশ্যই করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মন কখনই এ-সব কাজে লাগে নাই। এইজন্য সুযোগ পাইলেই তাহারা ইহার কোনও না কোনও অংশের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাইত। ১৯২১-এর জুলাইয়ে নিখিল ভারত

কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনেই তাহারা প্রতিবাদ করে; আবার আমেদাবাদ কংগ্রেসের সময়ও ঐ কথা কহিতে লাগিল। যখন বারদোলিতে ওয়ার্কিং কমিটি সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার সংকল্প করিল, তখন তাহাদের আরও ভালো সুযোগ মিলিল। দিল্লির নিখিল ভারতীয় কমিটির অধিবেশনে ডাক্তার মুঞ্জে তাই এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহার আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। সমস্ত কার্যক্রম সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটি তিনি বসাইতে চাহিয়াছিলেন। সেখানে তো এ প্রস্তাব নামঞ্জুর হইল, কিন্তু মারাঠী মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটিতে ডাক্তার মুঞ্জের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সেখানে এক কমিটি হইল। কমিটি এক রিপোর্ট প্রস্তুত করে, তাহাতে প্রায় সমস্ত কার্যক্রম ভাঙিয়া চুরিয়া এক নূতন কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেখানকার প্রাদেশিক কমিটি উহা নিখিল ভারতীয় কমিটির নিকট বিচারের জন্য পাঠানো হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। নাগপুরে এক প্রকাণ্ড সভা হইল। তাহাতে প্রাদেশিক কমিটির উপর অনাস্থা জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় প্রায় আট-নয় হাজার লোক উপস্থিত ছিল। শ্রীযমুনালাল বাজাজ ছিলেন তাহার সভাপতি। ডাঃ মুঞ্জের মতাবলম্বী লোকেও উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। রিপোর্টের সমর্থনে তাঁহারা যাহা-কিছু বলার ছিল তাহা সবই বলিলেন। কিন্তু সাত ঘণ্টা তর্কবিতর্কের পর সভা রিপোর্টের নিন্দা করিলেন। তাহার অনুকূলেও কয়েকজন হাত উঠাইলেন। বাকি সকলে রিপোর্টের বিরোধীই ছিলেন।

ইহার বিপরীত—বারদোলি ও দিল্লির সংকল্প—বিহার সাদরে গ্রহণ করিল। প্রাদেশিক কমিটি গঠনকর্ম বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রস্তাব পাস করিল। যদিও সেখানেও সরকারি দমননীতিই চলিতেছিল, তথাপি সত্যাগ্রহ বন্ধই ছিল, আর কংগ্রেস-কমিটিগুলিকে আদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন গঠনকর্ম উৎসাহ করিয়া চালাইয়া যায়। গুজরাটও এইরূপই করিল। বিহারে ইহার ফল হইল এই যে, অন্যমতের লোকেরা, যাহারা কিনা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের জন্য কংগ্রেস হইতে দূরেই ছিল তাহারা, গঠনকর্মে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বাবু গণেশদত্ত সিংহ। পাটনাতে এইরূপ সকল ব্যক্তির এক সাধারণ সভা হইল, তাহাতে অন্যান্য অসহযোগীদের সংগে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেখানে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহারাও ইহাতে পুরাপুরি মন দিবেন ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

আমরা খাদির কাজ বেশি উৎসাহে হাতে নিলাম। সংগে সংগে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বিষয়ে এক কন্‌ফারেন্সও করা গেল, তাহাতে নিয়মাবলী ও পাঠক্রম সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তখন যে সমস্ত পাঠশালা চলিতেছিল, তাহাদের

আর্থিক সাহায্য ইত্যাদির কথা ভাবা হইল। আমরা সকলে এই-সব আলোচনা উপলক্ষে এখানে ওখানে ভ্রমণও করিতে লাগিলাম।

সরকারের দমুখো নীতি চলিতেছিল। কোথাও কোথাও গ্রেপ্তারও হইতেছিল। অন্য দিকে, যাহাদের জেলে পাঠানো হইয়াছিল তাহাদের মকদ্দমার কাগজপত্র গভর্নমেণ্ট হাইকোর্টের জজ স্যর বসন্তকুমার মল্লিকের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে, ঐ-সব কাগজপত্র দেখিয়া, সাজা দেওয়া ঠিক ও উচিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার মত তিনি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার অনুমোদন অনুসারে কাহাকেও কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কাহারও সাজা কম করা হইল। কিন্তু অধিকাংশই যেমন জেলে পড়িয়া ছিল তেমনই রহিয়া গেল।

শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ ১৯২১ সালেই, রায় কৃষ্ণসহায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর, বিহার গভর্নরের কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জেলের ব্যাপার তাঁহারই অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি রাজবন্দীদের সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে সাধারণের মনে কিছুটা সন্তোষ জন্মিল। কিন্তু জেল-বিভাগের কর্মচারীরা ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইলেন না। কয়েকদিন পরে জেলাসমূহের ইনস্পেক্টর-জেনারেল হইয়া কোথাও কোন সুদূর প্রদেশ হইতে স্যর হরমুসজী বনাতওয়ালা নামে জনৈক ব্যক্তি আসিলেন। তিনি খুব কঠোর আচরণ করিতে লাগিলেন। নূতন নিয়ম সত্ত্বেও বিহারের জেলে রাজবন্দীদের প্রতি খুব কঠোর আচরণ হইতে লাগিল, তখনকার সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সর্বদাই আলোচনা দেখা যাইত। রাজবন্দীদের দিয়া জাঁতা পেষানো আর ঘানিতে ঘোরানো তো সাধারণ কথা; তা ছাড়া হুকুম অনুসারে পুরা কাজ না হইলে তাহার জন্য সাজা হইত। পায়ে বেড়ি, ডাণ্ডাবেড়ি, দাঁড়ানো হাতকড়া, চটের কাপড়—যে-সব কিনা জেলের কঠোর দণ্ড, অনেককেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। কোথাও কোথাও বেতও লাগানো হইত। মুসলমানদের সংখ্যা জেলে ছিল যথেষ্ট। এজন্য তাহাদের নমাজ লইয়া সংঘর্ষ হইয়াছিল। কর্তারা ইহা বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন; তাহারা সে হুকুম শুনিল না। এজন্য অনেকের সাজা হইল।

মৌলানা মজহর-উল-হক সাহেব ১৯২১-এর সেপ্টেম্বর হইতেই এক সাপ্তাহিকপত্র—নাম 'মাদার-ল্যাণ্ড'—প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তিনি নিজেই বেশি লিখিতেন। উহা পাটনা হইতে প্রকাশিত হইত। উহাতে জেলের বিষয়ে একটা লেখা ছাপাইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে স্যর হরমুসজী বনাতওয়ালা মকদ্দমা চালাইলেন। ফলে তাঁহারও সাজা হইয়া গেল। শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহের জেলশাসনের বিরুদ্ধে আমাকেও এক কড়া মন্তব্য লিখিতে হইয়াছিল।

মহাত্মাজীর জেল হইয়া যাওয়ার পর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক যেখানে

সেখানে হইতে থাকিল। বৈঠকে গঠনকর্মের উপর জোর দেওয়া হইত। এক বৈঠকে স্থির হইল, খাদিপ্রচার কর্ম সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য বোর্ড গঠন করিতে হইবে। এই কার্যে তিলক স্বরাজ্য ফন্ড হইতে টাকা দেওয়ার অনুমতিও দেওয়া হইল। শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল ছিলেন নিখিল ভারতীয় কমিটির সম্পাদক। তিনি বক্তৃতায় ও সংবাদপত্রে লেখার দ্বারা জনসাধারণ ও কংগ্রেসকর্মীদের বরাবর উৎসাহিত করিতেন, যাহাতে তাঁহারা কংগ্রেসের বেশি বেশি সভ্য করেন, তিলক স্বরাজ্য ফন্ডের অর্থ সংগ্রহ করেন এবং খাদি-প্রচার, অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষার কাজে বেশি বেশি জোর দেন। ইহাতেও আলস্য বা জড়তা আসিতেছিল। লখনৌয়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসিল। শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল তখনকার অবস্থা দেখিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমি লখনৌয়ে ঠিক পেঁৗছিলাম বটে, কিন্তু সেখানে পেঁৗছিয়াই জ্বরে পড়িলাম। তাই সেখানকার বৈঠকে প্রায় দর্শকের মতোই যোগদান করিলাম। আলোচনা প্রভৃতিতে বেশি যোগ দিতে পারিলাম না। ভাগ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই সময়ে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার পরের দিন ঐ বৈঠকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী পেঁৗছিবার পূর্বেই ঐ বৈঠকে শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল ও অন্য কয়েকজন নেতার উদ্‌যোগে এক কমিটি নিয়োগের কথা হইল, উহার উপর এই কাজ দেওয়া হইল যে, দেশের অবস্থা বিচার করিয়া এবং যেখানে গিয়া তদন্ত করা প্রয়োজন মনে হইবে সেখানে গিয়া তদন্ত করিয়া, দেশ সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত কি না সে বিষয়ে রিপোর্ট দিতে হইবে। পণ্ডিতজীও আসিয়া এই কথা গ্রহণ করিয়া লইলেন। সভাপতির নিকট অনুরোধ করা হইল যে তিনি এক কমিটি গঠন করুন। গান্ধীজী, কোনও কমিটির তদন্ত ছাড়াই, দেশের নাড়ী চিনিতে পারিতেন। যখন হইতে তিনি ভারতে ফিরিয়াছিলেন এবং খোলাখুলি সাধারণ হিতের কাজে যোগ দিতে আরম্ভ করেন তখন হইতেই তিনি নিজের এই শক্তির বলে কাজ করিতেন। তিনি সরিয়া যাওয়াতেই কমিটির এই প্রয়োজন অনুভব হইল। কিন্তু ইহার ফল ভালো হইল না। ভারতে ব্রিটিশ সরকার যেমন কোনও ব্যাপারে পিছাইতে হইলে এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতেন, আমরাও যেন তেমনই করিলাম। ইহাতে সত্যাগ্রহ একপ্রকার স্থগিত করা হইল। গঠনকর্মে যে উৎসাহ উত্তেজনা চাই আর যাহার উপর গান্ধীজী জোর দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও একরকম গৌণ হইয়া দাঁড়াইল।

এই বৈঠকে অন্য একটা কাজ করা হইল, তাহার ফল কয়েকদিন পরে খুব ভালোই দেখা গেল। সারা দেশে খাদির কাজ দেখাশোনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যে বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন, কমিটি তাহা অনুমোদন করিলেন। ১৯২১-এ যখন স্বরাজ্য ফন্ড সংগ্রহ হয় আর খাদির কাজের

উপর জোর দেওয়া হয়, তখন ঐ ফণ্ড হইতে সকল প্রদেশে খাদিপ্রচারের জন্য টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এখন কাহারও খাদির বিশেষ জ্ঞানও ছিল না, অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাই মনে হইল যে, অনেক টাকা লোকসান হইবে, কাজ ঠিকমতো অগ্রসর হইবে না। এই বোর্ডের উপর সমস্ত প্রদেশে সুষ্ঠুরূপে কাজ দেখাশোনা করিবার ভার দেওয়া হইল। শেঠ যমুনালাল বাজাজ ইহার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। গঠনকর্মে শেঠজীর খুব বিশ্বাস ছিল। তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও অনুরাগ সহকারে খাদি প্রচার ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের কাজ শুরু করিয়া দিলেন।

বিহারে কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ ও তাহার আয়োজন

আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিহারের যে যে প্রতিনিধি উপস্থিত হন তাঁহাদের সকলের মত হইল যে, এবার কংগ্রেসের অধিবেশন বিহারে করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হউক। বিহারে ইহার পূর্বে কেবল একবারই কংগ্রেস হইয়াছিল—১৯১১ সালে, যখন নিজেদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে আর খুব কম লোকই উপস্থিত হয়। সেবারকার অধিবেশনে কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা এমন কিছু ভালো ছিল না, বরং কটুই ছিল। এমন-কি, কংগ্রেসের সময়ে যে খরচ হইয়াছিল তাহার কিছু টাকা বাকি পড়িয়া যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মজহর-উল-হক সাহেব, সম্পাদক শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ এবং অন্যান্য সদস্যদের উপর ঐ বাকি টাকার জন্য আদালতে নালিশ হয়। কিন্তু বিহারে, মহাত্মাজী চম্পারনে আসার পর বিশেষ করিয়া ১৯২১ সালের আন্দোলনের জন্য, দেশ অনেকটা জাগিয়াছিল। আমরা মনে মনে বুঝিয়াছিলাম যে, এবার ঐরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা হইবে না। আমরা সাহস করিয়া নিমন্ত্রণ তো করিয়া বসিলাম, কিন্তু সেখানে এ কথা ঠিক করিতে পারিলাম না যে বিহারের কোন্ শহরে অধিবেশন করা যাইবে। সে কথা বিহারের প্রাদেশিক কমিটির বৈঠকে স্থির করা যাইবে বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কংগ্রেসও আমেদাবাদে স্থির করে নাই যে, কোন্ প্রদেশে আগামী অধিবেশন হইবে। বিহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইবে, এই কথা ওয়ার্কিং কমিটি কয়েকদিন পরে স্থির করিলেন।

বিহারে, প্রাদেশিক কমিটির বৈঠকের পূর্বে, আমি নিজে গিয়া কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর কমিটির বৈঠক হইল।

সেখানে স্থির হইল যে, গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন করা যাইবে। অর্থ-সংগ্রহের জন্য ঐ জেলায় আমি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ সেন সিংহের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলাম। চেষ্টা খানিকটা সফলও হইল। সমস্ত জেলায়—আমি নিজে কখনও পূর্বে যাই নাই—যাওয়ার খুব সুযোগ পাওয়া গেল। ঐ জেলায় বর্ষায় ঘোরা বড়ো মুশকিল। এঁটেল মাটি। যেখানে পাকা রাস্তা নাই সেখানে কোনও প্রকার যানবাহন নাই। তাই, বর্ষার পূর্বেই, যেখানে কিছু লোকসমাগম হইতে পারে—এমন অনেক জায়গায় গিয়া প্রচারের কাজ করিয়া লইলাম।

পাটনায় ১৯১১ সালের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে মকদ্দমার কথা আমার মনে ছিল। এজন্য স্থির করা হইয়াছিল যে, এখন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক বা অন্য পদাধিকারী পাকাপাকি নির্বাচন করা হইবে না। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য অধিকসংখ্যায় সংগ্রহ হইলে পদাধিকারী নির্বাচন সংগত হইবে। ততক্ষণ কাজ চালাইবার জন্য আমাকেই অস্থায়ী সম্পাদক করা হইল। কয়েকজন সদস্য লইয়া—তাহাদের মধ্যে অনুগ্রহবাবুও ছিলেন—আমার সাহায্যের জন্য ছোটোখাটো এক কার্যকর সভাও গঠন করা হইল। আমি স্থির করিয়া লইয়াছিলাম আর কমিটিকে বলিয়াও দিয়াছিলাম যে, আমি এক পয়সাও ধারকর্জ করিয়া খরচ করিব না—শুধু তাই নয়, কোনও কাজ ততক্ষণ শুরুই করিব না যতক্ষণ তাহার জন্য পুরাপুরি টাকা হাতে না পাইব। এই একমাত্র উপায়েই নিজেকে ও কমিটির সদস্যদের নিজেদের উপর আর্থিক দায়িত্ব হইতে বাঁচাইবার পথ ছিল। সমস্ত জেলায় পত্র লেখা হইল যে, সকলে যেন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য গঠন করেন এবং চাঁদা জমা করেন। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে একটু আলস্য দেখা গেল, অর্থসংগ্রহও কম হইতে লাগিল। আমেদাবাদের পর কংগ্রেসের রূপই বদলাইয়া গিয়াছিল। আমাদের প্রায় নূতন করিয়া এক শহর নির্মাণ করিতে হইবে, সে শহর হইবে গয়া শহরের বাহিরে। সেখানে লোকদের থাকার জন্য কুটির, আলো ও জলের পুরা-পুরি ব্যবস্থা থাকিবে। এ ছাড়া কংগ্রেসের প্যাণ্ডেল তৈরি করিতে হইবে। স্থান-সংগ্রহে কিছু অসুবিধা হইল। কিন্তু স্থানীয় লোকদের কৃপায়, গয়া শহরের প্রায় দেড়-দুই মাইল দক্ষিণে, 'তেনুই' গ্রামে, পাকা সড়কের পূর্ব দিকে আমের বাগান ও পশ্চিমে খালি খেত পাওয়া গেল। স্থির হইল, ফাঁকা খেতে প্যাণ্ডেল বসিবে, বাগানে হইবে থাকিবার কুটির। খানিকটা দূরে আর একটা ফুলবাগান পাওয়া গেল, সেখানে একটা ছোটো বাংলোও ছিল। সেখানে খাদি-প্রদর্শনী করা স্থির হইল। খানিকটা সময় তো নকসা করিতে ও এখানে ওখানে টাকা ও বাঁশপাতা একত্র করিতে ব্যয় হইল। বর্ষায় কাজ হইতেই পারিত না, এইজন্য বর্ষার পরেই কাজ আরম্ভ করা স্থির হইল।

অধিবেশন হইত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। এইজন্য বর্ষার পর প্রায় তিন মাস সময় পাওয়া যাইত। টাকা ও সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকিলে সমস্ত কিছু করিয়া লওয়া বেশি মুশকিল হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সময় হইয়া গেলেও টাকা বেশি আসে নাই। আমি পত্রের দ্বারা আর লোক পাঠাইয়া সমস্ত জেলায় তাগিদ করিলাম, কিন্তু যথেষ্ট টাকা আসিল না। আমার চিন্তা বাড়িতে লাগিল। আমি তো স্থির করিয়াই লইয়াছিলাম যে, ততক্ষণ কাহাকেও কেনো কণ্ট্রাক্ট দিব না যতক্ষণ কণ্ট্রাক্টের জন্য পুরা টাকা ব্যাঙ্কে জমা হইয়া না যাইবে। সময় যতই কাছে আসিতে লাগিল, চিন্তা ততই বাড়িতে লাগিল। আমরা সেই সময়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম যখন সময় কম বলিয়া প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি, প্যাণ্ডেল ইত্যাদি তৈয়ার করিবার কোনও ঠিকাদার পাওয়া যায় না। কমিটির বৈঠক বসিল, সমস্ত কথা আলোচনা করা হইল। আমি আমার এই সংকল্পে স্থির রহিলাম যে, যতক্ষণ না কোনও কাজের জন্য পুরা টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয় ততক্ষণ আমি সম্পাদক হিসাবে কোনও কণ্ট্রাক্টে সই করিব না। সমস্ত জেলার কর্মকর্তাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া আমরা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। শেষটায় স্থির হইল যে, কমিটির সভ্যদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে, সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া তবে নগর-নির্মাণ প্রভৃতি কণ্ট্রাক্ট দেওয়া যাইবে।

এইভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ করিবার কথা স্থির হইল। কেহ কেহ চাহিতেছিল যে এই কথা গোপন রাখা হউক, কারণ এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সমস্ত প্রদেশের অপমান, আর সরকারের কর্মচারী ও অন্যান্য লোকেরা ইহা দেখিয়া আমোদ বোধ করিবে। আমি বলিলাম, এ প্রদেশের জনসাধারণের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। লোকে যখন এ কথা বুঝিবে যে, কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমরা অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছি, তখন তাহারা অবশ্যই প্রয়োজনমতো টাকাপয়সা দিয়া দিবে। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী কর্মীরাও অবস্থা যে কত খারাপ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিবে এবং টাকা সংগ্রহের জন্য মনে প্রাণে চেষ্টা করিবে।

প্রস্তাব সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দেওয়া হইল। আমি টাকা জোগাড় করিবার জন্য ঘুরিতে লাগিলাম। লোকে যেমনই খবরের কাগজে এই প্রস্তাবের কথা পড়িল, অমনই সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের মনে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সকলে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যসংগ্রহ করিতে ও অর্থসংগ্রহ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। আমি যেখানে গেলাম সেখানে টাকা পাইতে লাগিলাম। প্রদেশের অপমানের কথা সকলে অনুভব করিতে লাগিল। প্রায় এক সপ্তাহ সফর করার পর কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিলাম। টাকাটা সঙ্গেই ছিল। শহর হইতে প্রায় দেড় মাইল

দূরে আমরা সেই ছোট বাংলোতে থাকিতাম, যেখানে খাদি প্রদর্শনী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেখানে এতগুলি টাকা সঙ্গে সঙ্গে রাখা ঠিক হইবে না। রেলগাড়ি হইতে প্রায় ৪টার সময় বিকালে স্টেশনে নামিলাম। গয়া স্টেশনে পুলিশের এক দারোগার সঙ্গে দেখা হইল। সে খবরের কাগজে আমাদের প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিল। সে এই স্বপ্ন দেখিতেছিল যে, গয়াতে হয়তো কংগ্রেস হইতেই পারিবে না। ট্রেন হইতে নামিতেই সে আমাকে প্রশ্ন করিল, ব্যাঙ্ক হইতে টাকাটা কি কর্জ লওয়া হইয়াছে? হয়তো সে ভাবিয়াছিল, ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর কোনও ব্যাঙ্কই এত টাকা ধার দিবে না। আমি উত্তর করিলাম, না। তখন সে প্রশ্ন করিল, তাহলে কংগ্রেস হইবে কি করিয়া? আমি উত্তরে বলিলাম, ধার লইবার আর এখন প্রয়োজন রহিল না। এ কথা শুনিয়া সে খুব আশ্চর্য বোধ করিল। আমি এ কথাও বলিয়া দিয়াছিলাম যে, এখন কাজের জন্য যথেষ্ট টাকা আসিয়া গিয়াছে আর আমি নিজে সঙ্গে করিয়া ভালোমতো কিছু টাকা জোগাড় করিয়া লইয়া আসিয়াছি। আমার কথায় তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। আমি তো টাকার বোঝা ব্যাঙ্কের ঘাড়ে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছিলামই। এজন্য গাড়ি ভাড়া করিয়া সোজা ব্যাঙ্কের দিকে গেলাম। সে সাইকেল করিয়া গাড়ির পিছনে পিছনে চলিল। যখন সে দেখিল যে, ব্যাঙ্কে সত্যসত্যই আমি বেশ ভালো রকম কিছু টাকা গুণতি করিয়া জমা করিয়া দিতেছি তখন আমার কথায় তাহার বিশ্বাস জন্মিল। সে আমার সঙ্গ ছাড়িয়া নিজের অন্য কাজে চলিয়া গেল। আমি যাহা কিছু জোগাড় করিয়া আনিয়াছিলাম তা ছাড়া সমস্ত জেলা হইতেই রোজ রোজ টাকা আসিতে থাকিল। আমরাও এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেই থাকিলাম। এদিকে ঘরবাড়ি তৈরির কাজও জোর চলিতে লাগিল।

গরিব বিহার ধনী আমেদাবাদের সাজসজ্জা নকল করার বা ছাড়াইয়া যাওয়ার আর কতদূর স্পর্ধা করিতে পারে? কিন্তু আমার মনে হয় আমরাও ভালোমতো আয়োজন করিয়াছিলাম, আর খরচও গুজরাট হইতে অনেক কমই হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর বিষয়ে আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, খাদি তৈরির সমস্ত প্রক্রিয়াই দেখানো হইবে। খাদিতে আমরা শুধু কার্পাসের কাপড় নয়, রেশম, পশম, পাট ইত্যাদি সমস্ত জিনিসই ধরিয়া লইয়াছিলাম, যাহা হইতে সুতা বা রশি টানিয়া কোনও না কোনও বস্তু বুনাইয়া তৈরি করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকটি, শুরু হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ জিনিস তৈরি হইয়া ব্যবহারযোগ্য না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া দেখাইবার আয়োজন করা হইল। যেমন, কার্পাসের কথা ধরুন। কার্পাসের গাছ হইতে শুরু করিয়া কার্পাসের বীজ ছাড়ানো,

ধুনাই, কাতাই, তুনাই, জড়ানো, বোনা, কাপড় ধোওয়া ও রং করানো ইত্যাদি সকল প্রক্রিয়াই দেখানো হইত। এই প্রকার পশম, রেশম, পাট প্রভৃতির বিষয়েও। তখনও চরকা-সংঘ পাকাপাকি হয় নাই। খদ্দর-বোর্ড তাহার কাজ করিতেছিল, কিন্তু তখনও তাহার বয়স এক বৎসরও হয় নাই। তাই খাদি-কাজের সংগঠন ও অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান কিছু ছিল না বলিলেই হয়। এ-সব বিষয়ের ও সকলের জন্য কারিগর জোটানো বড় সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু এ-সব আয়োজন হইয়া গেল। খাদি-প্রদর্শনী নিজের ধরনে উৎকৃষ্ট হইল। দর্শকদের নিকট হইতে যে পয়সা আসিল তাহা প্রদর্শনীর ব্যয়ের পক্ষে প্রায় যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইল।

আসাম ও সাঁওতাল-পরগনায় দমননীতি

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ও কাজকর্মের বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্বে ১৯২২ সালের কংগ্রেসের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পরও সরকারের দমননীতি কোনও কোনও প্রদেশে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। বড়ো বড়ো নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল ভিন্ন আর সকলে প্রায়ই জেলে থাকিতেন। দমনের জন্য জনসাধারণ কিছুটা যেন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। কংগ্রেসকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। অল্প কয়েকজন যাহারা বাহিরে ছিল, তাহাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গেল। মালব্যজীর মতে আসামে, যেখানে দমননীতির ভয়ানক সব খবর আসিতেছিল, সেখানে অবশ্য যাওয়া চাই। আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম। সেখানে প্রায় সমস্ত জেলায় কংগ্রেস কমিটি, শুধু শহরে নয়, অনেক গ্রামেও স্থাপিত হইয়াছিল। আসামের বাড়িঘর অধিকাংশ কাঠের; কংগ্রেসের বাড়িও কাঠের ছিল। সরকারি কর্মচারীরা প্রায় সর্বত্র কংগ্রেসের অফিস পোড়াইয়া দিয়াছিল। সব ভালো ভালো কর্মী গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছিল। কংগ্রেসের সেবকদলের সদস্য দেখিতে পাওয়া মাত্র গ্রেপ্তার করা হইত।

আসাম সরকারের ক্রুদ্ধ হওয়ার বিশেষ কারণ এই ছিল যে, আসামে আফিম বিক্রি করিয়া সরকারের ভালো আয় হইত। সেখানকার লোকে আফিম খাইত, ফলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বল কমিয়া যাইত। কম বয়সেই তাহারা বৃদ্ধ হইয়া পড়িত। মনে প্রাণে দুর্বল হইত বলিয়া তাহারা অকর্মণ্য হইয়া যাইত। এ অবস্থা শুনিয়া গান্ধীজী সেখানকার

কর্মীদের আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন আফিম বন্ধ করিবার আন্দোলন করে। ঐ আন্দোলনের ফলে আফিম বিক্রি অনেক কমিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আয়ও কমিয়া যায়। তাই সরকারি কর্মচারীদের চেষ্টা ছিল কংগ্রেসকে দমন করিতে হইবে। উপরে যেমন বলা হইয়াছে, তাহারা কঠোর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

সেখানে পৌঁছিয়া আমরা সমস্ত অবস্থা দেখিলাম ও স্থির করিলাম যে, সমস্ত প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। আমার পক্ষে এবং মালব্যজীর পক্ষেও আসাম-দর্শনের এই প্রথম সুযোগ। বেশ সবুজে শ্যামলে ফুলে ফলে ভরা দেশ। তাহাতে ব্রহ্মপুত্র নদ ও পাহাড়গুলির শোভা অত্যন্ত মনোহর। ঘন বিশাল বৃক্ষরাজি ও ছোটো ছোটো গুল্মে পরিপূর্ণ জঙ্গল যেখানে প্রদেশের শোভা বাড়ায়, সেখানে জঙ্গলের জানোয়ারের জন্য—তাহাদের মধ্যে হাতি ও বাঘ প্রধান—চাষবাস ও ভ্রমণ বিপজ্জনকও হইয়া পড়ে। হরিৎ বর্ণ দেখিতে তো সুন্দর বটেই; কিন্তু মাটি সর্বদা ভিজা থাকে বলিয়া দেশের অনেক অংশ ম্যালেরিয়ার গ্রাসেও পড়িয়াছে।

গৌহাটিতে পূজ্য মালব্যজী অত্যন্ত জোরালো ও উদ্দীপক বক্তৃতা করেন, আফিম বন্ধের কাজ চালু রাখার জন্য সকলের কাছে আবেদনও জানাইলেন। আমিও কিছুটা বলিলাম; কিন্তু পূজ্য মালব্যজী সভায় থাকিতে আর কে কি বলিতে পারে! আসাম ভ্রমণে আমরা যে যতটা সময় দিতে পারিতাম, তাহার মধ্যে অনেক জায়গায় পৌঁছানোই সম্ভব হইত না। এইজন্য আমরা দুই দলে ভাগ হইয়া গেলাম। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবক মালব্যজীর সঙ্গে সেই-সব জায়গায় চলিয়া গেল যেখানে রেল বা স্টিমারে যাওয়া যাইতে পারে। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আমার এমন কয়েকটি জায়গায় যাওয়া স্থির হইল, যেখানে গোরুর গাড়িতে যাইতে হয়। ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছিল, আর আমার মনের অনুকূলও বটে; কারণ এইভাবে গ্রামের অবস্থা বেশি করিয়া দেখিতে পারিব। সঙ্গে সঙ্গে পূজ্য মালব্যজী বৃদ্ধাবস্থায়— তখন তাঁহার বয়স ষাট-এরও বেশি— গোরুর গাড়িতে ঘোরা হইতে বাঁচিবেন। এমনভাবে জায়গাগুলি বাছা হইল যেখানে চণ্ডনীতি অত্যন্ত তীব্র বেগে অনুসরণ করা হইতেছে।

আমাকে এক বেহদ্দ জায়গায় যাইতে হইল, যেখানে খানিকটা দূর পর্যন্ত ঘন জঙ্গল হইয়া আমাকে যাইতে হইত। আসামের গ্রামে বিহারী মজুর কাজ করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। বিহারের গোরুর গাড়ি মাল বহে। গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গেলাম। সেখানে সুবিধা-মতো দুইটি নৌকা ভিড়িয়াছিল। মাল্লাদের পরস্পর কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, তাহারা ছাপরা জেলার কথা বলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, মাঝির বাড়ি হইল ছাপরা জেলার কোনও গ্রামে, আর

বরাবর নৌকায় যাওয়া-আসা করে। স্টিমারের উপরে যে হালুইকর দোকান দিয়াছিল তাহারও বাড়ি ছাপরা জেলায়।

আমরা গৌহাটি হইতে পনেরো-ষোল মাইল পর্যন্ত লরি করিয়া গেলাম। সেখান হইতে গোরুর গাড়িতে আরও প্রায় কুড়ি মাইল যাইতে হইবে। রাস্তা জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। জায়গাটির নাম আজ মনে নাই। জায়গাটিতে আমরা তো প্রায় বারোটা বেলায়ই পৌঁছিয়া গেলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, জঙ্গলের রাস্তাও তাড়াতাড়ি গেলে দিনের মধ্যেই বেশির ভাগ কাটিয়া যাইবে। দুইটি গোরুর গাড়ি ভাড়া করা হইল। কিন্তু গাড়োয়ান কোনো-না-কোনো ছুতায় দেরি করিয়া প্রায় বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত রওনা হইল না। খোঁজখবর করিয়া জানা গেল যে কড়া রৌদ্র বলিয়া গোরুর গাড়ি বেশির ভাগ রাত্রেই চলাচল করে। একটা গাড়িতে আমি ও একজন স্বেচ্ছাসেবক বসিলাম। অন্যটিতে অন্য দুই-তিনজন স্বেচ্ছাসেবক। কাছে খাওয়ার কিছুই নাই। রাত আটটায় একটা জায়গায় আসিয়া পেঁাছিলাম, যাহা চটির মতো মনে হইল। অনেক গাড়ি সেখানে জমা হইয়াছিল। খোঁজ করিয়া শুধু ভাজা ছোলা পাওয়া গেল, তাহা লইয়া আমরা গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। উহা চিবাইয়া আমি গাড়িতে শুইয়া পড়িলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে খুব গোলমাল শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, স্বেচ্ছাসেবক দুইটি কেরোসিন তেলের টিন খুব জোরে পিটিতেছে, আর জোর গলায় গান করিতেছে, এইভাবে গোলমাল হইতেছে। সেই সঙ্গে গাড়োয়ানও খুব জোরে চিৎকার করিয়া বলদ তাড়াইতেছে। দুই গাড়ির সঙ্গে যে লণ্ঠন ছিল তাহা ঝুলিতেছে। পথ খুব সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দুই পাশে বড়ো বড়ো গাছ, খুব ঘন জঙ্গল। উহা হইল এক ঘাঁটি, দুই দিকেই পাহাড়, কিন্তু রাত্রে গাড়ি হইতে তাহা দেখা যাইতেছিল না— ফিরিবার সময়েই আমি ও-সব দেখিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, ঐ স্থানে জঙ্গলী জানোয়ার—বিশেষ করিয়া বাঘ— সর্বদা যাওয়া-আসা করে। তাহাদের তাড়াইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও গাড়োয়ান ডাকহাঁক করিতেছিল। তাহারা বলিল যে, জানোয়ার ঐ আওয়াজের নিকটে আসে না, সড়কের উপরে থাকিলেও হটিয়া যায়। কিন্তু কোনও কোনও জানোয়ার এতটা সাহসী হয় যে, গাড়ির বলদকেও টানিয়া লইয়া যায়। জানা গেল যে, সম্প্রতি এরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার পর আমি আর ঘুমাইতে পারিলাম না।

যখন আমরা ঘন জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিলাম ও জানোয়ারের ভয় কম হইয়া গেল তখন শোরগোল করাও বন্ধ হইল। আমরা গন্তব্যস্থানে খুব ভোর থাকিতেই পেঁাছিলাম। সেখানকার জনসাধারণ বড়োই আতঙ্কে ছিল। কংগ্রেসের ছোটোখাটো বাড়ি পোড়াইয়া দিয়াছিল। কংগ্রেসকর্মী

সকলে গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছিল। থানা ছিল কাছেই। লোকে ভয়ে এখন কংগ্রেসের কাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা পেঁাছিবার পর তাহাদের সাহস ফিরিয়া আসিল। সকলে একত্র হইল। আশপাশের গ্রামে খবর দেওয়া হইল যে, সভা হইবে। ইতোমধ্যে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে সেখানকার দমনের অবস্থা আমরা শুনিতে থাকিলাম। আফিম বন্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও অবগত হইলাম। দুপুর পর্যন্ত লোক জমা হইয়া গেল। দুই-তিন শো লোকের এক ভালোমতো সভা হইল। দেখিলাম, লোকের সাহস বাড়িয়াছে। আবার কংগ্রেস-ভবন তৈয়ার করিতে ও আফিস বন্ধ ব্যাপারে কাজ চালাইতে লোকদের বলিলাম। পুলিশ হাজির থাকিলেও লোকে খোলাখুলিভাবে সভায় যোগ দিল।

আমরা প্রায় তিনটায় সেখান হইতে ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, যে জায়গাটায় রাত্রে টিন বাজাইতে হইয়াছিল দিনের আলো থাকিতে সেখানটা পার হইয়া যাই। হইলও তাই। ঐ জায়গাটায় পেঁাছিতে সূর্যাস্ত হইল, কিন্তু তখনও অন্ধকার হয় নাই। আমি সঙ্গীদের লইয়া পায়ে হাঁটিয়াই চলিতেছিলাম। গাড়ি দুইটি সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। ইহার মধ্যে পাহাড়িয়া অঞ্চল হইতে বাঘের গর্জন শুনিতে পাওয়া গেল। এ শব্দ দুই দিক হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল, হইতে পারে শব্দ আসিতে-ছিল এক দিক হইতে, আর একই বাঘের শব্দ, কিন্তু ঐ নির্জন পাহাড়-জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হইয়া কয়েকটি বাঘের একসঙ্গে আওয়াজ বলিয়া মনে হইতেছিল। বাঘ কিন্তু কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। আওয়াজ খুব নিকটে নয়, হয়তো দুই-তিন ফার্লং দূর হইতে আসিয়া থাকিবে। আমি চিড়িয়াখানা ছাড়া বাঘের এমন গর্জন আর কখনও শুনি নাই।

সারা রাত গাড়িতে চলিয়া আমরা খানিকটা রাত্রি থাকিতেই যেখান হইতে মোটর-লরি যায় সেখানে গিয়া পেঁাছিলাম। প্রায় দশটার সময় আবার গৌহাটিতে আসিলাম। পূজ্য মালব্যজীর সঙ্গে অন্যান্য জায়গায় যাওয়া শেষ করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করিলাম। লখনৌতে যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হইবার কথা ছিল তাহাতে যোগদান করিলাম। দেখিলাম যে, ঐ পতিত অবস্থাতেও পূজ্য মালব্যজী লোকদের জাগাইবার জন্য ও সাহস দিবার জন্য চেষ্টায় কতখানি সফল হইয়াছেন। তাঁহার কথায় শক্তি তো আছেই, ওখানকার অবস্থা দেখিয়া তাহাতে আরও তেজ আসিল। তাঁহার ঐ যাত্রা এই দুঃসময়েও অনেক পরিমাণে সফল হইল।

আমাদের নিজের প্রদেশে (বিহারে) সাঁওতাল পরগনায় দমননীতির দুঃসংবাদ আসিল—বিশেষ করিয়া পাকুর হইতে। আমি সেখানেও গেলাম। স্থানীয় লোকে এতই ভয় পাইয়া গিয়াছিল যে, স্টেশনে আমাদের

সঙ্গে দেখা করিতেও কেহ আসে নাই। আমরা সারা রাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর শুইয়া রহিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি, কুকুর এক পাটি জুতা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। ওখানেই মুখ-হাত ধুইয়া শহরে যাওয়ার কথা স্থির করিলাম। অল্প খানিকটা গিয়াই ওকালতির সময়কার এক পরিচিত মক্কেলের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আমি স্টেশনে পড়িয়া আছি—জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কেহ নাই, আর এই কথা শুনিয়া তিনি আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য আসিতে-ছিলেন। আমি তাঁহার বাড়ি গেলাম। স্নানাদি শেষ করিয়া জেলখানাতে গেলাম। আমাদের পৌঁছিবার দুই-একদিন পূর্বেই পাঁচ-ছয়জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইতে হইতে প্রায় বারোটা বাজিল। জুতা তো ছিলই না, রোদ ছিল প্রচন্ড। সেখানকার রাস্তার বড়ো বড়ো মুরাম মাটির ঢেলাও খুব গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সেখান হইতে খালি পায়ে ফিরিবার সময় পা এতখানি পুড়িয়া গিয়াছিল যে, সমস্ত পায়ের তলার চামড়া উঠিয়া আসিয়াছিল। কোনও প্রকারে বাসস্থানে আসিয়া এক জোড়া দড়ির জুতা কিনিয়া লইলাম, তাহার তলাটা দড়ির। বিকালে রাস্তার পাশেই সভা হইল, তাহাতে কিছু কিছু লোক আসিল বটে, কিন্তু আতঙ্কও ছিল যথেষ্ট। সেখানেও আমরা গেলে লোকের মধ্যে কিছু সাহস আসিল। ধৃত কর্মীদের বাড়ি গিয়া তাহাদের পরিবারের মধ্যে সাহস সঞ্চারিত করা হইল।

আমরা দুমকাতেও গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেও থাকিবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমরা এক ধর্মশালায় গিয়া উঠিলাম। সেখানে স্থানীয় পুলিশ দারোগাও ছিলেন, তিনি ভোজপুরী বুলি বলিতেন এবং প্রতি মিনিটে একবার 'জয় শিব' বা 'ব্যোম্ ব্যোম্' বলিয়া উঠিতেন। তিনি অতিশয় ভদ্রতার সঙ্গে আলাপ করিলেন; কিন্তু তাঁহার পরামর্শ হইল, আমাদের সেখানকার কাজ তো শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন সেখানে আর থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শেষে তিনি এ কথাও বলিলেন যে, আমাদের সেখান থেকে চলিয়া যাইবার হুকুম আছে। হুকুম দেখিতে চাহিলে তিনি দেখাইতে পারিলেন না, আনিতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না! আমরা সেখানে তাঁহার অপেক্ষাই করিতে থাকিলাম! আমি আমার প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে বেশিক্ষণ থাকিবার সংকল্প করি নাই, সুতরাং রাত্রির গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

দুমকার অন্য এক স্থানে কয়েকজন নেতা গিয়াছিলেন। সেখানকার লোকদের মধ্যে একজন ভালোমতো অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তাঁহারা যেখানে উঠিয়াছিলেন, সেখানে একজন তাঁহাদের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছিল। লোকদের ভয় ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সে ব্যক্তি ছিল নির্ভয়।

নেতাদের চলিয়া আসার পর শোনা গেল যে, ঐ গরিব লোকটির জমি 'উচ্ছেদ' করিয়া লওয়া হইয়াছে। ওখানকার জমি সরকারি বলিয়া মনে করা হইত। কোনও চাষীকে তাহার নিজের জমি হইতে তাড়াইয়া দিলে ওখানে 'উচ্ছেদ' করা বলা হইত। তাহার জমি ফেরত দেওয়ার জন্য আমরা পরে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টায় কোনও ফল হয় নাই।

সাঁওতাল পরগনায় যে জুলুম হইয়াছিল, তাহার বিষয়ে আমি এক দীর্ঘ বিবরণী তৈয়ার করিয়াছিলাম। তাহা সাময়িকপত্রে, বিশেষ করিয়া 'সার্চলাইটে', ছাপাইয়া দেওয়া হয়।

কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া বাক্‌ বিতণ্ডা

উপরে সত্যাগ্রহ তদন্ত কমিটির প্রসংগ আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত কমিটি প্রশ্নাবলী তৈয়ারি করিয়াছিল এবং সমস্ত কংগ্রেস কমিটির নিকট উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। তাহার পর সমস্ত প্রদেশে গিয়া, সেখানকার কর্মীদের সংগে দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিবে ও সাক্ষ্য লইবে স্থির করিয়াছিল। আমার কাছে ইহা ভালো লাগে নাই; কারণ ইহা তো সরকারি কমিটির পদ্ধতির অনুরূপ, তাহাতে প্রায়ই রিপোর্ট দেওয়া ছাড়া— তাহাও অনেকটা সময় লইয়াছে— আর কিছুই করিতে চাওয়া হয় নাই। কমিটির কাজ-কর্ম যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই স্পষ্ট বোঝা যাইতে লাগিল যে, উহাতে দুই মত আছে। এক পক্ষ গান্ধীজীর নির্দেশিত গঠনকর্মের উপর জোর দিয়া দেশকে সত্যাগ্রহের জন্য তৈয়ারি করিতে চাহিয়াছিল, আর অন্য পক্ষ, দেশ সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত নহে দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, কাউন্সিলে যাইতে হইবে এবং কাউন্সিল বর্জনের যে প্রস্তাব কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশনে ১৯২০ সালে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বদল করিতে হইবে। কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যেও অনেক মতভেদ দেখা গেল— যদিও গান্ধীজীর কার্যক্রম অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষেই বেশি লোক ছিল বলিয়া মনে হইল। কমিটি সমস্ত প্রদেশের উত্তর ভাগে নিজে গিয়া কর্মীদের বিবৃতি গ্রহণ করিলেন— এই ব্যবস্থায় কমিটির সদস্যেরা পাটনাতেও আসিলেন। অন্য কংগ্রেসকর্মীদের ছাড়া আমাকেও এজাহার দিতে হইল। আমি গান্ধীজীর কার্যক্রমের পুরাপুরি পক্ষপাতী ছিলাম। আমার বিবৃতিতে উহা জোরে সমর্থন করিলাম।

শেষে কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে দেখা গেল ছয় জন সদস্যের

মধ্যে তিন জন এক দিকে, আর তিন জন অন্য দিকে। তাই কাউন্সিলের ব্যাপারে কমিটি কোনও নির্দেশ দিতে পারিলেন না। সমস্ত সদস্যদের মত দিয়াই কমিটি সন্তুষ্ট থাকিতেন। রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব হইতেই উগ্র মতভেদ দেখা যাইতেছিল। বাহির হইবার পর তো তাহা আরও উগ্র হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রে ও কংগ্রেসী বৈঠকে কাউন্সিলে যাওয়া না যাওয়া লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। যাহারা কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে তাহাদের নামকরণ হইল 'প্রো-চেঞ্জার্স'— পরিবর্তনবাদী। আর যাহারা পূর্ব কার্যক্রমের পরিবর্তন চাহিল না—অর্থাৎ যাহারা কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী— তাহাদের নাম হইল "নো-চেঞ্জার্স" বা পরিবর্তন-বিরোধী।

ক্রমে বড়ো বড়ো নেতারাও কারাবাসের মেয়াদ ফুরাইলে মুক্তি পাইতে থাকিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দেশবন্ধু দাশের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। লালাজীর মেয়াদ ছিল দীর্ঘ। তাঁহার মুক্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। পণ্ডিত মতিলালজীর মত প্রথমটায় ঠিক বোঝা যাইতেছিল না, মনে হইতেছিল তিনি গান্ধীজীর কার্যধারাই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু দেশবন্ধুর মুক্তির পর স্পষ্ট বোঝা গেল, পণ্ডিতজীও কাউন্সিলে যাওয়ার পক্ষে। প্রথম কার্যধারার পক্ষে ছিলেন নেতাদের মধ্যে শ্রীরাজগোপালাচারি, ডাক্তার আনসারি, শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমুনালাল বজাজ প্রভৃতি। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরে দেশবন্ধু তাঁহার নিজের মত প্রকাশ করিলেন। উহা কাউন্সিলে প্রবেশের অনুকূলে। তিনিই ছিলেন আমেদাবাদ কংগ্রেসের মনোনীত সভাপতি। তাই তিনি মুক্তিলাভ করিয়া যথানিয়মে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইলেন। নির্বাচিত হইয়াও তিনি আমেদাবাদে সভাপতি হইতে পারেন নাই। দেশ তাঁহাকে পুনরায় গয়া অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচিত করিল।

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হইল। সত্যাগ্রহ কমিটির রিপোর্ট আলোচনার জন্য উহাতে পেশ করা হইল। তিন-চার দিন ধরিয়া তর্ক চলিতে থাকিল। আমাদের পরিবর্তন-বিরোধীদের নেতৃত্ব করিলেন স্বয়ং শ্রীরাজাগোপালাচারী। আমাকেও বাদ-প্রতিবাদের ভাগ লইতে হইল। আমাদের চেষ্টা ছিল, খানিকটা অদল-বদল করিয়া এবং কাউন্সিল ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে— রিপোর্টে যাহার উল্লেখ ছিল— যদি কিছু মীমাংসা করা যায়। কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। অনেক তর্কবিতর্কের পর তাহা গয়া কংগ্রেসের জন্য স্থগিত রাখা হইল।

এই বৎসর অগস্ট-সেপ্টেম্বরে, যতদূর মনে পড়ে, দুইটি বড়ো দুর্ঘটনা হয়, তাহার প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনীতির আবহাওয়ার উপর পড়িয়াছিল। প্রথমটি 'গুরু-কা-বাগ' সম্পর্কে। কিছুকাল ধরিয়া শিখদের মধ্যে তাহাদের গুরুদ্বার সংস্কারের আন্দোলন চলিতেছিল। ধর্ম লইয়া কোনও ঘটনা হইতে সেখানকার গুরুদ্বার সংস্কারের রূপে পরিচিত ছিল। প্রধান প্রধান গুরুদ্ধারের সঙ্গে কোন-না-কোন গুরুর জীবনকথার সম্পর্ক আছে। শিখেরা নিজেদের ধর্মের জন্য বিস্তর কষ্ট সহ্য করিয়াছে, বিস্তর অত্যাচার বরদাস্ত করিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। তাই গুরুদ্বারের প্রতি উহাদের ভারি মমতা ও শ্রদ্ধা। এই-সব গুরুদ্বারে জনসাধারণের দেওয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে। পন্থের সেবার জন্যই এ সমস্ত দেওয়া হয়। গুরুদ্বারগুলি দেখাশোনার জন্য যে-সব সেবক নিযুক্ত হইত তাহারাই ঐ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সব-কিছুই করিত। যেমন সর্বদা হইয়া থাকে, তেমনই গুরুদ্বার মোহন্তদের হাতের মুঠায় ছিল। অনেক মোহন্ত নিষ্কর্মা ও দুরাচারী হইয়াছিল, তাই শিখদের মধ্যে "অকালী" নামে একদল গুরুদ্বার সংস্কারের জন্য মোহন্তদের নিয়ন্ত্রণ করা চাই, এই কথার উপর জোর দিতে লাগিল।

আস্তে আস্তে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল। গুরু-দ্বারের ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রাখিবার জন্য 'শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি' নামে এক কমিটি স্থাপন করা হইল। কোনো কোনো জায়গার মোহন্ত, শিরোমণি কমিটির কথা মানিয়া লইয়া নিজেদের কাজকর্মের ভার উহার হাতে দিয়া দিল। গভর্নমেণ্টও ভাবিতে লাগিল যে এই কাজ আইনসংগত করিয়া, আইন তৈয়ারি করিয়া, গুরুদ্বারগুলির পরিচালনের ব্যবস্থা কমিটির হাতে দিলে ভালো হয়। কিন্তু তখনও কোনও সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। গভর্নমেণ্ট তটস্থ দর্শক ছিল। অকালীদের প্রতি রুষ্ট হইয়া কিছু কিছু মোহন্ত জোর-জবরদস্তি করিতে শুরু করিল। একটি গুরুদ্বারে সেখানকার মোহন্ত অনেকগুলি অকালীকে অতিশয় নৃশংস-ভাবে মারধর করিয়া দগ্ধ করিল। কিছুকাল পূর্বে এই ঘটনা নানকানা-সাহেবের গুরুদ্বারেই হইয়াছিল। ইহাতে অকালীদের মধ্যে অতিশয় ক্ষোভ ও রোষের সঞ্চার হয়। তাহারা গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংসা নীতি স্বীকার করিল এবং স্থির করিল যে, অহিংসার দ্বারাই গুরুদ্বার-গুলি নিজেদের হাতে লইয়া আসিবে। এই অহিংসা নীতি শিখদের পক্ষে

নূতন বস্তু ছিল না— মুসলমানদের সময়েও তাহারা এই নীতি গ্রহণ করিয়া অনেক দুঃখ বরণ করিয়াছিল।

অমৃতসর হইতে খানিকটা দূরে 'গুরু-কা-বাগ' নামে একটি স্থান আছে। সেখানে এক গুরুদ্বার আছে, তাহা এক মোহন্তের অধিকারে ছিল। অকালীরা এই গুরুদ্বারটি নিজেদের হাতে লইতে চাহিল। প্রথমে মোহন্ত তাহাদের কথায় রাজি হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে স্থির হইল যে গুরুদ্ধার অকালীদের হাতে থাকিবে, আর মঠ থাকিবে মোহন্তের দখলে। সেখানে কিছু জমিও ছিল, তাহাতে বাবলা কাঁটার জঙ্গল ছিল। কিছুকাল পরে আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হইল। শিরোমণি কমিটির দিক হইতে গুরুদ্বারের ব্যবস্থা হইতেছিল। গ্রন্থসাহেবের সেবার জন্য সেবক নিযুক্ত ছিল। গুরুদ্বারে ও শিখসংগতে সর্বদাই 'লঙ্গরখানা' খোলা থাকে, এখানেও তাহা খোলাই ছিল। এখানে জ্বালাইবার জন্য কিছু বাবলা গাছ কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মোহন্ত পুলিশের সাহায্য লইয়া তাহা আটকাইল। সরকারের তরফ হইতে অকালীদের সেখানে যাওয়া বারণ হইয়া গেল। অকালীরা স্থির করিল, তাহারা সত্যাগ্রহ করিবে। তাহারা ঐ জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যাইত, অমনই পুলিশ আসিয়া বাধা দিত; যদি তাহারা তাহাতে না থামিত, তবে পূর্বে তাহাদের গ্রেপ্তার করিত, পরে শুধু মারপিট করিয়া হটাইয়া দিত। যে অকালী সেখানে যাইত সে অতি নৃশংসভাবে প্রহৃত হইত। পরে গভর্নমেণ্ট যাওয়ার পথে কিছু দূর হইতেই আটকাইত। অকালীদের মধ্যে খুব উৎসাহ ছিল। তাহারা অমৃতসরের অকাল-তক্তে গিয়া, অহিংস থাকিয়া এখানে শপথ লইত। যতক্ষণ রাস্তা খোলা পাইত ততক্ষণ গুরুদ্বারে উঠিত। সেখান হইতে জঙ্গলে যাইত আর মার খাইত। রাস্তা বন্ধ করিয়া দিলে তো তাহাদের দলকে রাস্তাতেই আটকানো হইত, আর তাহারা মার খাইত— এত বেশি মার খাইত যে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। হাসপাতাল খোলা হইয়াছিল, ঐ অবস্থাতেই লোকে তাহাদের ওখান হইতে উঠাইয়া হাসপাতালে লইয়া যাইত।

ইহার প্রতিক্রিয়া সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। দূর দূরান্তর হইতে লোকে সেখানকার সত্যাগ্রহ দেখিতে আসিতে থাকিল। পণ্ডিত মালব্য, হাকিম সাহেব, অন্য লোকও আসিলেন। আমিও গেলাম। অমৃতসরে ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হইল। সেখান হইতে আমরা 'গুরু-কা-বাগ' দেখিতে গেলাম। যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। কয়েকজন জোয়ান শিখ জোড়হাতে আগাইয়া আসিল। ওদিকে লোহা ও পিতলে মোড়া লাঠি লইয়া এক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে পুলিশের সেপাই আগাইয়া আসিল। তাহারা উহাদিগকে আটকাইল। উহারা বসিয়া

পড়িল। ইহার পর উহাদিগকে লাঠি দিয়া খুব পিটানো হইল। উহারা আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেই উহাদের মারধর করিয়া ফেলিয়া দিল। যতক্ষণ উহারা অজ্ঞান হইয়া না পড়িত ততক্ষণ এইভাবেই চলিত। অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, অ্যাম্বুলেন্সে উঠাইয়া অন্য লোকে উহাদের লইয়া যাইত। কখনো কখনো তাহাদের চুল ধরিয়া হেঁচড়াইয়া লইত। লোকে ইহা দেখিতে ভিড় করিত, কিন্তু একজনও কখনও হাত উঠাইত না। যে মার খাইত সে বেচারাও কখনও হাত উঠাইত না। অহিংস সত্যাগ্রহের এই এক অত্যন্ত জ্বলন্ত উদাহরণ সমস্ত দেশের সামনে আসিয়া পড়িল। অতিশয় উৎসুক হইয়া সমস্ত দেশ 'গুরু-কা-বাগের' সংবাদ পড়িতে লাগিল। হাজার হাজার লোক গ্রেপ্তার হইল। শিরোমণি কমিটির প্রধান সদস্যও গ্রেপ্তার হইলেন। অনেক লোক তো এমনই মার খাইল। যাহারা অকালী সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে এমন ছিল যে জার্মান যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের হইয়া সাহস ও কৃতিত্বের সঙ্গে লড়িয়াছিল। গভর্নমেণ্টের বক্তব্য ছিল যে মোহন্তের জমি, যাহার উপর তাহার আইনসংগত অধিকার আছে, কি করিয়া কাড়িয়া লওয়া যায়, আর মোহন্ত যখন নিজের দখল কায়েম রাখিবার জন্য গভর্নমেণ্টের সাহায্য চাহিতেছে তখন কি করিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায়! আইনের এই কারচুপিতে অনেকে জেলে গেল; এই কারণে অনেক লোককে খুব খারাপভাবে মারপিট করা হইতেছিল। জনৈক পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট লাঠি চালাইবার কলাকৌশলকে সেই রূপ দিলেন যাহা ফৌজে অন্যান্য অস্ত্র চালাইতে হইলে দেওয়া হয়। তিনি ইহার জন্য ব্যায়াম কৌশলের নিয়ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কোনও নায়ক বা সরদারের হুকুম অনুসারে সমস্ত সেপাই লাঠি দিয়া পিঠে বা মাথায় আঘাত করিত; অথবা দুই জঙ্ঘার মধ্যে লাঠি লাগাইয়া শরীরের উপর আঘাত করিত বা পেটে মারিত। এইভাবে অফিসারদের হুকুম অনুসারেই মার দেওয়া হইত। শিখদের সাহস ও সহ্যশক্তিও খুব অদ্ভুত ছিল!

আমরা সেখানে গিয়া সমস্ত কাণ্ড নিজের চোখে দেখিলাম। বিশ্বাস হইল, সত্যকারের সত্যাগ্রহও করা যায়। তার জন্য কৌশল, সাহস ও দুঃখ সহিবার শক্তি চাই। সে শক্তি যদি হাবাগোবা জোয়ানমর্দও হাত না তুলিয়া দেখাইতে পারে, তাহা হইলে কোনও শক্তিই উহাকে দাবাইতে পারে না।

সরকারের দিক হইতে রাস্তা খুলিয়া দিবার চেষ্টা হইল। একটা রাস্তা বাহিরও হইল। স্যর গঙ্গারাম ছিলেন এক প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি, তিনি মোহন্তের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া অকালীদের দিয়া দিলেন। সরকারের আর অত্যাচার বন্ধ করিবার কোনও প্রয়োজন রহিল না। কয়েক দিন পরে আইনও করা হইল, এখন গুরুদ্বারগুলির সেই আইন অনুযায়ী

ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু এ সমস্ত তাড়াতাড়ি হয় নাই। ইহাতে সময় লাগিয়াছে। অনেককে অনেক কষ্টও সহিতে হইয়াছে। সত্যাগ্রহের উপযোগিতা ও উহাতে নিহিত সম্ভাবনা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ইহার কল্যাণ শিখদেরই। ইহা তাহারা নিজেদের সত্যনিষ্ঠা ও শক্তি দিয়া দেখিয়াছে।

দ্বিতীয় ঘটনাও পঞ্জাবেই হইয়াছিল। আমরা অমৃতসর হইতে মুলতানে গেলাম। সেখানে অন্য প্রকারের এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুসলমানেরা তাজিয়ার মিছিল বাহির করিয়াছিল। সেই মিছিলের জন্য হিন্দু-মুসলমানে খুব ভীষণ এক দাঙ্গা হয়। মুসলমানদের বক্তব্য ছিল এই যে হিন্দুদের মধ্যে কেহ একজন তাজিয়ার উপর ঢিল ছুঁড়িয়াছিল। হিন্দুদের বলার ছিল এই যে তাহাদের দিক হইতে কিছুই করা হয় নাই— পূর্ব হইতেই মুসলমানদের দিক হইতে হিন্দুদের লুটপাট করিবার ব্যবস্থা ছিল, তাজিয়া তো শুধু ছুতা মাত্র। কারণ যাহাই হউক, ফ্যাসাদ যা বাধিল তাহাতে বিস্তর হৃদয়ভেদী ঘটনা ঘটিয়াছিল। খবর পাইয়া হাকিম আজমল খাঁ— যিনি কংগ্রেসের সভাপতির কাজ করিতেছিলেন— পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শেঠ যমুনালাল, শ্রীপ্রকাশ ও আমি গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরস্পরের সংঘর্ষ এতদূর কঠিন ছিল যে আমাদের উঠিবার থাকিবার জায়গার বিষয়েও কোনও কথা স্থির হইতে পারে নাই। তাই, আমরা যখন স্টেশনে আসিয়া নামিলাম, প্রথম প্রশ্ন উপস্থিত হইল, কোথায় গিয়া উঠিব। আমরা নিজেদের দুই দলে ভাগ করিয়া দিলাম। এক দল মুসলমানদের অতিথি হইয়া সেখানকার এক নবাবের বাড়ি উঠিল, অন্য দল হিন্দুদের অতিথি হইয়া অন্যত্র উঠিল। আমি হাকিম সাহেবের সঙ্গে নবাববাড়িতে উঠিলাম।

আমরা গিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামার জায়গাগুলি দেখিলাম। কত হিন্দুর ঘরবাড়ি লুটপাঠ করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই-সব বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র হয় লুটপাঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, নয় তো পোড়াইয়া দিয়াছে। কতজন লোককে মারিয়া ফেলাও হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া মেয়েরা খুবই দরদ দিয়া সব ঘটনা বর্ণনা করিল, ইহার প্রভাব আমাদের উপর খুবই পড়িল। এক জায়গায় দেখিলাম, হাকিম সাহেব সোজাসুজি খুবই প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। একটি স্ত্রীলোক বলিল, সমস্ত কিছু লুটিয়া পুড়াইয়া গেলে লুণ্ঠনকারীরা আর কিছু না পাইয়া একটি খাঁচা— তাহাতে সে তোতা পুষিয়াছিল— আগুনে ফেলিয়া দিল। তখনও এখানে-ওখানে ছাইয়ের গাদা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে লোহার খাঁচাটিও পড়িয়া ছিল, তবে তোতাটি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। কয়েকটি মন্দির ও দেবস্থানের এই অবস্থা হইয়াছিল।

আমরা সেখানকার ডেপুটি কমিশনার মিঃ এমার্সনের সঙ্গে দেখা

করিলাম। ইনিই পরে গান্ধী-আরউইন বোঝাপড়ার সময় গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার হোম-সেক্রেটারী ছিলেন, তাহার পর পঞ্জাবের গভর্নর হন। ইঁহার নিকট হইতে আমরা এমন কিছু পাই নাই যাহা পরস্পরে মিলন ও প্রীতি স্থায়ী করে। ইনি কানুনের দোহাই দিয়া দাঙ্গাকারীদের সাজার কথাই জোর দিয়া বলিতে থাকিলেন। আমরা চাহিয়াছিলাম যে ইহা ছাড়া পরস্পরে মেলামেশা কায়েম করিবারও চেষ্টা করা হয়। সেখানে উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান লোকের এক ছোটো সভা বসিল। তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিবার পরে দেখিলাম যে লোকের মধ্যে মনকষাকষি খুবই আছে, তাহা হইলেও উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার আয়োজনের মতো মনে হইতেছে। মুসলমানদের অনেক চেষ্টা এই কথা আশ্রয় করিয়া ছিল যে তাহাদের লোক গ্রেপ্তার হইয়াছিল ও হইতেছিল— সমস্ত মামলা-মকদ্দমা তাহাদের বিরুদ্ধে চলিবে এবং এমনও হইতে পারে যে লুঠের জন্য উহাদের দণ্ডও দিতে হইবে। পরে এক প্রকাণ্ড সভা হইল, তাহাতে হাকিম সাহেব ও পণ্ডিত মালব্যজী বক্তৃতা করিলেন। পরস্পর মেলামেশা বাড়াইবার জন্য আমরা একটা বেসরকারী কমিটি গঠন করিয়া দিলাম, তাহার পর সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমার উপর ওখানকার সমস্ত দৃশ্যের প্রভাব খুব পড়িল। দেখিলাম যে পণ্ডিত মালব্যজীও অনেকখানি অভিভূত হইয়াছেন। তিনি সেখানে হিন্দুদের বলিলেন, 'তোমাদেরও সংঘবদ্ধ হয়ে যাওয়া চাই, তোমাদের ধনপ্রাণমান যারা বিপন্ন করবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের দাঁড়াতে হবে।' তিনি সরকারকেও অনুরোধ করিলেন যে উপদ্রবকারীদের সাজা দিতে হইবে।

আমাদের ওখানে যাওয়ার এই ফল হইল যে মনকষাকষি কমিয়া গেল। যেখানে উহারা নিজেদের মধ্যে একসঙ্গে বসিয়া স্থির করিতে পারিত না যে আমরা কোথায় উঠিব, সেখানে উহারা এখন একসঙ্গে বসিয়া কমিটির মেম্বর করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সকলে প্রীতির সম্পর্ক বাড়াইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। হাকিম সাহেব এক বিবৃতি দিলেন, তাহাতে তিনি মুসলমানদের কার্যকলাপের নিন্দা করিলেন এবং হিন্দুদের সান্ত্বনা দিলেন।

গয়া কংগ্রেসের সময়ে কাহারও কাহারও এমনও মত হইল যে যেমন সেখানে খিলাফত কন্‌ফারেন্স হইবে তেমনই হিন্দুসভাও হওয়া চাই। উৎসাহীরা পণ্ডিত মালব্যজীকেই সভাপতি করিবার জন্য আগ্রহ করিল। আমাকে খুব সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইল, আমিও যদি আগ্রহ করি তবে পণ্ডিত মালব্যজী স্বীকার করিবেন। আমার নিকট এমনও অনুরোধ আসিল যে আমি যেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হই।

গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছু আগে অভ্যর্থনা সমিতিতে এক ঘটনা ঘটে, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। জনৈক ভদ্রলোক কয়েকমাস পূর্বে পাঁচ হাজার টাকা অভ্যর্থনা সমিতিকে দিবেন কথা দিয়াছিলেন। টাকার দরকার পড়িলে, তাঁহাকে তাগাদা করা হইল, কিন্তু তিনি আজ না কাল এইভাবে টালবাহানা করিতে লাগিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন ঠিক হইলে পর যখন সমিতির বৈঠক বসিল, তখন তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যপদের জন্য দুই শত দরখাস্ত-পত্র সহি করাইয়া জনপ্রতি পঁচিশ টাকা হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন; অভিপ্রায়, এইভাবে তিনি স্বাগত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়া যাইবেন, কারণ আর কোনো পক্ষে কেহই এই নির্বাচনের জন্য চেষ্টা করেন নাই। যদিও সদস্যসংখ্যা যথেষ্টই ছিল, তবু কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েকদিন মাত্র আগেকার এই সভায় সকলে আসেন নাই। আমার ব্যাপারটা বড়োই খারাপ মনে হইল; এ এক রকম ষড়যন্ত্র, ইহার দ্বারা সারা দেশের চোখে ধুলা দিয়া ইনি সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধি সাজিয়া আগন্তুক নেতাদের অভ্যর্থনা করিবার নাম কিনিতে চান। ইনি কংগ্রেসের বড়ো রকম কর্মী হইলে আমার এ দুঃখ ছিল না, কিন্তু নীতির তেমন কোনো সেবার কাজই ইনি করেন নাই; আবার এই প্রয়াস সকলের কাছে এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন! সেজন্য এই ক্ষোভও বেশি হইল। আমি তাই কারণ নির্দেশ করিয়া তাঁহার টাকাটা ফেরত পাঠাইলাম। যদিও টাকার নিতান্তই দরকার ছিল, তবু আমার মনে হইল, এই ধরনের চালাকি বন্ধ করাই উচিত। সকলেরই ইচ্ছা ছিল শ্রীব্রজকিশোর প্রসাদ অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ হন, অভ্যর্থনা সমিতিও সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকেই এই পদে নির্বাচিত করেন।

অধিবেশনের দিন আসিয়া পড়িল, কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক কুটির তখনও তৈয়ারি হয় নাই, প্যাণ্ডেলও শেষ হয় নাই। গয়াতে এমনিতেই শীত বেশি, সেই বৎসর শীত আবার একটু বেশিরকম পড়িয়াছিল। কুটিরগুলির জন্য আরও কয়েকজন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু প্যাণ্ডেল যেন শেষই হয় না। তখনকার দিনে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত এক বড়ো সামিয়ানার নীচে, এখনকার মতো খোলা ময়দানে নয়। লোকেদের বসিবার জন্য জমি উঁচু নিচু, ঢালু সোজা তৈয়ারি করিতে হইত। আশঙ্কা ছিল, অন্য সব কাজ শেষ করা যাইবে, কিন্তু মাটি ভরাট করার কাজ আর হইয়া উঠিবে না।

কংগ্রেসের ঠিক দুই দিন আগে, রাঁচি এবং তাহার আসপাশের আদিবাসীরা, প্রায় তিন-চারি শত লোক পায়ে হাঁটিয়া গয়ায় আসিয়া হাজির। তাহারা নিজেদের হাঁড়ি-হাণ্ডা আর কাঠ-কুট্‌রা বাঁকে করিয়া আনিয়াছিল। প্রায় দেড় শত দুই শত মাইল দূর হইতে একটানা কতদিন হাঁটিয়া তবে গয়ায় আসিয়াছে। কংগ্রেসের উপর তাহাদের এতই শ্রদ্ধা বাড়িয়াছিল যে কংগ্রেসের নামে যখন যাহা-কিছু করিতে হয় উহারা তখনই তাহাতে প্রস্তুত। কখনও কখনও তাহারা না বুঝিয়া অবুঝের কাজও করিত। অসহযোগ আন্দোলন যখন জোরে চলিতেছিল, তখন অহিংসার অর্থ কে যেন ইহাদের বলে যে, মাংসের জন্যই তো ছাগল পালন করা হয়, সুতরাং ছাগল পালনও ঠিক নয়। জানি না কোন্ পক্ষ হইতে ইহা প্রচার করা হয়, কিন্তু ফলে হাজার হাজার ছাগল জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসিল! একবার সফরে গিয়া আমি এইরকম অনেক ছাগল দেখিতে পাই আর ব্যাপারটা শুনিতে পাই। ঐরকম লোকেরই এক মস্ত দল অনুরূপ শ্রদ্ধা লইয়া গয়ায় আসিল। অভ্যর্থনা সমিতির কাছে ইহারা কেবলমাত্র থাকিবার জন্য কোনো বাগানে একটু ফাঁকা জায়গা দেখাইয়া দিতে বলিল, সেই মাঠেই ইহারা থাকিবে ও নিজেদের রান্না করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিবে। ইহারা খুব পরিশ্রমী ও কর্মপটু; যেই শুনিল কংগ্রেস-প্যাণ্ডেলের মাটি ভরাট করার কাজ তখনও শেষ হয় নাই, আর আমরা সেজন্য খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, অমনই কোদাল আর ঝুড়ি চাহিল। সে-সব জিনিস উহাদের দেওয়া হইল আর তৎক্ষণাৎ সকলে কাজে লাগিয়া গেল। সারা দিনরাত্রি কাজ করিয়া দুই দিনের মধ্যে সব শেষ করিয়া ফেলিল। উহাদের উৎসাহ আর পরিশ্রম দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলাম। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে প্রত্যেককে একটি গান্ধীটুপি আর অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যের এক-একটা ফুল দেওয়া হইল। ফুলটা টুপির উপর লাগাইয়া দেওয়া হইল। উহারা কি খুশি! বছর কয়েক পরে একবার যখন ঘুরিতে ঘুরিতে উহাদের এলাকায় গেলাম, বড়ই গৌরবভরে উহারা সেই ফুল-আঁটা টুপি দেখাইয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে উহারা গয়া কংগ্রেসে গিয়াছিল।

অধিবেশনের কয়েকদিন আগে আমার বেজায় হাঁপানির টান উঠিল। মুলতান যাওয়ার সময়েই একটু শ্বাসের কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম। তাহার পূর্বে শীতকালে আমার মাঝে মাঝে কাসি হইত, কিন্তু শ্বাসকষ্ট কখনও টের পাই নাই। কাসির জন্যই আমি নাগপুর কংগ্রেসে যোগ দিতে পারি নাই। মুলতান যাওয়ার সময় আমি হাকিম আজমল খাঁর সঙ্গেই ছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন রোগটা হাঁপানি, আর একটা ওষুধও দিয়াছিলেন। তখনকার মতো সারিয়া গেলাম। ডিসেম্বর মাসে গয়ায় যখন খুব ঠাণ্ডা

পড়িল, তখন আবার হাঁপানির টান উঠিল, কিন্তু ঐখানেই এক হাকিমের ওষুধে শীঘ্রই আরাম পাইলাম। কিন্তু যেদিন সভাপতি দেশবন্ধু দাশ গয়া পৌঁছিলেন আর মিছিল বাহির হইল, আমি না পারিলাম স্টেশনে যাইতে, না পারিলাম সেই মিছিলে যোগ দিতে; দুর্বল শরীরে কেবল বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে যোগ দিলাম। বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থার কাজ কিছু কিছু দেখিতেছিলাম। এই-সব ভার বিশেষভাবে শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহের উপর পড়িল। ভোজনবিভাগের ভার নিলেন আমার ভাই সাহেব। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁহার কাজ শেষ করিলেন। প্যাণ্ডেল তৈরি করা আর সাজা ভার নিয়াছিলেন গে মথুরবাবু এবং মজঃ-ফরপুরের জমিদার শ্রীবৈদ্যনাথপ্রসাদ সিংহ। শ্রীবদরীনাথ বর্মা ছিলেন স্বয়ংসেবকদলের নেতা। প্রদর্শনীর কাজে সামাল দিয়াছিলেন শ্রীবানারসী-প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা।

অভ্যর্থনা সমিতির কাজ বেশ ভালোই হইয়াছিল, তবে আমার ধারণা, আর একটু দরদ থাকিলে খরচ কিছু কম করা যাইত। অধিবেশনের দিন-গুলিতে তো আমার ভয়ই হইয়াছিল, বুঝি ঘাটতি পড়িবে। সেইজন্য সকল বিভাগেই আমি খরচ কম করিবার জন্য খুব জোর করিতাম। গয়া স্টেশন হইতে সভার স্থান প্রায় তিন মাইলেরও উপর, লোকের যাতায়াতের জন্য আমরা লরি ভাড়া করিয়াছিলাম— মতলব ছিল, সকলের কাছেই লরির জন্য ভাড়া চাহিব, আর সেজন্য প্রত্যেক লরিতেই টিকিট-হাতে লোক ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা চলিল না। ভাড়া বাবদ আমরা খুব কমই উসুল করিতে পারিলাম। কিন্তু লরিগুলির তো ভাড়া দিতেই হইবে। ইহাতে প্রায় হাজারখানেক টাকার লোকসান হইল। আমার বিশেষ ভাবনা হইয়াছিল বুঝি বা টাকা ঘাটতি পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসাব করিয়া দেখা গেল, বরং কিছু টাকা বাঁচিয়াছে, কম পড়ে নাই।

গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল। ইহার আগে হইতেই দেশে কাউন্সিল-প্রবেশের জন্য আলোচনা হইতেছিল। সত্যাগ্রহ-কমিটির রিপোর্টে একটা শোরগোলের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কংগ্রেসের বিচারের জন্য উহার মীমাংসা স্থগিত ছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ, দেশবন্ধু দাশ— এই তিন প্রধান নেতার মতে, সত্যাগ্রহ যখন সম্ভব নয় তখন কাউন্সিলে যাওয়ার অনুমতি থাকা চাই। কিন্তু অধিকাংশ কংগ্রেসীর মতে গান্ধীজীর দেওয়া কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন করা সংগত নয়। এইজন্য দুই দলেরই লোক আপন আপন দলের প্রতি-নিধি গয়া-কংগ্রেসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কারণেই শ্রীজয়াকর, শ্রীনটরাজনের মতো প্রধান প্রধান ব্যক্তিও নিজ নিজ প্রদেশের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। নির্বাচনের সময় এমন ব্যাপার

যে না হয় তাহা নয়। আমরা জানি মিঃ ব্যালফোর এত বৎসর প্রধান মন্ত্রী থাকিয়াও পরের বারের নির্বাচনে সাধারণ সভ্য পর্যন্ত হইতে পারেন নাই। উঁহার পার্টি বিশ্রীরকম হার হারিয়া কতকদিন পর্যন্ত নিজেদের নেতাকে পার্লামেণ্টে আর দেখিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের দেশে তখনও এই ধরনের ব্যাপার নূতন। কাজেই ইঁহাদের পরাজয়ে কাহারও কাহারও মনে বড়োই আঘাত লাগিয়াছিল। আমিও তাহাদের একজন। যদিও শ্রীজয়াকর কাউন্সিল-প্রবেশের পক্ষে আর আমি উহার বিরোধী, তবু আমার মনে হইল বিরুদ্ধমতের হইলেও এইরকম বিশিষ্ট ব্যক্তির কংগ্রেসে না আসা ঠিক হইবে না— কংগ্রেস যে মীমাংসাই করুক, ইঁহাদের মতো লোকের বক্তব্য ইঁহাদের নিজের মুখে শোনা কংগ্রেসের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তখনকার দিনে কংগ্রেসের নিয়মমতে কংগ্রেসের সদস্য হইলেই যে-কেহ যে-কোনো জায়গা হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিত। সেজন্য চেষ্টাচরিত্র করিয়া আমি শ্রীজয়াকর আর শ্রীনটরাজনকে বিহারের প্রতিনিধি নির্বাচিত করাইয়া দিলাম। দুইজনকেই আভাস দিয়া দিলাম এবং তাঁহারা দুইজনেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন, আর গয়া কংগ্রেসে আসিলেন।

এই ছোটো কথাটি আমি এত সবিস্তারে বলিলাম, তাহার কারণ, সেই-সব দিনে বাগ্‌বিতণ্ডার হিড়িকে অনেকে বলিয়াছিলেন যে পরিবর্তন-বিরোধীরা গান্ধীর নাম ভাঙাইয়া অন্যায় প্রচারপূর্বক কংগ্রেসের ভোট জুটাইয়াছিলেন। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছিলেন যে, পরিবর্তনবাদী বলিয়া সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও দেশবন্ধু দাশ তেমন মানসম্মান পাইলেন না; তাঁহার অভ্যর্থনা ও সেবায় ত্রুটি করা হইল, কারণ বিহার প্রদেশ গান্ধীভক্ত এবং পরিবর্তনবিরোধী। এই-সব কথা মর্মে আঘাত দেয়। আমরা তো যথাসাধ্য সেবাযত্ন অভ্যর্থনার ত্রুটি করি নাই। উঁহার আবাসস্থানে সব দেখাশোনা করার ভার ছিল বাবু দীপনারায়ণ সিংহের উপর। ইনি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সকল কাজ করিয়াছিলেন। অবশ্য এটা ঠিক যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি নিজে বেশি দৌড়ধাপ করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্য সকলে দিনরাত খাটিয়াছিল। সভাপতি ও তাঁহার দলের সকলের পরিপূর্ণ খাতির-যত্ন করা হইয়াছিল, কোনো রকম ত্রুটি ঘটিতে দেওয়া হয় নাই।

দেশবন্ধু সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। কিন্তু তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ করার দিকে অত্যন্ত বেশি জোর দিলেন। ঐ বিষয়টি মীমাংসার জন্য আগেই বিষয়নির্বাচনী কমিটিতে পেশ করা হইয়াছিল, কিন্তু সভাপতি বলিলেন তাঁহার অভিভাষণে তো তিনি যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তবে তাঁহার অভিভাষণ শেষ হইলে এখানেই বিচার করা হউক, কেননা তাহাতে প্রতিনিধিরা মীমাংসার বিষয় জানিবার সুযোগ

পাইবেন ও আপনাদের মতামত কার্যকরী-সমিতিকে জানাইতে পারিবেন। এইজন্য গোড়ায় সভাপতি এই বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার অনুমতি দেন নাই। পরে কয়েকদিন ধরিয়া মহা তর্কবিতর্ক চলিল, দুই পক্ষেরই লোক সকাল-সন্ধ্যা যখনই বিষয়নির্বাচনী সমিতির বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে সময় পাইতেন, আলাদা আলাদা সভা করিতেন। ঐ-সব সভায় লোকে নিজের নিজের পক্ষের সমর্থন করিত। খুব গরম গরম তর্ক হইত।

বিষয়নির্বাচনী সমিতি কিন্তু অনেকের মতানুসারে কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। সুতরাং এই প্রস্তাবটি সংশোধনের রূপেই খোলা কংগ্রেসের কাছে উত্থাপন করা হইল। কংগ্রেসও কয়েকদিন ধরিয়া খুব গরম গরম আলোচনা চলিল। নির্ধারিত সময় অপেক্ষা দুই-তিন দিন বেশি সময় লাগিয়া গেল। আমিও সাধারণ অধিবেশনে জোর গলায় কাউন্সিলে প্রবেশের বিরোধিতা করিলাম। আমাদের দলের নেতা ছিলেন শ্রীরাজাগোপালাচারি। তিনিও তখন হাঁপানির রোগী ছিলেন; কিন্তু বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে এবং খোলা কংগ্রেসে দুই জায়গায়ই তিনি অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া চমৎকারভাবে নিজের পক্ষ সমর্থন করিলেন। শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার রফার জন্য একটি সংশোধন প্রস্তাব আনিলেন, কিন্তু উহা নামঞ্জুর হইল। শেষকালে যখন মূল প্রস্তাবের উপর সকলের মত গ্রহণ করা হইল, তখন বহুভোটাধিক্যে কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। বোধ হয় প্রবেশের পক্ষে প্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ, আর বিপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মত দিয়াছিলেন।

এ কথা মনে করা ভুল হইবে যে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স এন্‌-কোয়্যারি কমিটি বা গয়া কংগ্রেস কমিটি কেবল এই এক বিষয়েই বিচার করিয়াছিলেন। কমিটির রিপোর্টে তো অসহযোগের পুরোপুরি কার্যসূচী, অর্থাৎ সত্যাগ্রহ, করবন্ধ প্রভৃতি যাহার মধ্যে পড়ে সব আলোচনা করা হইয়াছিল। উপস্থিত সকল বিষয়েই ইঁহারা রায় দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই-সব বিষয়ের মধ্যে তো মতভেদ ছিল না, কাজেই সেগুলির সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করা গেল। গয়া কংগ্রেসেও ঐ-সব প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হয়। সরকারি স্কুল আর আদালত বর্জন বজায় রহিল, স্বদেশী জিনিস ও খাদি-প্রচারের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হইল। এমন একটা প্রস্তাব আসিয়াছিল যে সব কিছু বিলাতী জিনিসই বর্জন করিতে হইবে আর বর্জন করার মতো জিনিসের একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য আর বিদেশী বর্জনের উপায় সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হউক। বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে এই প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেসে ইহা অনেক ভোটে বাতিল হইয়া যায়। কেননা, অনেকেই বলিলেন, প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করা যাইবে না, আর

ইহাকে কার্যে পরিণত করিলে হিংসাত্মক বৃত্তি জাগিবার আশঙ্কা আছে।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই অধিবেশনে গ্রহণ করা হয়; তখন হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজে, অথবা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মঞ্জুরি অনুসারে, যাহা কিছু ঋণ করিবেন তাহার জন্য স্বাধীন ভারত ঋণী থাকিবে না। কেননা ব্রিটিশ সরকার খুশিমতো খরচ করিয়া ভারতের নামে টাকা ধার লয়, আর ব্যবস্থাপক সভা ভারতের প্রতিনিধি সভা নয়। এই প্রস্তাবে ঐদিনের আগেকার সব ঋণ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটি লইয়াও মতভেদ ছিল, কিন্তু বহু ভোটে ইহা গ্রাহ্য হইয়া যায়। যদিও বিষয়টি একেবারেই নূতন আর এই কংগ্রেসে উত্থাপিত করার আগে এই বিষয়ে চর্চা মোটেই হয় নাই।

গয়া কংগ্রেস সত্যাগ্রহ অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের পর আরও একটি প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন, আত্মরক্ষার জন্য আইনগত যে অধিকার সে পাইয়াছে ব্যক্তিকে তাহা দিতে হইবে, অর্থাৎ হিংসাবৃত্তি যে পর্যন্ত আইনের অনুমোদিত, কংগ্রেস তাহা মঞ্জুর করিবে। আর একটি প্রস্তাব দ্বারা ঠিক করা হইল যে দেশকে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে, সেইজন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা আর পঞ্চাশ হাজার স্বয়ংসেবক সংগ্রহ করা হউক। গয়া কংগ্রেসে এইরূপ আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যতদূর জানি, এই রকম দীর্ঘ অধিবেশন আরও কোথাও হয় নাই। কিন্তু কাউন্সিল-প্রবেশ ব্যাপারে মতভেদের দরুন আর সব ব্যাপার তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইল।

কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই গয়ায় খিলাফত কন্‌ফারেন্স আর জমিয়ৎ-উল-উলেমার অধিবেশনও মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। কংগ্রেস কমিটির ন্যায় খিলাফত কমিটিও একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটিও জায়গায় জায়গায় ঘুরিয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন। উহাতেও সেই মতভেদ— বিশেষ করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশের ব্যাপারে। এই দুই প্রতিষ্ঠানই আগে কাউন্সিল-বর্জনের নির্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু গয়া কংগ্রেসের সময়ের মধ্যে খলিফা আর তুরস্কের অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। তুরস্ক তখন গ্রীসকে হারাইয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। সে ঠিক করিল, তাহার সুলতানকে (তিনিই আবার খলিফা) গদিচ্যুত করিতে হইবে।

ইহা লইয়া ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বড়োই চাঞ্চল্য দেখা দিল। তবে আমি যতদূর বুঝি, উহারা তুরস্কের এই কাজকে সমর্থনই করিয়াছিল, কেননা তাহাদের আশা ছিল, এই সুলতান নাকি অন্যের হাতের পুতুল হইয়া আছে আর ইসলামের ক্ষতি করিতেছে, ইহাকে পদচ্যুত করাই

ঠিক। উহার স্থলে এমন একজন জবরদস্ত খলিফা মনোনীত করিতে হইবে যাঁহার মধ্যে ইসলামের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি রক্ষা করিবার শক্তি ও ইচ্ছা দুই-ই বর্তমান। তুরস্ক তো নিজের শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কাজেই আশা করা যায় নূতন খলিফা আপনার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিবে। অবশ্য পরে কয়েক দিন বাদে খলিফা পদটিই উঠিয়া গেল, আর তুরস্ক প্রজাতন্ত্র কায়েম করিল। ঐ প্রজাতন্ত্রে নায়ক নির্বাচিত হইবেন। আজ পর্যন্ত তুরস্কে এই নীতিই বর্তমান।

মুসলমানদের দ্বিতীয় কথা, আরবের স্বাধীনতা সম্পর্কে। আরব ও তুরস্ক দুইয়েরই ধর্ম ইসলাম; কিন্তু দুইয়ের জাতি এক নয়, তুরস্ক আরবের উপর নিজের রাজ্যশাসন কায়েম করিয়াছিল। ইহারাও মুসলমান বলিয়া অন্য জায়গার মুসলমানেরা ইহার সুলতানকেই খলিফা বলিয়া মানিত। জার্মানযুদ্ধের সময় তুরস্ক যখন জার্মানির পক্ষ লইয়া লড়িতে লাগিল, তখন ইংরেজ সরকার আরবকে তুরস্কের বিরোধী করিয়া তুলিল ও আরববাসীকে তুরস্কের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। তবে উহা একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হইল না। মুসলমানদের ইচ্ছা, আরব স্বতন্ত্র থাকুক, কিন্তু খলিফা-নির্বাচন সকলে মিলিয়া করুক। তাহা কিন্তু করা গেল না। পরে অবশ্য তুরস্ক খলিফা পদটিই লুপ্ত করিয়া দিল। আরব-দেশকে দেখাশোনা করার ভার পাইল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। এইভাবে আরব আজও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়—যদিও লোকদেখানো ভাবে আমীরের হাতে কিছু কিছু অধিকার আছে।

এই-সব কারণে অল্পদিনের মধ্যে ভারতে খিলাফত আন্দোলন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। খিলাফত কমিটি বহুদিন পর্যন্ত বজায় থাকিলেও, নামে মাত্রই জীবিত ছিল। গয়ার কংগ্রেস-অধিবেশনের সময় এই-সব প্রশ্নের এমনভাবে মীমাংসা হয় নাই, কাজেই সেখানে পর্যন্ত খিলাফত কন্‌ফারেন্স খুব উৎসাহে ও সমারোহে করা হইয়াছিল। কংগ্রেস অপেক্ষাও ইহার মধ্যে উৎসাহ আর প্রাণশক্তি বেশি ছিল, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার বিশেষ কারণ অবশ্য ছিল তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের আঘাত আর তাহাদের কারসাজি।

প্রথম হইতেই পরিবর্তনবাদী ও পরিবর্তনবিরোধী দুই দলের মধ্যে বেশি মনকষাকষি চলিতেছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইতেই দেশবন্ধু দাশ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। যাঁহারা কাউন্সিল-প্রবেশের পক্ষে তাঁহারা মিলিয়া স্বরাজ্য-দল স্থাপন করিবেন, এই ঘোষণা করিলেন। এই দলের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ, শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল, শ্রীকেলকার প্রভৃতি। দেশবন্ধু দাশ হইলেন উহার প্রধান নায়ক, সম্পাদক হইলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। পরিবর্তনবিরোধীদের বিশেষ আগ্রহ যে দেশবন্ধুই কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকেন, কিন্তু তিনি রাজি হইলেন না। তাঁহার কথা এই যে লোকমত তাঁহার দিকে নয়, এমন অবস্থায় সভাপতি তিনি থাকিতে পারেন না। স্বরাজ্য দল দ্বারা তিনি অধিকাংশকে তাঁহার নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করিবেন—কাজেই সভাপতিপদে থাকিলে তাঁহার কাজে সুবিধা না হইয়া বাধারই সৃষ্টি হইবে।

যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও বেশির ভাগ পরিবর্তনবিরোধী দলের লোক। আমাকে প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত করা হইল। কাজটি আমার পক্ষে বড়োই গুরুভার, কিন্তু বহন করিতেই হইল; কারণ আমরাই সকলে মিলিয়া সভাপতির মত অমান্য করিয়াছি, এখন প্রজাতন্ত্রের সাধারণ নিয়ম অনুসারে উহার কাজের ভার সামলাইয়া দেওয়া আমার ধর্ম। যাহাই হউক, গয়াতে দেশবন্ধু দাশের কর্মত্যাগপত্র গৃহীত হইল না। পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকটে অনুরোধমূলক এক প্রস্তাব পাশ করা হইল, কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, পুনর্বিচার আর সম্ভব হইবে না।

১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে নূতন কাউন্সিলের নির্বাচন হইবার কথা। স্বরাজ্য দল ঠিক করিলেন, তাহার আগেই কংগ্রেসে অধিকাংশের মত করাইয়া লইবেন, আর তখন কংগ্রেসের তরফ হইতে নির্বাচনের জন্য লড়িবেন। আমরা যে কয়জন পরিবর্তনবিরোধী ছিলাম আমরা ভাবিলাম, কংগ্রেস তো এই বিষয়ে বিচার করিয়াই দিয়াছেন, এখন চাই পূর্ণ উদ্যমে গঠনমূলক কাজ করিয়া যাওয়া। কিন্তু কার্যত ইহা চোখে দেখা গেল না; কেননা কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে বাদবিবাদ তখন বেশ চলিতেছিল। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে তো ঠিক হইল যে গঠনমূলক কর্মসূচীতে বিশেষ মন দিতে হইবে, আর কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী

পঁচিশ লক্ষ টাকা আর পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে, যেন সত্যাগ্রহ শুরু করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু ইহা কি সহজে আর শান্তিতে হইবার! কংগ্রেসের অধিবেশনের অল্প দিন পরেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কয়েকজন নেতা জেল হইতে ছাড়া পাইলেন। বিহারের নেতাদের মধ্যে মৌলবী মহম্মদ শফী আর বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহও এই সময় জেলের বাহিরে আসিলেন। মৌলানা আজাদ সাহেব জেল হইতে বাহিরে আসিয়াই দুই দলের মধ্যে একটা রফার জন্য চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। গয়া কংগ্রেসের পর তাঁহাকে ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার মনোনীত করা হইয়াছিল, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনি রফার কথা পাড়িলেন আর কমিটি উহা মঞ্জুরও করিলেন। স্বরাজ্যদলের সকল নেতাদের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ কথা হয় নাই, তবে তিনি যত দূর বুঝিতেছিলেন, দলের লোকেরাও এই রফার কথায় রাজি। কাজেই স্থির হইল যে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ওয়ার্কিং কমিটি আর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় এই রফার কথার বিচার হইবে। এই মধ্যস্থতার কাজটি সম্পন্ন করিতে চান বলিয়া মৌলানা সাহেব ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পৃথক রহিলেন, কারণ তাহাতে তাঁহার নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুবিধা হইবে।

ফেব্রুয়ারির শেষে প্রয়াগে সভা হইল। দেশবন্ধু দাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। ঐ বৈঠকে রফার কথা স্বীকৃত হইল। শর্ত হইল : ১। ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধীয় প্রচার বন্ধ থাকিবে; ২। দুই দল নিজের নিজের কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে কাজ করিতে চায় করিবে, কিন্তু একে অন্যের কাজে বাধা দিবে না; ৩। গয়া-কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তনবিরোধীরা সত্যাগ্রহের জন্য টাকা ও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করিবে; ৪। রচনাত্মক কাজ ও অন্য যে-সকল কাজে দুই পক্ষের মতের ঐক্য আছে সেই সকল কাজের জন্য পরিবর্তনবাদী, পরিবর্তনবিরোধী দুই পক্ষই সহযোগিতাপূর্বক টাকা তুলিবে আর কর্মী সংগ্রহ করিবে; ৫। ৩০শে এপ্রিলের পর দুই পক্ষই যেমন ভালো বুঝিবে তেমনভাবে আপন কর্মসূচী অনুসারে কাজ করিতে পারিবে।

এই নির্দেশ অনুসারে শ্রীরাজাগোপালাচারির সঙ্গে আমি বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিলাম। তাহার পূর্বে অবশ্য আমার নিজের প্রদেশটি ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম। বিভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান বেশি ছিল না, এই উপলক্ষে অনেক জায়গায় যাওয়ার ও তাহাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ মিলিল। অনেক টাকাও তুলিলাম। যেখানেই গিয়াছি, গঠনমূলক কাজের উপর বিশেষ জোর দিয়াছি। রাজাজীও বক্তৃতা দিতেন, তাঁহার মতো তীক্ষ্নবুদ্ধি প্রতিভাশীল আর কুশলী বক্তা কমই আছে। বক্তৃতার সময় তাঁহার বেশি গলা ওঠে না, হাত-পা-ও বেশি নাড়েন না। আস্তে আস্তে

শব্দগুলির মধ্যে যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া শ্রোতাদের সম্মুখে হাজির করেন আর লোকে মুগ্ধ হইয়া শোনে। তাঁহার বক্তৃতার পর মনে হইত, ইহার পর আমি আর কি বলিব, চুপ করিয়া থাকাই ভালো— বলিতে গেলে হয়তো উঁহার বক্তৃতায় লোকের মনের উপর যে প্রভাব পড়িয়াছে তাহা মৃদু হইয়া পড়িবে। কিন্তু লোকের ইচ্ছা, আমিও কিছু বলি। আমি বাঁচিবার একটা উপায়ও পাইয়া গেলাম। রাজাজী ইংরেজীতে বলিতেন, কেননা তিনি হিন্দী বলিতে পারেন না। আমি চট্ করিয়া ঠিক করিলাম, উঁহার অভিভাষণটিই অনুবাদ করিয়া বলিব। ইহাতে ভালোই হইত, কারণ তাহা না হইলে তখন সভার মধ্যে দোভাষী খুঁজিয়া ফিরিতে হইত, আর দোভাষী পাইলেও হয়তো তাহার অনুবাদ ঠিক ঠিক হইত না। অথচ রাজাজীর বিচারশৈলীর সঙ্গে আমি সুপরিচিত, আর উঁহার বলার ভঙ্গিটিও আমার বেশ জানা ছিল। কাজেই আমি এক ঢিলে দুই কাজ সারিলাম, তাঁহার বক্তৃতারও ভাষান্তর হইল, আমিও বাঁচিয়া গেলাম। উনি ইংরেজীতে এক-একটা বাক্য বলিতেন আর আমি তাহা তর্জমা করিয়া দিতাম। তাহাতে আমার কাজের সুবিধা হইত আর লোকেও সব কথা ভালোভাবে বুঝিতে পারিত। প্রায় সব সভাতেই যেখানে হিন্দী তর্জমার দরকার পড়িত আমি এই রকম করিতাম। ভাষান্তর করা কঠিন কাজ, বিশেষ যদি তৎক্ষণাতই তাহা করিতে হয় আর যদি বক্তা ধারা-প্রবাহের মতো বাক্যধারা ঢালিয়া চলেন। কিন্তু আমি ঐ কাজে পটু ছিলাম। আমি কলিকাতা হাইকোর্টে দেখিয়াছিলাম একজন দোভাষী সাক্ষীর জেরার সময় ব্যারিস্টারের সওয়াল আর সাক্ষীর জবাব এই দুইয়ের এমন চমৎকার তর্জমা করিতেন যে কেবল শব্দের অর্থ নয়, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ঢঙটি পর্যন্ত অন্য ভাষায় ঢালিয়া দিতেন।

কয়েক বৎসর পরে আমি একবার ইউরোপে যাই, তখন সেখানে যুদ্ধ-বিরোধী এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় কন্ফারেন্সে যোগ দিয়াছিলাম। সেখানে একটি আশ্চর্য চমৎকার দোভাষী দেখিয়াছিলাম। লোকটি জার্মান। বয়স ২৪।২৫ বৎসরের বেশি নয়। কিন্তু ইংরেজী, ফরাসি, জার্মান আর এসপেরেণ্টো ভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিত। কোনো বক্তা এই চার ভাষার যে-কোনোটিতে বক্তৃতা করার সঙ্গে সঙ্গে সাংকেতিক লিপিতে (shorthand) সারা অভিভাষণটি লিখিয়া লইত। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে ঐ শীঘ্রলিপিতে লিখিত কপিটি হাতে লইয়া বাকি তিন ভাষায় তর্জমা করিয়া দিত। অনুবাদ কতটা খাঁটি হইত তাহা তো আমি বলিতে পারি না কারণ আমি তো ইংরেজী ছাড়া আর ঐ তিনের কোনো ভাষাই জানিতাম না। কিন্তু যেরকম বিশুদ্ধ ইংরেজীতে সে তর্জমা করিত তাহাতে মনে হয় অন্য ভাষাও নিশ্চয় শুদ্ধই বলিত। তা ছাড়া, চারটি

ভাষায় যে এমন অনর্গল ও শুদ্ধ কথা বলিতে পারে সে কেনই বা তর্জমা ভুল করিবে। উহার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম সে সংস্কৃতও জানে আর তখন একটি সংস্কৃত বই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিতেছিল। এই ভাষান্তরের কথায় আমি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি!

ঐবারকার ভ্রমণের ফলে গঠনকর্মের প্রতি লোকের মনে কিছু আগ্রহের সঞ্চার হইল, কিন্তু কাজ তেমন বেশি আগাইল না। দুই-তিন মাসের ভিতর এমন কিছু কাজও দেখানো গেল না। তের লাখ আন্দাজ টাকা উঠিল, কিন্তু পঁচিশ লাখ পুরিতে তখনও বাকি। স্বরাজ্যদলের সুবিধা হইল। উহারা আমাদের পরাজয়ের প্রস্তাব পেশ করিল এবং নিজেদের কর্মসূচী প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বরাজ্য দলের সঙ্গে রফার বিফল প্রয়াস

একদিকে আমরা যখন দেশময় সফর করিতে ব্যস্ত, অন্য দিকে তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। মুলতানের কথা উপরে বলিয়াছি, সেখানে তখন পর্যন্ত অল্পস্বল্প মনোমালিন্য চলিতেছিল। সেইজন্য মৌলানা সাহেব জেল হইতে ছাড়া পাইয়া ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন তাহাতে ঠিক হইয়াছিল যে সেখানকার ঝগড়া মিটাইবার জন্য মালব্যজীর সঙ্গে মৌলানা সাহেবও মুলতান যাইবেন এবং ঐ কলহ নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন। ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সাহায্যের জন্য কংগ্রেস হইতে দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করাও হইয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ঝগড়া কেবল মুলতানেই আবদ্ধ রহিল না, অমৃতসরের অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়িল। আমরা ঐ সফরের সময় পাঞ্জাবের অনেক জায়গায় গিয়াছিলাম। দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁও বরাবর চেষ্টা করিতেছিলেন। ডাক্তার আনসারি প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া তাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা রফা করা হউক, যাহাতে সমস্ত দেশের বিকল চিত্ত আবার সুস্থ সবল হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টা সফল হয় নাই।

পাঞ্জাব সফরের সময়েই, লাহোরে যখন দেশবন্ধু দাশ ছিলেন তখন, তাঁহার সঙ্গে রাজাজী আর আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে স্থায়ী নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু প্রস্তাব করিলেন যে, কংগ্রেসের কাজ কয়েকটি বিভাগে ভাগ করিয়া এমন সব লোকের উপর ভার দেওয়া হউক, যাহাদের ঐ কাজে

বিশেষ উৎসাহ বা আকর্ষণ আছে। যেমন রাষ্ট্রীয় শিক্ষা, খাদিপ্রচার, কাউন্সিল বিভাগ, বিদেশে প্রচার, শ্রমিক-সংগঠন, অস্পৃশ্যোদ্ধার, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ-ছয় কোটি টাকাও তোলা হউক।

পাঞ্জাব হইতে আমরা পুনায় গেলাম—সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল। ঐ কমিটি দেশবন্ধুর এই প্রস্তাব কার্যকরী হইবে না মনে করিয়া নামঞ্জুর করিলেন। অধিবেশন চলিতেছে এমন সময় দেশবন্ধু প্রভৃতির নিকট হইতে তার আসিল যে পাঞ্জাবের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য অবিলম্বে প্রয়াগে ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন করা হউক। আমাদের কার্যক্রম ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত নির্দিষ্ট রহিয়াছে, এ অবস্থায় উহা স্থগিত রাখিয়া এত তাড়াতাড়ি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজাজী মারফত বলিয়া পাঠানো হইল, যাহা মনে হয় উঁহারা করুন, দরকার হইলে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও ডাকিতে পারেন। রাজাজী সেখানে গেলেন এবং দেশবন্ধু দাশ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হইল। কিন্তু আলোচনা শেষ হইতে পারিল না; এজন্য কিছু কথা দিল্লিতে হাকিম আজমল খাঁর সঙ্গে হইল। এইভাবের যাহা-কিছু আলোচনা হইয়াছিল রাজাজী সমস্ত নোট করিয়া হাকিম সাহেবের হাতে দিলেন, যাহাতে তিনি দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত নেহরুর রায় লইতে পারেন। ঐ নোটের আর এক কপি লইয়া ওয়ার্কিং কমিটির অন্য মেম্বারদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রাজাজী স্বয়ং বোম্বাই গেলেন। এই প্রস্তাবে না মত দিলেন মতিলালজী, না সর্দার বল্লভভাই আর শেঠ যমুনালালজী। কিন্তু এই ব্যাপারে এমন কিছু কিছু কথা বাহির হইল যেন পরিবর্তন-বিরোধীরাই প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করিয়া দিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও এইজন্য পরিবর্তনবিরোধীদের, যদিও তিনি নিজে এইদলেরই একজন, প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। কাগজেও কড়া টিপ্পনী বাহির হইল। পণ্ডিত মতিলালজী স্বরাজ্য-দলের তরফ হইতে প্রচার শুরু করিয়া দিলেন। মে মাসের শেষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠকে এই রফার বিচারের কথা ছিল তাহাতে তিনি নিজে যাইবেন না ঘোষণা করিয়া দিলেন আর তাঁহার অনুগামীদিগকেও যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

নিজেদের মধ্যে এই বিবাদের জন্য সারা দেশ ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোনো কোনো প্রাদেশিক কমিটি নিষ্পত্তির পক্ষে মত দিলেন। পরিবর্তন-বিরোধীদের মধ্যে শ্রীমতী নাইডু ও ডাঃ আনসারি ছিলেন মিটমাটের পক্ষে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গয়া কংগ্রেসের সময় জেলে ছিলেন, এখন ছাড়া পাইয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহারও মত মিটমাট হউক। এইরূপে মিট-মাট করার অনুকূলে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়া উঠিল। ফলে স্বরাজ্য-দলের লোকেরাও বোম্বাইয়ে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক

হওয়ার কথা তাহাতে যোগ দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করিল এবং যোগ দিল। এই বৈঠক ছিল মে মাসের শেষে। ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইল যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হউক অবশ্য যদি স্বরাজ্যদল ঐ কংগ্রেসের নির্ণয় মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকে। দেশবন্ধু দাশ ঐ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, তিনি বলিয়া দিলেন যে স্বরাজ্য-দল ঐ কংগ্রেসের নির্দেশমতো কাজ করিবেই এমন কথা তিনি দিতে পারেন না। ওয়ার্কিং কমিটি তখন প্রস্তাবটি উঠাইয়া লইলেন। উপস্থিত সদস্যেরা আরও কয়েকটি প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটির প্রস্তাবক শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত জওহরলালজী। তাঁহাদের প্রস্তাবের বিষয় ছিল যে, দেশের মধ্যে যখন এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা কাউন্সিলের নির্বাচনে যোগ দিতে ইচ্ছুক তখন নিজেদের মধ্যে এই বিরোধ মিটাইবার জন্য গয়া কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী প্রচার যেন না করা হয়। কেহ কেহ আপত্তি তুলিলেন, গয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধী এই প্রস্তাব অবৈধ (out of order), কিন্তু দেশবন্ধু দাশ এই আপত্তি মানিতে রাজি হইলেন না, প্রস্তাবটি বৈধ বলিয়া দিলেন। অল্প ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়া গেল। আমরা যাহারা গয়া কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার নির্বাচিত হইয়াছিলাম, পদত্যাগ করিয়া সরিয়া আসিলাম। দেশবন্ধু দাশের রায় অনুসারে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইল। উহার মধ্যে গেলেন এমন লোক যাঁহারা না ঘোর পরিবর্তনবাদী, না ঘোর পরিবর্তনবিরোধী, অর্থাৎ যাঁহারা চান মিটমাট। ডাক্তার আনসারি সভাপতি আর পণ্ডিত জওহর-লাল সম্পাদক মনোনীত হইলেন।

রাজাজী এই প্রস্তাবে খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার মতে, এই-ভাবে চলিলে কংগ্রেস আত্মঘাতী হইবে। তাঁহার মতে, হয় কাউন্সিলে যাইবার জন্য সোজা অনুমতি দেওয়া হউক আর নির্বাচনের জন্য তোড়-জোড় করা হউক, নতুবা ইলেকশন বর্জন কর, আর জনসাধারণের মধ্যে সেইরূপ প্রচার কর। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি এই দুইয়ের কোনো পন্থাই লইলেন না, স্বরাজ্যদলকে প্রচারের অনুমতি দেওয়া হইল, ইলেক-শনে দাঁড়াইবার অনুমতিও দেওয়া হইল, অথচ উহার উপর কংগ্রেসের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকিল না। অপর দিকে নির্বাচনবিরোধীদের মুখ বন্ধ রাখিতে হইবে। অতএব এই প্রস্তাব মানা চলে না, বিশেষত গয়া কংগ্রেসে তো কাউন্সিল-বিরোধী প্রচারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এমন আশঙ্কা নাই যে অধিকাংশ সংবাদপত্র ছিল কাউন্সিল-প্রবেশেরই পক্ষে। কংগ্রেসেরও অনেক লোক এই বিবাদ হইতে সরিয়া পড়িল। বহুজনের কাছে এই মাঝামাঝি রফার কথাটা ভালোই লাগিল। নূতন

ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করিলেন যে গয়া কংগ্রেসের কাউন্সিল-বর্জন প্রস্তাবই কায়েম আছে, এই প্রস্তাবে কেবল এই বিষয়ের প্রচারই বন্ধ করিতে বলা হইয়াছে। আমাদের বিহার প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ হইতে আমরাও এই রায় দিলাম। কিন্তু অন্য কয়েকটি প্রাদেশিক কমিটি বিরোধিতা করিল, এই প্রস্তাবকে গয়া কমিটির নির্দেশের বিরোধী মনে করিয়া তাহারা ইহা মানিল না।

বোম্বাইয়ের এই বৈঠকের পর দেশের মধ্যে এই বিতণ্ডা আরও জোরে চলিতে লাগিল। যে মতভেদ চাপা দিবার জন্য বোম্বাইয়ে প্রস্তাব করা হইল তাহা আরও তীব্র হইয়া উঠিল। দেশবন্ধু দাশ বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ সফরে গেলেন, কয়েক জায়গায় তিনি অতিশয় কঠোর ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। এক বক্তৃতায় লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে আপসের ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলেন, সেবারকার সত্যাগ্রহে গভর্নমেণ্ট ভয় পাইয়া গিয়াছিল, উহারা যাচিয়া পরামর্শ করিতে আসিয়াছিল, আমার কাছে কয়েকটি শর্ত বলিয়া পাঠায়, আমি হেডকোয়াটার্সে অর্থাৎ গান্ধীজীর কাছে উহা পাঠাই, কিন্তু তিনি সব মাটি করিয়া দেন (bungled and mismanaged), আর আমাদের সকলকে চরখা ঘুরাইতে বলেন। এই উপলক্ষে পুরানো কথা আবার উঠিয়া পড়িল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কি করিলেন, দেশবন্ধু গান্ধীজী আর পণ্ডিত মালব্যজী পরস্পরের মধ্যে যে-সকল তার করিয়াছিলেন, সেগুলি কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মালব্যজী, আর মৌলানা আজাদ যাঁহারা এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, নিজের নিজের বক্তব্য খবরের কাগজের মারফত বাহির করিয়া দিলেন।

দেশ জুড়িয়া নূতন ধারায় কটুত্বপূর্ণ প্রবল বাদবিতণ্ডা চলিল। ফলে কার্যকরী সমিতির কেহ কেহ আবার নিখিল ভারতীয় কমিটির অধিবেশনের জন্য জোর করিতে লাগিলেন। একটি অধিবেশন তো জুনের শেষে নাগপুরে হইয়া গেল। সেখানে স্থির হইল, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন করিতে হইবে, সেখানে এই কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিতে হইবে। ওয়ার্কিং কমিটির দিক হইতে এই অধিবেশনে এক প্রস্তাব করা হইল, তাহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, যে-সব কমিটি বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত কমিটির নির্দেশের বিরুদ্ধে রব তুলিয়া কংগ্রেসের অনুশাসন ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদিগের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হউক। এই-সব কমিটির মধ্যে প্রধান ছিল তামিলনাদ কমিটি, আর এই প্রস্তাবের বিশেষ লক্ষ্য শ্রীরাজাগোপালাচারি। ইহা লইয়া প্রবল বিরোধ বাধিয়া উঠিল। বলা হইয়াছিল, ইনি নিখিল ভারত কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছেন। আমাদের মতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবটাই কংগ্রেস সিদ্ধান্তের প্রতিকূল, সুতরাং আমাদের বক্তব্য, রাজাজী তাঁহার কাজে

কংগ্রেসের নির্দেশই পালন করিয়াছেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঝগড়া চলিল, আমাকে রাজাজীর পক্ষ লইয়া বক্তৃতা করিতে হইল। যদিও ১৯১৯ হইতে আমি বরাবর নিখিল ভারত কমিটির সদস্য ছিলাম, কিন্তু খুব কমই মুখ খুলিতাম। সত্যাগ্রহ কমিটির রিপোর্টের ব্যাপার আর গয়া কংগ্রেস ছাড়া কখনও কংগ্রেসে বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কিছু বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। গয়ায় আমি হিন্দীতেই বক্তৃতা করি; নাগপুরে ইংরেজীতে বলাই ঠিক মনে হইয়াছিল, কেননা সেখানে দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য হিন্দী-না-জানা প্রতিনিধিদেরই বেশি বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল। রাজাজী নিজে বেশি বলিতে চাহিতেন না। আমি সম্ভবত ওখানেই প্রথম ইংরেজীতে বক্তৃতা করি। উহা লোকের উপর বেশ কাজ করিল। স্বরাজ্যদলের বড়ো পাণ্ডা ও রাজাজীর পক্ষের বিরোধী শ্রীসত্যমূর্তি আমার কাছে আসিয়া প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'আমি তো জানিতাম না আপনি এমন সুন্দর ইংরেজীতে বলিতে পারেন।' ফলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইল। নিন্দাত্মক প্রস্তাব বাতিল হইলে ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগ করিল, আর নূতন কমিটি গঠিত হইল। আমরা আবার ওয়ার্কিং কমিটিতে গেলাম, শ্রীবেঙ্কটাপ্পা সভাপতি আর শ্রীগোপাল কৃষ্ণায়া হইলেন সম্পাদক। বিশেষ অধিবেশনের স্থান নির্বাচনের ভার ওয়ার্কিং কমিটির উপর দেওয়া হইল। কয়েকদিন পরে তাঁহারা ঠিক করিলেন উহা দিল্লিতে হইবে। নিখিল ভারত কমিটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে এই বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করিলেন।

পতাকা-সত্যাগ্রহ ও গান্ধী-সেবাসংঘ

দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনের বিষয়ে কিছু বলার আগে নাগপুর-পতাকা-সত্যাগ্রহের কথা বলা দরকার। জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে ১৯২৩ সালের ১৩ই এপ্রিল জাতীয় পতাকাসহ একটি মিছিল বাহির করা হইল। মধ্য-প্রদেশের সরকার জব্বলপুর আর নাগপুরের সিভিল লাইনে এই মিছিলের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আদেশ না মানায় জব্বলপুরে পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাতে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সত্যাগ্রহ করিবার কথা আরম্ভ হইল।

বড়ো বড়ো নেতারা সকলেই সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, কাউন্সিল প্রবেশকে হেয় করিবার জন্য পরিবর্তনবিরোধীদের

এই চাল। যাহা হউক, ১লা মে হইতে নাগপুরে সত্যাগ্রহ শুরু হইয়া গেল। ঐ আন্দোলনের নেতা হইলেন শেঠ যমুনালালজী। সত্যাগ্রহের জন্য ইঁহারা এক-এক দল লোককে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল করিয়া সিভিল লাইনের দিকে পাঠাইতে লাগিলেন। এক জায়গায় পেঁাছিলে সরকারের পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া হইত, আর বাধা না মানিলে গ্রেপ্তার করা হইত। দিনের পর দিন এইরূপ চলিল, বহু লোক এইভাবে গ্রেপ্তার হইয়া জেলে গেল। সত্যাগ্রহের বার্তা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল, আর নানা স্থান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক নাগপুর আসিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে শেঠ যমুনালালজীও গ্রেপ্তার হইলেন। তখন সর্দার বল্লভ-ভাই নাগপুরে আসিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আমি বিহারে স্বেচ্ছাসেবক-দল গঠন করিয়া নাগপুরে তাঁহার কাছে পাঠাইতে লাগিলাম। আমি নিজেও তাঁহার সঙ্গে কয়েক বার নাগপুরে গেলাম। সত্যাগ্রহের জন্য দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। এখন মনে হইল, এবার বোধহয় সর্দারজীও গ্রেপ্তার হইবেন, সেইজন্য আমার নাগপুর যাওয়া আরও দরকার হইয়া পড়িল।

এইভাবে সমস্ত দেশ হইতে হাজার হাজার সত্যাগ্রহী নাগপুর গেল আর ধরা দিল। পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া উঠিল। শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল, যিনি স্বরাজ্যদলে আছেন, নাগপুর আসিয়া সর্দারজীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সরকার দেখিলেন, এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন আর বাড়িতে দেওয়া ঠিক হইবে না। এইজন্য বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও হইল। একদিন জাতীয় পতাকাসহ মিছিলকে সিভিল লাইনে প্রবেশ করিতে দিয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি সেই সময় নাগ-পুরে। শেষের দিনে খুব সমারোহে মিছিল বাহির হইল। বহু লোক পতাকা হাতে উহাতে যোগ দিল। বিঠলভাই আর সর্দারের সঙ্গে আমিও ঐ দলে ছিলাম। মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে সিভিল লাইন হইয়া ফিরিয়া আসিল, সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইল আর কয়েদীদেরও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই সত্যাগ্রহের প্রভাব অন্যান্য জায়গার উপরও বেশ ভালোই হইয়াছিল।

বিহার হইতে অনেক সত্যাগ্রহী নাগপুর গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হরদেব সিংহ নামে একজনের নাগপুর জেলেই মৃত্যু হয়। আমি সেই দিন ঐখানেই ছিলাম। জেল হইতে তাঁহার শব আমাদের দেওয়া হইয়া-ছিল। আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সৎকারাদি করিলাম। সর্দারজীর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল, কিন্তু নাগপুরে যে ঘনিষ্ঠতা হইল তাহা আমার জীবনের সুখের স্মৃতিগুলির মধ্যে চিরজাগরূক থাকিবে। তাঁহার কর্মকুশলতা, গাম্ভীর্য আর নেতৃত্ব-শক্তির উপর আমার অসীম শ্রদ্ধা জন্মিল। আর সেই শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সেখানে তাঁহার

কাছে যে ভালোবাসা ও বিশ্বাস আমি লাভ করিয়াছিলাম আমার প্রতি আর বিহারবাসীদের প্রতি তাহা বরাবর ঐভাবেই অটুট রহিয়াছে।

ঐ সময়েই শেঠ যমুনালালজীর ধারণা হইল যে পরিবর্তনবাদী আর পরিবর্তনবিরোধীদের এই ভেদ চলিতে থাকিলে দেশে গঠনকর্মে শিথিলতা আসিবে। অতএব এমন একটি সংস্থা স্থাপিত করা হউক যাহাতে গঠনমূলক কাজের উপর বেশি জোর দেওয়া যাইবে, আর সেই অবস্থার মধ্যে বেশির ভাগ এমন লোক লওয়া হইবে যাহারা গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিবে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হইল গান্ধী-সেবা-সংঘ। শ্রীরাজাগোপালাচারি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীগঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে, শেঠ যমুনালাল বাজাজ প্রমুখ উহার পরিচালক-মণ্ডলের সদস্য হইলেন। আমিও উহার মধ্যে ভর্তি হইলাম। যতদিন এই সংঘ এই আদর্শে স্থির ছিল ততদিন আমি ইহার সদস্য ছিলাম। আমাদের বরাবর লক্ষ্য ছিল, এই সংঘকে রাজনৈতিক দলাদলির বাহিরে রাখিতে হইবে। আর তাহা করাও হইল। উহার কর্মকর্তারা খাদি প্রচার, হরিজন সেবা ইত্যাদি গঠনমূলক কাজেই বিশেষভাবে লাগিয়া আছেন। অবশ্য গান্ধীবাদের বিরোধী দল যখন-তখন বলিয়া বেড়ান যে, ইহাও একটি রাজনীতিক দল, আর স্বরাজ্য-দল, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও নাম জুড়িয়া দেন!

যাহাই হউক, গান্ধী-সেবা-সংঘ গঠনমূলক কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল। ইহার সদস্যগণ ইহার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে লাগিয়া আছেন। প্রায় সব প্রদেশেই ইহার শাখা স্থাপিত হইল। বিহারেও হইল। কোনো কোনো সদস্য— অবশ্য ইহাদের সংখ্যা কখনও বাড়ে কখনও কমে, নূতন সদস্যও হয়—নিজেদের খরচ চালাইবার মতো কিছু কিছু পায়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো বিশেষ একটি কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া ইহার কাজ হয় নাই। কয়েক বছর পরে সারন জেলার মৈবওয়া গ্রামে আশ্রম স্থাপিত করিয়া এ কাজ করা হয়। সেখানেও ঠিকমতো কাজ চলে নাই। এইজন্য বিহারে বলার মতো উহার কোনও কাজ আমি উল্লেখ করিতে পারি না। কোনো কোনো সদস্য গঠনকর্ম করিয়াছেন, কেহ কেহ বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সরিয়া থাকিতে পারেন নাই।

দিল্লী অধিবেশনের পূর্বে মৌলানা মহম্মদ আলি জেল হইতে ছাড়া পাইলেন। আমি অনুমান করিয়াছিলাম, তিনি কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী হইবেন। রাজাজী এই বিভেদের সময় এমন সরিয়া পড়িয়াছিলেন যে, দিল্লীর অধিবেশনে আসিলেনই না। আমরা মহম্মদ আলিকেই নেতা ঠিক করিয়া তাঁহার হাতেই সব ছাড়িয়া দিলাম। তিনি ঠিক করিলেন, দুই পক্ষের রফা হউক। এই মীমাংসার শর্ত হইল, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আর কংগ্রেসের নামে কেহ নির্বাচনে দাঁড়াইবে না। তবে কংগ্রেসের কোনো লোক যদি নিজে নির্বাচনে দাঁড়াইতে চায় তবে তাহার উপর হইতে নিষেধ উঠাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে স্বরাজ্যদল নিজেদের জোরে কংগ্রেসীদের দাঁড় করাইয়া নির্বাচনে প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার মস্ত সুযোগ পাইয়া গেল। কংগ্রেস এই নির্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে পৃথক রহিল।

এই ঝগড়ায় আমরা ঘাবড়াইয়া গেলাম। আমরা বেশ দেখিতেছিলাম, ইহাতে গঠনমূলক কাজেরও ব্যাঘাত আসিতেছে, কেননা, কাউন্সিল-প্রবেশের পক্ষের কেহ কেহ নিজ পক্ষ সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিরোধিতা না করিলেও বেশ উপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এই রফার পরে যে যাহার নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকিবে, আর আমরা গঠনমূলক কাজের উন্নতি করিতে পারিব। মৌলানা মহম্মদ আলিও এই কথার উপর বেশ জোর দিলেন, কিন্তু এই পরামর্শের সময় তিনি আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্ম আমরা বুঝিলাম পরে। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ছিল, তিনি রফার পক্ষে যাইবার নির্দেশ বেতারেও পাইয়াছেন। ইহার অর্থ আমরা করিয়াছিলাম, তিনি হয়তো কোনো-না-কোনো উপায়ে টের পাইয়াছেন যে গান্ধীজীর মতও এই দিকে। অবশ্য আমরা জানিতাম, গান্ধীজী জেল হইতে কোনো নির্দেশ পাঠাইবেন না, কেননা তিনি ইহাকে মতের দিক হইতে ভুল মনে করেন। আমরা আরও জানিতাম যে শ্রীশংকরলাল ব্যাঙ্কার, যিনি গয়া কংগ্রেসের ঝগড়ার পর জেল হইতে ছাড়া পাইয়া আসিয়াছেন, যিনি জেলে গান্ধীজীর সঙ্গেই ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজীর মতের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তবু আমরা ভাবিলাম, অন্য কোনো ছাড়া-পাওয়া কংগ্রেসী হয়তো আলাপ-আলোচনার মধ্যে গান্ধীজীর মতামত আন্দাজ করিয়া মৌলানা সাহেবকে কিছু বলিয়া থাকিবেন। তখন অনবরত কংগ্রেস-কর্মীরা নিজের নিজের মেয়াদ পূর্ণ করিয়া ছাড়া পাইতেছিল, কাজেই

এমন হওয়া অসম্ভবও নয়। পরে শুনিলাম, দেবদাস গান্ধী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, মহম্মদ আলি যাহা কর্তব্য মনে করিবেন তাহাই যেন করেন; আমার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও প্রেম যেন তাঁহাকে প্রভাবিত না করে, কারণ দেশের যাহাতে কল্যাণ বুঝিবেন তাহাই করা তাঁহার উচিত। এই কথাই মৌলানা সাহেব নিজের সুবিধামতো 'বেতারের' বলিয়া উল্লেখ করেন। অনেকে এই কথায় বিস্তর প্রভাবান্বিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্দার বল্লভভাই, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, ডাক্তার আনসারি, আর আমি— আমরা যাহারা কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী ছিলাম— তাহারাই প্রধান। কোনো উপায় না দেখিয়া আমরা রফা মানিয়া লইলাম।

হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ভয় হইল উহাতে স্বরাজের কাজে বড়ো বাধা পড়িবে; লোকে চিন্তিত হইয়া পড়িল। দিল্লী কংগ্রেসেও এই বিষয় লইয়া বহু বিচার-বিতর্ক হইল; যেখানে যেখানে বিবাদ বাধিয়াছে বিবাদের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। আরও কমিটি গঠিত হইল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপসের একটি খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য। স্থির হইল, কংগ্রেসের তরফ হইতে সকল ধর্মাবলম্বীর সংরক্ষণের জন্য একটি রক্ষা-দল নিযুক্ত করা হইবে, আর সর্বত্র আপসের জন্য এমন কর্মিমণ্ডল থাকিবে যাহারা ঝগড়া-বিবাদ ঘটিতে দিবে না এবং কোথাও বিবাদ বাধিয়া গেলে তাহা যাহাতে বেশি-দূর না ছড়াইতে পারে তাহা দেখিবে।

এই সময় আর একটি ব্যাপার লইয়া দেশে বড়োই আন্দোলন চলিতে-ছিল। উপনিবেশগুলিতে বিশেষত কেনিয়াতে ভারতবাসীর স্থান ও মর্যাদা লইয়া এই আন্দোলন। ভারতবাসীরাই গিয়া ঐ স্থানটিকে বাস-যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, উহারাই সেইখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালু করিয়াছে, রেলের রাস্তা তৈরির জন্য কঠিন পরিশ্রম করিয়াছে, আর এখন গোরারা আসিয়া বলে এই-সব অবস্থাপন্ন, উচ্চ ও উন্নত পদবীর ভারতীয়েরা সেই-খানে থাকিতে পারিবে না! ইংরেজ গভর্নমেণ্ট গোরাদের এই দাবি মানিয়া লইল। দক্ষিণ আফ্রিকার গোরারাও কেনিয়ার এই গোরাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য ও সহানুভূতি দিতে লাগিল। এইরূপে ফিজিতেও ভারতীয়দের প্রতি নানা অত্যাচার হইতে লাগিল। এইজন্য, কংগ্রেসে এইভাবে প্রস্তাব করা হউক যে, ভারতবাসীর প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই অত্যাচার হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতীয়দের স্থান নাই, সুতরাং ভারতবাসীকে এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাওয়ার প্রয়াস করিতে হইবে। কথাটা ঠিকই ছিল। ঐ সময় হইতে এ যাবৎ যত-কিছু ঘটনা হইল, তাহাতে ব্যাপার আরও স্পষ্টই হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ সময়

কংগ্রেস মৌলানা মহম্মদ আলির বিশেষ নির্বন্ধে এই প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করিয়া দিল। আমার যদিও প্রস্তাবের পক্ষেই সহানুভূতি ছিল তবু আমরা এত বড়ো পরিবর্তনের জন্য ঠিক ঐ সময়টাকে উপযুক্ত মনে করি নাই, কেননা আমরা তখন কিছু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম আর আমাদের আন্দোলনও একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কথা নাই, এমন একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেল।

দিল্লী অধিবেশনের পরেই লালা লাজপত রায়কে দেখিবার জন্য আমি ওখান হইতে সোলন চলিয়া গেলাম। তিনি রুগ্ন অবস্থায় জেল হইতে বাহির হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য তখন সোলনে বাস করিতেছিলেন। উঁহারও রফার কথা বেশ পছন্দ হইয়াছিল। তিনি সেজন্য বেশ খুশি ছিলেন, কারণ তাঁহারও স্বরাজ্যদলের মতেই মত ছিল। সোলন হইতে ফিরিবার পথে আমি লখনৌয়ে নামিলাম, সেখানে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হাঁপানির বিশেষজ্ঞ লেঃ কর্ণেল স্প্রাসনকে দিয়া পরীক্ষা করাইলাম। তিনি আমার রোগ হাঁপানি বলিয়া মত দিলেন আর 'সোয়ামিন' ইন্‌জেকশন দিতে বলিলেন। পাটনায় ফিরিয়া তাঁহার কথামতো ঐ ইন্‌-জেকশন নিলাম, কিন্তু বিশেষ ফল পাইলাম না।

দিল্লী অধিবেশনরে পর স্বরাজ্যদল ইলেকশনে যোগ দিল। মধ্য-প্রদেশের বেশির ভাগ জায়গায়ই স্বরাজ্যদলের সুবিধা হইল। সেখানকার কাউন্সিলে উহাদেরই সংখ্যাধিক্য হইল। বাংলাদেশেও বেশ সফলতা লাভ হইয়াছিল, তবে সংখ্যাধিক্য হয় নাই। অন্য কোনও প্রদেশে এইরকম সফলতা পাওয়া যায় নাই, তবে সর্বত্রই জনকয়েক ভালো লোক কাউন্সিলে ঢুকিতে পারিলেন। বিহারেও স্বরাজ্যদল গঠিত হইয়াছিল, আর তাহাতে বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন মৌলবী মহম্মদ শফী, প্রোফেসার আবদুল বারি, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় আর বাবু জলেশ্বর প্রসাদ। এখানকার ইলেকশনে আমাদের মধ্যে কেহ যোগ দেয় নাই। আমরা কোনো সহায়তাই করি নাই, পরোক্ষভাবেও নয়। তবু দশ-বারো জন নির্বাচিত হইলেন। ইঁহারা কাউন্সিলে গিয়া বেশ ভালো কাজও করিয়াছিলেন। জলেশ্বরবাবু ছিলেন দলের নেতা। সংযুক্তপ্রদেশে দলনেতা ছিলেন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। বাংলায় তো স্বয়ং দেশবন্ধু দাশ। ভোটাধিক্য থাকায় মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য-দল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে দিল না। কিছুদিন এইভাবেই কাটিল। কিন্তু নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সরিয়া গিয়া মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিলেন। বাংলায় দেশবন্ধু দাশ ও অপর কয়েকজন মিলিয়া কিছুদিনের জন্য ঐখান-কার মন্ত্রিমণ্ডলও ভাঙিয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

এইভাবে ১৯২৩ সন শেষ হইয়া আসিল। কংগ্রেসের বার্ষিক অধি-বেশন হইল কোকনদে ডিসেম্বর মাসে। অধিবেশনের ঠিক সময়টিতে

অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমি কোকনদ যাইতে পারিলাম না। সেখানে রাষ্ট্র-ভাষা প্রচারের যে সভা হইবার কথা ছিল তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম আমি। আর সেখানে বলিবার জন্য আমি দীর্ঘ এক ভাষণ লিখিয়া পুস্তকাকারে তাহা ছাপাইয়াও লইয়াছিলাম। কিন্তু রওনা হওয়ার ঠিক আগে অসুখে পড়ায় আমার বদলে খালি ছাপানো বইটাই সেখানে গেল! আমার বদলে শেঠ যমুনালালজী সভাপতিত্ব করিলেন। শুনিয়াছি, তিনি আমার ঐ অভিভাষণটি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

কোকনদ কংগ্রেসে সভাপতি হইলেন মহম্মদ আলি। তাঁহার অভি-ভাষণটি দীর্ঘ আর মহত্ত্বপূর্ণ হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের রাজনীতিতে মুসলমানদের স্থান কি, অংশ কতটুকু, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহার আলোচনা তিনি করিয়াছিলেন। আগেকার বিষয়ে তিনি এমন অনেক কথা বলিয়াছিলেন যাহা হয়তো সকলে মানিতে পারে না। যাহা হউক, কোকনদ কংগ্রেসে দিল্লী কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করা হইল। স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার যে অনুমতি সেখানে পাইয়াছিল তাহাই পুনরায় মঞ্জুর করিয়া লওয়া হইল। তাহা ছাড়া, হিন্দু-মুসলমানের রফার সম্বন্ধে জনসাধারণ ও কমিটির সিদ্ধান্তসহ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করার নির্দেশ দেওয়া হইল। খাদি-প্রচারের জন্য একটি খদ্দরবোর্ডও সংগঠন করা হইল। লোকের কি উৎসাহ! মনে হইল জনসাধারণের মধ্যে যেন নবজীবন আসিয়াছে। ঠিক অধিবেশনের সময়টিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ সেন সিংহের মৃত্যু সংবাদে সকলের বড়োই দুঃখ হইল। আমাদের একজন দৃঢ়চিত্ত ত্যাগী কর্মকর্তা চলিয়া গেলেন!

হাইকোর্টে বর্মার মামলা

আমি কিছুদিন পাটনায় থাকিয়া গেলাম। ১৯২৪ সালের ২রা জানুয়ারি হইতে হাইকোর্টে হরিজীর মকদ্দমার আপীল বসিবার কথা। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। জানুয়ারির গোড়া হইতে মে-র শেষ পর্যন্ত মামলা চলিল, আমাকেও প্রায় সারাক্ষণ উহাতে লাগিয়া থাকিতে হইল। হাইকোর্টে আমাদের পক্ষে সওয়াল করিয়াছিলেন শ্রীহাসান ইমাম আর মিস্টার মানুক। ডুমরাওঁয়ের মহারাজের পক্ষে ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখার্জি। তিনি তখন সদ্য হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে পেন্সন লইয়া বাহির হইয়াছেন। আমাকে খুব পরিশ্রম

করিতে হইয়াছিল। সকালেই স্নানাদি সারিয়া ঠিক সাতটার সময়ে জনাব হাসান ইমামের কাছে যাইতাম। যতক্ষণ তিনি কাছারিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন বলিয়া উঠিয়া না পড়িতেন, ততক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতাম। তারপর সারাদিন কাছারিতে কাজ করিতাম। সন্ধ্যায় আবার তাঁহার সঙ্গে! বিশেষ করিয়া শনি রবি, আর কখনও কখনও অন্য দিনেও, একলা লাইব্রেরিতে কাজ করিতাম। আইনের নজির খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার আমার উপর দেওয়া হইয়াছিল। আরাতেও আমি এই কাজ করিয়াছিলাম, এখানেও আবার তাহাই। আরায় একটা বিষয়ে কোনো নজির খুঁজিয়া পাইলাম না, অথচ বিষয়টি বড়ো জরুরি। ভাবিয়া দেখিলাম, এরকম মামলা তো কতবারই আসিবে, আর আমাদের পক্ষের নজির মেলাই চাই। কিন্তু পাটনার মতো বইয়ের এমন সুবিধা তো আরায় নাই, সেইজন্য নজির খুঁজিয়া পাই নাই। পাটনায় হাসান ইমামের চমৎকার লাইব্রেরি। আমি তাঁহার লাইব্রেরিতে ঐ ধরনের নজির খুঁজিতে বহু সময় ব্যয় করি এবং অবশেষে সফলও হই। একটা নজির পাওয়ার পর আগেকার, পিছনকারও অনেক পাইলাম। জনাব হাসান ইমামকে যখন নজিরগুলি দেখাইলাম, তখন তিনি এত খুশি হইলেন যে আমাকে লইয়া তখনই মিঃ মানুকের বাড়ি গেলেন, আর তাঁহাকে অবিলম্বে তাহা দেখাইলেন। দুইজনেরই সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, মামলায় তাঁহারা উহার জোরে জিতিবেন, আর হইলও তাহাই।

এই মামলার শুনানির সময়েই পাটনা শহরে স্যর আশুতোষের অকালে মৃত্যু হয়। তাঁহার সওয়াল শেষ হইয়াছিল। জজদের জন্য কিছু নোট তৈরি করিতে ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ এক দিনের অসুখে আচমকা তিনি চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর সময় আমি তাঁহার কাছেই ছিলাম। কয়মাস ধরিয়া পাটনায় রোজ তাঁহার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার বড়োই সৌভাগ্যের কথা ছিল। কলিকাতায় যখন ছিলাম, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ, আর আমি নতুন উকিল। পাটনায় তো দুইজনেই এক মামলায় কাজ করিতে-ছিলাম—যদিও ভিন্ন পক্ষে, তবু সকালে, দুপুরে, কাছারি ভাঙিবার পরে, প্রায়ই নিজেদের মধ্যে দুই-চারিটি কথার আলাপ-আলোচনা হইত। এখানে একটি ছোটো ঘটনার উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। জনাব হাসান ইমাম আশুবাবুকে 'গুরুজী' বলিতেন। হাসান ইমাম যখন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, স্যর আশুতোষ ছিলেন তাঁহার সিনিয়ার। সম্ভবত সেখানেই এই সম্বন্ধটি পাতানো হইয়াছিল। নিযুক্ত হইবার অল্পদিন পরেই হাসান ইমামকে ফৌজদারী বেঞ্চে বসিতে হয়, আর সেইখানকার সিনিয়ার জজের সঙ্গে পর পর তিনটি মকদ্দমায়ই তাঁহার মতভেদ হয়। তৃতীয় ব্যক্তির বিচারের জন্য ঐ তিন মামলাই স্যর আশুতোষের কাছে পাঠানো হয় আর

তিনটিতেই তিনি হাসান ইমামের বিচারকে সমর্থন করেন। এইজন্য কলিকাতা হাইকোর্টে অল্প দিনেই হাসান ইমামের খুব নাম হইয়া যায়। পাটনায় হাসান ইমাম একদিন আশুতোষকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেন। হাই-কোর্টেই তিনি বলিলেন, 'গুরুজী, আমাদের বাড়িতে আপনি চা খাবেন?' স্যর আশুতোষ বলিলেন, 'আমি গোঁড়া সনাতনী, সে কথা ঠিক, আর আজ পর্যন্ত এইজন্যই কোনোদিন গভর্নমেণ্ট-হাউসে চা খাই নাই; কিন্তু তার জন্যে এমন কথা নাই যে হাসান ইমামের বাড়িতে চা খাবো না।' চা-পার্টি হইল, আর আমরা সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাতে যোগ দিলাম!

বেতিয়ার মীনা-বাজার

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন যারবেদা জেলে। সেখানে তিনি কঠিন অসুখে পড়িলেন। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের প্রকোপ এমন বাড়িয়া উঠিল যে, একদিন ডাক্তারেরা ভাবিলেন, তাড়াতাড়ি অস্ত্রোপচার না করিলে ইঁহার প্রাণরক্ষা হইবে না। রাত্রিবেলা তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আর সেই রাত্রিতেই তাঁহাকে পুনার হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানকার ইংরেজ ডাক্তার কর্ণেল মেডোককে অস্ত্র করিতে হইল। মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার ডাক্তার কে। গান্ধীজী বোম্বাইয়ের ডাক্তার দালাল আর ডাঃ জীবরাজ মেহতার নাম করিলেন। কিন্তু এমন সময় ছিল না যে উঁহাদের ডাকিয়া আনা যায়। গান্ধীজী পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে এই ইংরেজ ডাক্তারের উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আর আস্থা আছে, এখন তিনি নিশ্চিতভাবে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। ঐ সময় শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে হাসপাতালে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়, আর যতক্ষণ পর্যন্ত ছুরির কাজ শেষ না হইল ততক্ষণ তিনি হাসপাতালে থাকিলেন। মাঝরাত্রিতে অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজ ডাক্তার এ কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। ছুরি লাগাইবার ঠিক সময়টিতে সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয়। ঠিক ছুরির কাজ চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ বিজলী বাতি নিভিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে তখনই আবার জ্বলিয়া উঠিল, অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে বিশেষ বিঘ্ন কিছু হয় নাই।

আমি তখন বর্মার মকদ্দমার ব্যাপারে পাটনা হাইকোর্টে কাজ করিতে-ছিলাম। কাগজে গান্ধীজীর পীড়া ও অস্ত্রোপচারের খবর বাহির হইল। দেশময় চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া ছড়াইয়া পড়িল, আমি তিন-চার দিনের ছুটি লইয়া সোজা পুনা চলিয়া গেলাম। গান্ধীজী তখনও হাসপাতালে,

আর খুবই দুর্বল। আমি ঐ অবস্থায়ই গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম। হালচাল জানিয়া পাটনায় ফিরিয়া আসিলাম। তখন এইটুকু বোঝা গেল যে এখন আর প্রাণের ভয় নাই, তবে এত দুর্বল যে কিছু দিন পর্যন্ত ভালোমতো বিশ্রাম করিতে হইবে। পাটনায় ফিরিবার অল্প পরেই শোনা গেল, গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। খবর আসা মাত্র পাটনায় এক সভা হইল, আমিও তাহাতে বক্তৃতা দিলাম। পুনা হাসপাতালে গান্ধীজীর সঙ্গে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, ঐ সভায় সকলকে তাহা বলিলাম। তাহার সারাংশ এই যে, অসুখের জন্য ছাড়া পাওয়া গান্ধীজীর মনঃপূত নয়। আমি বলিলাম, দেশের লজ্জার কথা যে, আমরা নিজের শক্তিতে পারিলাম না, গভর্নমেণ্টের দায়ে তাঁহাকে কারামুক্ত করা হইল। ছাড়া পাওয়ার পর গান্ধীজীও তাঁহার বিবৃতির মধ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন।

কিছুদিন হাসপাতালে থাকিয়া সুস্থ হইয়া গান্ধীজী বাহিরে আসিলেন। ঠিক হইল, বিশ্রামের জন্য বোম্বাইয়ের কাছে জুহু নামে সমুদ্রতীরে একটি জায়গায় তিনি কিছুদিন থাকিবেন, আর সেই অনুসারে তিনি জুহুতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন।

এই সময়ে চম্পারন জেলার বেতিয়ায় এক ঘটনা ঘটে, এইখানে তাহার কথা বলা দরকার। বেতিয়া স্টেট কিছুদিন যাবৎ কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। মিঃ রাদারফোর্ড তখন ঐ স্টেটের ম্যানেজার। ইনি আগে ছিলেন নীলকর। গভর্নমেণ্টের তখনকার নীতিই ছিল যে যেখানেই কোনো স্টেট কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস-এর কবলে আসিয়া পড়িত, সেখানেই কোনো নীলকর সাহেবকে ধরিয়া ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইত। ইঁহার আগেও নীলকরদেরও একজন বেতিয়ারাজ্যের ম্যানেজার ছিলেন। যাহা হউক, ১৯২২ সালে বেতিয়া মিউনিসিপ্যালিটির যে সদস্য-নির্বাচন হয় তাহাতে কয়েকজন কংগ্রেসী লোকও নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের পদের জন্যও প্রার্থীরা দাঁড়াইলেন। চেয়ারম্যানের পদের জন্য তো স্বয়ং মিঃ রাদারফোর্ড ছিলেন নির্বাচনপ্রার্থী আর ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য তাঁহারা দাঁড় করাইলেন ওখানকার এক সাব-রেজিস্ট্রারকে। কংগ্রেসের পক্ষের প্রার্থী ছিলেন শ্রীবিপিনবিহারী বর্মা আর শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র। রাজ্যের পক্ষে, বিশেষত মিঃ রাদারফোর্ডের পক্ষে, আর কাহারও এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মোটেই সম্মানজনক নয়। বিশেষত কংগ্রেসী কেহ তাহাদের হারাইয়া চেয়ারম্যান অথবা ভাইস-চেয়ারম্যান হইবে, এই চিন্তাই অসহ্য। ১৯২৪ সনে আবার নূতন নির্বাচন হইল, এইবার তো কংগ্রেসী মেম্বারদের দল বেশ ভারি হইল। সেইজন্য চেয়ারম্যানের পদের জন্য রাজ্যের তরফ হইতে কাহাকেও দাঁড় করাইল না। শ্রীবিপিনবিহারী বর্মা আর পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র নির্বাচিত হইয়া গেলেন। স্টেট হইতে

কাহাকেও প্রার্থী দাঁড় করায় নাই, তবু কিন্তু মিঃ রাদারফোর্ডের এই হার স্টেটের লোকেরা ভুলিতে পারে নাই। স্টেটের তরফ হইতে উঠিতে বসিতে শুনাইয়া দিত যে যেমন করিয়াই হউক ইহার ফল বুঝাইয়া দিবে।

মহাত্মাজীর রোগের সংবাদে সমস্ত দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে মৌলানা মহম্মদ আলি নির্দেশ দিলেন যে সর্বত্র সভা করিয়া মহাত্মাজীর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করা হউক। বেতিয়ায়ও সভা হইবার কথা। ঐখানে রাজার একটি মীনা-বাজার আছে, শহরের বিভিন্ন ব্যাপারীরা ঐ বাজারে দোকান ভাড়া নিয়া বসে। সেদিন প্রজাপতি মিশ্র আর বাবু জয়নারায়ণ এই দুই জনে প্রার্থনাসভায় যাইবার জন্য দোকানদারদের অনুরোধ করিবার জন্য ঐ বাজারে যান। রাজার এক কর্মচারী জয়নারায়ণবাবুকে দুই চড় মারিয়া দুই জনকেই বাজার হইতে বাহির করিয়া দিল। সমস্ত দোকানদারদের মধ্যে এক মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, মিশ্রজী তাহাদের নিবৃত্ত না করিলে বড়ো রকম মারামারি বাধিয়া যাইত। পরে প্রার্থনা সভা হইল, আর দলে দলে দোকানের লোকেরা তাহাতে যোগ দিল। শুধু তাহাই নয়, ঐ দোকানীরা ঠিক করিল মীনাবাজার হইতে দোকান তুলিয়া লইবে এবং মিউনিসিপ্যালিটির কাছে জমি লইয়া অন্যত্র দোকান খুলিবে। পর দিন হইতে বাজার খালি হইতে লাগিল, একটু দূরে সরিয়া কয়েকটা দোকান বসিয়া গেল। ক্রমে দুই-চারি দিনের মধ্যে নূতন বাজার লাগিয়া গেল। মীনাবাজার প্রায় খালি, স্টেটের দিকেও ইহার ধাক্কা লাগিল, লোকের মুখে মুখে খবর রটনা হইল যে কংগ্রেসীদের মার দেওয়া হইবে, কিন্তু কংগ্রেসীরা এই ধরনের খবরের পরোয়া করিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা টমটমে চড়িয়া প্রজাপতি মিশ্র কোথায় যেন যাইতেছিলেন, এমন সময় কেহ একজন লাঠি দিয়া তাঁহার মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত করিল, তিনি প্রায় বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। লোকটি ম্যানেজারের কুঠির অভিমুখে পলাইয়া গেল। শোনা গেল, উহাকে লইয়া রাজার কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পর্যন্ত গিয়াছিল এবং কোনো কারসাজিতে উহাকে ঐখান হইতে সরাইয়া ফেলিল। সারা শহরের লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, আমার কাছে তার গেল। তার পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া সকল বিষয়ের খবরাখবর সংগ্রহ করিলাম। এই মারের আগে মীনাবাজারে বড়ো দোকান দুই-একটা তখনও ছিল, কিন্তু ইহার পরে তাহারাও বাহির হইয়া আসিল। বেশ সুন্দর একটি বাজার গড়িয়া উঠিল। মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল, কিন্তু রাজ্যের প্রায় বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কা দেখা গেল। প্রজাপতি মিশ্র ঐ সময় খুব সাহস ও শান্তি বজায় রাখিয়া কাজ চালাইয়া-

ছিলেন। বিছানায় শুইয়াও তিনি লোককে শান্ত থাকিবার জন্য উপদেশ ও আদেশ পাঠাইয়াছিলেন। যাহারা এই ব্যাপার করিয়াছিল তাহাদের উপর কোনোরকম দণ্ড বিধান করা হইবে না ঠিক হইল। বেশ বোঝা গেল, এই ব্যাপারটি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নির্দেশমতোই করা হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গেল। ছোটো বড়ো যে-সব দোকানীর মীনাবাজারে দোকান ছিল, তাহারা সকলেই খোলামাঠে অথবা খড়ের চালের নীচে দোকান খুলিল। মাটির বাসন হইতে আরম্ভ করিয়া সোনারুপার জিনিস পর্যন্ত সব কিছুর দোকানই এই নূতন বাজারে চলিয়া আসিল। ভয় ছিল যদি এই-সব খোলা জায়গায় দোকানীদের জিনিস চুরি যায়, পুলিসের সাহায্যের তো আশা নাই; সেজন্য দোকানগুলির রক্ষার জন্য শহর হইতে স্বয়ংসেবক দল হাজির রহিল। দিনরাত উহারা পাহারা দিতে লাগিল। লোকের মনে খুব উৎসাহ। এই বিরোধ বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। বহুদিন পর যদিও মীনাবাজারে আবার দোকান পসার খুলিয়াছে তবু এই নূতন বাজারও রহিয়া গিয়াছে।

এই খবর পাইয়া আমি বেতিয়া যাই। অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর খবরের কাগজে ছাপিবার জন্য আমি এক বিবৃতি দিয়াছিলাম। তাহাতে সব কথা খোলাখুলি করিয়া বলি। ইহার কিছুদিন পরে বেতিয়াতে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি মৌলানা মজহর-উল-হক সাহেব আর অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্থির হইল যে, বেতিয়ার অবস্থার যদি সংশোধন না হয় তবে প্রান্তীয় কমিটির অনুমোদন পাইলে বেতিয়ার প্রজাদিগকে খাজনা বন্ধ করিতে বলিতে হইবে, আর সেজন্য যত কিছু ত্যাগস্বীকার করা দরকার হইবে তাহার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত হইতে হইবে। একটি সর্বজনীন সভা করিয়া এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হইল। বিহার কাউন্সিলেও এই প্রশ্ন উঠিল। ঐ সময় স্বরাজ্যদলের লোকেরা খুব জোর বিতর্ক করেন। জলেশ্বরবাবু ছিলেন তাঁহাদের নেতা। তিনি নিজে এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। দাঙ্গাকারীরা নিজেরাই তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ের আসল কথা বলিয়া দিয়াছিল। তাহাদের কথার ভিত্তিতেই তিনি সমস্ত বিষয়টি বিশদভাবে কাউন্সিলে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন।

মহাত্মাজী বিশ্রাম করিতেছিলেন, কিন্তু কাজও চলিতেছিল। কারণ যেই তিনি কথাবার্তা বলিবার মতো সুস্থ হইলেন তখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দলে দলে লোক জুহুতে আসিতে লাগিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বিশেষত কাউন্সিল প্রবেশ আন্দোলনের কথা, সব তাঁহাকে বলিতে লাগিল। দেশবন্ধু দাশ আর পণ্ডিত মতিলাল নেহরুও গেলেন এবং কয়েকদিন সেখানে থাকিলেন। এই সম্বন্ধে অনেক আলাপ-আলোচনা হইল, যাহাতে এই বিষয়ে নিষ্পত্তির একটা পথ পাওয়া যায়। স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে কোনো কোনো কংগ্রেসী কাউন্সিলে ঢুকিয়াছিলেন। কাজেই গয়া আর দিল্লি কংগ্রেসের সময় যতটা ছিল এখন আর এই বিষয়ের ততটা গুরুত্ব ছিল না। তবু আমাদের মতো লোকদের মনে বেশ আনন্দ হইল যে গান্ধীজী কাউন্সিল বর্জন সম্বন্ধে আমাদের পন্থাই পছন্দ করিয়াছেন। আমাদের আরও আনন্দের কারণ যে, আমাদের বরাবরই বলা হইয়াছে যে গান্ধীজী বাহিরে থাকিলে এই বিষয়ে এত জেদাজেদি করিতেন না, একটা না একটা রফা করিয়াই দিতেন। দেখা গেল, গান্ধীজী আগেও যেমন এই কার্যক্রম দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহার বিরোধী হইতেন, এখনও তেমনই প্রবলভাবে তাহার বিরোধী আছেন।

জুহুর আলাপাদির পর গান্ধীজী এক বিবৃতি দিলেন। তিনি তাহাতে পরিষ্কার বলিলেন যে তিনি এখনও পঞ্চবিধ বর্জনের পক্ষপাতী, আর তাঁহার মতে কাউন্সিল-প্রবেশ অসহযোগ নীতির বিরুদ্ধ; কিন্তু দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি স্বরাজ্যদলের অন্য সকলকে নিজের মতে টানিতে পারেন নাই, তাঁহারা ইতিমধ্যেই কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন; কাজেই এই বিষয়ে বাদবিতণ্ডায় আর কোনো লাভ হইবে না, অপরিবর্তনবাদীরা এই বিবাদ ভুলিয়া রচনাত্মক কার্যে আত্মনিয়োগ করুন। তিনি আরও বলিলেন, কংগ্রেসের সংগঠন সম্বন্ধে তাঁহার আরও অনেক কিছু বলিবার আছে, তাহা পরে বলিবেন। সেসময় হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্নটি দেশময় খুব বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছিল, আর সর্বত্র ছিল এক নিরাশার ভাব। গান্ধীজী ইহারও এক অতিশয় বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তিনি আর্যসমাজের বিষয়ে যে মন্তব্য করেন, তাহা অনেকের ক্ষোভের কারণ হয়। তিনি ইহাতে বলিয়াছিলেন, মুসলমানরা কলহপ্রিয়- (bully) আর হিন্দুরা কাপুরুষ (coward)।

কংগ্রেসের গঠনসম্বন্ধে তাঁহার মত, কংগ্রেসের যেখানে যেখানে নির্বাচন হইবে সেখানেই এমন লোক দিতে হইবে যিনি এই পঞ্চবিধ বর্জনের নীতি মানেন, আর নিজের জীবনে সেই আদর্শ প্রতিপালন করেন—অর্থাৎ আদালত বর্জন করিয়া নিজে ঐ আদালতে ওকালতি করিবেন না, বা মামলা লড়িবেন না, সরকারি বিদ্যালয়ে নিজের নাবালক সন্তানকে পড়িতে পাঠাইবেন না, সরকারের খেতাব বর্জন করিবেন, কাউন্সিলে যাইবেন না এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জনের উদ্দেশ্যে খাদিই পরিবেন ও চরখা চালাইবেন।

ঐ সময়েই গোপীনাথ সাহা নামে এক বাঙালী যুবক কলিকাতায় প্রকাশ্য রাস্তায় দিনে-দুপুরে ডে নামে এক সাহেবকে পিস্তলের গুলিতে নিহত করে। উহাকে ধরিয়া ফেলা হয়, আর বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়। বাংলার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সেই বার সিরাজগঞ্জে অধিবেশন হয়; ইহাতে একটি প্রস্তাবে এ বিষয়ে দেশভক্তির প্রশংসা করা হয়, যদিও গোপীনাথের কাজটাকে নিন্দনীয় বলা হয়। মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবটি ভালো লাগে নাই, কারণ তাঁহার মতে এই ধরনের হত্যা কংগ্রেসের সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ, আর ইহাতে দেশের ক্ষতি হয়, স্বরাজের পথে ইহাতে বাধাই পড়ে। প্রস্তাবটি পড়িয়া গান্ধীজী তীব্র মন্তব্য করেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকটে কংগ্রেসের সংগঠন সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আর ডে-হত্যার সম্বন্ধেও এক প্রস্তাব পেশ করিতে চাহিলেন। প্রস্তাবের খসড়া তিনি নিজেই করেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কংগ্রেসের সদস্যেরা সকলেই এই বর্জনগুলি মান্য করিবেন, আর মান্য করেন এমন লোকই কেবল পদাধিকারী হইতে পারিবেন। ফলে দাঁড়াইল যে, যাহারা কাউন্সিলে গিয়াছে তাহারা পদাধিকারী নির্বাচিত হইবে না, আর যাহারা নির্বাচিত হইয়াছে তাহাদিগকে সরিয়া আসিতে হইবে। এইভাবে নির্বাচিত পদাধিকারীরা প্রতিদিন আধ ঘণ্টা সুতা কাটিবেন, মাসে দুই হাজার গজ সুতা খদ্দর বোর্ডে অবশ্য দিবেন। যিনি সুতা দিতে পারিবেন না, তাঁহার পদ খালি হইয়াছে মনে করিতে হইবে, আর ঐ পদের জন্য অন্য লোককে নির্বাচন করিতে হইবে। ইহার ফলে আপসে মিটমাটের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাহাও একেবারে চলিয়া গেল। সারা দেশে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উঠিল, পক্ষ বিপক্ষ দুই দলের লেখায় সংবাদপত্রগুলি ছাইয়া গেল। আর্যসমাজের শাখাগুলি উহাদের সম্বন্ধে গান্ধীজীর মন্তব্যের নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু গান্ধীজী যেমন চিরদিন করিয়া আসিতেছেন, তেমনই ভাবে দৃঢ় অথচ সংযত ভাষায় নিজের মতামত দেশের সমক্ষে খুলিয়া ধরিলেন।

জুনের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক

অধিবেশন হইল। যে-সকল প্রস্তাবে বর্জন না মানিলে ও চরখা না কাটিলে পদের অধিকারী হওয়া যাইবে না বলা হইয়াছিল, সেগুলি লইয়া এই অধিবেশনে বিরোধিতা করা হইল। বিরোধী দলের কথা যে, এই প্রস্তাব কংগ্রেসের নিয়ম অনুযায়ী হয় নাই; তাঁহাদের মতে কংগ্রেসের নিয়মকানুন তো কংগ্রেস বাঁধিয়া দিয়াছে, কংগ্রেসই তাহার হেরফের করিতে পারে; নিখিল ভারত কমিটির সেই অধিকার নাই, এখানে এই প্রস্তাব পাশ করিতে হইলে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে। মহাত্মাজীর বক্তব্য ছিল যে, কংগ্রেসেরই এক নিয়মে কংগ্রেসের অধিবেশন যখন হইবে না তখন উহার সমুদয় অধিকার নিখিল ভারত কমিটির হাতে থাকে; আর যদি এই প্রস্তাব দ্বারা নিয়মাবলীর সংশোধনই হয়, তাহাও অনিয়মের কিছু হইবে না, বিশেষত যখন ইহার প্রভাবে এই পাঁচটি বর্জন সম্বন্ধে মীমাংসার বিষয়ে সুবিধা হইবে। মৌলানা মহম্মদ আলি সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। এই প্রস্তাব নিয়মের অনুকূল না প্রতিকূল প্রশ্ন উঠিলে তিনি নিজের রায় না দিয়া সদস্যদের মত লইলেন, দেখা গেল, বহু মত এই বিধানের অনুকূলেই ছিল, যদিও বহু মত আর অল্প মতের মধ্যে খুব অল্প ভোটের তফাত। ইহার প্রতিবাদে দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইঁহারা চলিয়া যাওয়ার পরও গান্ধীজী আরও একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, খুব অল্প ভোটে উহা গ্রাহ্য হয়। তখন গান্ধীজী অবিলম্বে এক প্রস্তাব করিলেন যে, ঐ প্রস্তাবের যে অংশে বর্জননীতি অমান্য করিলে পদচ্যুতির দণ্ড বিধান করা হইয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হউক। তিনি বলিলেন যে যদিও উপস্থিত লোকেদের মত এই প্রস্তাবের পক্ষে, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত পক্ষে বহুমত বলা যায় না, কারণ যাঁহারা আজ অনুপস্থিত তাঁহারা ভোট দিলে হয়তো ঐ দিকেই ভোট বেশি পড়িত; তাহা ছাড়া, এই দিকে ভোট বেশি হইলেও সংখ্যাধিক্য এত কম যে নাই বলিলেও চলে। এইভাবে স্বীকৃত প্রস্তাবটি বদলাইয়া দেওয়া হইল, আর স্বরাজ্যদলের আবার ফিরিয়া আসিবার সুযোগ মিলিল।

এই দিনই রাত্রিবেলা পুনরায় গান্ধীজীর সঙ্গে উঁহাদের আলোচনা হয়, যাহার ফলে কংগ্রেসের সংগঠনসম্বন্ধীয় প্রস্তাবকে এমনভাবে সাজানো হয় যে দুই দলেরই মনঃপূত হইল। পরের দিন সব প্রস্তাবই এই চুক্তি অনুসারে গৃহীত হইল। তখন মহাত্মাজী ডে-হত্যা সম্বন্ধে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন। দেশবন্ধু দাশ সিরাজগঞ্জে গৃহীত প্রস্তাবকেই সংশোধিতরূপে পেশ করেন। শেষে অবশ্য গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়, কিন্তু তাহাও খুব অল্প ভোটের জোরে। তাহার বিশেষ কারণ, সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের উপর ইংরেজরা আর ইংরেজী কাগজের দল খুব কলরব তুলিয়াছিল। খোলাখুলিভাবে শোনা যাইতেছিল যে এজন্য দেশ-

বন্ধু ও অন্যান্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইবে। দেশবন্ধু তাঁহার সংশোধিত প্রস্তাবের কারণ হিসাবে বলিলেন যে ইহা না করিলে লোকে মনে করিবে তিনি বুঝি গ্রেপ্তারের ভয়ে সিরাজগঞ্জের প্রস্তাব ছাড়িয়া দিতেছেন। যাহাই হউক, কংগ্রেসসংগঠন সম্বন্ধে প্রস্তাবের ফল হইল এই যে, বর্জননীতি আরও শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, অন্য দিকে কাউন্সিল বর্জন আরও শিথিল হইয়া গেল।

মহাত্মাজীকে কেহ কেহ বলিল, আদালত বর্জনের এই প্রস্তাবের সুযোগ লইয়া দুষ্ট লোকেরা কংগ্রেসীদের প্রতি ভারি জুলুম করে; কেননা কংগ্রেসী লোকেরা না পারে নিজের দাবি আদালতে উপস্থিত করিতে, না পারে কোনো নালিশের প্রতিবাদ করিতে। সেইজন্য ইঁহারা কংগ্রেসীদের নালিশ মামলার একটা সুব্যবস্থা করিতে চাহেন। মহাত্মাজী রাজী হইলেন, আর বলিলেন, আত্মরক্ষার জন্য ইঁহাদের আদালতে যাইবার অনুমতি দেওয়া হউক। বিশেষভাবে শ্রীগঙ্গাধর রাও দেশপান্ডে, যিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন, তাঁহার কথা উঠিল। ইঁহাদের অনুমতি দেওয়ার জন্য গান্ধীজী একটি প্রস্তাব আনিলেন। ডাক্তার মহম্মদ আলি গান্ধীজীর মত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, তিনি বহিষ্কারসম্বন্ধীয় প্রস্তাবের বিরোধী নিশ্চয়ই। মৌলানা সাহেব তখন প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দিলেন। সভার কাজ শেষ হইল। কিন্তু ঐ সভার কাজ-কারবার সব কিছুতেই গান্ধীজীর প্রাণে গভীর আঘাত লাগিল। তিনি এক গভীর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সভায় ঘোর নিস্তব্ধতা, গান্ধীজীর চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু পড়িতেছে। খানিকক্ষণ পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া গান্ধীজী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন। সমস্ত আবহাওয়াই বিষাদ ও নৈরাশ্যে থম-থমে হইয়া উঠিল। উপস্থিত সদস্যগণ তাহার পর বক্তৃতা করিয়া গান্ধীজীকে সান্ত্বনা দিলেন : গান্ধীজী বিশ্বাস করুন, আমরা আপনার পিছনে পিছনে চলিবার জন্য প্রস্তুত। অনেকে তো গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে, কেহ-বা পরে কাঁদিতে লাগিলেন। এই বিষাদময় অবস্থার মধ্যে সভার কাজ সমাপ্ত হইল।

এই অধিবেশনটির বিষয় নিতান্ত মর্মভেদী ভাষায় গান্ধীজী লিখিলেন। ভোটাধিক্য সত্ত্বেও গান্ধীজী যে নিজের প্রস্তাব বদলাইয়া লইলেন, তাহার জন্য দেশের কাগজগুলি ভূরিভূরি প্রশংসা করিল। বেশ বোঝা গেল, কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ ক্রমে অধিকতর স্থায়ী আর উৎকট হইয়া দাঁড়াইবে। কথাটা যদিও নূতন নয়, কারণ চৌরিচৌরা ব্যাপারের পরই তো খানিকটা জানা গিয়াছিল, যখন অধিকাংশ নেতাই জেলের মধ্য হইতেও গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে মত দিয়া-

ছিলেন। ডে-হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সময়েও এই মতবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছিল। সরকার তো হামেশাই এইরকম সুযোগের সন্ধানে থাকে, এখন এই ফাটলকে নিজের কাজে লাগাইতে ব্যস্ত হইল। কয়েক-দিন পর সুভাষচন্দ্র বসু ও বাংলার আরও কয়েক জন ভাইকে গ্রেপ্তার করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। গান্ধীজী নিজের দিক হইতে সর্বদাই ঝগড়া-বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহার সংকল্প দৃঢ়তর হইল—যে-কোনো রকমেই হউক, নিজেদের মধ্যকার এই বিরোধ-বিচ্ছেদ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে। আমেদাবাদে তিনি বলিয়াছিলেন যে যদিও কয়েকটি ভোট বেশি হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এত অল্প ভোটে যে প্রকৃত-পক্ষে তিনি উহাতে নিজের হারই মনে করেন। তখন হইতেই তিনি পথ খুঁজিতেছিলেন। তিনি যে কেবল স্বরাজ্যদলের সঙ্গে মিলনের পন্থা খুঁজিতেছিলেন তাহা নয়, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অন্যান্য মতের লোকেরা যাঁহারা অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও যেন আবার কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন।

তখন ডাঃ অ্যানি বেসাণ্ট স্বরাজ্যদলের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করিবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক ঐ সময়েই ইংলণ্ডে শ্রমিক দল বহু ভোটে জিতিয়া বিলাতে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীর‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড হইলেন প্রধান মন্ত্রী। লোকের আশা ছিল, কর্ণেল ওয়েজউড যিনি ভারতের হালচাল খানিকটা বুঝিতেন, তিনিই হইবেন ভারত মন্ত্রী। কিন্তু ভারতের ইংরেজদের, বিশেষভাবে সিভিল সার্ভিসওয়ালাদের বিরুদ্ধতায় তাহা হইল না। লর্ড অলিভিয়ার ভারতের মন্ত্রী হইলেন। কাহারও কাহারও আশা রহিল যে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদের খানিক অধিকার দিতে পারিবেন। দেশের পরি-স্থিতি দেখিয়া, কিংবা মুসলমানের বিরোধের বিষয় চিন্তা করিয়া, আর কংগ্রেসের এবং বলিতে কি, দেশের পরস্পরের মধ্যে অমিলের জন্য ক্রমে বর্ধমান এই ঔদাসীন্য দূর করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া, গান্ধীজী রায় দিলেন যে, কংগ্রেস বরং অসহযোগ স্থগিত রাখুক—যাহাতে সকল মতের লোকেই কংগ্রেসে আসিতে পারে।

মহাত্মাজীর প্রস্তাব ছিল এইরূপ : ১। কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র ভিন্ন অন্য সব বর্জন স্থগিত করুক; ২। কংগ্রেস কাপড় ভিন্ন অন্য সব ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন ছাড়িয়া দিক; ৩। খদ্দর আর চরখা-প্রচার, হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য আর হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-বর্জন—ইহাই করুক; ৪। বর্তমানে চালু রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়গুলি চালাইবে আর দরকার হইলে নূতনও খুলিবে; ৫। কংগ্রেসের সভ্য হইবার চার আনা চাঁদার নিয়ম উঠাইয়া দিয়া নিয়ম

করা হউক যে, কংগ্রেসের সভ্য তাহারাই হইবে যাহারা দিনে আধ ঘণ্টা সুতা কাটিয়া মাসে নিজের কাটা দুই হাজার গজ সুতা কংগ্রেসকে দিবে, অবশ্য গরিব বলিয়া যে তুলা কিনিতে পারে না তাহাকে কংগ্রেস হইতে তুলা দেওয়া হইবে। ফলে ১। কংগ্রেস অথবা অপরিবর্তনবাদীদল স্বরাজ্য-দলের বিরোধিতা না করিয়া নিজেদের গঠনমূলক কাজের পূর্ণ সুযোগ পাইবে; ২। ভিন্ন দলের লোককেও কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য বলা যাইবে; ৩। অপরিবর্তনবাদীরা কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধিতা করার জন্য পরোক্ষ-অপরোক্ষে আন্দোলন করা ছাড়িয়া দিবে; ৪। যাহারা বর্জন নীতিতে বিশ্বাস করে না তাহাদেরও স্বাধীনতা রহিল, উকিল যদি চায় ওকালতি করিতে পারে, আর বর্জন নীতি না মানিয়াও কংগ্রেসের পদাধি-কারী হইতে পারে।

মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবগুলি লইয়া লোকে বিচার করিতে লাগিল। শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট প্রস্তাবগুলি একপ্রকার মঞ্জুর করিয়া লইলেন। উঁহাদের মত লোকের কংগ্রেসে যোগ দিবার পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, দেখা গেল।

একুশ দিনের উপবাস ও একতা সম্মেলন

এক দিকে এই আলোচনা চলিতে লাগিল অন্য দিকে সারা দেশময় যেখানে-সেখানে হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা হইতে থাকিল। বিহারে ও ভাগলপুরে দাঙ্গা বাধিল। অন্য কয়েক জন ভাইয়ের সঙ্গে আমিও সেখানে গেলাম। আপোষে মিটমাট করাইয়া ফেলার চেষ্টায় বেশ কয়েকদিন সেখানে থাকিতে হইল। আরও নানা স্থানে দাঙ্গা হইতেছিল, গান্ধীজীর উপর ইহার গভীর প্রতিক্রিয়া চলিতে লাগিল। তারপর দিল্লীতে যখন জোর দাঙ্গা বাধিল, গান্ধীজী স্বয়ং তখন সেখানে গেলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকি-বার পর কি-একটা কাজে তাঁহাকে বোম্বাই ফিরিয়া আসিতে হয়। নিজাম-রাজ্যের গুলবর্গায়, এক জোর ফ্যাসাদ বাধে। গান্ধীজী আবার দিল্লী গেলেন। ঠিক ঐ সময়টিতে সীমান্ত প্রদেশের কোহট নগরে প্রবল দাঙ্গা হয়, বিস্তর লোক মারা যায়, বহু ধনসম্পত্তি লুট হয়, কত দোকানপাট আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। দেখিয়া শুনিয়া গান্ধীজী চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। গভীর ব্যথায় তিনি ঠিক করিলেন, হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের জন্য তিনি একুশ দিন উপবাস করিবেন। দিল্লীতে মহম্মদ আলীর

বাড়িতে যখন ছিলেন তখনই এই সংকল্প করেন আর সেখানেই উপবাস আরম্ভ করেন।

মহাত্মাজীর উপবাসের খবর কাগজে পড়িয়া দেশবাসী [illegible]
উঠিল। এই তো কিছুদিন আগে তিনি এমন ভারি অসুখে ভুগিয়া উঠিয়াছেন, এই শরীরে একুশ দিনের অনশন! দেশের লোক, বিশেষত তাঁহার চিকিৎসক ডাঃ আনসারি, মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। গান্ধীজীকে এই সংকল্প ত্যাগ করাইবার জন্য তিনি কত চেষ্টা করিলেন—
[illegible]ারি পরামর্শ, নিজের হৃ[illegible] প্রী[illegible] [illegible]ইই
গান্ধীজী টলিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি গান্ধীজীর কাছে কথা আদায় করিয়া লইলেন যে, উপবাসের ফলে যদি মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায় তবে তিনি অনশন ভঙ্গ করিবেন। উপবাস আরম্ভ হইল, খবর পাইয়াই আমি দিল্লী চলিয়া গেলাম। কয়েকদিন পরে গান্ধীজীকে মহম্মদ আলীর বাড়ি হইতে সরাইয়া লইয়া শহরের বাহিরে রায় বাহাদুর সুলতান সিংহের এক বাংলো বাড়িতে আনিয়া রাখা হইল। শ্রীএণ্ড্রুস উঁহার সেবা করিবার জন্য আসিলেন। আর, ডাঃ আনসারি তো দিনরাতই উঁহার দেখাশুনায় রত ছিলেন।

ইহার প্রভাব লোকের উপর না-পড়িয়া পারে না। মৌলানা মহম্মদ আলীর উদ্যোগে দিল্লীতে এক সর্বজাতি-সম্মেলন ডাকা হইল। তাহাতে হিন্দু মুসলমান শিখ ছাড়া খ্রীষ্টান নেতারাও যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ ডাঃ ফস ওয়েস্টকটও আসিয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া সমানে বিচার বিতর্ক চলিল। যে যে বিষয় লইয়া ঝগড়া বাধে সেইসব বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইল। মুখ্য প্রস্তাবটি ছিল :

(১) দেশব্যাপী এই যে ঝগড়াবিরোধ, যাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের ধন প্রাণ নষ্ট, ধর্ম-মন্দির অপবিত্র হইতেছে, তাহার জন্য এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে আর ইহাকে বর্বরতাসূচক ও ধর্মবিরোধী মনে করিতেছে। এই সভার মতে, নিজের হাতে প্রতিশোধ লওয়া বা অপরকে সাজা দেওয়া কেবল যে নিয়মবিরুদ্ধ তাহা নয়, অধর্মও বটে। সকলপ্রকার বিবাদ বিরোধেরই পঞ্চায়তদ্বারা বিচার হওয়া দরকার, যেখানে তাহা সম্ভব নয় সেখানে আদালতের সাহায্যে মীমাংসা করিতে হইবে।

(২) উপরিলিখিত প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করার আর আপোষে মিটমাটের উপায় কায়েম রাখার জন্য দুইটি জিনিস থাকা অনিবার্য : এক, প্রত্যেকের নিজের ধর্মবিশ্বাস ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে, আর, পরস্পরের মনোভাবের কথা চিন্তা করিয়া কেহ কাহারও এই অধিকারে আঘাত না-করিয়া নিজের নিজের ধর্ম মানিয়া চলিবে। কোনও ব্যক্তি বা দল ভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক পূজ্য মহাপুরুষদের গালি দিবে না, বা তাঁহাদের

ধর্মমতের নিন্দা করিবে না। সকল ধর্মমন্দিরকেই পবিত্র মনে করিতে হইবে, কাহারও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। কোনও অবস্থায়ই, যতই উত্তেজনার কারণ ঘটুক, প্রতিশোধের জন্য ধর্মমন্দিরের উপর অত্যাচার বা ধর্মস্থানকে অপবিত্র করা চলিবে না। কোথাও এইরূপ কিছু ঘটিলে সকলেরই কর্তব্য হইবে আপনার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া।

(৩) হিন্দুরা এমন আশা করিবেন না যে, জোরজবরদস্তি, কোনও বোর্ডের প্রস্তাব, বা ব্যবস্থাপকসভার আইন বা কোনও আদালতের হুকুমে মুসলমানেরা গোহত্যা রীতিটা পালটাইয়া ফেলিবে। অবশ্য মুসলমানেরা নিজের খুশিতে ছাড়িয়া দিতে পারে। সেজন্য উহাদের শুভবুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা করিয়া সদ্‌ভাব বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য ইহার অর্থ এমন নয় যে, স্থানীয় কোনও রেওয়াজ অথবা দুই জাতির মধ্যে আপোসে বর্তমান প্রথা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে, অথবা এখন হইতে যেখানে হয় না এমন জায়গায়ও গোহত্যা হইতে পারিবে। যেখানে বস্তুস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ সেখানে অনুসন্ধান ও বিচারের ভার রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়তের হাতে থাকিবে; আর গোহত্যা করিলেও এমন জায়গায় করিতে হইবে যাহাতে হিন্দুর মনে আঘাত না লাগে।

(৪) এই সম্মেলনের মুসলমান সদস্যগণ সহধর্মীদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যতদূর সম্ভব তাঁহারা যেন গোহত্যার সংখ্যা কম করিয়া ফেলেন। মুসলমানরাও এমন আশা করিবেন না যে, জোরজবরদস্তি বা বোর্ডের নিয়ম, ব্যবস্থাপক সভার আইন বা আদালতের হুকুমে হিন্দুগণ মুসলমানের মসজিদের কাছে বাজনা বাজাইতে নিরস্ত হইবে। হিন্দুরা ইচ্ছা করিলে উহা বন্ধ করিতে পারেন। হিন্দুরা যাহাতে মুসলমানের সাধনার মর্যাদা রাখে তাহার ভার হিন্দুদের শুভবুদ্ধির উপরই ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশ্য ইহার অর্থ এমন নয় যে, যেখানে যেরূপ কোনও স্থানীয় রেওয়াজ আছে বা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে কোন প্রথা দাঁড়াইয়াছে সেই সব এই প্রস্তাবের ফলে উঠিয়া যাইবে, আর যেখানে মসজিদের কাছে কোনওদিন বাজনা বাজে না সেখানেও এখন হইতে বাজনা বাজাইতে হইবে। উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়ত। এই সম্মেলনের হিন্দু সদস্যগণের হিন্দুদের প্রতি অনুরোধ যে, মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতে হইলে তাহা এমন ভাবে বাজাইবেন যেন মসজিদের নমাজ পড়ায় ব্যাঘাত না-হয়।

(৫) আরতি এবং আজান সম্বন্ধেও এই প্রকার প্রস্তাব স্বীকার করা হইল।

(৬) যেখানে মাংস-বিক্রি ও পশুবধের ব্যবস্থা আছে, প্রাণিবধের প্রণালী সম্বন্ধে—বলি বা জবাই—বিরোধ করা হইবে না।

(৭) ব্যক্তিমাত্রের যে-কোনও ধর্মকে মানিবার ও ইচ্ছা হইলে ধর্ম পরিবর্তনের অধিকার আছে। ধর্মপরিবর্তনের জন্য কেহ দণ্ডনীয় হইবে না বা অন্য কোনও রকম কষ্ট ভোগ করিবে না।

(৮) প্রত্যেক ব্যক্তি বা দলেরই বিচার বিতণ্ডা করিয়া অন্যকে নিজের ধর্মমতে আনিবার বা বিধর্মীকে বলিয়া বুঝাইয়া স্বধর্মে ফিরাইয়া আনিবার অধিকার আছে। কিন্তু জবরদস্তি, ধোঁকা, জুলুম বা লোভ প্রদর্শন চলিবে না।

(৯) ধর্মপরিবর্তন সম্বন্ধে লুকানো-ছাপানো চলিবে না। কেহ নিজের জায়গায় পূজা-স্থান নির্মাণ করিতে চাহিলে অপর ধর্মাবলম্বী তাহাতে বাধা দিবে না। নূতন পূজা-স্থান করিতে হইলে অপরের ধর্ম-স্থান হইতে দূরে সরাইয়া করিতে হইবে।

(১০) পনের জন সদস্যের একটি রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়ত গঠিত হউক, ইঁহারা ভিন্নমতাবলম্বী স্থানীয় লোকদের সম্মতি অনুসারে স্থানীয় পঞ্চায়ত গঠন করিবেন, তাহারাই স্থানীয় সব বিবাদ মিটাইবে। এই পঞ্চায়ত নিজের নিজের নিয়ম রচনা করিতে পারিবে। পঞ্চায়তের সভাপতি মহাত্মা গান্ধী, আর সদস্য হইবেন হাকিম আজমল খাঁ, শ্রীসি কে নরিম্যান (পার্সী), ডাক্তার এস কে দত্ত (খ্রীষ্টান), মাষ্টার সুন্দরসিং লয়ালপুরী (শিখ)। বাকী সদস্যদের ইঁহারাই বাছিয়া লইবেন।

এই প্রচেষ্টার ফলে মনে হইল দেশের আবহাওয়া যেন কিছুটা শান্ত হইয়াছে। সকল ধর্মের লোকে পরস্পরের সহিত সদ্‌ভাবে থাকিতে আর ভাইয়ের মত ব্যবহার করিতে মনস্থ করিল, মনে হইল। একতা-সম্মেলনের ফল বেশ ভালই হইয়াছে মনে হইল। স্থায়ী হইলে তো কথাই ছিল না, কিন্তু স্থায়ী তো হইল না। তখনকার আশা কিছুদূর চলিয়াই আর পূর্ণ হইল না।

আমি বরাবরই এই সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেজন্য আমিও ইহার সফলতাই কামনা করিতাম। কিন্তু এই হঠাৎ ভাল-হওয়া বায়ুমণ্ডল আর আশ্বাসে আমার মনে সর্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল, কারণ এই সব আলাপ-আলোচনার পিছনে একতার জন্য এমন জোর আকাঙ্ক্ষা ছিল না যাহাতে এমন শুভ চেষ্টাকে স্থায়ী সফলতাতে পরিণত করা যায়। নিজের দাবী-দাওয়ার উপর সকলে যতটা জোর দিতেছিল আপন আপন কর্তব্যের উপর মোটেই তত নয়। আমার তো বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেকে নিজের কর্তব্যের প্রতি মন দিলেই এই সকল ঝগড়াবিবাদ দূর হইতে পারে, হক আর দাবী নিয়া লড়াই করিলে হয় না। কিন্তু ঐ সময়ে যাহা কিছু হইতেছিল দেখিতে বেশ ভাল লাগিয়াছিল; সেজন্য আমার মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

ওদিকে গান্ধীজীর অনশনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। ডাক্তার আনসারি দিনে দুইবার তাঁহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিতেন। একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ডাক্তার আনসারির কাছেই শুনিয়াছি। একদিন পরীক্ষার পর তিনি দেখিলেন প্রস্রাবে অ্যাসিটোনের পরিমাণ খুব বেশি হইয়াছে। লক্ষণ ভাল নয়! আর বাড়িলে রোগীর বেহুঁস হইয়া পড়ার কথা, আর তখন তাহাকে বাঁচান কঠিন হইয়া পড়িবে। ডাক্তার বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি গান্ধীজীকে বলিলেন : আপনি বিপদের মুখোমুখি এসে পড়েছেন, আর সম্ভবত, একুশ দিন পূর্ণ হবার আগেই আপনার কথানুসারে আপনাকে অনশন ভেঙে ফেলতে হবে।

অ্যাসিটোনের মাত্রা বাড়িয়া চলিল। ডাক্তার আনসারি স্থির করিলেন যে, আর দেরি করা বিপদজনক। গান্ধীজীকে ঐকথা বলিলেন আর ব্যাকুলভাবে জানাইলেন যে, এখন উপবাস ভঙ্গ করা দরকার। তাঁহার ভয় হইল, আর কয়েকঘণ্টার মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারেন। সব কথা বলিয়া তিনি খাওয়াইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী বলিলেন : আপনি তো নিজের সব কিছু বিদ্যা প্রয়োগ করে দেখলেন, সব হিসাবও করেছেন, এখন আজ রাত-ভর আমার উপর ছেড়ে দিন। ডাক্তার সাহেব রাজী হন না। তখন গান্ধীজী বলিলেন : আপনি সব কিছুর হিসাব করেছেন, কিন্তু প্রার্থনার প্রভাবের হিসাব করেন নি, আজ আমাকে ছেড়ে দিন। পরদিন প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন অ্যাসিটোনের ভয় কাটিয়া গিয়াছে, তিনি খাওয়াইবার আগ্রহ ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর, উপবাসের শেষদিন পর্যন্ত, অ্যাসিটোনের উপদ্রব আর হয় নাই। ডাক্তার আনসারির ভয় কমিয়া গেল। আমাদের কাছে তিনি বলিয়াছিলেন : আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এই আশ্চর্য ঘটনার হদিস কিছু মেলে না, আমি ভেবে পাই না কি করে এমনটি সম্ভব হল।

অনশনের সময়ও গান্ধীজী নিজের নিয়মানুসারে প্রতিদিন চরখায় সুতা কাটিতেন। চারিদিকে বালিস দিয়া কোনওমতে উঠাইয়া বসান হইত। ঐভাবে বসিয়া বসিয়া তিনি চরখা ঘুরাইতেন। অবশেষে যখন অনশন-ভঙ্গ করিবার সময় আসিল, তখন প্রার্থনা করিয়া চরখা চালাইয়া ও ভজন গাহিয়া তিনি কমলালেবুর রস খাইয়া উপবাস ভঙ্গ করিলেন। এই সময় মৌলানা মহম্মদ আলী কসাইখানা হইতে একটি গরু কিনিয়া মহাত্মাজীকে উপহার দেন। কতখানি প্রেম আর সদ্ভাবের নিদর্শন!

আমি যখন বাবু হরিজীর মামলার জন্য পাটনায় কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় পাটনা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যনির্বাচন হইল। কাউন্সিলে যাওয়ায় যদিও কংগ্রেসের নিষেধ ছিল, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে প্রবেশ করায় কোনও নিষেধ ছিল না। ঐ নীতি অনুযায়ী সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে নির্বাচিত হইয়া উহার প্রেসিডেন্ট হইলেন। পণ্ডিত জহরলাল হইলেন এলাহাবাদ মিউ-নিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। পাটনায়ও কংগ্রেসের তরফ হইতে মিউনিসি-প্যাল নির্বাচনে দাঁড়ান ঠিক হইল। মৌলবী খুরশেদ হাসনান, শ্রীঅনুগ্রহ-নারায়ণ সিংহ, শ্রীজগৎনারায়ণ লাল, শ্রীবদরীনাথ বর্মা, শ্রীআব্দুল বারি প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেসীগণ দাঁড়াইলেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা ঠিক করিয়াছিলাম, মৌলবী খুরশেদ হাসনানকে চেয়ারম্যান আর অনুগ্রহ-বাবুকে ভাইস-চেয়ারম্যান করা হইবে। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইল, কারণ পাটনায় কয়েক জন বহুদিন যাবৎ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইয়া আসিতে-ছিলেন, তাঁহাদের হটানো সহজ নয়। তবু কংগ্রেসের অনেকে নির্বাচিত হইলেন, যদিও সংখ্যাধিক্য হইল না। অবশ্য কংগ্রেসীরা ছিলেন সংগঠিত আর তাঁহাদের কার্যক্রমও ঠিক ছিল, অপরদিকে অন্যরা ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়ইয়াছিল। মৌলবী হাসনানের নির্বাচনে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হিন্দু; তিনি হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন তুলিয়া দিলেন, তাঁহার ভোট-বাক্সের গায়ে নিজের ছবি আঁকিয়া দিলেন। এমনও শোনা গেল যে, একটা বাছুর সঙ্গে লইয়া হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে গিয়া বাছুরের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম; মোঃ হাসনানের মতো এমন ভাল কংগ্রেসী যদি নির্বাচনে জয়ী না-হন তবে আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা হইবে। আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম, তিনি বহু ভোটে নির্বাচিত হইলেন।

কিন্তু এই ঝগড়া-বিবাদ দেখিয়া মোঃ খুরশেদ হাসনান ঠিক করিলেন যে চেয়ারম্যানের পদের জন্য তিনি প্রার্থী হইবেন না, ঐ পদে আমাকেই বসিতে হইবে। আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমার সময়ও বড় কম, কারণ তখন এক বড় মামলায় খুব খাটিতে হইতেছে। কিন্তু তিনি কোনও-মতে রাজী না-হওয়ায় আমাকেই রাজী হইতে হইল। অনুগ্রহবাবুও সেই মকদ্দমায় বিরুদ্ধপক্ষে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি হইলেন ভাইস-চেয়ারম্যান। এই নির্বাচনের ফলে আমরা এমন কয়েকটি বন্ধুকে হারাইলাম যাঁহাদের

আমরা কংগ্রেসের শুভানুধ্যায়ী মনে করিতাম আর যাঁহাদের কাছে আমরা অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা রাখিতাম। ইঁহারা আমাদের পাকা বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহারা মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর আমাদের বিরোধী একটি দল গঠন করিয়া লইলেন। কোনও প্রস্তাব উঠিলেই তাহার বিরোধিতা করা এই দলের, বিশেষ দুই তিনটি ভাইয়ের কাজ হইয়া দাঁড়াইল। মিউনিসিপ্যালিটির মীটিংএ বড়ই সময় লাগিত, অথচ কোনও কাজই করা যাইত না। এমনও হইত যে, আগের অধিবেশনের কাজের রিপোর্ট মঞ্জুর করিয়া নিতেও তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগিত।

যাহা হউক, আমরা কাজ শুরু করিয়া দিলাম। মকদ্দমার কাজ শেষ হইয়া গেলে আমরা দুইজনে এই কাজে সমগ্র সময় দিতে লাগিলাম। অবশ্য আমাদের দুইজনেরই এই প্রথম মিউনিসিপ্যালিটির কাজ, আর কেহই এই কাজে ওয়াকিবহাল নই। তবে আমরা অবিলম্বে কাজ শিখিয়া লইবার জন্য যত্নশীল হওয়ায় কাজ চলিতে লাগিল। গয়ায়ও ঐ সময়ে নির্বাচন। সেখানকার লোকে অনুগ্রহবাবুকে শুধু মেম্বার নয়, একেবারে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিল। দুই জায়গার কাজ সামলানো শক্ত, সেজন্য কয়েকদিন পরে অনুগ্রহবাবু পাটনার ভাইস-চেয়ারম্যানের কাজে ইস্তফা দিলেন। এখন হইতে তিনি গয়ার কাজই সামলাইতে লাগিলেন। পাটনায় ভাইস-চেয়ারম্যান হইলেন মিষ্টার সৈয়দ মুহম্মদ; ইনি কংগ্রেসটিকিটে নির্বাচিত হন নাই, তবে আমাদের বিশেষ বন্ধু আর ভারি সজ্জন। মিউ-নিসিপ্যালিটিতে তিনি বেশ ভাল কাজও করিয়াছিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির হাঙগামা অনেক ছিল—আয় কম, ব্যয় বেশি, বিনা খরচে কোনও কাজই করা চলে না। নূতন ট্যাক্স না-বসাইলে আয় কি করিয়া বাড়িবে? ঐসময় স্যর গণেশদত্ত সিংহ বিহার সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। আমি রাঁচি গিয়া এই বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিলাম। আমি রাঁচিতে তাঁহার কাছে, এমন সময় তার আসিল, বাবু হরিজী হাইকোর্টের আপীল জিতিয়াছেন। আমার খুবই আনন্দ হইল। মিউনিসিপ্যালিটির কাজও আমি এইরকম প্রাণ দিয়া করিতাম। প্রতিদিন তিনচার ঘণ্টা আপিসে কাজ করিতাম, দুইতিন ঘণ্টা শহরে ঘোরাফেরা করিয়া মহল্লাগুলির সঙেগ পরিচয় বাড়াইতাম আর কাজের ব্যবস্থা করিতাম।

মিউনিসিপ্যালিটির হাঙগামা কি এক রকম! শহরটি লম্বায় প্রায় দশ মাইল, আর চওড়ায় মোট এক মাইল। সেজন্য খুব লম্বা লম্বা রাস্তার দরকার। আমাদের মত যাহারা শহরের পশ্চিমপ্রান্তে বাস করে আর এক্কা ভিন্ন অন্য যান যাহাদের নাই, তাহাদের পূর্বপ্রান্তে পরিদর্শনের জন্য যাওয়া বেশ কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদেরও এই

হাল। হেলথ-অফিসার আর ইঞ্জিনীয়ার ঘোড়া-গাড়ির জন্য ভাতা পান। এক্কার তুলনায় ঘোড়া-গাড়ি চড়ায় মান বেশি, কিন্তু তাড়াতাড়ি চলার পক্ষে কোনও লাভ নাই, কারণ তেজী এক্কা গাড়ির চেয়ে দ্রুত চলে। এই সব ভাবিয়া আর খরচ কমাইবার খেয়ালে আমার এক্কায় যাওয়াই পছন্দ ছিল। গাড়ির জন্য বা অন্য কিছুরই জন্য চেয়ারম্যানের কোনও ভাতা ছিল না, এক্কার ভাড়া নিজের পকেট হইতে দিতে হইত। গাড়ির ভাড়া এক্কার চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ কি তিন গুণ বেশি। আমার আগে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তো বেশির ভাগ পাটনার অতি সম্পন্ন ঘরের লোকই হইতেন, যাঁহাদের গাড়ির অভাব নাই, যাঁহারা নিজের পয়সায় ভাল ভাল গাড়ি রাখিতেন। আমার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়, কারণ আমার এত পয়সা ছিল না। আমি যখন এক্কা চাপিয়া আমার বাসস্থান খন্দরভাণ্ডার হইতে প্রায় চার মাইল দূরে মিউনিসিপ্যাল আপিসে যাওয়া শুরু করিলাম, তখন পাটনার উচ্চবর্গের লোকেরা যেখানে সেখানে আমাকে লইয়া হাসিঠাট্টা, টীকাটিপ্পনী করিতে লাগিল, কয়েকজন পুরানো আমলের প্রাচীন মিউ-নিসিপ্যাল কমিশনারও এই দলের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আমি বেপরোয়া। একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান আমাকে বেশ উৎসাহ দিয়াছিলেন। মিঃ জনসন ছিলেন তখন পাটনার অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি থাকিতেন শহরের পূব দিকে, আর আপিস কাছারি প্রায়ই পশ্চিমে। তিনি ভাড়ার এক্কায় কাছারি যাওয়া আসা করিতেন, কখনও কখনও দেখা যাইত, অন্যের সঙ্গে শেয়ারে এক্কা ভাড়া করিয়াছেন, অন্য সাথী না মেলা পর্যন্ত এক্কাদার সওয়ারীর জন্য চীৎকার করিতেছে। আমি অবশ্য এতদূর যাইতে পারি নাই, কারণ আমার তো এক জায়গায় যাওয়া নয়, একবার বাহির হইয়া আমি পরিদর্শনের কাজ করিতাম, আপিস যাইতাম, আবার সেখান হইতে ফিরি-বার পথে শহরের পরিদর্শনের কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতাম। ইহাতে অংশীদার পারে না, আমাকে পৃথক এক্কা ভাড়া করিতে হইত। তবে হাঁ, যতদিন অনুগ্রহবাবু ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, আমরা দুইজনে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করিতাম।

শহরের এই দীর্ঘায়তনের জন্য তত্ত্বাবধান ছাড়া অন্য কাজেরও যে মহা অসুবিধা ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাটনা কিছু নূতন শহর নয়, স্থানীয় কাজ-কর্ম নিয়াই ঐ শহরের ব্যবসা বাণিজ্য। আগে যখন নদীপথে মাল আনা-নেওয়া চলিত তখন পাটনার বেশ প্রাধান্য ছিল; কারণ গঙ্গা নদী যে এখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে। গঙ্গা-গণ্ডক নদীর সঙ্গম তো এইখানেই, আর শোনভদ্র ও সরযূর সঙ্গমও এখান হইতে কুড়ি পঁচিশ মাইলের মধ্যেই। কিন্তু এখন রেল হওয়ায় আর সেদিন নাই। সেইজন্য এখন আর ইহা ব্যবসাকেন্দ্র নয়। নূতন কলকারখানাও কমই আছে আর

এখন পর্যন্ত বিশেষ বৃদ্ধিও হয় নাই। ১৯২৪ সনে তো আরও কম ছিল। প্রাদেশিক রাজনৈতিক কেন্দ্র হওয়ার পর কিছু সরকারী চাকুরে আর কিছু উকীল ব্যারিষ্টার—হাইকোর্টের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ—অবশ্য সর্বদাই এখানে থাকেন। সেইজন্য যে-দিকটায় ইহাদের বাস শহরের সেই পশ্চিম অংশে কিছু জৌলুস আছে। পূর্ব অংশ পুরাতন মহল্লায়—যাহার স্বকীয় ঐশ্বর্য অনেক দিন নষ্ট হইয়াছে। এইজন্য শহরের মিউনিসি-প্যালিটির আয় মোটেই বেশি নয়।

আধুনিক সরঞ্জামপাতিরও নিতান্ত অভাব। নর্দমাগুলি খোলা বলিয়া বিস্তর মশার উপদ্রব। নালাগুলি পরিষ্কার রাখা যায় না, কারণ জল বাহির করিয়া দিবার ভাল পথ নাই। আগে এখানে ঘরে ঘরে কুয়ার পায়খানা থাকিত, কখনও সেগুলি পরিষ্কার করা হইত না। বহু দিনের ব্যবহারে যদি কখনও ফাটিয়া যাইত তবে অদূরেই আবার নূতন কুয়া নির্মাণ করা হইত। এইজন্য শহরের স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ থাকিত। আমাদের আগেই মিউনিসিপ্যালিটি এই কুয়া-পায়খানা বন্ধ করিয়া দিয়া-ছিল, অবশ্য এখানে-সেখানে দুইচারটা তখনও ছিল। আমরা সেগুলিও বন্ধ করিয়া দিই। প্রায়ই এমন হইত যে এই কুয়ার পাশেই গৃহস্থের পানীয় জলের কুয়া। আর প্রায় সব জায়গায়ই জল অপেয়। মাঝে মাঝে দুইএক জায়গায় মিঠা জলও যে পাওয়া যাইত না তাহা নয়। তবে লোকে পানীয় জল প্রায়ই গঙ্গা হইতে আনিয়া লইত। বর্ষাকালে গঙ্গাজল ঘোলা হইয়া যায়, তখন লোকের মহা কষ্ট হইত। সেইজন্য লোকে এখন এখানে জলের কলের আবশ্যকতা বোধ করিতেছিল। আমাদের আগে হইতেই জলের কল আর বন্ধ নর্দমার কথা চলিতেছিল, খরচপত্রের খসড়াও তৈরি হইয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাবে যেখানকার প্রস্তাব সেখানেই পড়িয়া ছিল।

আমরা এইসব জিনিসের দিকে মনোযোগ দিলাম, আর খরচের একটা আন্দাজ করিতে লাগিলাম। এই সমস্ত কাজের জন্য প্রাদেশিক সরকার এককালীন সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু ইহাদের চালাইবার ও কায়েম রাখিবার খরচ তো মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে হইবে। নূতন কর না-বসাইলে উহার হাতে তো পয়সা আসিতে পারে না। খাঁটি আর ভাল দুধ পাওয়া লোকের পক্ষে কঠিন ছিল। আমার মনে হইল মিউনিসি-প্যালিটি হইতে গোশালা খোলা হউক, যাহাতে মনের মত দামে লোকে ভাল আর খাঁটি দুধ পাইবে। কিন্তু এই সবই নির্ভর করে টাকার উপর। আমি তাই আয় বৃদ্ধির পথ খুঁজিতে লাগিলাম। সংযুক্ত প্রদেশের মিউনিসি-প্যালিটি শহরে, আমদানী হয় এমন সব-কিছু জিনিসের উপর শুল্ক বসাইয়া বেশ আয় বাড়াইয়াছিল। আমিও পাটনা শহরে এইরূপ শুল্ক বসাইবার কথা ভাবিয়া ইহাতে কতখানি আয় বাড়ে তাহার হিসাব করিলাম।

এই ধরনের প্রস্তাব আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়, পরে প্রাদেশিক সরকারে। মিউনিসিপ্যালিটি মঞ্জুর করিলে তবে কথাটা আগাইয়া যায়।

মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ঘুষ খাওয়া খুব চলিত; আয় যাহা হইত তাহারও পুরাপুরি ফল জনসাধারণ ভোগ করিতে পারিত না। আমরা ইহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করায় কর্মচারীরা ভিতরে ভিতরে রুষ্ট হইয়া উঠিল, যদিও বাহিরে কিছু করিতে পারিত না। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের মধ্যেও কেহ কেহ এই ব্যাপারে কর্মচারীদের পক্ষে ছিলেন আর তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেন। আমাদের প্রযত্ন তাঁহাদেরও অপছন্দ। তাঁহারা পরম উৎসাহে আমাদের বিরোধী দলের সঙ্গে যোগ দিলেন আর প্রত্যেক কাজে আমাদের সঙ্গে বিরুদ্ধ আচরণ করিতে লাগিলেন। তবু, সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি শুল্ক বসাইবার কথাটা উঠাইয়া উঁহাদের কাছে পেশ করিলাম। বেশির ভাগ সদস্য বিরোধিতা করিলেন, প্রস্তাব নামঞ্জুর হইয়া গেল। তাঁহাদের বক্তব্য যে, আমরা যে-সব সুবিধা দিতে চাই আর উপরে যে-সকল সুবন্দোবস্তের কথা বলা হইয়াছে, সেই সব হইতে বঞ্চিত থাকিবেন তাহাও ভাল, তবু নূতন কর বসানো মঞ্জুর করিবেন না। আমি দেখিলাম, শহরের পরিচ্ছন্নতা, রাস্তাঘাটের সংস্কার, শিক্ষার উন্নতি, কোনও কিছুই করা সম্ভব হইবে না। বিস্তর পরিশ্রম ও বহু সময় খরচ করিয়া যে কোনও কাজের কথা বলি, বিরোধী দল সব পণ্ড করিয়া দেয়। এই ভাবে কোনও ভাল কাজ করা কঠিন। সেইজন্য বারো-চৌদ্দ মাস ঐখানে থাকিবার পর আমি ঐ পদ হইতে ইস্তফা দিলাম। ইস্তফা দেওয়া ছাড়া পথও ছিল না, কারণ কেবল সময়ই নষ্ট হইতেছিল, আমরা লোকের কাজে লাগিতে পারিতেছিলাম না।

আমার সময়ে একটি কাজ হইয়াছিল : বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপন। মিউনিসিপ্যালিটির ইহাতে বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না, কেবল রাস্তায় রাস্তায় পুরান বাতিগুলির জায়গায় বিজলীবাতি লাগাইয়া লওয়া। যে-কোনও প্রকারেই হউক, লোকে এটা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিল। আমাদের সময়েই বিজলী-কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হইয়া গিয়াছিল, আমরা সরিয়া আসার অল্প দিনকয়েকের মধ্যেই পথে পথে বিজলীবাতি জ্বলিয়া উঠিল। আর এক কথা, আমরা মিউনিসিপ্যালিটির মেথরদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছিলাম, উহাদের মহল্লায় মহল্লায় গিয়া আমাদের মধ্যে একজন কেহ উহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিত, ঘর-দুয়ার, ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে বলিত, সপ্তাহে একদিন কীর্তন বা কথকতার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সেই সময় প্রসাদের জন্য কিছু মিঠাই বিতরণ করা হইত। গোড়ায় তো ইহারই লোভে লোকে—

বিশেষত ছোট ছেলেমেয়েরা—সংকীর্তন আর কথা শুনিতে আসিত। ইহার খরচ বাহির হইতে করা হইত। খুব চেষ্টা করা হইত যাহাতে ইহারা মদ খাওয়া ছাড়িয়া দেয়। একটু একটু করিয়া ফল দেখা যাইতেছিল, কিন্তু আমরা তো বেশিদিন থাকিতে পারি নাই, আমরা সরিয়া আসিলে বোধহয় কাজটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় একটি কাজও আমরা করিয়াছিলাম। আমরা দেখিতাম ইহাদের হাতে পয়সা আসে কিন্তু তাহার উপযুক্ত ব্যবহার হয় না। আর সেজন্য ইহাদের অবস্থা খারাপই থাকে। মেথররা মাসে দশবারো টাকা পায়, স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা দুই টাকা কম পায়। ছোট ছেলেরা পায় মাসে পাঁচ টাকা। এই হিসাবে, এক পরিবারে যদি পুরুষ, তার স্ত্রী, দশ বারো বৎসর বয়সের দুইটি ছেলে থাকে তবে মাসে তাহাদের প্রায় ত্রিশ টাকা আয় হয়, যে-কোনও সরকারি আপিসের কেরাণীদের মাসোহারার সমান। কিন্তু যখন দেখি একমাত্র সেই আয়ের উপর থাকিয়াও কেরাণীবাবু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া ও জুতা পায়ে দিয়া কাছারি যান, তাঁর স্ত্রী-পুত্র আলাদা কিছু রোজগার করে না, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে তুলনায় মেথরেরা বেশি পায়। তাছাড়া, মেথররা যে-সব বাড়িতে কাজ করে, সেই সব বাড়ি হইতে মিউনিসিপ্যালিটির রোজগারের অতিরিক্ত তাহাদের কিছু না কিছু আয় সর্বদাই হয়। ইহার উপরে, পালাপার্বণেও কিছু কিছু উপায় করে। তবু কেন তাহাদের এই খারাপ অবস্থা? আমরা দুইটি কারণ দেখিতে পাইলাম : এক, তাহাদের মদ খাওয়া; আর, সুদে টাকা ধার করা। মাহিনার দিন তো মহাজন কাছারিতেই হাজির হয়! ইহারা যে-মাহিনা পায় মহাজনই তাহা লইয়া লয়। আর তাহা যায় পুরান ধার শোধ করিতে! ফের সেই দিন হইতেই নূতন কর্জ লইয়া সংসার চালাইতে থাকে। কর্জের জন্য সুদ বিস্তর দিতে হয়, ফলে মেথররা কোনও দিনই ঋণমুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক মাসে একটা মোটা অঙ্ক সুদেই চলিয়া যায়।

এই অর্থ-সংকট হইতে আমরা ইহাদের বাঁচাইতে চাহিলাম। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, উহারা মাসে একদিন বেতন পায়। অথচ মাসে কত-বারই তো কর্জ করে, কাজেই মাসের শেষে ঐ দিন সুদ-আসল আদায় করিতে হয়। আমরা বলিলাম, কর্জ লওয়া বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু তাহারা রাজী হইল না। আমরা বলিলাম, মাহিনা দিবার জায়গায় মহা-জনের আসা বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু মেথররা বিগড়াইয়া গিয়া হরতাল করিবে ঠিক করিল। তাহাদের মতে, মহাজনের জন্য তাহারা কাজ কর্মের কত সুবিধা পায়, মহাজনকে তাহারা ছাড়িতে পারে না। তাহারা আরও বলিল যে, যতদিন ধার না-শোধ হইবে মহাজন তাহাদের ছাড়িয়া দিবে না।

আমরা এমন প্রস্তাবও করিলাম যে তাহাদের সমস্ত ধার শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। মহাজনের কাছে কর্জ না-করিলে তাহাদের কত টাকা বাঁচিবে, এ বিষয়ে কত বুঝান হইল, কিন্তু সহজে বোঝে কি? আমরা আর একটা ব্যবস্থা করিলাম যে, মাসের শেষে না-দিয়া পনের দিন পরে পরে দুইবারে তাহাদের মাহিনা দেওয়া হইবে। তাছাড়া ইহাও বলা হইল যে পনের দিন অন্তর বেতন দিবার ব্যবস্থা করিলাম। ইহাও বলিলাম যে প্রয়োজন হইলে এই শর্তে অগ্রিম বেতনও দিতে পারা যাইবে, বেতন মিলিবার সময় অগ্রিম দেওয়া টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে। বহু পরিশ্রমের পরে ইহারা কথাটা বুঝিল আর রাজী হইল। আর দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যবস্থায় বেশ লাভ হইল বুঝিতে পারিয়া ইহারা প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সরিয়া আসার পরে এই বন্দোবস্ত চালু ছিল কিনা জানি না। মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়িয়া আসিতে এই একটা আপশোষ রহিল যে হরিজনদের অল্পবিস্তর যেটুকু সেবা করার সম্ভাবনা ছিল তাহা করা গেল না।

আমরা যখন পাটনা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ করিতেছিলাম, তখন অন্য কয়েকটি জিলায়ও কংগ্রেসীরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি গয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে অনুগ্রহ-বাবুকে চেয়ারম্যান করা হইয়াছিল। মুঙ্গের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে শাহ্ মহম্মদ জুবেয়ার সাহেব চেয়ারম্যান, আর শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ভাইস-চেয়ারম্যান; ছাপরা বোর্ডে চেয়ারম্যান মজহরুল হক সাহেব; চম্পারনে প্রথমে বেতিয়া মিউ-নিসিপ্যালিটিতে পরে চম্পারন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে শ্রীবিপিনবিহারী বর্মা চেয়ারম্যান; মজঃফরপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রীবন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ বর্মা আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে শ্রীরামদয়ালু সিংহ চেয়ারম্যান ছিলেন। ভাগলপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীকৈলাসবিহারী লাল। দ্বারভাঙ্গায় চেয়ারম্যান ছিলেন বাবু হরিনন্দন দাস আর ভাইস-চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার মিঃ মহম্মদ শফী। ছোটনাগপুরের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিতে চেয়ারম্যান ওখানকার ডেপুটি কমিশনারই হইতেন, আর ভাইস-চেয়ারম্যান বেসরকারি কেহ হইতেন। সেজন্য ওখানে মানভূমে শ্রীজীমূতবাহন সেন আর হাজারি-বাগে শ্রীরামনারায়ণ সিংহ ভাইস-চেয়ারম্যান হইলেন। এইরূপে আমাদের প্রদেশে প্রায় সব জেলাতেই অনেকগুলি জায়গায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে কংগ্রেসী লোকের হাতে কিছু কিছু কর্তৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছিল, আর তাঁহারা কাজও আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। পাটনার মত হাঙ্গামা আর কোনও জায়গায় ছিল না, কেবল ছোটনাগপুরে চেয়ারম্যান আর ভাইস-চেয়ারম্যানে প্রায়ই খিটিমিটি চলিত। আমাদের পক্ষের লোকেরা প্রায় সব জায়গায়ই কাজ ভাল ভাবে করিয়াছিলেন, লোকের উপর যথেষ্ট প্রভাবও পড়িয়াছিল, কিন্তু এই কাজে আমার মনে তৃপ্তি ছিল না।

নির্বাচনের আগেই প্রার্থী পদের জন্য পরস্পরের মধ্যে বড় রেষারেষি চলিতেছিল। নির্বাচনে দাঁড়াইতে না পারিলে কেহ কেহ দুঃখিত হইতেন। কাহারও কাহারও মনে হইল, আমরা দেশের সেবা করিয়াছি, এই সব বোর্ডে যাইতে পারা তো দেশসেবারই একরকম পুরস্কার, নিজেদের দাবী পেশ করিবার সময় ইঁহারা দেশসেবার কথা লিখিয়া পেশ করিতেন। আমার মনে শঙ্কা জাগিল, এই তো মোটে সামান্য কাজের সুযোগ উপস্থিত, এখনই নির্বাচনের জন্য ইহারা নিজের নিজের সেবার তালিকা তৈয়ারি করিতেছে, পরে কি হইবে কে জানে? কয়েকদিন ধরিয়া এইরকম অনুভব করার পরে আমি কলিকাতার 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় এ-বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইলাম, তখন নিজের নাম ছাপাই নাই। কিন্তু তাহাতে আমি নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলাম। অনেক স্থলে বেশ ভাল কাজ হইলেও নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতেছিল। এই বিষয়ে মুঙ্গেরের জিলা বোর্ড একেবারে দোষমুক্ত ছিল। সেখানে অন্য সব জায়গার মত নিজেদের মধ্যে মনকষাকষি কখনও দেখা যায় নাই। ইহা অবশ্য সেখানকার কর্মকর্তা ও নেতাদের গুণে। যদিও আমার নিজের বিচারে এই সব বোর্ডে যোগ না-দেওয়াই উচিত মনে হইতেছিল, আমার সঙ্গীদের মত ছিল অন্যরূপ। সেইজন্য আমি নিজের মত চাপিয়া গেলাম। কংগ্রেসীদের নির্বাচনে দাঁড়াইতে আমি সর্বদা যথাসাধ্য সাহায্যই করিয়াছি।

আমরা যখন মিউনিসিপ্যালিটি আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজে ব্যাপৃত, সেই সময় বিহার সরকার এক নূতন বিল পেশ করিলেন। এই বিলের ফলে এই সকল বোর্ডের হিসাব-পরীক্ষক সরকারি অডিটর, বোর্ড অথবা বোর্ডের পদাধিকারীদের মধ্যে কেহ কোনও খরচ করিলে তাহা আইন-মাফিক কি বেআইনী সে বিষযে মীমাংসা করিতে পারিবেন। যদি তিনি উচিত বুঝেন তবে ঐ বেআইনী খরচের টাকা ঐ পদাধিকারী বা বোর্ডের মেম্বার যাঁহারা উহা মঞ্জুর করিয়াছেন তাঁহাদের কাছ হইতে উশুল করিয়া লইবার জন্য নির্দেশ দিবেন। ১৯২২ সনে মিউনিসিপ্যালিটি আর জিলা বোর্ডগুলির নিয়মাবলী সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল, ইহারা নিজেদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য অপর কয়েকটি অধিকার হাতে পাইয়াছিল। এই নূতন বিল দ্বারা পূর্বে দেওয়া অধিকার খর্ব করা ছিল উদ্দেশ্য। সব চেয়ে গুরুতর কথা যে, অডিটারের হাতে বোর্ডের নিয়মাবলীসংক্রান্ত বিষয়ে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা থাকিবে। এই বিল সকলেরই অপছন্দ হইল। বোর্ড আর জনসাধারণ দুই দিক হইতেই বিলটির জোর বিরোধিতা শুরু হইল।

পরিস্থিতি যখন এইভাবের, তখন এই বিষয় এবং বোর্ডসম্বন্ধীয় অপর কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার জন্য এক কনফারেন্স ডাকা ঠিক হইল।

পাটনায়ই এই কনফারেন্সটি বসিল। সারনের জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মজহরুল হক সাহেবের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। মুঙ্গের জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ্ মহম্মদ জুবেয়ার ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন। মজহরুল হক সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমাকে সভাপতি হইতে হইল। সারা প্রদেশের প্রধান প্রধান বোর্ডগুলি এই কনফারেন্সে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অডিট বিলের নিন্দা করা হইল। বোর্ডের অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হইল। তাহার মধ্যে একটা তখন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল—জিলা বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার, কি বোর্ডের কর্মচারী, না প্রাদেশিক সরকারের? আমরা ইহারও বিরোধিতা করিলাম। শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনাও ছিল। ঠিক হইল যে, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য যে-বোর্ড আছে তাহার সংগঠন করা হউক এবং বোর্ডের প্রতিনিধিদের জন্য উহাতে কয়েকটি আসন থাকুক। এই কনফারেন্স একটি ছোট স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত করিলেন. আর এই ধরনের সম্মেলনের আবশ্যকতা ও উপ-যোগিতা অনুভব করিয়া পুনরায় এইভাবে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন। আমার বিশ্বাস, আমাদের পদত্যাগের পরেও কয়েকবার এই কনফারেন্স বসিয়াছে আর তাহাতে বোর্ডের নানা বিষয়ে পরস্পরের মতের আদানপ্রদান হইয়াছে।

এই নির্বাচনের ব্যাপারে একটা দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহার ফলও বড় খারাপ হইয়াছিল। ১৯২২ হইতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাড়িয়াই চলিয়াছিল; প্রায়ই কোনও-না-কোনও জায়গা হইতে দাঙ্গার খবর আসিত। আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতাম, নিজের নিজের এলাকায় যেন দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয় সেজন্য সর্বদা আমাদের চেষ্টা করিতে হইত। তবু এখানেও জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা হইয়া গেল। আজ এতদিন পর সে-সব জায়গার নাম মনে নাই, আর কবে কোথায় আরম্ভ হইল, তাহাও বলিতে পারি না। তাহার জন্য তখনকার সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিতে হয়। যাহাই হউক, দাঙ্গামারামারি এত বাড়িয়া চলিল যে তাহার পরিণামও গুরুতর না হইয়া পারে নাই। একদিকে শুদ্ধি আর সংগঠন, অন্যদিকে লীগের প্রচার হিন্দু-মুসলমান এই বিরোধ আরও যেন বাড়াইয়া তুলিল। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িতে লাগিল, যেখানে নিতান্ত দাঙ্গা বাধে না সেখানেও দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পরের মধ্যে দারুণ অবিশ্বাস। অপরদিকে তুরস্ক খলিফাকে তাড়াইয়া দেওয়ার ফলে খিলাফৎ আন্দোলন আপনা হইতেই খানিকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক মুসলমান, যাঁহারা খিলাফতের জন্যই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন, এখন আস্তে আস্তে কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। ইঁহারা পরিষ্কার দেখাইতে লাগিলেন যে ১৯২১-২২ সনের মতই সকল বিষয়ে ইঁহারা একমত থাকিতে

পারিবেন না। জনসাধারণের মধ্যে এই দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে বিহারের মত হিন্দুপ্রধান দেশে মুসলমানের নির্বাচিত হওয়া কঠিন হইয়া পড়িল।

পাটনা মিউনিসিপ্যালিটিতে মৌলভী খুরশেদ হাসনানের নির্বাচনে গোলমালের কথা আগেই বলিয়াছি। এখানে আমরা খুব চেষ্টা করিলাম, মৌলভী সাহেবকে কিছু করিতে দিই নাই। দেখা গেল, বহু ভোটের জোরে তিনি জিতিয়াছেন। ওদিকে ছাপরায় সেবা, ত্যাগ আর ব্যক্তিত্বের জন্য মজহরুল হক সাহেবের খুব প্রতিপত্তি। তবু কতক লোকে গোলমাল বাধাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সেখানে আমার দাদার খুব প্রভাব, তিনি সব গোলমাল থামাইয়া দিলেন, হকসাহেব অনায়াসে নির্বাচিত হইয়া গেলেন। মুঙ্গেরে জুবেয়ার সাহেবকে লোকে খুব মান্য করিত, তাঁহার নির্বাচনে কেহ বাধা দেয় নাই। মজঃফরপুরে মৌলভী মহম্মদ শফীর সেবা, ত্যাগ কাহারও অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু সেখানে কংগ্রেসীদের মধ্যে তেমন ঐক্য আর বাহিরের লোকের উপর তত বেশি প্রভাব ছিল না, ফলে শফী সাহেব হারিয়া গেলেন। আমাদের বড়ই আপশোষ হইল, কিন্তু নাচার। মৌলভী সাহেবেরও বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি তখন তাহা চাপিয়া রাখিয়া কাজ করিয়া চলিলেন। ইহার অশুভ ফল পরে বোঝা গেল, যখন তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়া দিয়া মুসলিম প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য সময় দিতে লাগিলেন। অবশ্য ইহার কিছুদিন পরে তিনি যান, তবে সূত্রপাত সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পরাজয়ে। যদিও এই সব নির্বাচনে আমরা মুসলমানদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম আর বেশ কয়েকজন মুসলমান নির্বাচিতও হইয়াছিলেন, তবু বিহারের মুসলমানেরা মনে করিল তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট হয় নাই। এই সব ব্যাপারে বিশ্বাসই বড় কথা, অকারণে তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি লিখিবার সময় নির্বাচনের ফল তো আমার হাতের কাছে নাই, তবে যতদূর মনে পড়ে, মুসলমানদের প্রতি কোনও অন্যায় করা হয় নাই; তবে হাঁ, কোনও কোনও জায়গায় কম বেশি হইয়াছে, কোথাও হয়তো প্রধান কেহ কেহ নির্বাচিত হইতে পারেন নাই, তবে সমস্ত প্রদেশের ফলাফলের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে তখন আমরা কংগ্রেসীরা ঐ সব নির্বাচনের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছিলাম। কিন্তু অনেক মুসলমান-ভাইদের বিশ্বাস চলিয়া গেল, আর কিছুদিন পরেই তাহার কুফল দেখা গেল।

উপবাসের পরেও স্বাস্থ্য-লাভ করিতে গান্ধীজীর কয়েকদিন সময় লাগিল। তিনি কোহাট যাইবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু সরকার অনুমতি দিলেন না। ঐ সময় সরকার আর একটি চাল চালিলেন। এক নূতন অর্ডিনান্স জারি করিয়া বলা হইল যে, বাংলাদেশে বিপ্লবীদল পুনরায় ষড়যন্ত্রে রত হওয়ায় যেখানে সেখানে খুব হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। ডে-হত্যা এবং আরও অন্য কয়েকটি হত্যার নজীর দেখাইয়া অর্ডিনান্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হইল। সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র বসু এবং আরও বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। কিছুদিন আগেই যদিও গুজব শোনা গিয়াছিল যে, দেশবন্ধু দাশকেও গ্রেপ্তার করা হইবে, কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। এই অর্ডিনান্স আর সুভাষবাবুদের গ্রেপ্তারের ফলে দেশময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, নরমপন্থীরাও এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। স্বরাজ্যদলের লোকের মতে এই অর্ডিনান্স বিশেষভাবে তাঁহাদেরই উপর প্রয়োগ করিবার জন্য জারি করা হইয়াছিল কেননা তাহারা বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলী ভাঙিগয়া দিয়াছিল; তখন নূতন নিযুক্ত দল সেখানে কোনও প্রকারে কাজ করিতে পারিতেছিল না। মহাত্মা গান্ধীও এই অর্ডিনান্সে বড়ই রুষ্ট হইলেন; তিনি অবিলম্বে দেশবন্ধু দাশ ও মতিলালজীর সঙ্গে রফা করিয়া ফেলিলেন। দেশময় সভাসমিতি হইল, বড় বড় নেতারা কাগজে নিজেদের বিবৃতি দিলেন, সর্বত্রই সরকারের এই কাজের তীব্র নিন্দা করা হইল। পাটনাতেও মস্ত এক সভা হইল, সর্বদলের, সকল মতের লোক উহাতে যোগ দিলেন। বাংলাদেশে দমন-নীতি প্রয়োগের জন্য সরকারকে কড়া সমালোচনা করা হইল, আমিও ঐ সভায় জোর বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

গান্ধীজী যে-রফা করেন তাহার মর্ম এই যে, বিদেশী বস্ত্র বর্জন ছাড়া অন্য সব অসহযোগ কংগ্রেস এখন স্থগিত রাখিবে, আর কংগ্রেসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কমিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাজের ভার লইবে, তবে চরখা ও খাদির প্রচার, আপোষে মিলিয়া, বিশেষ হিন্দু-মুসলমান একযোগে, দুই সম্প্রদায়ের একতা বাড়ানোর চেষ্টা আর হিন্দুর অস্পৃশ্যতা-বর্জন, এই কয়টি কাজ অবশ্য করণীয় মনে করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল যেন কংগ্রেসেরই অঙ্গ হিসাবে কাজ করিবে, তাহারা নিজেদের নিয়ম তৈরি করিবে, আয়ব্যয়ও তাহাদের নিজেদের। যেহেতু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে-যে, সকলে সুতা না-কাটিলে দেশ কাপড় সম্বন্ধে

স্বাধীন হইবে না, যেহেতু দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ ঘটাইবার পক্ষে চরখা এক প্রাণবন্ধ আর স্পষ্ট-প্রমাণিত পথ বলিয়া মনে হইতেছে, সেইজন্য চরখা-সম্বন্ধীয় আইনের সংশোধন করিয়া ঠিক করা হইল যে আঠারো বৎসর আগে কেহ কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারিবে না; রাজনৈতিক সভা-সমিতির স্থানে আর কংগ্রেসের কাজের সময় যে হাতে-কাটা হাতে-বোনা খদ্দর পরিবে না, যে প্রতিমাসে নিজের হাতে কাটা দুই হাজার গজ ভাল সুতা দিবে না—সে কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারিবে না; রোগপীড়া, অনিচ্ছা, অথবা অন্য কোনও কারণেই অন্যের কাটা সুতা দেওয়া চলিবে না। ইহার ফলে স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের নামেই কাউন্সিলেন কাজ করিবার অধিকার লাভ করিল, কিন্তু কংগ্রেসের মেম্বার হইতে গেলে এখন চার আনা চাঁদার বদলে নিজের হাতে কাটা দুই হাজার গজ সুতা কংগ্রেস কমিটিতে দিতে হইবে স্থির হইল। রোগ অথবা অনিচ্ছার ক্ষেত্রে অন্যের কাছ হইতে কিনিয়া দিতে হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আর বেলগাঁও কংগ্রেসেও এই সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করা হইল।

বাংলার নির্যাতন আর স্বরাজ্যদলের সঙ্গে বোঝাপড়া, এই দুই বিষয়ের বিচারের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলী বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন ডাকিলেন। বাংলার এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও আহ্বান করিলেন। গান্ধীজীর প্রথম হইতেই চেষ্টা ছিল যাহাতে সকল দলের লোকেই আবার কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য উৎসুক হয়; ঠিক সেই সময় গভর্নমেণ্টের আচরণে বেশ সুযোগও পাওয়া গেল। বোম্বাইয়ে বৃহৎ এক সম্মিলন হইল, সভাপতি হইলেন স্যর দিনশা পেটিট। প্রথম প্রস্তাবেই সরকারের দমন-নীতির নিন্দা করিয়া স্বরাজের দাবী পেশ করা হইল। দ্বিতীয় প্রস্তাব দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইল, এই কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক-দলগুলিকে কি উপায়ে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন আর স্বরাজের একটা খসড়া তৈরি করিয়া হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সমস্যার মীমাংসার উপায় বিবেচনা করিবেন। ৩১শে মার্চের মধ্যে এই কমিটির রিপোর্ট তৈরি হইলে এপ্রিলে আবার বৈঠক বসিবে। এই সম্মেলনের বিশেষত্ব, ইহাতে কংগ্রেসীরা, কংগ্রেসের ভিতরকার স্বরাজ্যদলের লোকেরা, ছাড়াও ভারতের সব রাজনৈতিক দল, এমন কি মুস   লীগও যোগ দিয়াছিলেন। এই সম্মে   ফলে সমগ্র দেশে এক নূতন তরঙ্গ উঠিল। আশা হইল, এই বার বুঝি সকলে এক-যোগে, একমত না হইলেও নিজ নিজ মতে, সকলের একই ধ্যানের বস্তু স্বরাজলাভের জন্য যত্নবান হইবে।

এই সময়েই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইল। উহাতে

গান্ধীজী ও স্বরাজ্যদলের সঙ্গে নিষ্পত্তি মঞ্জুর হইয়া গেল। অপরিবর্তনবাদীদের মধ্যে অনেকের অবশ্য এই রফা পছন্দসই হয় নাই, স্বরাজ্যদল যে কাউন্সিলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসের কথা বলিবার অধিকার পাইল, ইহাতেই তাহাদের বিশেষ আপত্তি। লোকের ইচ্ছা এই অধিকার দেওয়া হইলেও তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণের ভার কংগ্রেসের থাকুক। গান্ধীজী এই নিয়ন্ত্রণের ভার নিতে অনিচ্ছুক। অবশেষে, বহু বাদানুবাদের পর ঐ রফা মঞ্জুর হইল।

এই দুই সম্মেলনই গান্ধীজীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। নিজেদের মধ্যে যে-বিভেদে তিনি দুঃখ বোধ করিতেছিলেন তাহা অনেকখানি দূর হইল। বাকি যেটুকু মনোমালিন্য তাহাও দূর করিবার দরজা খুলিয়া গেল। বেলগাঁও কংগ্রেসে তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত রাজী হন নাই। এই দুই সম্মেলনের পর তিনি সম্মতি দিলেন। আশা করা গেল যে, কংগ্রেসের সময় বিভিন্ন দলের বার্ষিক অধিবেশনও বেলগাঁওয়েই হইবে, আর সকল দলের মধ্যে আপোষে আলাপের আরেকটা সুযোগ পাওয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না। কেবল শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসে যোগ দেওয়া স্থির করিলেন, আর নিজের অনুগামী দলবলসহ বেলগাঁও কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

প্রধানত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। স্থানীয় লোকের কংগ্রেসের জন্য পরম উৎসাহ ছিল। শ্রীগঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে প্রাচীন বয়সেও নবীনের উৎসাহে ঘোড়ায় চড়িয়া সর্বত্র যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন আর ব্যবস্থা বন্দোবস্তের তদারক করিতে লাগিলেন। অধিবেশনের সঙ্গে বরাবরই একটা প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। বেলগাঁওয়ে একটি সংগীত-সম্মেলনও হইয়াছিল, আর কর্ণাটকের বহু গুণী ও শিল্পী তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। দরবারের তরফ হইতে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছিল। গুণী বিদ্বান অনেককে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বীণকার আচার্য শ্রীশেষন্নাজী ছিলেন সবচেয়ে নামকরা। কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের অবসর সময়ে তিনি অতি চমৎকার দক্ষিণী, বিশেষত কর্ণাটকের, সংগীত গাহিয়া শুনাইতেন। একদিন গান্ধীজীর কুঠিতে গিয়া তিনি নিজের বীণার অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিল, সিংহল হইতে ডাক্তার কেসিয়াস পেরেরার (Cassius Pereira) নেতৃত্বে বৌদ্ধদের এক মণ্ডলী ভারতীয় কংগ্রেসের কাছে আসিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা, বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দির বৌদ্ধদের অধিকারে আনিয়া দিতে হইবে। গয়া কংগ্রেসের সময়েই ব্রহ্ম-দেশ হইতে ভিক্ষু উত্তমের নেতৃত্বে প্রায় একশ ভিক্ষুর মস্ত একদল প্রতি-নিধি আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ তখন ভারতেরই অংশ ছিল, সেখানেও কংগ্রেস-কমিটি ছিল, ইঁহারা সেই কংগ্রেস-কমিটিরই প্রতিনিধি। ইঁহারা এক ঢিলে দুই পাখি মারিতে চাহিয়াছিলেন, কংগ্রেসে যোগ দেওয়া আর বোধগয়ায় বুদ্ধদেবের দর্শন। আর গয়া কংগ্রেসের স্থানও বোধগয়ারই পথে। তখন এবং কোকনদ কংগ্রেসের পরেও এই বিষয়ে কথাবার্তা চলিতে-ছিল, এবং আমাকে বুদ্ধগয়া-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির তদন্তের জন্য বলা হইল। কিন্তু আমি তখন পর্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই। বেলগাঁওয়ে ডেপু-টেশন কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিল। গান্ধীজী উহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন। এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট পেশ করার জন্য গান্ধীজী আবার আমাকে নিযুক্ত করিলেন। বলিলেন, সাহায্যের জন্য আমি নিজের ইচ্ছামত লোক আমার সঙ্গে লইতে পারি। প্রতিনিধিদল সন্তুষ্ট হইয়া গেল। লালা লাজপতরায় আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, বিদেশী বৌদ্ধগণ মন্দিরের অধিকার পাইলে হয়তো বা উহা বিদেশী ষড়-যন্ত্রের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে, আর পরে আন্তর-রাষ্ট্রীয় জটিলতার সৃষ্টি হইবে।

কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আমি তদন্তের কাজে লাগিয়া গেলাম। শ্রীব্রজ-কিশোর প্রসাদ, ডাঃ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ও শ্রীরামোদর দাস (পরে ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ন) কে লইয়া ছোট একটি কমিটি গঠন করা হইল। তদন্ত আরম্ভ হইবার পর সিংহলবাসী শ্রীগুণী সিংহ সেখান হইতে আসিয়া যোগ দিলেন। কিছুদিন বিহারে থাকিয়া তিনি বৌদ্ধদের পক্ষ হইতে কমিটিকে সাহায্য করিলেন। আমি প্রথমেই হিন্দুদের অভিমত জানিবার চেষ্টা করি। পাটনায় দুইটি সভা ডাকা হয়, কিন্তু সভায় লোক তেমন না-হওয়ায় তাহাদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব রহিল না। ভাগ্যক্রমে ঐ সময় মজঃফরপুরে হিন্দু-মহাসভার এক অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, আর তাহার সভাপতি ছিলেন লালা লাজপতরায়। আমি সেখানে গেলাম; বোধগয়ার মোহন্তর পক্ষ হইতেও কয়েকজন গিয়াছিলেন। ঐ সভায়

একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল যে হিন্দু ও বৌদ্ধদের এক সম্মিলিত কমিটির হাতে মন্দিরের ব্যবস্থার ভার সমর্পণ করা হউক। আরও বলা হইল যে, এই প্রস্তাব ভালভাবে বিচার করিবার জন্য, আর সম্ভব হইলে মোহন্তকে রাজী করাইবার জন্য, এক কমিটি গঠিত হইবে। উপরিলিখিত চারজন ভদ্রলোক ঐ কমিটিরও সদস্য হইলেন। আরও একজনকে এবং বোধগয়ার মোহন্তকেও সদস্য করা হইল, কিন্তু কমিটির কাজ আরম্ভ হইলে দেখা গেল, দুইজনের কেহই যোগ দিলেন না। এইভাবে কংগ্রেস আর হিন্দু-মহাসভার তরফ হইতে আমরা চারজনে রিপোর্ট তৈরি করিলাম। কমিটি সকল দিক বিচার করিয়া দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ এক রিপোর্ট লিখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মন্তব্য পেশ করিলেন যে মন্দিরের ভার হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের এক মিলিত কমিটির হাতে দেওয়া হউক, পূজা-অর্চনা বৌদ্ধ-রীতি অনুসারে করা হইবে, তবে হিন্দুদেরও দর্শন এবং পূজার অধিকার থাকিবে।

এই মন্দিরটি যদিও বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থান, তবু মন্দিরের ভার ছিল বোধগয়ার শৈব মোহন্তের উপরে। হিন্দুরাও বুদ্ধদেবকে নিজেদের প্রধান দশ অবতারের একজন মনে করে। কিন্তু বুদ্ধের পূজা হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত নাই। কোথাও কোথাও আবার বুদ্ধের নিন্দাই করা হয়। এই-সব কারণে, পূজার সামান্য ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা এমন মহত্ত্বপূর্ণ বিশিষ্ট তীর্থস্থানের মোটেই উপযুক্ত নয়। আমরা দেখিলাম, বৌদ্ধদের অভিযোগ সংগত; বৌদ্ধমন্দিরে পূজার সমুচিত ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষেই করা সম্ভব, সেইজন্য আমরা ইহার সুপারিশ করিলাম। আমরা মোহন্তর সঙ্গেও দেখা করিয়া এই ব্যবস্থায় তাঁহাকে রাজী করাইতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহাকে এই কমিটির সদস্যও করিতে চাহিলাম, মন্দির হইতে তাহার ভোগ প্রভৃতির যাহা আয় হয় তাহার জন্য ক্ষতিপূরণও দিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী নন। তিনি বলেন, লাভের লোভে তিনি মন্দিরের অধিকার বজায় রাখিতে চান না। এমন কি লাভই বা হয়, মন্দিরের খরচই তো সবসময় ওঠে না, আর উঠিলেও তাঁহার মস্ত জমি-দারীর আয়ের কাছে এই আয় তো কিছুই নয়। কথাটা সত্য। তাঁহার মঠের আয় অনেক লাখ টাকা, আর এই মন্দিরের আয় হয়তো বৎসরে হাজার, দুই হাজার হইবে। তবে তিনি জানেন, এই মন্দির তাঁহার অধিকারে আছে বলিয়াই দেশ-বিদেশ পর্যন্ত তাঁহার এত প্রতিষ্ঠা! ইহা তিনি ছাড়িতে চাহেন না। আমরা কত বুঝাইলাম যে, আমাদের কথা মানিয়া লইলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বিস্তর বাড়িবে বই কমিবে না, কিন্তু তিনি বুঝিলেন না, আমাদের চেষ্টাযত্ন বিফল হইল। মন্তব্য পেশ করিয়া দিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

নিখিল-ভারত কমিটিতে এই রিপোর্ট পেশ হইল, মঞ্জুরও হইল কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজ শেষ হয় নাই। বৎসর কয়েক পরে যখন কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব হইল, তখনও আবার সিংহল হইতে একটি ডেপুটেশন আসিয়াছিল। উহারা আবার সেই প্রার্থনা জানায়। আমি তখন অসুস্থ হইয়া নিজের গ্রাম জীরাদেইয়ে। সেইজন্য ইহারা জীরাদেইয়ে গেল। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিল, কিন্তু মোহন্ত কোনওমতে রাজী হন না। আইন করিলে কিছু করা যাইতে পারে ভাবিয়া আমি প্রধান মন্ত্রীকে পত্র দিলাম, তিনি এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানারকম ঝঞ্ঝাটে ব্যাপৃত থাকায় কাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিল, বুদ্ধগয়া মন্দিরের সমস্যা তখনও যেখানকার সেখানেই রহিয়া গেল। আমার আজও বিশ্বাস, এই মন্দিরের কাজকর্মের ভার বৌদ্ধদের হাতে দেওয়াই ন্যায়-সঙ্গত। আর, হিন্দুরাও যখন বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া ভক্তি করে তখন ব্যবস্থাকমিটিতে হিন্দুদেরও থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। সিংহলে কতরগামা নামে এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, সেখানকার হিন্দুরা বলে মন্দিরটি তাহাদের, আর বৌদ্ধরা তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে। আমাদের এই সব কথা চলিতেছে, এমন সময় সিংহলের হিন্দুদের কাছ হইতে আমার নিকট পত্র ও তার আসিতে লাগিল এই বলিয়া যে যতদিন কতরগামা মন্দিরে হিন্দুদের অধিকার ইহারা স্বীকার না-করিবে ততদিন যেন বৌদ্ধগয়ার মন্দিরে বৌদ্ধদের অধিকার আমরা স্বীকার না-করি। কথা চলিতে থাকিলে হয়তো এই ব্যাপারেরও কিছু প্রসঙ্গ উঠিত, কিন্তু তখন সময়ই হইল না, কথাটা ঐখানেই চাপা রহিল।

এইখানে আমি ১৯২৫-এর কথা লিখিতে লিখিতে ১৯৩৯ সনে চলিয়া আসিয়াছি; কারণ এ-বিষয়ে এক জায়গায় সবটা লেখাই সঙ্গত।

বেলগাঁওয়ের পরে

বেলগাঁও কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের সঙ্গে রফার বিষয় মঞ্জুর হইয়া গেল। গান্ধীজীর মনের ভাব এই যে, যেখানে রাজনৈতিক ব্যাপারের প্রশ্ন সেখানে স্বরাজ্যদলের প্রাধান্য থাকুক, ইচ্ছা হইলে তো ওয়ার্কিং কমিটিও তাহারা নিজেদের অনুকূল করিয়া গঠন করিতে পারে; কিন্তু খাদি-প্রচার আর গঠনমূলক কাজে পরিপূর্ণ সহায়তা করিতে হইবে, আর ইহার পরিচালনার

ভার গান্ধীজীর উপর ছাড়িয়া দিক। এই অনুসারে কংগ্রেসের নিয়মেরও সংশোধন হইল। কংগ্রেসের সভ্য হইবার জন্য চার আনা চাঁদার বদলে নিজের হাতে কাটা সুতা দেওয়া মঞ্জুর হইল।

গান্ধীজী জেলখানা হইতে বাহিরে আসিয়া অবধি খাদি-প্রচারের দিকে বিশেষ জোর দিতেছিলেন। আমিও নিজের প্রদেশে গঠন-কর্ম, বিশেষ ভাবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আর খাদিপ্রচারে লাগিয়া রহিলাম। ১৯২৪ সনে আমরা পাটনায় একটি প্রদর্শনী করিয়া চরখা আর চরখায় প্রস্তুত সব রকম খাদির নমুনা প্রদর্শন করিলাম। এই প্রদর্শনীকে আমি রাজনীতি হইতে পৃথক রাখিয়াছিলাম। সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া বলা হইল, দলে দলে আসিয়া দেখুন, হাতে কেমন সুন্দর সুতা কাটা যায় আর খাদিপ্রচারের দ্বারা গরীবদের কত লাভ হয়। বহু সরকারি কর্মচারীও আসিয়া খাদি-প্রগতি দেখিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাটনা হাইকোর্টের চীফ-জস্টিস স্যর ডসন মিলারের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্য কয়েকজন ভারতীয় ও ইংরেজ জজ, বিহার গভর্নরের কাউন্সিলের মেম্বার স্যর হিউ ম্যাকফারসন এবং আরও অনেক উচ্চ কর্মচারীও আসিলেন। চরখা-প্রতিযোগিতায় মলখাচক-গান্ধী-কুটিরের (সারন) দুইটি ছেলে প্রথম পুরস্কার পায়। ছেলে দুটি শ্রীরাম-বিনোদ সিংহের ছোট ভাই। ইহারা ঘণ্টায় প্রায় ৬০০ গজ সুতা কাটিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে একজন ডাক্তার সত্যনারায়ণ সিংহ, যিনি পরে ইউরোপে শিক্ষা লাভ করিয়া 'ডকটর' উপাধি পাইয়া দেশে আসেন। ইনি হিন্দীতে অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। মিহি সুতার কাটুনীরা প্রায় ৩০০ নম্বরের সুতা কাটিয়া দেখাইয়াছিল। তখন পর্যন্ত যতটা প্রগতি হইয়াছিল আমি আমার বক্তৃতায় লোককে তাহা পড়িয়া শুনাইলাম, আমার যতটা অনুমান হয়, লোকে মহা সন্তুষ্ট হইল। চীফ-জস্টিসের স্ত্রী লেডী মিলার পুরস্কার বিতরণ করিলেন।

বেলগাঁওয়ের প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমার প্রদেশে খাদির কাজ ভাল চলে বলিয়াই বোধহয় এই সম্মান আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে যদিও অন্য নানারকম শিল্পের নমুনা দেখান হইয়াছিল, তবু আমার বক্তৃতায় আমি খাদির কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছিলাম। আমি জোর গলায় বলিলাম যে, প্রচারক আর পয়সার অভাব না হইলে আর লোকে কিনিলে, সারা দেশের প্রয়োজন-মত খাদি অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি করা যায়।

এই বৎসরের কয়েকটি ছোট ঘটনা আমার পক্ষে পুণ্যস্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। ইউনিভার্সিটি সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতার জন্য সেবার স্যর জগদীশচন্দ্র বসু পাটনায় আসিলেন, আমি তাঁহাকে বিহার-বিদ্যাপীঠে নিমন্ত্রণ করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার সময় ডাক্তার বসুর

কাছে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সে তো বহুদিনের কথা। আর তাহাও উপরের দিকে নয়, বি. এসসি, এম. এসসিতে নয়, এফ. এ ক্লাসেই আমার তাঁহার কাছে পড়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই জন্য, আমি ভাবিতেই পারি নাই যে আমার কথা তাঁহার মনে আছে বা আমার কথা তিনি কিছু জানিতে পারেন। কিন্তু আমার আহ্লাদের সীমা রহিল না, যখন দেখিলাম তিনি যে শুধু মনে রাখিয়াছেন তাহাই নহে, আমার উপর তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ। তিনি আনন্দের সঙ্গে বিদ্যাপীঠে আসিলেন আর সুন্দর ওজস্বী এবং উৎসাহপূর্ণ এক বক্তৃতা দিলেন। আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। এই প্রেম আর বিশ্বাসের পরিচয় তিনি মৃত্যুর কিছুদিন আগে আবার দিয়া গেলেন; বিহারের মদ্যপান-নিরোধের জন্য তিনি মোটারকম টাকা দান করিলেন আর ঐ টাকার সুদ যথোচিত ভাবে খরচ করার ভারও তিনি আমার উপর দিলেন। তিনি যে কেবল বিজ্ঞানবিদ্‌দের মুকুটমণি তাহা নয়, তিনি একজন খাঁটি দেশভক্ত আর ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। ১৯৪২ সনে জেলে যাওয়া পর্যন্ত আমার তত্ত্বাবধানে ঝরিয়ায় এই মদ্যপান-নিরোধের কাজ চলিয়াছিল। লেডী অবলা বসু আমাকে টাকা পাঠাইতেন। আমি যখন জেলে চলিয়া আসিলাম আর অন্য কর্মীরাও বন্দী হইলেন তখন আমি আমার হাতের সঞ্চিত টাকা লেডী বসু আর ট্রস্টীদিগের হাতে ফিরাইয়া দিই। ফিরাইয়া দেওয়ার জরুরী দরকার ছিল, কারণ আমার নামে ব্যাঙ্কে যত হিসাব ছিল গভর্নমেণ্ট সব বাজেয়াপ্ত করিতেছিল। আমি দেখিলাম আমার অনুপস্থিতিতে কাজ তো বন্ধ হইবেই তাহার উপর পয়সার অভাবে —এই অবস্থায় নিজের দায়িত্বে টাকা রাখা চলে না; বিশেষত আমি কতদিনে জেল হইতে ছাড়া পাইব তাহারই বা ঠিক কি? আমার লিখিত অনুরোধের ফলে গভর্নমেণ্ট এই বাবদ টাকা ট্রাষ্টীদের কাছে পাঠাইবার অনুমতি দিল। প্রায় ষোলমাস জেলে থাকিবার পর এই লাইনগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে, টাকা ফিরাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছিলাম। কেবল আফশোষ এই যে, আচার্য বসুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার তো দোষ নাই। ভারতবর্ষে রাজনীতি এমনই জিনিস, ইহার কবলে পড়িলে মানুষকে বহু প্রয়োজনীয় আর মহত্ত্বপূর্ণ কাজ ছাড়িয়া দিতে হয়। আর যদিও গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নিয়ম পাল্টাইয়া দিয়াছে, আর ঝরিয়ায় যেখানে এই টাকা দিয়া কাজ করা হইতেছিল সেখানে আবার এখন মদ বিক্রি হইতেছে, তবুও আমার বিশ্বাস আবার যখন আমাদের সময় আসিবে তখন আচার্যমহোদয়ের ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিব।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করাও অসঙ্গত হইবে না। খাদির কাজে শ্রীবব্বন সিংহ নামে এক যুবক কর্মী ছিল। সারণ জেলার গোপাল-

গঞ্জ সাবডিভিশনে কথয়েগবলিয়া গ্রামে তাহার বাস। বড় ভাবপ্রবণ ছেলে। মোক্তারী পরীক্ষার জন্য তৈয়ারি হইতেছিল, এমন সময় দেশের ডাক শুনিয়া ঐ পথ ছাড়িয়া খাদির কাজে লাগিয়া গেল। ঘরের অবস্থা ভাল নয়। সামান্য আয়। ছেলেটি নিজের পয়সায় খাদি আর চরখার প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল। নিজের জমি, স্ত্রীর অলঙ্কার পর্যন্ত এই কাজে বেচিয়া ফেলিল। এতখানি করিবার পরে সে খাদি বোর্ডের কাছে নিজের অবস্থা খুলিয়া বলিল। বোর্ড হইতে উহাকে সাহায্য দেওয়া ঠিক হইল। এমন সময় বেচারি পড়িল রোগে, উন্মাদের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। বার বার কেবল বলিত, উহাকে সাপে কামড়াইবে; সারাক্ষণ চরখা আর খাদির গান গাহিত, কখনও একেবারে বিগড়াইয়া যাইত। এইসব কারণে লোকে উহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত। একদিন রাত্রিবেলা বন্ধ ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, সাপ আসিয়াছে, উহার সঙ্গে লড়াই শুরু করিয়া দিয়াছি। প্রথমে তো লোকে পাগলের প্রলাপ মনে করিয়া চুপ করিয়াই ছিল, পরে কিন্তু গিয়া দেখে সত্যই এক গোখরা সাপ উহার হাতের মধ্যে। কয়েক জায়গায় সাপে উহাকে কামড়াইয়া দিয়াছে। কোনও মতে সাপটাকে সে মারিয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ সাপের বিষেই অলপক্ষণ পরে উহার মৃত্যু হয়।

বব্বন সিংহের স্ত্রী তাহার রোগের প্রথম দিন হইতেই ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। চব্বিশ দিন পরে উহার মৃত্যু হইলে স্নানাদি করিয়া সে সতী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। লোকে রাজী নয়। দাহ করিবার জন্য শব লইয়া যাওয়া হইল, সে বেচারিও জোর করিতে লাগিল, কিন্তু লোকে জবরদস্তি করিয়া উহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল। মেয়েটি তখন শান্ত হইল, চুপ করিয়া রহিল। নিজের ঘরে এক অন্ধকার কোণে পড়িয়া থাকিত। কোণটিতে কিছু তুলা আর খদ্দর রাখা ছিল। তিন-চার দিন পরে একদিন রাত্রিবেলা সে নিজের ঘরে শুইতে গিয়াছে, বব্বন সিংহের ভাই বাহিরের ঘরে শুইয়াছে। কাহারও কিছু সন্দেহ হয় নাই। সকালে যখন সে উঠিল না, লোকের মনে সন্দেহ হইল। ঘরের ভিতরে রামসুরত (মেয়েটির নাম) এক হাতে গীতা লইয়া অপর হাতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। শরীর স্পর্শ করিয়া দেখা গেল, পায়ের বুড়া আঙ্গুল হইতে বুক পর্যন্ত সর্বশরীর পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে, বাদবাকী শরীর যেমন তেমনই রহিয়াছে। পিঠের উপর ঝুলান লম্বা চুলের রাশি খানিকটা পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু চোখের পাতায় আগুনের কোনও চিহ্নই নাই। উহার শরীরের তিন-চার ফুটের মধ্যে দুইদিকেই সেই তুলা আর খাদি। ঘরে কিছু জ্বালানি কাঠ ছিল, সেগুলি অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু উহার দেহ পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতে পারে, এমন পরিমাণ ছিল না। এইরূপে সেই

দেবী আপনার সতীত্ব প্রমাণ করিয়া দেহত্যাগ করিল। ঘটনাটির খবর পাইয়া সেখানে গেলাম। লোকের মুখে যাহা যাহা শুনিলাম, কাগজে লিখিয়াছিলাম। বিচিত্র ঘটনা। খানিকটা আশ্চর্য তো বটেই। দলে দলে লোক স্থানটি দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়াও সতীসাধ্বীর পীঠস্থান দেখিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

দেশবন্ধুর দেহাবসান

বেলগাঁও কংগ্রেসের সময় হইতে দেশবন্ধু দাশের স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছিল, কিছুদিন তিনি নিজের ছোট ভাই শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাশের (পি. আর. দাশ) কাছে পাটনায় আসিয়া রহিলেন। তখনই প্রায়ই তাঁহার কাছে যাইতাম। তিনি চরখা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমাকে বলিলেন : হয় তুমি নিজে শেখাও, নয় কাহাকেও ঠিক করিয়া দাও। এই সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন : এই ধরনের কাজে আমার হাত চলে না, বুদ্ধিও খেলে না, আমার হাতে ছেড়ে দিলে আমি হয়তো নিজের ট্রাঙ্কের তালাটাও খুলতে পারব না। আমি কয়েকদিন তাঁহাকে সুতাকাটা শিখাইলাম, আমাকে বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে আর একটি বন্ধু এই কাজের জন্য তাঁহার কাছে যাইতেন। পাটনায় তাঁহার সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে কথাবার্তাও হইত। তখন লর্ড বার্কেনহেড ভারত-মন্ত্রী। ইনি তো ছিলেন ঘোর কনসারভেটিভ (রক্ষণশীল দলের) আর পাক্কা সাম্রাজ্যবাদী; কিন্তু দেশবন্ধু বলিতেন, লোকটি প্রতিভাশালী আর একগুঁয়ে ধরনের, হয়তো বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু করিয়া যাইতে চায়। ভিতরে ভিতরে এই বিষয়ে কিছু কথাও হইয়াছিল। তাঁহার বড়ই আশা ছিল, ঐ সময় এমন কিছু হইবে যাহাতে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইবে। তিনি এমনও বলিতেন যে, বার্কেনহেডের দ্বারা যদি তাঁহার আশা পূর্ণ না হয় তবে দেশকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজীর চরখা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না।

১৯২৩ সনের নির্বাচনে স্বরাজ্যদল যোগ দিয়াছিল, আগেই বলিয়াছি। দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইহাদের তাহা করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কাউন্সিলের কার্যক্রম হাতে লওয়া হয় নাই। সেইজন্য সেই নির্বাচনে কংগ্রেসের সাহায্য পাইলে যতটা সুবিধা হইত স্বরাজ্যদল

ততটা করিতে পারেন নাই। অবশ্য বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে ঐ দলের সভ্য-সংখ্যা ভাল হইয়াছিল। এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং দিল্লীতেও স্বরাজ্যদলের অনেকে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, যথেষ্ট না হইলেও জনকতক ভাল লোক কাউন্সিলে যাইতে পারিয়াছিলেন। উঁহারা এসেমব্লীর কার্য-পদ্ধতিতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আর রীতির সমাবেশ করিলেন। মধ্য-প্রদেশে অবশ্য স্বরাজীদের দলই ভারি ছিল। সেখানে তাঁহারা বাজেট আর মন্ত্রীদের মাসোহারা নামঞ্জুর করিলেন। গভর্নর নাচার হইয়া মন্ত্রীদের সরাইয়া প্রদেশের শাসনভার নিজের হাতে লইতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে দলে ভারী না হইয়াও স্বরাজ্যদল দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বে ও চেষ্টার ফলে বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙিয়া দিল। বাংলার গভর্নরকেও শাসন-ভার নিজের হাতে লইতে হইল। কেন্দ্রীয় পরিষদে পণ্ডিত মতিলালজী ছিলেন স্বরাজ্যদলের নেতা, অন্যান্য দলের চিন্তাশীল সভ্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিষদেও তাহারা বাজেট নামঞ্জুর করিলেন। বড়লাট তাঁহার বিশেষক্ষমতাবলে উহা পাশ করাইয়া লন। দুই বৎসর যাবৎ এই পরিস্থিতি চলিল। বাংলাদেশে দেশবন্ধু দমননীতির বিল পাশ করা রদ করিয়া দিলেন। এই সব ব্যাপারে দেশের কাজে যতই সুফল ফলিতে লাগিল, সরকারি কর্তৃপক্ষ ততই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। স্বরাজ্যদলের এই সফলতাও এক প্রধান কারণ—যাহার জন্য গান্ধীজী তখন রফা করিলেন। অবশ্য স্পষ্টই দেখা গিয়াছিল যে, এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলিতে পারে না; কেন্দ্রীয় পরিষদে অপর যেসব দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া একজোট করা হইয়াছিল তাহারা ক্রমে দুর্বল হইতে হইতে একসময়ে সরিয়া দাঁড়াইল। স্বরাজ্যদল অন্য সব দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। মধ্যপ্রদেশেও স্বরাজ্যদলের মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এক দল লোক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল, বেরারের কয়েকটি সদস্য এইদলের অগ্রণী ছিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া দূরদর্শী ও মর্মজ্ঞ দেশবন্ধু দাশ মনে করিলেন যে, এই সুযোগে যদি প্রতিষ্ঠা ও সম্মান বজায় রাখিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে কোনও চুক্তি করা যায় তবেই মঙ্গল।

নূতন অর্ডিনান্স আর ১৮১৮ সনের রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তারাদি করিয়া গভর্নমেণ্ট স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিপ্লববাদীদের কোনও-মতেই আমল দেওয়া হইবে না। এই সব ধরপাকড় আর এই নূতন অর্ডি-নান্স লেবারপার্টির (শ্রমিক দল) সময়েই হইয়াছিল, আর র‍্যামসে ম্যাক্-ডোনাল্ড ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। পরে লেবারপার্টি নির্বাচনে হারিয়া যাওয়ায় রক্ষণশীল দলের (কনসারভেটিভ) হাতে মন্ত্রিত্ব আসে, ঐ সময়ই লর্ড বার্কেনহেড ভারত-মন্ত্রী হন আর উঁহার কাছেই দেশবন্ধু দাশ অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু নিজের বুদ্ধিমত রাস্তাও পরিষ্কার

করিয়া লইলেন। তিনি জানিতেন ইংরেজের ঘোর সন্দেহ যে, দেশবন্ধু দাশ ভিতরে ভিতরে বিপ্লববাদীদের সাহায্য করিতেছেন। ইংরেজদের মনে এই সন্দেহ, গোপীনাথ সাহার বিষয়ে তাঁহারা যে প্রস্তাব আনেন, তাহা হইতে আরও দৃঢ় হইল। দেশবন্ধু ভাবিলেন, যতক্ষণ এই সন্দেহ ইংরেজদের মনে বদ্ধমূল থাকিবে, ততক্ষণ ইংরেজ কোনও প্রকারের বোঝা-পড়া করিবে না। ইংরেজদের সঙ্গে কথা বলিয়া তিনি এইরূপই বুঝিয়াছিলেন। তাই ইহা দূর করা তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন। একটি বিবৃতি প্রকাশিত করিয়া তিনি একথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন যে কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলও সে নীতি সমর্থন করে নাই, যাহাতে হত্যা বৈধ মনে করা হয়। স্বরাজ্যদলের বিচারে এই জাতীয় হত্যা স্বরাজ্যপ্রাপ্তির পথে বাধারই সৃষ্টি করে, তাই ঐ দল পূর্বেও কখনও ইহার সমর্থক ছিল না, এখনও কোনও প্রকারেই ইহার সমর্থন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে তাহারা স্বরাজ্য বাধাদানের নীতিকে বৈধ বলিয়া বিবেচনা করিল। যতক্ষণ বোঝাপড়ার দ্বারা একটা কিছু স্থির হইয়া অধিকার হস্তান্তরিত না হয়, ততক্ষণ ঐ নীতি চালু রাখা হইবে একথাও বলা হইল। বিবৃতির প্রথম অংশ পড়িয়া ইংরেজ সন্তুষ্ট হইল। এমন কি লর্ড বার্কেনহেডও এবিষয়ে তাঁহার সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন: কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিলেন যে বিধান প্রবর্তনে ভারতবাসীদের সহযোগিতা করা চাই। সহযোগিতা করিলেই রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব। ইহাতেও দেশবন্ধু একেবারে নিরাশ হইলেন না। সে সময়ে ফরিদপুরে বঙ্গীয় রাজনৈতিক সম্মেলন হইবার কথা ছিল। তিনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

গান্ধীজী সেই সময়ে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের সম্মেলনে তিনিও উপস্থিত হইলেন। দেশবন্ধু তাঁহার ভাষণে ঐসব চিন্তা ও আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সব আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙিগয়া যাইতেছিল। তিনি দার্জিলিং চলিয়া গেলেন। মহাত্মাজীও সেখানে গেলেন। তাঁহারা দুইজন যখন দার্জিলিংয়ে, তখন আমিও জলপাইগুড়ি পর্যন্ত গেলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধীজীকে বাংলা হইতে বিহারে লইয়া আসিব। সেই উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের জন্য পাহাড়ে আর গেলাম না। শ্রীমথুরাপ্রসাদজীকেই গান্ধীজীর কাছে পাঠাইয়া দিলাম। গান্ধীজীও রাজী হইলেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে অকস্মাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যু হইল। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে সমস্ত দেশময় শোকের ছায়া পড়িল। তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় আনা হয়, সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। শবযাত্রার মিছিলে যত লোক হইয়াছিল তত বুঝি তখনও কোনও মিছিলে দেখা যায় নাই। মহাত্মাজীও কলিকাতায় আসিলেন। দেশবন্ধুর

স্মৃতিরক্ষার জন্য টাকা উঠানো আর বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঐখানকার অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা—এই দুই কাজে লাগিয়া গেলেন। এই সব কারণে কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহার বিহারে আসা হইয়া উঠিল না।

সমাজসংস্কার

পরিবারে তখন দুইটি আয়োজন তোছিল। এক আমার ছোট ভাইঝি রমার—লক্ষ্নৌয়ের শ্রীবিদ্যাদত্ত রামের সঙ্গে; অপরটি আমার বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের—শ্রীব্রজকিশোর প্রসাদজীর ছোট মেয়ে বিদ্যা-বতীর সঙ্গে। লক্ষ্নৌয়ের বরযাত্রী আসিল মহা-সমারোহে। লোক বেশি নয়; তবে প্রতিষ্ঠাবান বড় ঘরের বলিয়া উহাদের আড়ম্বর বেশি। ব্যবস্থা সব আমাদেরই করিতে হইবে; আমার দাদা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। এই সম্বন্ধ ঠিক করার সময় বাবু হরিজী আমাদের খুব সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধ। আমাদের ইচ্ছা নয়, কাহারও কোনও অসুবিধা হয়। সেইজন্য থাকিবার জায়গা, খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অপরদিকে, মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহ ইহার ঠিক বিপরীতভাবে, খুব সাদাসিধাভাবে হইয়াছিল। আমরা তো তিন ছেলের কাহারও বিবাহেই তিলক-যৌতুক কিছু লই নাই; কিন্তু তিনটি মেয়ের বিবাহেই যৌতুক দিতে হইয়াছে বিস্তর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো ইচ্ছার অতিরিক্ত দিতে হইয়াছে, জবরদস্তির ফলে। এই সম্বন্ধে আমাদের বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়া গিয়াছে। আমাদের সমাজে নানারকম কুপ্রথা বর্তমান। এই সব প্রথা দূর না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে হওয়া আর মেয়ের বিবাহ দেওয়া আমাদের পক্ষে চিরদিন গ্লানি ও ঝঞ্ঝাটের কারণ হইয়া থাকিবে। কায়স্থদিগের মধ্যে, বিশেষত শ্রীবাস্তব আর অম্বষ্ঠদের মধ্যে, বহু সংস্কারের প্রয়োজন।

অখিলভারত কায়স্থ সম্মেলনের জন্ম প্রায় কংগ্রেসেরই সমসাময়িক। আমার বিশ্বাস, ঐ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেই কন্যার পিতার নিকট কোনওরকম যৌতুক ও পণ লওয়ার প্রথার নিন্দা করা হইয়াছিল, আর ঐ প্রথা দূর করার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই এই ভাবের সব প্রস্তাব পাশ হয়! কিন্তু কন্‌ফারেন্সের হর্তাকর্তারাই এই সব প্রস্তাব অবহেলা করেন! অনেক ক্ষেত্রে আবার এমনও দেখা

গিয়াছে যে, এই কন্‌ফারেন্সে লব্ধ প্রতিষ্ঠার বলেই অধিকতর তিলক-যৌতুক লাভ হইয়াছে। কেননা এই কন্‌ফারেন্সের সভাপতি বা অন্য উচ্চ-পদাধিকারী হওয়া কায়স্থসমাজে মহা প্রতিপত্তির কথা, সুতরাং তাহাদের দাবীও বেশি! এই সব কারণে জাতীয় অন্যান্য কন্‌ফারেন্স অপেক্ষা পুরানো হইলেও ইহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

১৯১৬ সনে আমি যখন ওকালতি করিতে কলিকাতা হইতে পাটনায় আসিলাম তাহার কয়েকদিন পরেই জনকয়েক কায়স্থ বন্ধু আমাকে দিয়া একটি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লন। প্রতিজ্ঞার বিষয় ছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও উপায়েই ছেলের বিবাহে পাত্রীর পিতা বা অন্য কোনও আত্মীয়ের কাছ হইতে ৫১৲ টাকার বেশি আমি লইব না। পূর্ব হইতেই আমার মত এই রকম ছিল, কাজেই আমি খুসি হইয়া নাম দস্তখত করিলাম। আমার দাদার তো এই বিষয়ে আরও বেশি কড়া মতামত ছিল; তিনি বলিতেন, যাহারা পণযৌতুক নেয় বা বিবাহের নাচগানে বাড়াবাড়ি খরচ করে, তাহাদের সহিত কুটুম্বিতায় যাওয়াই অনুচিত। সেইজন্য আমাদের পরিবারে এই শর্ত মানা কঠিন ছিল না। আমার তিন ভাইঝির মধ্যে দুইটির ইহার আগেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের বিবাহে আমাদের যৌতুক দিতে হইয়াছিল। এখন কেবল এক মেয়ের বিবাহ বাকী, তবে ছেলে তিনটির কাহারও বিবাহ হয় নাই। যেখানে পণ দেওয়ার কথা ওঠে, আমরা তো পিছাইয়া যাই, আর যেখানে কিছু পাইবার আশা থাকে সেখানকার রাস্তা তো প্রতিজ্ঞানুযায়ী বন্ধ। তবে আমরা জানিয়া বুঝিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। এই জন্য তিন ছেলের বিবাহই নূতন ধরনে, তিলক-যৌতুক আর নাচ-তামাসা বিনাই হইল। কিন্তু মেয়েদের বিবাহের সময় কন্যাপক্ষ বলিয়া তিনজনকেই পণ দিতে হইয়াছে। আমাদের সমাজে মেয়ের বাপকে যত কিছু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আমাদেরও সে সব ভুগিতে হইয়াছে।

ইহার ঠিক পরে, ঐ বছরেরই শেষে (১৯২৫ সনের ডিসেম্বরে) আমাকে যখন কায়স্থ-সম্মেলনের জৌনপুর-অধিবেশনের সভাপতি করা হয়, এই কুপ্রথা দমনের জন্য কিছু করিতে পারিব সেই আশায়ই আমি সম্মত হইলাম। পুরানো হইলেও ঐ সম্মেলনের দুইটি প্রস্তাব লক্ষ্য করিবার মত। একটি তো পণপ্রথা সম্বন্ধে—আমি এসম্বন্ধে প্রতিজ্ঞার আরো কড়াকড়ি করিলাম। এই প্রস্তাব লঙ্ঘন করিলে সেই বিবাহসভায় আমরা যোগ দিব না—তাহাও যোগ করিয়া দিলাম। দ্বিতীয় প্রস্তাবে কায়স্থদের বিভিন্ন বর্গ আর শাখার মধ্যে বিবাহের প্রচলন অনুমোদন করা হইল। আমি যতদূর জানি, তিলক-যৌতুকের প্রথা এখনও বর্তমান আছে; সম্ভবত থাকিবেও, কারণ আজকাল তো দেখি অনেক যুবক বিবাহের শর্তের মধ্যে

নিজেদের শিক্ষার, বিশেষত বিদেশে গিয়া শিক্ষার, সমস্ত খরচ আদায় করিতে চায়, টাকা না হইলেও অন্য পাঁচরকম ফরমাশ করিয়া বসে। সেজন্য এমন আশা নাই যে সেকেলে ভাবাপন্ন বুড়ার দল গতাসু হইলেই এই সব কুপ্রথার সংশোধন হইয়া যাইবে, কারণ আমি তো দেখিতেছি, বুড়াদের অপেক্ষা ইহাদের বিষয়বুদ্ধি বরং বেশি। তবে আনন্দের কথা, কায়স্থদের মধ্যে অন্তর্বর্গীয় বিবাহের চলন হইয়াছে। ভিন্ন শাখা আর বর্গের মধ্যে বিবাহ সংগত ও উচিত, এই বিষয়ে এখন আর কাহারও মনে খটকা নাই। এখন তো অল্পবয়সের বিধবা মেয়েরও বিবাহ হইতেছে। তখন পর্যন্ত আমারও এসম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল না, কিন্তু পরে আমিও মানিয়া লইয়াছি যে, বিধবাবিবাহ, বিশেষত বালবিধবার বিবাহ, হওয়া বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি বালবিধবার বিবাহে আমি শুধু সম্মতি নয়, উৎসাহও দিয়াছি।

কাউন্সিলের নির্বাচন ও মহাত্মা গান্ধীর বিহার-সফর

আমি আগেই বলিয়াছি যে, বেলগাঁও কংগ্রেসে আপোসের পরে কংগ্রেসের নিয়মাবলী পরিবর্তিত করিয়া ঠিক করা হইল যে, চার আনার বদলে দুই হাজার গজ হাতে কাটা সুতা দিয়া কংগ্রেসের মেম্বার হইতে হইবে এবং কংগ্রেসসম্বন্ধীয় কাজকর্মের সময় খদ্দর পরা আবশ্যিক থাকিবে। অনেকে ইহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের বাহিরের যাঁহারা কংগ্রেসে ঢুকিতে পারিবেন আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তো বিরোধী ছিলেনই, কংগ্রেসের ভিতরেও একদল এই নিয়মের ঘোর বিরোধিতা করিয়াছিলেন। স্বরাজ্যদল ইহা মঞ্জুর করিয়া লইলেও উহারই জনকয়েক প্রধান সদস্য এই প্রস্তাবটি মনে প্রাণে স্বীকার করিতে পারেন নাই। বেলগাঁওয়ের পরেই তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, সুতা আর খাদির শর্ত জুড়িয়া দিয়া কংগ্রেস নিজের ক্ষেত্র আরও সংকুচিত করিয়া তুলিল, এখন সদস্যসংখ্যা খুবই কমিয়া যাইবে। গান্ধীজীর আশা ছিল, যদি সকলে মিলিয়া বিশেষ চেষ্টা করে তবে চরখার কাটুনি অনেক জুটিয়া যাইবে, আর সদস্যদের সংখ্যা কমিয়া গেলেও যাহারা থাকিবে তাহাদের কাজ হইবে পাকা রকমের, তাহাদের উপর পুরাপুরি ভরসাও করা যাইবে। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয় নাই! বহু চেষ্টার পরও কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা নিতান্তই কম থাকিয়া গেল, গান্ধীজীর মনে খুব আঘাত লাগিল। তিনি তখন জানাইয়া

দিলেন যে স্বরাজ্যদল যদি চায় তবে তাহাদের ঐ আপোসের শর্ত হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে, আর কেবল সুতার বদলে 'সুতা অথবা চার আনা পয়সা' সদস্যের দেয় শুল্ক বলিয়া ধার্য করা হইবে। কিন্তু জনকতক লোকের মতে তিনি খদ্দর ও সুতার কথাটা একদম উঠাইয়া দিতে রাজী হন নাই। পণ্ডিত মতিলালজীর সঙ্গে তাঁহার আলোচনায় স্থির হইল, নিয়মাবলীর আবার সংশোধন করা হইবে; তাহার সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, খাদির কাজে যে টাকা লাগান রহিয়াছে তাহা ঐ কাজের জন্যই থাকিবে এবং খাদি প্রচারের জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান করা হইবে, যে প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের অঙ্গ হইলেও স্বতন্ত্র থাকিবে। অপরদিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাইবার জন্য স্বরাজ্যদলকে পুরাপুরি অধিকার দেওয়া হইবে।

কিছুদিন পরে বাংলার কাজকর্ম সারিয়া গান্ধীজী বিহার-সফরের জন্য আসিলেন। ছোটনাগপুর হইতে সফরের কাজ শুরু হইল। তাহার কারণও ছিল; শাহ্ মহম্মদ জুবেয়ারের সভাপতিত্বে সেইবার পুরুলিয়ায় বিহার-প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা ছিল। স্থানীয় লোকেরা বিপুল উৎসাহে সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল। ছোটনাগপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনের এই প্রথম অধিবেশন। ওখানকার লোকদের একান্ত ইচ্ছা গান্ধীজীও ঐখানে উপস্থিত থাকেন। গান্ধীজী রাজী হইলেন। একপ্রকার এখান হইতেই গান্ধীজীর যাত্রা শুরু হয়। ইহার কিছুদিন আগে গান্ধীজী একবার জামসেদপুরে আসিয়াছিলেন। তখন দেশবন্ধু সেখানে শ্রমিক-সংগঠনে আগ্রহ দেখাইয়াছেন। একটি সংঘও গঠিত হইয়াছে, কিন্তু টাটা কোম্পানি তখনও ঐ ইউনিয়নকে স্বীকার করে নাই। দেশবন্ধুর পরে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ তখন উহার সভাপতি, তাঁহারই অনুরোধে গান্ধীজী সেখানে যাইতে রাজী হন। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীআর. ডি. টাটাও ঐখানে আসিলেন, কোম্পানির তরফ হইতে মহাত্মাজীকে বিপুল সংবর্ধনা করা হইল। আমি গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলাম, দুইদিন সেখানে থাকিয়া তিনি খুব ভালভাবে কারখানাটি দেখিলেন। ডিরেক্টরদের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা হইল; ফলে কোম্পানি মজুরদের ইউনিয়নকে স্বীকার করিয়া লইল। মজুর-মেম্বারদের বেতন হইতে কাটিয়া উহার চাঁদা জমা করিয়া লইতেও রাজী হইল। উহাদের অন্য অভিযোগগুলিরও দ্রুত প্রতীকার করা হইল। সেই হিসাবে গান্ধীজীর যাত্রা খুবই সফল হইয়াছিল।

খুব সমারোহে পুরুলিয়া-সম্মেলন হইল। মহাত্মাজী বোম্বাইয়ের দিক হইতে আসিলেন, আমরা সিনিতে তাঁহাকে ডাকগাড়ী হইতে নামাইয়া লইলাম। সময়সংক্ষেপ বলিয়া সেখান হইতে পুরুলিয়া পর্যন্ত এক

স্পেশ্যাল ট্রেনে তাঁহাকে আনা হইল। এই সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ, একটি চমৎকার প্রদর্শনী; গান্ধীজী তাঁহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। সম্মেলনের শেষে গান্ধীজী ছোটনাগপুরের সফর আরম্ভ করিলেন। আশা ছিল, সমস্ত প্রদেশটি ঘুরিতে পারিবেন। আমি দেখিয়াছি যে মহাত্মাজী যখন কোথাও সফরে যান, লোকে চায় তিনি ক্রমেই অধিকসংখ্যক জায়গায় যান, আর জনসাধারণ তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে। একহিসাবে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সময় সময় মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। অবশ্য আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, নিজের ইচ্ছায় হউক বা বন্ধুজনের আগ্রহে হউক, আমিও এই দোষে দোষী। ব্যাপক ভ্রমণসূচী ঠিক করা হইল। মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য আগে হইতেই খারাপ ছিল, তিনি এই কার্যক্রম বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। আমরা ভ্রমণের দুইটি ভাগ করিয়াছিলাম. প্রথমে ছোটনাগপুরে, পরে বিহারের অন্য জেলাগুলিতে। কথা ছিল, তিনি ছোটনাগপুরের ভ্রমণ সারিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের জন্য পাটনায় কয়েকদিন থাকিয়া বিহারের অন্যান্য জেলায় ভ্রমণে বাহির হইবেন। কিন্তু ছোটনাগপুর সফরেই গান্ধীজী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষদিন, হাজারিবাগ জেলার কাজ শেষ করিয়া কোডারমা স্টেশনে রেলে উঠিতে গিয়া গান্ধীজী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমি সঙ্গেই ছিলাম। প্রবল ভিড়কে ঠেকাইয়া রাখা এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি যে কতদূর অসুস্থ তাহা আমিও আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন সব প্রকাশ পাইল। বিহারের বাকী কার্যক্রম আমি কিছুদিনের মত স্থগিত রাখিলাম। আমরা ঠিক করিলাম, মহাত্মাজী পাটনায় গঙ্গার ধারে একটি বাড়িতে কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন। এখানে তাঁহার বেশ উপকার হইয়াছিল, বিহারের সর্বত্র হইতে বহু লোক সব সময় তাঁহার দর্শনলাভও করিতে পারিল।

এই সময় পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক হয় তাহাতে কংগ্রেসের নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও সংশোধন করা স্থির হয়। ঐ বৈঠকে আরও ঠিক হয় যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রোগ্রাম, কাউন্সিলের নির্বাচন প্রভৃতি সব কাজ স্বরাজ্যদলের হাতে থাকিবে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করান হইবে, আর স্বরাজ্যদলের নেতা পণ্ডিত মতিলালজীর উপর এই ব্যাপারের সকল ভার অর্পণ করা হইবে। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত অথচ কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন একটি সংস্থার উপর খাদি প্রচারের ভার থাকিল। এইভাবে নিখিল ভারতীয় চরখা-সংঘের জন্ম হইল। উহার নিয়মকানুন রচনা করিলেন গান্ধীজী। জনকয়েক বন্ধু উহার আজীবন-সভ্য হইলেন। আমিও তাহাদের একজন ছিলাম এবং আজও আছি। মহাত্মাজী হইলেন সভাপতি। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক প্রদেশের কাজের দেখা-

শোনা করিবার জন্য এক-একজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক মন্ত্রীও নিযুক্ত করা হইল। বিহারের জন্য আমি এজেণ্ট নিযুক্ত হইলাম, সংযুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত জওহরলাল, বাংলায় শ্রীসতীশ-চন্দ্র দাসগুপ্ত, তামিলনাডে শ্রীরাজাগোপালাচারি প্রভৃতি। এইরূপে, একপ্রকার স্বতন্ত্র ভাবে এই সংঘ খাদির কাজ চালাইতে লাগিলেন। পরবর্তী ১৭।১৮ বৎসরে এই সংঘ খাদির প্রচার ও উন্নতির জন্য খুব সুন্দর কাজ করিয়াছেন। আজ এই লাইনগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে, সরকার যদি এই সংঘের কারবার তছনছ করিয়া না দিতেন তবে কাপড়ের এই দুর্মূল্যের দিনে খাদির উপযোগিতা লোকে আরও বুঝিতে পারিত। এই কয় বৎসরে গরীব লোকদের, বিশেষত যে সব গরীব মেয়েরা অন্য কিছু করিতে পারে না তাহাদের, মজুরি হিসাবে এই সংঘ কোটি কোটি টাকা দিয়াছে।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কাউন্সিল-নির্বাচনে দাঁড়ান যখন স্থির হইল, তখন পণ্ডিতজী আমাকে বলিলেন যে বিহারের ভার আমাকে লইতে হইবে। যদিও আমার মনোভাব আগেরই মত ছিল, তবু ভাবিয়া দেখিলাম যে, কংগ্রেস যখন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে তখন তাহার জয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই আমার ধর্ম। আমি পণ্ডিতজীকে কথা দিলাম, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই প্রথম কাউন্সিল অফ স্টেটের নির্বাচন হইল। বিহার হইতে একজন মুসলিম আর তিনজন অমুসলমান নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন। মুসলমান এলাকার জন্য আমরা শাহ্ মহম্মদ জুবেয়ারকে আর অমুসলমান এলাকাগুলির জন্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ ও বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ এই তিনজনকে দাঁড় করাইয়াছিলাম। বিরোধী দলের মধ্যে ছিলেন দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ ও ডুমরাঁও-এর মহারাজা বাহাদুর প্রভৃতি। নির্বাচনে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইল, কারণ ভোটদাতারা প্রায়ই জমিদার, মহাজন, ব্যাপারী প্রভৃতি ধনী শ্রেণীর। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু উঁহারা কেহই একজায়গায় আসিয়া ভোট দিবেন না। কোনও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সম্মুখে দস্তখত করিয়া সম্মতিপত্র উঁহারা ডাকেই পাঠাইতে পারিতেন। এইজন্য একপ্রকার কাগজ বিলির হিড়িক পড়িয়া গেল। যত তাড়াতাড়ি মতদাতাদের নিকট হইতে কাগজ আনিয়া দরখাস্ত করাইয়া নিজেদের দলে পাঠাইতে পারিব, ততই বেশি সফলতার আশা করা যাইবে। তাছাড়া, উড়িষ্যাও বিহারের সঙ্গে ছিল; সেখানকার ভোটও লইবার ছিল! আমাদের চেষ্টায় শাহ্ জুবেয়ার সাহেব, বাবু অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ ও বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ নির্বাচিত হইলেন। চতুর্থ স্থানে দারভাঙ্গার মহারাজা-ধিরাজ নির্বাচিত হইলেন। শ্রীবাবু হারিলেন বলিয়া আমাদের খুব দুঃখ

রহিল; কিন্তু নাচার। এ সমস্ত ব্যাপার ১৯২৫ শেষ হইবার পূর্বেই সমাধা হইয়া গিয়াছিল।

স্বরাজ্য দলে মতভেদ ও কানপুর কংগ্রেস

সকল দলের লোককে কংগ্রেসে আনিবার জন্য কতরকম চেষ্টা আমরা করিয়াছিলাম তাহা উপরে বলা হইয়াছে। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, বেলগাঁও কংগ্রেসের আগেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অন্য অসহযোগ স্থগিত রাখিয়া শুধু বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কথাই কায়েম রাখিয়াছিলেন। আর তাহার সঙ্গে গঠনাত্মক কাজের দিকে জোর দিয়াছিলেন। কাউন্সিলে রাজনৈতিক কাজ চালানর অধিকার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বরাজ্যদলের উপর দেওয়া হইয়াছিল। আশা ছিল, ইহাতে অপর পক্ষের লোকও কংগ্রেসে যোগ দিবে। বোম্বাইয়ের সর্বদল-সম্মেলনে সেই আশা আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু দুঃখের কথা, সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। সর্বদল-সম্মেলন যে সাব-কমিটি নিযুক্ত করিলেন তাহা কোনও মীমাংসায় পেঁছিতে পারিল না। আপনাদের অক্ষমতা ঘোষণা করিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন। অবশ্য ইহার পরেও কোনও-না-কোনও পথ ধরিয়া মিলনের আলোচনা চলিতেছিল। নরমপন্থীদের ও জিন্নার মত লোকদের দুই তিনটি অভিযোগ ছিল। এক অভিযোগ এই যে, কংগ্রেস যদিও অসহযোগ নীতি তখনকার মত স্থগিত রাখিয়াছে, কিন্তু বরাবরের জন্য নয়। অথচ কংগ্রেস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ বরাবরের জন্য ছাড়া দূরের কথা, দেশকে ঐ জন্যই প্রস্তুত করিতেছিল, আর এই বিষয়ে অপরিবর্তনবাদীদের ও স্বরাজীদের উভয়দলেরই সম্মতি ছিল। এই বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। ইহাদের মতভেদ কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে, কাউন্সিলগুলি দেশকে প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিবে, না, বাধা দিবে। অপরিবর্তনবাদীদের বিশ্বাস কাউন্সিলের কার্যক্রম সত্যাগ্রহের পথে প্রতিবন্ধক, আর স্বরাজীরা কাউন্সিলগুলিকেও দেশের প্রস্তুতির কাজে লাগাইতে চায়। আর একটি অভিযোগ, কংগ্রেস খাদি ও চরখা প্রচারের দিকে বেশি জোর না দিলেও বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশনে সদস্যদের খাদি পরিধানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, অন্তত কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত থাকা কালে খাদি পরা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। মেম্বারদের সুতাকাটাও আবশ্যিক করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের বাহিরের লোকেরা না করিত চরখায় বিশ্বাস, না ছিল তাহাদের খাদি

পরিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ। কংগ্রেসের ভিতরেও কিছু লোকের এই মত ছিল, তাহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের লোকই বেশি, অবশ্য ইঁহাদের সংখ্যা বেশি নয়। তৃতীয় যে কারণে লোকের মনে আশঙ্কা জাগিতেছিল তাহা হইল এই যে, কংগ্রেস কাউন্সিলের সব কাজকর্মের ভার ও অধিকার স্বরাজ্যদলের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে। কারণ বাহিরের লোকের বেশির ভাগই তো কাউন্সিলের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল। তাহারা মনে করিল, কংগ্রেসের মধ্যে আসিলেও তাঁহারা কাউন্সিলে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিবে না। কারণ সেখানে তো স্বরাজীদের নীতিই বহাল থাকিবে। এই ধরণের নীতি তাহাদের পছন্দ নয়, তাহাদের মতে মন্ত্রীমণ্ডলের কাজের মধ্যে সকলেরই অংশ থাকা উচিত। এই জন্যই গোড়ায় যেটুকু আশার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যে এই মৌলিক মতভেদের দরুণ তাহা শীঘ্রই নির্মূল হইয়া গেল। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পাটনায় অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণভাবে স্বরাজ্যদলের হাতে ছাড়িয়া দেন, ফলে বাহিরের লোকের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া আরো কঠিন হইয়া পড়ে।

আমি আগেই বলিয়াছি; স্বরাজ্যদলের ভিতরেই, বিশেষত মধ্যপ্রদেশে, যেখানে অ্যাসেমব্লীতে উহারাই দলে ভারী ছিল, সেখানে দেশবন্ধু দাশের অন্তিম সময়েই মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে কিছু কানাঘুষা শোনা গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পরেই প্রকাশ পাইল যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রিত্বগ্রহণের পক্ষপাতী। তখনও মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু একজন বিশিষ্ট স্বরাজী শ্রীতাঁবে—যিনি স্বরাজ্যদলের তরফ হইতে মেম্বার নির্বাচিত হইয়া পরে অ্যাসেমব্লীর সভাপতি হইয়াছিলেন—সেখানকার গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ জুটাইয়া লইলেন। লইবার পূর্বে তিনি না লইলেন নিজের সঙ্গীদের বা দলের কাহারও সম্মতি, না দিলেন দলেতে ইস্তফা। কাজেই দলেতে বেশ গোল বাধিয়া গেল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তো বেশ কড়া মন্তব্য করিলেন। অপর দিকে মহারাষ্ট্রের শ্রীনৃসিংহ চিন্তামণি কেলকর শ্রীতাঁবেকে সমর্থন করিলেন। শ্রীজয়াকরও এক হিসাবে সমর্থন করিলেন—তবে শ্রীতাঁবেকে নয়, পদগ্রহণকে। মধ্যপ্রদেশের শ্রীঅভয়ঙ্কর কিন্তু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। আবার, ডাঃ মুঞ্জে ও শ্রীঅভয়ঙ্করের মধ্যে বিলক্ষণ মতান্তর হইল; ইঁহারা স্বরাজ্যদলের বিশিষ্ট ব্যক্তি, কাজেই ব্যাপারটা অনেকটা গৃহবিবাদে পরিণত হইল। মহারাষ্ট্রের শ্রীকেলকর এবং ডাঃ জয়াকর প্রতিক্রিয়াবশে সহযোগের প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দলের বিরোধ-নীতি ধরিয়া রহিলেন ও উহার প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই মতভেদ যখন বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কানপুর কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ঠিক এক বৎসর আগে ইনি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে খুব সুন্দর কাজ করায় তাঁহার তখন খুব নামডাক হইয়াছে। গান্ধীজী তো পারিলে উঁহাকে বেলগাঁও কংগ্রেসেরই সভানেত্রী করিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি নিজেই দেশবাসীর অনুরোধে বেলগাঁও অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এক হিসাবে বেলগাঁওয়ের আগেই লোকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে শ্রীমতী নাইডু কানপুর কংগ্রেসে সভাপতির কাজ করিবেন।

কানপুর কংগ্রেসের একটা বিশেষত্ব ছিল। কথা ছিল, স্বরাজ্যদল ইহার কার্যক্রম স্থির করিবেন। সেইজন্য, পণ্ডিত মতিলালজীর মত অনুসারেই ওয়ার্কিং কমিটি বিষয় নির্বাচনী সমিতির প্রস্তাব রচনা করিয়া দেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে নূতন আইন পেশ করা হইতেছিল, এই অধিবেশনে তাহার প্রতিবাদ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে, বর্মাদেশে ভারতীয়দের প্রতি যে সকল বিরুদ্ধ আচরণ করা হইত তাহার নিন্দা করা হয়। কাউন্সিলসম্বন্ধীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও ছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল, দেশবাসীর পক্ষ হইতে স্বরাজের জন্য যে দাবি অ্যাসেমব্লীতে পাশ করা হইবে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে তাহা মানিয়া লইয়া তদনুযায়ী বিধান করিতে হইবে। যদি তাহারা ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করে, অথবা ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত এ-বিষয়ে কিছু না বলে, অথবা বলিলেও আমাদের সন্তোষজনক কিছু না বলে, তবে স্বরাজী সদস্যরা অ্যাসেমব্লী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবেন, যতদিন কংগ্রেসের অনুমতি না পান আর ফিরিবেন না, এবং গঠনমূলক কার্যে লাগিয়া যাইবেন। বিরোধিদল বলিলেন, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯২৬ সনের জানুয়ারি হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত যে-বৈঠক হইবে, উহাই ১৯২৬ সনের নূতন নির্বাচনের পূর্বেকার শেষ বৈঠক, যাহাতে স্বরাজ্যদল যোগ দিতে পারিবেন। কাজেই ফেব্রুয়ারিতে বাহির হইয়া আসিলে শেষ কয় দিনের অধিবেশনে তাঁহাদের থাকা হয় না। সেই কাজটা কি তেমন সুবিধার হইবে? হাঁ, অবশ্য একেবারে ছাড়িয়া আসিলে আলাদা কথা।

যাহাই হউক, কংগ্রেস তো এই নির্দেশ দিলেন, ফলে প্রতিক্রিয়াত্মক সহযোগবাদীরা বলিলেন যে, আস্তে আস্তে একপ্রকার অসহযোগই আসিয়া কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতিতে প্রবেশ করিতেছে, ফলে তাহাদের কার্যক্রম চালু হইতেই পারিবে না। এইজন্য শ্রীজয়াকর, শ্রীকেলকর ও ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি কাউন্সিলে পদত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া গেলেন। উঁহারা প্রতিক্রিয়াত্মক সহযোগীদের একটি নূতন দল সৃষ্টি করিলেন। আমার নিজের তো

বরাবরই ধারণা যে, যদি কাউন্সিলে যাইতেই হয় তবে সেখানে গিয়া বিধান অনুসারে আমরা যতদূর করিতে পারি তাহা করিতেই হইবে। আমি এই বিরোধনীতি বুঝিতে পারি না। আমার মতে, স্বরাজ্যদল যখন কাউন্সিলে এসময়েও গেলেনই, তখন সেইখানে কাজ কিছু করিতেই হইবে, কেবলই বিরোধিতা করায় কি ফল? আমি এই বিরোধ-নীতির মূল্য কোনও দিনই বুঝিতে পারি নাই, তাছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেখানে যাওয়া অনর্থক, কারণ ১৯২০ সনের বিধান অনুযায়ী যে-অধিকার পাওয়া গিয়াছিল তাহা মোটেই সন্তোষপ্রদ হয় নাই। এই অবস্থায়ও ঐখানে যাওয়ার অর্থ দেশে বুদ্ধি-ভেদের সৃষ্টি করা ভিন্ন আর কিছু নয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও তাহার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে লোকের চিন্তাধারার মোড় ফিরাইয়া আনা এবং নিজেদের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই অসহযোগের উদ্দেশ্য ছিল। অসহযোগ দ্বারা লোকের মনে রচনাত্মক শক্তি জাগ্রত করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। আমার মতে তাই কাউন্সিলে যাওয়া আমাদের পক্ষে হিতকর নয়, তবে যদি যাওয়াই কেহ পছন্দ করে, তবে অল্প-বিস্তর যাহা লাভ করা যায় তাহা তো তাহার করাই চাই। স্বরাজীদের মতে, যদি কাউন্সিলে যাইবার জন্য কাহাকেও না পাওয়া যায়, কাউন্সিলের বাহিরে থাকিয়া অসহযোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না। অবশ্য ভিতরে থাকিয়াও একরকম অসহযোগ করা যায়, বিরোধিতা করিয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলিতে হয় যে আইনের ছ্যাকড়া-গাড়ী অচল হইয়া পড়ে। তাঁহারা সেই চেষ্টাও করিয়াছিলেন। বাংলা আর মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিত্ব চলিল না, স্বয়ং গভর্নরকে শাসনভার নিজের হাতে লইতে হইল। কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁহাদের ভোটাধিক্য না থাকিলেও অন্য কয়েক দলের লোককে নিজেদের দলে আনিয়া তাঁহারা বাজেট নামঞ্জুর করিয়া দিলেন; ভাইসরয়কে আপনার বিশেষ ক্ষমতার বলে বাজেট পাশ করিতে হইল। এইভাবে বিরোধিতা-নীতিদ্বারা যতদূর করা যায় তাঁহারা করিয়া দেখাইলেন, দেশের উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাবও জন্মিল।

যাহাই হউক, আমি কিন্তু কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী ছিলাম। এই অবস্থায় উঁহারা কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন তাহার বিচার আমার করা সাজে না। আমি ভাবিলাম, যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার ফয়সালা করিবেন। তাঁহাদের রায় অনুসারে কংগ্রেস এই বিষয়ে যে-নীতি অবলম্বন করিবে আমি তাহাই মানিয়া লইব এবং ঐ নীতির অনুসরণে আমার যত-টুকু সাধ্য সাহায্য করিব। মহাত্মাজী নিজেও সম্ভবত এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বরাজীদের খেয়ালমত কংগ্রেস যদি কাউন্সিল-বর্জন নীতি ত্যাগও করে তবু কংগ্রেস কাহাকেও কাউন্সিলের জন্য ভোট দিতে বা অন্যপ্রকারে সাহায্য দিতে বাধ্য করিতে

পারে না। আমি অবশ্য একটু বেশি গেলাম, আমার মনে হইল, কংগ্রেস যখন কাউন্সিলের কার্যপদ্ধতি নিজের হাতে লইয়াছে, তখন আমার নিজের মত যাহাই হউক, উহাদের কার্যক্রম (অর্থাৎ নির্বাচন) সফল করিবার জন্য আমাকে সহায়তা করিতেই হইবে। আমি সেই হিসাবে কাজও করিলাম। খুব দৌড়ধাপ করিয়া নির্বাচনের জন্য খাটিলাম।

কানপুর কংগ্রেসের সঙ্গে স্বদেশী মেলা হইয়াছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী সেবাদলের খুব ভাল সংগঠন ছিল। একদিন খবর রটিয়া গেল যে, কতকগুলি লোক কংগ্রেস শিবিরে আগুন লাগাইবে ঠিক করিয়াছে; ডাঃ হার্ডিকরের নেতৃত্বে সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকগণ এমন সুন্দর পাহারা দিল যে কোনও অঘটন ঘটিল না, বিনা উপদ্রবে, নির্ঝঞ্ঝাটে অধিবেশনের কাজ সমাপ্ত হইল। সেখানে আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। আজমীরকে কংগ্রেসের একটি প্রদেশ ধরা হইত, নিয়মমতে, অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আজমীরেরও প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ছিল। কিন্তু ঐ প্রদেশের নির্বাচনে কিছু গলদ থাকায় ওয়ার্কিং কমিটি ঐ নির্বাচন নামঞ্জুর করিয়া দেন, ফলে একদল লোক ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীঅর্জুনলাল শেঠীর নেতৃত্বে জোর-জবরদস্তিপূর্বক কংগ্রেসে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। হয় তাহারা ঢুকিবে, না হয়, অপর লোককেও ঢুকিতে দিবে না। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারেও ঐ সেবাদলকে সব দিক সামলাইতে হইয়াছিল।

কংগ্রেসে স্বতন্ত্র দল

সরকারের নিকট হইতে মার্চ মাসের মধ্যে যখন সন্তোষজনক উত্তর কিছু পাওয়া গেল না, পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারে তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস ঠিক করিলেন যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলি হইতে স্বরাজ্যদলকে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। একটি দিনও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। স্বরাজ্যদলের নেতা পণ্ডিত মতিলালজী অ্যাসেমব্লীতে একটি বিবৃতি দিলেন। তাহাতে এই সিদ্ধান্তের কারণগুলি প্রকাশ করিয়া ইহাকে সমর্থন করিলেন। অন্য প্রদেশের লোকেও একই রকম পন্থা নিলেন, কাউন্সিলে স্বরাজীদের জায়গা খালি পড়িয়া রহিল। আগেই স্থির হইয়াছিল, যাঁহারা ছাড়িয়া আসিবেন তাঁহারা বাহিরে আসিয়া গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন; কেহ কেহ তাহাই করিলেন, কিন্তু অনেকেই নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে লাগিলেন। এই বৎসরের শেষে নূতন নির্বাচন হইবার কথা

ছিল। ইতিমধ্যে কয়েকটি দুঃখের ব্যাপার ঘটিয়া গেল, এইখানে সেকথা বলা আবশ্যক।

কয়েক বৎসর যাবৎ হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুসভার পক্ষে, বিশেষত আর্যসমাজীদের পক্ষ হইতে—শুদ্ধি আর সংগঠনের কাজের দিকে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। অপরদিকে মুসলমানেরাও তবলীগ ও তঞ্জীমের আন্দোলন জারি করিয়াছিল। তিক্ততা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। কোহটের দাঙ্গার কথায় আগেই বলা হইয়াছে যে, গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীকে সেখানে যাইতে দেয় নাই। পরে মহাত্মাজী ও মৌলানা সৌকত আলী এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য রাওলপিণ্ডি গেলেন। তাহার বেশি যাওয়ার অনুমতি ছিল না, সুতরাং সেইখান হইতে যথাসম্ভব তদন্ত করিলেন। কয়েকটি বিষয়ে দুইজনে একমত হইতে পারিলেন না। পৃথক পৃথক রিপোর্ট ছাপা হইলে দেখা গেল, এতদিন ধরিয়া যে-দুইজন সম্পূর্ণ একমত অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন তাঁহাদেরও এই বিষয়টিতে মতের অনৈক্য হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মাজী নিজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিলেন, 'লোকে যেন না মনে করে যে, আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ ও ব্যবহারে কোনও পার্থক্য ঘটিয়াছে, বরং লোকের ইহাই বোঝা উচিত যে, ইঁহারা সব কথাতেই পরস্পরের মতে সায় দিয়া চলেন না, কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদের অবকাশও আছে।' কিন্তু ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে ভাবান্তর না ঘটিলেও দেশের উপর ইহার ফল ভাল হইল না। সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক মতভেদ তো ছিলই। মহাত্মাজী রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে একরকম পৃথক্‌ই হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়াছিল, কোনওমতে কানপুর কংগ্রেস পর্যন্ত কাজ চালাইয়া দিলেন। ইহার পর ডাক্তারদের কথামত এক বৎসর সবরমতী আশ্রমে থাকাই তিনি স্থির করিলেন। সেখানে তিনি খাদি আর আশ্রমের কাজ সুগঠিত করার কাজে লাগিয়া গেলেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন গান্ধীজী প্রাণে ব্যথা পাইয়া এই ভাবে পৃথক হইয়াছেন, তাঁহারা গান্ধীজীকে পুনরায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কথা ঠিক তাহা নয়, সবরমতীতে থাকিয়া কাজ করা তিনি দেশ ও নিজের স্বাস্থ্য দুই দিক হইতেই কল্যাণকর মনে করিয়াছিলেন, সেইজন্য নিজের সংকল্পে অটল রহিলেন।

এদিকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ খুব বাড়িয়া উঠিল। কলিকাতায় প্রচণ্ড এক দাঙ্গার ফলে বহু হিন্দু-মুসলমান মারা যায়। সপ্তাহ কয়েক ধরিয়া মারামারি চলিল। বকরীদের উপলক্ষে জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা বাধিল, ফলে খিলাফৎ কমিটির লোকেও বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের এক সভায় বেশ কড়া বক্তৃতা হইল, তাহারা ঠিক করিল, এখন হইতে

মুসলমানদের দাবী-দাওয়া রক্ষা করা, মুসলমানদের সংশিলষ্ট সব কিছু বিষয়ের ব্যবস্থা খিলাফৎ কমিটিকেই উদ্যোগী হইয়া করিতে হইবে। অপর দিকে হিন্দুদের মধ্যেও বিস্তর কটু ভাষণ ও লেখালেখি চলিতে লাগিল। আমাদের প্রদেশে আর একটা ব্যাপার হইল: পণ্ডিত মতিলালজী আর মৌলভী মহম্মদ শফীর মধ্যে মতান্তর। মৌলভী মহম্মদ শফী অ্যাসেমব্লীর পদত্যাগ করিয়াছিলেন, পরে কিন্তু স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়া পুনর্নির্বাচিত হন এবং স্বতন্ত্র হিসাবে কিছু বক্তৃতাদিও দিতে আরম্ভ করেন। আমাদের প্রদেশের আবহাওয়া বিগড়াইয়া গেল। মৌলানা মজহরুল হক্ খুব দুঃখ পাইলেন। তিনি বিহারের বিশিষ্ট কংগ্রেসী, খিলাফৎ কমিটির সদস্যগণ ও কয়েকজন স্বতন্ত্র লোককে আমন্ত্রণ করিয়া ছাপরায় ছোট একটা সম্মেলন আহ্বান করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া খুব খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা হইল। আমরা সকলে মিলিয়া ঠিক করিলাম যে, ব্যাপার যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহাকে এখন ছাড়া ঠিক নয়, আমাদের দ্বারা যতদূর সম্ভব, এই দূষিত আবহাওয়া যাহাতে আরও দূষিত না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা স্থির করিলাম সকলে মিলিয়া ইহার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিব। এই সভায় আর একবার আমি হক্ সাহেবের দেশপ্রেম এবং খাঁটি জাতীয়তার পরিচয় পাইলাম, বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমরা এমন এক নেতা পাইয়াছি যিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করিতে পারেন। জীবনের অনেকখানি সময়ই তিনি এইজন্য ব্যয় করিয়াছেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ইহাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। এই কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে হক্ সাহেব, মৌলভী মহম্মদ শফী, বাবু জগৎনারায়ণ লাল এবং আরও কয়েকটি বন্ধু সারা বিহার পরিভ্রমণে বাহির হইলেন।

ফল খুব ভালই হইল। দেশে এই বিষয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা হইতে লাগিল, আর হক্ সাহেবের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জটিল সমস্যাগুলি সহজ করিয়া বুঝাইবার জন্য খুব প্রচেষ্টা চলিতে থাকিল। বিহারের বায়ুমণ্ডল খানিকটা শান্ত হইয়া উঠিল। আর একটা ফল হইল যে, কিছুদিন বাদে কাউন্সিল ও অ্যাসেমব্লীর এই নির্বাচনের জন্য দেশ খুব গরম হইয়া উঠিল। নিজেদের পক্ষের প্রার্থীদের সমর্থন করিবার জন্য মালব্যজী এবং লালাজীও বিহার-সফরে আসিলেন, এদিকে পণ্ডিত মতিলালজী এবং অন্যান্য স্বরাজী নেতারাও কংগ্রেসী প্রার্থীদের সমর্থনের জন্য আসিয়া পেঁৗছিলেন। আমিও তো সাধ্যমত কাজ করিতেছিলাম।

এই উপলক্ষে আমি গেলাম ছোটনাগপুর। পুরুলিয়া হইতে রাঁচি মোটরে চলিয়াছি, গাড়ি খুব জোর ছুটিয়াছে, কারণ সেইদিন রাঁচিতে নির্বাচন-প্রার্থীদের দরখাস্তপত্র পরীক্ষা করা হইবে, কাজেই ঠিক সময়ে

পেঁাছান জরুরি দরকার। পথে কয়েকটা মহিষের গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাঁচিবার জন্য মোটরটিকে ঘুরিতে হইল। খুব কষ্টে পাশ কাটাইয়া গাড়িটি একটি গাছে গিয়া ধাক্কা খাইল। আমার মাথায় ও নাকে খুব চোট লাগিল; অন্যদেরও কিছু কিছু আঘাত লাগিয়াছিল। গাড়িটির কয়েকটা অংশ খুলিয়া গেল। যাহা হউক, কোনওক্রমে খানিক দেরিতে আমরা রাঁচি পেঁাছিলাম, কারণ ব্যাপারটা রাঁচির কাছাকাছি ঘটিয়াছিল। সেইখানে তো আমার মনে হয় নাই যে, আমার এমন বেশি কিছু লাগিয়াছে। ডাক্তার পট্টি বাঁধিয়া দিলেন, আমি ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলাম। রাঁচি হইতে গেলাম উত্তর-বিহারে। বেগুসরাই, সমস্তিপুর ইত্যাদি হইয়া আমি মজঃফরপুর জেলায় গেলাম। ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে সীতামারি পেঁাছিয়া আমি মাথায় খুব যন্ত্রণা বোধ করিলাম। প্রথমে মনে হইল বেশি ক্লান্তিতে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ব্যথা করিতেছে, কিছু ওষুধপত্র খাইয়া ফের চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আমার পাটনায় ফেরার কথা, পাটনায় পেঁাছিতে পেঁাছিতে ব্যথা খুব বাড়িয়া গেল, কয়েকদিন পর্যন্ত বড়ই কষ্ট পাইলাম। ডাক্তাররাও বুঝিতে পারেন না কিসের ব্যথা। দিন দুই তিন পরে সারা মুখ যেন ফুলিয়া গেল, তখন বোঝা গেল যে, ইহা সেই দুর্ঘটনারই ফল। এই অসুখের জন্য আমার আর যে সব জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল তাহা হইল না। এই নির্বাচনে অনেক মিথ্যা প্রচার হইয়া গেল। কোথাও কোথাও পণ্ডিত মতিলালজীর উপর জনতা খোলাখুলি ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিল। কোথাও ব্যঙ্গচিত্র দেখান হইল। আমরা এই সবের তীব্র প্রতিবাদ করিলাম, ফলে, অধিকাংশ জায়গা হইতেই কংগ্রেসী প্রার্থীরা নির্বাচিত হইলেন। স্বতন্ত্র দলের খুব কম লোকই নির্বাচিত হইলেন। নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন জগৎনারায়ণ বাবু আর নন্দনপ্রসাদ-নারায়ণ বাবু। আগেকার বিহার-কাউন্সিলের স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীজলেশ্বর-প্রসাদ, যিনি কংগ্রেসের পক্ষের প্রার্থী ছিলেন, তাঁহাকেই হারাইয়া ইঁহারা নির্বাচিত হন। লোকের বলা-কওয়া আর জেদাজেদির ফলে হক্ সাহেব দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সমান ভোট পাইলেন। তখন লটারি করা হইল, তাহাতেও প্রতিদ্বন্দ্বীরই জয় হইল। এইভাবে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যদিও কংগ্রেসীরাই বেশি ভোট পাইল, তবু হক্ সাহেবের মত লোক এবং আরও কয়েকজন, যাঁহারা স্বরাজ্যদলের কাজ খুব ভাল ভাবে চালাইয়াছিলেন, তাঁহারা নির্বাচিত হইলেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বোঝা গেল যে, কংগ্রেসীরা সংখ্যায় বেশি থাকিলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতেই কংগ্রেস-বিরোধী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা চলিবে, কেন না নিয়মানুযায়ী গভর্নমেণ্ট-মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা তো কম নয়। কংগ্রেসবিরোধী প্রতিনিধি আর এই মনো-

নীত সদস্যগণ মিলিত হইলেন কংগ্রেসী দলের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশি। কেন্দ্রীয় পরিষদে কিন্তু আমাদের বেশ ভাল ফল হইয়াছিল। যে দুই-একটি আসন আমাদের হাতে আসে নাই তাহাতেও কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকই নির্বাচিত ছিলেন। বিহার-কাউন্সিলে স্বতন্ত্র নির্বাচিত কেহ কেহ কংগ্রেসের সঙ্গেই থাকিতেন। স্বতন্ত্র কংগ্রেসদলের কেহ কেহ কংগ্রেসের সঙ্গে, কয়েকজন মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিলেন। কাজেই, এই নির্বাচনে কোনও কথাই পরিষ্কার হইল না। মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে কংগ্রেসের আগে যে সদ্ভাব ছিল, এখন তাহা রহিল না, কারণ এইবারকার নির্বাচনে আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। এইবার তাঁহারা যখন পুনরায় মন্ত্রিত্ব পাইলেন, আর কংগ্রেসীদের প্রধান কাজই হইল তাঁহাদের বিরোধিতা করা, তখন এই অবনিবনাও আরও বাড়িয়া গেল। মন্ত্রী স্যর গণেশ দত্ত সিংহ তো কংগ্রেসের প্রার্থীর ভয়ে একাধিক জায়গা হইতে দাঁড়াইলেন। কিন্তু কোথাও নিজের জায়গা সুরক্ষিত না দেখিয়া তিনি করিলেন কি, কংগ্রেস যেখানে কোনও প্রার্থী দাঁড় করায় নাই, এমন জায়গায় আপোসে এক প্রার্থী দাঁড় করাইয়া নির্বিরোধে সেখান হইতে নির্বাচিত হইয়া গেলেন। এই নির্বাচনের সময় জাতিগত আর ধর্মগত ভেদবুদ্ধি প্রচার করিয়া কতক লোকে নিজের নিজের কাজ হাসিল করিল। কংগ্রেসীরাও অনেকে ঐ ভেদবুদ্ধি হইতে নিজেদের বাঁচাইতে পারেন নাই।

আমার আগেই ধারণা ছিল, এইবার তাহা আরও দৃঢ় হইল যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই যে ভেদভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে, ইহার ফল শেষ পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, হিন্দুর মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি আছে, ক্রমে তাহারাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ শুরু করিবে, মুসলমানের মধ্যেও বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইবে। শিক্ষিতদের ঝগড়া সরকারি চাকুরি বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লইয়া। কোনও না কোনও সময়ে হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই দুরাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে, আর নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করিবে। এই নির্বাচনের সময়েই তাহার কিছু নমুনা দেখা গেল। 'দেশ'-এ আমি এই বিষয়ে কিছু লিখি; কিন্তু অনেকের তাহা পছন্দ হইল না। সেই হইতে আজ পর্যন্ত সব ব্যাপারে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে আমরা যদি দেশের আসনে জাতি ধর্ম বা দলবিশেষকে বসাইতে চাই তবে এই রকম বিবাদ বিসম্বাদ না হইয়া যায় না। দেশসেবকের একই পন্থা; বিশেষত যতদিন দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা না-পায় ততদিন পর্যন্ত দেশসেবক স্থান, পদ বা প্রতিষ্ঠা কিছুর জন্যই লালায়িত হইবে না, দেশসেবাকেই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করিয়া কাজ করিয়া যাইবে। যখন কেহ বলে, দেশের সেবার

জন্যই পদ-বিশেষের প্রয়োজন, ঐ বিশেষপদ না-পাইলে কাজ করা চলিবে না, আমার মনে হয় ইহা প্রবঞ্চনা। সেবকের জন্য স্থান চিরদিন খালি পড়িয়াই আছে। প্রার্থীদের ভীড় সেবার জন্য হয় না, সেবাকার্যের ফলের ঘাঁটোয়ারার জন্য ভীড় লাগিয়া থাকে! সেবার ফল নয়, শুধু সেবাই যাহার ধ্যানের বস্তু, তাহার এই ধারণার মধ্যে যাওয়ার বা এই সব ঝামেলার মধ্যে পড়ারও, দরকার নাই।

বর্ষশেষে, ডিসেম্বর মাসে গৌহাটিতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবার কথা। সভাপতিত্বের জন্য বহু জায়গা হইতে মৌলানা মজহরুল হকের নাম করা হইয়াছিল। বিহারের লোকের একান্ত ইচ্ছা তিনি নির্বাচিত হন, বিহার হইতে আর কাহারও নামই পাঠান হয় নাই। কিন্তু শেষ নির্বাচনের আগেই তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই প্রতিষ্ঠা চাহেন না, লোকে যেন অপর কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে বাছিয়া লয়। এই অস্বীকারের তিনি যে কারণ দেখান, তাহা তাঁহার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরই উপযুক্ত। তিনি বলেন, সম্প্রতি তিনি নিজের প্রদেশে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মীমাংসার কাজে ব্যাপৃত, কংগ্রেসের সভাপতি হইলে এই কাজে ততটা সময় দিতে পারিবেন না। আমাদের অনেকেরই মনে হইল, কাজটা ঠিক হইল না, কিন্তু ইহার মধ্যে অন্যের কথা বলা তো চলে না। তিনি সরিয়া দাঁড়াইলে পর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় সর্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত হইলেন; কারণ ডাঃ আনসারিও আগেই নিজের নাম প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছিলেন।

ভাইসাহেব আর আমি দুইজনেই সপরিবারে কানপুর কংগ্রেসে গিয়া-ছিলাম, সেইখানেই মীরা বেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ইহার কিছুদিন আগেই তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই সময় হইতেই তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আমার অন্তরে মুদ্রিত হইয়া যায়। ইনি এক ইংরেজ অ্যাডমিরালের মেয়ে। তাঁহার পিতা ভারতবর্ষে নৌসেনাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ইনিও আগে বোম্বাইয়ে ছিলেন। এইরকম একটি মহিলার মহাত্মাজীর আশ্রমে আসা এবং আশ্রমবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া থাকা কি ইংরেজের ভাল লাগিতে পারে? ইংরেজি কোনও কোনও কাগজ লিখিতে লাগিল যে, গান্ধীজী কৌশলে ইঁহাকে ফুসলাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কথাটা তো ঠিক নয়, তাই মীরা বেন ইহার প্রতিবাদ করেন। ব্যাপারটা এই, জার্মান যুদ্ধের সময় যুদ্ধের হানাহানিতে ক্ষুব্ধ হইয়া ইনি রোমাঁ রোলাঁর কাছে যান—এই ভীষণ জীবন হইতে মানুষের বাঁচিবার পথ কি, তাহার অনুসন্ধানে। রোলাঁ তাঁহাকে গান্ধীজীর পুস্তকাদি পড়িতে দেন আর বলেন যে, একমাত্র গান্ধীজীই তাঁহার পিপাসা মিটাইতে পারিবেন।

গান্ধীজীর লেখা বই যতদূর পাওয়া গেল মীরা বেন পড়িয়া ফেলিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়তর হইল। তিনি গান্ধীজীর কাছে আসিতে চাহিলেন। গান্ধীজী কিন্তু নিষেধ করিলেন। বিলাতে থাকিয়াই তিনি যথাসাধ্য আশ্রমজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পরে খুব পীড়াপীড়ি করায় গান্ধীজী তাঁহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। তখন হইতে তিনি বরাবর গান্ধীজীর সঙ্গী, নিজের যাহা কিছু ছিল সবই গান্ধীজীকে সমর্পণ করিয়াছেন।

কানপুর হইতে আমি কায়স্থ-কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবার জন্য জৌনপুর গেলাম। এই প্রসঙ্গে আগেই কথা হইয়াছে। বন্ধুরা কেহ কেহ ইহা অপছন্দ করিলেন। তাঁহাদের মতে, কংগ্রেসীদের কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা সংগত নয়, তাহাতে কংগ্রেসের জাতীয়তাকে আঘাত করা হয় আর লোকের মনে ভেদবুদ্ধি জাগার সম্ভাবনা থাকে। আমি অবশ্য কোনও জাতি-বিশেষের উন্নতি বা অধিকার রক্ষার জন্য সভাপতি হই নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমাদের কায়স্থ-সমাজে বহুতর কুপ্রথা প্রচলিত আছে, যদি আমাদের সমাজ বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানে মিলিত হইয়া সেইসব কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা করে, তবে মন্দ কি? সভাপতির মঞ্চ হইতে আমি যে অভিভাষণ দিই তাহাতে জাতীয়তা-বিরোধী একটি কথাও ছিল না, জাতিতে জাতিতে বিভেদ বাড়াইতে পারে এমন কথাও ছিল না, বরং তাহাতে জাতীয়তারই সমর্থন ছিল। কনফারেন্সে অন্য জাতির লোকেও নিমন্ত্রিত ছিলেন; তাঁহাদের মতে, জাতীয় সম্মেলনগুলিতে যদি এই ধরনের বক্তৃতা হয় তবে তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিই হয় না।

কায়স্থ-কনফারেন্স একটি পুরানো প্রতিষ্ঠান, ইহার মধ্যে অনেক প্রবীণ ও কর্মকুশল সেবক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমি তো একজন নগণ্য ব্যক্তি, আর আমার সেই প্রথম কায়স্থ-সম্মেলনে যোগ দেওয়া। প্রাচীনপন্থীদের কাহারও কাহারও আমার ভাষণ পছন্দ হয় নাই। সম্মেলনের কাজকর্ম কাহারও কাহারও অপছন্দ হইল, কিন্তু তবু মোটামুটি সম্মেলন ভালভাবেই শেষ হইল। তবে আমার আফ্‌শোষ এই যে যতটা আশা আর অভিলাষ লইয়া উহাতে যোগ দিয়াছিলাম তাহা খুব বেশি পূর্ণ হয় নাই। দোষ অপরের উপর না-চাপাইয়া নিজের ঘাড়েই লইতে চাই, কারণ নানা কাজে ভিড়িয়া যাওয়ায় আমি এই কাজে পুরাপুরি শক্তি নিয়োগ করিতেও পারি নাই।

তখনকার দিনে আমার বেশির ভাগ সময়ই যাইত খাদির কাজ দেখাশোনা করিতে আর বিহার-বিদ্যাপীঠের খরচের জন্য টাকা জোগাড় করিতে। আমরা গোড়াতেই দেখিয়াছিলাম, বহু বন্ধুবান্ধবই বিহার-বিদ্যাপীঠের প্রতি উদাসীন, কেহ কেহ ইহাকে উপেক্ষার চোখে দেখিতেন। ১৯২১ সনেই এই ভাবটা অল্প অল্প ফুটিয়া উঠিল, আর সবচেয়ে দুঃখ ও আশ্চর্যের কথা যে, যাঁহারা উৎসাহ করিয়া বিদ্যাপীঠ খুলিয়াছিলেন তাঁহারাই হয় উদাসীন নয় বিরোধী হইয়া উঠিলেন। প্রথমে এক ভাড়া-বাড়িতে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, মাসে প্রায় দুই শ' টাকা ভাড়া লাগিত। আমার মনে হইল, খরচ যথাসাধ্য কম করিতে হইবে। ঠিক করিলাম যে, মজহর্-উল্-হক্ সাহেব তো সদাকত আশ্রমটি খুলিয়াই রাখিয়াছিলেন আর তাহাতে কয়েকখানা ঘরও তৈয়ারি করিয়া লইয়াছিলেন, সেইখানেই এই বিদ্যাপীঠকে লইয়া যাওয়া হউক। কথাটা হক্ সাহেবের খুবই ভাল লাগিল। আমরা বিদ্যাপীঠ ঐখানে লইয়া গেলাম, কয়েকটি নূতন বাড়ি তৈয়ারি করা হইল। প্রায় সব ছাত্র ও বেশির ভাগ শিক্ষকই সেখানে থাকিতে লাগিলেন। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা কম হইয়া আসিল, জেলায় জেলায় যে-সব স্কুল খোলা হইয়াছিল স্থানে স্থানে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল, লোকের উৎসাহ ক্রমে কম হইতে থাকায় অর্থাভাব ও ছাত্রাভাবে সব বন্ধ হইয়া গেল। তবু ১৯১৬ সনের মার্চ মাসে ৯টি উচ্চ, ১৬টি মধ্য আর ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা ছিল, তাহাদের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৭১৭, ১,২৮৫ আর ১,০১৯ এবং শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯, ৭০ আর ৩৪ ছিল। মাসিক খরচ যথাক্রমে ১৯৫০৲, ১২৬০৲ আর ৪২৬৲ টাকা, অর্থাৎ ৫৫টি স্কুলে ১৮৩জন শিক্ষক কাজ করিত এবং তাহাদের মাসিক ব্যয় হইত ৩৬৩৬৲ টাকা। যাহা হউক, কয়েকটি স্কুল সব রকম বাধা বিপর্যয়ের মধ্যেও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে। আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম যে, বিদ্যাপীঠকে স্থায়ী করিতেই হইবে। সেইজন্য যখন তখন ইহার খরচের টাকা জোগাড় করিতে হইত।

আমি মহারাষ্ট্রে দেখিয়াছিলাম, অনেক প্রতিষ্ঠান লোকে বার্ষিক চাঁদায় চালায়, আর চাঁদাও একজন কেহ খুব বেশি দেয় না, অনেকে ৫।১০ টাকা বা ইহারও কম দেয়। সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট ভি. পি. ডাকে সভ্যদের কাছে পাঠান হয়, আর দিনকয়েকের মধ্যেই ভি. পি. মারফৎ সকলের চাঁদা আসিয়া যায়। আমিও এইরকম কিছু করিবার কল্পনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া

বার্ষিক পাঁচ টাকা চাঁদার সভ্য জোগাড় করিলাম। যাঁহারা থোক কিছু বেশি টাকা দিলেন তাঁহারা আজীবন সদস্য বা ট্রাষ্টী হইলেন। কিন্তু আমাদের প্রদেশে এইরকম নিয়মিত বার্ষিক চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস লোকের নাই। যাঁহারা কথা দিয়াছিলেন, সভ্য হইবার ফরম সই করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বৎসরান্তে বড়ই কষ্টে চাঁদাটা দিলেন, তাহাও আবার দুই এক বৎসর পরেই বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন তো সম্ভব নয় যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বৎসর বৎসর প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায়ের জন্য মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি যাইবেন। এইজন্য আমাদের ক্ষেত্রে এই উপায় খাটিল না। আর, ঘুরিয়া ফিরিয়া যেখানেই যাইতাম আমাকে সর্বদাই কিছু টাকা জোগাড় করিতে হইত। অবশ্য পাটনায় জনকয়েক সদাশয় ব্যক্তি মাসিক কিছু দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বরাবর চাঁদাটা দিয়া আসিতেছেন। গোড়ায়ই এক বন্ধু (শ্রীভগবান দাস) কিছু জমি দান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রতি বৎসর অল্পবিস্তর আয় হইত। কিছু-দিন বাদে মজঃফরপুরের শ্রীগঙ্গাধর প্রসাদ শাহু নিজের ট্রাষ্ট হইতে বিদ্যাপীঠকে কিছু দিয়াছিলেন, তাহা বরাবর পাওয়া যাইত। বিদ্যাপীঠে টাকার টানাটানি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত।

আমি ঠিক করিলাম বিশিষ্ট পণ্ডিতদের বিদ্যাপীঠে ডাকিয়া আনিব, তাঁহারা এই শিক্ষার উপযোগিতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলিবেন, তাহাতে যদি ইহার প্রতি লোকের আস্থা জন্মে। কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীরামদাস গৌড় মহাশয় আসিলেন। বাংলাদেশ হইতেও ইউনিভারসিটির পরীক্ষায় খুব ভালরকম পাশকরা কয়েকজন অধ্যাপক লইয়া গেলাম। কিছুদিন পরে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ, খ্যাতনামা শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারও আমাদের বিদ্যাপীঠের ইতিহাসের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার সেই যে পরিচয় হইল তাহা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে। ইহারই ফলে ভারতীয় ইতিহাস-পরিষদের জন্ম। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও ছাত্রসংখ্যা কমই হইতে লাগিল। আমরা পাঠক্রমেও কিছু অদলবদল করিলাম, চেষ্টা করিলাম যাহাতে বিদ্যার্থীরা কেবল বইয়ের শিক্ষা না-পাইয়া হাতে কলমে কাজ শিখিয়া অধিকতর কার্যকুশল দেশকর্মী হইতে পারে। কিন্তু সব-কিছু করার পরেও জাতীয় শিক্ষা সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল। অবশ্য যতদিন ছিল, আমাদের বিদ্যার্থী ও শিক্ষকগণ ভালো দেশ-সেবক হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। সত্যাগ্রহের সময় বরাবর ইঁহারা ভাল কাজ করিয়াছেন।

১৯১৬ সনের মার্চ মাসে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে আমরা শ্রীরাজা-গোপালাচারি মহাশয়কে দীক্ষান্ত অভিভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলাম। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয় আমাদের উৎসাহের জ্যোতি-

শিখাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে—কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সমাবর্তন উৎসবে খুব উৎসাহের সঞ্চার হইল, তাঁহার অভিভাষণটি খুব জোরালো হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই উহার ভুরি-ভুরি প্রশংসা করেন। বিদ্যা-পীঠ আর উহার ছাত্রদের সরলতার সহিত ইউনিভারসিটির সমাবর্তন-অনুষ্ঠানের আয়োজন আড়ম্বরের তুলনা করিয়া, সকলেই এই রকম ছোট প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা স্বীকার করিলেন।

আগেই বলিয়াছি, বিদ্যাপীঠ অপেক্ষাও খাদির কাযেই আমার বেশি সময় দিতে হইত। খাদির কার্যের শুরু হইতেই উহাতে আমার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল, কিন্তু এই সময়টায় আমি যতক্ষণ খাদির কাজে লাগিয়া থাকিতাম তত আর কোন সময় পারি নাই, না আগে, না পরে। বিহারে খদ্দরের কাজ আরম্ভ হয় ১৯২১ সনে, যখন স্বরাজ্য-ফন্ড হইতে বিহার প্রাদেশিক কমিটি খাদি-প্রচারের জন্য বেশ মোটারকম একটা টাকা পাইয়া-ছিল। প্রাদেশিক কমিটিই শুরু হইতে এই কাজটি চালাইবার ভার লইয়া-ছিল। উহারই পক্ষ হইতে কয়েক জেলায় কাজ চালাইবার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়। না প্রাদেশিক কমিটির না সেই লোকদের, কাহারও এই বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না বলিয়া তেমন ভাল ফল পাওয়া যায় নাই।

কংগ্রেসের কর্মী শ্রীরামবিনোদ সিংহ স্বতন্ত্রভাবে এই কাজ আরম্ভ করেন। ইনি আচার্য কৃপালানীর সহায়তা পান। মধুবনীতে একটি উৎপত্তি-কেন্দ্র খুলিয়া খুব সুন্দর খাদি তৈয়ার করিতে থাকেন। এই খাদি বিভিন্ন প্রদেশ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। খাদি সংক্রান্ত কাজে মধুবনী বিহারের নাম উঁচু করিয়া তুলিল। আচার্য কৃপালানীর সুপারিশ আর আমার অনুমতিক্রমে খাদির কাজ বাড়াইবার জন্য ইহারা খাদি বোর্ড হইতে মোটা টাকা ধার পাইল। প্রাদেশিক কমিটির কাজ তত সফল হয় নাই, তাহার কারণ, ইহারা খুব ছড়াইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের খাদি-জ্ঞান বা ব্যবহারিক বুদ্ধি কোনটাই বেশি ছিল না। সেইজন্য ইহাদের বিস্তর লোকসান পড়িতে লাগিল। যখন নিখিল ভারতীয় চরখা-সংঘ স্থাপিত হইল এবং আমি 'এজেন্ট', আর লক্ষ্মীনারায়ণবাবু 'মন্ত্রী' হইলেন, তখন নূতন পন্থায় সমগ্র কাজটার পুনর্গঠন করা হইল। অনেকগুলি খাদি-ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, যেগুলিতে লোকসান না-করিয়া কাজ হইতে পারে, কেবল সেগুলিই বজায় রহিল। কংগ্রেসকর্মীরা অনেকে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। খাদির কাজে যাহারা আসিল তাহাদের খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে একচিত্ত হইয়া এই কাজেই আত্মনিয়োগ করার জন্য জোর দেওয়া হইল। ফলে কাজের ব্যবস্থা অনেক শুধরাইয়া উঠিল আর খাদির উৎপত্তি ও বিক্রি বাড়িতে লাগিল।

তখনকার দিনে আমি সবগুলি কেন্দ্রেই বছরে একবার যাইতাম।

একদিন দুইদিন সেইখানে থাকিয়া কাজ দেখাশোনা করিতাম। আর ভাণ্ডারে যেখানে সুতা কেনা আর তুলা বেচা হইত সেইখানে নিজেও অনেক সময় বসিতাম। নিজের হাতে কাপড় তুলা সুতা ওজন করিতাম, কেনাবেচা করিতাম। কাপড় বোনাও গিয়া দেখিতাম আর দাম ফেলার সময় যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম। ইহাতে আমার অনেক কিছু শেখা হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ অনুভব করিলাম যে, এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কত কম। আরও বুঝিলাম যে, এই অজ্ঞতাই কাজের লোকসানের অন্যতম প্রধান কারণ। আমরা খরচপত্রের আনুমানিক হিসাব যা ধরিতাম, চরখা-সংঘের মন্ত্রী শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কার এবং তাঁহার অফিসের লোকেরা তাহা অনেকরকম তদন্ত-তদারক করিয়া মঞ্জুর করিতেন, তবু কোন কোন বারে ঘাটতি পড়িয়া যাইত।

সেই সময় আমাদের সকলেরই খাদি-প্রচারের জন্য ব্যগ্রতা ছিল। নিখিল ভারতীয় চরখা-সংঘের মতে, যত সস্তায় খাদি উৎপন্ন করিয়া বিক্রি করা যাইবে ততই মঙ্গল। সেইজন্য শস্তার পর শস্তার দামে সুতা কেনা, যত কম সম্ভব বুনানি দিয়া কাপড় বুনান আর খুব কম খরচে তাহা বিক্রি করার জন্যই চেষ্টা ছিল। ফলে কর্মীর অভাব হইল, আর অযোগ্যতার দরুণ দোকানে বিক্রি ঠিকমত হইল না। জিনিষের হিসাব ঠিক থাকিত না, আর উৎপাদন-কেন্দ্রের অবস্থা কখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইত না। সেইজন্য দেখাশোনা করা খুব দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য আমাকে এই কথা বলিতেই হইবে যে, যতগুলি খাদি-কেন্দ্র ছিল তাহাদের মধ্যে বিহারের খাদি ছিল খুবই শস্তা আর সুন্দর। মিহি খদ্দরের জন্য নাম ছিল অন্ধ্র দেশের। বিহারের 'কোকটী' সর্বত্র চালান যাইত আর তাহাতে বিহারের খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। রঙ-করা, ছাপান প্রভৃতি কাজও আরম্ভ করা হইয়াছিল। রঙ-বেরঙ-এর খাদি এখন পাওয়া সম্ভব হইল, কিন্তু তবু আমার আশানুরূপ পাকাপাকি ব্যবস্থা এখনো করা যায় নাই।

কাজ আরম্ভের সময়ে খাদি বিভাগের দপ্তর ও প্রধান ভাণ্ডার পাটনায় ছিল। খাদি বেশির ভাগ দারভাঙ্গা জেলায় তৈয়ার হইত, কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার ছিল পাটনায়। তাহাতে বিস্তর অসুবিধা ছিল, কিন্তু আমরা সকলেই থাকিতাম পাটনায়, সেইজন্য কেন্দ্র-ভাণ্ডার আর দপ্তর সরাইয়া লওয়ার ইচ্ছা কাহারও হইত না। লক্ষ্মীবাবু মন্ত্রী হওয়ার পর যখন কাজ বাড়াইবার প্রস্তাব হইল, তখন ঠিক হইল যে, কারবার পাটনা হইতে উঠাইয়া মজঃফরপুরে লইয়া যাওয়া হইবে। পাটনার বন্ধুরা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া আমি সায় দিয়া দিলাম। মজঃফরপুরে, অখাড়া-ঘাটে, গণ্ডকী নদীর ধারে কিছু কাপড় তৈয়ারি হইত, কর্মীরা সেখানে থাকিয়া

রঙ-করা ইত্যাদি কাজ করিতে লাগিলেন। ভারি সুন্দর জায়গা, আমি মাঝে মাঝে গিয়া সেখানে থাকিতাম। মাল রাখিবার গুদাম আর প্রধান ভাণ্ডার ছিল সহরে, সরৈয়াগঞ্জের এক ভাড়াটে বাড়িতে। এখন হইতে কাজ খুব বাড়িয়া গেল। কিছুদিন পরে আমি দেখিলাম, এই বন্দোবস্তও ঠিক হয় নাই; কারণ প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল দারভাঙ্গা জেলায়, সেখান হইতে কাপড় বুনাইয়া মজঃফরপুরে লইয়া আসিতে হইত; ধোলাই-করা, রঙ-করা, ছাপান সব হইত মজঃফরপুরে। তারপর বিক্রির জন্য বিভিন্ন ভাণ্ডারে পাঠাইতে হইত। ইহাতে খরচ বেশি পড়িয়া যাইত। সেইজন্য আমরা ঠিক করিলাম প্রধান ভাণ্ডার মধুবনীতেই (দারভাঙ্গা জেলায়) নেওয়া হউক। রামবিনোদবাবুর ভাণ্ডার আগে হইতে সেখানে ছিল বলিয়া চরখা-সংঘের কাজ সেখানে বেশি না করিয়া পণ্ডৌলে বেশি করা হইত, যেন দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেষারেষি না হয়, দুই দলই স্বতন্ত্রভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু দিনকতক পরে রামবিনোদবাবু আর শ্রীধ্বজা প্রসাদ ও রামদেব ঠাকুর প্রভৃতি সহকর্মীদের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটে, চরখা-সংঘের তুলনায় কাজও কম হইতে লাগিল। এইজন্যও আমাদের মধুবনী যাওয়ার সুবিধা হইল। এক তো সেখানে খুব বড় কেন্দ্র করা যাইবে, দ্বিতীয়, অন্য সব কেন্দ্র হইতে কর্মীদের এখানে আসা-যাওয়ার সুবিধা আছে, তৃতীয়, এখানে রেল, তার, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সব কিছুর সুবিধা আছে। এইসব কারণে আমাদের দপ্তর ও কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার মধুবনী লইয়া যাওয়া হইল, আস্তে আস্তে সেখানে চরখা-সংঘের নিজের বাড়ি তৈয়ারি হইল। আজ তো উহা একটি দেখিবার মত জায়গা। ইহাতে না জানি কত বৎসর লাগিয়াছিল, কিন্তু আমি এক জায়গায়ই কথাপ্রসঙ্গে ইহার সব ইতিহাস লিখিয়া দেওয়া ঠিক মনে করিলাম।

১৯২৬ সনে খাদি-সম্বন্ধে আমার প্রধান কাজ ছিল স্থানে স্থানে খাদি-প্রদর্শনী করা। আমার চেষ্টা ছিল খাদির প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যেই পাটনার প্রদর্শনীর উদ্যোগ, যাহার কথা আমি আগে বলিয়াছি। ১৯২৬-এর প্রদর্শনীতেও ইহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি, ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীয়েরাও ইহাতে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। চম্পারন জেলার বেতিয়ার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বেতিয়ার রাজার তখনকার ম্যানেজার মিঃ এইচ. সি. প্রায়র, আই-সি-এস। মিঃ রুদারফোর্ড চলিয়া গেলে পর ইনিই ম্যানেজার হন। মতিহারীর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন রেভারেণ্ড জে. জেড. হাউস। ইনি একজন বিখ্যাত পাদরী, গান্ধীজী এবং আমি আগে হইতেই ইঁহাকে চিনিতাম। জামসেদ-পুরেও একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয়। অত বড় কারখানাওয়ালা শহর,

যেখানে দিনরাত চিমনীগুলি ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করিতেছে, যেখানে গলিত লোহা নদীর ঝরণার মত অনবরত বহিয়া চলিয়াছে, যেখানে লোহার বড় বড় পাত আটার রুটির মত সর্বদা বেলা হইতেছে, আর যেখানে বেলুনের কাজ করে পাথর বা লম্বা রেল-লাইন, তেমন যে প্রকাণ্ড শহর, সেখানে তক্‌লি আর চরখার প্রদর্শনী এক তাজ্জব ব্যাপার! ইহার আয়োজন করাই সাহসের কথা। তারপর ঐ বিশাল কারখানার অফিসারদের এই ছোট কলের কেরামতি দেখান তো আরও দুঃসাহসের কথা। কিন্তু আমরা তাহাই করিলাম। টাটা কোম্পানীর বড় অফিসার মিঃ টেম্পল্‌, তিনি স্বয়ং ইঞ্জিনীয়ার আর জামসেদপুর শহরের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন; তাঁহাকেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করা হইল। সুখের বিষয় তিনি রাজীও হইলেন এবং খাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতাও করিলেন। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কীলন আর তাঁহার স্ত্রী (দুইজনেই আমেরিকাবাসী) এই প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন। দুই জনই কিছু খাদি কিনিলেন। খাদির বিক্রি খুব ভাল হইয়াছিল, কোম্পানির প্রায় সব বড় বড় অফিসাররাই প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন। লোকের আগ্রহে শহরের অন্য এক মহল্লায় প্রদর্শনীটি খোলা হয়। সেই বৎসর বিহারের প্রায় সব বড় বড় শহরে প্রদর্শনী করা হয় আর সর্বত্রই স্থানীয় নামজাদা লোকের দ্বারা উদ্বোধনাদি করা হইত। দুই এক জায়গায় আমিও উদ্বোধন করিয়াছি। এই সব প্রদর্শনীতে কেবল যে খাদি-সম্বন্ধে প্রচার করা হইত তাহা নয়, যথেষ্ট খাদি বিক্রয়ও হইত। নূতন যে কাপড় বোনা হইয়াছিল এই সব প্রদর্শনীর দ্বারা তাহা চালু করিবার খুব সুবিধা হইত। ১৯২৫ সনে গান্ধীজী বিহারের নানা জেলায় যে সফর করেন তাহাতে খাদি আর দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য টাকা তুলিয়াছিলেন, বিহার হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়াছিল। এই টাকাটা মূলধনের মধ্যে জমা দিয়া কাজ খুব বাড়ান হইয়াছিল।

কিন্তু মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ থাকিতেছিল। রক্তের চাপ খুব বাড়িয়া যাইত। গরমের সময় তিনি মহীশূর রাজ্যের নন্দী পাহাড়ে বিশ্রামের জন্য গেলেন, আমিও সেখানে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে কয়েকদিন ছিলাম, জায়গাটি ভারি সুন্দর। পাহাড়ে ওঠা পরিশ্রমের কাজ, তবে তখন পর্যন্ত আমার হাঁপানি এত বেশি হয় নাই, গ্রীষ্মকালে তো প্রায়ই ভাল থাকিতাম। সেইজন্য আমি পায়ে হাঁটিয়াই পাহাড় ওঠানামা করিতাম। ঐ প্রদেশে আমার সেই প্রথম যাওয়া, ঐখান হইতে মহাত্মাজীর সঙ্গে বাঙ্গালোর গিয়া কয়েকদিন ছিলাম। সেইখানে খাদির এক বিরাট প্রদর্শনী হয়—তামিলনাড. ও অন্ধ্রদেশের শাখাই ইহাতে বিশেষভাবে যোগ দেয়। খুব সুন্দর মেলা হইয়াছিল। উহা হইতেই মহীশূর রাজ্যে সংগঠিত-

ভাবে খাদির কাজ আরম্ভ হয়। সেই সূত্রে খাদি-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলির প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে খাদি-সম্বন্ধে বক্তৃতাদিও হয়।

দক্ষিণে হিন্দী-প্রচারের কাজও কিছু কিছু হইতেছিল। সেখানে একটি সম্মেলন ডাকিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ কয়েকটি বিদ্যার্থীকে প্রমাণ-পত্র দেওয়া হয়। সেই প্রথম আমি হিন্দী-সম্বন্ধে এত উৎসাহের পরিচয় পাইলাম। একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ আর বাপ-ছেলে হিন্দী শেখার জন্য আসিয়া জুটিত, একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে বসিত। আমার পক্ষে এই সব এক নূতন অভিজ্ঞতা, মনে হইল নানাভাবে এই যাত্রায় অনেক কিছু শিখিলাম।

বাঙ্গালোরের প্রদর্শনীর পর আমি দক্ষিণের কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণে বাহির হইলাম। ত্রিপুরীতে তামিলনাডের মুখ্য ভাণ্ডারটি দেখিলাম, আরও গোটাকতক খাদি-ভাণ্ডারও দেখিয়াছিলাম। রাজাজী সালেম জেলায় আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেইখানে খদ্দরের কাজ খুব ভাল হইতেছিল, আমি সেইখানেও গেলাম। সর্বত্র কাজের পারিপাট্য আর সংগঠনবিধি আমি মন দিয়া দেখিতেছিলাম। যেখানে যাহা কিছু নূতন ও শিখিবার উপযুক্ত মনে হইত তাহাই নিজের দেশে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতাম। ওখানকার সংগঠন ও হিসাব রাখিবার প্রণালী আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল—আমি তাহা শিখিয়া লইলাম। তখনকার দিনে সবচেয়ে বেশি খাদি উৎপন্ন হইত তামিলনাডে আর সবচেয়ে মিহি খাদি—কোকটীর কথা বাদ দিলে—প্রস্তুত হইত অন্ধ্রদেশে। সেখানকার চরখা-সংঘের সম্পাদক শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী খুব আগ্রহ করিলেন, আমি যেন একবার যাই, আর খাদির বিষয়ে কিছু বলি।

ফিরিবার সময় তাই অন্ধ্র হইয়া ফিরিলাম। যে কয়েক জেলায় গিয়াছি সর্বত্রই খাদির বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। আমি ইংরাজীতেই বলিতাম। আমি দেখিলাম, আমি যেভাবে শাস্ত্রীয় রীতিতে লোককে খাদির কথা বুঝাইতাম তাহা লোকের উপর বেশ কাজ করিত, বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর। তাহাদের মনে সর্বদাই খাদির উপযোগিতা আর সাফল্য বিষয়ে নানারকম সন্দেহ ও ভয়। সেখানকার লোকে বলিত, আমি যাওয়ায় খাদি-প্রচারের খুব সাহায্য হইল। পাটনায় ফিরিলে বন্ধুরা কেহ কেহ বলিলেন, ঐ সব বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছি তাহা একত্র করিয়া লিখিয়া ছাপাইলে ভাল হয়। সেই অনুসারে আমার বক্তব্যের সারাংশ আমি লিখিয়া ফেলি, উহা ইকনমিক্স্ অব্ খাদি (খাদির অর্থশাস্ত্র) নামে ছোট বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। 'খাদিকা অর্থশাস্ত্র' এই নামে উহার হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হইল। এইভাবে সেই বৎসর খাদির কাজে অনেকখানি সময় কাটিয়া গেল।

কানপুর কংগ্রেসে আসামের কয়েকজন আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনবীনচন্দ্র বরদলই-এর নাম করা যায়, ইনি আমার পূর্ব-পরিচিত বন্ধু। কলিকাতা হাইকোর্টে যখন দুইজনে একসঙ্গে ওকালতি করি তখন হইতে ইঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া হইতে ইনি যোগ দিয়াছিলেন, আর আসামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই ছিলেন। ইঁহাদের ইচ্ছা আসামে আগামী কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করেন, আমার মত চাহিলে আমি কিন্তু নিষেধ করিলাম। কারণ গয়া কংগ্রেসের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হইল কংগ্রেস এখন খুব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ আসাম ছোট প্রদেশ। প্রথমে তো যথেষ্ট টাকা উঠান মুশকিলের কথা, কেননা আসাম শুধু ছোট নয়, গরীব দেশও। আর এক কথা, কংগ্রেসীরা কেবল সেই অংশটুকুকেই আসাম বলে যেখানকার ভাষা অসমিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র বিভাগকে। সরমা বিভাগ যেখানে ভাষা বাংলা, তাহা তো বাংলারই অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে আসাম প্রদেশ আরও ছোট হইয়া গিয়াছে। কর্মীসংখ্যাও খুব বেশি নয়। বাধা দিলেও উঁহাদের উৎসাহ কমিল না, উঁহারা আমার কথায় রাজি হইলেন না, কংগ্রেসকে আহ্বান করিয়া লইলেন।

তাঁহাদের ইহাও মনে হইল কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার আগেই আসামে খাদির কাজটি সংগঠিত করা হউক। আগেই অল্পস্বল্প কাজ হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত কর্মীর অভাবে ঠিক চলে নাই, বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। এই পুনর্গঠনের কাজে তাঁহারা আমার সাহায্য চাহিলেন, আমিও অস্বীকার করিতে পারিলাম না। যাইব কথা দিলাম, আর কয়েকদিন পরেই সেখানে গেলাম। আসামের যে কয়টি জেলায় খাদির কাজ ভাল চলিতে পারে, ঘুরিয়া দেখিলাম। এইবারের বেড়ানটা খুবই ভাল লাগিয়াছিল। আসাম প্রদেশ খাদি উৎপাদনের পক্ষে পরম যোগ্য স্থান, এইখানে যে-সব সুবিধা আছে তাহা বোধহয় খুব কম প্রদেশেই আছে। রেশমের পোকা পালা, উহা হইতে সুতা কাটা, আর সেই সুতায় কাপড় বোনার রেওয়াজ এখনও আসামের সর্বত্র। আমাদের মেয়েরা যেমন সেলাই অল্পবিস্তর সকলেই জানে, ওখানকার মেয়েরা তেমন সকলেই কাপড় বুনিতে পারে। ভালরকম কাপড় বুনিতে না পারিলে বড় ঘরের মেয়েদের বিবাহ হয় না। আর শুধু মামুলি বোনা নয়, নিজেদের ছোট তাঁতে রঙ-বেরঙের ফুল তুলিতে পারে। চমৎকার ফুলদার পাড় বসানো শাড়ী পর্যন্ত বুনিতে পারে। প্রায় প্রতি ঘরেই তাঁত চলে—সুন্দর সাদা বাঁশের তৈয়ারি তাঁত।

শুধু কাপড় বোনা নয়, মেয়েরা সুতা কাটিতেও পারে। দেখিয়া আমি বিস্মিত ও প্রসন্ন হইলাম যে, মেয়েরা নিজেরা সেইখানকার খদ্দর-ভাণ্ডারে নিজেদের বোনা কাপড় লইয়া আসে এবং তাহার বদলে আবার তুলা লইয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের দারভাঙ্গা জেলায় যেমন তুলা লইয়া যায় আর সুতা জমা দেয়, এইখানে তুলার বদলে কাপড় দিয়া যায়। তাহার কারণ এখানে ঘরে ঘরে চরখা আর ঘরে ঘরেই তাঁত। আমরা মেয়েদের দিয়া সুতা কাটাইয়া পরে তাঁতীদের দিয়া সেই সুতায় কাপড় বুনাই। আসামে এই মাঝের ধাপটি বাতিল হইয়া গিয়াছে, মেয়েরাই বোনে বলিয়া তাঁতীর বাড়ি যাওয়ার দরকার হয় না। আসামের কয়েকটি জেলায় কিছু কিছু তুলা জন্মে, খুব ভাল জাতের না হইলেও কাজ চলিয়া যায়। এই সব মিলিয়া আমি দেখিলাম আসামে খাদি-প্রচারের বেশ সুযোগ আছে, তাই চরখা-সংঘে আসিয়া আসামে খাদির জন্য কিছু টাকা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম। মন্ত্রী মহাশয় প্রথমটায় রাজি হন নাই। পরে কিন্তু তিনি এবং কাউন্সিল সকলেই আমার কথা মানিয়া লইলেন, কিছু টাকা দেওয়া হইল, আর বেশ সংগঠিতভাবে কাজ চলিতে লাগিল।

এই যাত্রায় একটা জিনিস দেখিলাম। নওগাঁ জেলার গ্রামে গ্রামে দেখিলাম, বিস্তর জমি পড়িয়া আছে, কিন্তু চাষ-আবাদ হয় না। জমিতে খুব সুন্দর সবুজ ঘাস লাগান রহিয়াছে, শুনিলাম এই জমিতে খুব নরম আর্দ্র ঘাস জন্মে। বড় বড় ঘাসের ঝোপের মধ্যে চোখে পড়ে দুই চারিটি কুঁড়ে ঘর, তাহাতে জনকতক লোক দেখা যায়। কিন্তু জমিতে কোন ফসল নাই, বীজ বোনা বা চাষ দেওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। খোঁজ লইয়া জানিলাম এই রকম অনাবাদি জমি আসামে প্রচুর, আর ঐখানকার নিয়ম অনুসারে এই সব পতিত জমিতে আবাদ শুরু করিয়া কিছুকাল বসবাস করিলেই জমির উপর স্বত্ব জন্মিয়া যায়। এই সব পতিত জমিগুলি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার সংলগ্ন, সেইজন্য সেখানকার কিছু লোক আসিয়া প্রথম এই পতিত জমিতে কুটির নির্মাণ করিয়া বসতি স্থাপন করে, তারপর আস্তে আস্তে চাষ-আবাদ করিতে থাকে। ক্রমে অল্পদিনেই জমির উপর কায়েমি স্বত্ব করিয়া লয়। ইহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান, ইহাদের দ্বারাই আসামের পতিত জমিতে চাষ-আবাদের কাজ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক মুসলমানদের দ্বারা আসামের মুসলমান সংখ্যা বাড়িয়া চলে। জিজ্ঞাসা করিয়া আরও জানিলাম যে, যে-কোন প্রদেশের লোকই ইচ্ছা করিলে এখানে আসিয়া জমি লইতে পারে। আমার মনে হইল বিহারের কথা, সেখানে, বিশেষত ছাপরা জেলায়, এত বেশি জমিতে আবাদ করা হইয়াছে যে, জমির অভাবে লাখ লাখ লোককে প্রতি বৎসর বিদেশে মজুর খাটিতে যাইতে হয়। তাহাদের কতজন না জানি এই আসামেই আসে।

এখানে মাস কয়েক মজুর খাটিয়া কিছু টাকা রোজগার করে, আর তারপর কয়েক মাস বাড়ি থাকিবার জন্য চলিয়া যায়। আমার ভ্রমণের মধ্যে দেখিলাম প্রায় সব জায়গায় আমার জেলার লোক রহিয়াছে। তাহাদের ভাষা আর হাল-চাল দেখিয়া সহজেই তাহাদের চেনা যায়। প্রশ্ন করিলে গ্রামের নাম পর্যন্ত জানা যায়। আমি ভাবিলাম, যাহারা এইভাবে আসিয়া কয়েক মাস পরেই আবার চলিয়া যায়, তাহারা যদি স্থায়ীভাবে এইখানে জমি দখল করিতে পারে তবে একসঙ্গে দুই কাজই হয়—ইহাদের এই বারবার যাতায়াতের রেলভাড়ার খরচ বাঁচিয়া যায়, এবং ইহারা জমিটা ভোগও করিতে পারে, অপরদিকে ছাপরায় খানিকটা জমির সঙ্কুলান হয়।

এই বিষয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। উহারা কথাটা বেশ পছন্দ করিল, কারণ বিহারী মজুরদের উহারা বেশ ভাল চোখে দেখে। ময়মনসিংহের লোকেদের দিয়া এই কাজটা ভাল হয় না। আর ময়মনসিংহের লোকেরা স্থানীয় লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করে না, সেইজন্য স্থানীয় অনেকেই ময়মনসিংহের মুসলমানদের অপেক্ষা বিহারী হিন্দুদের ওখানে গিয়া বসবাস করা ভাল মনে করিত। তখনও প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া বাধিত, কাজেই মুসলমানের সংখ্যা না-বাড়িলেই হিন্দু স্বার্থের পক্ষে ভালো। আর ব্যাপারটাও ছিল এই যে, মুসলমানের সংখ্যা বাংলা-ভাষাভাষী আসামেই বেশি ছিল, যেখানে শুদ্ধ আসামী ভাষা বলে এমন জায়গায় হিন্দুর সংখ্যাই বেশি আর সেখানেই এই ধরনের পতিত জমি বেশি। সেখানকার হিন্দুদের তাই আশঙ্কা হইতেছিল, যদি এই ভাবে মুসলমানেরা আসিয়া বসতি স্থাপন করে তবে ক্রমে যে তাহারাই দলে ভারী হইয়া পড়িবে। সমস্তটা জমি আবাদ করার সাধ্য উহাদের নাই, আইনানুসারে বাহির হইতে যে কেহ আসিয়া এই জমিতে চাষ-আবাদ করিতে পারে। এমন অবস্থায় বিহারের হিন্দুরা আসিয়া বসবাস করে, ইহাই তাহারা চাহিতেছিল। বিহারে ফিরিয়া আমি কয়েক বন্ধুকে এই জমির কথা আর কিভাবে জমি পাওয়া যায় তাহা বলিলাম। বিশেষ কেহই গেল না, আমি যতদূর জানি দুই চারজনের বেশি লোক সেখানে গিয়া জমি লয় নাই।

আমি আমার দাদাকেও এই কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বৎসর কয়েক পরে একবার জমি দেখিতে গেলেন। শুধু অনাবাদি নয়, আবাদির জন্যও জমি লওয়ার কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বাবু শম্ভুশরণ আর বাবু অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ এবং একজন বাঙালী ভদ্রলোক মিলিয়া হাজার কয়েক টাকা দিয়া এক হাজার একর জমি কিনিলেন। শুনিয়াছিলাম জমিটা খুব ভাল ছিল, কমলার বাগান ছিল, চাষ করার জন্য মোটর ট্রাক্টর ছিল, জমির মধ্যে একটা বাংলোও ছিল। জমিটা ছিল জঙ্গলের মধ্যে,

জংলী জানোয়ার, বিশেষত বাঘ আর হাতী প্রায়ই আনাগোনা করিত, তবু চাষের ব্যবস্থা করা হইল, হাল বলদ প্রভৃতি কেনা হইল, কিন্তু সেইখানকার জলবায়ু ও স্বাস্থ্য এমন খারাপ যে, যে-কেহ ঐখানে যাইত, সেই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িত। পুরানো মালিক যে জমি বেচিয়া ফেলিতে চায় তাহার কারণও সম্ভব ইহাই। ভাইসাহেব বারকয়েক গেলেন, অনুগ্রহবাবু এবং শম্ভুবাবুও গেলেন। আমার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু ইঁহাদের যাওয়া-আসা সত্ত্বেও চাষের ব্যবস্থা ঠিক জমিল না। কয়েক বৎসর পর একবার গিয়া ভাইসাহেব ঐখান হইতে জ্বর লইয়া ফিরিলেন। সেই জ্বরে তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিল, পরে উহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঠিক তাহার আগেই শম্ভবাবুর মৃত্যু হইয়াছে, কাজেই কাহারও মনে আর উৎসাহ থাকিল না। আমরা জমির কল্পনাই ছাড়িয়া দিলাম। মালগুজারী বাকী পড়িয়া যাওয়ায় সম্ভবত উহা নিলাম হইয়া যায়। যাহা হউক, আমাদের হাজার কয়েক টাকা লোকসান হইল। কেবল বাবু মহেন্দ্রসিং আর শ্রীরামরক্ষা ব্রহ্মচারী সেইখানে কিছু জমি লইয়া আবাদ করাইতে পারিয়াছিলেন। আজও তাঁহাহদের আত্মীয়রা ঐখানে আবাদ করিয়া কিছু কিছু উপায় করিতেছে। অবশ্য এইসব ব্যাপার কিন্তু সেই এক বৎসরেরই কথা নয়, সাত আট বৎসরের সব ঘটনার ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তবে আমার মনে হয়, এই এক জায়গায়ই ইহাদের কথা লেখা ঠিক। এখন আমি শুনিতেছি, ঐ নিয়মের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এত সুবিধায়ও সহজে বাহিরের লোক আর জমি পায় না। সম্ভবত বেশির ভাগ জায়গা স্থানীয় লোকের জন্য সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গৌহাটি কংগ্রেস

গৌহাটির কংগ্রেস-অধিবেশনের জন্য সেইখানকার লোকেরা মহা উৎসাহে ব্রহ্মপুত্রের ধারে কংগ্রেস-নগর নির্মাণ করিয়াছিল। জায়গাটি আর শিবিরের দৃশ্য ভারি সুন্দর ছিল। খাদির কাজের তখন খুব প্রচার আর প্রদর্শনীও অতি চমৎকার হইয়াছিল। কংগ্রেসের প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চরখা-সংঘেরই প্রধান চেষ্টা ছিল, এইজন্য চরখা-সংঘের কর্মীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন। আমার মনে পড়ে, এই প্রদর্শনীতে চরখা-সংঘের বিহার-শাখার কর্মীরা খুব খাটিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন শ্রীনবীন-

চন্দ্র বরদলই আর শ্রীতরুণকুমার ফুকন ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সর্বদিক দিয়া সুবন্দোবস্তের জন্য ইঁহারা দুইজন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মুসলমান এক আততায়ী দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। সারা দেশময় হিন্দুদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গৌহাটিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের উপরও ইহার প্রভাব না-পড়িয়া পারে নাই। হিন্দুদের সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, সেই হত্যাকারীর মকদ্দমায় মহম্মদ আলীর মত নেতাও জড়িত হইয়াছিলেন। ফলে হিন্দুদের ধারণা হইল যে, মৌলানা সাহেবেরও উহার প্রতি সহানুভূতি আছে আর হয়তো এই হত্যা তাঁহার অপছন্দও নয়। বৎসর কয়েক যাবৎ স্বামীজী শুদ্ধি আর সংগঠনের কাজে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ উঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হত্যার ইহাও এক কারণ। সেই সময়ে ধর্মের অজুহাতে আরও কয়েকজন হিন্দু এইভাবে নিহত হইয়াছিলেন। ঝগড়াঝাঁটি তো লাগিয়াই ছিল। সমস্ত দেশের আবহাওয়া যেন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯২১ সনে আকাশে যে-সুন্দর মিলনের ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা যেন একেবারেই চলিয়া যাইবার মত হইল।

এই অধিবেশনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় আলোচনা হয় নাই। গান্ধীজী তখন কংগ্রেসে যাইতেন বটে, তবে কেমন যেন তটস্থ থাকিতেন; কেননা কাজের ভার তিনি স্বরাজ্যপার্টির হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। গৌহাটিতে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিষয় এখানে বলা বোধ হয় অনুচিত হইবে না। পাঞ্জাবের নাভারাজ্যের মহারাজাকে পদচ্যুত করা বলিয়া তাঁহার অনুগত জনকতক প্রজা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা হইল, কংগ্রেসে এই বিষয়ে সরকারের কাজের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব করা হউক আর কংগ্রেস পদচ্যুত মহারাজার সহায়তা করুক। মহাত্মাজীর অনুপস্থিতিতেই বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে একটি প্রস্তাব গৃহীতও হয়। কিন্তু মহাত্মাজী এটা পছন্দ করিলেন না, কেননা, তাঁহার মতে দেশীয় নৃপতিদের এই সব ঝগড়ার মধ্যে কংগ্রেসের হাত দেওয়া রাজন্যবর্গ ও কংগ্রেস উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। সেইজন্য তিনি বিষয়-নির্বাচনী সমিতিকে এই বিষয়টি পুনরায় বিচার করিবার জন্য আগ্রহ জ্ঞাপন করিলেন। ফলে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল না। ইহাতে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি শ্রীহর্নিম্যান বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুন-র্বিচারের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের বিষয়ে আমার তখন বিশেষ জ্ঞান ছিল না বলিয়া এই নীতির বিষয় আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। কয়েক বৎসর পরে কংগ্রেস এই বিষয়ে কি নীতি অবলম্বন করিবেন তাহা লইয়া কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রকাণ্ড মতভেদের সৃষ্টি

হইল। বৎসর কয়েক পর্যন্ত প্রতিবারই ইহা একটি বিবাদের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার কথা পরে আবার বলিব।

গৌহাটি কংগ্রেসে প্রবল বৃষ্টির জন্য উদ্যোক্তাদের এবং আগন্তুক সকলেরই বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বিঘ্ন সত্ত্বেও অধিবেশনটি বেশ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সমস্ত কাজই নির্দিষ্ট নিয়মে চলিয়াছিল, রামগড়ের অধিবেশনের মত বৃষ্টির জন্য সবকিছু তছনছ হয় নাই। কিন্তু বৃষ্টির জন্য একদিকে বাড়তি খরচ অনেক হইল, অন্যদিকে আয়, যাহার বড় অংশ আসে দর্শকদিগের টিকিট হইতে, তাহাতে ঘাটতি পড়িয়া গেল। অভ্যর্থনা সমিতিকে অনেকখানি লোকসান সহিতে হইয়াছিল, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যথেষ্ট হয় নাই। শ্রীফুকন ও শ্রীবরদলই মহাশয়কে নিজের পকেট হইতে কিছু ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। বহুদিন পর্যন্ত ইহার জন্য লেখালেখি চলে, সম্প্রতি ওয়ার্কিং কমিটি উঁহাদের বাকি হিসাব চুকাইয়া দিয়া এই ব্যাপারটি শেষ করিয়া দিয়াছেন। আমি যে ভয়ে বন্ধুবর শ্রীবরদলই মহাশয়কে কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। প্রকৃতির প্রকোপে আয় কম হওয়ায় আর্থিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া দিল।

আগে একবার বলিয়াছি যে, আমেদাবাদ অধিবেশনের পর হইতে প্রতি বৎসরই কেহ না কেহ প্রস্তাব আনিতেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য কেবল স্বরাজ্য না রাখিয়া পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলা হউক। প্রতি বৎসরই এই প্রস্তাব নামঞ্জুর করা হইত। কিন্তু গৌহাটি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত আয়েঙ্গার নিজেই ইহা সমর্থন করেন, কাজেই প্রস্তাবটি এবার জোরালো হইয়া উঠিল। অবশ্য গৌহাটিতেও ইহা গৃহীত হয় নাই।

কংগ্রেস দল কাউন্সিলে প্রবেশের পর হইতেই কিছু লোক ঐ কাজে লাগিয়া গেলেন, কেহ কেহ খাদির কাজেই লাগিয়া রহিলেন। আবার কেহ কেহ কংগ্রেসের সংগঠনের কাজে মন দিলেন। কাউন্সিলে যাহা কিছু হইত সংবাদপত্রে তাহার খুব প্রচার হইত। কাজও বেশ ভাল হইয়াছিল। পণ্ডিত মতিলালজী নেতা ছিলেন, তিনি অন্য কয়েকটি দলের সদস্যদের সহায়তায় বারকয়েক সরকারের বাজেট নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। অপর কয়েকটি বিষয়েও সরকারের বিরোধী প্রস্তাব পাস করাইলেন। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয়ও সেই সভার সদস্য ছিলেন। এক একটা বিষয়ে পণ্ডিতজীর সঙ্গে তাঁহার মতের অমিল হইত, কিন্তু তখন পর্যন্ত এমন কিছু স্পষ্ট বিরোধ হয় নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদের সর্বাপেক্ষা বলিবার কথা যে, তাঁহারা শ্রীবিঠলভাই প্যাটেলকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

তিনি বহুবার নিজের বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার চমৎকার প্রমাণ দিয়াছেন। সর্বপ্রকারে নিরপেক্ষ থাকিয়াও তিনি এক একবার গভর্নমেণ্টকে বিষম মুস্কিলে ফেলিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

গোহাটি কংগ্রেসের পরে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় দুইটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। আগেই বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছিল, ঝগড়া, মারামারি তো লাগিয়াই ছিল। কংগ্রেসী লোকেদের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানে অবিশ্বাসের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহার প্রতিকারের জন্য আয়েঙ্গার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঝগড়ার দুইটি রূপ, এক ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে, আর এক রাজনৈতিক ব্যাপারে। সাধারণ লোকে, হিন্দু বা মুসলমান যেই হউক, ধর্মের ব্যাপারেই বেশি মাতিয়া ওঠে। আর শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়, যাহারা ভিতর ও বাহিরের খবরাখবর রাখে, তাহারা রাজনৈতিক কারণেই প্রভাবিত হয়। আবার একের উপর অন্যের প্রভাবও যথেষ্ট পড়ে। অপর দিকে, শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ লোকের এই উত্তেজনাকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। দুই সম্প্রদায়ের সমস্যা ভিন্ন, আর সমাধানও ভিন্ন।

হিন্দুরা গোরুর প্রতি পূজা ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। গোবধের নামেই তাহারা উত্তেজিত হইয়া ওঠে। বিশেষত বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই ভাবটি প্রবল। এই গোবধ উপলক্ষ করিয়া কত যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। কথাটাও নূতন নয়। মুসলমান বাদশাহরাও অনুভব করিয়া গিয়াছেন যে, গোবধে হিন্দুর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে, তাঁহাদের মধ্যে উদারহৃদয় কোন কোন বাদশাহ হিন্দুর মর্মপীড়া বাঁচাইবার জন্য গোবধ নিষিদ্ধও করিয়া দেন। আজও হিন্দুর মনোভাব সেই রকমই আছে, শিক্ষিত হিন্দুও ইহার ব্যতিক্রম নয়। তাহারাও গোবধের নামে উত্তেজিত হইয়া পড়ে। অপর দিকে, বকরীদের দিনে কোরবানি করা মুসলমানের কাছে ধর্মের অনুশাসন। গরীবের পক্ষে তো এই গোরু কোরবানিই কর্তব্য পালনের উপায়, কেননা ইহাতে খরচ কম পড়ে। সেইজন্য ঐ দিনটিতে যেখানে সেখানে এই গোরু কোরবানির জন্য দাঙ্গা বাধে। যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশি সেখানে তো কোরবানি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, কিন্তু

যেখানে উহাদের সংখ্যা কম সেখানে প্রায়ই কোরবানি হয় না। বিশেষত যে-গ্রামে আগে কোরবানি করিবার মত মুসলমান ছিল না সেখানে যদি কেহ নূতন করিয়া কোরবানি করিতে চায়, তবেই হয় মুশকিল। এখন হইতে তাহাদের মধ্যে যাহারও কিঞ্চিৎ পয়সা হাতে আসিয়াছে, তাহার ইচ্ছা হয় নিজের ধর্মের অনুশাসন মানিয়া কোরবানি করিতে। স্থানীয় হিন্দুরা কোনমতেই তাহা বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয়, ফলে হয় বিবাদ ও মারামারি।

বিহার-সরকার এই বিরোধ নিবারণের জন্য বরাবর যে-সমস্ত গ্রামে কোরবানি হইয়া আসিতেছে তাহাদের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সব গ্রামে হিন্দুরা কোরবানির রেওয়াজে বাধা দিলে সরকার তাহাদের দমন করিয়া কোরবানির ব্যবস্থা করিয়া দেন। মুসলমানরা নূতন নূতন জায়গায় কোরবানি করিতে চাহিলে সেই সব জায়গায় মুসলমানদেরও দমন করা হয়। বিহার-সরকারে বহুদিন যাবৎ এই নীতি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমানেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নয়। তাহাদের মতে, একে তো এই তালিকা নির্ভুল নয়, কেন না, কোরবানি হামেশা গোপনেই করা হয়, প্রকাশ্যভাবে কখনও করা হয় না, সেজন্য মুসলমান ভিন্ন কাহারও সাক্ষ্য এই বিষয়ে প্রামাণ্য নয়, এমনকি সরকারি হিন্দু-অফিসারেরও সাক্ষ্য মুসলমানেরা বিশ্বাস করে না; উহাদের দ্বিতীয় দাবি যে উহারা আপনার ধর্ম পালন করিতে চায়, ইহার মধ্যে রেওয়াজের প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে আগে রেওয়াজ নাই সেখানেও যখন তাহারা ইচ্ছা করিবে কোরবানি করিতে পারিবে—ইহাতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার থাকা চাই। ইহাই হইল ঝগড়ার কারণ, আর এইজন্য বকরীদের সময় সরকারের ও আমাদের নিয়ত চেষ্টা থাকিত যেন কোথাও মারামারি না-হয়।

অপরদিকে, মুসলমানের মসজিদের সম্মুখ দিয়া গান-বাজনা সহকারে হিন্দুর কোন মিছিল যাইতে চাহিলে মুসলমানদের ঘোর আপত্তি হয়, তাঁহারা বলেন নমাজ পড়িবার সময় বাজনার শব্দ কানে গেলে তাঁহাদের প্রার্থনায় বাধা জন্মে, এই নিয়া হিন্দুদের পূজা-পার্বণের দিনে প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া লাগিয়াই থাকে। অন্যান্য প্রদেশের মত ইহা বিহারে অবশ্য তত বেশি ছিল না। কিন্তু যখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য জাগিয়া উঠিল তখন ইহারই সূত্র ধরিয়া সর্বত্র জোর দাঙ্গা বাধিতে লাগিল। বিহারের হিন্দুরা বলিল, গোরু কোরবানিতে আপত্তির পাল্টা জবাবেই মুসলমানেরা জবরদস্তিপূর্বক মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিবার এই ফিকির তুলিয়াছে। যাহাই হউক, বিহারেও মাঝে মাঝেই দাঙ্গা মারামারি চলিতে থাকিল। পাটনা সহরের মত কোন কোন জায়গায় অবশ্য এতদিন পর্যন্ত দাঙ্গা বাধিতে পারে নাই, কারণ উচ্চ

শ্রেণীর কতিপয় মুসলমান নিজেদের জোরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ রাখিয়াছিলেন আর বাজনা বাজানোর সূত্রে বিরোধ করিতেই দেন নাই।

তবে কথা হইতেছে যে প্রতিদিন কসাইখানায় কত যে গোরু মারা হয় তাহার ঠিকানা নাই—হয় গোমাংসের জন্য, নয় চামড়া ইত্যাদি বেচিয়া পয়সা করিবার জন্য। বিশেষত যেখানে গোরা সিপাহীর ছাউনি বেশি আছে অথবা কলিকাতার মত সহর যেখানে গোরা সাহেবদের বসতি বেশি, সেখানে তো ভাল ভাল গোরু মারিয়া ফেলা হয়। কিন্তু সেদিকে হিন্দুর খেয়াল নাই, দৈনন্দিন গোবধ সে সহ্য করিয়া চলে, অথচ বকরীদের দিন ধর্মানুষ্ঠানের জন্য গোরুহত্যা করা তাহার বরদাস্ত হয় না। তেমনই আবার, বড় বড় সহরে বড় বড় মসজিদের সম্মুখে ও চারিপাশে দিনরাত ট্রাম, মোটর, ছ্যাকরাগাড়ী, আরও কতরকম দুর্দান্ত আওয়াজকারী জিনিস প্রচণ্ড গোলমাল সৃষ্টি করে, মহরমের দিন মুসলমানের মিছিলেই কত বাজনা বাজে, কি ভয়ঙ্কর গোলমাল হয়, তাহাতে মুসলমানরা বিচলিত হয় না, অথচ হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারের মিছিলের বাজনা তাহাদের সহ্য হয় না। জনসাধারণের ইহাতেই বেশি বিক্ষোভ।

শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল সরকারি চাকুরি, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও কাউন্সিলের সভ্যপদ ইত্যাদি বিষয়ে। যদি তাহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী না হইত, তাহা হইলে মুসলমান যাইত বিগড়াইয়া, যদি হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা উচিত অনুপাত অপেক্ষা বেশি হইত তাহা হইলে হিন্দু বিগড়াইয়া যাইত। এখানে সামান্য যাহা কিছু অধিকার ভারতবাসীরা পাইয়াছে বা পাইতে পারে তাহা ভাগ করিয়া লইবার প্রশ্ন উঠিল। যাহারা সেই অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহাদের কোনপ্রকার আঘাত লাগিলেই তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয়ের বড় ইচ্ছা ছিল যে একটা বোঝাপড়া হইয়া যায়। কিন্তু এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা উত্তর ভারতে যতখানি জটিল, দক্ষিণ ভারতে ততটা নয়। সেখানে ঝগড়া বেশি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের মধ্যে। মুসলমানদের সংখ্যা সেখানে কম। যে গো-বধের জন্য উত্তর ভারতে এত বেশি হাঙ্গামা, ওদিকে তাহা লইয়া অতটা ঝগড়া নাই। অবশ্য বাজনার প্রশ্ন লইয়া ওদিকেও ঝগড়া হয়, তবে তাহা খ্রীষ্টানদের সঙ্গেও। এজন্য এ-সমস্যার জটিলতা ও হিন্দুদের চিন্তাধারা দক্ষিণীরা ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারে না। আয়েঙ্গার মহাশয় কিছু তাড়াহুড়াও করিতেন। যত জোর দিয়া তিনি বলিতেন তত জোর দিয়াই তিনি নিজের মতও দাঁড় করাইতেন। একবার মত স্থির করিলে তিনি তাড়াতাড়ি তাহা বদলাইতে চাহিতেন না। তাঁহার বুদ্ধি ছিল সুতীক্ষ্ম, কিন্তু

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ছিল না। তাই শাস্ত্রীয় জ্ঞান যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত তিনি সকলকে হারাইতে পারিতেন; কিন্তু কার্যকুশলতার কথা যেখানে, সেখানে তাঁহার বুদ্ধি ততটা চলিত না। তিনি সভাপতি থাকিতে থাকিতে হিন্দু-মুসলমানে বোঝাপড়া যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বোঝাপড়ার যে-অর্থ করিয়াছিলেন, হিন্দু জনসাধারণ তো অবশ্যই, আর সম্ভবত কংগ্রেসী হিন্দুও, তাহা স্বীকার করে নাই। এজন্য তাঁহার এই সাধুচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই।

সাইমন কমিশন ও মান্দ্রাজ কংগ্রেস

১৯২০ সনে নূতন আইন রচিত হইল। তাহাতে একটা নিয়ম ছিল যে, দশ বৎসর পর পার্লামেণ্ট এই আইনের কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিবেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী ইহার পরীক্ষার জন্য কাহাকেও নিযুক্ত [illegible]। এই আইন তৈয়ারি হওয়ার শুরু [illegible] কংগ্রেস ইহার বিরোধিতা করে। ১৯২০ সনের নির্বাচনে কংগ্রেসীরা যোগও দেয় নাই। তাঁহারা এবং কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির বলা-কওয়ার ফলে বুদ্ধিমান হিন্দু-মুসলমান প্রায় সকলেই ইহাকে বর্জন করেন। অবশ্য কেহ না কেহ নির্বাচনে দাঁড়াইয়া জায়গাগুলি ভরিয়া দিত, কিন্তু লোকে জানিত, এমনকি সরকারও ভিতরে ভিতরে মানিতেন যে, জনসাধারণের আসল প্রতিনিধি এই সব আইন সভায় যোগ দিতেছেন না; কেননা, কংগ্রেস ও খিলাফতের লোকেরা কেবল যে নিজেরা নির্বাচনপ্রার্থী হইতেন না, তাহা নয়, ভোটারেরাও ভোট দিয়া যাহাতে নির্বাচনে যোগ না দেয় তাহা দেখিতেন। ফলে খুব কম সংখ্যক লোকই ভোট দিল। ১৯২৩-এর ইলেক্শনে কংগ্রেস এইটুকু স্থির করিল যে, যে-সব কংগ্রেসী যাইতে চায় তাহারা যাইতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচনে কোন অংশ গ্রহণ করিবে না। সেজন্য, যদিও কয়েকজন কংগ্রেসী নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কিছু অধিকসংখ্যক লোকের ভোট পাওয়া গিয়াছিল, তবু একথা বলা যায় নাই যে, ইলেক্শনে সমগ্র জনতার প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইল। ১৯২৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস যোগ দিল, আর জনসাধারণ খুব আগ্রহভরে ভোট দিয়াছিল। এই নির্বাচনের ফল বাহির হইলে দেখা গেল, কংগ্রেসের যতদূর পর্যন্ত সম্ভব ছিল ততটা সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, কিন্তু আইন এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, কংগ্রেসের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দল

সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে না। সেইজন্য ইঁহারা সংখ্যায় যথেষ্ট হইলেও, সরকারী সদস্যগণ ও সরকারের মনোনীত যে অল্প কয়েকজন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা মিলিয়া কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোটাধিক্য লাভ করিলেন। অবশ্য সব জায়গায় এই রকম হইত না, কোন কোন স্থলে, বিশেষত কেন্দ্রীয় আইন-সভায় এই নির্বাচিত সভ্যগণই পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে বহুবার সরকারপক্ষকে হারাইয়া দিয়াছেন। এই সব কারণে সরকারেরও মনে হইল, এই অসন্তোষের কারণ দূর করিতে হইবে, এবং দশ বৎসরের অপেক্ষা না করিয়াই ১৯২৭ সনে এক কমিশন নিযুক্ত করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, ১৯২৮-এর গোড়াতেই এই কমিশন ভারতে আসিয়া তদন্তের কাজ আরম্ভ করিবে। কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যর জন সাইমন। বাকি সভ্যরাও সকলে ইংরেজ। একজন ভারতীয়ও তাহার মধ্যে ছিলেন না। এই ঘোষণা প্রকাশের সংগে সংগে সারা দেশময় অসন্তোষের ভাব দেখা যাইতে লাগিল। কংগ্রেস দলের তো কথাই নাই, নরমপন্থীরাও নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। এই বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই প্রায় একমত দেখা গেল। মনে হইল, আবার একবার সকলে মিলিয়া ইহার বিরোধিতা করিবেন।

পাটনায় এই বিষয়ে একটি কনফারেন্স হইল। সভাপতি হইলেন স্যর আলি ইমাম। সকল দলেরই লোক ইহাতে যোগ দিলেন, আর স্থির হইল, সকলে মিলিয়া একযোগে এই কমিশন বর্জন করিবেন। স্যর আলি ইমামকেই নেতা করা হইল। আমার মনে পড়ে, এই বিষয়ে তাঁহার সংগে আমার কিছু কথা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার ন্যায় গভর্নমেণ্টে প্রতিষ্ঠাপন্ন ও নরমপন্থী লোক যে এই কমিশন বর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা বড়ই আনন্দের কথা—জনসাধারণ তো তাঁহার সংগে থাকিবেই, কংগ্রেস তথা অন্য সকল দলের লোক একযোগে কাজ করিলে কমিশন বয়কট অবশ্যই সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাঁহাদের মতে বয়কট অর্থে, কেহ কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে যাইবে না বা অন্য প্রকারে সহায়তা করিবে না। এদিকে আমরা আরও বেশি দূর যাইতে চাহিলাম; আমরা চাহিলাম, জনসাধারণ কোনভাবেই কমিশনের কাজে যোগ দিবে না। কমিশন বর্জন বয়কটের রূপ ধারণ করিলেই কেবল তাহা সম্ভব। আমরা তাঁহাদের বলিলাম, আপনারা কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিবেন না, এবং অন্য কোন প্রকার সাহায্যও করিবেন না—আর আমরা বিরোধিতামূলক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সাহায্যে জনসাধারণের অসন্তোষ ব্যক্ত করিব। এই সব প্রদর্শন ও জনসাধারণের বিক্ষোভকে স্যর আলি ইমাম বড়ই ভয় করিতেন। এই কথাটা তাঁহার পছন্দ হইল না, কিন্তু তবু কমিশনের প্রতি এতই বিদ্বেষ ছিল যে, ইহাও মানিয়া লইলেন।

বিহারের যাহা, সারা ভারতেরও সেই একই কথা। কমিশনের সম্বন্ধে সব দলের লোকই বলিতে লাগিল যে, একজনও ভারতবাসীকে না লইয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর নিতান্ত অপমান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা কেহই এই কমিশনের সহযোগিতা করিবেন না। গভর্নমেণ্ট যদিও কমিশনে কোন ভারতবাসীকে স্থান দেন নাই, তবু এই কাজের সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য কিছু লোককে তাঁহারা ডাকিবেন, এবং সব প্রদেশগুলিতেই এইরকম লোক নিয়োগ করা হইবে। সরকার যাহাই করুন, সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া চলিবার মত লোকের অভাব হিন্দুস্থানে নাই। এই ক্ষেত্রেও সেইরকম লোক জুটিয়া যাইবেই! তবে আহ্লাদের কথা যে, কোন রাজনৈতিক দলেরই কেহ ইহাতে যোগ দেয় নাই।

কমিশনের আসিবার কথা ছিল ১৯২৮ সনে, গভর্নমেণ্ট তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য মালমসলা তৈয়ারি করিতে লাগিলেন। অপরদিকে, জনসাধারণ কমিশন বয়কটের কথা ভাবিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সময় আসিয়া পড়িল। ডাঃ আনসারি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। মহাত্মাজী কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এক হিসাবে কংগ্রেসের এই অধিবেশনটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কমিশন বয়কটের কথা তো দেশের সম্মুখে ছিলই। কংগ্রেস আরও স্থির করিল যে, কেবলমাত্র বিরোধেই ফল হইবে না, একটি কমিটি ঠিক করিয়া সর্বদলের লোক তাহাতে লইতে হইবে। এই কমিটি ভারতের জন্য একটি আইনের খসড়া রচনা করিবে। এই আইনের দাবি সাইমন কমিশনের কাছে পেশ করিবার জন্য নয়; ঠিক হইল, এই বিধান দ্বারা আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ও দাবি দেশের সমক্ষে তুলিয়া ধরিব, এবং সকল দল সম্মিলিতভাবে এই দাবি মঞ্জুর করাইবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করিব।

মাদ্রাজ কংগ্রেসেও পূর্ণস্বাধীনতা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিনকতক ইউরোপে কাটাইয়া সবেমাত্র দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি এ-প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন। তিনিই বিষয়-নির্বাচনী সভায় বিশেষ জোর করিয়া প্রস্তাবটি পাশ করাইয়া লন। আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, যে-প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই তাহা পাশ করান ঠিক নয়। তখন দেশের মধ্যে প্রস্তুতির এমন পরিচয় পাই নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের ধ্যানের বস্তু পূর্ণস্বাধীনতা লাভের ভরসা করা যায়। কিন্তু বহু ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি পাশ হইয়া গেল। অবশ্য তখন পর্যন্ত ইহা প্রস্তাব মাত্রই ছিল, দুই বৎসর পরে লাহোর কংগ্রেসের সময় ইহা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হয়।

বিষয়-নির্বাচনী কমিটি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধীয় একটি প্রস্তাব

কংগ্রেসের কাছে পেশ করিতে রাজি হন। তাহাতে অন্যান্য কথা ছাড়া গো-বধের বিষয় বলা হইল। গো-বধে মুসলমানগণের অধিকার আছে এবং লোকের চোখকে পীড়া না দিয়া যেখানে ইচ্ছা তাহারা গোরু বধ করিতে পারে। শ্রীযুত আয়েঙ্গার আগেই একথা বলিতেছিলেন, এখন কংগ্রেসও এই প্রস্তাব আনিল। আমার মনে হইল, উচিত যাহাই হউক, হিন্দু জন-সাধারণ ইহা কিছুতেই মানিতে চাহিবে না; আর মুসলমানেরা যদি এই অধিকার বেপরোয়া চালাইতে শুরু করে তবে ইহার ফলে বড় বড় দাঙ্গা মারামারি ভিন্ন আর কিছু লাভ হইবে না। ইহাতে কোনমতেই দেশের কোন উপকার হইবে না। গান্ধীজী বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু আয়েঙ্গার মহাশয় প্রথম যখন কথাটা তুলিয়াছিলেন তখনই আমি গান্ধীজীকে এই বিষয়ে চিঠি লিখিয়াছিলাম। সেইজন্য এই প্রস্তাবের দুই তরফের কথাই তাঁহার জানা ছিল। যেই বিষয়-নির্বাচনী কমিটি প্রস্তাবটি স্বীকার করিয়া লইলেন, আমি গিয়া তাঁহাকে জানাইলাম। দ্বিতীয় বৈঠকে তিনি নিজেই উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুরোধে বিষয়টির পুনর্বিচার করা হইল। প্রস্তাবটির রূপের কিছু অদলবদল করিয়া এমন করা হইল যে, উহা সকলেরই গ্রহণযোগ্য হইল, কিন্তু আমি জানি কতিপয় মুসলমান ভাই বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরস্পরের মতভেদের যে ফাটল দেখা গিয়াছিল তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

সিংহল যাত্রা

আমাদের বাড়ির মেয়েদের ইচ্ছা হইল যে, মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশন-শেষে ঐদিকের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিবেন, কারণ মাদ্রাজের কিছুদূরেই রামেশ্বরের মন্দির। আমার সঙ্গে আমার বৌদিদি, আমার স্ত্রী এবং অন্য কয়েকটি বন্ধুর বাড়ির মহিলারা মাদ্রাজ গিয়াছিলেন। যাওয়ার পথে আমরা গোদাবরীতে স্নানের জন্য রাজ-মহেন্দ্রীতে নামিয়াছিলাম। কংগ্রেস অধিবেশনের পর আরও অনেকের সঙ্গে মিলিয়া আমরা মাদুরা, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গেলাম। রামেশ্বর দর্শনের পর আমরা সিংহল চলিয়া গেলাম। সিংহল ভ্রমণের একটা সুবিধাও জুটিয়া গেল। রামোদার দাসজী সেখানে লানিয়ার এক মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ছাপরা কংগ্রেসে বৎসর কয়েক কাজ করিয়া এবং বার কয়েক জেল খাটিয়া বৌদ্ধগ্রন্থাদি পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সিংহলে থাকা স্থির করেন।

সেইখানে সংস্কৃত পড়াইবার ও পালি ভাষায় ত্রিপিটকাদি গ্রন্থ পাঠ করিবার তিনি প্রচুর অবসর পাইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে পরিচিত হন। ঐ সময় তিনি কেবল অধ্যয়নে রত ছিলেন, পুরাপুরি ভিক্ষু বনিয়া যান নাই।

আমরা সেখানে গেলে পর তিনি সিংহলের প্রধান প্রধান জায়গাগুলি আমাদের দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। একটি লরি ভাড়া করিয়া আমরা কয়েকদিন খুব ঘোরাঘুরি করিলাম। ঐ রমণীয় স্থানটিতে আমাদের সেই প্রথম বেড়াইবার সুযোগ হইয়াছিল। দ্বীপের শোভা আর সবুজের মেলা আমাদের মুগ্ধ করিয়াছিল। কান্ডীর চমৎকার সুন্দর মন্দিরটি দর্শন করিলাম। ঐখান হইতে আমরা নুর-এলিয়ার পাহাড়ে গিয়া এক রাত সেখানেই কাটাইলাম। তারপর গেলাম সীতা-এলিয়ায়; কথিত আছে যে, এখানেই রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া অশোকবনে বন্দী করিয়া রাখেন। এখানে যাওয়ার সময় এক বিচিত্র জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। নুর-এলিয়ার একটু দূরেই সীতা-এলিয়া। পাহাড়ের মাথায় নুর-এলিয়া, আর পাহাড়ের নীচে সীতা-এলিয়া। ইহার চারিদিকেই পাহাড়, দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি যেন একটি বাটী তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার দেওয়াল-গুলি পাহাড়ের আর যাহার পাদপীঠে ছোট একটা ঝর্ণা; সেইখানেই ছোট-খাটো একটি মন্দিরের মত স্থানে জানকীকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। পাহাড় হইতে নামিতে হইলে মোটরগাড়ীখানাকে বার কয়েক চক্কর খাইতে হয়। নামিবার সময় দেখিলাম চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত রক্তাশোকের বন। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারি হইয়াছে তাহারও পাশে উঁচু দেওয়ালের মত বড় বড় পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। সেই পাহাড়ের দেওয়ালে কত রকম মাটি আর পাথর দেখা যায়, একরকম মাটির পাথর ছিল, প্রায় দুই তিন ফুট চওড়া, তাহার মাটি এখন ঠিক যেন ছাইয়ের মতো। আমরা খুঁড়িয়া দেখিলাম, মনে হইল উপরে-নীচে পাথুরে মাটি, আর মাঝখানে একটা স্তর ছাইয়ের। অশোকের পাতা আর ছাই আমরা সঙ্গেও নিয়া আসিয়া-ছিলাম। এই সব দেখিয়া রামায়ণে বর্ণিত অশোকবাটিকা আর হনুমানের লঙ্কাদহনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

অনেক জায়গা ঘুরিয়া—তাহার মধ্যে একটি সুন্দর ও অতি প্রাচীন গুহা দেখিয়া— আমরা অনুরাধাপুর পেঁীছিলাম। এখানে বিশাল একটা স্তূপ আছে। লোকে বলে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এখানেই আসিয়া গয়া হইতে আনীত মহাবোধিবৃক্ষের একটি শাখা লাগাইয়া দেন। আমরা রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ঐখানে পেঁীছিলাম। একটি পিপুল গাছের পাশে বৌদ্ধদের এক ধর্মসভা বসিয়াছিল, একজন ভিক্ষু ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন।

জায়গাটার দৃশ্যও ভারি সুন্দর ছিল, মনের উপর ভারি সুন্দর একটা ছাপ পড়িয়াছিল। আমরা ধর্মোপদেশ তো কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কেবল শ্রোতারা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে যে "সাধু, সাধু" বলিতেছিলেন তাহাই বুঝিতেছিলাম। লোকেরা বলিল, এই সেই পিপুল গাছ, মহেন্দ্র যাহা আনিয়া লাগাইয়াছিলেন। অবশ্য বুদ্ধগয়ায় যে মহাবোধি-বৃক্ষ তাহাও কিছু ঐ সময়কার নয়, তবে ঐ স্থানে ঐ সময়ে লাগানো গাছের বংশধর। তেমনই, অনুরাধাপুরের গাছটিও হয় তো মহেন্দ্রের হাতে লাগানো নয়, সেই ঐতিহাসিক বৃক্ষেরই কোন বংশধর ঐ স্থানে আজ অবধি কোনমতে কায়েম হইয়া রহিয়াছে। আরও বেশি কৌতুক ও আশ্চর্যের কথা শুনিলাম যে, সেখানে যে প্রদীপটি জ্বলিতেছিল তাহাও নাকি মহেন্দ্রের হাতে জ্বালা। তাহারা বলে আজ অবধি সেই প্রদীপটি কখনও নিভে নাই। বাইশ-তেইশ শত বৎসর পর্যন্ত একইভাবে বৌদ্ধগণ প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। কথাটা যদি সত্য হয় তবে দুই হাজার বৎসরেরও বেশি দিন ধরিয়া জ্বলিতেছে এমন আর কোনও দীপশিখার কথা জগতে শোনা যায় নাই।

সিংহল ভ্রমণ শেষ করিয়া আমরা রামেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর যে-সকল তীর্থে প্রথমবার যাওয়া হয় নাই পরিবারের সকলকে সেইগুলি দেখাইয়া আবার ছাপরায় ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়াই শুনিলাম, আমাদের অনুপস্থিতির সময়ই দাদার অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। কিছুদিন বাদে উঁহার প্রস্রাবের মধ্যে চিনির মাত্রা একটু বেশি হওয়ায় ঘা শুকাইতে একটু বেগ পাইতে হইতেছিল; মাঝে একদিন তো অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সকলে বেশ চিন্তিত হইয়া পড়েন। আমরা বেড়াইতেছিলাম, কাজেই তারে খবর পাঠানও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় আমরা ফিরিবার আগেই ভয়ের অবস্থাটা কাটিয়া যায়, তখন ভালই ছিলেন। দিন কয়েকের মধ্যে আবার সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলেন।

ইউরোপ যাত্রা

হরিবাবুর মকদ্দমায় ডুমরাঁওয়ের মহারাজা প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিয়াছিলেন, আপীল পেশ করার সময় কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। হরিবাবুর ইচ্ছা সেখানকার ব্যারিস্টারদের সাহায্য করিবার জন্য আমি বিলাত যাই। আমি আগেই বলিয়াছি, অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভেই তিনি

আমার কাছে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে, এই মকদ্দমায় আমি বরাবর কাজ করিয়া দিব। এই কথা অনুযায়ী হাইকোর্টের মামলার সময়েও আমি কাজ চালাইয়াছিলাম, এখন বিলাত যাওয়ার কথা উঠিলেও অস্বীকার করিতে পারিলাম না। আর এই উপলক্ষ্যে বিদেশ হইতে ঘুরিয়া আসার একটা লোভও হইল। সেইজন্য আমি বিলাত যাত্রার জন্য তৈয়ারি হইতে লাগিলাম।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জনার্দন যে লোহা তৈয়ারি শেখার জন্য বিলাত গিয়াছিল, সে তখন সবে দেশে ফিরিয়াছে, জামসেদপুরের টাটা কোম্পানিতে কাজ পাইয়াছে। বিদেশে যাওয়া ও থাকার বিষয়ে তাহার ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শীতের জন্য গরম কাপড় তৈয়ারি করিতে দিলাম। আমি বরাবর খাদি পরি, বিলাতে গিয়াও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। সেইজন্য খাদিভাণ্ডার মারফৎ কাশ্মীরি পশমী কাপড় আনিয়া আমি পোষাক তৈয়ারি করাইলাম, পোষাকের ছাঁটকাট আমি দেশীই রাখিলাম। বিলাতের পোষাক পরিব না, এরূপই সঙ্কল্প করিলাম। ফলে দুইটি জিনিস দাঁড়াইল। খুব কম খরচে কাজ চালাইবার মত যথেষ্ট কাপড় তৈয়ারি হইবে, আর দেশী পোষাক বলিয়া ছাঁটকাটের ভুলচুক বিদেশীর চোখে ধরা পড়িবে না। ইংরেজের পোষাক-পরিচ্ছদ ও ধরনধারন স্বীকার করিলে উহাদের ফ্যাসান, রীতিনীতি, কাপড় পরার নিয়ম সব কিছু মানিয়া চলিতে হয়। নিজের নিয়মকানুন মানিয়া চলিলে এই সব ঝঞ্ঝাট থাকে না, বিশেষ আমার মত লোকের পক্ষে এই সব ঝঞ্ঝাট কম কথা নয়; কেন-না জীবনে কখনও কাপড়-চোপড় ও ফ্যাসানের দিকে মন দিই নাই। বস্ত্রকে চিরদিন আমি শরীর গরম রাখা ও লজ্জা নিবারণের উপায়মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছি, আর চিরদিন এই নীতি অনুসারেই আমি চলিয়াছি। ৪৫।৫০ বৎসর বয়সে নূতন ধরনে বিদেশী ফ্যাসান স্বীকার করিয়া নূতন আদবকায়দা অনুসারে পোষাক পরা আর বিভিন্ন সময়ে ঐ পোষাক বদল করা, এই সব আমার পক্ষে কম শক্ত কথা নয়। আর তাহাতে খরচও যথেষ্ট বাড়িয়া যাইত। এইজন্য বিদেশেও আমার নিজের চালচলন বজায় রাখাই ঠিক মনে করিয়া সেইমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম।

হরিবাবুর ইচ্ছা আমি সব রকমে আরামে থাকি, সেইজন্য ইংলণ্ডেও যতদিন তাঁহার কাজের জন্য থাকিতে হইবে, যথাসাধ্য আরামের ব্যবস্থা যেন করা হয়। তিনি আগ্রহভরে বলিলেন, আমি যেন সবটাই ফার্স্ট ক্লাসে যাই আর কাজকর্মের সুবিধার জন্য এখান হইতে নিজের চাকর সঙ্গে লইয়া যাই। আমার বন্ধুরা যাঁহাদের বিলাত সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারা কেহই চাকর লওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, কিন্তু হরিবাবু

মানিলেন না। আমি গোবর্ধনকে সঙ্গে লইলাম। মার্চ মাসের গোড়াতেই এক শুভদিনে, তাঁহাদের জ্যোতিষী যে-দিনটিকে ভাল বলিয়াছিলেন, আমি বাড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া বোম্বাইয়ে পোঁছিলাম। সেইখানে খাদি-ভাণ্ডারকে আরও কিছু কাপড়ের অর্ডার দিয়া মহাত্মা গান্ধীর কাছে বিদায় লওয়ার জন্য সবরমতী ঘুরিয়া আসিলাম। ইংলণ্ড রওয়ানা হইবার দিন দাদাও বোম্বাইয়ে পোঁছিলেন। কাইসার-ই-হিন্দ জাহাজে আমি বোম্বাই হইতে যাত্রা করিলাম।

এই আমার প্রথম বিদেশ-যাত্রা। আমি দেশেও এমন লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করি নাই যাহারা বিদেশী ধরনে থাকে আর খাওয়া-দাওয়া করে। যাওয়ার আগে একদিন শ্রী (পরে ডাঃ) সচ্চিদানন্দ সিংহ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বাড়িতে টেবিলে বসাইয়া খাওয়ান। সেইদিন আমি কাঁটা চামচের ব্যবহার দেখিয়া লইয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে এক পার্সী ভদ্র-লোক জাহাজে আমার কেবিনের সঙ্গী ছিলেন। তিনি বেড়াইতে যাইতে-ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল। কিন্তু পরিচিত অপরিচিত অন্য কোনও বন্ধু-বান্ধব এই জাহাজে ছিলেন না। আমার স্বভাবতই নূতন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য আগাইয়া যাইতে বড় সঙ্কোচ। সেইজন্য দুই-একদিন পর্যন্ত দেশী বিদেশী কাহারও সঙ্গে আমার দেখাশোনা বা আলাপ পরিচয় হইল না। কিন্তু আমি দেখিতাম, আমার স্বদেশীয় পোষাকের দিকে অনেকেরই চোখ পড়িতেছিল। আমি ডেকের উপর নিজের চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতাম, অথবা পায়চারি করিতাম। সমুদ্র ভারি শান্ত ছিল, তাই মাথা-ঘোরা প্রভৃতি কোনও জাতীয় অসুস্থতা বোধ করি নাই।

দুই দিন পরে পেন্সনভোগী আই. এম. এস. একজন ইংরেজ ভদ্র-লোক আমার নিকটে আসিলেন। আলাপ শুরু করিয়া তিনি বলিলেন, আমার খদ্দরের পোষাক আর এই চুপচাপ একান্তে বসিয়া থাকা তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পেন্সন লওয়ার পর কি একটা কমিশনের মেম্বার হইয়া আবার তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। স্বামী স্ত্রী দুইজনেরই ভারি মিষ্ট স্বভাব। তাঁহারা গান্ধীজীর বিষয়ে কিছু কিছু জানিতেন, খদ্দরের সম্বন্ধেও খবরের কাগজে কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। বড় ইচ্ছা ছিল ভারতে একবার গান্ধীজীর দর্শন পাইবেন, কিন্তু সুযোগ হয় নাই। কথাবার্তায় তাঁহারা যখন গান্ধীজীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। সর্বদাই আমার সঙ্গে গল্পসল্প করিতেন। আমি মাছ-মাংস খাই না জানিয়া তাঁহাদের বড় কৌতূহল বোধ হইল। তাঁহারাও মাংসাহারী নন। তাঁহারা একটা কথা বলিয়া আমাকে

চমকিত করিয়া দিলেন, বলিলেন যে, নিরামিষাশী হইয়া ভারতবর্ষে থাকা বড় কঠিন ব্যাপার। কেন না নিরামিষাশীর উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য এখানে কমই মেলে। তাঁহাদের নিকটে শুনিলাম, ইংলণ্ডে, এবং সমস্ত ইউরোপে, এমন বহু ভোজনাগার আছে যেখানে নিরামিষ আহার্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। শাকসব্জী প্রচুর পাওয়া যায়, দুধ আর দুধের তৈয়ারি নানা রকম খাবার জিনিস যথেষ্ট মেলে। তবে ঐখানকার লোকেরা ডিমকেও নিরামিষ বলিয়া গণ্য করে। তাঁহারা আমাকে বলিয়া দিলেন যে, ইংলণ্ডে যদি কোন রেস্তোরাঁয় আমি খাইতে যাই তবে যেন আগেই বলিয়া দিই যে আমার ডিমও অচল, তবেই উহারা ডিমবর্জিত খাদ্য দিবে, নতুবা সবকিছু জিনিসেই কোন না কোন রূপে ডিম থাকিবেই। এই সঙ্গে তাঁহারা আরও বলিলেন, ডিমছাড়া বিস্কুট ইত্যাদিও সর্বত্র মেলে না; তবে কোন দোকানদার যদি বলে যে তাহার জিনিস ডিমছাড়া তৈয়ারি তবে তাহাতে বিশ্বাস করা চলে, কারণ সত্য কথা বলাই তাহার স্বার্থ—ডিমের দাম অনেক। আমার কাছে তো সবই নতুন কথা, এই দম্পতীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় এই রকম বহু দরকারি কথা আমার জানা হইল। প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগে এমন একটি সাধারণ বিধি তাঁহারা বলিয়া দিলেন। আমি বিদেশেও নিজের আচার-অভ্যাস মতই দিনগুলি কাটাইতে পারিলাম।

পথেই শুনিলাম, জাহাজ যতক্ষণ সুয়েজ খালে থাকিবে তাহারই মধ্যে টমাস কুক কোম্পানির ব্যবস্থা আছে যে, যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে মোটর গাড়ি করিয়া কায়রো শহর ও আর একটু দূরে অবস্থিত স্ফিংক্স মূর্তি দেখিয়া আসিতে পারে। আমার এই ব্যবস্থাটা ভাল লাগিল, ঠিক করিলাম নামিয়া ঐসব দেখিয়া লইব। আমার মত আরও কয়েকজন টমাস কুকের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। খুব ভোরে আন্দাজ পাঁচটার সময় জাহাজ হইতে নামিয়া আমরা মোটর গাড়িতে যাত্রা করিলাম। কায়রো পেঁাছিয়া মুখহাত ধোওয়া এবং হাল্কা প্রাতরাশের জন্য আমাদের এক হোটেলে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার পর কায়রোর মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। পিরামিড দেখিতে গেলাম। পিরামিড হইতে খনন করিয়া বাহির করা বিবিধ বস্তু সেখানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সংগ্রহটি চমৎকার! প্রাচীন মিশরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী বড় বড় কয়েকজন সম্রাটের পিরামিড হইতে পাওয়া শব (মমী) সেখানে সুন্দর ভাবে রাখা হইয়াছে। এখন সেগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু মানুষের মুখ এবং হাত পা ঠিক যেমন তেমনই রহিয়াছে। শবদেহ যে সূক্ষ্ম বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া সমাধিস্থ করা হইয়াছিল, আজ পর্যন্ত সেই বস্ত্রই উহাদের শরীরের সঙ্গে আঁটিয়া রহিয়াছে। সেই কাপড়গুলি নিতান্তই মিহি, আর শোনা যায় তাহা নাকি আমাদের ভারতবর্ষ হইতেই যাইত। তখনকার কালে ঐ দেশের

বিশ্বাস ছিল যে আরামের যাবতীয় উপকরণ যদি মৃতদেহের সঙ্গে দিয়া দেওয়া হয় তবে পরলোকেও মৃত ব্যক্তি আরামে থাকিবে। এই বিশ্বাসের বশেই পিরামিডের ভিতরে শবদেহের সঙ্গে আবশ্যক সব কিছু জিনিস পুঁতিয়া রাখা হইত—পড়িবার কাপড়, গহনা, বসিবার চৌকী, খাইবার অন্ন, সাজসজ্জার বস্তু, আরোহণ করিবার জন্য ঘোড়া, নৌকা সব কিছু। ইহাদের প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর ভাবে তৈয়ারি। দেখিয়া মনে হয়, তখনকার দিনেও লোকে সোনার ব্যবহার জানিত।

শুনিয়াছি, এইভাবে খুঁড়িবার ফলে সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোতে যে-গম পাওয়া গিয়াছিল তাহা নাকি বুনিয়া দিলে গজাইল। যাদুঘরের সংগ্রহ আর প্রতাপশালী রাজাদের শবগুলি দেখিয়া মনুষ্য-জীবনের অনিত্যতা যেন চোখের উপর দেখিতে পাইলাম। এই সব দেখিলে বেশ বোঝা যায়, আমরা নিজেদের বাহাদুরির গর্বে যাহা কিছু করি না কেন, সবই কত তুচ্ছ ও অনিত্য। যে-সকল বাদশাহের বিষয় শোনা যায় যে তাঁহাদের কালে কতই না অত্যাচার করিয়াছেন তাঁহাদের শব আজও এইভাবে পড়িয়া আছে। বিশেষভাবে মিশরের ইতিহাস যাঁহাদের পড়া নাই তাঁহাদের কাছে তো ইঁহাদের নামও অজানা। আমি কয়েকখানা ছবি কিনিলাম। যাদুঘর দেখা যদিও বেশ ভালভাবে শেষ হইল কিন্তু আমার মনে মানবজীবনের অসারতার কথা বড় গভীর ছায়াপাত করিল। উদাস মন লইয়া ঐখান হইতে ফিরিলাম।

যাদুঘর দেখিবার পর আমাদের শহরের কয়েকটি অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত অট্টালিকা এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখান হইল, তাহাদের মধ্যে ভারি সুন্দর একটি মসজিদও ছিল। মিশরের মুসলমানেরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়ে, কেন না কাবা ঐখান হইতে পূর্বদিকে পড়ে। ভারতবাসীর কাছে ইহা একটু অদ্ভুত মনে হয়। ঐখানকার মসজিদগুলি ভারতবর্ষের মসজিদের মত পূর্বমুখী না হইয়া পশ্চিমমুখী। এই বড় মসজিদটিও তাই। দেশের ভাষা আরবী, কিন্তু ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে ফরাসী ভাষারই সেদেশে বেশি প্রচলন। লোকেরা বেশ ফর্সা, পুলিসের মাথায় ফেজ টুপী। কায়রো পুরাতন শহর, তবে আমরা যে-দিকটা দেখিলাম সেই দিকটা অনেকখানি আজকালকার শহরেরই মত।

দুপুরের খাওয়া সারিয়া আমরা কিছুদূর মোটরে চড়িয়া পিরামিড দেখিতে গেলাম। এক জায়গায় মোটর ছাড়িয়া দিতে হইল, পিরামিড পর্যন্ত উটের পিঠে যাইতে হইল। উটে চড়া আমার পক্ষে একেবারে নূতন। দেশে আমি কখনও উটের পিঠে উঠি নাই। অবশ্য একবার উঠিয়া পড়িলে আর তেমন কিছু মনে হয় না। পিরামিডের একেবারে কাছে গিয়া দেখিলাম। কতকগুলি খুব উঁচু চতুষ্কোণ ইমারত। আমাদের

দেশে যেমন বড় বড় ইঁটের পাঁজা তৈয়ারি হয় ইহাও সেইরূপ পাথরের বড় বড় টুকরা কাটিয়া তৈয়ারি। আর পাঁজার মতই নীচেটা বেশি চওড়া, উপরের দিকে ক্রমে কম চওড়া। ইঁটের পাঁজা তো ছোট ব্যাপার, এইগুলি যেমন বিশাল তেমনি উঁচু। উচ্চতায়, বিশালতায় ইমারতগুলি যে পরিমাণে বড়, ইহাদের পাথরগুলিও ইঁটের চেয়ে সেই পরিমাণেই লম্বা চওড়া ও মোটা। আমার ধারণা, এক-একখানা পাথর লম্বায় চার পাঁচ হাত হইবে। চওড়া এবং মোটাও সেই অনুপাতে। কতদিন ধরিয়া এক-একখানা এত বড় পাথরের ইঁট কাটিয়া এইগুলি তৈয়ারি হইয়াছিল কে জানে। কত গরীব বেচারির জীবনের কত দিন না জানি লাগিয়াছিল। এইগুলি এক-একজন রাজার মৃত্যুর পরেও তাহাদের নাম চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল! নাম তো এখন কেবল বইয়ের পাতায়! আর ইমারতগুলি মানুষের যাহাতে কোনই লাভ নাই, হাজার হাজার বছর পরেও আজ পর্যন্ত নিজের নিজের জায়গা ঠিক যেমন ছিল তেমনই দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির ভিতর খনন করা হইয়াছে। সেইখান হইতে বাহির করা আসবাবপত্রের সংগ্রহই যাদুঘরে রাখা আছে। আমার মনে পড়ে, সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে এই কবর যাহারা খুঁড়িত, তাহাদের মৃত্যু হইত। যে কেহ এজন্য কাজে লাগিত সেই মৃত্যু-মুখে পড়িত। খননকারীর তো মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু খননের ফলে অনেক কিছু উপকরণ পাওয়া গিয়াছে।

স্ফিংক্স ছিল এক অদ্ভুত জিনিস। মানুষের মুখ, কিন্তু পশুর দেহ: ঐ মরুদেশে এইরকম আকৃতির এক বিরাট মূর্তি। শোনা যায়, প্রাচীন কালে ইহার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত, আর এই মূর্তি ভবিষ্যতের কথা বলিয়া দিত। তবে কিনা এ যাহা বলিয়া দিত তাহা বোঝা খুবই কঠিন ছিল। এখন সেই সব কথা তো নাই, কিন্তু মূর্তিটি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ফিরিয়া আসিয়া ট্রেনে উঠিলাম। পোর্ট সৈয়দ পেঁছিতে রাত প্রায় এগারটা হইল। জাহাজ ততক্ষণে আসিয়া গিয়াছে, আমরা নিজের নিজের কামরায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। খাওয়া-দাওয়া তো ট্রেনেই হইয়া গিয়াছিল।

ভূমধ্যসাগরে পেঁছিয়া একটু ঠাণ্ডা বোধ করিতে লাগিলাম। লোহিত সমুদ্র তো বেজায় গরম ছিল, আরব সাগরের অপেক্ষাও বেশি। ভূমধ্য-সাগরে হাওয়াও বেশ জোরে বহিতে লাগিল, সেজন্য জাহাজ একটু দুলিতেছিল। আমার একদিন সামান্য একটু বমির ভাব হইয়াছিল, এমন বেশি কিছু নয়। পথে যাহা কিছু দেখিবার ছিল, আমি সবই দেখিতে গিয়াছিলাম। ইটালির অদূরে সিসিলি দ্বীপের কাছে গিয়া জাহাজ

থামিল। এখান হইতে কিছু দূরে শহরটি দেখা গেল। পাহাড় তো পরিষ্কার দেখা গেল। দিনকয়েক পরেই আমরা মার্সেলসে পৌঁছিয়া গেলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু আর ঘটে নাই। মাঝে মাঝে কোথাও যখন উপকূল দেখা যাইত, সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতে থাকিতাম। সমুদ্রযাত্রায় চারিদিকে জল, শুধু জল। দিনরাত জল দেখিতে দেখিতে দুই চারি দিনের মধ্যেই উৎসাহ নিবিয়া যায়। যদি অন্য কোন জাহাজ বা তীরভূমি চোখে পড়ে, মনে তবে বড়ই আনন্দ হয়। যাত্রীরা সকলে এমন ভাবে সেই দিকে চাহিয়া থাকে, যেন জন্মে তাহারা কখনও মাটি চোখে দেখে নাই।

ভোরবেলা মার্সেলসে পৌঁছিলাম। একটা হোটেলে গিয়া উঠিলাম। এইখানেও কুক কোম্পানির কৃপায় শহরের দর্শনযোগ্য জায়গাগুলি সব দেখিয়াছিলাম। টমাস কুকের ব্যবস্থা খুব ভালো। উহাদের দোভাষী সঙ্গে থাকিয়া প্রধান প্রধান জায়গাগুলি দেখাইয়া আনে, কোম্পানির নিজের মোটর আছে, এমন সুন্দর ব্যবস্থা যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লোকে সব কিছু দেখিতে পায়। সকাল বেলা জাহাজ হইতে নামিয়াই রাত্রিবেলায় ছাড়িবার গাড়ীতে আমি নিজের জন্য জায়গা ঠিক করিয়া গিয়াছিলাম। সারা দিন খুব হৈ হৈ করিয়া রাত্রির গাড়ীতে প্যারিসে রওয়ানা হইলাম। প্যারিসে গাড়ী বদল করিয়া আমরা ক্যালে পৌঁছিলাম। সেখানে আবার জাহাজে চড়িয়া সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ডোভারে উপস্থিত হইলাম। ডোভারে রেলে চাপিয়া আমরা রাত্রি প্রায় ১টার সময় লণ্ডনে পৌঁছিলাম। আমাদের লণ্ডন পৌঁছিতে পৌঁছিতে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ হইল, তখনও সেখানে বেশ শীত। স্টেশনে এক বন্ধু আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে সোজা আমাদের জন্য আগে হইতে ভাড়া করা বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। বাড়ীটি গোল্ডার্স গ্রীনে। সেই বাড়ীতে বেশ কিছুদিন ছিলাম।

আগে হইতেই সব বন্দোবস্ত করা ছিল। ব্যারিস্টার শ্রীমহাবীরপ্রসাদ আর কুমার বাহাদুর পূর্ব হইতেই সেখানে ছিলেন। সেই জন্য আসিয়া মনে হইল যেন নিজের বাড়ীতেই আছি। তাহার উপর গোবর্ধন সঙ্গে থাকায় খাওয়াও দেশী ধরনেই হইল। এদেশে যেমন আমরা ভাত, ডাল, রুটি তরকারি খাই, সেইখানেও তাহাই খাইতাম। আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য মামলার তদ্বির করা। পৌঁছিয়াই লোকজনের সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা সারিয়া শুইয়া পড়িলাম। গিয়াই বুঝিলাম, ভোরে উঠিয়াই আমাকে ব্যারিস্টারের বাড়ি যাইতে হইবে, তিনি ব্যক্তিগত পরামর্শের জন্য সময় দিয়াছেন। ফলে, লণ্ডনে পৌঁছিবার বারো ঘণ্টার মধ্যেই আমি কাজে লাগিয়া গেলাম। মকদ্দমা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ঐ কাজেই লাগিয়া থাকিতে হইল।

এখানেও আমার অভ্যাসমত খুব প্রত্যূষে উঠিতাম। কিন্তু এখানকার লোকেরা অনেক দেরি পর্যন্ত সকালে শুইয়া থাকিত। বেশির ভাগ লোকে রাত্রির প্রথম প্রহরেই জাগিয়া কাজ করিত। আমি কখনও এরূপ করি নাই। সেখানেও এইরূপ করিতে পারি নাই। যখন সকলে শুইয়াই থাকিত, তখন আমি হাত মুখ ধুইয়া স্নান করিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া ঘরে গিয়া বসিতাম ও মকদ্দমার কাগজ পড়িতে শুরু করিতাম।

সকলে সকালে প্রায় নয়টা সাড়ে নয়টায় প্রস্তুত হইত। ততক্ষণে আমি প্রায় দুই ঘণ্টা কাজ সারিয়াছি। তাহার পর জলযোগ করিয়া প্রায় দশটায় লাইব্রেরিতে চলিয়া যাইতাম। সেখানে আইনের পুস্তক পড়িতে থাকিতাম। ওখানকার এটর্ণি লাইব্রেরিতে আমাদের জন্য সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে ইংরেজী আইনের সর্বপ্রকার পুস্তক দেখিতে পাওয়া যাইত। বেলা ১টা পর্যন্ত এইভাবে কাজ করিয়া নিকটেই এক নিরামিষ-ভোজীদের রেস্তোরাঁতে চলিয়া যাইতাম। সেখানে কিছু ফল, রুটি, দুধ ইত্যাদি খাইতাম। বলিলেই ডিম ছাড়া আর সমস্ত তৈয়ারি করিয়া দিত। ওখানকার লোকেরা আমাকে দুই-একদিনের মধ্যেই চিনিয়া লইয়াছিল, তাই একবার গিয়া পৌঁছিলে মুখে কিছু না-বলিলেও চলিত। আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোর্টে কাজ করিয়া প্রায় ছয়টা বাজিতে ফিরিয়া আসিতাম। যাওয়া-আসা রেলেই চলিত, সে-রেল মাটির নীচে যাতায়াত করিত। বাড়িতে সান্ধ্য ভোজন করিয়া সন্ধ্যার পর বেশ কিছুক্ষণের জন্য বেড়াইতে যাইতাম এবং ফিরিয়া আসিয়া কিছু কাজ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। কোন কোন দিন ব্যারিস্টারদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ হইত। সেই-মতো এই নিয়মের অদল-বদল হইত। প্রায় দুইমাস এইভাবে কাটিল। তাহার পর হরিবাবুও আসিয়া পড়িলেন। ইহার মধ্যে আমাকে কয়েক-দিনের জন্য হাইথে গিয়া থাকিতে হইল।

আমাদের পক্ষের সিনিয়র ব্যারিস্টারদের মধ্যে ছিলেন মিঃ লক্সমুর, ইনি অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার হাইকোর্টের জজ হইয়া যান। তাঁহার বাড়ি ছিল হাইথের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্রামে। ঈস্টারের ছুটিতে তিনি বাড়ি গেলেন। আমাদের দিক হইতে তাঁহাকে বলা হইল যে এই মকদ্দমা বড়ই জটিল, যদি আপনি বলেন তবে কাগজ পড়ার বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আপনার সঙ্গে সেখানে যাইবে। প্রথমটায় তিনি রাজি হন নাই, কিন্তু পরে অনেক বলা-কওয়ায়

রাজি হইয়া গেলেন। আমি হাইথে থাকিয়া গেলাম। সেখান হইতে তাঁহার বাড়ি সাত-আট মাইল দূরে। রোজ সকালে নয়টায় তাঁহার মোটর গাড়ি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইত। সাড়ে নয়টা হইতে আমরা কাজ আরম্ভ করিতাম। মধ্যে এক ঘণ্টা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আর আধ ঘণ্টা চায়ের জন্য বাদ দিলে প্রায় সাড়ে ছয়টা-সাতটা পর্যন্ত কাজ করিতাম। আমি পুনরায় ঐভাবে হাইথে চলিয়া আসিতাম। দুপুরের খাবার উঁহাদের বাড়িতেই খাইতাম। তাঁহার পত্নী আমি যে নিরামিষাশী সে-কথা জানিতেন। তিনি সেজন্য ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। প্রায় পনের দিন ধরিয়া সেখানে ছিলাম। কাজের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

আমাদের সর্বাপেক্ষা সিনিয়র ব্যারিস্টার ছিলেন মিঃ আপজন। তাঁহার বয়স তখন পঁচাত্তরেরও বেশি ছিল। তখনও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মকদ্দমার কাগজপত্র ছাপায় প্রায় পনের হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী। বিষয়টিও ছিল খুব জটিল। কখনও কখনও পঁচিশ ত্রিশ পৃষ্ঠার একই কাগজে আমাদের কাজের অংশ পাইতাম শুধু তিন-চার পঙ্‌ক্তি। আমাদের নিকটে পাটনা হইতেই পুরা নোট তৈরি ছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম যদি আমরা ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে বসিয়া এই সকল দলিলের আবশ্যকীয় অংশের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তবে তাঁহাদের সময় বাঁচিয়া যাইবে। এইজন্যই চাহিতেছিলাম যে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সেইসব কাগজ পড়ুন। প্রথমে কেহই রাজি হন নাই, পরে মিঃ লক্সমুর রাজি হইয়া গেলেন। মিঃ আপজন রাজি হইলেন না। এজন্য পৃথক ফি দিতে চাহিলাম। এখানে ভারতবর্ষে এইরূপই হইত। কাগজ পড়িবার জন্য যখন আমাদের কাহারও সঙ্গে সিনিয়রেরা বসিতেন তখন সেজন্য ঘণ্টা পিছু ৮৫৲ পৃথক ফি লইতেন। এইভাবে প্রায় পনের হাজার পৃষ্ঠা ঘণ্টায় ৮৫৲ হিসাবে পড়ানো হইল। হরিবাবু চাহিয়াছিলেন যে খরচ যাহাই হউক, ওখানেও এই ব্যবস্থা চলুক। কিন্তু মিঃ আপজন, যিনি আমাদের দিক হইতে সর্বপ্রথমে সওয়াল জবাব করিবেন, তিনি এবিষয়ে কিছুতেই রাজি হইলেন না। তাঁহার বক্তব্য ছিল এই যে, যে ফি আমরা পাইয়াছি তাহা শুধু এজলাসে বসিবার বা দাঁড়াই-বার জন্য নহে, কাগজ পড়াও আমাদের কর্তব্য : কারণ তাহা না হইলে ওখানে যাওয়া আমাদের নিষ্ফল, তাই কাগজ পড়িবার জন্য আলাদা ফি লইব না। আর নিজের কাজ নিজেই করিব,—হাঁ, তবে কোনও বিষয়ে নোটের দরকার হইলে চাহিব, তোমাদের কোনও মন্তব্য দিতে হইলে দিয়া দাও, আমি তাহা দেখিয়া লইব; কাগজপত্র পড়িবার জন্য অন্য কাহারও সঙ্গে একত্র বসার কোনও রেওয়াজ এদেশে নাই, যখন অন্য কাহারও সঙ্গে

বসিয়া কিছু দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইবে তখন ডাকাইয়া পাঠাইব, এবং সেজন্য তাহার যে ন্যায্য ফি—কনসাল্টেশনে যেমন লওয়া হয়—তাহা লইব।

হরিবাবু খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেলেন; কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এতখানি বয়োবৃদ্ধ এতগুলি কাগজপত্র নিজে সম্পূর্ণভাবে হয়তো পড়িতেই পারিবেন না। আর পড়িতে পড়িতে অস্থির হইয়া যাইবেন; কারণ, উপরে যেমন বলা হইয়াছে, একটা অতি দীর্ঘ কাগজপত্রে পঁচিশ ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ার পর দুই-চার পঙ্‌ক্তি কাজের বলিয়া পাওয়া যাইবে; এমন হইতে পারে যে তিনি ঐ কয় পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়া অগ্রসর হইবেন, কেন এই কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিবেন না। যখন তাঁহাকে এ-কথা বলা হইল যে আপনার অনেকটা সময় বাজে জিনিস পড়িতে নষ্ট হইবে, তখন তিনি জবাব দিলেন, 'আমি এক লাইনও না-পড়িয়া বাদ দিব না—তোমরা মনে করিতেছ তোমরা যে দুই-চার পঙ্‌ক্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছ শুধু উহাই বুঝি দরকার; কিন্তু সওয়াল জবাব আমাকে করিতে হইবে, এমনও হইতে পারে যে আমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে অন্য এমন দুই-চার পঙ্‌ক্তি বাহির করিব যাহা আমাদের কাজে লাগিবে অথচ তোমরা অদরকারি মনে করিয়াছ; তাই আমি সমস্ত জিনিস একাই পড়িব, এবং যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয় তো জিজ্ঞাসা করিব।'

একথার কোনও উত্তর ছিল না। হরিবাবুকে চুপ করিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তিনি ভয়ে ভয়েই থাকিলেন।

প্রিভি কাউন্সিলের ব্যবস্থা এই যে উভয় পক্ষই নিজের নিজের যুক্তির সারাংশ লিখিয়া দাখিল করে। ইহাকেই বলে 'কেস পেশ করা'। খুব সতর্ক হইয়া কেস তৈয়ারি করিতে হয়; কারণ উহার বাহিরের কথা লইয়া যুক্তিতর্ক চলে না। এক পক্ষ নিজের কেস দাখিল করিবার পূর্বে অন্য পক্ষের কেস দেখিতে পায় না। এইজন্য উভয় পক্ষকেই নিজের কেসের ভিতর বিপক্ষ পক্ষের কেসের উত্তরও পূর্ব হইতেই আন্দাজ করিয়া দিয়া দিতে হয়। মিঃ আপজন আমাদের কেস তৈয়ার করিলে আমরা সকলে উহা দেখিলাম। আমাদের সকলেরই, বিশেষ করিয়া হরিবাবুর, পুরা বিশ্বাস হইল যে তিনি সমস্ত জটিলতাই ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন, এবং অন্য সমস্ত কাগজপত্রই আদ্যোপান্ত পড়িয়া লইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমরা সম্পূর্ণ তুষ্টি লাভ করিলাম। আইনব্যবসায়ীদের আচরণের এক অতি উচ্চ আদর্শ আমার দৃষ্টিতে আসিল। আমি তো মুগ্ধ হইয়া গেলাম। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, নিজের দেশে এত উচ্চ আদর্শ আমি দেখি নাই।

মিঃ আপজনের সঙ্গে আমার পরিচয় বিচিত্রভাবে অগ্রসর হইল। আমার ভারতীয় বেশভূশা দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে আমিই হয়তো

হরিবাবু, নয়তো তাঁহার কোনও আত্মীয়, মকদ্দমার তদ্বির করিতে আসিয়াছি! আমি যে উকিল তাহা তিনি জানিতেন না। একদিন পরামর্শসভায় তিনি কোনও প্রশ্ন করিলেন। আমি পিছনে বসিয়াছিলাম, উত্তর দিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না। পরে আমাদের মধ্য হইতে একজনের নিকটে—যিনি উকিল হিসাবে তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন—তিনি বলিলেন যে আমাদের মক্কেল তো খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়, আমার প্রশ্নের তিনি বেশ উত্তর দিয়াছিলেন। তখন আমাদের সহকর্মী আমার বিষয়ে বুঝাইলেন যে আমি মক্কেল নই, একজন উকিলই, নিজে ওকালতি ছাড়িয়া দিয়াছি। ইহাতে তাঁহার কৌতূহল বাড়িল। পরে তিনি আমার নিকট হইতে অনেক কাজ আদায় করিয়া লইয়াছেন। অনেক প্রকার 'নোট' তৈয়ারের ফরমায়েস করিয়াছেন। আমি বরাবর তৈয়ার করিয়া দিয়াছি। মকদ্দমা পেশ করিবার সময় আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি এজলাসে উপস্থিত থাকিতে চাও? আমি সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় বলিলেন : তাহার প্রয়োজন নাই, তোমার সময় অন্যভাবে ভাল ব্যয় হইবে, আমার নানাবিষয়ে নোট চাই, তুমি ঘরে বসিয়া সেগুলি তৈয়ার কর। আমি বলিলাম : যদি নোট তৈয়ার করিয়া দিই, ঘরে বসিয়া থাকার প্রয়োজন না হয়? তিনি বলিলেন : না, নোট তৈয়ার করিতে সময় লাগিবে, তুমি হাজির হইতে পারিবে না; তবে তুমি যদি নোট করিতে দেরি না-কর, আর এজলাসে হাজির থাকিতে পার, তবে আমার কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু নোট করিতে দেরি করিলে আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। একথা সকলেই জানিতেন যে তিনি অত্যন্ত বদমেজাজের ছিলেন, নিজের দলের ও বিরোধী দলের ব্যারিস্টার ও জজদের উপরও রাগ করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে আমি খুব ভয় করিতাম; কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম যে তিনি আমার প্রস্তুত নোট দেখিয়া খুশী হইতেন। তিনি টেলিফোন করিয়া দিতেন যে আমি যেন এজলাস আরম্ভ হওয়ার পাঁচ দশ মিনিট পূর্বে তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা করি। সেখানে তিনি ঘর হইতেই সেই সকল বিষয়ে নোট করিয়া আনিতেন যাহাদের সম্বন্ধে আমাকে দিয়া নোট লেখাইয়া লইতে চাহিতেন। আমাকে ঐ সকল নোট লিখাইয়া দিতেন। আমি তাঁহার পূর্বের নোট দেখিয়া আসিতাম আর যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিত তবে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম। আমি যদি প্রথম হইতেই কাগজ পেনসিল লইয়া প্রস্তুত না থাকিতাম তবে তাহাতেও তিনি চটিয়া যাইতেন। সময়ের এতটা সদ্ব্যয় করিতেন যে এক মিনিট নষ্ট হইতে পারিত না।

আর একটা জিনিস দেখিলাম। ইহা আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া পাটনা ও কলিকাতার, উকিল ও ব্যারিস্টার সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

ওকালতি করিবার সময় আমাদের বোধ হইত যে কোর্টে যাওয়ার পর যে পর্যন্ত ঘরে ফিরিয়া না আসিতাম ততক্ষণ আমাদের অধিকাংশ সময় নিজের নিজের মকদ্দমা পেশ করিতে না হইলে প্রায়ই বৃথা নষ্ট হইত। বার-এসোসিয়েশনে বা পুস্তকালয়ে বসিয়া আমরা খুব কমই কাগজপত্র বা পুস্তকাদি পড়িতাম। মকদ্দমার কাজকর্ম ঘরে বসিয়াই যাহা করার করিতাম। কোর্টে যখন মকদ্দমা পেশ হয় এবং তাহা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ পর্যন্ত যাহার মকদ্দমা তাহার তো ঐ সময়টা কাজে লাগে, কিন্তু অন্য যাহাদের মকদ্দমা পেশ না-হয় তাহারা শুধু গল্পসল্প করিয়াই সময়টা কাটাইয়া দেয়। কখনও কখনও শতরঞ্চ খেলাও জমিয়া ওঠে। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও এই ছিল যে ওখানে বসিয়া কাগজপত্র দেখা বা বই পড়া বড় কঠিন, কারণ আবহাওয়া তাহার অনুকূল নয়। যেখানে লোকে গল্পসল্প কি হাসিঠাট্টা করিতে থাকে সেখানে কি কাগজ পড়িতে পারে? এইজন্য মকদ্দমার কাগজপত্র পড়িবার সমস্ত সময় বাড়িতেই ব্যবস্থা করিতে হয়। আমার হাতে যথেষ্ট মকদ্দমা থাকিত। এজন্য আমাকে বরাবর প্রায় তিনটা চারটার সময় উঠিয়া প্রস্তুত হইতে হইত। ওখানে দেখিলাম, ব্যারিস্টার নিজের সমস্ত কাজকর্ম হয় লাইব্রেরিতে নয় তো নিজের চেম্বারে বসিয়াই শেষ করেন। এজলাসে জজেরা বসিবার কিছু পূর্বেই আসিয়া যান। পুনরায় এজলাস উঠিয়া যাইবার পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকিয়া যান। মাঝখানে যখন মকদ্দমা পেশ করার মধ্যে ছুটি মেলে তখনও কাজ করেন। কেহ কেহ বাড়িতে মকদ্দমার কাগজপত্র লইয়াও যান না। এমন কি, বাড়িতে আইনের বইপত্রও রাখেন না। তাঁহাদের [illegible] এই যে, ঘর তো ঘরই—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশা, কথাবার্তা বলা, খাওয়া-দাওয়া, চিত্তবিনোদন করা, অথবা মন চায় তো ইচ্ছামত নানা পুস্তক পড়া, এই সমস্ত চাই। মকদ্দমার কাজকর্ম তো সারাদিন হয় চেম্বারে নয় তো এজলাসেই করা উচিত। এই প্রকারে দিনের সমস্ত সময় ঠিক ঠিক কাজে লাগে, এবং রাতটা ও সকাল বেলাটা নিজের থাকে। আমরা যেমন চাই তেমনভাবে উহা কাজে লাগাইতে পারি।

ওখানকার বহু উকিল ব্যারিস্টার শনিবার ও রবিবার লণ্ডন হইতে বাহিরে চলিয়া যান। মিঃ আপজন প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় এজলাস হইতে উঠিয়া সোজা স্টেশনে যান। সেখান হইতে রেলপথে লণ্ডন হইতে প্রায় সত্তর মাইল দূরে নিজের গ্রামের বাড়িতে গিয়া থাকেন। পুনরায় রবিবার সন্ধ্যায় লণ্ডনে চলিয়া আসেন। সপ্তাহের শেষের দুই দিন সর্বদা গ্রামের খোলা হাওয়াতেই কাটান। আমাদের ইচ্ছা ছিল যতদিন আমাদের মকদ্দমার বিচার চলিতে থাকে ততদিন তিনি লণ্ডনেই থাকেন। আমরা বুঝিয়া-ছিলাম যে শনিবার রবিবারই অন্যপক্ষের ভাষণাদি ও নিজেদের কথাবার্তা

তাঁহাকে বলিবার সুবিধা পাইব; কারণ অন্যদিন তো সমস্ত সময় এজলাসেই লাগিয়া যাইবে। তাঁহাকে বলা হইল যে আপনি শনিবার লণ্ডনেই থাকিয়া যান, মকদ্দমার বিচার চলিতে থাকিলে যেমন ফি লইয়া থাকেন ঐ দুইদিনও তেমনি ফি পাইবেন। তিনি একথায় রাজি হইলেন না। ফি-এর লোভও তাঁহাকে নিজের এই নিয়ম হইতে টলাইতে পারিল না। শেষে অনেক জিদ করিবার পর তিনি বলিলেন : সপ্তাহের এই দুইটি দিন যদি গ্রামের খোলা হাওয়ায় না-কাটাই তাহা হইলে সপ্তাহের বাকি পাঁচদিন কাজের উপযুক্ত থাকিব না,—তুমি কি মনে কর যে এই নিয়ম মানিয়া না চলিলে আজ এই বয়সে এতখানি কাজ করিতে পারিতাম? মক্কেলকে বুঝাইয়া দাও যে এখানে থাকিলে আমি তাঁহার কাজ ভণ্ডুল করিব, আগাইয়া দিতে পারিব না।—যদি আমাদের দেশের লোকেরাও এইভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিত, স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দিত, তাহা হইলে আমাদের আয়ু বাড়িত, কাজও অধিক হইতে পারিত।

আমাদের, বিশেষ করিয়া আমাদের বড় বড় ব্যারিস্টারদের, ধারণা ছিল যে আমাদের প্রমাণাদি খুব পাকা, আমরা অবশ্যই জয়লাভ করিব। মিঃ আপজন বলিতেন যে আমাদের হয়তো অনেকখানি জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন হইবে না। মকদ্দমার শুনানী বিপক্ষের দিক হইতে বিশ-বাইশ দিন পর্যন্ত চলিল। এখনও হয়তো আরও এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত অপর পক্ষের তর্কাদি চলিবে। ইতিমধ্যে আদালত প্রায় তিন মাসের জন্য বন্ধ হইতে চলিতেছে। ফলে মকদ্দমার বিচার পুনরায় অক্টোবরে হইবে, হয়তো ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিবে। সে সময়ে খুব ঠাণ্ডা পড়িবে, আমাদের মধ্যে অনেকে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। বিশেষ করিয়া আমি তো ঐ ঠাণ্ডা সহ্য করিতেই পারিব না। হরিবাবু এই চিন্তায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। সুযোগ পাইলেন, অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই আপোষ নিষ্পত্তির কথা স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন, উকিল ব্যারিস্টারেরা এ-কথা পছন্দ করিবেন না; কারণ তাঁহারা মকদ্দমায় জয়লাভ করিবেন বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তথাপি, খরচ বাঁচাইবার জন্য এবং শীতের অসুবিধা হইতে বাঁচিবার জন্য, অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি আপোষ করিয়া লইলেন। সমস্ত কথা ঠিক করিয়া ফেলিয়া, লিখিত পত্র দাখিল করিবার সময় তিনি সকলের নিকট একথা প্রকাশ করিলেন। কাহারও এখন কিছু বলিবার রহিল না; আপোষের দরখাস্ত পেশ হইয়া গেল। আমরা সকলে ছুটি পাইলাম।

মিঃ আপজন মকদ্দমার কথা ছাড়া কখনও অন্য কথা বলিতেন না। তাঁহার সঙ্গে আমার এতটা কাজ করিতে হইয়াছিল যে তিনি আমার বিষয়ে কিছু জানিবার ইচ্ছায় কুমারবাহাদুরকে প্রশ্ন করেন। তিনি জানিতে

পারেন যে আমি এখন ওকালতি ছাড়িয়া গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ করিতেছি। শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হইলেন। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন। ইহাও বলিলেন যে গান্ধীজী তাঁহার মক্কেল ছিলেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য জেনারেল ডায়ারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইবার জন্য তাঁহার অভিমত লইয়া যাওয়া হয়। তিনি অভিমতও দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে গান্ধীজী ডায়ারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইবার বিরোধী ছিলেন, হয়তো পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু দাশ আপনার মত চাহিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন : আমি বুঝিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের দিক হইতে গান্ধীজীই আমার মত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তখন পর্যন্ত আমি নিজেও জানিতাম না যে হত্যাকাণ্ডের মামলা এতদূর পেঁৗছিয়াছে, বিলাতের ব্যারিস্টারদের মত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমার কথায় তিনি এপর্যন্ত বলিয়াছিলেন : তোমাকে ওকালতি ছাড়িতে হইবে না, এই মকদ্দমা মিটিলে একদিন কথাবার্তা বলিব। কিন্তু মকদ্দমা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি লণ্ডন ছাড়িয়া আসিতে হইল; এই কারণে তাঁহার সঙ্গে আর কথা হয় নাই।

যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন

লণ্ডন ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। যেদিন মকদ্দমা শেষ হয়, তাহার দুই দিন পরেই অস্ট্রিয়ার এক ক্ষুদ্র গ্রাম সন্তাসবর্গে, ভিয়েনা হইতে কিছু দূরে এক অন্তর-রাষ্ট্রীয় যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন হইবার কথা ছিল। আমি এ-বিষয়ে জানিবার কিছু আগ্রহ পোষণ করিতাম। মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে উহার সভাপতি হইবেন বলিয়া কথা ছিল। বিহারেরই তারিণীপ্রসাদ সিংহ, যিনি ইংলণ্ডে অনেকদিন ধরিয়া ছিলেন ও ঐ সম্মেলনে যাইবেন বলিয়া কথা ছিল, তিনি আমাকে বলিলেন যে আমিও যদি যাই তবে ভাল হয়। এই ধরনের সম্মেলনের কথা আমি পূর্ব হইতেই শুনিয়াছিলাম। প্রথম হইতেই উহাতে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল। মকদ্দমা শেষ হইয়া যাওয়ায় খুব ভাল সুযোগ পাওয়া গেল। তাই আমি অমনি সেখানে যাওয়ার কথায় রাজি হইয়া গেলাম। আমরা অন্য একজন পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে রওনা হইয়া গেলাম। পরের দিন সেখানে পেঁৗছিলাম। পথে কোন বিশেষ কিছু ঘটে নাই। শুধু ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলির কিছু নমুনা দেখা গেল। গাড়ি যখন চার-পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া

থামিয়া পড়িত তখন জানা যাইত যে এখন অন্য দেশের সীমায় আসিয়া পেশৗছিয়াছি। সেখানে ঐ দেশের কর্মচারী কাস্টমস্-এর জন্য আমাদের জিনিসপত্র দেখিতে আসিত। আমাদের পাসপোর্টও দেখিত। এইভাবে প্রায় ২৪ ঘণ্টায় অস্ট্রিয়ায় আসিয়া পেশৗছিলাম। পথে তিন-চার বার জিনিসপত্র দেখাইতে হইল।

যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন হইয়াছিল এক গ্রামে। সেখানে এক ছোট পাহাড়ের উপর পুরানো একটা গির্জাঘর ছিল। সেখানে জার্মাণী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলন্ড, প্যালেস্টাইন, চেকোস্লোভাকিয়া, হল্যান্ড ইত্যাদি বহু দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন না; কিন্তু নিজের নিজের জায়গায় সকলেই মহা কলরবে যুদ্ধবিরোধী প্রচার কার্যে লাগিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর লোক এজন্য দণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন, জেলখানায় বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আমার সম্বন্ধে বুঝিতে পারিলেন যে আমি গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ করিতেছি তখন স্বভাবতই আমার দিকে তাঁহাদের নজর পড়িল। গান্ধীজীর কাজ ও কর্মপদ্ধতি বিষয়ে তাঁহারা আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। কনফারেন্সেও আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। মহাত্মাজীর কার্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলাম। ভারতবর্ষে সে-সময়ে বারডোলিতে সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। তাহার কিছু কিছু খবর আমরা ওখানে থাকিতেই পাইয়াছিলাম। আমি বিশেষ করিয়া চম্পারন ও বারডোলির সত্যাগ্রহের কথাই বক্তৃতায় বলিলাম। দেখাইলাম, কিভাবে তাঁহার অহিংসা-নীতি সার্বজনীন বা সাধারণের সমস্যা-সমাধানে প্রয়োগ করা হয় এবং উহা কতদূর সফল হইয়াছে। আমরা সেখানে দুই-তিন দিন থাকিলাম। সময় খুব ভাল ভাবেই কাটিল।

কনফারেন্সের কাজকর্ম—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী ও এসপারেণ্টো—এই চার ভাষায় নির্বাহ হইত। জনৈক জার্মাণ যুবক, যাঁহার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, চারটি ভাষাতেই এমন পণ্ডিত ছিলেন যে কোনও একটি ভাষায় বক্তৃতা হইলেই তাহা শর্টহ্যান্ড বা সাঙ্কেতিক লিপিতে সমস্ত লিখিয়া ফেলিতেন এবং তাঁহার নোট সামনে রাখিয়া আগাগোড়া বক্তৃতা বাকি তিন ভাষায় তর্জমা করিয়া শোনাইয়া দিতেন।

কনফারেন্সে যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। স্থির হইল যে কনফারেন্সের পরে, কোনও প্রধান প্রধান স্থানে, কনফারেন্সের প্রতিনিধিরা গিয়া যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিয়া প্রচারকার্য চালাইবেন। সেখান হইতে কিছু দূরে গ্রাট্জ নামে শহর; সেখানে ডাঃ স্টাণ্ডিনাথ সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি সেখানকার মেডিকাল কলেজের শিক্ষক ছিলেন। মহাত্মা-জীর সঙ্গে এই দম্পতির পত্রের আদান-প্রদান চলিত, যদিও ইঁহারা তখন

পর্যন্ত ভারতে আসেন নাই। আমি যখন ইউরোপে আসি তখন মহাত্মাজী আমাকে ইঁহাদের নামে এক পত্র দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে ঐ অঞ্চলে গেলে যেন ইঁহাদের সঙ্গে দেখা করি। যখন গ্রাট্‌জেও যাওয়ার কথা হইল তখন আমি তাঁহাদের জানাইলাম, গান্ধীজীর পত্রও পাঠাইয়া দিলাম। কনফারেন্সের কর্মকর্তা ছিলেন ইংলণ্ডের শ্রীরনহম ব্রাউন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রতিনিধি ভিয়েনা ও গ্রাট্‌জ যাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। ভিয়েনাতে এক সভা হইল, তাহাতে সেখানকার প্রসিদ্ধ পাদ্রী শ্রীউদা সভাপতি হন। সেখানকার সভায় এমন কিছু কিছু লোক আসিয়াছিলেন যাঁহারা মাঝে মাঝে খুব গোল করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাই তাঁহারা কি বলিতেছেন কি চাহিতেছেন তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা তো বুঝিয়াছিলাম যে ইহারা বিরুদ্ধ মতের লোক। ঐ সভায় ইহার চেয়ে বেশি কিছু ঘটে নাই।

পরের দিন আমরা গ্রাট্‌জে গেলাম। সেখানে সন্ধ্যা পাঁচটায় পেঁৗছিলাম। সাতটায় সভা হইবার কথা ছিল। স্টেশনে ডাক্তার স্টাণ্ডিনাথ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের বাড়িতে থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়া গেলাম। অন্যান্য সঙ্গীরা অন্যত্র গেলেন, সন্ধান রাখি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে আবার দুই ঘণ্টা পরে তো দেখা ডাক্তার স্টাণ্ডিনাথের বাড়ি হইতে অল্পদূরেই সভাস্থল। তাঁহার বাড়িতে হাতমুখ ধুইয়া কিছু খাইয়া তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই সভায় রওনা হইলাম। সেখানে পেঁৗছিয়া যে বড় হল-ঘরে সভা বসিবার কথা সেখানে গেলাম। এই ধরনের কোনও সভা আমি কখনও দেখি নাই। একটা বড় হল-ঘর ছিল, সেখানে প্রায় চার পাঁচ শত লোক বসিতে পারিত। সমস্ত ঘর জুড়িয়া ছোট ছোট টেবিল। প্রত্যেক টেবিলের চার ধারে পাঁচ-ছয় জন করিয়া লোক বসিয়াছিল। প্রত্যেক লোকের সামনে মদের গেলাস। প্রায় সকলেই সিগারেট বা সিগার খাইতেছিল। সমস্ত ঘর ধূমাচ্ছন্ন। ঘরের ভিতরে যাওয়ার জন্য একদিকে দরজা। ঘরের অন্য প্রান্তে, দেওয়াল ঘেঁসিয়া, কাঠের এক প্ল্যাটফরম, তাহার উপর পাঁচ সাতটি চেয়ার, আর একটা লম্বা টেবিল রাখা হইয়াছে। ঐ প্ল্যাটফরমের এক কোণে নিকটে একটা ছোট-মতো দরজাও ছিল, তাহার খিল বন্ধ। আমরা ঘরের ভিতর ঢুকিলাম। আমার পোষাক হইতেই হয়তো কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছিল যে যাহারা বক্তৃতা দিতে আসিয়াছে আমিও তাহাদেরই একজন। ঘরে ঢুকিতেই একজন জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিব—জার্মান ভাষায়, না অন্য ভাষায়? আমি বলিয়া দিলাম, আমি ইংরেজী জানি, যাহা কিছু বলিবার তাহা ইংরেজীতেই বলিব—যদি সভা যাঁহারা

ডাকিয়াছেন তাঁহারা ভাষান্তরের কোনও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তবে আমার বক্তৃতার তর্জমা কেহ না কেহ করিয়া দিবেন।

যেমন আমরা ঘরের মধ্যভাগে গিয়াছি, অমনি একদিকে শোরগোল শুরু হইল। আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু উক্ত দম্পতি আমাকে বলিলেন, বিরোধী পক্ষ গণ্ডগোল করিতেছে! আমরা তিনজন সোজা সেই মঞ্চের দিকে চলিয়া গেলাম। প্রফেসর স্টাণ্ডিনাথ ঐ প্ল্যাটফরমের কোণের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি উহা খুলিতে চাহিলেন, কিন্তু উহা ছিল বন্ধ। ইতিমধ্যে দশ-বার জন লোক ছুটিয়া মঞ্চের উপর চলিয়া আসিয়া আমার উপর ঘুষি ও লাথি চালাইতে লাগিল। উক্ত দম্পতি মাঝে পড়িয়া কিছু প্রহার নিজেদের উপর গ্রহণ করিলেন। ইহাতে আক্রমণ-কারীদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চেয়ার ফেলিয়া ভাঙিগল ও তাহার টুকরা টুকরা অংশ দিয়া আমার উপর প্রহার চালাইতে লাগিল। দুর্ভাগা দম্পতি আহত হইলেন, তাঁহাদের মাথা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। আমিও আহত হইলাম। আমার মাথা হইতেও রক্ত পড়িতে লাগিল। আমরা বুঝিতেই পারিলাম না যে কিসে কি হইল এবং কেন আমাদের উপর আক্রমণ। তখন আমার মনে সহজেই এই ধারণা হইল যে এখন এখান হইতে নীচে অবতরণ করা উচিত। আমি প্ল্যাটফরম হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলাম। নীচে যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের কি ভাব, তাহা বুঝিতেই পারি নাই। যতক্ষণ আমাদের উপর আক্রমণ চলিতেছিল, কেহ উঠেও নাই, কিছু বলেও নাই। আমরা যখন নীচে নামিয়া গেলাম তখনও কেহ কিছু বলে নাই। মধ্য দিয়াই আমরা দরজার দিকে চলিয়া গেলাম। শুধু একজন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল, বাহিরে আসিয়া প্রফেসর স্টাণ্ডি-নাথের সঙ্গে যেন কি-সব কথাবার্তা বলিতে লাগিল। আমরা রক্তাক্ত কলে-বরেই বাড়ি পৌঁছিলাম। সেখানে প্রফেসর প্রথমে আমার ঘা ধোয়াইয়া পটি বাঁধিয়া দিলেন, তাহার পর তাঁহার স্ত্রীর, সর্বশেষে নিজের। তাঁহারা ইংরেজী কম জানিতেন, নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করা কঠিন হইত।

আমি বুঝিলাম, আক্রমণকারীরা যাহারা যুদ্ধ চাহে তাহাদের দলভুক্ত, তাই তাহারা যুদ্ধবিরোধী প্রচার বন্ধ করিতে চাহে। আমার সঙ্গীদের কোনও সংবাদই আমি পাই নাই। পরে শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা প্ল্যাটফরমের ছোট দরজার নিকটে আমার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা পরে জানিতে পারিলেন যে ভিতরে এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সভা তো হইতেই পারিল না, তাঁহারাও চলিয়া গেলেন। আমি পরের দিনই সকালে সেখান হইতে ভিয়েনা রওনা হইলাম। আমাকে কিছু দূর পর্যন্ত আগাইয়া দেওয়ার জন্য স্টাণ্ডিনাথ ও তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। তিনজনেরই মাথায় পটি বাঁধা। রেলযাত্রীরা আমাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা

করিল। যখন ডক্টর স্টাণ্ডিনাথ সব কথা জানাইলেন তখন একজন মহিলা তাঁহার গাঁঠরি খুলিয়া আমাকে কিছু আহার্য দিলেন। কিন্তু উহা ছিল মাংসের তৈরি, আমি লইতে পারিলাম না। ডাক্তার ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে সে-কথা জানাইয়া দিলেন। দেখিলাম, সুদূর বিদেশেও সাধারণ লোকে বিদেশীর প্রতি সেই মনোভাব পোষণ করে যাহা ভারতবর্ষে সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল। সেখানকার পত্র-পত্রিকা এ-বিষয়ে টিপ্পনীও করিল। এখানে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছাইয়া গেল। মহাত্মাজীও এদিক ওদিক হইতে কিছু শুনিতে পাইয়াছিলেন। আমি তো সে-সময় কাহাকেও কিছু লিখি নাই। কিন্তু ডাক্তার স্টাণ্ডিনাথ মহাত্মাজীকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে সর্বপ্রথম পুরা ঘটনার বিবরণ ছাপাইয়া দেন।

রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যুবক-সম্মেলন

সেখান হইতে আমি সোজা সুইজারল্যাণ্ড গেলাম। বড়ই ইচ্ছা ছিল যে গিয়া রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাই তিনি যেখানে বরাবর থাকিতেন সেখানে গেলাম। কিন্তু সেখানে তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা হইলে বুঝিলাম যে তিনি গ্রীষ্মের জন্য কার্টারিগী পাহাড়ে গিয়াছেন। সেখানে চলিয়া গেলাম। পথটি অতি সুন্দর। রেল উঁচু পাহাড়ের উপর ধীরে ধীরে চড়িয়া গিয়াছে। অল্প একটু গেলেই বরফে ঢাকা পাহাড় নজরে আসে। আমি একটা হোটেলে গিয়া উঠিলাম। রোমাঁ রোলাঁই সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দুই দিন সেখানে থাকিলাম। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল, কথাও হইল। কিন্তু বিপদ এই যে তিনি ইংরেজী বলিতে পারিতেন না, আমিও ফরাসী ভাষা বুঝিতাম না! তিনি খুঁজিয়া হোটেলে এক ইংরেজী-জানা লোক বাহির করিলেন। কিন্তু তাহার বিদ্যাও খানিকটা অনুমানের উপরেই চলিত। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আমি যতটা লাভবান হইতে চাহিয়াছিলাম ততটা হইতে পারিলাম না। তিনি গ্রাট্জের ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন। আমার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা ও হাত তিনি দেখিলেন। সেখান হইতে রওনা হইয়া, সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য শহর দেখিয়া আমি লণ্ডনে ফিরিলাম। আমি বর্ণওয়েল, নিউশাটেল, লজান, ও জেনেভা শহর দেখিলাম। নিউশাটেলে এক ক্ষুদ্র কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি বাজারে বেড়াইতেছিলাম; এক

দোকানে হাতে কাটা সূতার কাপড় বিক্রয় হইতেছিল। আমি সেখানে গেলাম। বিক্রয়ের ভার ছিল একটি মেয়ের উপর। সে ইংরেজী জানিত। আমি যখন হাতে কাটা সূতায় বোনা কাপড়ের কথা বলিলাম সে আমার পোষাক দেখিল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে আমি হিন্দুস্থানের লোক। ইহা জানিয়া খুব আশ্চর্য লাগিল যে সে শুধু গান্ধীজীর নামই জানিত না, তাঁহার বিষয়ে যে-গ্রন্থ সে পাইয়াছিল তাহা পড়িয়াও ফেলিয়াছিল। সে আমাকে মূনিকের এক দোকানের খবর দিল, যেখানে হাতে কাটা সূতার তৈরি কাপড় পাওয়া যাইত। তাহার নিজের দোকানে সুরক্ষিত পুরানো সুইস চরখার নমুনাও দেখাইল। উহা আমাদের দেশের পাখি চরকারই সমান, তবে উঁচু চেয়ার বা টুলে বসিয়াও উহা চালানো যাইতে পারে। আমি সর্ব প্রথম বুঝিতে পারিলাম, গান্ধীজীর বিষয়ে লিখিত রোমাঁ রোলাঁর পুস্তক কতখানি প্রচারকার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে!

সুইজারল্যাণ্ডের শহরগুলি দেখিতে দেখিতে প্যারিসে আসিলাম। সেখানেও দুই একদিন থাকিয়া শহর দেখিয়া লণ্ডনে আসিয়া পেঁাছিলাম। লণ্ডনে নিজের বাসায় সন্ধ্যা ছয়টা-সাতটার সময় আসিলাম। আসিতেই দেখি, সব অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শ্রীসত্যরঞ্জনপ্রসাদ সিংহ, যিনি আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন, একদিন কোথাও হইতে ফিরিবার সময়, ঠিক নিজের বাড়ির সামনেই বাস হইতে নামেন, এবং রাস্তা পার হইবার সময়ে মোটরের ধাক্কা লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। যেখানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল সকলে আসিয়া সেই নার্সিং হোমে গেল। হাত-মুখ ধুইয়া আমিও তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম। আঘাত লাগিবার পর হইতে তাঁহার আর জ্ঞান হয় নাই। আমি গিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থাতেই দেখিলাম। অবস্থা উদ্বেগজনক ছিল। সেই রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমার ইচ্ছা ছিল, মকদ্দমা শেষ হইবার পর লণ্ডন শহর দেখিব, অন্যান্য জায়গায়ও কিছুটা বেড়াইয়া দেশে ফিরিব। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় সকলের মনই বড় উদাস হইয়া গেল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা হইল, যত তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে ফিরিতে পারি। এখন সেখানে থাকিয়া কোনও কিছু দেখিতে মন একটুও চাহিল না: তাঁহার মৃত্যুর পর দুই-তিন দিন ধরিয়া সেখানকার করোনারের তদন্তের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি রায় দিলেন যে মৃত্যু হইয়াছে দুর্ঘটনাতে, কাহারও দোষে নয়, আর আমাদের শব দিয়া দিলেন। আমরা তাহা সেখানকার ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করিলাম। আমি সেই রাত্রেই গ্রুডিনবরা চলিয়া গেলাম। সেখান হইতে

ফিরিয়া আমরা সকলে রওনা হইয়া আসিলাম। লণ্ডনে কিছু দেখিতে পারিলাম না। এমন কি, ব্রিটিশ মিউজিয়মেরও শুধু দর্শনমাত্র হইল। ভিতরে গিয়া কিছু দেখিতে পারিলাম না।

লণ্ডন হইতে আমরা এই ভাবিয়া রওনা হইয়াছিলাম যে মার্সেলস হইতে মুলতান জাহাজে উঠিব; উহা অগস্টের শেষ সপ্তাহে একদিন রওনা হইবে কথা ছিল। মাঝখানে দশ-বারো দিন পাওয়া যাইত। ভাবিলাম, এই দশ-বারো দিন ইউরোপের দেশগুলি দেখার কাজে লাগাইব। তখন হল্যাণ্ডে যুবকদের এক অন্তর-রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইবার কথা ছিল। আমি সেখানেও গেলাম। সম্মেলনে বাংলার ডাঃ সান্যালের সঙ্গে দেখা হইল। উহাও খানিকটা যুদ্ধবিরোধী সম্মেলনই ছিল। উহাতেও অনেক দেশের যুবক আসিয়াছিলেন। একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে উহাতে আমেরিকার অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পূর্বোক্ত সন্ত্রাসবর্গের যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন হইতে এখানে প্রতিনিধিদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল; কিন্তু যতটা গাম্ভীর্য ও অন্তরের উৎসাহ সেখানে দেখিয়াছিলাম, তাহা এখানে পাইলাম না। এই সম্মেলনও কোনও শহরে না হইয়া এক গ্রামেই হইয়াছিল। আমরা সকলে কোনও বাড়িতে না থাকিয়া তাঁবুতে ছিলাম। ব্যবস্থা খুবই সাদাসিধা ধরনের ছিল। ঠিক সময়ে সাইরেন বাজিত। সকলে নিজের নিজের গেলাস ও বিছানাপত্র লইয়া এক বড় তাঁবুতে গিয়া উঠিতাম। সেখানে কাঠের বাক্স জুড়িয়া কাজচলা গোছের টেবিল ও বেঞ্চ করা হইয়াছিল। সেখানে খাবার ও জলপান পাওয়া যাইত। পুনরায় সাইরেন বাজিলে সকলে গিয়া সম্মেলনে উপস্থিত হইতাম। তখন সেখানে বক্তৃতা হইত। দেখিলাম যে দেশ-দেশান্তরের সেই সকল যুবকদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও অন্তর-রাষ্ট্রীয় বিষয়েই গভীর অনুরাগ। অত্যন্ত উৎসাহের সহিত রাষ্ট্রসংঘের মত প্রতিষ্ঠানের ও তাহাদের কার্যক্রমের সম্বন্ধে খুব তর্ক বা আলোচনা হইতে লাগিল। কয়েকজন জার্মানও তাহাতে যোগ দিলেন। অনুমান করিলাম, ওদেশে নিজেদের মধ্যে মতভেদ আছে—অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যেও সেখানকার সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য আছে। এই সম্মেলনে আমিও বক্তৃতা করিলাম।

সেখান হইতে আমি বার্লিন গেলাম। সেখানে আমার থাকার ও কার্যক্রমের কিছু বর্ণনা দিলে ভাল হইবে। আমি একটা দ্রষ্টব্য-সূচী করিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতে জার্মানীর তিনটি শহর রাখিয়াছিলাম—বার্লিন, লিপজিগ ও ম্যুনিক। ইটালিতে ভেনিস ও রোম এবং ফ্রান্সের দক্ষিণে নীস হইয়া মার্সেলসে পৌঁছিব, এইরূপ ভাবিয়াছিলাম। সময় এত কম ছিল যে ইহার বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। এইসব শহরেও সমস্ত সময় দিতে পারি নাই। প্রায়ই রাত্রের গাড়িতে রওনা হইতাম। ওদেশের গাড়িতে বেশি ভাড়া দিলে শুইবার জায়গা পাওয়া যাইত। তাই আমি এমন গাড়ি বাছিয়া লইতাম যাহা রাত্রি দশটা-এগারটায় রওনা হইত, সকালে গিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিত। ঘুমাইবার টিকিট লইয়া রাত্রে আরামে গাড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। সকালে গাড়িতেই হাতমুখ ধুইয়া তবে গাড়ি হইতে নামিতাম। স্টেশনে এমন গাড়ি বাছিয়া লইতাম যেখানে আরোহীদের জিনিসপত্র তত্ত্বাবধানে রাখা হইত। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে টমাস কুকের প্রতিনিধি পাওয়াই যাইত, শুধু লিপজিগে পাই নাই।

বার্লিন স্টেশনে নামিয়া প্রথমে পরিচিত কাহাকেও দেখিলাম না। কিন্তু যখন ট্যাক্সিওয়ালার নিকট হইতে শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে ইংরেজী হোটেল খুঁজিতে চেষ্টা করিতেছি, তখন টমাস কুকের লোক নজরে পড়িল। সে আমাকে লইয়া চলিল এক হোটেলে। ভাগ্যক্রমে হরিবাবুও সেই হোটেলে হাজির। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। দুই-তিন দিন সেখানে থাকিয়া গেলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার্লিন দেখিলাম। সেখানে শ্রীবি. চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হইল। রুষের সঙ্গে তাঁহার কিছু সম্বন্ধ ছিল। তিনি বলিতেছিলেন যে যদি সেখানে যাইতে চাই তবে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু সময় কম বলিয়া ইহা সম্ভব হইল না। বার্লিনে আমি এমন এক রেস্তোরাঁতে গিয়া খাইয়া আসিতাম যেখানে নিরামিষ আহার পাওয়া যাইত। সেখানে লোকেরা ইউরোপের বড় বড় শহরের নিরামিষ রেস্তোরাঁর তালিকা দিল। সবগুলির নাম ও ঠিকানা ছাপাই ছিল। স্টেশনে নামিয়া ঐ কাগজ দেখাইলে আমি এই সব রেস্তোরাঁতে গিয়া পৌঁছিতাম, সেখানেই ভোজন করিতাম। ডিমের জন্য খানিকটা অসুবিধা হইত; কিন্তু আমি দুই একটা শব্দ শিখিয়া লইয়াছিলাম, এখন সব ভুলিয়া গিয়াছি, তাহাতে বুঝাইয়া দিতাম যে ডিমও আমার চলিবে না।

লিপজিগে শুধু একদিন ছিলাম। সেখানে টমাস কুকের প্রতিনিধিকে

পাইলাম না। তাই নিজের বুদ্ধিতেই কাজ সারিতে হইল। ইংলণ্ড যাওয়ার পূর্বে কয় মাস ধরিয়া আমি লুই কুনের জল-চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে কটিস্নান (hip bath) করিয়াছিলাম, তাহাতে উপকারও হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকও ইংরেজীতে পড়িয়াছিলাম। তাই ইচ্ছা হইল, নিজে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি। এইজন্য আমি যাত্রাসূচীর মধ্যে লিপজিগও রাখিয়াছিলাম। স্টেশন হইতে নামিয়া সোজা তাঁহার চিকিৎসালয়ে গেলাম। শুনিলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাও কি অদ্ভুতভাবে! তিনি কুল খাওয়ার খুব পক্ষে ছিলেন। বয়স বেশি হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও ফল সংগ্রহের জন্য কোনও গাছে উঠিয়াছিলেন, সেখান হইতে পড়িয়া যান। আঘাত বেশিরকম হইয়াছিল, মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ছেলে ছিলেন, তিনি ইংরেজী জানিতেন না বলিলেই হয়। তাঁহার সহিত কোনও প্রকারে কথাবার্তা হইল। তিনি আমার জন্য স্নানবিধি ও ভোজনবিধির নিয়মাদি লিখিয়া দিলেন। ওখানেই একবার স্নান করাইয়া দেখাইয়াও দিলেন। ঐ নিয়মাদির খসড়া জার্মান ভাষায় লেখা ছিল। আমি তাহা হইতে কোনও উপকার পাইলাম না, ওখানে তাহা হারাইয়াও গেল।

খাওয়ার সময়ে সেখানে এক রেস্তোরাঁতে গেলাম। সেখানে তো একজনও ইংরেজী-জানা লোক ছিল না! আমি কষ্টে-সৃষ্টে ভৃত্যকে কিছু বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম। আমার থেকে কিছু দূরে এক টেবিলে একজন মহিলা খাইতে বসিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী খুব ভালই জানিতেন। তিনি নিজে জাতিতে জার্মান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী ছিলেন আমেরিকান, তিনি সে সময়ে আমেরিকায় গিয়াছিলেন। সেই মহিলা আমার সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেদিন টমাস কুকের প্রতিনিধির কাজ তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত শহরও তিনি দেখাইয়া দিলেন। সন্ধ্যায় রেলে চড়াইয়া দিলেন। এমন সহৃদয়তা সচরাচর দেখা যায় না।

আমার যাত্রাসূচী অনুসারে ম্যুনিকে গেলাম। সেখানে সেই প্রসিদ্ধ সেলর হোস দেখিলাম, যেখানে সর্বদা হিটলারের বক্তৃতা হইত। সেখানকার প্রসিদ্ধ মিউজিয়মও দেখিলাম, যেখানে বৈজ্ঞানিক বস্তুর সংগ্রহ আছে। ওখানে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই দোকান পর্যন্ত পেঁৗছিলাম—যেখানে নিউশ্যাটেলে আমাকে বলিয়াছিল যে হাতে-কাটা-সুতায় বোনা কাপড় পাওয়া যায়। এমন কোনও কাপড় কিন্তু পাওয়া গেল না।

ম্যুনিক হইতে ভেনিসে গেলাম। অদ্ভুত শহর। ঘরে ঘরে সমুদ্র। ঘর হইতে বাহির হইয়া নৌকাতেই বাহিরে যাওয়া যায়। নৌকা ছাড়া অন্য কোনও যানবাহন নাই। জলের মধ্যে প্রস্তর খণ্ডের উপর ঘর তৈয়ারি

হইয়াছে। প্রসিদ্ধ যে গির্জাঘর আছে, সেখানে খানিকটা খালি জায়গা আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলাম। রাত-দশটা এগারোটায় হোটেলে গিয়া থাকিতে চাহিলাম; কিন্তু এত মশা যে মশারি লাগাইলেও থাকা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাই গাড়ির সময়ের পূর্বেই স্টেশনে চলিয়া আসিলাম।

রোমে দুই দিন থাকিলাম। টমাস কুকের লোকের ব্যবস্থায়, নূতন ও পুরাতন কীর্তি, দুই-ই খুব দেখিলাম। ইটালির দুই শহরেই সৈন্য-বিভাগের অনেককে এখানে-ওখানে যাইতে-আসিতে দেখিলাম। মনে হইল, সৈন্যদল এখানে খুবই প্রবল। আমার যাওয়া এমন হইল যে যাত্রীদের দ্রষ্টব্য স্থান ভিন্ন আমি আর কিছু দেখিতে পারি নাই, কাহারও সহিত দেখা করিতে পারি নাই। সময়ও ছিল না, ব্যবস্থাও ছিল না। প্রথম হইতে যদি ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে কাহারও কাহারও সঙ্গে দেখা করিতাম। সময় থাকিলে ওদেশের অবস্থা জানিবার জন্যও চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এমনটি হইতে পারি না; দুঃখ থাকিল, কিন্তু উপায় ছিল না।

অবশেষে মার্সেল্‌সে রওনা হইলাম। পথে নীসে জাহাজ হইতে নামিলাম। সেখানে ভাগলপুরের দীপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। কয়েক ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে থাকিলাম। সেখানে নিকটেরই প্রসিদ্ধ কেসিনোতে গিয়াও দেখিলাম, যেখানে লোকে গিয়া জুয়া খেলে। এই সকল দেখিতে প্রাণ চাহিল না। শীঘ্র মার্সেল্‌সে চলিয়া গেলাম। পরের দিন জাহাজে ওঠার কথা। হরিবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। সমস্ত রাত এক হোটেলে থাকিলাম। পরের দিন 'মুলতান' জাহাজে উঠিলাম। জাহাজ ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। এবার আট-দশজন একত্র যাইতে-ছিলাম, তাই জাহাজে কোনও প্রকারের অসুবিধা হয় নাই। আমার শরীর কিছুটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। দুই-এক দিন সমুদ্রের হাওয়া লাগিতেই আবার হাঁপানি হইল। কিন্তু তাহা তাড়াতাড়ি সারিয়াও গেল। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে নামিলাম। জাহাজে কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যর ফিলিপ হার্টগ ঐ জাহাজে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। জাহাজে সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইত।

বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে নামিয়া সোজা আমেদাবাদ চলিয়া গেলাম। সেখানে দুই-এক দিন থাকিয়া পুনরায় পাটনায় ফিরিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইয়া গিয়াছে—(১) বারডোলিতে ভূমির উপর খাজনা বাড়াইবার জন্য সত্যাগ্রহ, আর (২) দেশের জন্য সকল দল মিলিয়া বিধান প্রস্তুত করিবার জন্য নেহরু-কমিটি গঠন। বারডোলির সত্যাগ্রহ খুবই সফল হইয়াছিল। সরকার তাঁহাদের দিক হইতে সর্বপ্রকারে উহা দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লোকেরাও উৎসাহ করিয়া পীড়ন সহ্য করিল। দমন রোধ করিতে জনসাধারণ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। গান্ধীজীর আশীর্বাদ ও সাহায্য তো ছিলই, কিন্তু আন্দোলন পরিচালনার সমস্ত ভার প্রকৃতপক্ষে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের উপরই ছিল। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধৈর্য, নির্ভীকতা ও পরিশ্রমের সহিত এই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। সকল দলের লোকেই উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন বলিয়া বুঝিয়াছিল। সকলে সাহায্যও করিয়াছিল। সরদার গুজরাটের বাহির হইতে লোক আসা বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই অন্য দেশের কর্মীরা বাহির হইতেই যতটা সম্ভব সাহায্য করিতেছিল, কেহ সে স্থানে যায় নাই। সমস্ত দেশের সম্মুখে সত্যাগ্রহের এক নিদর্শন রহিয়া গেল। লোকেরা বুঝিতে পারিল যে সংগঠন ও ত্যাগ যথেষ্ট থাকিলে অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা প্রবল সরকারকেও দমনে রাখা যায়। যে-আদর্শের সন্ধান লোকে ১৯২১ সাল হইতেই করিতেছিল সরদার একটি তালুকে তাহা প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া দিলেন। ইহার পর লোকে এই কথাই ভাবিতে আরম্ভ করিল যে সমস্ত দেশকে কি করিয়া বারডোলি করিয়া তোলা যায়। এই সত্যাগ্রহ দেশে নবজীবনের সঞ্চার করিল। পরে যে-সত্যাগ্রহ ১৯৩০ সালে হইল, তাহার ভূমিও প্রস্তুত করিল এই সত্যাগ্রহ।

মান্দ্রাজ কংগ্রেসেই এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল, সর্বদলের নেতাদের একত্র করিয়া এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হউক। সকলেই তো সাইমন কমিশন বর্জন করিয়াছে কিন্তু তাহা নিজের কাজ করিয়াই যাইতেছিল। মনে হইয়াছিল, যতক্ষণ নিজেরা কোনও পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ না-করি, ততক্ষণ লোকে বুঝিবে যে আমরা শুধু নকলনবীশ, গঠনমূলক কাজ কিছু করিতে পারি না। তাই এই কমিটি সকল দলের লোকের সাহায্য পাইল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ছিলেন ইহার প্রযোজক, তাই ইহার নাম

নেহর্-কমিটি। এই কমিটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল। সকল দলের প্রতিনিধিরা, কিছু কথা বাদ দিয়া অধিকাংশ কথাতো স্বীকারও করিয়াছিল। এখন এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় এক সর্বদল-সম্মেলনে বিধিবদ্ধভাবে গ্রহণ করিবার কথা ছিল। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হইবে। পণ্ডিত মতিলাল নেহর্ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। নেহর্-রিপোর্টের উপর সমস্ত দেশ জুড়িয়া আলোচনা হইতেছিল। সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি এবিষয়ে নিজের নিজের মত বিবৃত করিতে যাইতেছেন। পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল ঔপনিবেশিক স্বরাজই ভারতের আদর্শ ইহা মানিয়া লইয়া। এইজন্য কংগ্রেসের যে-সকল সভ্য পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জওহরলাল নেহর্, সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার।

আমি দেশে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে, শীত আরম্ভ হইতেই, সাইমন কমিশন আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিল। যে সব প্রদেশে তখনও যাওয়া সম্ভব হয় নাই সেই সকল স্থানে যাইতে আরম্ভ করিল। কমিশন বর্জন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায় যোগ দিয়াছিলেন। পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর লাঠি চালাইয়াছিল। পুলিশের লাঠিতে পূজ্য লালাজীর খুব আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, আর ভাল হন নাই। এরূপ অনুমান হয় যে ঐ লাঠির প্রচণ্ড আঘাতেই কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। কমিশন যুক্তপ্রদেশে গেলে সেখানেও বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ লাঠি চালায়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্রও চোট লাগিয়াছিল। এইরূপে এই কমিশন পুলিশের লাঠির সঙ্গে সঙ্গে দেশভ্রমণ করিতেছিল। এখন তাহাদের পাটনায় আসার দিন স্থির হইয়া গেল!

আমার অনুপস্থিতিতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। 'সার্চ-লাইট' পত্রিকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর কুর্টনে টিরেল আদালতের মানহানির মামলা চালাইয়াছিলেন। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ডসন মিলার ঐ বৎসর পেনসন লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির অথচ স্বাধীন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জজ ছিলেন। যদিও তিনি মকদ্দমা ঠিক বুঝিতে খানিকটা সময় লইতেন, কিন্তু তাঁহার বিচার খুব ভাল হইত। সকলে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার যাওয়ার পর ইংলণ্ড হইতে নূতন বিচারপতি আসিলেন, তিনি লোকের সঙ্গে আলাপে ও ব্যবহারে অবশ্য খুব ভাল ছিলেন, কিন্তু মেজাজ ছিল বড় একগুঁয়ে এবং সর্বদাই রায় দিতে গিয়া ভুল করিতেন। ইঁহার এক রায়ের উপর সার্চলাইট কঠোর মন্তব্য করে। সেজন্য তাহার বিরুদ্ধে

মামলা রুজু হইল। মামলার গুরুত্ব এত বেশি হইল যে প্রয়াগ হইতে মতিলাল নেহরু ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং কলিকাতা হইতে শ্রীশরৎ-চন্দ্র বসু ওকালতি করিতে আসেন। কয়েকদিন ধরিয়া পাটনায় খুব গণ্ড-গোল। শুনিলাম বক্তৃতাগুলি হইয়াছিল খুবই সুন্দর ও জোরালো। শেষে 'সার্চলাইটের' কিছু সাজা হইল। ইহাতে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষত উকিল মহলে প্রচুর উত্তেজনা দেখা দিল।

অন্য ঘটনাটি গয়া জেলাবোর্ড সম্বন্ধে। সেখানে শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ ছিলেন চেয়ারম্যান। প্রথমে বলা হইয়াছে যে প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্বাচনে কংগ্রেস স্যার গণেশ দত্ত সিংহের বিরোধিতা করিয়াছিল। তিনি ১৯২১ হইতেই মন্ত্রী হইয়া আসিতেছিলেন, এবং মন্ত্রী হিসাবে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড দেখাশুনা করিতেছিলেন। বিরোধের বহর দেখিয়া তিনি চার জায়গা হইতে প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন। সমস্ত স্থানেই কংগ্রেস-প্রার্থীরা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। একটি কেন্দ্রে, গয়ায়, অন্য একটি ভদ্রলোকের জন্য, যিনি নিজেকে কংগ্রেসের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিতেন, প্রার্থী দাঁড় করানো হয় নাই। শেষে সেই স্থান হইতে ঐ ভদ্রলোকটিকে সরাইয়া স্যার গণেশ দত্ত নির্বাচিত হইয়া গেলেন।

এই নির্বাচনের আর একটি ঘটনা। বেগুসরাই অঞ্চল হইতেও স্যার গণেশ দত্ত প্রার্থী ছিলেন। স্যার গণেশ দত্ত নিজে ভূমিহার ব্রাহ্মণ, উচ্চ জাতির খুব ভাল পরিবারের লোক। সেই কথা মনে করিয়া তিনি সেখান হইতেও দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী প্রার্থীও ভূমিহার ব্রাহ্মণই ছিলেন। তথাপি জাতির মধ্যে স্যার গণেশ দত্তের খ্যাতি নানা কারণে যথেষ্ট ছিল। আমি নির্বাচন উপলক্ষে সেখানে গেলাম। খুব বড় সভা হইল। স্যার গণেশ দত্তের সমর্থকরাও আসিল। তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিল, স্যার গণেশ দত্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী কেন দাঁড় করানো হইয়াছে? তাঁহারা স্যার গণেশ দত্তের সব কথাই বলিল, তাহার প্রধান কথা ইহাই ছিল যে তিনি যখন হইতে মন্ত্রী হইয়াছেন তখন হইতে তিনি তাঁহার নিজ বেতনের অল্প অংশই নিজের খরচের জন্য লইতেন, অধিকাংশ পরোপকারে দান করিতেন। কথাটি সত্য। তিনি কয়েক লক্ষ টাকার ট্রাস্ট গঠন করিয়া অতি সুন্দর আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা সকলে তাঁহার খুব অনুরাগী ছিলাম ও প্রশংসা করিতাম। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের কার্যক্রমের সহিত একমত ছিলেন না, শুধু এই জন্যই তাঁহার বিরোধিতা করিতে হইল। আমি সভায় বলিয়াছিলাম যে, কংগ্রেস সমস্ত দেশের প্রতিষ্ঠান, যদি স্যার গণেশ দত্ত তাহার অধীনে কাজ করিতে স্বীকার করেন, তবে কংগ্রেসী প্রার্থীকে সরাইয়া লইয়া যাইব, কিন্তু এত বড়

প্রতিষ্ঠান কোনও ব্যক্তিবিশেষের মান রক্ষা করিবার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না। আমি তাঁহার সমর্থনকারীদের একথাও বলিয়াছিলাম যে আমি আরও এক দিন থাকিব, ইতিমধ্যে তাঁহারা স্যর গণেশ দত্তকে ডাকুন। অথবা তাঁহার পত্র বা তার আনাইয়া লউন, যাহাতে তিনি আমার শর্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কংগ্রেসী প্রার্থীকে সরাইয়া লইব। সভায় অধিকাংশ লোক তাঁহারই স্বজাতি, তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ ভরসা ছিল। আমার কথা তাহারা সকলেই খুব পছন্দ করিল। আমি সেখানে থাকিয়াও গেলাম, কিন্তু তাঁহার লোকেরা আর ফিরিয়া আসিল না। দেখিলাম, সেখানকার লোকেরা পুরাপুরি কংগ্রেসের পক্ষেই হইয়া গেল। ইহার পরে স্যর গণেশ দত্ত গয়ায় সেই ভদ্রলোককে সরাইয়া কোনও প্রকারে নিজে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

এ ব্যাপার তো হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মনে কংগ্রেসের প্রতি খুব রাগ ছিল, তিনি যতদিন সাধারণের কাজ করিতেছিলেন কখনও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। গয়া জেলা বোর্ডে তাঁহার সেই বন্ধুকে চেয়ারম্যান করিবার কথা ছিল যিনি নিজে সরিয়া গিয়া তাঁহাকে মন্ত্রী করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। তাই তিনি নানা উপায়ে সেখানকার চেয়ারম্যান শ্রীঅনুগ্রহ-নারায়ণ সিংহকে সরাইয়া দিলেন—এমন কি তাঁহাকে সভ্যপদ হইতেও বঞ্চিত করিলেন। আমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া এই ষড়যন্ত্র দেখিলাম, আমার খুবই রাগ হইল। আমাদের সমস্ত কংগ্রেসী বন্ধুই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। আমাদের মনে ইহাও আশংকা ছিল যে সেই সময়ে দেশে সাইমন কমিশন ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহারা একথাও জানিতে চাহিতেছিল যে সামান্য কিছু অধিকার যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ভারতবর্ষীয়েরা কতদূর সততা ও সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতেছে। বিহারের যে-জেলা-বোর্ডে সব চেয়ে বেশি আয় হইত তাহাকে এই প্রকারে অযোগ্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা, আমাদের মনে হইয়াছিল এইজন্য করা হইয়াছিল যে সাইমন কমিশনের সামনে গভর্নমেণ্ট ইহাও আমাদের অযোগ্যতার দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত করিতে পারেন। এজন্য সমস্ত প্রদেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইল। গয়াতে সভা হয়। আমিও সেখানে গেলাম। সেখানে আমার বক্তৃতা তীব্র-ভাষায় হইয়াছিল, পূর্বে কখনও তেমন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। জেলা-বোর্ডের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ করা হইয়াছিল, কংগ্রেসের দিক হইতে আমরা তাহার তদন্ত করাইলাম। সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া দেখিতে পাইলাম। তখন প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন করাইবার কথা হইল। তাহা হইল পাটনাতেই। অনুগ্রহবাবুকে তাহার সভাপতি করা হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয়। এই কনফারেন্সের দিন সাইমন কমিশনের পাটনায় পৌঁছাইবার

দুই একদিন পূর্বে নির্ধারিত হইল। মনে করা হইল যে যাহারা কনফারেন্সে আসিবে তাহারা কমিশনের বিরুদ্ধে যাইবে, তাহারা কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনেও যোগ দিতে পারিবে। কনফারেন্স সফলতার সহিত শেষ হইল। পরের দিন সকালেই সাইমন কমিশনের স্পেশ্যাল ট্রেনে আসিবার কথা।

শুনিয়াছিলাম স্পেশ্যাল ট্রেন পাটনা জংশনে বিশেষ প্ল্যাটফরমে লাগানো হইবে, যেখানে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে নামানো হইয়াছিল। তাহা ঠিক হার্ডিঞ্জ পার্কের সামনে পড়ে। সেখানে, হার্ডিঞ্জ পার্কের সামনে, কাঠের মজবুত খুঁটি গাড়িয়া জনসাধারণের ভিড় আটকাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে লালা লাজপত রায় ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মত নেতাদের উপর লাঠি চালাইবার কথা জানিয়াছিলাম। ইহাতে আমরা মোটেই আশ্চর্য হই নাই। বুঝিয়াছিলাম, বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় কিছু কিছু খুনখারাপি হইবেই। কিন্তু জনসাধারণের উৎসাহ ছিল সমধিক, তাহার কিছু আভাস আমরা প্রাদেশিক সম্মেলনে পাইয়াছিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যায় সচ্চিদানন্দ সিংহ আমাকে তাঁহার বাড়িতে ডাকাইয়া লইলেন। সেখানে গিয়া দেখি, পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ সোয়েনও উপস্থিত। তিনি আমাকে বলিলেন, তাঁহার কথামত শ্রীযুক্ত সিংহ আমাকে সেখানে ডাকাইয়াছেন এবং আমার সঙ্গে সাইমন কমিশন সম্বন্ধে কথা বলিতে চাহেন। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে যাহা হইয়াছে বিহারেও সেইরূপ হয়, ইহা তিনি চাহেন না, ইহাতে উভয় পক্ষেরই দুর্নাম। তিনি এমনও বলিলেন যে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয় এমন কোনও উপায় যদি বাহির করা যায় তবে ভাল হয়। আমি বলিলাম, জনতা নিরস্ত্র আছেই, উহা সম্পূর্ণ অহিংসই থাকিবে, যাহা কিছু হইবে তাহা আপনাদের দিক হইতেই। তিনি ভরসা দিলেন, এরূপ হইতে তিনি দিবেন না; কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন, ভিড় বাড়িলে কোথাও কোনও দলকে যদি কেহ বাজে বকিয়া দেয় বা মেজাজ দেখায়, তাহা হইলে তাহার প্রভাব সমস্ত জনসাধারণের উপর পড়িতে পারে—তাহা কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না—তাই ভিড় বাড়িতে দিলেই বিপদ। আমি পরিষ্কার বলিয়া দিলাম যে ইহা বন্ধ করা যাইবে না। তিনি প্রশ্ন করিলে ইহাও বলিলাম যে হয়তো হাজার দশেক লোক জমিবে। আমি ভয়ে ভয়ে সংখ্যা কম করিয়াই বলিলাম, কারণ সেই ডিসেম্বরের শীতে সকালে সাড়ে ছয়টায় গাড়ি আসে, আমার ভয় ছিল যে শহরের লোকেরা তখন বেশি সংখ্যায় জমায়েত হইতে পারিবে না। শেষে তিনি বলিলেন যে, ভিড় যদি হয়ই তবে এমন উপায় কি কিছু হইতে পারে না যে উভয় পক্ষের লোক একত্র

না হয়, পৃথক পৃথক থাকে? আমি খুশি হইয়া একথা স্বীকার করিয়া লইলাম আর বলিয়া দিলাম যে পথের এক দিকে থাকুক অভ্যর্থনাকারীর দল, অন্যদিকে বিরোধীর দল। এই প্রস্তাব তাঁহার খুব ভাল লাগিল, আমারও লাগিল—বিশেষ করিয়া এইজন্য যে এইভাবে একথাও পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে অভ্যর্থনাকারীরা সংখ্যায় কত কম আর বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা কত বেশি। কথা স্থির হইয়া গেল। আমি বলিয়া দিলাম, আমাদের কোনও লোক কাঠের তৈরী সীমানার ওদিকে যাইবে না—আমরা শহরের দিকে রাস্তার উত্তরে যাইব, আর প্রতিপক্ষ রাস্তার দক্ষিণে রেলওয়ে লাইনের ধারে থাকিবে।

পরের দিন রাত থাকিতেই প্রায় তিনটায় আমরা উঠিলাম। সমস্ত শহরে প্রভাতফেরি আরম্ভ হইল। ভিড় স্টেশনের দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ছয়টা বাজিতে বাজিতেই প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার লোকের ভিড় আমাদের হাতার সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িল। ওধারে কিছু কিছু লোক মোটরে চড়িয়া আসিয়াছিল, কয়েকটা লরি শহরের লোকদের জুটাইয়া আনিবার জন্য ঘুরিতেছিল; কিন্তু হয়তো দেড় শ দুই শ লোক ওদিকের সীমানায় হইবে, তাহাদের অধিকাংশ সরকারি চাকুরিয়া আর তাহাদের চাপরাশি প্রভৃতি! এমনও দেখা গেল যে কেহ কেহ তাহাদের লরিতে চড়িয়া আসিল আর ঐদিকের সীমানায় গেল, কিন্তু যখন উহারা বুঝিতে পারিল যে ঐটাই হইল অভ্যর্থনাকারীর দল, আর বিরোধী দল রাস্তার ওপারে, তখন সোজা ওখান হইতে বাহির হইয়া এদিকে চলিয়া আসিল। আমি সেখানে আমাদের লোকদের সামনে ঘোরা ফেরা করিতেছিলাম, কাঠের খুঁটি হইতে তাহারা যে মাত্র দুই হাত বাহিরে। সেখানে মিঃ সোয়েনের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এই ব্যবস্থায় সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া অভিনন্দন করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দশ হাজার লোক ঠিক ঠিক আসিয়াছে কি না। তিনি বলিলেন, তাহা হইতে অনেক বেশি লোক আসিয়াছে! যখন আমি তাঁহাকে, দুই পক্ষের লোক দুই দিকে থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইবার কারণ বুঝাইয়া বলিলাম, তখন তিনি খুব হাসিলেন। এইভাবে, বড়ই আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইল। কালা ঝাণ্ডা দেখানো ও 'সাইমন, গো ব্যাক' ধ্বনি করা ছাড়া অন্য কিছু হয় নাই।

এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিল। তাহারা যখন নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল তখন এই উৎসাহপূর্ণ বিক্ষোভের কথা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেল। সমস্ত প্রদেশে উৎসাহ উথলিয়া উঠিল। কয়েক দিন ধরিয়া পথে ঘাটে বুঝিয়া না-বুঝিয়া ছোট ছোট ছেলেরাও 'গো ব্যাক সাইমন' চীৎকার করিত। এদিকে এই প্রকার কারণে দেশে নব জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

মনে হইতে লাগিল, ১৯২১ সালের দিন বুঝি আবার ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন ও সর্বদল সম্মেলনের দিন আসিয়া গেল। সর্বদল সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ আনসারি, আর কংগ্রেসের, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

কলিকাতা কংগ্রেস ও সর্বদল সম্মেলন

আমি সর্বদল সম্মেলনে যোগদান করিলাম বটে, কিন্তু প্রথম হইতে সব কথা জানিতাম না, এজন্য সেখানে বিশেষ কোনও কার্য করিতাম না। মনে আছে, একদিন রাত্রে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনও কোনও দিক লইয়া কথা হইতে লাগিল। রীতিমত সম্মেলন নয়, কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। মিঃ জিন্না, যতদূর মনে পড়ে, সেখানে দুইটি কথার উপর খুব জোর দিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান-দের জন্য এক-তৃতীয়াংশ স্থান সুনিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত থাকিবে, আর যে-সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে সেগুলির সম্বন্ধে প্রদেশ পূর্ণ অধিকার ফিরিয়া পাইবে। আমার মনে আছে, এই সব কথা লইয়া অনেক রাত্র পর্যন্ত তর্ক চলিতে থাকে, কিন্তু লোকে এই দাবি স্বীকার করিল না। বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে জবর-দস্ত মনে হইয়াছিল শ্রীযুক্ত জয়াকরকে। তাঁহার সঙ্গে হিন্দুসভার লোকেরাও ছিলেন, কিন্তু বক্তা তিনি একাই। শেষ পর্যন্ত কোনও মীমাংসা হইল না। সম্মেলনে এই নীতি পালিত হইয়াছিল যে, যে-কথায় সকলে একমত হইবে না তাহার সম্বন্ধে কাহার কি মত তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। প্রকাশ্য সম্মেলনে মৌলানা মোহম্মদ আলীও কিছু সংশোধন প্রস্তাব আনিলেন, লোকে ভোটাধিক্যে তাহা নামঞ্জুর করিয়া দিল। এই ভাবে সম্মেলন নিজের কাজ তো শেষ করিল; কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়িল যে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাবুঝি হয় নাই। ইহার ফলে এই সম্মেলন শেষ হইতেই মুসলমানদেরও এক সর্বদল সম্মেলন হইল, তাহাতে কংগ্রেসী মুসলমানও অনেকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মধ্যে প্রধান ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলবী মোহম্মদ কাফী প্রভৃতি। এই সময় হইতেই স্পষ্ট ভাবে মুসলমানদের এক প্রভাবশালী দল কংগ্রেস হইতে খসিয়া পড়িল। এইভাবে, যে-সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মেলন আহূত হইয়াছিল তাহা আরও জটিল হইয়া গেল, তাহার কুফল পরে আরও দৃষ্টিগোচর হইল।

ইহার পরেই মিঃ জিন্না মুসলমানের দিক হইতে নিজের চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করিলেন, এবং বলিলেন, কোনও প্রকার বোঝাপড়া করিতে গেলে সর্বপ্রথমে ঐ দাবি মানিয়া না লইলে চলিবে না।

ওদিকে কংগ্রেসে নেহরু-রিপোর্ট লইয়া 'স্বরাজে'র সংজ্ঞা কি হইবে সে বিষয়ে অনেক মতভেদ দেখা গেল। পূর্বে বলা হইয়াছে, পণ্ডিত জওহরলাল, সুভাষবাবু, শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার প্রভৃতি চাহিতেছিলেন, পূর্ণ স্বরাজকেই কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা হউক। আর সকলে শুধু 'স্বরাজ' কথাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, ভাবিতেছিলেন যে কথাটা আমাদিগকে পুরা সুযোগ দিতেছে, সময় আসিলে আমরা স্থির করিতে পারিব যে ঔপনিবেশিক স্বরাজেই খুশী থাকিব না পূর্ণ স্বাধীনতাই লইব। ঔপনিবেশিক স্বরাজকেই লক্ষ্য স্বীকার করিয়া নেহরু-রিপোর্ট তৈয়ার করা হয়। অন্য কিছু হইতেও পারিত না; কারণ উহা তৈয়ার করায় নরম দলের লোকদের—বিশেষত স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতির—পুরা হাত ছিল। উহা স্বীকার না করিলে হয়তো এ-রচনা প্রণীত হইয়া সর্বদল সম্মেলনের সম্মুখ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিত না। তাই, যদি কংগ্রেস ঐ মূল ভিত্তিটাই নিজের প্রস্তাব হইতে বাদ দিত, তাহা হইলে নেহরু-রিপোর্ট ততদূরই সর্বজনমান্য হইত যতদূর সর্বদল সম্মেলন তাহা গ্রহণ করিত। কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে এই বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। মহাত্মাজীর মত ছিল, নেহরু-রিপোর্ট মঞ্জুর করা হউক। কিন্তু গান্ধীজী সর্বদা নিজের মত প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। শেষকালে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থকদের সঙ্গে, যাঁ নেতৃস্থানীয়দের নাম উপরে দিয়াছি, এই একটা বোঝাপড়া করিয়া যে এক বৎসর পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ববৎ থাকিবে—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই বৎসরের ভিতর নেহরু-রিপোর্ট মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয় তো ভাল, নতুবা এক বৎসরের পর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাকেই আপনার লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিবে এবং তাহার জন্যই প্রস্তুত হইবে, অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া গেলে আমরা ঔপনিবেশিক স্বরাজেই সন্তুষ্ট থাকিব, না হইলে আর ঔপনিবেশিক স্বরাজের কথাই থাকিবে না, কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়া লইবে। ইহা স্থির হইয়া গেলে আমরা সকলে বুঝিলাম যে, ব্যাপারটার শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু পরের দিন সুভাষবাবুর দিক হইতে বোঝা গেল যে তিনি এই মীমাংসা স্বীকার করিবেন না। ইহাতে মহাত্মাজীর খুব কষ্ট হইল; কারণ পূর্বরাত্রে সুভাষবাবু উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। মনে হইল, তাঁহার সঙ্গী ও অনুবর্তী কর্মিগণ ইহা পছন্দ করেন নাই, তাই তিনি আবার মত পরিবর্তন করিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল ও শ্রী

শ্রীনিবাস আয়েংগার উহা পছন্দ না করিলেও গান্ধীজীর নিষ্পত্তি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মাজী এই কথাটার কঠোর আলোচনাও করিলেন। শেষে মহাত্মাজী ঐ সামঞ্জস্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, আর তাহা গৃহীত হইয়া গেল।

এই কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচনী সভায় অন্য ব্যাপারেও মতভেদ ছিল। এরূপ মনে হইতেছিল যে কেহ কেহ গান্ধীজীর নীতিতে সন্তুষ্ট নয়—যেমন কোনও কোনও কমিউনিস্ট, যাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীযুক্ত নিম্বকর ও শ্রীযুক্ত মোগলেকর, যিনি অখিল ভারতীয় কমিটিতে প্রায়ই কিছু-না-কিছু বলিতেন। এবারকার কংগ্রেসে এক বিশেষ ঘটনা এই হইয়াছিল যে কলিকাতার শ্রমিকদের এক অতি প্রকাণ্ড দল শক্তি দেখাইবার জন্য এক মিছিল তৈয়ার করিয়া কংগ্রেস-নগর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা কংগ্রেস পেণ্ডালের ভিতরে যাইতে চাহিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিল যে, উহাদের প্রথম হইতেই পেণ্ডালের ভিতর গিয়া বসা ছিল উদ্দেশ্য, তার পর অধিবেশনের সময়ে তাহারা ওখান হইতে সরিয়া যাইবে না, আর এই ভাবে সমস্ত কাজ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে। কিন্তু হয়তো উহাদের ইচ্ছা বাস্তবিক এরূপ ছিল না। কারণ মহাত্মাজী আসিয়া তাহাদিগকে কিছু বলিলেন, আর তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল। এই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি হইতে বিহারের প্রতিনিধিদের কার্যক্রম সম্বন্ধে খানিকটা মতের পার্থক্য দাঁড়াইল। বিহারের সমস্ত প্রতিনিধি কংগ্রেসে যাইতে অস্বীকার করিল। সুভাষবাবু এই খবর পাইলেন। তিনি নিজে আসিলেন। তিনি অভিযোগ দূর করিয়া দিবেন বলিয়া কথা দিলেন। তখন লোকেরা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিল।

একদিক হইতে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন অতিশয় মহত্ত্বপূর্ণ ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া ইহা একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইল; কারণ সেখানে স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেস এক বৎসরের পর ঔপনিবেশিক স্বরাজ লইয়া কখনই সন্তুষ্ট থাকিবে না। হইতে পারে কংগ্রেসে এমনও অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা মনে করিলেন—এই প্রস্তাব তো গ্রহণ করা হইল, এক বৎসরের পরে আবার দেখা যাইবে। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রস্তাবকে খুব গুরুত্ব দিতেন, বিশেষ করিয়া যখন কোনও কালসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত, বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইত। এইজন্য তিনি তো স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বেই কোনও সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে, না হইলে পরবর্তী অধিবেশনে কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। আমি এবিষয়ে দ্বিধায় ছিলাম। ব্রিটিশ সম্পর্কের আমি পক্ষপাতী ছিলাম। আমি স্বীকার করিতাম যে উপনিবেশগুলির নিজ

নিজ কাজকর্ম চালাইবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাই যদি আমরাও সেই স্বাধীনতা পাই তবে আমাদের পক্ষে তাহা যথেষ্ট মনে করা উচিত। পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই গৌরবের বিষয়; কিন্তু শেষে পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে কোনও-না-কোনও প্রকারের এমন একটা বোঝা-পড়া অবশ্যই করিতে হইবে, যাহাতে একে অন্যের সঙ্গে কোনও বন্ধনে যুক্ত থাকে। এরূপ না হইলে লড়াই হইতে থাকিবে। দুনিয়ার কয়েকটি দেশের লোকের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ঐ প্রকারের এক সংগঠন তো বটেই, তাহাতে যোগদান করায় আমাদের কোন ক্ষতি নাই, বরং কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের সুবিধাই। তা ছাড়া আমরা এখনও এতদূর সংগঠিতও নহি যে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লইতে পারি। এই সব কারণে আমি মান্দ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আমার কখনও কখনও বিরক্তিও লাগিত, যাহাতে আত্মহারা হইয়া আমি কখনও কখনও পূর্ণ স্বরাজের কথাও বলিতাম। কিন্তু সে-বিরক্তি জন্মিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে ভারতবাসীদের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া —বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি যে-ব্যবহার হইত, তাহাতে আমি এতখানি অস্থির হইতাম যে কখনও কখনও ভাবিতাম, যে-সাম্রাজ্যের কোনও অংশে আমাদের দেশী ভাইদের প্রতি এত খারাপ ব্যবহার হইতে পারে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়াই বা আমাদের কি লাভ; আবার ভাবিতাম, ঐ সব উপনিবেশের যে-অধিকার ও স্থান আছে, যত দিন আমাদের সেই অধিকার ও স্থান না জোটে ততদিন পর্যন্ত এইরূপই হইতে থাকিবে, যখন আমাদেরও সেই মর্যাদা জুটিবে তখন এরূপ আর ত পারিবে না। এইভাবে আমি নিজের মনকে বুঝাইতাম।

এই কথা লইয়া আমার মনে তোলপাড় হইতে থাকিত। এই চিন্তায়, বিশেষত উপনিবেশের সংবিধান ও অধিকার বিষয়ে জানিবার জন্য আমি অধ্যাপক কীথের গ্রন্থগুলি পড়িতাম। ১৯২৬ সালে ইম্পীরিয়াল কন-ফারেন্সে যাহা নির্ধারিত হইত আমি তাহাও দেখিয়াছিলাম। সব দিক দিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঐ সব আক্ষেপ সত্ত্বেও, আমি তখন পর্যন্ত ঔপনি-বেশিক স্বরাজেই সন্তুষ্ট ছিলাম, পূর্ণ স্বরাজকে কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করাটা মনে করিতাম, নিজের চলিবার পথকে আরও দুর্গম করিয়া তোলা। আমি তখন পণ্ডিত জওহরলালের এই কথাটা ঠিক বলিয়া মনে করিতাম না যে আমাদের কথা বিদেশের লোকে বুঝিতে পারে না; কারণ ঔপনিবেশিক স্বরাজ তো ইংরেজেরা নিজের জাতি ও নিজের দেশের লোকদেরই দিয়াছে, যাহাদের সঙ্গে তাহাদের সংস্কার, সমাজ ও ধর্মের হাজারো রকমের বন্ধন বা যোগ আছে; কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো তাহাদের ঐ প্রকারের কোনও বন্ধনই নাই; এই অবস্থায় তাহারাও আমাদের সেই

অধিকার দিতে পারিবে না, আমরাও উহা লইয়া খুশী থাকিতে পারিব না। আমার মনের উপর স্বর্গীয় গোখলের কথা এই ভাবে আঁটিয়া বসিয়াছিল যে আমি সহসা তাহা মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। ১৯১০-এ তিনি আমাকে সার্ভ্যেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন; তখন তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-চিত্র আমরা আমাদের সামনে রাখিয়াছি তাহা তো এই যে, যত লোক ইহার মধ্যে আছে সকলে সমশ্রেণীর হইবে, সকলে মিলিয়া তাহার চেষ্টা করিবে, এইজন্য যে যখন সময় আসিবে তখন সাম্রাজ্য থাকিতেই পারিবে না, আর যদি থাকেও তাহা হইলে নিজেদের সংখ্যাধিক্যবশতঃ ভারতবাসী তাহা নিজেদের সাম্রাজ্যই করিয়া লইবে। আমি এই কথা ভাবিতাম যে সত্য সত্যই যদি আমাদেরও ঐ স্থান ও অধিকার পাওয়া যায়, যাহা ইংলণ্ড ও অন্যান্য উপনিবেশগুলি পায়, তাহা হইলে বাস্তবিক পক্ষে আমাদের তার চেয়ে আর কিছুই প্রয়োজন হইবে। যাহা হউক, কলিকাতায় কংগ্রেস স্থির করিলেন যে ১৯২৯ সালের মধ্যেই ঔপনিবেশিক স্বরাজ পাইতে হইবে।

দুঃখের দিন

উপরে বলিয়াছি যে দেশের মধ্যে নবজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গান্ধীজীও কংগ্রেসের কাজে অনেক বেশি মন দিতে শুরু করিলেন। ১৯২৯-এর মধ্যে আরও ঘটনা হইল, যাহার ফলে জাতীয় জাগরণ আরও ব্যাপক হইল। গান্ধীজী সর্বদা ভাবিতেন যে আমাদের দেশের দারিদ্রের কারণসমূহের মধ্যে এক প্রধান কারণ হইল এই যে, এই দেশ হইতে কাপড়ের ব্যবসা ইংরেজেরা উঠাইয়া লইয়াছে, তাহার ফলে চরখা চলা বন্ধ হইয়াছে, আর কোটি কোটি গরিবের রুজি তাহাদের হাত হইতে ছিনিয়া লওয়া হইয়াছে। এইজন্য তিনি চরখাকে আবার বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। খাদি সম্বন্ধে সকল চেষ্টা এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তিনি চাহিতেন যে ভারতবর্ষে একগাছি সুতাও বিদেশ হইতে না আসে। তিনি এই বস্ত্র-ব্যবসায়কে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে গরিবদের সেই রুজি আবার ফিরিয়া আসে। তাই তিনি সকল প্রকারের বিদেশী বস্ত্র ভারতে আসা বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শুধু ইংলণ্ডের বস্ত্র নয়। অন্য লোকের বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার অর্থে সর্বদা ইংরেজী বস্ত্রের বহিষ্কার বুঝিত। তাহাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল না যে

ভারতবর্ষে এই ব্যাপার আবার গাঁয়ে গাঁয়ে চলে। তাহারা ইংলণ্ডে প্রস্তুত কাপড় এ দেশে না আসিলেই সন্তুষ্ট হইত, শুধু তাহারা মনে করিত যে, শুধু ইংরেজের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, তাই তাহাদেরই দেশের পণ্য আমরা বর্জন করিব, এবং এইভাবে তাহাদের উপর চাপ দিব এবং নিজেদের দাবি মানিতে তাহাদের বাধ্য করিব। এই প্রকারের বর্জনকে গান্ধীজী হিংসামূলক বলিয়া মনে করিতেন, এবং সর্বদা ইহার প্রতিরোধ করিতেন। কলিকাতা কংগ্রেসের পর স্বদেশীর ঢেউ আর একবার চলিল। গান্ধীজী উহাকে কেবল ব্রিটিশ পণ্য বহিষ্কারের রূপ না দিয়া বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কারের রূপ দিয়া দিলেন। তিনি কেবল বহিষ্কারেই সন্তুষ্ট থাকিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চরখা প্রচারও ততখানি প্রয়োজন মনে করিলেন। চরখা প্রচারের কাজ তো চরখা সংঘ করিতেছিল। ব্রিটিশ পণ্য বহিষ্কারের জন্য এক কমিটি গঠিত হইল, তাহা এই উদ্দেশ্যে খুব জোরে প্রচার কার্য চালাইতে লাগিল। ১৯২৯ সাল এই কার্যে চলিয়া গেল। যাহা কিছু জাগরণ হইল, তাহা হইতে এই কার্যে লাভ দেখা গেল, এবং ইহার প্রভাবও পড়িল ঐ জাগরণের উপর।

গান্ধীজী কোনও কোনও জায়গায় বিদেশী বস্ত্র পোড়াইয়াছিলেন, তাহাতে জনতার মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়া গেল। কলিকাতায় তিনি এক দিনের জন্য আসিলেন। বর্মায় যাইতেছিলেন, পথে এক দিন থাকিলেন। লোকে সেখানে জনসাধারণের এক সভা ডাকিল। তাহাতে বিদেশী বস্ত্র পোড়াইবার ব্যবস্থাও থাকিল। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো হইল। কিন্তু ইহার পূর্বেই পুলিশ কোনও সাধারণের গতায়াত আছে এমন স্কোয়ারে এই ধরনের কাজ যাহাতে না হয় সেজন্য বারণ করিয়া দিয়াছিল। সভা হইয়া গেল; কাপড়-চোপড় পোড়ানোও হইল। আমরা সকলে ওখান হইতে চলিয়াও আসিলাম। তখন পুলিশ আসিয়া আগুন নিভাইয়া দিল! যাহারা ওখানে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদিগকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। পরের দিন মহাত্মাজীর নামে মকদ্দমা রুজু হইল, শুনানী হইল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। গান্ধীজী তো কিছুই বলিতেই চাহেন নাই, কিন্তু উকিলেরা খুব তর্ক শুরু করিল যে এই মকদ্দমা বে-আইনী হইতেছে কারণ আইনের যে-ধারায় এই মকদ্দমা জারী হইয়াছে তাহা এইখানে ঠিক প্রয়োগ হয় না। কিন্তু মিঃ রক্সবরা, যিনি এখন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, এই অভিমত গ্রহণ করিলেন না, আইন ভঙ্গের জন্য গান্ধীজীকে এক টাকা জরিমানা করিলেন! গান্ধীজী রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি ফিরিলে পরে তবে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল।

এই সময় গান্ধীজী কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে আর একটা ঘটনা ঘটিল, যাহার সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধ ছিল। ঘটনা দুঃখের, কিন্তু

তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। ১৯২১ সালেই খাদি প্রচারের কাজ আরম্ভ হয়। আমাদের প্রদেশে শ্রীরামবিনোদ সিংহ প্রচণ্ড উৎসাহ ও যোগ্যতার সঙ্গে ইহা শুরু করেন। পূর্বে বলিয়াছি যে তাঁহার সফলতা ও কর্মকুশলতায় প্রভাবিত হইয়া তাঁহাকে তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড হইতে পঁচিশ হাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি খাদির কাজ অনেকটা অগ্রসর করিয়া দেন। ইহাও লিখিয়াছি যে তাঁহার সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হয়; কারণ তাঁহাদের মতে রামবিনোদ-বাবু এই প্রতিষ্ঠানকে এখন নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া চালাইতে-ছিলেন। আচার্য কৃপালনী ঋণের জন্য সুপারিশ করেন; তিনিও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনিও চাপ দিতেছিলেন যে চরখা-সংঘ তাঁহার নিকট হইতে টাকাটা ফিরাইয়া লয়। আমি বিহার শাখার এজেণ্ট ছিলাম বলিয়া এই ভার আমার স্কন্ধে আসিতেছিল। চরখা-সংঘের প্রাদেশিক সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, চরখা-সংঘের নির্ধারণ অন টাকার হিসাব চাহিলেন। হিসাবে তাঁহার ও রামবিনোদ বাবুর মধ্যে মতভেদ হইল। কথা গান্ধীজীর কানে উঠিল। তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে এবিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিতে বলিলেন।

সতীশবাবু কলিকাতায় বসিয়াই তদন্ত করিলেন। লক্ষ্মীবাবু প্রভৃতি সেখানেই সব কাগজপত্র লইয়া গিয়াছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি এই তদন্তে যোগ দিই নাই; কিন্তু তাঁহার রিপোর্ট আমাকে দুঃখ দিয়াছিল। টাকা কমবেশি যাহা কিছু বাকি থাকুক, তাহা শ্রীযুক্ত রাম-বিনোদ সিংহের নিকটে বিহার চরখা-সংঘেরই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি রিপোর্টে বিহার শাখা অযোগ্য বলিয়া অভিযোগ করিলেন। হিসাবও, রামবিনোদবাবু যেমন বলিয়াছিল তাহাই স্বীকার করিলেন। রিপোর্ট দেখিয়া আমার খুব খারাপ লাগিল—বিহার শাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে বলিয়া নয়, কিন্তু তিনি নিজ অধিকারের বাহিরে গিয়া বিহার শাখাকে অপটু ও অকর্মণ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া। আমি মহাত্মাজীকে বলিলাম যে আমি এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি, তাঁহাকে নিজে হিসাব দেখিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ একদিকে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান, যাহার পরিচালনায় কয়েকজন ত্যাগী ও সত্যসন্ধ সেবক প্রচণ্ড উৎসাহ ও পরিশ্রমের সঙ্গে নিযুক্ত আছেন; অন্য দিকে এমন একজন কার্যকর্তা যিনি কর্মপটু ও খাদি প্রচারে অনেক কাজও করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল এই যে তিনি সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের অর্থের সাহায্যে নির্মিত প্রতিষ্ঠানকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করিয়া বসিয়া আছেন—তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই, কারণ তিনি এই কার্যে পরিশ্রম করিয়াছেন ও সময় দিয়াছেন, কিন্তু চরখা-সংঘের টাকাটা তো ঠিক ঠিক ফিরাইয়া পাওয়া চাই।

বর্মা হইতে গান্ধীজী কলিকাতায় ফিরিবার পর, যখন সব কথা তাঁহার সামনে উপস্থিত করা হইল, তখন তিনি সব কিছু নিজে দেখিবেন বলিয়া কথা দিলেন। অনেক দিন ধরিয়া কথা চলিতে থাকিল। হিসাব পরীক্ষার জন্য মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস গান্ধীজীর উপর ভার দিলেন। শেষ-কালে চরখা-সংঘের তরফ হইতে যে-হিসাব পেশ করা হয় তাহাই শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। গান্ধীজী রামবিনোদবাবুকে বলিলেন, ইহাতে যদি ভুল হইয়া থাকে তবে আমাকে বুঝাইয়া দাও। এইজন্য দিনও স্থির করা হইল। কিন্তু আর অগ্রসর হইল না, যেখানকার সেইখানেই থাকিল। তবে হ্যাঁ, গান্ধীজী বুঝিতে পারিলেন যে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ঠিক।

এই ঘটনাকে আমি এইজন্য দুঃখের বলিয়া মনে করি যে এবিষয়ে রাম-বিনোদবাবু ও সতীশবাবুর সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিতে হইল। ইহার চেয়েও বেশি দুঃখ আমি তখনকার সমস্ত কথাবার্তা হইতে পাইয়াছিলাম। সার্বজনিক জীবনে আমাদের এইভাবে অনেকবার এমন কাজ করিতে হয় যাহা আমরা ব্যক্তিগতভাবে করা পছন্দ করি না, কিন্তু কর্তব্যানুরোধে অপ্রিয় হইলেও করিতেই হয়। শ্রীযুক্ত রামবিনোদ সিংহ যখন ভাগলপুর কলেজে পড়েন ও প্রথম জার্মান যুদ্ধে নজরবন্দী থাকেন তখন হইতেই আমি তাঁহাকে জানি। গান্ধীজী চম্পারণে আসিবার পর ঐ পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। অসহযোগ আন্দোলনে, বিশেষত খাদির কাজে, তাঁহার সহিত আমার শুধু সম্পর্কই বাড়ে নাই তাঁহার কার্যকুশলতায় আমার বিশ্বাসও বাড়িয়া গিয়াছিল। এরূপ লোকের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে তাহা দুঃখের হইয়াই থাকে। সতীশবাবুর প্রতি আমার হৃদয়ে যে-শ্রদ্ধা ও প্রেম, তাহা আমি বলিতে চাহি না। তাঁহার কার্যক্ষমতা ও ত্যাগের তুলনা নাই। আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহও আছে। এই কারণে এই দুর্ঘটনা স্বভাবতই আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের হইয়াছিল।

রাজবন্দীদের শ্রেণী-বিভাগ

১৯২৯-সালে 'লাহোর কন্‌স্পিরেসি কেস' নামে এক প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রের মকদ্দমা লাহোরে চলিয়াছিল। সরদার ভগৎসিং ছিলেন অন্যতম আসামী। মকদ্দমা অনেক দিন ধরিয়া চলে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জেলের মধ্যে অসুবিধার প্রতিবাদে অনশন শুরু করিল। অনশন কয়েকদিন ধরিয়া চলিল। অনশন-

কারীদের মধ্যে এক তরুণ যুবক শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ষাট দিন অন্তে শহীদ হইলেন। এই মকদ্দমার সব বার্তা সংবাদপত্রে ছাপা হইত। অনশনের খবরও লোকে পড়িত। সমস্ত দেশ জুড়িয়া তুমুল চঞ্চলতা দেখা দিল। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে এই চঞ্চলতা আরও অনেক বাড়িয়া গেল। তাঁহার মৃতদেহ গভর্নমেণ্ট তাঁহার বন্ধুদের দিয়া দিলেন। তাহা রেলে করিয়া অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে লাহোর হইতে কলিকাতায় আনা হইল। যে-সব শহর হইয়া ঐ গাড়ি আসিল, সে-সব শহরের স্টেশনে স্টেশনে প্রকাণ্ড ভিড় জমিল। লোকে শবের উপর ফুলের মালা রাখিল, অন্য উপায়েও সম্মান করিল। যে-জাগরণ কিছু পূর্ব হইতেই হইতেছিল, তাহার গতি আরও বাড়িয়া গেল। সমস্ত দেশে প্রবল উৎসাহের আবির্ভাব হইল। যতীন্দ্রনাথের আত্মোৎসর্গের অন্যতম ফল ইহাও হইল যে গভর্ন-মেণ্ট কয়েদীদের—তাহাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা ইত্যাদি হিসাব করিয়া—তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহা তাড়াতাড়ি হইতে পারিল না, কিন্তু ১৯৩০ সালে যখন সত্যাগ্রহ হয় তখন সত্যাগ্রহী কয়েদীও তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইল। অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে 'এ' ক্লাস জুটিল, তাদের চেয়ে কিছু পাইল 'বি' ক্লাস, আর অনেক বেশি সংখ্যা 'সি' ক্লাসেই রাখা হইল। রাজনৈতিক কয়েদীদের এক স্বতন্ত্র বর্গ বা ক্লাস থাকা উচিত, গভর্নমেণ্ট এ-কথা মঞ্জুর করিলেন না। এ-প্রশ্ন এখনও যেমনকার তেমনই আছে।

গভর্নমেণ্ট যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। এ-কথা সত্য যে যে-ব্যক্তি নিজের বাড়িতে অনেক আরামে থাকিয়া আসিয়াছে তাহাকে জেলেও গরীব মজুরেরা যে-ভাবে থাকে সেই ভাবে রাখিলে, সেই আহার্য দিলে, সেই কাপড় চোপড় পরাইলে, তাহার সাজা তাহার পক্ষে আরও অনেক কষ্টদায়ক হয়। আর অপরাধের জন্য সকলকে সমান দণ্ড দেওয়াই যদি আইনের অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে এক অবস্থায় রাখিলে তাহার সাজা বেশি হয়। এই বলিয়া কয়েদীদের তিন ভাগে ভাগ করা হইল। কিন্তু যাহারা একসঙ্গে কাজ করিতেছে ও একই কাজে লাগিয়া আছে তাহাদের যদি জেলের ভিতরে লইয়া পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা যায়,—এদিকে কাহারও কাহারও শোয়ার জন্য খাট জোটে, খাওয়ার বেলায় অল্প দুধ-ঘিও থাকে, চিঠি লিখিবার ও দেখা-সাক্ষাৎ করিবার সুবিধাও বেশি পায়, আর অন্যদিকে অধিকাংশের ভাগ্যে জোটে লোহার পাত্রে মোটা চাউলের ভাত, লোহার বাসনে রান্না হইয়াছে বলিয়া বেশি জোলো কালো কালো ডাল, নামমাত্র তরকারি, পরিবার জন্য ছোট জাঙিয়া, হাতকাটা কুর্তা, আর যে-সব কয়েদী চুরি ইত্যাদির জন্য জেলে বন্ধ থাকে, তাহাদের প্রতি জেলের কর্তৃপক্ষের ব্যবহারও সেইমত হয়, তাহা হইলে এই জাতীয় অধিকাংশ লোকের মনে অসন্তোষ জন্মানো

স্বাভাবিক। জানি না, গভর্নমেণ্ট কোন বিধি অনুসারে এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন।

রাজনৈতিক কয়েদীদের একই শ্রেণী হউক, যে-সুবিধা 'এ' অথবা 'বি' শ্রেণীর ভাগ্যে জোটে তাহার চেয়ে কম পাইলেও সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার হয়—এর জন্য আজ পর্যন্ত যে-সব চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট নিজের সুবিধার জন্য রাজনৈতিক বন্দীদের এক প্রকার আলাদা করিয়া রাখেন; কিন্তু তাহাদিগকে আলাদা বলিয়া মনে করা হউক, তাহাদের প্রতি ভিন্ন ব্যবহার হউক, এ-কথা বলিলে সর্বদা উত্তর আসে, গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক ও অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন না। ১৯৩০-এর আন্দোলনে বিহার প্রদেশে সত্যাগ্রহের জন্য রাজনৈতিক বন্দী ১২ হইতে ১৪ হাজার পর্যন্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কুড়ি জনের বেশি 'এ' ক্লাস পায় নাই। যাহারা 'বি' ক্লাস পাইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা হইবে তিন হইতে চার শ পর্যন্ত, তাহার বেশি নয়। বাকি সকলকেই 'সি' ক্লাসে রাখা হয়। শ্রেণীবিভাগও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনও পদাধিকারীর ইচ্ছামত হইত। শেঠ যমুনালাল বাজাজের ছেলেকে রাখা হইল 'সি' ক্লাসে। একই বাড়ির এক ভাইকে রাখা হইল 'এ' অথবা 'বি' ক্লাসে, অন্য এক ভাইকে 'সি' ক্লাসে। এই ধরনের অনেক গোলমাল হইত। এছাড়া, বিহারে 'সি' ক্লাসের এক প্রকাণ্ড দল—সংখ্যায় চার পাঁচ হাজার হইবে—পাটনা ক্যাম্প জেলে রাখা হয়। এ জেলখানা খোলা ময়দানে অবস্থিত ছিল, কোনও গাছপালা ছিল না, দেওয়াল আর চাল টিনের। বর্ষাকালে নীচু জমি বলিয়া মেজে স্যাঁৎসেতে হইয়া থাকিত। গ্রীষ্মকালে টিনের দেওয়াল ও চাল তাতিয়া যাইত। গ্রীষ্মের তাপে লোক পীড়িত হইয়া ছটফট করিত। ঠাণ্ডার সময়ে টিন বাহিরের ঠাণ্ডাকে বন্ধ করিতে পারিত না। কখনও কখনও হাওয়ার মধ্যে যে-লবণ আছে তাহা টিনে লাগিয়া জল হইয়া যাইত, আর বর্ষা না হইলেও জল পড়িতে থাকিত। কয়েদীদের কষ্টের সীমা ছিল না। এই সব কারণের ফলে 'সি' ক্লাসের মধ্যে খুব দেখা দিল। অসন্তোষের খানিকটা অংশ তাহাদের বিরুদ্ধেও আসিল যাহারা 'এ' অথবা 'বি' ক্লাসে স্থান পাইয়াছিল। মানুষের মধ্যে সাধারণ হিসাবে হিংস্যার কিছু ভাগ থাকেই। কেহ কেহ ইহার উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল, যদিও এই শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে 'এ' 'বি' ক্লাসের লোকদের কোনই দোষ ছিল না।

অবশ্য কখনও কখনও এমনও হইয়া থাকিতে পারে যে কেহ চেষ্টা চরিত্র করিয়া 'এ' অথবা 'বি' ক্লাস পাইয়াছে, যদিও এইরূপ লোকের সংখ্যা অল্পই হইবে। নিজের 'এ' অথবা 'বি' ক্লাস ছাড়িয়া দরখাস্ত দিয়া 'সি' ক্লাস করাইয়া লইয়াছে, এমন ধারাও কেহ করে নাই। কোথাও কোথাও 'এ' অথবা

'বি' ক্লাসের কেহ কেহ নিজের খাবার ছাড়িয়া কিছু দিন পর্যন্ত 'সি' ক্লাসের খাবার খাইয়াছে; কিন্তু তাহা বেশি দিন চলে নাই। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে এই প্রকার শ্রেণীবিভাগে কংগ্রেসী কর্মীদের মধ্যে খানিকটা মনোমালিন্য হইল; কিন্তু এই মনকষাকষি খুব বেশি পরিমাণে হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। 'সি' ক্লাসের মধ্যে অধিকাংশেরই এতখানি উদারতা ছিল যে তাহারা নিজেরাও বুঝিত অন্যকেও বুঝাইত যে শ্রেণী-বিভাগে আমাদের কোনও হাত নাই—যাহারা জেলখানায় পাঠায় তাহারা যাহাকে যেখানে পাঠায়, যাহাকে যেভাবে রাখিতে চায়, তাহাকে সেইখানেই যাইতে হয়, সেইভাবেই থাকিতে হয়। একই অপরাধের জন্য যদি একজনের তিন মাসের আর সঙ্গীর তিন বৎসরের কারাদণ্ড বিহিত হয়, তবে এজন্য তিন মাসের কয়েদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যেমন করা যায় না, তেমনই 'এ' অথবা 'বি' ক্লাসের কয়েদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগও ব্যর্থ। এ-সব সত্ত্বেও কোনও কোনও লোকের মনে শ্রেণীবিভাগের জন্য অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা রহিয়াই গেল।

গান্ধীজীর মত সর্বদা এই ছিল যে, আমরা যেন এক কয়েদী ও অন্য কয়েদীর মধ্যে প্রভেদ না করি; যদি সব রাজনৈতিক বন্দী নিজেদের পৃথক শ্রেণী করিয়া লয় তাহা হইলে অন্যান্য গরিব লোক যাহারা জেলে আসে, তা চাই যে অপরাধেই হউক না কেন, তাহারা আজ পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই পড়িয়া থাকিবে; এইজন্য আমাদের যদি আন্দোলন করিতেই হয় তাহা হইলে এইজন্য করিব যে, সকল কয়েদীর অবস্থার উন্নতি হউক। ঠিক এই নীতি অনুসারে গান্ধীজী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে চড়েন, আর চাহেন যে অন্যান্য বড় লোকেরাও ঐভাবে যাওয়া আসা করেন, তাহা হইলে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তন হইবে। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেও সকলে এই মত পোষণ করে না। এইজন্য এ পর্যন্ত এমন কিছু হইতে পারে নাই। আমি যখন প্রথম জেলে গেলাম তখন আমি ভাবিতাম যে এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি বাহির হইতে বেশি সহজে হইতে পারিবে, আমি কয়েদীদের দিয়া আন্দোলন করানো পছন্দ করিতাম না। কিন্তু আমার এখন বিশ্বাস হইয়াছে যে এ-বিষয়ে যাহা কিছু করণীয় তাহা কয়েদীরাই করিতে পারে, বাহিরের লোকে বিশেষ কিছু করিতে পারে না। তবে যদি বিবেচক লোকদের হাতে অধিকার আসিয়া যায়; তাহা হইলে তাহারা হয়তো কিছু করিতেও পারে। এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাও ইহাই বলিয়া দেয় যে বন্দীদের অবস্থায় কম বেশি যাহা কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা কয়েদীদের আন্দোলনের জন্যই হইয়াছে। লোকের সামান্য যাহা কিছু সুবিধা হইয়াছে, তাহাও যতীন দাসের আত্মবিসর্জনেরই ফল।

স্থান হিসাবে বিহারে জামসেদপুরের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেখানে শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সমস্ত এশিয়ায় সবচেয়ে বড় লোহার কারখানা, পৃথিবীর বড় বড় কারখানার মধ্যেও তাহার হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কারখানাও আছে, সে সব কারখানা অবশ্য তাহার তুলনায় ছোট, না হইলে বড় বলিয়াই গণ্য হইত। সকলেই জানে যে এমন-ধারা শহরের শ্রমিকদের সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া থাকে। এই প্রদেশে শ্রমিক-সংগঠনের গুরুত্ব সমধিক; কারণ এখানে কয়লার খনিও সকল প্রদেশের মধ্যে বেশি। যুক্তপ্রদেশ ছাড়িয়া দিলে এই প্রদেশে ইক্ষুর কার-খানাও সবচেয়ে বেশি। সকল প্রদেশের মধ্যে এখানেই বেশি চিনি হয়।

আমি নিজে শ্রমিক-সমস্যায় কখনও আগ্রহ দেখাইতাম না। তাহার কারণ ইহা নয় যে আমি তাহার গুরুত্ব বুঝিতাম না; তাহার কারণ ইহাই ছিল যে আমার হাতে অন্য কাজ এত বেশি ছিল যে ও-কাজের ভার হাতে লইতে আমার সাহস হইত না। অন্য কেহও ইহা হাতে লইতে চাহিত না। ফলে দাঁড়াইল এই যে আমরা এ-বিষয়ে অনেক পিছনে পড়িয়া গেলাম। জামসেদপুর, ঝরিয়া ইত্যাদি জায়গায় স্থানীয় লোকেরা অথবা অন্যত্র হইতে আসিয়া বিহারের লোকেরা, কিছু কিছু কাজ করিত। কিন্তু তাহাতে আমরা খুশি হইতে পারি নাই। ১৯২১ সাল হইতেই আমি যখন তখন জামসেদপুরে যাইতাম। কংগ্রেসের প্রচারকার্য করিয়া চলিয়া আসিতাম। ঝরিয়ার সঙ্গেও আমার ঐরূপই সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল। শ্রমিক-সংগঠনের কাজ আমি কখনও নিজের হাতে লই নাই। জামসেদপুরে এক সংঘ গঠিত হয়, দীনবন্ধু এণ্ড্রুস হইয়াছিলেন তাহার সভাপতি। গান্ধীজী সেখানে গিয়াছিলেন। টাটা কোম্পানীর ডাইরেক্টর স্বর্গীয় আর. জি. টাটা আসিয়া-ছিলেন। আমিও গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলাম। শ্রমিক সংঘকে শ্রীযুক্ত টাটা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহা কিছু কিছু কাজ করিত। এণ্ড্রুস ওখানে থাকিতেন না, কখনও কখনও যাওয়া-আসা করিতেন। এইজন্য, যদিও তাঁহার সহানুভূতিতে লাভ হইত নিশ্চয়ই, তথাপি সংগঠন যতটা দৃঢ় হওয়া উচিত ততটা হয় নাই।

শ্রমিকদের অভিযোগের ফলে ১৯২৮ সালে সেখানে হরতাল হইল। হরতাল কিছুদিন ধরিয়া চলিল। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা হইতে আসিলেন। শ্রমিক-সংঘের তিনি সভাপতি হইলেন। শেষে তিনি টাটা কোম্পানীর সঙ্গে বোঝাপড়া করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সেখানকার

শ্রমিক-সংঘের মধ্য হইতে অন্য একজন এ-বিষয়ে মন দিতেছিলেন, তিনি এই মীমাংসা স্বীকার করিলেন না। কিছু কিছু শ্রমিক লইয়া তিনি এক স্বতন্ত্র সংঘ গঠন করিলেন। তাঁহার দিক হইতে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হইতে লাগিল। কিন্তু ব্যাপারের তো নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল, আর সব শ্রমিকদের এখন মতের ঐক্য ছিল না, তাই কোম্পানীকে আর কিছু করিতে হয় নাই। এসব হইয়াছিল আমার অনুপস্থিতিতে। শ্রমিকদের মধ্যে দুইদল, প্রতিষ্ঠানও দুইটি; উভয়ের মধ্যে পরস্পর মনো-মালিন্যও ছিল যথেষ্ট।

এই সময়ে সেখানে টিন-প্লেট নামে অন্য এক কোম্পানীর কারখানায় হরতাল হয়। সেখানকার লোকেরাও সুভাষবাবুর সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি আসিলেন। হরতাল চলিতে থাকিল। কিন্তু কোম্পানীর মালিকেরা খুব কঠোরতার সহিত প্রভুত্ব দেখাইতে থাকিল। কোনও প্রকারেই শ্রমিক-দের কথা শুনিতে রাজি হইল না। সুভাষবাবু আমাকেও খবর দিয়া ডাকাইয়া লইলেন। এই হরতালের বিষয়ে মন দিতে আমাকে বলিলেন। প্রফেসর আবদুল বারি ওখানে সুভাষবাবুকে সাহায্য করিতেছিলেন। আমিও, নিজের প্রদেশে হইতেছে বলিয়া, আর শ্রমিকদের দাবি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়া, এই হরতাল সমর্থন করিলাম। ইহার পরে উহা চালাইবার প্রায় সমস্ত ভার প্রফেসর আবদুল বারি ও আমার উপর আসিয়া পড়িল। আমি কয়েকবার সেখানে গেলাম। হরতাল প্রায় ৮।১০ মাস চলিতে থাকিল। আমি গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিলাম যে এই ব্যাপারটা 'ট্রেডস ডিসপ্যুট এক্ট' অনুসারে সালিসিতে দেওয়া হউক। কিন্তু তাঁহারা এ-কথায় রাজি হইলেন না। তখন চিফ সেক্রেটারি ও গভর্নমেণ্টের সদস্যের সঙ্গে আমি দেখা করিলাম। তাঁহারা ইহাই বলিলেন যে, গভর্নমেণ্ট এই হরতালকে ভ্রান্ত ও অকারণ বলিয়া মনে করেন, কারণ জামসেদপুরের শ্রমিকদের নেতা শ্রীহোমি-ও ইহার বিরোধী। ইনিই টাটা কোম্পানীতে সুভাষবাবুর বিরোধিতা করিয়া পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া লইয়া-ছিলেন। তখন গভর্নমেণ্ট ইঁহার মত এইজন্য ঠিক বলিয়াছিলেন যে, ইনি কিছু করিতে চাহেন নাই, কোম্পানীকে সাহায্য করাই পছন্দ করিয়া-ছিলেন। যাহা হউক, হাজার চেষ্টার পরও কোম্পানী একটু হেলিলেন না। আট-দশ মাস চলিয়া হরতাল বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু অনেক শ্রমিক যাহারা কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না। অথবা, যাহারা আসিতেও চাহিল, তাহাদিগকে কোম্পানী আর ফিরাইয়া লন নাই।

১৯২৯ সালে আমার বেশির ভাগ সময় কাটিল বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কাজে, যাহার গঠনমূলক রূপ হইল খাদি উৎপাদন। তাহা ছাড়া জামসেদপুরের ব্যাপারেও খানিকটা সময় গেল। খাদির কাজ দেখাশুনা করিবার জন্য মধুবনীতে কিছুদিন থাকিলাম; সেখানে এখন চরখা-সংঘের প্রধান কেন্দ্র ও প্রাদেশিক কার্যালয়। কি করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া যায় সে-বিষয়ে কার্যকর্তাদের পরামর্শ লইলাম। সেখানেই তার পাইলাম যে আমার ভাইপো জনার্দনের একটি ছেলে হইয়াছে। দাদা স্বভাবত খুশি হইলেন, আমরা সকলেও খুশি। পুরাতন রীতি অনুসারে দাদা বন্ধুদের অনুরোধে এই খুশির ব্যাপারে কিছু খরচও করিয়া ফেলিলেন। নাচ-তামাসার দিন তো আর ছিল না; কারণ তিনি ব্রত লইয়াছিলেন বিবাহাদিতেও নাচ প্রভৃতি দিবেন না। এইজন্য এই উপলক্ষেও নাচ ইত্যাদি হইল না, হইল পূজা-পাঠ। নিজের চাকরবাকর ও কর্মচারীদের কাপড়-চোপড় খুব বিতরণ করিলেন। আমিও উৎসবে ছাপরায় গেলাম। সকলে খুব আনন্দে কাটাইল। এখানে এইসব লিখিতে হইতেছে, কারণ ইহার পরিণাম অতিশয় দুঃখের হইয়াছিল।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইল খুব সুন্দর ও সবল হইয়া। আমরা দুই ভাই উহাকে খুব আদর করিতাম; কারণ সে সময় বাড়িতে ঐ একমাত্র ছেলে। ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে অসুস্থ হইয়া আমি ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে নিজেদের গ্রামে জীরাদেইতে কিছুদিন পর্যন্ত থাকিলাম। শিশুও সেখানেই ছিল। তাহাকে খেলা দিতে ও তাহার সঙ্গে খেলিতে সুযোগ পাইলাম। কলিকাতার শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও প্রায় এক মাস আমার সঙ্গে সেখানেই ছিলেন। রোজ রোজ নাড়িতাম চাড়িতাম বলিয়া ছেলেটির সঙ্গে খুব ভাব হইয়া গেল। সে যেমন যেমন বাড়িতে থাকিল, স্নেহও ততই ঘন হইতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসরের কিছু বেশি, তখন দাদার মৃত্যুর দুই মাস পরে সে-ও পাটনায় টাইফয়েড জ্বরে পীড়িত হইয়া যাওয়ার মত হইল! আমি পাটনাতেই ছিলাম। ডাক্তারেরা তাহাকে বাঁচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। এখনও তাহার কথা মনে পড়িলে মন অস্থির হয়, কষ্ট করিয়া নিজেকে সামলাইতে হয়। তাই, ১৯৪১ সালে আমার বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আমি তাহার জন্মে কোনও প্রকারের উৎসব যাহাতে না হয় সেজন্য কঠোরভাবে বারণ করিলাম। আজ পর্যন্ত মনের মধ্যে এই যে

কারণ বিঁধিয়া আছে তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই, সর্বপ্রথম আজই এই কথা লিখিতেছি।

যাক গে। এই সময়ে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন লর্ড আরুইন। তিনি ছুটি লইয়া কয়েকদিনের জন্য ইংলণ্ড গিয়াছিলেন। সেখানে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কথাবর্তা বলিয়াছিলেন। এই সময়ে সেখানেও শ্রমিকদল মন্ত্রিমণ্ডল গড়িয়াছিল। র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্‌ড ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, ওয়েজউড বেন ছিলেন ভারতসচিব। লর্ড আরুইন সেখান হইতে ফিরিয়া ব্রিটিশ সরকারের তরফ হইতে এক ঘোষণা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে—যে সকল ঘোষণা ব্রিটিশ সরকারের দিক হইতে করা হইয়াছে তাহার মধ্যেই ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বরাজের ব্যবস্থা আছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে এই বিষয়ে বিচার করিবার জন্য লণ্ডনে হয়তো এক গোলটেবিল বৈঠক করা যাইবে। এখানকার অবস্থা দেখিয়া এই ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষের সকল দল মিলিয়া একযোগে সাইমন কমিশন বর্জন করিয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি চলিয়াছিল। দেশের সম্মানিত লোকও আহত হইয়াছিলেন। সমস্ত দেশে গণ্ডগোল ছিল। লাহোর ষড়যন্ত্রের আসামীদের অনশন তাহাতে আরও বেগ সঞ্চারিত করে। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের প্রচার প্রবল হইয়াই চলিল। কলিকাতা কংগ্রেস এই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইল যে ১৯২৯ সালের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ না পাইলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই নিজের লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইবে।

গভর্নমেণ্ট হয়তো ভাবিয়াছিল যে, এই ঘোষণা ঐ অশান্তি দূর করিতে পারিবে। ঘোষণার অর্থ লইয়া সংবাদপত্রে কিছু কিছু তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। মনে হইল, নরম দল খানিকটা খুশি হইয়াছে। কিন্তু যদি উহা ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া হইত, তাহা হইলে সরকারের সমস্ত ঘোষণাপত্রের মত উহারও কিছু কিছু অর্থ বাহির করিতে পারা যাইত, আর গভর্নমেণ্ট নিজের সুবিধামত যখন যেমন দরকার তখন তেমন অর্থ বাহির করিতে পারিত। কংগ্রেসের লোকেরা মনে করে নাই যে উহা কলিকাতা কংগ্রেসের দাবি পূরণ করিতে পারে। পরে যখন সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল তখন দেখা গেল যে কংগ্রেসের সন্দেহ সম্পূর্ণ সমূলক, অন্য সকলে নিজের নিজের ইচ্ছামত অর্থ আরোপ করিয়াছে, সেই অর্থ উহার ভাষা হইতে আসে না।

লাহোর কংগ্রেসের ঠিক পূর্বে গান্ধীজী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আসিয়া লর্ড আরুইনের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারা ভাইসরয়ের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক ছিল, অন্য লোকে মনগড়া একটা অর্থ বাহির করিয়াছে! তখনও ঔপনিবেশিক

স্বরাজ দূরে! যাহারা ভাবিয়াছিল তাহা আসিয়া গিয়াছে তাহারা ওয়েজ-উড বেনের ঐ বক্তৃতার, যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ তো কার্যত হইয়াছে—Dominion Status in action,—বাক্-চাতুরী না বুঝিয়া শব্দের অর্থ করিতে ভুল করিয়াছিল। আমাদের পক্ষে এই কথা হইতে চৈতন্য হইল, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণাগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিতে হইবে, তাহার মধ্য হইতে মনগড়া অর্থ বাহির করিলে চলিবে না। এই চৈতন্য সম্পাদনের জন্য আমাদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

বর্মা ভ্রমণ

আমরা যখন হরিবাবুর মকদ্দমা শেষ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ফিরিতেছিলাম, তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে আমি যেন একবার বর্মা যাই এবং জিয়াবাড়ীতে উনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আসি। আমারও ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার ঐ কীর্তিও দেখি, বর্মাদেশে ভ্রমণও করি। এই ইচ্ছা ১৯২৮ সালে পূর্ণ হইল না। ১৯২৯ সালে তিনি নিজে বর্মা গেলেন। আমিও ভাবিলাম, ঐখানে যাওয়ার ইহাই ভাল সুবিধা। ইহার মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটিল। হরিবাবুর পরলোকগত পিতা দেওয়ান জয়প্রকাশ-লাল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উৎসাহে যেমনভাবে বর্মায় জমি লইয়াছিলেন, মিঃ মিলন নামে একজন ইংরেজ নীলকরও বর্মায় তেমনি অনেক জমি লইয়া-ছিলেন। মিঃ মিলনের নীলচাষ হইত সাহাবাদ জেলায়। তিনিও হরিবাবুর মতই বিহার হইতে, বিশেষত সাহাবাদ হইতে, কিষাণ লইয়া গিয়া নিজের জমিতে বসাইয়াছিলেন। অন্য লোকেরাও কেহ কেহ সেখানে জমি কিয়াছিল; কিন্তু তাহারা সে-জমির ঠিকমত ব্যবস্থা করিতে পারে নাই; শেষে জমি তাহারা ছাড়িয়া দেয় অথবা তাহা বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু এই দুইজন বড় জমিদার ওখানে প্রকাণ্ড জমিদারি ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন। অতিশয় অধ্য-বসায় ও পরিশ্রমের ফলে অনেক টাকা খরচ করিয়া, যেখানে হাতি ও বাঘ ঘুরিয়া বেড়াইত এরূপ গভীর জঙ্গল কাটিয়া মাটি সাফ করিয়া ইঁহারা বিহারীদের বসাইয়াছিলেন। সেখানে ধান, আখ ও অন্যান্য ফসলও হইত। মিঃ মিলনের রায়তদের মধ্যে একটা যেন অশান্তির ভাব ছড়াইয়া ছিল। রায়তেরা পত্র লিখিয়াছিল যে, আমি গিয়া যেন তাহাদের সাহায্য করি। হয়তো তাহারা শুনিয়া থাকিবে যে, আমি গান্ধীজীর সঙ্গে চম্পারনে গিয়া

কাজ করিয়াছিলাম, এই জন্য আমার সেবার উপর তাহাদের খানিকটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। বাস, এই দ্বিতীয়বার সুযোগ পাইয়া আমি সেখানে যাওয়া স্থির করিলাম। শ্রীযুক্ত মথুরাপ্রসাদজীর সঙ্গে নভেম্বর মাসে সেখানে গেলাম। মিঃ মিলনের জমিদারির নাম ছিল 'চৌতগা', আর হরিবাবুর জমিদারির নাম ছিল 'জিয়াবাড়ী'। আমি এই দুই জায়গায় গেলাম। রেঙ্গুনেও কয়েকটা দিন ছিলাম। সব মিলাইয়া হয়তো সেখানে পনেরো দিন থাকা হইল। আর কোথাও যাইতে পারি নাই। এইজন্য মান্দালয় প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পারি নাই।

স্টীমারযাত্রা মামুলি ধরনের; সমুদ্র ছিল শান্ত, জাহাজে আরামে ছিলাম। আমরা ফুর্তি করিতে করিতে পেঁছিয়া গেলাম। কিছু দূর থাকিতেই রেঙ্গুনের বৌদ্ধ মন্দিরের সোনালী চূড়া ও গম্বুজ চোখে পড়িল। কাছে যাইতেই তাহার বড় অংশটা দেখিতে পাইলাম। রেঙ্গুনের লোকেরা খুব আদরযত্ন করিল। এক সাধারণ সভায় আমাকে মানপত্র দেওয়া হইল। আমি তাহার উত্তরে বলিলাম যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাহা আজকার সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন প্রকারের ছিল। ভারতবর্ষও নিজের সাম্রাজ্য অন্যান্য দেশে স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সাম্রাজ্যের মত তাহা হিংসা, অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবলের ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল না। তাহা ছিল ধর্মসাম্রাজ্য। ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ এক রেশমি সূত্রে গাঁথা মণির মত, মণিগুলি একে অন্যের সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু একটি অন্যের উপর প্রভুত্ব করে না। আজও যখন সংসারে খুনখারাপি হইতে দেখি তখন বুঝিতে পারি যে ভারতবর্ষের সেই ধর্মগত ঐক্য বা একসূত্রতা, যাহা সেনাবলে নয় বরং ধর্ম ও চরিত্রের বলে স্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহা আজকার সাম্রাজ্যের অপেক্ষা কত দীর্ঘকালস্থায়ী ও প্রাণিমাত্রের পক্ষে কত অধিক হিতকর প্রমাণ হইয়াছে। ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া তাহার জন্মস্থান বিহারে, বৌদ্ধধর্ম একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে, তবু আজ সংসারের কত বেশি লোকে তাহা মানে। তাহারা আজও ঐ ধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানগুলিকে তীর্থস্থান বলিয়া মনে করে। বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, যেখানে নিজের ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, সে সকল স্থান আজ ভারতবর্ষে পৃথিবীর বৌদ্ধদের পক্ষে পুণ্যতীর্থ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল তীর্থের জন্য পৃথিবীর বৌদ্ধগণ আমাদের বর্তমান হীন দশা সত্ত্বেও, আমাদিগকে সাদর দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। কোনও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের পক্ষে এই সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, হইবেও না। বর্মায় গিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে এসব ভাব স্বতই স্পষ্ট হইয়া গেল।

ওদেশে চৌতগার রায়তদের সঙ্গে দেখাশুনা করিলাম। মালিক তো

সেখানে ছিলেন না, ছিলেন বিলাতে। কিন্তু তাঁহার কর্মচারী ও তাঁহার পুত্র সেখানে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রায়তদের অভিযোগ সম্বন্ধে কথা হইল। রকমসকম দেখিয়া মনে হইল যে কথাবার্তার পর একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু শেষটায় বিলাত হইতে একটা কিছু তার আসিল। সফলতা হাতে আসিয়াও আসিল না! কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে যে, সেখানকার লোকদের অবস্থার অনেক কিছু উন্নতি হইল, যদিও আমাদের সামনে সব কথার মীমাংসা হইতে পারিল না।

জিয়াবাড়ীতেও রায়তদের কিছু অভিযোগ ছিল। কিন্তু হরিবাবুর কার্যকুশলতা ও ব্যবহারদক্ষতার জন্য তাহা তখন পর্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করিতে পারে নাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু করিতে হয় নাই। কিছুদিন থাকিয়া ওখানকার অবস্থা দেখিলাম। ওখানকার গাঁয়ে গিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে বিহারের বাহিরে আসিয়াছি। সেই কাপড় চোপড়, সেই জীবনযাত্রা, ঐ ভাবের ঘরবাড়ি, ঐ ভাবেরই খেত-খামার। আমি মকদ্দমার সময় কাগজপত্র পড়িয়াছিলাম। তাহা পড়িয়াই হরিবাবুর কার্যদক্ষতা ও সংগঠনশক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। এখন তাহা এক সময়ের অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর পূর্বের জঙ্গলকে ফলেফুলে সমৃদ্ধ গ্রামের রূপে দেখিয়া আরও শ্রদ্ধা হইয়া গেল। আজ ঐ অঞ্চলে হাজার হাজার বিহারী থাকে ও খেতি করিয়া সুখে জীবন কাটায় আর হরিবাবুকেও বৎসরে লাখ লাখ টাকা জমা দেয়। আমাদের সামনে তিনি রায়তদের এক সভাও ডাকিলেন, তাহাতে প্রধানদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হইল, অন্য প্রকারেও আপ্যায়ন করা হইল। বিহার বিদ্যাপীঠের জন্যও কিছু অর্থ-সংগ্রহ করিলাম। রেঙ্গুনের ব্যবসায়ীরাও কিছু দান করিল, সে সব লইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম।

রেঙ্গুনেও বিহারীদের নিজস্ব বসতি আছে। আমার ইহা দেখিয়া আশ্চর্য মনে হইল যে জীরাদেইয়ের অধিবাসী আমার এক পুরানো চাকর রেঙ্গুনে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিল। সেখানে ও কোথাও চাকরি করিত। আমার আসার খবর পাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া-ছিল। ওদেশে গুজরাতী ও মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী অনেকে আছে। কিন্তু গ্রামে বেশির ভাগ মান্দ্রাজদেশের চেট্টীরা আছে, যাহারা বেশির ভাগ টাকা 'লগনি' বা সুদে ধার দিয়া থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশেরও অনেকে আছে, কিন্তু তাহারাও বিহারীদের মত চাকরি বা মজুরি করে। ঐ সময় অন্ধ্রের শ্রীনাগেশ্বররাও পন্তলুও সেখানে গিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে আমাদের দুই-জনকে ভোজ দেওয়া হইল, তাহাতে ওখানকার অনেক গণ্যমান্য বর্মী ও ভারতীয় যোগ দিলেন। মেয়র ছিলেন ওখানকার এক মুসলমান ভদ্র-লোক। শ্রীযুক্ত আব্বাস তৈয়বজীর পুত্র তৈয়বজী রায়তদের কাজে অনেক

আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। ইঁহারা সকলে ভোজে উপস্থিত ছিলেন। একজন ইংরেজ ভদ্রলোকও ঐ ভোজে উপস্থিত ছিলেন, যিনি পরে সেখানকার কৌনসিলের স্পীকার বা সভাপতি হইয়াছিলেন।

আমি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম যে সকলে মাটিতে বসিয়া খাইতে লাগিল। ইংরেজ ভদ্রলোকটিও আমাদের সঙ্গে ঐভাবে বসিলেন। বিহারে এমন কোনও ভোজ আমি দেখি নাই। তখন পর্যন্ত, গান্ধীজীর আশ্রম ছাড়া আর কোথাও আমি এইভাবে সকলকে ভারতীয় রীতিতে মাটিতে বসিয়া খাইতে দেখি নাই। ইহা আমাদেরই দুর্বলতা যে আমরা যদি কোনও বিদেশী ভদ্রলোককে খাওয়াইতে যাই বা অন্য কোনও প্রকারে তাঁহাকে আপ্যায়ন করি, তাহা হইলে তিনি যেমন খাওয়া দাওয়া করেন বা যেভাবে থাকেন, তাহারই আমরা নকল করি। তিনি নিজে তো নিজের বাড়িতে অমনই থাকেন, আর ঐ ভাবেই ঐরূপ আহার করেন, আবার আমরা নিজেদের ভোজে উঁহাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য কি দেখাইয়া থাকি? বিদেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা সহৃদয় হইবেন আর যাঁহারা এই দেশের সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহারা হয়তো মনে মনে চাহিতেও পারেন যে ভারতবাসীদের বাড়িতে তাঁহারা নিজেদের বাড়ির নকল না দেখিয়া ভারতবর্ষেরও কিছু দেখিতে পান। কিন্তু জানি না কেন আমরা নিকৃষ্ট অনুকরণ পছন্দ করি, নিজেদের রীতি-নীতি লুকানো উচিত বলিয়া মনে করি! যাহা হউক, রেঙ্গুনে ইহা দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। রেঙ্গুন হইতে আমি জাহাজে চড়িয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম।

লাহোর কংগ্রেস ও মৌলানা মজহর-উল-হক সাহেবের মৃত্যু

জাহাজে থাকিতেই খুব জোরে হাঁপানীর আক্রমণ শুরু হইয়া গেল। অবস্থা এতই খারাপ হইল যে জাহাজের ডাক্তারের ইনজেকশন দেওয়ার দরকার হইল। কলিকাতায় জাহাজ হইতে নামিয়া আমি আমার বন্ধু ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের বাড়ি গিয়া থাকিলাম। তিন চার দিনের পর মুঙ্গেরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনফারেন্স হইবার কথা। আমাকে তাহার সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, কলিকাতায় দুই তিন দিন বিশ্রাম করিব, একটু সুস্থ হইয়া মুঙ্গেরে যাইব। এ পর্যন্ত আমি হেকিম ও বৈদ্যের ঔষধ ভিন্ন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছিলাম। আমার বন্ধুর মত হইল, আমিও ভাল

বুঝিলাম, একবার হোমিওপ্যাথিকও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এক বুড়া ডাক্তারকে (যাঁহার উপর বন্ধুর খুব বিশ্বাস ছিল) ডাকা হইল। ডাক্তার সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাকে বলিলেন, তিনি এই শর্তে চিকিৎসা করিবেন যে আমি কিছু দিন একটানা তাঁহাকে দিয়া চিকিৎসা করাইব, আর যত দিন তাঁহার চিকিৎসা চলিবে ততদিন অন্য চিকিৎসা করিব না। হইতে পারে, তাঁহার চিকিৎসায় রোগ প্রথমটায় বৃদ্ধি পাইবে; যদি তাই হয় তবে আমি যেন ভয় না পাই, উহা শুভ লক্ষণই হইবে। আমি তাঁহার এ-সব কথা স্বীকার করিয়া লইলাম। তিনি এক মাত্রা ঔষধ দিলেন, বলিলেন, এখন দুই মাস পর্যন্ত অন্য ঔষধ খাইতে হইবে না। আমি সেই মাত্রা ঐখানেই খাইয়া লইলাম; দুই মাসের জন্য ঔষধ খাওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম!

আমি ঐখানে বসিয়াই প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য বক্তৃতা লিখিতেছিলাম। তৃতীয় বা চতুর্থ দিন, রাত্রের গাড়িতে মুঙ্গের রওনা হইলাম। গাড়িতে খুব ভিড় ছিল। সারা রাত বসিয়া থাকিতে হইল। বাতাসও লাগিয়া থাকিবে। ফলে দাঁড়াইল এই, মুঙ্গেরে পেঁাছিতে না পেঁাছিতেই শরীর খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িল। আমি সম্মেলনে যোগ দিতে পারি নাই। আমার বক্তৃতা অন্য কেহ পড়িয়া শুনাইল। তখন ডিসেম্বর আরম্ভ, অল্প দিন পরেই লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। দেশের সামনে ঔপনিবেশিক ও পূর্ণ স্বরাজের তর্ক চলিতেছিল। আমি আমার মুঙ্গেরের বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক স্বরাজেরই সমর্থন করিয়াছিলাম, আমার তো সেখানে এত কঠিন পীড়া হয় যে সম্মেলনে নির্ধারিত প্রস্তাবগুলিও জানিতে পারি নাই। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি।

শর্তানুযায়ী আমি কোনও ঔষধ খাই নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে রোগের এই বৃদ্ধি ডাক্তারের কথাতেই হইয়াছে—ইহা তাঁহার ঔষধের প্রতিক্রিয়া মাত্র, শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইব। কিন্তু তাহা হইল না। দাদা আমাকে কোনও প্রকারে মুঙ্গের হইতে পাটনায় লইয়া আসিলেন। সেখানেও কাশ ও জ্বরের প্রকোপ ছিল। সেখানকার ডাক্তার ব্যানার্জি বরাবর দেখিতেন। ডাক্তার ফণি মুখার্জি এক্স্-রে দিয়া ফুসফুস পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার ফল দেখিয়া তিনি ও ডাক্তার ব্যানার্জি একটু চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা আমাকে দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও ঔষধ খাই নাই। কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নিকট রোজ টেলিফোন করিতাম। উত্তর আসিত যে ভয় পাইবার কারণ নাই, ঔষধ খাওয়ারও প্রয়োজন নাই। একদিন পাটনার ডাক্তারেরা বেশি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা স্পষ্টই

বলিলেন যে পরের দিন অবস্থা ভালোর দিকে না গেলে চিন্তার কারণ হইবে, তাঁহারা আমাকে দূরবর্তী ডাক্তারের আশীর্বাদের ভরসায় বিনা চিকিৎসায় রাখিয়া দিবেন না।

কলিকাতায় খবর দেওয়া হইল। ডাক্তারকে পাটনায় ডাকিয়া আনা হইল। তিনি এক মাত্রা ঔষধ দিতে বলিলেন, পরে দেখা গেল তাহাতে শুধু জলই ছিল। তিনি আসিবার পর এখানকার ডাক্তারেরা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। তিনি এখানে দুইদিন থাকিলেন বটে, কিন্তু ঔষধপত্র কিছু দিলেন না। এখন হইতে রোগ আপনা আপনি কমিয়া যাইতে লাগিল। আবার এক্স্-রে দিয়া পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, ফুসফুস একেবারে পরিষ্কার হইয়াছে।

আমি জীরাদেই চলিয়া গেলাম। যে বন্ধুর লাহোর কংগ্রেসে যাওয়ার কথা ছিল তিনি চলিয়া গেলেন। আমি যাইতে পারিলাম না। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, সতীশবাবুর সংগে প্রায় এক মাস বাড়িতে থাকিলাম। তাঁর সংগে গল্পসল্প করিতাম, খবরের কাগজে কংগ্রেসের খবর পড়িতাম আর অহিংসা বিষয়ে একখানি ছোট্ট বইও লিখিতাম। আমি সতীশবাবুকে তাহা দেখাইতাম। তিনি খুব প্রশংসা করিলেন, বলিলেন যে কাশী ফিরিবার পর তিনি উহা একবার ভাল করিয়া পড়িবেন এবং প্রয়োজনমত কিছু সংশোধনের কথাও বলিবেন, তবে উহা ছাপিবার মত হইবে। তিনি উহা লইয়া গেলেন। ইহার পরই ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া গেল। আমি তাহাতে এতখানি জড়াইয়া গেলাম যে আর ওদিকে মনই দিতে পারিলাম না। জানি না, ঐ লেখাটির কি গতি হইয়াছিল।

লাহোর কংগ্রেস খুব ধুমধামের সংগে শেষ হইল। সেখানে যাইবার পূর্বেই গান্ধীজী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু দিল্লীতে ভাইসরয়ের সংগে দেখা করিয়াছিলেন। সেখানে একথা স্পষ্ট হইয়াছিল যে তাঁহার ঘোষণায় কংগ্রেসের দাবি পূরণ হয় নাই। তাই ইহা প্রায় স্থির করা হইল যে সেখানে কংগ্রেসের লক্ষ্য পরিবর্তন করা হইবে। তাহার পরিবর্তনও হইল। এখন কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল পূর্ণ স্বাধীনতা, আজ পর্যন্ত তাহা আমরা পাইতে পারি নাই, এখনও তাহার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে।

ওদিকে লাহোর কংগ্রেস হইতেছে, এদিকে নিজের গ্রামে ছিলেন মজহর-উল-হক সাহেব, তাঁহার দেহান্ত ঘটিল। হক সাহেব পাটনা হইতে গিয়া ওদরের কাছে ফরিদপুরে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার কিছু জমিদারি ছিল। তিনি সেখানে খুব বড় একটা আমবাগান করিয়াছিলেন। ঐ বাগানে এক ছোটমতো বাংলোয় তিনি থাকিতেন। নিকটেই 'দাহা' নদীর বন্যায় তাঁহার বড় ছেলে হঠাৎ ডুবিয়া মরিয়া যাওয়ার পর তিনি খুব চুপ-

চাপ, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। প্রেততত্ত্ব বিষয়ে অনেক কিছু বইপত্র পড়িতেন। এই বিষয়ের তাঁহার নিকটে একটি ভাল লাইব্রেরি হইয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও আমি সেখানে যাইতাম। তিনি আমাকেও ঐ বিষয়ে পড়াশুনা করিতে বলিতেন। আমি কয়েকখানি বই পড়িয়াও ছিলাম। কিন্তু খুব দৌড় ধাপ করিতে হইত বলিয়া আমি পড়িবার সময় পাইতাম না। ঐ স্থানেই, অল্প কয়েকদিন ভুগিবার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এই গ্রাম আমার গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। খবর পাইয়াই আমি সেখানে গেলাম ও তাঁহার বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা করিয়া সহানুভূতি জানাইলাম।

তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সকলের খুব দুঃখ হইল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মত ছিল, দেশের কয়েকটি স্থান হইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হউক; কিন্তু তিনি নিজে এই মত সমর্থন করেন নাই, বরং সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন যে এরকম কথা যেন না চলে। তিনি এক প্রকার সংসারে বিরাগী হইয়া গিয়াছিলেন, ফকিরের মতই জীবন কাটাইতেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও বোঝাপড়ার খুব বড় এক স্তম্ভ ভাঙিয়া গেল। এ-বিষয়ে আমাদের পরামর্শদাতা আর কেহ রহিল না। শুনিয়াছিলাম, পাটনায় সর্বসাধারণের এক সভা হয়, তাহাতে তাঁহার নামে কোনও স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত করিবার সংকল্প গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু আজ ১৫ বৎসর হইয়া গেল, তথাপি প্রস্তাব প্রস্তাবরূপেই পড়িয়া আছে! স্মৃতিরক্ষা এখন পর্যন্ত হইল না! আমার ইচ্ছা ছিল, উঁহার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এক রাষ্ট্রীয় ভবন নির্মিত হউক। কিন্চ তাহাও এপর্যন্ত ইচ্ছার পর্যায় হইতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। খানিকটা জমি লওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে দুইখানি ছোট বাড়ি তৈরী হইয়াছে। বড় হলঘরের জন্য নক্শাও প্রস্তুত। কিন্তু এখনও হলঘরের ভিত্তিও স্থাপিত হয় নাই। দেখি, ঈশ্বর কবে ইহা সম্পূর্ণ করেন।

পূর্ণ স্বরাজ প্রাপ্তিই কংগ্রেসের লক্ষ্য, লাহোর কংগ্রেস তাহা স্থির করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই, এজন্য সত্যাগ্রহ করিবার আদেশও লাহোর কংগ্রেস দিয়া দিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব হইতে যে নবজাগরণ দেখা যাইতেছিল, ইহা তাহারই ফল। কংগ্রেসের অধিবেশনের অল্পদিন পরেই ওয়ার্কিং কমিটি সমগ্র দেশকে আদেশ দিল, ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করিতে হইবে। সে বৎসর ঐ দিন পড়িয়াছিল রবিবার। এক সুন্দর তেজস্বী ঘোষণা প্রকাশ করা হইল তাহাতে দেশের অবস্থা দেওয়া ছিল, আর ছিল স্বরাজ প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞা। নির্দেশ ছিল যে সব জায়গায় বড় বড় সভা করিয়া জনগণ দিয়া ঐ ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হউক; বিভিন্ন প্রদেশের লোকে নিজেদের বিভিন্ন ভাষায় তাহার অনুবাদ করাইয়া লয়, এই জনগণ যাহাতে সে অনুবাদ বুঝিয়া তাহার আবৃত্তি করে, সেজন্য ব্যবস্থা করে; ঐ উপলক্ষ্যে অন্য কোনও বক্তৃতা যেন না করা হয়; শুধু সংকল্পবাক্যই পঠিত ও গৃহীত হয়। এই সভা হইবে বিকাল বেলায়, সকালে যেখানে সম্ভব রাষ্ট্রীয় পতাকা অভিবাদন করা হইবে; সমগ্র দেশে এই কার্যক্রম যেন অনুসরণ করা হয়।

ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাড়িতেই বিশ্রাম করিতেছিলাম। ঐ দিন সর্বপ্রথমে বাড়ির বাহিরে আসিব স্থির করিলাম। আশপাশে কোনও জায়গার লোকদের আগ্রহ হইল, আমি সেখানে সভায় যোগ দেই। সমস্ত সভা যদি একই সময়ে হইবার কথা না থাকিত, তাহা হইলে আমি সারা দিন বহু সভায় যোগ দিতে পারিতাম; কিন্তু ঐরূপ করিবার উপায় ছিল না। এইজন্য আমি মোটরে গেলাম। আধঘণ্টা আগে-পিছে দুই জায়গার সভায় যোগ দিতে ইচ্ছা করিলাম, একটি হওয়ার কথা ছিল গ্রামে, অন্যটি সীবান শহরে। গাঁয়ের সভা শেষ করিয়া যখন সীবান যাইতেছিলাম, তখন মোটর গেল বিগ্‌ড়াইয়া। মনে হইল, সীবান আর পোঁছিতে পারিব না। কিন্তু পুলিশের লোকেরা দয়া করিয়া নিজেদের গাড়িতে জায়গা দিয়াছিল। আমি যথাসময়ে সীবান পোঁছিলাম। সেখানেও এক প্রকাণ্ড সভায় একত্রিত জনগণ একচিত্তে ঐ সংকল্প বাক্য পুনরায় উচ্চারণ করিতে পারিল।

দেশে এই সময়ে জনজাগরণ খুবই দেখা গিয়াছিল। প্রায় সমস্ত শহরে এবং বহু গ্রামে স্বাধীনতা দিবসের কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়াছিল। এইসকল শুভচিহ্ন দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল যে দেশ যেন খুবই খানিকটা অগ্রসর হইতে চলিয়াছে। সর্বত্র সত্যাগ্রহের চর্চা হইতেছিল।

অল্পদিন পূর্বেই বারডোলিতে সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছিল। তাহা লোকের মনে খুবই উৎসাহের সঞ্চার করে। লোকে উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল কবে, কোথায়, কি ভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে। গান্ধীজীর লেখা লোকের মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

তখন মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে। সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। তাহাতে তিনি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার কথা বলেন। দেশ এখনও প্রস্তুত কি না তাহা লইয়া খুব কথাবার্তা হইল। অনেকের মতে এখন আরও খানিকটা তৈয়ারী করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু মহাত্মাজী ও জওহরলালজী খুবই ব্যগ্র ছিলেন। কি ধরনের আইন ভাঙ্গা যাইবে তাহা লইয়াও খুব তর্ক হয়। মহাত্মাজীর দৃঢ় মত ছিল, লবণ আইন দিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। তাঁহার বক্তব্য ছিল এই যে, এই আইনের জন্য লবণের উপর কর ধরা হইয়াছে—যে লবণ গরিব লোকে বিনা ব্যয়ে পাইতে পারিত, কিংবা খুব কম দামে তাহারা পাইত, তাহা বেশি দামে পাওয়া যায়; দুঃস্থ অনেকে এইজন্য স্বাস্থ্যের জন্য যতটা প্রয়োজন ততখানি লবণ খাইতে পারে না; লবণ আমাদের খাদ্য পদার্থের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, সমুদ্রের ধারে সংগ্রহ করিলেই ইহা বিনামূল্যে পাওয়া যায়, অন্য জায়গায়ও মাটি হইতে তৈরী করা যায়, যেখানে নুনের পাহাড় আছে সেখানেও লোকেরা খুঁড়িয়া বিনা দামে ইহা বাহির করিতে পারে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট শুধু 'কর' আদায় করিবার জন্য ইহা একত্র করিবার পক্ষে বাধা রাখিয়াছে, ঈশ্বর জল ও বায়ুর মতই লবণও মুক্ত হস্তে বিতরণ করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাহা লইতে দিতেছেন না। এইজন্য মহাত্মাজীর মত ছিল এই যে, ইহা হইতে খারাপ কর আর হইতে পারে না, ইহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবার কথা গরিবও সহজে বুঝিতে পারিবে, সংসারেরও লোকেরা স্বীকার করিবে যে ইহা ন্যায়সঙ্গত।

এক সামান্য বস্তু লইয়া তাহা হইতে বড় সিদ্ধান্ত বাহির করিতে চাহেন, মহাত্মাজীর সর্বদা ইহাই হইল কার্যপদ্ধতি। তাঁহার ধারণা ছিল, যদি একটি অন্যায় কর আমরা এইভাবে প্রতিরোধ করিতে পারি তবে অন্য সমস্ত করও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিব। এইভাবে যখন তিনি পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড ও খিলাফতের জন্য ন্যায়ের উপর জোর দিয়াছিলেন তখন তিনি ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের মধ্যে যদি ইহাদের ন্যায় বিচার পাইবার শক্তি আসে, তাহা হইলে সেই শক্তি আমাদিগকে অন্যান্য অন্যায় অবিচারও দূর করিবার শক্তি দিতে পারিবে। এইভাবে, লবণ আইন ভাঙিগয়া আমরা সর্বপ্রকারে নিজের ইচ্ছামত গভর্নমেণ্টকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবার শক্তি পাইব।

আমরা একথা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আমাদের সামনে কত বাধা বিপত্তি। আমাদের মধ্যে অনেকে এই কথা বুঝিতে পারিত না যে গভর্নমেণ্টের উপর জোর না খাটাইয়া আমরা তাহাকে কি করিয়া বাধ্য করিতে পারিব। সঙ্গে সঙ্গে ইহা হইতেও বেশি কঠিন লাগিত, লবণ আইন আমরা ভাঙ্গিব কি করিয়া। যাহারা সমুদ্রের ধারে থাকে তাহারা তো সেখানেই সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে লবণ একত্র করিয়া অথবা লবণ জল গরম করিয়া আইন ভঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক, যাহারা সমুদ্রের ধারে বাস করে না, তাহারা কি করিয়া আইন ভঙ্গ করিবে? হাঁ, অনেক স্থানে, বিশেষত বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে মাটি হইতে লবণ তৈয়ারি করা হইত। নুনিয়া বলিয়া এক জাতিই ছিল, তাহারা এই কাজ করিত। এখন, যখন বিদেশি বা দেশি লবণ সর্বত্র, সমুদ্রের ধার হইতে অথবা পাহাড় হইতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে তাহাদের রোজগারই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে যদি সরকারি হুকুমের বিরুদ্ধে লবণ তৈরী করা হয় তাহা হইলে আইন ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপে লবণ তৈয়ারি ব্যাপারে সাধারণ লোকের কি উৎসাহ থাকিবে? লেখাপড়া জানা লোকে কি ইহাতে আগ্রহ দেখাইবে? শুধু নুনিয়ারাই এই কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে। কিন্তু তাহারা গরিব, অশিক্ষিত। তাহাদের থেকে ইহা আশা করা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া আইন ভঙ্গ করানোও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এসব কথা গান্ধীজীকে বলা হইল। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল—লবণ আইনই ভাঙ্গিতে হইবে, লোকে উৎসাহ করিয়া ইহাতে যোগ দিবে, এই জিনিসই সমস্ত দেশে চলিতে পারিবে।

এই কার্যক্রম যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমারও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, বিহারে চৌকিদারি টেক্স এমন একটি কর যাহা সকলকেই দিতে হয়। গরিবেরা উহাতে খুবই অসন্তুষ্ট। তাহা আদায় করিতেও গরিবের উপর বিশেষ কড়াকড়ি হয়। বাকি করের জন্য তাহাদের বাসনকোসনও বাজেয়াপ্ত হইয়া নিলাম করানো হয়। আমি বলিলাম যে বিহারে এই টেক্স বন্ধ করিলে সুবিধা হইবে। লোকে খুব তাড়াতাড়ি ও খুশি হইয়া ইহা দেওয়া বন্ধ করিবে। বিহারের পক্ষে চৌকিদারি টেক্স বন্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হউক। মহাত্মাজী বলিলেন, যদি তুমি ইহা দিয়া কাজ শুরু কর তবে খুব তাড়াতাড়ি হারিয়া যাইবে, প্রথমে লবণ আইন ভাঙ্গিয়াই কাজ আরম্ভ কর, পরে যদি লোকের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ আসে তবে টেক্সবন্ধের কথা ভাবিও। কথাটা আমি শুনিলাম, কিন্তু তাহা মনোমত হইল না। আমি ভাবিলাম যে এই সোজা রাস্তা ছাড়িয়া লবণ আইনের ফেরে পড়ার দরকার কি? কিন্তু এই সব বিষয়ে গান্ধীজীর

অনুভূতিকে আমি ভয় করিতাম। আমার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখিতে পান, আমরা ততদূর দেখিতে পাই না। এই জন্য, কিছুদিন হইতেই আমি নিজের এই কর্মপন্থা করিয়া লইয়াছিলাম যে নিজের মত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব। যদি তিনি তাহা মানিয়া লন তো ভাল, না হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করাই ঠিক। শেষকালে আমার বোধ হইত যে তাঁহারই সিদ্ধান্ত ঠিক হইয়াছে। আমি এই সময়েও স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে বিহারেও লবণ আইনই ভাঙ্গা হইবে, যদিও আমি তখন পর্যন্ত কথাটা পুরাপুরি বুঝিতে পারি নাই।

গান্ধীজীর ডাণ্ডীযাত্রা ও নেহরুজীর বিহার ভ্রমণ

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর গান্ধীজী নিজের জন্য এক দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। ঐ দিন তিনি আশ্রম হইতে বাহির হইবেন। প্রায় মাসখানেক পায়ে হাঁটিয়া সুরাট জেলার ডাণ্ডী নামক গ্রামে সমুদ্রতীরে পৌঁছিবেন, সেখানেই তিনি সর্বপ্রথম লবণ আইন নিজে ভঙ্গ করিবেন। এই সঙ্কল্প অনুমোদন করাইবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক সবরমতীতে ডাকা হইল। কিন্তু তখন মহাত্মাজী ডাণ্ডীযাত্রার জন্য বাহির হইয়াছেন। এইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির নির্ধারণই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করিলেন।

ডাণ্ডীযাত্রার পূর্বে, যাহা কিনা এক প্রকার সত্যাগ্রহের আরম্ভ, গান্ধীজী নিজের নিয়ম অনুসারে বড়লাটের নিকটে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন। সত্যাগ্রহ আরম্ভের কথাও লিখিয়া দিলেন। এই পত্র তিনি একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের হাতে পাঠাইলেন। তাঁহার নাম মিঃ রেনল্ড্স্। ঐ সময়ে তিনি সবরমতীতে থাকিতেন। কিন্তু যেমন ভাবা গিয়াছিল, কোনও সন্তোষজনক উত্তর আসিল না। যাত্রা আরম্ভ করিবার সময়ে তিনি কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসের সভ্যদের বারণ করিয়া দেন যে যতক্ষণ আমি আদেশ না দিই ততক্ষণ যেন কেহ সত্যাগ্রহ না করে—যদি সরকারি আদেশ খারাপও লাগে, তাহা হইলেও তাহা যেন মানাই হয়।

ঠিক ছিল যে ৬ই এপ্রিল নাগাত তিনি ডাণ্ডী পৌঁছিয়া যাইবেন, ঐ দিন নিজে সকলের আগে সত্যাগ্রহ করিবেন। এই যাত্রায় তিনি সত্যাগ্রহ

আশ্রমের আশি একাশি জনকে নিজের সঙ্গে লইলেন। পর পর এই ব্যবস্থা ছিল যে সকালে কিছু দূর পর্যন্ত যাইতে হইত, দুপ্রহরে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে স্নানাহার ও বিশ্রাম করা হইত, আবার বিকালে খানিকটা দূর যাওয়া হইত। সন্ধ্যার সময়ে কোথাও বাসা বাঁধা হইত। সেখানে রাত্রিটা বিশ্রাম হইত। আবার পরের দিন সকালে ঐ ব্যাপার শুরু হইত। এই অভিযান ছিল প্রায় এক মাস ব্যাপী। মাঝখানে অনেক গ্রাম, কিছু কিছু শহরও ছিল। পথের দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় শ মাইল। রোজ প্রায় বারো তের মাইল হাঁটিতে হইত। যেদিন গান্ধীজী সবরমতী হইতে বাহির হইলেন সেদিন আশ্রমে সারা রাত খুব ভিড় লাগিয়া ছিল। সকালে হাজার হাজার লোকের জয় জয়কারের মধ্য দিয়া গান্ধীজী ও তাঁহার সঙ্গীরা বাহির হইলেন। প্রত্যেকের নিকটে নিজের নিজের ঝুলিতে আবশ্যক জিনিসপত্র ছিল। উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। দেখিলে মনে হইত যে সমস্ত আহমদাবাদ ও সেখানকার এলাকা যেন উথলিয়া উঠিয়াছে।

গান্ধীজী ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে স্বরাজ না পাইলে তিনি এখন আর সবরমতী আশ্রমে ফিরিবেন না। তাঁহার যাত্রার সম্পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার প্রভাব সমস্ত দেশের উপর ইন্দ্রজালের মত হইল। সমস্ত জায়গায় লোকেরা খুব ব্যগ্র হইয়া ৬ই এপ্রিলের পথপানে চাহিয়া ছিল। লোকেরা চাহিতেছিল, আমাদেরও সত্যাগ্রহ করিবার সুযোগ জুটুক। কংগ্রেসের লোকেরা বসিয়া ছিল না। তাহারাও চারদিকে খুব জোর প্রচারকার্যে লাগিয়াছিল। গান্ধীজী যেমন যেমন অগ্রসর হইয়া চলিলেন, দেশের উৎসাহও তেমনি বাড়িতেই থাকিল। যাত্রা আরম্ভের পূর্বেই সরদার বল্লভভাইকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। এইজন্য তিনি ঐ যাত্রায়, অথবা উহার পর যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল তাহাতে, যোগদান করেন নাই।

ইহার মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসিল। সেখান হইতে পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতির সঙ্গে আমরা জম্বুসার পর্যন্ত গেলাম। সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হইল। আমরাও তাঁহার সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত গেলাম। পুনরায় নিজের নিজের স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। বিহারে আসিয়া সব জায়গার লোককে নির্দেশ দিলাম, গান্ধীজীর হুকুম বাহির না হওয়া পর্যন্ত কেহ যেন সত্যাগ্রহ না করে। পণ্ডিত জওহরলালজীকে অনুরোধ করিলাম, চার পাঁচ দিনের জন্য তিনি যেন বিহার প্রদেশে ঘুরিয়া যান। তিনি প্রসন্নভাবে তাহাতে রাজি হইলেন। আমার ইচ্ছা ছিল যে অল্প যাহা কিছু সময় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে খুব বেশি জায়গায় সভা হইয়া যায় আর অনেকে তাঁহার তেজঃপূর্ণ বক্তৃতা শুনিবার সময় পায়। এইজন্য প্রথম হইতেই কার্যক্রম তৈরি করিয়া দেওয়া

হইল। যেখানে যেখানে সভা হইবার কথা, ঠিক সময়ে লোকে যেন একত্র হইয়া সেখানে অপেক্ষা করে, তাহা বলা হইল। তিনি কোথায় কোথায় কোন কোন জেলায় গেলেন তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমি এমন কার্যক্রম প্রস্তুত করিলাম যে সভায় তাঁহার খুব কম সময় লাগে। সঙ্গে ছিল তিনখানি মোটর। প্রথম মোটরে এমন কিছু লোক থাকিত যাহারা আগে গিয়া সভায় রাষ্ট্রীয় গান ইত্যাদি গাহিয়া লোককে শান্ত রাখিত। সকলে নিজের নিজের জায়গায় বসিলে অন্য এক মোটর করিয়া আমি পোঁছিয়া যাইতাম। যতক্ষণ তৃতীয় মোটরে পণ্ডিত জওহরলালজী না পোঁছাইতেন ততক্ষন যাহা কিছু বলা দরকার হইত তাহা আমি বলিয়া দিতাম। আমি পোঁছাইলে প্রথম গাড়ি অগ্রসর হইত। পণ্ডিতজী পোঁছিয়া গেলে আমি দ্বিতীয় গাড়িতে করিয়া পরবর্তী সভার জন্য রওনা হইয়া যাইতাম। এইভাবে কাহাকেও অন্য কাহারও বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। সভায় পোঁছিয়া লোকদের শান্ত করিবার জন্য ও তাহাদের উৎসাহ সংযত করিবার জন্য যে সময়টুকু প্রয়োজন তাহাও নষ্ট হইত না; কারণ এই কাজ তো প্রথমেই হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজীর এই পরিভ্রমণ খুব সার্থক হইয়াছিল। ইহাতে সমস্ত প্রদেশ, যেখানে পণ্ডিতজী যাইতেও পারেন নাই, পরিপূর্ণ উৎসাহে উদ্বেল হইয়া পড়িল।

বিহারে লবণ-সত্যাগ্রহ

নেহরুজীর বিহার ভ্রমণের শেষ দিন। তিনি প্রয়াগ চলিয়া যাইবেন। যতদূর মনে পড়ে, এই শেষ সভা হইয়াছিল সন্ধ্যার সময়, ছাপরা জেলায় মহারাজগঞ্জ নামে এক বড় গ্রামে। সেখানেই তারযোগে অথবা সংবাদপত্রে জানা গেল যে ৬ই এপ্রিল হইতে সকলে নিজের নিজের জায়গায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে পারে, ইহাই গান্ধীজীর নির্দেশ। এই ইঙ্গিত আমাদের কার্যক্রমকে একপ্রকার উলট পালট করিয়া দিল। আমরা তখনও স্থির করি নাই যে কে কোথা হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবে। রাতারাতি সর্বত্র খবর দেওয়া হইল। চম্পারণের লোকেরা প্রথম হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে বিপিনবাবু মোতিহারি হইতে পায়ে হাঁটিয়া সাত আট দিন অভিযানের পর জোগাপট্টীর নিকটে পোঁছিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন। তিনি ৬ই এপ্রিলই যাত্রা আরম্ভ করিলেন। মজঃফরপুর জেলাতেও এই-রূপই হইল। দুই চার দিনের মধ্যেই সর্বত্র লবণ আইন অমান্য করা হইতে

লাগিল। যেদিন বিপিনবাবু নুন তৈরি করিলেন, সেই দিন আমি সেখানে গিয়া পেঁাছিলাম। কিন্তু আমি গিয়া পেঁাছিবার পূর্বেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেই এক বাগানের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট কাছারি বসাইয়া চটপট মকদ্দমা বিচার করিয়া তাঁহাকে সাজাও দিয়া দিলেন। সত্যাগ্রহীরা আসিয়া যেখানে যেখানে ছিল আমি রাস্তায় সেই সব স্থানে স্থানে মোটরে করিয়া দেখিতে দেখিতে গেলাম। দৈর্ঘ্যে জেলার প্রায় অর্ধেক ভাগটাই এই অভিযানের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পথে রাস্তার উপর অসংখ্য মেরাপ-তোরণ-পতাকা ইত্যাদি লোকে সাজাইয়াছিল। অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যাইতেছিল। যেখানে আইন ভঙ্গ করা হইল সেখানকার লোকদের উৎসাহের তো সীমাই ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এমন একটি ভদ্রলোক যিনি ১৯২১ সালে পাটনা কলেজ হইতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কিছুদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। বাড়ির লোকদের চাপে তিনি আবার ফিরিয়া যান। পড়াশুনায় খুব ধারালো ছিলেন, আবার কলেজের পরীক্ষা পাশ করিয়া শীঘ্রই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গেলেন। আট দশ বৎসর চাকুরির পর এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিলাম, মকদ্দমা শুনানীর সময়ে যতক্ষণ এজলাস বসিয়াছিল, ততক্ষণ তিনি একবারও মাথা তোলেন নাই। যাহা কিছু লিখিবার ছিল তাহা মাথা নীচু করিয়াই লিখিলেন, ঐভাবে হুকুমও শুনাইয়া দিলেন। সেখান হইতে বিপিনবাবুকে মোটরে করিয়া মোতিহারি জেলে লইয়া আসা হইল।

আমিও নিজের গাড়িতে মোতিহারি পর্যন্ত আসিয়া পাটনা কিংবা অন্য কোনও স্থানে রওনা হইয়া গেলাম। ওদিকে গান্ধীজী লবণ সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু সরকার তাঁহাকে ধরিলেন না। সমস্ত দেশ জুড়িয়া অসংখ্য স্থানে লোকে নুন তৈয়ারি করিতে লাগিল। গ্রেপ্তারের কাজ চলিতে থাকিল। আমি নিজের জন্য এই কার্যপ্রণালী স্থির করিলাম যে সমস্ত জেলাগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে উৎসাহ দিব। দুই এক দিনের মধ্যে সমস্ত জেলায় ঘুরিতে গেলাম। যেখানে যেখানে নুন তৈয়ারি হইত অথবা তৈয়ারির বন্দোবস্ত হইত, সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে গিয়া যোগ দিতাম। যতদূর সম্ভব সাধারণ সভাও করিয়া লইতাম।

আমি দুই চার দিনের মধ্যেই পাটনায় পেঁাছিলাম। স্টীমার পেঁাছায় মধ্যরাত্রে। সেখানে গঙ্গার ঘাটেই লোকে বলিল, পাটনা শহরে ঐ দিন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহার প্রকার ছিল এই যে, কিছু কিছু সত্যাগ্রহী বাকরগঞ্জ মহল্লা হইতে বাহির হইয়া পতাকা লইয়া শহরে যাইতেছিল—সেখানে নুন তৈয়ারি করিবে বলিয়া। তাঁহারা যখন সুলতানগঞ্জ

থানার সামনে গিয়া পেঁাছিল তখন পুলিশ তাহাদের পথরোধ করিল। এ পর্যন্ত তাহাদের এইটুকু দোষ ছিল যে তাহারা পতাকা লইয়া, পাঁচ সাত-জনের মিছিল করিয়া, রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের গ্রেপ্তারও করা হয় নাই। কিন্তু পুলিশের সিপাহীরা কাতারে কাতারে তাহাদের পথ আটক করিল। তাহারা সমস্ত দিন ওখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল। রাত্রেও সেইখানেই রাস্তাতেই শুইয়া থাকিল।

আমি সোজা সেই জায়গায় গেলাম। দেখিলাম, সিপাহিরা রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে আর সত্যাগ্রহীরা খুশি মনে মাঝখানে রাস্তার উপর শুইয়া আছে। তাহাদের শোয়ার জন্য মহল্লার লোকেরা বিছানাও দিয়া-ছিল, সময় মত তাহাদের খাওয়াইয়াছিলও। আমি গিয়া পেঁাছিলে তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার সঙ্গে খুব আদর যত্ন করিয়া কথা বলিল। রাত্রে তো কিছু হইবার কথা ছিল না, আমি সদাকত আশ্রমে চলিয়া গেলাম। পরের দিন আবার খুব সকালেই ঐ জায়গায় আসিয়া পেঁাছিলাম। আমি তো সমস্ত প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতাম আর আশ্রমে বসিয়া বসিয়া ব্রজ-কিশোরবাবু সব জায়গায় প্রয়োজনমত আদেশ ও সাহায্য পাঠাইতেন। এবার এ পর্যন্ত কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্য বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় নাই, সদাকত আশ্রমও বাজেয়াপ্ত হয় নাই। এজন্য একাজ ঐখান হইতেই চলিতে থাকিল। গ্রেপ্তার তাহারাই হইত যাহারা নুন তৈয়ার করিত, আর সকলে নহে।

পরের দিন সকালে সেখানে পুলিশের ভিড় ছিল খুব। ঘোড়সওয়ার পুলিশও আসিয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও থানায় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে লোকের ভিড়ও বাড়িতে লাগিল। আমি বুঝিলাম যে সত্যাগ্রহীদের হয় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, নয়তো মারপিট করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। একজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে থানায় ডাকিতেছেন। আমি সেখানে গেলাম। তিনি আমায় বলিলেন, সত্যা-গ্রহীদের আপনি সরিয়ে নিয়ে যান, না হলে আমাকে হাঙ্গাম করতে হবে। আমি বলিলাম, আপনি ওঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেন। তিনি বলিলেন, ভিড়ও আমি সরিয়ে দেব, তবে সরাতে গেলে আমায় কঠোরতার আশ্রয় নিতে হতে পারে। আমি স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সরাইবার কথায় অস্বীকার করিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে বলিলেন, এর জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে, আমি যা ভাল বুঝি করব। আমি বুঝিলাম, এমন হইতে পারে, তিনি লাঠি বা গুলিও চালাইবেন। সঙ্গীদের পরামর্শ লওয়া আমার ভাল মনে হইল। একথা আমি তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন যে এজন্য তিনি আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারেন। আমি যখন যাইতে আরম্ভ

করিয়াছি তখন তিনি তাঁহার ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ঘড়ি আমার ঘড়ির সঙেগ মিলিয়ে নিন। এ কথা আমার খারাপ লাগিল। আমি বলিয়া দিলাম, আমি এর প্রয়োজন দেখছি না। তিনি নিজের ঘড়ির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আমি ইহাও বলিয়া দিলাম, যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সন্তোষজনক উত্তর না দিই তবে তিনি যা ভাল বোঝেন করবেন। আমি সোজা মোটরে চড়িয়া সদাকত আশ্রমে গেলাম। সকলের মত হইল, আমরা কিছু করিতে পারিব না, ম্যাজিস্ট্রেট যাহা খুশি করুন। আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোনযোগে সুলতানগঞ্জ থানায় এই উত্তর দিয়া দিলাম। আবার এখন ওখানে একটা-না-একটা কিছু হইবেই, এই কথা মনে করিয়া আমি তাড়াতাড়ি মোটরে করিয়া সেখানে যাইবার জন্য রওনা হইলাম।

পথের মধ্যে বাকরগঞ্জে ওদিক হইতে মোটরে করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে ফিরিতে দেখিলাম। তিনিও আমাকে দেখিলেন। একটু হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, ওখানে তিনি হাঙগামা করিয়া ফিরিতেছেন। সেখানে গিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি প্রথমে সত্যাগ্রহীদের চলিয়া যাওয়ার আদেশ দেন, যখন তাহারা গেল না তখন কিছু দূরে যে সব ঘোড়সওয়ার দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের ঘোড়া চালাইবার আদেশ দেন। ঘোড়া ছুটিলে ছেলেরা রাস্তার উপর শুইয়া পড়িল। এইভাবে তাহারা রাস্তা বন্ধ করিয়া দিল। ঘোড়া সেই পর্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের কাছে গিয়া থামিয়া গেল। তখন ঐ ছেলেদের এক এক জনকে উঠাইয়া এক মোটর লরীতে রাখিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইল।

এখন আমরা স্থির করিয়া লইলাম যে সত্যাগ্রহীরা পাঁচ পাঁচ জনের মিছিল তৈয়ারি করিয়া সমস্ত দিন ওখানে যাইতে থাকুক। এক দল গ্রেপ্তার হইলে অন্য দল যাইবে। দিন রাত্র এইরূপ চলুক। এপ্রিল মাসের অর্ধেকের বেশি কাটিয়া গিয়াছে। খুব গরম পড়িয়াছে। আমাদের সত্যাগ্রহীদেরও খুব রৌদ্র লাগিতেছে। পুলিশের লোকেরা তো দিন রাত দাঁড়াইয়াই আছে। দুই এক দিন এইভাবে কাটিল। তখন আমি কর্মপদ্ধতির কিছু বদল করিয়া দিলাম। দিন রাত গ্রেপ্তারের অপেক্ষা না করিয়া সময় নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইল। দিনে রাতে চার পাঁচ বার নির্দিষ্ট সময়ে যাইত। প্রথমে তো তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইত, কিন্তু পরে যখন দর্শকেরা খুব ভিড় করিত, তখন ঘোড়সওয়ার পুলিশ ঘোড়া ছুটাইত, আর লোকদের ডাণ্ডা দিয়া মারিত। এই ধাক্কাধাক্কির মধ্যে সত্যাগ্রহী কখনও গ্রেপ্তার হইত, কখনও হইত না, কিন্তু জনতার উপর খুব একচোট মার পড়িত। বিশেষ করিয়া সকাল সন্ধ্যায় যখন সত্যাগ্রহীর দল যাইত তখনই এরূপ হইত। আমিও সময়মত গিয়া পেঁৗছিতাম ও ভিড়ের মধ্যে থাকিয়া সব দেখাশুনা

করিতাম। পুলিশের লোকেরা হয়তো আমাকে চিনিত তাই আমার কখনও চোট লাগে নাই। কিন্তু প্রফেসর আবদুল বারির খুব চোট লাগিয়াছিল।

এইভাবে কয়েক দিন চলিল। ভিড় রোজ বাড়িতে থাকিল। ঘটনাস্থল সুলতানগঞ্জ থানা হইতে পশ্চিমদিকে হটিতে হটিতে পাটনা কলেজের সম্মুখ পর্যন্ত আসিয়া গেল। আমাদের লোকেরা এবং জনসাধারণও বরাবর শান্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মারপিট যাহা কিছু হইত, তাহা পুলিশের পক্ষ হইতেই হইত। একদিনের কথা : মিঃ সৈয়দ হাসান ইমামের বিবিসাহেবা কোথা হইতে আসিবার সময় পুলিশকে মারপিট করিতে দেখেন। কয়েকজনের মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনে ইহাতে খুব লাগিল। তিনি গিয়া হাসান ইমাম সাহেবকে বলিলেন, অনেক খুনখারাপির সম্ভাবনা আছে। তখন পর্যন্ত জানিতাম না যে হাসান ইমাম সাহেবের এবিষয়ে কোনও আগ্রহ আছে। এ ব্যাপার লইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করি নাই, তাঁহাকে কিছু বলিবার সুযোগও পাই নাই। বিবিসাহেবার কথা শুনিয়া তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি টেলিফোনে ডাকিলেন। আমি সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিতভাবে তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন, সব কথা শুনিয়া তাঁহারও রাগ হইল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, বলিলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিবেন। তাঁহার এই উৎসাহ বাড়িতে থাকিল। একথা আমি পরে আবার বলিব।

ইহার মধ্যে ইস্টারের ছুটি আসিয়া গেল। আমি এই সত্যাগ্রহকে ধর্মযুদ্ধ মনে করিতাম। আমি ভাবিলাম, ইহা যদি ধর্মের ব্যাপার হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা কাহারও ধর্মপালন সম্বন্ধে বাধা না হওয়াই উচিত। আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে এক পত্র লিখিয়া দিলাম যে পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন খ্রীষ্টানও আছেন, যাঁহারা হয়তো ইস্টারের সময়ে কিছু ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাই সোমবার অভিযান যাইবে না, আবার মঙ্গলবার হইতে নিয়মমত জাঠা চলিতে থাকিবে। শুক্রবারও দুপুর বেলায় যে জাঠা রওনা হইবার কথা ছিল তাহা আমি বন্ধ করিয়া দিলাম; কারণ ঘোড়সওয়ার পুলিশের মধ্যে বেশির ভাগই মুসলমান। আমি এই পত্র শুদ্ধ মন হইতে লিখিয়াছিলাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পত্র পড়িয়া টেলিফোনযোগে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা কি সত্যসত্যই ধর্মভাব হইতেই লিখিয়াছি। আমি বলিয়া দিলাম যে বাস্তবিক শুদ্ধ চিত্ত হইতেই লিখিয়াছি। ইহার পর তিনি বলিলেন যে আমি যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি, তিনি ভাবিয়া দেখিবেন কিভাবে এই ঝগড়ার সমাধান হইতে পারে।

পরের দিন ছিল সোমবার; আমি তাঁহার কাছে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হইল। আমি বলিয়া দিলাম যে এই ঝগড়া অতি সামান্য

ব্যাপার। পাঁচজনের মিছিল রাস্তা দিয়া যাইতে চায়। ইহাতে কোনও আইনবিরোধী কথা নাই। তিনি যদি মিছিল লইয়া যাইতে দেন, তাহা না আটকান, তাহা হইলে সমস্ত ঝগড়া মিটিয়া যায়। জাঠা যখন নুন তৈয়ার করিয়া আইন ভংগ করিবে, তখন গ্রেপ্তার করা হউক; আইনমতে যাহা সাজা তাহাই দেওয়া হউক। তিনি অন্য রাস্তা দিয়া মিছিল লইয়া যাইতে বলিলেন। আমি তাহাতে রাজি হইলাম না। এই পর্যন্ত কথা হইয়া থামিয়া গেল। পরের দিন সকালে যে জাঠা গেল তাহা গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রেপ্তারের পর লোকের ভিড় আপনিই সরিয়া গেল। মারপিটের প্রয়োজনই হইল না। ইহাও দেখা গেল যে পুলিসের সংখ্যা অতি কম; ঘোড়সওয়ার পুলিশ তো ছিলই না। পুলিশের অ্যাসিস্টান্ট সুপারিণ্টেডেণ্ট গ্রেপ্তার করিলেন। সত্যাগ্রহীদের তাড়াতাড়ি কাছারিতে উপস্থিত করা হইল। মকদ্দমা তো চলিতেই ছিল, এমন সময় পরবর্তী জাঠার আসিবার সময় হইয়া গেল। সে জাঠা সোজা রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। কেহ তাহার পথরোধ করিল না। আমরা কাছারিতেই ছিলাম, এমন সময় এই খবর পাইলাম। সেই সত্যাগ্রহীদেরও কাছারির ছুটি হওয়া পর্যন্ত আটক থাকিবার শাস্তি হইল। হুকুম শুনাইয়া হাকিম উঠিয়া গেলেন। আমাদের সব সত্যাগ্রহীদের সংগে সংগেই তিনিও সেখান হইতে বাহির হইলেন। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে, পুলিশ জাঠার পথ আটক করিবে না। সন্ধ্যাবেলাতেও জাঠা গেল। কিন্তু আটকবন্ধ কিছু হইল না। ইহার পর জাঠা পাঠানো বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু নুন তৈয়ারির কাজ চালু থাকিল, এইজন্য লোকেরা গ্রেপ্তার হইয়া চলিল। পাটনা শহরেও গ্রেপ্তার চলিতে থাকিল।

লবণ সত্যাগ্রহের পরের কার্যক্রম

গান্ধীজী কয়েকদিন পরে গ্রেপ্তার হইয়া গেলেন। ধরাসনায় সরকারি নুন-গোলা ছিল, সেখানে সত্যাগ্রহীদের অভিযান চলিল। সেখানে বাহিরের ময়দানেই প্রচুর লবণ জমা হইয়া পড়িয়া থাকিত। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহা লুটিতে অবশ্য যাইত না, কিন্তু সরকারি আদেশ অমান্য করিয়া সেখানে প্রবেশ করিতে চাহিত। এইজন্য সেখানে তাহাদের উপর লাঠি চলিত খুব। প্রথমে গান্ধীজী, তাহার পর আব্বাস তৈয়বজী ও সরোজিনী নাইডু ঐ স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব করিতে থাকেন। তাঁহারা এক একজন করিয়া

গ্রেপ্তার হইয়া চলিলেন। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দয়ভাবে মার খাওয়া, লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়া, অজ্ঞান অবস্থায় তাহাদিগকে টানিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়া, সেখান হইতে কংগ্রেসী খাটে উঠাইয়া তাহাদিগকে কংগ্রেসী হাসপাতালে পেঁছানো, এসব রোমাঞ্চকর সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইতে লাগিল। তাহাতে উৎসাহ বাড়িয়াই চলিল, কমিল না। প্রচণ্ড মার খাইতে হইবে জানিয়াও শত শত লোক রোজ যাইত। যত দিন না বর্ষা শুরু হইয়া সেখানে যাওয়া-আসা অসম্ভব করিয়া তুলিল, ততদিন এ ব্যাপার বরাবর চলিতে থাকিল।

বিহার প্রদেশে সমুদ্রতট তো ছিলই না। কিন্তু সর্বত্র কিছু না কিছু নোনতা মাটি পাওয়া যাইত, তাহা একত্র করিয়া তাহার জল চোয়াইয়া লওয়া হইত আর হাঁড়িতে তাহা গরম করিয়া শুকাইলে নুনের মত একটা জিনিস পাওয়া যাইত। আমি নিজে কোথাও নুন তৈয়ারি করি নাই, কিন্তু যেখানে যাইতাম সেখানকার তৈয়ারি নুন সভায় বিক্রয় করিতাম বা নীলাম করিতাম। তাহাতে খরচের কিছু টাকাও পাওয়া যাইত, খোলাখুলি আইন ভাঙ্গাও হইত। কারণ কর না দিয়া নুন বিক্রয় করা নুন তৈয়ারি করার মতই অপরাধ। কিন্তু আমি অনেক দিন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হই নাই।

শুরুতেই পণ্ডিত জওহরলালজী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহার জায়গায় পণ্ডিত মতিলালজী কাজ করিতে লাগিলেন। তিনিও প্রায় জুনের শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হন নাই। আমাকেও ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যখন-তখন প্রয়াগে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও হইত। সেখান হইতে প্রয়োজনমত নির্দেশ বাহির হইত। লোকে যে প্রকার সাহায্য চাহিত তাহা দেওয়া হইত। সমস্ত দেশে গভর্নমেণ্টের দমননীতি জোর চলিতেছিল। যত লোক গ্রেপ্তার হইতে পারিত গভর্নমেণ্ট তত ধরিতেন না। সরকার এই নীতি স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে, আইন-ভঙ্গকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইবে, অধিকাংশকে মারপিট করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইজন্য যেখানে কয়েকজন একত্র হইয়া নুন তৈয়ারি করিত, পুলিশ সেখানে গিয়া হাঁড়ি চুলা ভাঙিয়া ফেলিত, যাহারা সেখানে উপস্থিত থাকিত তাহাদের মধ্যে দুই একজনকে গ্রেপ্তার করিত, অন্য লোকদের লাঠি মারিয়া চলিয়া যাইত। ইহাতে নুন তৈয়ারি করা বন্ধ হইত না। আবার নূতন হাঁড়ি আসিত, নূতন চুলা তৈরি হইত, আর নুন যাহারা তৈয়ারি করিত তাহাদের সংখ্যা আগেকার মতই থাকিত। গাঁয়ের লোকেরা এ কাজ লুকাইয়া ছিপাইয়া করিত না, কারণ নির্দেশ ছিল খোলাখুলিভাবে করিবার। আমি বরাবর দিন রাত ঘুরিয়া বেড়াইতাম। সর্বত্র দেখিতাম, লোকেরা গাঁয়ের কোনও প্রধান জায়গায়, কলাগাছ প্রভৃতি পুতিয়া, পতাকা ও তোরণ দিয়া সাজাইয়া, একটু ঘিরিয়া লইত। সেখানেই

চুলা ও মাটি হইতে জল চোলাই করিবার জন্য ছোট কুঠি তৈরি করিয়া লইত। গাঁয়ের সকলে জানিত, কোথায় নুন তৈয়ারি হয়। কোনও আগন্তুক ব্যক্তি বা পুলিশের লোকে নুন তৈয়ারির জায়গার সন্ধান অনায়াসেই পাইত।

উপরে বলিয়াছি যে কিছুদিন পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট আমাকে গ্রেপ্তার করেন নাই। ইহাও বলিয়াছি যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্বে লবণ সত্যাগ্রহের সফলতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তবু আমি এজন্য পুরাপুরি চেষ্টা করিয়াছি। গান্ধীজী তাঁহার অভিযানে যেমন যেমন ডাণ্ডীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন, দেশে উৎসাহ তেমনি তেমনি বাড়িতে লাগিল। এই সমস্ত দেখিয়া আমার বিশ্বাসও দৃঢ় হইতে থাকিল যে, ইহাতে পূর্ণ সফলতা পাওয়া যাইবে। তখন আমি আরও জোর দিলাম। পণ্ডিত মতি-লালজীরও এমনই একটা অবস্থা ছিল। তিনিও প্রয়াগে, নিজের আনন্দ-ভবনেই, যেমন প্রয়োগশালায় প্রয়োগ হয় তেমনই ফিলটার কাগজের সাহায্যে মাটি হইতে নুন বাহির করিলেন। উহা তিনি খুব গর্ব করিয়া আমা-দিগকে দেখাইলেন। আমরাও ইহাতে গর্ব অনুভব করিলাম। তাঁহার আদেশ ও সম্মতি পাইয়া, বিহারের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি এরূপ কর্মপ্রণালী স্থির করিলাম যে, বিহারে জুন মাস পর্যন্ত নুন তৈয়ারি চলিবে—অর্থাৎ এইদিকে বেশি জোর দেওয়া চলিবে; তাহার পর জোর দেওয়া হইবে বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কারের উপর, সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান নিবারণের কাজ চলিতে থাকিবে; বর্ষায় নুন তৈয়ারি করা যাইবে না, এই কারণে জুনের পর বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও মদ্যনিষেধের জন্য পাহারা ইত্যাদির কাজ চালু করা হইবে; বর্ষা শেষ হইলে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করিবার কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

এই কার্যক্রমের এমন অর্থ ছিল না যে যখন নুন তৈয়ারি হইতে থাকিবে তখন বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কাজ হইবেই না। ইহার শুধু এইটুকুই অর্থ যে ঐ সময় একটা বিষয়ের উপর জোর দিয়া লোকের মন সেইদিকে বেশি আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহাতে পূর্ণ সফলতা পাইতে হইবে। এইভাবে, একটা কাজের উপর জোর দিলে তাহা বেশি অগ্রসর হয়।

আমি খবর পাইয়াছিলাম যে প্রথমে গভর্নমেণ্টের আমাকে গ্রেপ্তার করিবার ইচ্ছা ছিল না। আমি তো গভর্নমেণ্টের মতের অপেক্ষা না রাখিয়া কাজ করিয়াই যাইতেছিলাম। কয়েকদিন পরে খবর আসিল যে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পাইয়াছেন—তিনি ইচ্ছা করিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। আমার কাজের পদ্ধতি এইরূপ ছিল যে আমি কোনও জেলায় চলিয়া যাইতাম; বিনা পয়সায় কি ভাড়া দিয়া এক মোটর গাড়ির ব্যবস্থা করিতাম, সকালে পাঁচটা ছয়টায় স্নানাদি সারিয়া একদিকে বাহির হইতাম, সারাদিন দশ-পনেরোটা জায়গায় ছোটখাটো সভা

করিতাম, রাস্তায় যেখানে যেখানে লবণ তৈয়ারি হইত সমস্ত দেখাশুনা করিতাম, রাত দশটা এগারোটায় এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহির হইতে ফিরিতাম। এইভাবে প্রত্যেক জেলার খুব বড় অংশ ঘুরিয়া আসিতাম। দুই-তিন দিনে এক জেলা ঘুরিয়া অন্য জেলায় বাহির হইয়া যাইতাম। আমি দেখিয়াছি, গাঁয়ে গাঁয়ে এই লইয়া বাজি ধরিত। যে কোন গ্রামে অধিক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। যেখানে লবণ তৈয়ারি থাকিত না, সেখানকার লোক যতক্ষণ লবণ তৈয়ারি না হইত ততক্ষণ লজ্জিতভাবে থাকিত। আমি লোকদের বিদেশী বস্ত্র বর্জন, মদ্যপান নিষেধ ও লবণ তৈয়ারি করিবার কথা বুঝাইতাম। সর্বদা লোকেরা চৌকিদারী ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহাদের বলিয়া দিতাম যে এই চলতি কার্যপদ্ধতি শেষ হইয়া গেলে পরে সেবিষয়ে নির্দেশ বাহির হইবে, ততদিন লোকে সেজন্য প্রস্তুত হউক। লোকেরা একথার অর্থ বুঝিতে পারিত।

বিদেশী বস্ত্রবর্জন ও মদ্যপান নিবারণ

লবণ তৈয়ারি করা ছাড়া শহরের কাজ ছিল বেশির ভাগ বিদেশী বস্ত্রবর্জন ও মদ্যপান নিবারণ। প্রয়াগে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সময়ে জানা গিয়াছিল যে, দেশের কয়েক জায়গায় বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কাজও জোর চলিতেছিল; এই কাজ বিহারেও শুরু হইয়া গিয়াছিল। ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোক উভয়ের মধ্যেই এ বিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। এইজন্য একাজ অত্যন্ত সহজে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক গ্রামে যেমন লবণ তৈয়ারি একটা ঢেউয়ের মত আসিল তেমনি বড় বড় শহরে দোকানে ও আড়তে সমস্ত বিদেশী কাপড় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা চলিল। মহাত্মাজী লিখিয়াছিলেন, এই কাজ এবং মদের দোকানে পাহারার কাজ বেশির ভাগ মেয়েদের হাতেই থাকুক—আর ইহার সম্পূর্ণ ভার মেয়েরা বুঝিয়া লউক। এইজন্য কোথাও কোথাও মেয়েরা দোকানে পিকেটিং করিতে বা পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। কোথায় কেহ এক কর্মপ্রণালী চালাইয়া দিল—তাহা প্রায় সব জায়গায় চলিল; সব কাপড়ের দোকানদার নিজের দোকানে বিদেশী বস্ত্র বাঁধিয়া তাহার উপর কংগ্রেসের মোহর মারিয়া দিত ও লিখিত প্রতিশ্রুতি দিত যে, যতক্ষণ কংগ্রেসের হুকুম না হইবে ততক্ষণ আর গাঁইট খুলিবে না। ব্যবসায়ীরা সর্বদা নিজেদের মধ্যে কমিটি করিয়া লইত—ঐ কমিটি দেখাশুনার ভার কংগ্রেসের উপর থাকিত, অথবা কংগ্রেসের

প্রতিনিধিরাও তাহাতে থাকিতেন—তাঁহারা এই কমিটির উপর সমস্ত বিদেশী বস্ত্র এইভাবে বাঁধিয়া দিবার ও বিক্রয় বন্ধ করিবার ভার অর্পণ করিতেন। কোনও ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে কমিটি তাহাকে জরিমানা করিয়া শাস্তিও দিত, এইভাবে তাহার উপর সম্পূর্ণ শাসন চলিত। যে ব্যাপারী রাজি হইত না, তাহার দোকানে পাহারা বা পিকেটিং বসানো হইত ও তাহার বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইত।

আজও ইহা মনে করিয়া খুব সন্তোষ বোধ করি যে বিহারের প্রায় সকল শহরে আর বহুসংখ্যক গ্রামে ছোট ছোট ব্যাপারীরাও নিজেদের সমস্ত বিদেশী কাপড় গাঁট বাঁধিয়া কংগ্রেসের মোহর লাগাইয়া আলাদা করিয়া রাখিয়া দিত। সমস্ত প্রদেশে পাহারার কাজ অল্পই করিতে হইয়াছিল, আর তাহাও খুব সফল হইয়াছিল। পিকেটিং শুরু করিতেই গাঁট বাঁধা শুরু হইয়া যাইত, আর দুই চারিদিনেই কাজ শেষ হইত। প্রায় সর্বত্রই আমি এ দৃশ্য দেখিয়াছি। স্থির করা ছিল যে জুন মাসের অর্ধেক গেলে তবে এই দিকে জোর দেওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, জুনের শেষ হইতে হইতে এই কাজও সমস্ত প্রদেশে শেষ হইয়া গিয়াছিল। যে ধরনের কাজ হইতেছিল তাহাতে তত্ত্বাবধানে খুব সুফল হইত। কোন এক শহরের ব্যাপারীরা গাঁট বাঁধিতে শুরু করিয়াছে; এই খবরে অন্য শহরের ব্যাপারীরা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিত ও সেখানকার কংগ্রেসীরাও তাহাদের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করিত। অমনি সেখানকার কাজও শুরু হইত, তাড়াতাড়ি শেষও হইত। কানপুর, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বড় বড় ব্যবসায়ীরা আসিয়া পণ্ডিত মতিলালজীর সহিত দেখা করিত ও তাঁহার সহিত কথা বলিয়া ঐ সব কেন্দ্রে কিভাবে এই কাজ সুসম্পন্ন করা যায় ও ইহাতে ভারতীয় মিল মালিকদের নিকট হইতে কিভাবে সাহায্য নেওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিত। প্রতিজ্ঞা-পত্রের মুসাবিদা তৈয়ারি করিয়া সর্বত্র পাঠানো হইয়াছিল। জনসাধারণ ও ব্যাপারীরা নিজের নিজের প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত করিত।

কোনও কোনও প্রদেশে মদ্যপান নিবারণের উপর বেশি জোর দেওয়া হইল। সেখানে ইহা লইয়া সরকারের দমননীতি চলিল। লোককে জেল-বরণ করিতে হইল—গুলী পর্যন্ত খাইতে হইল। এমন রোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিল সীমান্ত প্রদেশে। অনেক পাঠানের উপর গুলীবর্ষণ হইল। সমস্ত দেশে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িল। এ্যাসেম্বলীর প্রথম নির্বাচিত সভাপতি বিঠ্ঠলভাই প্যাটেল নিজের পদে ইস্তফা দিলেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশের গুলীর ব্যাপার তদন্ত করিতে যাইতেছিলেন। গভর্নমেণ্ট তাঁহার রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত করিলেন। উহার অধিক প্রচার হইতে পারিল না। কিন্তু যাহা কিছু খবর ছাপা হইত—তাহা সমস্ত বিদ্যুতের মত অতিশয় তেজের

সহিত কাজ করিত। যখন একে একে সর্বত্র উত্তেজক কান্ড হইতে লাগিল, তখন কাহাকে ছাড়িয়া ছাড়িয়া কাহার কথা বলিব, তাহা বাছিয়া লওয়ার মানে কিছু হয় না। আমার দুঃখ এই যে, আজ পর্যন্ত দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা হয় নাই। কিন্তু এমন কয়েকটি কথা আছে, যাহা উল্লেখ করিলে ভাল হয়।

বিহার পর্দাপ্রধান দেশ। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন এখানে পর্দা দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গা জেলার যুবক শ্রীরামনন্দন মিশ্র বাড়ির লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীকে পর্দা হইতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। স্ত্রীকে তিনি সাবরমতী আশ্রমে কিছুদিনের জন্য লইয়াও যান। মহাত্মাজী মগনলাল গান্ধীর কন্যা শ্রীমতী রাধাকে তাহার শিক্ষা ও পর্দানিবারণ কাজের জন্য বিহারে পাঠান। মগনলালজী এখানকার কাজ দেখিতে আসিলেন। মেয়েকে দেখাও উদ্দেশ্য ছিল। তিনি হঠাৎ অসুখে পড়িলেন ও পাটনায় তাঁহার মৃত্যু হইল। ইহার ফল হইল অদ্ভুত। পর্দানিবারণের কাজ জোরে আরম্ভ হইল। এজন্য প্রাদেশিক সম্মেলন হইল। তাহাতে শ্রীব্রজকিশোর প্রসাদও অগ্রণী ছিলেন। যে-কাজ গয়া কংগ্রেসের সময় স্বল্পমাত্রায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখন বাড়িয়া চলিল।

১৯৩০ সালে যখন সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল ও গান্ধীজী মদ্যপান নিবারণ ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন বিশেষ করিয়া মেয়েদের কাজ বলিয়া নির্ধারণ করিলেন, তখন মেয়েদের মধ্যে উৎসাহের ঢেউ উঠিল। শহরের যেখানে যেখানে পিকেটিং বা পাহারার কাজ চলিত, সেখানে মেয়েরাই কাজ করিত। মেয়েরা দোকানে আসিয়া দাঁড়াইলেই কোন খরিদ্দার সেদিকে উঁকি মারিতে সাহস করিত না। দোকানদারও ভয় পাইত এবং মেয়েদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিত। পাটনায় এ প্রকারের পাহারা দু-চার দিনের জন্য কোনও কোনও দোকানে বসাইতে হইয়াছিল—এ বিষয়ে প্রধান কাজ করিবার ভার ছিল শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী দেবীর উপর। যাঁহারা কখনও ঘরের বাহির হন নাই এমন মেয়েরাও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। সকালে আটটা নয়টা পর্যন্ত কংগ্রেসী কর্মীরা তাঁহাদের নিজের নিজের ঘর হইতে ডাকিয়া লইয়া নির্দিষ্ট দোকানে লইয়া যাইতেন, সময় হইয়া গেলে তাঁহাদের বাড়িতেও পোঁছাইয়া দিতেন। একদিনকার কথা—কোন এক বাড়ির এক নূতন বৌ আসিয়া উপস্থিত। স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাকে বাড়িতে পোঁছাইয়া ভুলিয়া গিয়াছিল। রাত হইয়া গিয়াছে। উহাকে কেহ লইয়া যাইতে আসে নাই। অন্য কার্যে নিরতা অন্য মেয়ের স্বামী, পত্নীকে বাড়ি লইয়া যাইতে আসিয়া এক দোকানের সামনে এই মেয়েটিকে দাঁড়াইতে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাহাকে বাড়ি

লইয়া যাইতে কেহ আসে নাই। তিনি তাহাকে নিজের মোটর গাড়িতে উঠাইয়া বাড়ি পেঁাছাইয়া দিতে চাহিলেন। সে মেয়েটি নিজের বাড়িও চিনিতে পারিল না—কারণ কখনও ঘরের বাহিরে আসে নাই। শহরের সব বাড়ি প্রায় একরকম দেখিতে। তাই সব বাড়ি নিজের বলিয়াই দেখাইল। আমাদের এখানকার রেওয়াজ এই যে মেয়েরা স্বামীর নাম লয় না। এইজন্য সে স্বামীর নামও বলিতে পারিল না যে তাহার বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। মেয়েটি হয়তো কায়েথী অক্ষরে নিজের নাম লিখিতে পারিত, তার চেয়ে বেশি লেখাপড়াও জানিত না। যে ভদ্রলোকটি মোটর গাড়িতে চড়িয়া ঘুরিতেছিলেন, তিনি কায়েথী জানিতেন না যে তাহার স্বামীর নাম তাহাকে দিয়া লেখাইয়া বাড়ির সন্ধান করিবেন। বেশ খানিকক্ষণ ধরিয়া গাড়ি এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিল। আবার তাহার স্বামীর নাম তাহাকে দিয়া লেখাইয়া কাহাকে দিয়া পড়াইয়া লইলেন। তখন ঘরের খোঁজ হইল। এইরূপে মেয়েটিকে তাহার বাড়ি পর্যন্ত পেঁাছাইয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনা আমি লিখিলাম এইজন্য যে পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, মেয়েদের মধ্যে কতখানি উৎসাহ ছিল; আর অশিক্ষিত মেয়েরাও কিভাবে একাজে আসিয়া জুটিয়াছিল।

বীপুরে সত্যাগ্রহ

একবার প্রয়াগে গিয়াছিলাম। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ছিল; সেখান হইতে পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, ভাগলপুর জেলায় বীপুর গ্রামে নূতন ধরনের সত্যাগ্রহ শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রয়াগে ইহার কিছু খবর পাইয়াছিলাম। পাটনাতে বিস্তারিত খবর জানিতে পারিলাম। তখন আমি শীঘ্র সেখানে যাওয়া স্থির করিলাম। বীপুর গঙ্গার উপরে ভাগলপুর হইতে কিছু দূরে, বি. এন্. ডবলিউ. আর. (ও. টি.) রেলওয়ের ছোট একটা জংশন—সেখান হইতে ভাগলপুর ঘাটের গাড়ি যায়—এখানকার সারা অঞ্চল বর্ষায় জলমগ্ন হইয়া থাকে। এরূপ স্থানে যেমন দেখা যায়, এখানকার লোকেরা খুব সাহসী ও লাঠিবাজ। এখানে কংগ্রেসের প্রতি লোকের খুব সহানুভূতি ছিল।

১৯২৯ সনে একবার আমাকে খুব আগ্রহ করিয়া এখানে ডাকা হইয়াছিল। লোকেরা আমাকে আশেপাশের গ্রামেও লইয়া গিয়াছিল। সেখানকার লোকেরা আমাকে খুব উৎসাহ ও আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া-

ছিল। আমি যেখানে গিয়াছিলাম সেখান হইতে কিছুদূরে গৌরীপুর গ্রাম। ফিরিবার সময় খুব জোরে বৃষ্টি হইতে লাগিল। মাঝখানে এক নদী পার হইবার ছিল। হাতী চড়িয়া যাইতেছিলাম। নদী পার হইয়া হাতীর উপরে খুব ভিজিয়া গেলাম। যখন বীপুরে সভাস্থলে গিয়া পেঁাছিলাম, তখন দেখিলাম খুব ভীড় জমিয়াছে, খুব বৃষ্টি হইতেছে তবু একজনও উঠিয়া চলিয়া যাইতেছে না। আমাকেও সেই অনর্গল বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে হইল। এভাবে সেখানকার উৎসাহের নমুনা আমি কিছু পাইয়াছিলাম। সেখানকার কিছু ইতিহাসও আমি শুনিয়া লইয়াছিলাম। তাহার মধ্য হইতে একটা কথা এখানে লিখি। সেখানে এক ইংরেজের জমিদারী ছিল। বহুদিন হইতেই রায়তদের সঙ্গে একটুকরা জমির জন্য ঝগড়া চলিয়া আসিতেছিল। কাছারিতে অনেক মামলা-মকদ্দমা চলিতেছিল। জমি রক্ষার জন্য সাহেব কয়েকজন গুর্খাকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের উপর রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। শোনা যায় যে, বর্ষাকালের এক রাত্রে ঐ অঞ্চলের লোকেরা সমস্ত গুর্খাকে মারিয়া—সংখ্যায় তাহারা বিশ-পঁচিশজন ছিল—গঙ্গার বানের জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। কে মারিল, আর তাহাদের মৃতদেহের কি হইল, তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না।

এরূপ স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে সত্যাগ্রহের জন্য উৎসাহ থাকিবে, তাহা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাহারা অহিংস থাকিতে পারিবে কিনা, সে ভয়ও ছিল; তাহা আশ্চর্য কথাও ছিল। সেখানে এক নূতন ধরনের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া গেল। কথাটা গাঁজার এক দোকান লইয়া। রেলওয়ে প্ল্যাটফরমের পাশেই পশ্চিমদিকে কংগ্রেসের আশ্রম। সেখানে এক ছোট কুঠরীতে খাদিভাণ্ডার। সেখানে সূতা কিনিয়া রাখা হইত। বিক্রয়ের জন্য তুলা ও কাপড় থাকিত। অন্যান্য কুঠরীতে কংগ্রেসের কার্যকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকেরা থাকিত। তখনকার দিনে এই বাড়ি ঝুপড়ীর মত ছিল। এখন সেখানে আশ্রমের জন্য সুন্দর পাকা বাড়ি হইয়াছে। রেলের যাত্রীরা গাড়ি হইতেই তাহা দেখিতে পায়।

স্টেশনের দক্ষিণে পাঁচ সাতটি দোকান লইয়া ছোটখাট বাজার। ইহার মধ্যে একটি দোকানে গাঁজা বিক্রয় হইত। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা গাঁজার দোকানে পাহারা বসাইল। একদিন পুলিশ আসিয়া আশ্রম হইতে কর্মীদের মারধর করিয়া বাহির করিয়া দিল; আশ্রমও দখল করিয়া লইল। তুলা, সূতা, খাদি প্রভৃতি এদিক-ওদিক ছড়াইয়া ফেলিল। যখন নিকটবর্তী লোকেরা বুঝিতে পারিল যে পুলিশ এইভাবে আশ্রম অধিকার করিয়া লইয়াছে, তখন তাহারা আশ্রম দখল করিতে চাহিল। এইজন্য প্রথমে চার পাঁচজন লোকের একটা দল পতাকা হাতে সেখানে গেল। প্রচার হইল, যেখানে পুলিশের দল হাতিয়ার লইয়া বসিয়া আছে সেখানে চার পাঁচজন

লোক জোর করিয়া দখল লইতে পারে না। ইহা সত্যাগ্রহের এক প্রণালী। পুলিশও উহা ঐরকমই বুঝিল। যাহারা ঐরকম দল গঠন করিয়া যাইত, পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইত। প্রতিদিন একবার তৃতীয় প্রহরে চারটা-পাঁচটার সময় একাজ হইত।

সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পাটনাতে তামাসা দেখিবার জন্য যেমন ভীড় জমিত, ওখানেও তেমনই সত্যাগ্রহীর দল যাত্রা করিবার সময় ভীড় হইত। কখনও কখনও পুলিশ সত্যাগ্রহীর দল গ্রেপ্তার না করিয়া মারপিট করিয়া ছাড়িয়া দিত। প্রতিদিন দর্শকের ভীড় বাড়িতে লাগিল। আমি যখন পাটনার বিস্তারিত খবর পাইলাম তখন কয়েকজন বন্ধুর সহিত ভাগলপুর গেলাম। সেখান হইতে পরের দিন দ্বিপ্রহরে বীপুর পেঁছিলাম। ঐদিন আমাদের যাওয়ার খবর ছড়াইয়া পড়িল। এজন্য ভীড়ও খুব বেশি হইল। বেলা প্রায় তিনটার সময় সমস্ত লোকেই এক বাগানে একত্র হইল। আমি তাহাদিগকে বুঝাইলাম যে যাহাই হউক না কেন, নিজেদের শান্ত রাখিতে হইবে, কোনরকমে কেহ যেন হিংসার কাজ না করে। সত্যাগ্রহের সময় উপস্থিত হইলে সকলে রাস্তার উপর এদিকে-ওদিকে দাঁড়াইয়া গেল। কেহ কেহ ঐ ছোট বাজারেও জমা হইল। আমরা এখানে-ওখানে দাঁড়াইলাম। আমি বাজারের সামনে এমন এক জায়গায় ছিলাম যেখান হইতে পুলিশের লোকেরা যে দাঁড়াইয়াছিল ও সত্যাগ্রহীর দল যে পর্যন্ত যাইতে পারিত, তাহা নজরে আসে। সেখানে পেঁছিবার পর সত্যাগ্রহীর দলের উপর হয় মারধর হইত নতুবা তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত। প্রায় পনেরো কুড়ি হাজার লোকের ভীড়।

সত্যাগ্রহীদের দল বাহির হইল ও রাস্তা দিয়া পুলিশ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে গিয়া পেঁছিল। তাহাদিগকে নিয়মমাফিক গ্রেপ্তার করা হইল, মারপিট হইল না। আমরা বুঝিলাম, ওদিনকার কাজ হইয়া গিয়াছে, এখন সকলে চলিয়া যাইবে। লোকেরা এখন এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িতেই চাহিতেছিল—এমন সময়ে আশ্রমের ভিতর হইতে পুলিশের সুপারিনটেনডেণ্ট কয়েকজন লগুড়ধারী সিপাহীর সহিত বাহির হইলেন। রাস্তার উপর যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের উপর লাঠিবাজি করিবার হুকুম দিলেন। রাস্তা সেখানে উঁচু। আশ্রম ও বাজার দুই-ই নিচু জমিতে। পুলিশের লোকেরা বেপরোয়া লাঠি চালাইতে লাগিল। লোকের ভিড় ছিন্নভিন্ন করিল, এভাবে স্টেশন পর্যন্ত আসিল। কতজনের উপর লাঠি পড়িয়াছিল জানি না, কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। সেখান হইতে পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে আসিয়া পেঁছিল। আমি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। খানিকটা দূরে এক দোকানের বারান্দা

হইতে সুপারিনটেনডেণ্ট চারিদিক দেখিয়া লইলেন। সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মারো শালাদের।" পুলিশ ঐভাবে লোকেদের উপর বেপরোয়া লাঠি চালাইতে লাগিল। আমার উপর চার পাঁচটা লাঠি পড়িল। এক যুবক স্বেচ্ছাসেবক মধ্যখানে কয়েকটি লাঠির আঘাত নিজের দেহে লইল। এইজন্য যদিও আমারও চোট লাগিয়াছিল, কিন্তু যতটা লাগিতে পারিত ততটা লাগে নাই। আমার স্থান হইতে কিছু দূরে ছিলেন বলদেব সহায় ও শ্রীযুক্ত মুরলীমনোহর প্রসাদ। তাঁহারাও খানিকটা চোট পাইয়াছিলেন। কিছুদূরে প্রফেসর আব্দুল বারিও ছিলেন। তাঁহার বেশি লাগিয়াছিল। তিনি পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর লাল হইয়া গিয়াছিল।

এই প্রকার মারপিট করিতে করিতে পুলিশবাহিনী সুপারিনটেন-ডেণ্টের পিছনে পিছনে আবার আশ্রমে চলিয়া গেল। ভিড় তো লাঠি চলিবার আগে হইতে কম হইতেছিল। .লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আমরা যাহারা ভাগলপুর হইতে আসিয়াছিলাম, ওখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কারণ আমাদের গাড়ি রাত্রি সাতটা আটটার সময় ওখান হইতে ছাড়িত। ভিড় ছত্রভঙ্গ হইলে ও পুলিশের লোকেরা চলিয়া গেলে এক ডাক্তার আসিলেন। তিনি ঐ বাজারেই থাকিতেন। তিনি আমাদের আহতস্থান ধুইয়া পট্টি বাঁধিয়া দিতে থাকিলেন। আমরা সেখানে বাজারের সামনে খোলা ময়দানে ঘাসের উপর পড়িয়াছিলাম। ইহার মধ্যে পুলিশ সুপারিন-টেনডেণ্টকে সিপাই ও পুলিশ ইনস্পেক্টারকে লইয়া আবার ঐদিকে আসিতে দেখিলাম। আমরা ভাবিলাম. হয়তো আবার আমাদের উপর লাঠিবৃষ্টি হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। তাহারা খানিকটা তফাতেই দাঁড়াইল। ইনস্পেক্টার ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল কংগ্রেসকর্মী পটল-বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইল। তিনি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাহারা পটলবাবুকে লইয়া ফিরিয়া গেল। আমরা রাত্রির গাড়িতে ভাগল-পুর গেলাম। সেখানে খুব উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমিও সেখানে দুই-একদিন থাকিয়া গেলাম।

সমগ্র বিহারে ভাগলপুর হইল বিদেশী কাপড়ের আড়তের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। অন্যান্য জায়গায় প্রায় সব ব্যাপারীরাই বিদেশী কাপড়ের গাঁট বাঁধিয়া মোহরবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ভাগলপুরে এ পর্যন্ত তাহা হয় নাই। উক্ত ঘটনার পর সেখানকার মেয়েরাও দোকান পাহারা দিতে অর্থাৎ পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিল। আমার নিকটে দোকানদারেরা আসিয়া বলিতে লাগিল যে তাহারা গাঁট বাঁধিয়া মোহর লাগাইয়া দিতে প্রস্তুত। তাহারা নিজেদের মধ্যে কমিটিও তৈরি করিয়া লইল। দুই চারি-দিনের মধ্যে সেখানেও সব বিদেশী বস্ত্র বাজার হইতে উঠাইয়া গাঁটের মধ্যে

মোহরবন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল। বীপুরের ঘটনার ফল হাতে হাতেই ফলিল। বিনা পরিশ্রমে সেখানে একাজ হইয়া গেল।

আমাদের সঙ্গে বীপুর গিয়াছিলেন—অ্যাসেম্‌বলীর সদস্য অনন্ত প্রসাদ ও কমলেশ্বরী সহায়। ভীড়ের গোলমালে তাঁহাদেরও খানিকটা ধাক্কা তো নিশ্চয়ই লাগিয়া থাকিবে, ঠিক পুলিশের সামনে পড়েন নাই বলিয়া তাঁহারা ঠিক লাঠির চোট হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিলেন। তাঁহারাও সেখান হইতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ফিরিলেন। তাঁহাদেরও মত ইহাই ছিল যে লাঠি একেবারে বিনা কারণে চালানো হইয়াছিল। কারণ লাঠি চালাইবার পূর্বে ভীড় হঠিতে শুরু হইয়াছিল। দুই চারি মিনিটের মধ্যেই লোকেরা যেখানে সেখানে চলিয়া যাইত। আমাদের উপর প্রহার হইয়াছিল আরও অকারণে। এই-জন্য তাঁহারা তাঁহাদের পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিলেন। আজ ঠিক মনে নাই, কিন্তু হয়তো অন্য কেহ কেহও এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়া পদত্যাগপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

আর একটা কথা হইল সবচেয়ে বিচিত্র। পুলিশের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল। কেহ কেহ সুপারিনটেনডেণ্টকে অভ্রান্ত বলিয়া ভাবিত ও খুব লাঠিচালনা করিত। কিন্তু এমনও কেহ কেহ ছিল যাহারা লাঠিমারা ভুল মনে করিত আর হুঁশিয়ার হইয়া হাত চালাইত। আমাদের উপর যেসব লাঠি পড়িয়াছিল তাহা দ্বিতীয় দলের সিপাহীর লাঠি, প্রথম দলের নয়। সুপারিনটেনডেণ্ট আগে আগে যাইতেছিলেন, ইহারা তাঁর পিছনে পিছনে চারিদিকে লাঠি আস্ফালন করিয়া যাইতেছিল। যখন লাঠির চোটে আব্দুল বারি প্রায় সেখানেই বেহুঁস হইয়া পড়িয়া যান, তখনও একজন সিপাহী তাঁহাকে মারিতে আবার লাঠি তুলিল। সে ভূপতিত অজ্ঞান বারি সাহেবের উপর লাঠি মারিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আর একজন সিপাহী নিজের লাঠি দিয়া তাহার লাঠি থামাইয়া দিল। তৃতীয় একজন সিপাহী তো বারি সাহেবের আততায়ী ঐ সিপাহীকেই এক লাঠি মারিল। এইভাবে পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে দুই দল সামনে বাহির হইয়া গেল, আর আব্দুল বারি ঐ সাংঘাতিক চোট হইতে বাঁচিয়া গেলেন। একথা স্বয়ং আব্দুল বারি সাহেব আমাদের বলিয়াছিলেন।

আমরা যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন প্রায়ই গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম। সেখানে পরের দিন কয়েকজন লোকের সঙ্গে ঘাটে দেখা হয়, তাহারাও স্নান করিতে আসিয়াছিল। তাহারা সব কাহিনী শুনাইল, তাহারা পরের ঘটনাও বলিয়া দিল। তাহারা পুলিশের ঐ দ্বিতীয় দলের লোক, যাহারা আব্দুল বারির উপর পরবর্তী আক্রমণ বন্ধ করিয়াছিল। তাহারা বলিল—"যখন আমরা দেখলাম যে আমাদের সেই সঙ্গী যাকে

আমরা লাঠি মারতে দিই নাই ও যার উপর আমরা নিজেরা লাঠি মেরে-ছিলাম সে সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে নালিশ করবে, তখন আমরা তাড়া-তাড়ি দৌড়ে গেলাম ও আমরাই প্রথমে নালিশ করে দিলাম যে ও-দলের লোকেরা লাঠি চালাতে জানে না। ভীড়ের উপর লাঠি না চালিয়ে নিজেদের লোকেদের উপর লাঠি মারে, এজন্য পুলিশের কেউ কেউ লাঠি খেয়েছে। আমরা এসব কথা বলতে বলতে অন্য দলের লোকেরা পেঁাছে গেল। তারা সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে নালিশ করল যে আমরাই তাদের উপর লাঠি চালিয়েছি।" পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট দুপক্ষের কথা শুনিয়া সেখানে কিছু করিলেন না। তাহাদিগকে সোজা ভাগলপুরে পুলিশ লাইনে পাঠাইয়া দিলেন।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনা। পুলিশ ইনস্‌পেক্টার ছিলেন ছাপরার লোক। তিনি স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন। আমরা দুজন চার বৎসর পর্যন্ত একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম। একসঙ্গে এনট্রান্স পাস করিয়াছিলাম; তারপর আমি গেলাম কলিকাতায় পড়িতে, আর ইনি পুলিশের চাকরিতে ভর্তি হইলেন। তখন হইতে দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু ইনি যে পুলিশে কাজ করিতেছেন তাহা জানিতাম। এখন তাঁহাকে দেখিলে বুড়ো বলিয়া মনে হইল। চুল প্রায় সাদা। ওদিন যখন আমরা ঘাসের উপর পড়িয়াছিলাম তখন ইনি সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আসেন পটলবাবুকে গ্রেপ্তার করিতে। ইনি আস্তে আস্তে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমি প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। পরে খোঁজ করিলে তাঁহার নাম জানা গেল। আমি খাদিভাণ্ডারের এক কর্মী রামবিলাস শর্মাকে বীপুর পাঠাইলাম, সেখানকার পুলিশ অফিসারকে বলিয়া খাদি, সুতা, চরখা ইত্যাদি যা এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিল তাহা সব একত্র করিয়া আনিয়া ভাগলপুর ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবার জন্য। রামবিলাসের খুব বোলচাল, মেজাজও খোসমেজাজই বলা যাইতে পারে। সে শুনিয়াছিল, ইনস্‌পেক্টার আমার সহপাঠী। সেখানে পেঁাছিয়া দেখে যে ঐ ভদ্রলোকই ওখানকার "ইন্‌চার্জ"—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাঁহার সহিত দেখা করিল। খানিকটা কথাবার্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইনস্‌পেক্টার সাহেব সেখানকার ঘটনায় খানিকটা লজ্জাবোধ করিতেছেন। ইহার পর শর্মা আমার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিল যে আমি তাঁহার সহপাঠী, এবং ঐদিন তিনি নমস্কার করিবার পরও চিনিতে না পারার জন্য আমার বড় দুঃখ রহিয়াছে। তাঁহার সহিত রামবিলাস যেমন যেমন কথা বলিয়া যাইতেছিল তাঁহার মুখের রং-এরও তেমনই বদল হইতেছিল। তিনি শর্মাকে বলিলেন, এসব কথার উল্লেখ করবেন না। এই বলিয়া তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

সুবিধা বুঝিয়া রামবিলাস আর কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। আবার আমার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিল, আমার এজন্য বড়ই দুঃখ রহিয়াছে যে এতদিন পরে দেখা হইল তবু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে কোন কথাই হইতে পারিল না। ইহার পর তিনি রামবিলাসকে কথা চালাইতে বারণ করিলেন। রামবিলাস দেখিল, তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে।

আমি জানি, এপ্রকার ঘটনা অনেক জায়গায় হইয়াছে। আর একজন পুলিশ অফিসারেরও এ অবস্থা হইয়াছিল। তিনি রাত্রে আমার সহিত দেখা করেন। চোখ দিয়া জল পড়িতেছে—আমার পা জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন যে, ঐ জিলায় তিনি থাকিতে থাকিতে এমন ঘটনা হইল যে আমি লাঠি খাইলাম আর তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না! এই কথাও এখানে বলিয়া রাখি, ১৯৩৩ সালে জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহের জন্য আমি যখন পাটনা জেল হইতে হাজারীবাগ জেলে নীত হই তখন একজন পুলিশ ইনস্পেক্টার হাজারীবাগ রোড স্টেশন হইতে হাজারীবাগ পর্যন্ত পেঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। ইনি সেই ইনস্পেক্টার। কিন্তু তখন ছিল রাত্রিকাল। শীতের কাপড়ে তিনিও খুব গা ঢাকা দিয়াছিলেন, আমিও তাই। কিছু না বলিয়া তিনি লরির সামনের আসনে বসিয়া গেলেন। আমরা বসিলাম পিছনে। আর খুব ভোর থাকিতেই জেলের দরজায় পেঁছিলাম। আমরা নামিতে নামিতে তিনি কোথায় সরিয়া পড়িলেন। তিনি রাস্তায় কোথাও একটি শব্দও বলেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে চিনিতে পারি। জেলের দরজাতেও দেখিতে পাই নাই। জেলার আমাদের কাছে তাঁহার নাম বলে, আর ইহাও বলে যে সারা রাস্তা ইনি কোনপ্রকার আত্ম-গোপন করিয়া আসিয়াছেন। জেলারও ছিল ছাপরার লোক। সে আমাদের এক বন্ধুর ছোট ভাই। সেজন্য আমরা তাহাকে ছোটবেলা হইতে জানিতাম।

বীপুরের লাঠির প্রহারের পরও সত্যাগ্রহীর দল পূর্বের মত যাইতে-ছিল। হয় গ্রেপ্তার, না হয় প্রহার। যতক্ষণ গান্ধী-আরউইন চুক্তি না হইয়াছিল, আর কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ বন্ধ না করিয়াছিল, সে পর্যন্ত বরাবর একাজ চলিয়া আসিয়াছিল। পরে সত্যাগ্রহীদের বড় নির্দয়ভাবে মারিতে আরম্ভ করা হয়। একজন স্বেচ্ছাসেবক আজ পর্যন্ত আমাদের নিকট সাহায্যের জন্য আসিয়া থাকে। তাহাকে খুব মারা হইয়াছিল। পরে তাহার কানে সাইকেলের পাম্প লাগাইয়া এমনভাবে হাওয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে তাহার কানের পর্দা ছিঁড়িয়া যায়। তাহার কষ্ট সে আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছে।

১৯৩২ সালে যখন সত্যাগ্রহ আবার আরম্ভ হইল তখন গভর্নমেণ্ট বীপুরের আশ্রম বাজেয়াপ্ত করেন। চুক্তির সময় অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইহা ছাড়িতে রাজি হন নাই। জমির মালিক জমিটা কংগ্রেসকে লিখিয়া

দিয়াছিল। উহার উপর আমাদের আইনসংগত পুরা অধিকার ছিল। কিন্তু সরকারি কর্মচারীরা অন্য একজনকে খাড়া করাইয়া জমিটা লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা যখন নালিশের হুমকি দেই, তখন আশ্রম ফিরিয়া পাই। পুলিশ যখন আশ্রম দখল করিয়া লয়, তখন বাজেয়াপ্ত করার কোন হুকুম পাওয়া যায় নাই। পরেও উহা কখনও রীতি-মত বাজেয়াপ্ত হয় নাই। তাহা হইলেও তাহারা উহা ছাড়িতে চায় নাই। কাহাকেও দিয়া লেখাইয়া উহার উপর এক মিথ্যা দাবি করিয়া চলিতেছিল। সেখানেই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে সরকারি কর্মচারী আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার ও করাইবার জন্য যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এজন্য আমাকে তখনকার চীফ সেক্রেটারি মিঃ হেলেট (পরে যুক্তপ্রদেশের স্যার মরিস্ হেলেট)-এর সঙ্গে আর বিহারের লাটের সঙ্গেও দেখা করিতে

আমার গ্রেপ্তার হওয়া : ছাপরা জেলে অবস্থান

পাটনায় ফিরিবার পর বুঝিতে পারিলাম এখন আমাকে ধরিবার জন্য গভর্নমেণ্টের হুকুম হইয়া গিয়াছে। আমি আগের মতই নিজের ঘোরা-ঘুরি চালাইতে লাগিলাম। কয়েকটি জেলায় ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু কোথাও গ্রেপ্তার করিল না। পরে বুঝিলাম, আমি এক জেলা হইতে আর এক জেলায় বড় তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া যাইতাম। এজন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিজের উপর বিপদ ডাকিয়া আনিতে চান নাই। এভাবে আমি বাঁচিয়া চলিলাম। ইহার মধ্যে একদিন বিট্‌ঠলভাই প্যাটেল পাটনায় আসিলেন। তিনি অল্পদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লীর সভা-পতির পদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাই লোকদের মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। পাটনায় এক সাধারণ সভা করা হয়। মিঃ হাসান ইমাম তাহাতে খাদির জাঙিয়া ও নিমা পরিয়া আসেন। সেখানেই খবর পাওয়া গেল যে ঐদিন ভোরবেলায় পণ্ডিত মতিলালজীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি বুঝিলাম, এখন আমাকে গ্রেপ্তার করিতে দেরি হইবে না। যাইবার সময় হাসান ইমামের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলাম। তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন। বলিলেন, তুমি গ্রেপ্তার হলে কাজ বন্ধ থাকবে না। আমি ঐ সভার পরে বিট্‌ঠলভাই প্যাটেলকে বিহার হইতে বিদায় দিয়া নিজে ছাপরা জেলায় ঘুরিতে লাগিলাম।

এখানেও তিনদিনের কাজ ছিল। জেলার পশ্চিমভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বভাগ শেষ করিয়া পাটনায় পেঁাছিবার কথা। প্রথম রাত্রি কাটাইবার কথা ছিল জীরাদেঈতে। দ্বিতীয় রাত্রি কাটাইবার কথা ছিল ছাপরায়। তৃতীয় রাত্রে পাটনায় পেঁাছিবার কথা। দুদিন কাটিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিন কার্যক্রম শেষ করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। সন্ধ্যায় না পেঁাছিয়া রাত বারোটায় ছাপরায় পেঁাছিলাম। বিহার ব্যাঙ্কে পেঁাছিয়া জানিলাম, দাদা কোথায় গিয়াছেন, ছাপরায় নাই, আর পুলিশের লোকেরা প্রায় দশটা এগারোটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কে বসিয়া ছিল। আমি বুঝিতে পারিলাম, গ্রেপ্তারের জন্য খোঁজ করিয়া থাকিবে। আমি খাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া স্নানাদি শেষ করিয়া প্রায় সাড়ে আটটায় মোটরে করিয়া গরখা রওনা হইলাম। সেখানে প্রথম সভা হইবার কথা ছিল। পুলিশের লোকেরা সেকথা জানিতই। সেজন্য তাহারা গরখায় গিয়া আমার অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে পথ দিয়া আমার গরখায় যাবার কথা, সে পথের উপর একদল লোক দাঁড়াইয়া গেল। আমি ছাপরা শহরের বাহিরেও যাই নাই এমন সময় গরখার দিক হইতে একটা মোটরে করিয়া পুলিশের লোকেরা ফিরিয়া আসিবার বেলা আমাকে মীনা মহল্লায় দেখিতে পাইল। তাহারা ইশারা করিয়া আমার গাড়ি আটক করিল। আমাকে বলিল, আমার খোঁজে তাহারা প্রথম দিন হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের গাড়িতে উঠাইয়া লইল। তাহারা বলিল, ব্যাঙ্কে যদি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে হয় অথবা জিনিসপত্র লইতে হয় তবে ওদিক দিয়া যাইতে পারে। আমি ব্যাঙ্কে গেলাম। সেখানে বাড়ির লোকদের সহিত দেখা করিলাম। কিছু খাইয়াও লইলাম। এক আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া তাহাদের গাড়িতে আবার চলিলাম। তখনও শহরের লোকে জানিতে পারে নাই যে আমাকে সোজা জেলে লইয়া যাওয়া হইল।

আমার এই প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা। একবার আমি ছাপরা জেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ জেল কিংবা অন্য কোনও জেলের সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বেশি জানিতাম না। জেলে তখন প্রায় তিন চার শত সত্যাগ্রহী বন্দী ছিল। তাহারা জানিতে পারিল যে আমি ফটকের ভিতরে পেঁাছিয়া গিয়াছি। তাহারা জয়ধ্বনি করিতে করিতে ফটকের কাছে আসিয়া পড়িল। জেলার একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে ভিতরের দরজা খুলিল না। ইহার পরে লোকে আরও গোল করিতে লাগিল। আমি জেলারকে বলিলাম : আমাকে ভিতরে নিয়ে চলুন, সব শান্ত হয়ে যাবে। সে বলিল : যতক্ষণ এই লোকগুলি ফটকের কাছে থাকবে ততক্ষণ ফটক খোলবার নিয়ম নাই; তাই এরা যখন চলে যাবে

তখনই আমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি সত্যাগ্রহীদের কিছু বলিতে পারলাম না; কারণ ছোট জানালার ভিতর দিয়া কতদূর আর কথা-বার্তা হইতে পারে। আমি জানিতাম যে এই উৎসাহ কেবল অভ্যর্থনার জন্য, আমি ভিতরে গিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিলেই সব শান্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু জেলার এই কথা বুঝিতে পারিল না। খানিকটা দেরি করিয়া ফটক খুলিয়া সে আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। সকলে এইটুকুই চাহিতেছিল। সকলে আমার সঙ্গ লইল এবং আমার যেখানে থাকার কথা সেই পর্যন্ত পেঁছাইয়া নিজের নিজের জায়গায় চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে বাহির হইতে জয়ধ্বনি কানে আসিয়া পেঁছিল। সেখানকার জেলে এক দোমহল্লা বাড়ি আছে। তাহাতেও কিছু কিছু লোক থাকিত। তাহারা দেখিল যে এক প্রকাণ্ড ভিড় জেলের দিকে জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। সেই ভিড় ছিল বাহিরের রাস্তায়। জেলার আরও ঘাবড়াইয়া গেল। সে জেলের ওয়ার্ডার-দের ফটক হইতে বন্দুক ছুঁড়িতে হুকুম দিল। আমরা শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে গুলী বোধহয় ভরা হয় নাই, ফাঁকা আওয়াজ। কিন্তু কথা তো তা নয়। জেল একরকম শহরের মধ্যে। চারিদিকে রাস্তা। লোকেরা শুধু জেলের চারধারে মিছিল করিয়া ও ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া কাজ শেষ করিল। কিন্তু জেলার নিজে বিচলিত হইয়া অনর্থক বন্দুক ছুঁড়িতে বলিল। তবে ভাল কথা এই যে ফাঁকা আওয়াজ করা হইয়াছিল। শুনিলাম পরে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই খবর গিয়া পেঁছিল, তখন তিনি জেলারকে ধমক দিলেন যে খুব ভুল করা হইয়াছে—লোকেরা যদি বন্দুক ছুঁড়িতে দেখিয়া বিগড়াইয়া যাইত তাহা হইলে ফাঁকা আওয়াজ দিয়া তাহাদের কি করিয়া আটকাইতে পারিত, বিশেষত যখন সে পুলিশ অথবা ম্যাজিস্ট্রেটকেও খবর দিয়া রাখে নাই?

আমার প্রথম অভিজ্ঞতা বিচিত্র; কারণ পরে যখন অন্য সকলের সহিত নিজের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া দেখিলাম, তখন জ্ঞান হইল অন্য লোকের এরূপ অভিজ্ঞতা হয় নাই। ঐ সময় পর্যন্ত ছাপরায় কয়েদীদের শ্রেণী-বিভাগের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমার বিষয়ে কোনও বিশেষ নির্দেশও ছিল না। সেইজন্য আমি লোহার থালায় যাহা কিছু ওখানে পাইতাম তাহাই খাইতাম। বাড়ির লোকেরা খাবার পাঠাইয়াছিল; কিন্তু আমি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা খাই নাই। জেলার বলিতে চাহিল যে আমি যতদিন হাজতে থাকিব, ততদিন পর্যন্ত বাড়ির খাবার খাইতে পারি, কিন্তু ফটকে গিয়া খাইতে হইবে! আমি তো এমনিই অস্বীকার করিতাম, এই শর্তে অস্বীকার করিতে আরও বাধ্য হইলাম। পরের দিন দাদা ছাপরায় আসিয়া পেঁছিল। জেলেই মকদ্দমা হইল, মকদ্দমা পেশ করিবার সময় দাদা আসিয়া উপস্থিত। জেলার নিয়ম পালন করিতে এত কড়া-

কাড় করিত যে আমার বাড়ি হইতে আম আসিলে তাহাও ফটকের কাছে গিয়াই খাইতে হইবে বলিয়া খবর পাঠাইল। আমি তাহা করিতে অস্বীকার করিলাম। আমও ফিরাইয়া দিতে বলিয়া দিলাম। ততক্ষণ পর্যন্ত যে লোক আম লইয়া আসিয়াছিল সে ফিরিয়া গিয়াছে। আবার জেলার নিজে আসিয়া বলিল। তখন আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে জেলে একজন কয়েদী অন্য কয়েদীকে খাবার দিতে পারে না, এইজন্য বাহিরের জিনিসও আমাদের ভিতরে খাইতে দিত না। পরে জানিতে পারিলাম, ইহা তাহার মনগড়া নিয়ম, অন্য কোনও জেলে এরূপ হয় নাই।

যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমার মকদ্দমা পেশ করা হইল, তাঁহার সঙ্গে আমার পূর্ব হইতে পরিচয় ছিল। আমি যখন ওকালতি করিতাম তখন তিনি ছিলেন আমার মক্কেল। তাঁহার নিজের মকদ্দমায় আমি কাজ করিয়াছিলাম। ঘটনাচক্রে, ১৯৩৩ সালে আমি যখন পাটনায় গ্রেপ্তার হই, তখন তিনি পাটনার সব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। সেবারেও তাঁহাকেই আমার সাজার কথা শুনাইতে হইল। মকদ্দমায় কিছু বলিবার বা শুনিবার তো ছিল না, কোনও একটা দফা লাগাইয়া তিনি আমাকে ছয় মাস জেল সাজা দিলেন।

আমাকে ওখানেই রাখা হইবে, না অন্য কোথাও লইয়া যাইবে, তাহা কিছুই জানিতাম না। কিন্তু এইটুকু জানিতাম যে প্রদেশের প্রধান কর্মীদের হাজারীবাগ জেলে রাখা হইয়াছে। আমাকে সেখানেই রাখিবে না হাজারীবাগে পাঠাইবে, সেকথা জেলারও কিছু বলে নাই। এইভাবে পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময়ে ভোজন করিয়া আমি নিজেদের ওয়ার্ডের ছোট আঙিনায় একটা কুর্তা পরিয়া ও একটা গামছা হাতে লইয়া বেড়াইতেছিলাম। জেলার আসিয়া বলিল : ডিপুটি সাহেব ফটকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে সময় ওখানকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছুটিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার জায়গায় এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করিতেছিলেন। আমি ভাবিলাম, তিনিই বুঝি আসিয়া থাকিবেন। আমি গেলাম। ফটক খুলিয়া গেল। আমি যেমনি প্রবেশ করিলাম অমনি ডেপুটি সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দরজার দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। ওয়ার্ডার আমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া ভিতরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, দৌড়িয়া গিয়া বাহিরের দরজা খুলিল। খুলিতেই আর একজন ভদ্রলোক ভিতরে আসিলেন, ইনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ খাঁ। তিনি বলিলেন : আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : জিনিসপত্র ভিতরে আছে, গিয়ে নিয়ে আসব? তিনি বলিলেন : তার জন্য ভাববেন না, ওসমস্ত এসে যাবে। জেলের এক নিয়ম ইহাও ছিল যে পরনের কাপড়

ও বিছানা ছাড়া অন্য কিছু ভিতরে লইয়া যাইতে দিত না। এইজন্য সামান্য কাপড়চোপড় দরজাতেই ছিল। আমি টুপি বাহির করিয়া লইলাম ও তাহা পরিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মোটরে গিয়া বসিলাম। তাহার চারি-দিকে পর্দা লাগানো ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভারকে পশ্চিমদিকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন। কোথায় যাইতে হইবে সেকথা জিজ্ঞাসা করায় আমাকে বলিলেন :. পরে বলব। ছাপরা জংশন স্টেশন জেলের পশ্চিম দিকে। কিন্তু গাড়ি স্টেশনের সামনে আসিলে তাহা সেদিকে না ঘুরাইয়া তিনি সোজা পশ্চিমদিকে যাইতে বলিলেন। একটু পরে আমরা শহরের একেবারে বাহিরে পেঁছিয়া গেলাম। তখন তিনি পর্দা ফেলিয়া দিলেন। আমার নিকটে মাপ চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, এইভাবে হাঙ্গামা করিতে হইল বলিয়া তিনি দুঃখিত; আমাকে হাজারীবাগে যাইতে হইবে, তবে সোজা রাস্তায় নহে; ছাপরা-বারাণসী লাইনে সরযূনদীর ধারে 'মাঁঝী' নামে এক ছোট স্টেশন আছে, আমাকে তিনি সেখানে কাশীর গাড়ি ধরাইয়া দিবেন, সেখান হইতে আমাকে কাশীর রাস্তায় মোগলসরাইয়ে লইয়া যাওয়া হইবে, সেখান হইতে গ্রাণ্ডকর্ড লাইন দিয়া সোন-ইস্ট-ব্যাঙ্ক স্টেশন পর্যন্ত লইয়া গিয়া আমাকে গাড়ি হইতে নামানো হইবে; আমার জন্য রেলওয়ে পুলিশের এসিস্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের সেলুন লইয়া আসিতেছেন, কোনও কষ্ট হইবে না।

যাক, আমরা মাঁঝী স্টেশনে তাড়াতাড়িই আসিয়া পেঁছিলাম। অল্প-ক্ষণ পরেই ডেপুটি সাহেবও আমার জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া পড়িলেন। গাড়িও আসিল। আমি সেলুনে উঠিলাম। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে এইটুকু মাত্র বলিলেন যে, আমি যেন লোকদের নিজের পরিচয় না দিই। আমি বলিলাম, আমি নিজে কাকেও নিজের পরিচয় দেব না; কিন্তু যদি কেউ আমাকে চিনে ফেলে তো কি করব! তিনি ইহাতে হাসিয়া ফেলিলেন, আমরা দুইজনে ফুর্তি করিয়া রওনা হইলাম। রাত্রিকাল। আমাদের কামরা শেষ কামরার পিছনে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; এইজন্য কোনও যাত্রীও সেপর্যন্ত গিয়া পেঁছে নাই। খানিকটা রাত থাকিতেই আমরা কাশীতে পেঁছিলাম। সেখান হইতে মোটরযোগে মোগলসরাই। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে কিছু খাওয়াইবার জন্য তিনি আমাকে লইয়া গেলেন; কিন্তু আমি তখনও প্রস্তুত ছিলাম না। খানিকক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম। ততক্ষণে গাড়ি আসিয়া গেল। ইহার মধ্যে দুইচারজন লোক আমাকে চিনিয়া থাকিবে। খাওয়ার জন্য তিনি আম কিনিলেন। গাড়ি ছাড়ার পর আমি হাতমুখ ধুইয়া স্নানাদি শেষ করিয়া প্রাতরাশ সমাপ্ত করিলাম। সোন-ইস্ট-ব্যাঙ্ক স্টেশনে গয়া জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে এক মোটর গাড়িতে চড়াইয়া

এক ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে দিয়া হাজারীবাগ রওনা করিয়া দিলেন। সেখানে আমি বেলা একটার কিছু আগে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে রাখা হইল। বন্ধুরা যখন এই লম্বা-চওড়া যাত্রার কথা শুনিলেন তখন তাঁহারা খুব অবাক হইলেন। মিঃ খাঁ ছাপরাতেই জিজ্ঞাসা করিলে এইভাবে লইয়া যাইবার কারণ বলিয়াছিলেন—গভর্নমেণ্ট চান না যে ছাপরা, সোনপুর, পাটনা ও গয়া স্টেশনে লোকের ভিড় জমে ও সকলে দেখিতে আসে, এইজন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া এই রাস্তা বাহির করা হইয়াছে। সঙ্গের ইন্‌স্পেক্টরও বলিল যে রাস্তায় কোথাও মোটরগাড়ি দাঁড় না করাইবার হুকুম হইয়াছে, আর আরঙ্গাবাদে (গয়ায়) যেখানে বড় গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে সেখানে মোটরগাড়ি তাড়াতাড়ি লইয়া যাওয়ার হুকুম আছে। সেইমত কাজ করাও হইয়াছিল।

ছাপরা জেল হইতে আমি চলিয়া আসিলে জেলার যখন আমার জিনিসপত্র আনিবার জন্য ভিতরে গেল তখন লোকেরা বুঝিতে পারিল যে আমাকে সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে সকলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সঞ্চারিত হইল। কেহ কেহ ঘরে উঠিয়া চিৎকার করিতে লাগিল যে আমাকে কোন এক অজানা জায়গায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শহরের কেহ দৌড়িয়া বিহার ব্যাঙ্কে গিয়া দাদাকে খবর দিয়া আসিল। তিনি নিজের মোটরে করিয়া তাড়াতাড়ি ছাপরা স্টেশনে আসিয়া পাড়িলেন। সেখানে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে আমাকে কোনও গাড়িতে রওনা করা হয় নাই। তখন ধারণা হইল যে হয়তো আগের কোনও স্টেশনে গাড়িতে উঠানো হইবে। কিন্তু সোনপুরের দিকে না গিয়া আমাকে কাশীর দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, ইহা তিনি কি করিয়া জানিবেন। দাদা মোটরে করিয়া সোনপুরে গিয়া উঠিলেন। সেখানেও আমাকে না পাইয়া নিরাশ হইয়া আবার ছাপরায় ফিরিলেন। পরে যখন জানিতে পারিল যে আমি হাজারীবাগে গিয়া পৌঁছিয়াছি তখন আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন।

হাজারীবাগ জেলে

হাজারীবাগ জেলের জেলার বাবু নারায়ণ প্রসাদ আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। তাঁহার এক বড় ভাই ছিলেন আমার স্কুলের সঙ্গী, তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার বাড়িতে কখনও কখনও যাইতাম, তিনি খুব কার্যকুশল ও বিচারশীল জেলার ছিলেন। রামদয়ালুবাবু, শ্রীবাবু, বিপিন-

বাব্ প্রভৃতি যেখানে থাকিতেন আমাকেও তিনি সেইখানে স্থান দিলেন। জেলখানায় খানিকটা পড়াশ্নায় ও স্তাকাটায় আমার সময় চলিয়া যাইত। পরে স্পারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর আয়েঙ্গারকে বলিয়া যেখানে কাপড় ও নেওয়ার বোনা হইত, সেই কারখানায় বোনাইয়ের কাজ করিতে লাগিলাম। এই পাঁচ-ছয় মাসে আমি প্রায় ২ শত গজ নেওয়ার ও ১৪।১৫ গজ কাপড় ব্নিয়াছিলাম। কিন্তু এই কাপড় চরখার স্তার নয়, জেলের ছিল, এই-জন্য উহা সেখানেই ছাড়িয়া আসিলাম। কিন্তু আসিবার সময় নেওয়ারের দাম দিয়া কিনিয়া আনিলাম। আমি জ্লাই-এর প্রথম সপ্তাহে গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম, এবং ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া ম্ক্তি পাই, সময় কাটিতে দেরি হয় নাই।

ইহার মধ্যে শ্রীয্ক্ত দীপনারায়ণ সিংহও পেঁছাইয়া গেলেন। তিনি আমাদের সঙ্গেই একই ঘরে থাকিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বামী ভবানী-দয়ালও ওই ওয়ার্ডে থাকিতেন। অন্য ওয়ার্ডে যেসব বন্ধ্ থাকিতেন তাঁহারা জেলারের অন্মতি লইয়া সর্বদা আমাদের কাছে আসিয়া দেখা করিতেন, অথবা আমরাই তাঁহাদের ওয়ার্ডে গিয়া মেলামেশা করিতাম, কোনও কিছ্রই বাধা ছিল না। বইয়ের সম্বন্ধে কিছ্ বাধা ছিল। প্লিশ অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের পাস করা ছাড়া কোন বই-ই আমরা পাইতাম না। যাঁহারা পাশ করিতেন, সেসব ভদ্রলোক বিশেষ কিছ্ লেখাপড়া জানিতেন বলিয়া মনে হয় নাই। যে যে বইয়ের নামে কোন মতে 'পলিটিক্স' বা পলিটিক্যাল শব্দ আছে তাহা কখনও পাস করিতেন না। যেসব বইতে এই শব্দটি না থাকিত, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যতই খারাপ হউক না কেন, পাস করিয়া দিতেন। উদাহরণস্বর্প সেখানকার এক মজার কথা শ্ন্ন।

কলেজে পড়ানো হইত এইরকম ইকনমিক্সের এক পাঠ্যপ্স্তক একজন চাহিয়া পাঠাইলেন। বইখানার নাম ছিল Text Book of Political Economy; কর্তারা তাহা নামঞ্জ্র করিয়া দিলেন, কারণ নামে Political শব্দটি ছিল। কিন্তু A. B. C. of Communism আর Theory of Leisured Class পাস করিতে তাঁহারা সংকুচিত হইলেন না! প্রথম বই-খানি জানি না কেন কি ব্ঝিয়া পাস করিলেন, অন্যটির সম্বন্ধে মনে হইল তাঁহারা ব্ঝিয়া থাকিবেন যাঁহাদের প্রচ্র অবকাশ আছে তাঁহাদের মনো-রঞ্জনের কথা ইহাতে লেখা আছে!

জেলে ভাবিলাম যে গান্ধীজীর লেখা অধিকাংশই তাঁহার সাপ্তাহিকের ফাইলেই পড়িয়াছি। যদিও মান্দ্রাজের প্রকাশক শ্রীয্ক্ত গণেশন্ সেই সমস্ত একত্র করিয়া প্স্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং তাহার আমি এক দীর্ঘ ভূমিকাও লিখিয়াছি, তাহা হইলেও আমার মনে হইল, এক এক

বিষয়ের সমস্ত লেখা যদি পৃথক পৃথক করিয়া ছাপা যায় আর প্রারম্ভিক ভূমিকায় ঐসব লেখার সংক্ষিপ্ত অর্থ দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়; পাঠক সেই সেই বিষয়ে তাঁহার বিচারধারা অল্পকথায় জানিতে পারিবেন, আর উহা সবিস্তরে তাঁহারই নিজের কথার সাহায্যে এক জায়গায় পড়িতে পারিবেন। এইজন্য আমি সেইসব লেখাগুলি কয়েকভাগে ভাগ করিলাম, যেমন অহিংসা, স্বরাজ, সত্যাগ্রহ, শিক্ষা, খাদি ইত্যাদি। আবার প্রত্যেক বিষয়ে ছোটখাট রচনা লিখিলাম, তাহাতে তাঁহার মতের সারাংশ ছিল। লেখাগুলি বাছিয়া লইলাম, কয়েকজন বন্ধু স্বতন্ত্রভাবে তাহার নকলও তৈয়ার করিয়া দিলেন। আমার ভূমিকাও সম্পূর্ণ হইল। এই সময় কারা-মুক্তি হইল।

উহা যে আর একবার দেখিয়া ছাপাইব, বাহিরে আসিয়া তাহার আর সময় পাইলাম না। গান্ধীজীর সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইরূপ করা কি তিনি পছন্দ করিবেন। তিনি অনুমতি দিলেন এবং ইহাও বলিয়া দিলেন যে, কে যেন গুজরাতীতে এইরকমই সংগ্রহ করিয়াছেন। আরও কয়েকজন বন্ধু ইহা পছন্দ করিলেন, বিশেষ করিয়া পুরুলিয়ার নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়, তাঁহার ইহা খুব ভাল লাগিয়া-ছিল। তিনি ভূমিকায় কিছু সংশোধনের কথাও বলিয়াছিলেন, আমিও তাহা মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু ১৯৩১ সালে এই জিনিসটি প্রেসে যাইতে পারিল না। ১৯৩২ সালে আমরা যখন আবার গ্রেপ্তার হইলাম তখন সদাকত আশ্রমও বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। সেই সমস্ত লেখা আর পাইলাম না। জানি না কোথায় তাহা রাখিলাম, আর কিভাবে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল!

জেলের ভিতর চরখা চালানো আর কাজকর্ম করা ছাড়া ধর্মগ্রন্থও অধ্যয়ন করা হইত। ছাপরার পণ্ডিত ভরত মিশ্র সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার নিকট বাল্মীকি রামায়ণের কথা ও পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্লের নিকট দুর্গা সপ্তশতীর কথা শুনিলাম। নিজে সর্বপ্রথমে প্রধান উপনিষদগুলির আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলাম।

উপরে বলিয়াছি, হাজারিবাগ জেলে সারা প্রদেশের প্রায় সমস্ত জেলার প্রধান প্রধান কংগ্রেসকর্মীদের পাঠানো হইয়াছিল। আমি বরাবর প্রদেশের সর্বত্র খুব ঘুরিয়া বেড়াইতাম। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীদের জানিতাম। কিন্তু জেলে যতদিন ধরিয়া একসঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, বাহিরে কখনও অতটা পাই নাই। সেখানে স্বামী ভবানীদয়ালের সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত একত্রে থাকিয়া পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। সেইসব দিনের এক সুমধুর স্মৃতি চিরকাল থাকিবে। মজঃ-ফরপুর জেলার ঠাকুর নবাব সিংহ পুরানা চালচলনের এক বয়োবৃদ্ধ ভদ্র-

লোক; যদি বলি ইংরাজি শিক্ষায় অনভিজ্ঞ, তাহা হইলে ভাল হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব গ্রামের অনেক লোকের উপর পড়িয়াছিল। বিহারে বিশেষ করিয়া গ্রামের লোকদের উপরই বেশি প্রভাব পড়িয়াছিল। পার্শ্ববর্তী সংযুক্ত প্রদেশে ইহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। সেখানে প্রভাব পড়িয়াছিল বেশির ভাগ শহরের উপর। চম্পারণে গান্ধীজীর কাজের সংগে গ্রামের লোক পরিচিত হইতে পারিয়াছিল। কৃষকেরা গ্রামেই থাকে, সেইজন্য তাহাদের মধ্যে গান্ধীজীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ওই প্রভাবে পড়িয়া ঠাকুর নবাব সিংহ শুরু হইতেই এই আন্দোলনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু একলা আসেন নাই। তাঁহার ছেলে, ভাইপো, নাতি সকলেই সংগে সংগে আসিয়াছিলেন। সীতামারি সাব-ডিভিশনে যাহা কিছু করিবার ছিল ঠাকুর নবাব সিংহের উপর তাহার ভার পড়িত। তিনি নেতৃত্ব করিতেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও তিনি এত বুদ্ধিমান ছিলেন যে সমস্ত কথা তিনি তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারিতেন। কংগ্রেসের আদেশ পালন করিতে ও করাইতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার ছেলের সংগে ঐ জেলেই ছিলেন। তাঁহাকে জানিবার সুযোগ ভাল করিয়া ঐখানেই পাইলাম। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের মতে দৃঢ় ছিলেন। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে গান্ধীজী ও অন্যান্য সকলের গ্রেপ্তারের পর যে গন্ডগোল শুরু হইল তাহাতেও তিনি সেই উৎসাহ, নির্ভীকতা ও দৃঢ়বিশ্বাসের সংগে যোগ দিলেন, যাহা লইয়া তিনি গোড়ায় আন্দোলনে নামিয়াছিলেন। সীতামারি নেপালের নিকটে; তিনি পুলিশের গোলমাল হইতে বাঁচিয়া কাজ করিবার জন্য নেপালের তরাইয়ে চলিয়া গেলেন। সেখান হইতেই কংগ্রেসের কাজ করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার অসুখ হয়, এবং জেলে থাকিতেই শুনিলাম যে তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে।

স্বামী সহজানন্দও জেলে ছিলেন। অনেকে তাঁহার নিকট গীতা পড়িত। আমারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি হইয়াছিল শ্রীযুক্ত নিবারণ দাশগুপ্তের সংগে। তিনি ছিলেন একজন সাধু প্রকৃতির পুরুষ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন মনে না করিয়া ধর্মের অভ্যুদয়ের এক উপায় বলিয়াও মনে করিতেন। তাঁহার নিকট আমরা পতঞ্জলি 'যোগসূত্র' পড়ি। সেখানে তাঁহার বিদ্যার এক গভীর গবেষণা শক্তির পরিচয় পাই। ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে তিনি কোনও প্রকারে নিজের জীবনকে ঐ সব শাস্ত্রীয় নিয়মমত গড়িতে চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন পরে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি এমন একস্থান শূন্য করিয়া গেলেন যাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই।

জেলে কয়েকটা বিষয়ে পরস্পরে বন্ধুভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হইত। কয়েকজন মিলিয়া 'বন্দী' বা 'কয়েদী' নামে হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা বাহির করে; অন্য দল 'কারাগার' নাম্ দিয়া আর একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিল, তাহাতে লিখিল যে 'কয়েদী' বা 'বন্দী' তো আসে, যায়, থাকে, বদল হয়; কিন্তু কারাগার তো স্থায়িরূপে থাকিয়াই যাইতেছে! এই সব সাময়িক পত্রে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে লেখা হইত। এক বিশেষ সংখ্যায় সমস্ত জেলার প্রধান কার্যকর্তাদের দিয়া নিজের জেলার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে লেখা হইল। আমার বিশ্বাস, উহাতে এমন অনেক কিছু উপাদান মিলিবে যাহাতে আন্দোলনের ইতিহাস লেখা যাইতে পারে। সেই বিশেষ সংখ্যা এখন কোথায় তাহা মনে নাই। এই সব পত্রিকার প্রধান প্রবর্তক ও লেখকদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী স্বামী ভবানীদয়াল, গাঙেগয়ার বাবু মথুরাপ্রসাদ সিংহ, রামবৃক্ষ বেনীপুরী আর উৎসাহী যুবক মহামায়া প্রসাদ। দুই একটি সংখ্যায় কিছু চিত্রও ছিল, তাহা আঁকিবার ও আঁকাইবার কৃতিত্ব গিধৌরের কুমার কালিকাপ্রসাদ সিংহের।

এইবার জেলে যাওয়ায় আমাদের জেল বলিয়া বিশেষ জ্ঞান বা বোধ হয় নাই; কারণ একে তো নিজেরাই এতজন ছিলাম যে অন্যদিকে মন বেশি যায় নাই। দ্বিতীয়ত, সাধারণ কয়েদীদের সঙেগ মিশিবার বেশি সুযোগও পাই নাই। আমাদের কাজ করিয়া দিবার জন্য যে-সব কয়েদী পাওয়া যাইত অথবা আমি যখন কারখানায় নেওয়ার বা কাপড় বুনিতে যাইতাম তখন সেখানে যে কয়জন কয়েদী কাজ করিত, তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইত, অন্যদের সহিত নহে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা আসিয়া মিশিত তাহাদের মধ্যে অনেককে ভালও মনে হইত। কোনও না কোনও কারণে তাহারা জেলে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাধারণ-ভাবে এমন কিছু নজরে পড়ে নাই, যাহার জন্য তাহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড উচিত হইয়াছে মনে হয়। ঐ বিষয়ে পরে যে অভিজ্ঞতা হইল, অন্য কোন উপলক্ষে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

প্রথমে আমরা কোনও খবরের কাগজই পাইতাম না। প্রয়োজন সকলেই খুব বোধ করিতাম। কিন্তু জেল এমন এক জায়গা যেখানে চেষ্টা করিলে সব কিছুই পাওয়া যায়। এই বিশেষ চেষ্টার জন্য লোকেরা এক বিশেষ শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহাকে 'তিকড়ম্' বলে। 'তিকড়ম্' দিয়া কেহ কেহ কখনও কখনও কোনও না কোনও সংবাদপত্র আনাইয়া লইত। উহা পড়িয়া ছাপানো খবর অন্যকে পেঁছাইয়া দিতে হইত। কয়েকদিন পরে এক ভদ্রলোক সকলের মত লইয়া কোথা হইতে খবরের কাগজ পাইয়া পড়িতেন এবং সকলকে খবর শুনাইয়া দিতেন। যখন খবর শুনাইতে

আসিতেন তখন সকলে উৎসুক হইয়া তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাঁহার স্মরণশক্তি এবং বলিবার ধরন এমন ছিল যে সকলে খুব খুশী হইয়া যাইত। কিছুদিন পরে গভর্নমেণ্ট সংবাদপত্র দিতে রাজি হইলেন। যেমন সরকারি সব কাজ হইয়া থাকে, লোক দেখাইবার জন্য বলা হইল খবরের কাগজ দেওয়া হইতেছে, কিন্তু আমরা সপ্তাহে একই সংবাদপত্র একবারই পাইতাম, তাহাও আবার স্টেটস্‌ম্যানের সাপ্তাহিক সংস্করণ! ইহা বিদেশের জন্য ছাপা হইত। তাহাতে বিশেষ করিয়া এরূপ আলোচনা থাকিত যাহা জানিবার জন্য আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই ব্যস্ত ছিল। তাহাতে শুধু এমন খবরই থাকিত যাহা জানিবার জন্য বিদেশী পাঠকেরই আগ্রহ বেশি থাকিবার কথা। তাহাও আবার আসিত আরও এক সপ্তাহ বাসি হইয়া। ভারতবাসীদের বিশেষ করিয়া সত্যাগ্রহীদের ঐ খবরে কোন লাভ ছিল না। রাষ্ট্রবিধানের রূপেই হউক অথবা অন্য কোনবিধ সংস্কার রূপেই হউক, ব্রিটিশ সরকার যে-সমস্ত সুবিধা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেন তাহার মধ্যে অধিকাংশেরই এই অবস্থা হইত। বলার মত একটা জিনিস তো দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাতে আসল জিনিস কিছু নাই, প্রকৃত তত্ত্ব নাই। এইসব আলোচনা লইয়া জেলে সময় কাটিত।

গোলটেবিল কনফারেন্স ও পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যু

ঐ সময়েই, আমার হাজারিবাগ পেঁ৷ছিবার কয়েক দিন পরেই, লণ্ডনে গোলটেবিল কনফারেন্স হইবার কথা উঠিল। সর্বপ্রথমে পণ্ডিত মতি-লালজীর সঙ্গে যে দেখা হইয়াছিল তাহার কথা মিঃ স্লোকোম্ব প্রকাশ করিলেন। তাহার পর স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীজয়াকর মধ্যস্থতা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যস্থতাতেই পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত জওহরলাল ও ডাক্তার মামুদের সঙ্গে—যাঁহাদিগকে নৈনী জেল হইতে পুণায় লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্য কোনও কোনও সভ্য ছিলেন—কথা হইল। কিন্তু সাত মণ তেলও পুড়িল না, রাধাও নাচিল না। হাজারিবাগ জেলে আমরা যে-কয়জন ছিলাম তাহাদের মধ্যে একটা জিনিস দেখিতে পাইলাম। সংবাদপত্রে যখন মীমাংসার কোনও খবর ছাপা হইত তখন আমরা উহা খুব উৎসুক হইয়া পড়িতাম ও সমস্ত বিষয় লইয়া নিজেদের মধ্যে খুব তর্ক করিতাম। মনে হইত, আমাদের মধ্যে অনেকে মীমাংসার জন্য ব্যগ্র। তবে

নিশ্চয়ই এবিষয়ে দৃঢ় ছিলেন যে, যতক্ষণ স্বরাজের বিষয়ে সন্তোষজনক কোনও মীমাংসা না হয় ততদিন বোঝাপড়া হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এমনও অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন যে গোলটেবিল কনফারেন্সে কিছু-না-কিছু সন্তোষজনক কথা হইয়া যাইবে, তাই এখন বেশি ঝগড়া না করিয়া ওখানে যাওয়াটা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। বোঝাপড়া যখন হইল না তখন এইসব লোকের তাহা খুব অপছন্দ হইল।

ডিসেম্বরে আমি জেল হইতে মুক্তি পাইয়া সোজা বোম্বাই গেলাম; কারণ তখন বোম্বাই-ই একপ্রকার আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে আজাদ-প্রাঙ্গণে সভা হইত, আর তাহা লাঠি দিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইত, অনেকে আহত হইত। সকলের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা ছিল কংগ্রেস-হাসপাতালে। ওখানকার তুলার বাজার অনেক দিন পর্যন্ত বন্ধ ছিল। অন্যপ্রকারেও সেখানকার লোকেরা আন্দোলনে খুব যোগ দিতেছিল। ওখানে গিয়া আমি সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিলাম। সরদার বল্লভভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হইল।

বিহারে চৌকিদারি টেক্স বন্ধ করিবার কাজ চলিতেছিল। গভর্নমেণ্ট তাহা কঠোরভাবে দমন করিতেছিলেন। যাহার দুই চার আনাও পাওনা ছিল, তাহার অনেক জিনিসপত্র নষ্ট করা হইত। যেখানে কোনও গ্রামের লোকে টেক্স বন্ধ করিত, সেখানে সমস্ত গ্রামই লুট করিয়া লওয়া হইত। আমি একটা গ্রামের কথা জানি, তাহা আমাদেরই জমিদারির অন্তর্গত ছিল। সেখানে পুলিশ গিয়া একজনকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে আর অন্য লোকদের খুব মারধর করে। আমি নিজে গিয়া আর একটা গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছিলাম; সেখানে ঘরে ঢুকিয়া ধান রাখিবার জায়গা ভাঙিয়া দিয়াছে, সমস্ত বাসনপত্র গুঁড়া করিয়া দিয়াছে, এমন কি চারপাইয়ের বুনট কাটিয়া দিয়া গিয়াছে, বাড়ির কাঠের খুঁটিও কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। একটি গাঁয়ের নিকটে শোনা গেল, পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর সেই গাঁয়ে না ছিল একটা ঘড়া না ছিল একটা রশি যে লোকে কুয়া হইতে জল তুলিয়া পিপাসা দূর করিতে পারে। অনেক গাঁয়ের এইরূপ অবস্থা। আমাদের অনুপস্থিতিতে অনেক জায়গায় গুলীও চলিয়াছিল। দমননীতি প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। গভর্নমেণ্ট যখন পরে দেখিলেন যে শুধু জেলে যাইতে লোকে ভয় পায় না, তখন জরিমানা করিতে শুরু করিলেন। জরিমানার মোটা মোটা টাকা আদায় করিতে গিয়া বাড়ির লোকদের খুব হায়রানি করা হইত, একজনের বদলে দশজনের জিনিসপত্র নষ্ট করা হইত। হাইকোর্টে কে-একজন আপিল করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে এমন একটা নির্দেশ পাওয়া গেল যে, হিন্দুর যৌথ পরিবারে একজনের দোষে সমস্ত পরিবারের যৌথধন নীলাম বা বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারিবে না।

ইহাতে খানিকটা বাধা পড়িল, তাহা হইলেও জরিমানা আর চৌকিদারি টেক্স না দেওয়ার জন্য যে লুটপাট হইত তাহাতে লোকদের মধ্যে আতঙ্কের ভাব ছড়াইয়া পড়িত। ইহা সত্ত্বেও আন্দোলন চলিতেছিল, কোথাও থামিয়া যায় নাই।

প্রায় এই সময়ে পণ্ডিত মতিলাল ছাড়া পাইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমি প্রয়াগে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গেলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও আন্দোলন চালাইবার ভার নিজের হাতে লইয়াছিলেন। আমি তাঁহার আদেশমত কাজ করিতাম। এই সময়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে গভর্নমেণ্ট বে-আইনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রাদেশিক এবং অন্যান্য বহু কমিটিও বে-আইনি হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অবৈধ হইয়া গেল, কিন্তু অনিয়মিত ভাবে আমরা বৈঠক করিতে পারিলাম। ওদিকে গোলটেবিল কনফারেন্সের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিছু কাজ আগাইল না। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এক বক্তৃতা দিয়া তাহা থামাইয়া দিলেন—তাহাতে গোল-গোল কথাই ছিল! জানা গেল যে, উঁহাদের ইচ্ছা কংগ্রেসকে কনফারেন্সে যোগ দেওয়াইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করা যাইবে। এই বক্তৃতার কিছু পূর্বেই পণ্ডিতজীর মতানুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সেইসব সভ্যকে প্রয়াগে ডাকা হইল যাহারা বাহিরে ছিল। সকলের নিকটে চিঠি পাঠানো হইল। ইহার কথা সংবাদপত্রে দেওয়া যাইতে পারে নাই, দেওয়াও হয় নাই। লাহোরে পুলিশ এক সদস্যের বাড়ি খানাতল্লাশ করিল। তাঁহার কাছে ঐ চিঠি পাওয়া গেল। এই কথা সংবাদপত্রে ছাপা হইল। আমরা তাহা দেখিলাম। ততক্ষণে মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ডের বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। আমরা ভাবিতেছিলাম যদি এই বৈঠক হয় তবে সকলকে এক সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হইবে, যেমন প্রথমে ওয়ার্কিং কমিটির ব্যাপারে হইয়াছিল। পণ্ডিতজী আজ্ঞা দিয়া-ছিলেন যে ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা আলোচনা করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অমুক দিনে প্রয়াগে হইবে। ওদিকে মালব্যজীও অসুস্থ অবস্থায় এই সময় ছাড়া পাইলেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইল।

নির্দিষ্ট দিন আসিল। ওয়ার্কিং কমিটির যে-সব সভ্য আসিতে পারিতেন, তাঁহারা প্রয়াগে পোঁছিয়া গেলেন। আমরা সকলে বুঝিয়া-ছিলাম যে, অবৈধ বৈঠকে সকলে গ্রেপ্তার হইয়া যাইবে, কিন্তু পণ্ডিতজী বলিতেন যে, যখন আমরা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতার বিষয় আলোচনা করিব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি তখন তাহারা গ্রেপ্তার করিবে না। হইলও তাহাই। সেই দিন রাত তিন প্রহর পর্যন্ত কথাবার্তা হইতে থাকিল।

আমরা এক সিদ্ধান্ত পর্যন্ত আসিয়া পেঁাছিলাম যাহাতে আমরা মিঃ ম্যাকডোনাল্‌ডের বক্তৃতা যথেষ্ট মনে করিলাম না এবং তাহা নামঞ্জুর করিলাম। পণ্ডিতজী তাঁহার অসুস্থ শরীরেও বরাবর কাজ করিয়া গেলেন, আমরা হাজার বলাতেও মানিলেন না। প্রস্তাব তৈয়ার হইয়া গেল। পণ্ডিতজীর মত হইল যে, উহা শীঘ্রই প্রেসে পাঠানো হউক; কারণ তাহা না করিলে লোকে একটা মীমাংসা হইতেছে মনে করিয়া ঢিলা দিবে। আমি বলিলাম যে, ইহা আর একবার দেখিয়া সকালে প্রেসে পাঠানো হউক। পণ্ডিতজী এইকথা মানিয়া লইলেন। ওয়ার্কিং কমিটির খবর ইংলণ্ডে পেঁাছিয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু আর শ্রীজয়াকরের তার ঐ রাত্রে আমাদের ঘুমাইবার পর পণ্ডিতজী পাইলেন, যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষে ফিরিতেছেন আর যে পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির কথাবার্তা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করা হয়। পরের দিন সকালে যখন আমি পণ্ডিতজীর সহিত দেখা করি, তখন তিনি তার দেখাইলেন আর বলিলেন যে, এখন ঐ প্রস্তাব খবরের কাগজে দিও না, শুধু এইটুকুই দিয়া দাও যে ওয়ার্কিং কমিটি তার পেঁাছিবার পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তার পাইয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা স্থগিত রাখিয়াছে। এ-সময়ে আমি প্রয়াগে প্রায় বরাবর স্বরাজ ভবনেই থাকিতাম।

এইসব কথার ফল হইল এই যে, গভর্নমেণ্ট ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত বর্তমান ও ভূতপূর্ব সভ্যকে মুক্তি দিলেন। যেদিন হইতে সত্যাগ্রহ শুরু হইল, ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বরদের গ্রেপ্তার করার পর তাঁহাদের স্থানে কোনও অস্থায়ী সভ্য করা হইত। এইভাবে গোড়ার দিকে অস্থায়ী সভ্যের সংখ্যা খালি হইয়া গিয়াছিল। সবশুদ্ধ ছাড়া পাইলেন। মুক্তি পাইয়াই গান্ধীজী প্রয়াগে গেলেন। সকলকে ডাকা হইল। সেখানে কথা শুরু হইল। পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছিল। জওহরলালজীকে ঐই জন্য মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যখন ভাবিলাম যে, ঐ অসুস্থ অবস্থায়ও পণ্ডিতজী বরাবর কাজ করিতেছেন এবং বার বার বাধা দেওয়াতেও তাহা মানিতেছেন না—বিশেষত যেদিন রাত্রে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনেকক্ষণ ধরিয়া হইতেছিল ও প্রস্তাব রচনা করিতে ও সংশোধন করিতে তিনি কত পরিশ্রম করিলেন—তখন আমি একথা বুঝিলাম যে পণ্ডিতজীর রোগ যদিও সাধারণ রোগ নহে এবং তাঁহার স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহাকে যদি এত বেশি পরিশ্রম করিতে না হইত তাহা হইলে হয়তো তাঁহার রোগ বাড়িত না এবং দেশ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তা হইতে আরও কিছুদিন পর্যন্ত লাভবান

হইবার সুযোগ পাইত। তাঁহার এই শেষ সময়ে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য আমার নিজের পক্ষে খুবই বেশি বলিয়া মনে করি। সে সময় তাঁহার ধৈর্য ও গাম্ভীর্য, মেধাশক্তি ও দেশপ্রেমের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি একমুহূর্তও দেশের বর্তমান আন্দোলন, তাহার অগ্রগতি এবং দেশের ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া আর কিছু ভাবিতেন না। নিজের স্বাস্থ্যকে আদৌ গ্রাহ্য না করিয়াই দেশোদ্ধারের চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন।

কলিকাতার কবিরাজ শ্রীশ্যামদাস বাচস্পতি আসিলেন, পরিশ্রম করিতে বারণ করিতে থাকিলেন, কিন্তু পণ্ডিতজী কি আর সেকথা শোনেন। পরিণামে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইল। একদিন চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে লখনউ লইয়া যাওয়া স্থির হইল। পণ্ডিত জওহরলাল আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া সেখানে গেলেন। পণ্ডিতজী এতখানি খোশমেজাজের ছিলেন যে তখনও ফূর্তি না করিয়া পারেন নাই। শরীর খানিকটা ফুলিয়া গিয়াছিল। যখন আমি তাঁহার যাওয়ার সময় প্রণাম করিতে গেলাম তখন হাসিতে হাসিতে তিনি সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিলেন—আমার চেহারা দেখ, আমি Beauty Competition-এ compete করতে যাচ্ছি। সকলে জোর করিয়া হাসিয়া উঠিল; কিন্তু সকলের মনে আশঙ্কা, হয়তো আর তাঁহার দর্শনলাভ হইবে না! হইলও তাহাই। লখনউয়ে পৌঁছিয়াই তাঁহার দেহান্ত হইল। আমি যেই তাঁহাকে লখনউ রওনা করিয়া দিয়া পাটনায় আসিলাম, অমনি এই দুঃখের সংবাদ পাইলাম। আমি ফিরতি গাড়িতেই আবার প্রয়াগে গেলাম; কিন্তু আমার পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহার শবের দাহকার্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

এই সময়ে পণ্ডিতজীর মৃত্যুতে সমস্ত দেশময় হাহাকার উঠিল, শোক উছলিয়া উঠিল। সমস্ত দেশে না জানি কত শোকসভা হইল। প্রয়াগে জনসাধারণের শোকসভায় আমিও যোগ দিয়াছিলাম এবং দুইটা কথাও বলিয়াছিলাম। কিন্তু দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা শব্দ দিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার অভাবের বোধ এইজন্য আরও পীড়া দেয় যে, ঠিক যে-সময় ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যেরা দেশের অবস্থা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চলিতেছিল বা চলিবে, এমনই সময়ে পণ্ডিতজীর দূরদর্শিতা ও নীতিনিপুণতা হইতে দেশ বঞ্চিত হইয়া গেল।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর গোলটেবিল কনফারেন্সের সদস্যগণের ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে দেখা হইল। সেখানকার অবস্থা সমস্ত তাঁহারা খুলিয়া বলিলেন। অন্য-সব বিষয় ছাড়া মহাত্মাজী এই কথাটার উপর খুব জোর দিতেছিলেন যে গভর্নমেণ্টের এই কথাটায় রাজি হইয়া যাওয়া উচিত যে. আন্দোলন দমন করিতে গিয়া তাঁহাদের কর্মচারিগণ যে সব বাড়াবাড়ি করিয়াছেন সে-বিষয়ে এক নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী তদন্ত করে। কিন্তু লর্ড আরুইন এ-কথা শুনিতেও চান না। প্রয়াগে এমনই মনে হইল যে, কথা আর অগ্রসর হইবেই না, এখানেই ব্যাপার সব শেষ হইয়া যাইবে। মহাত্মাজীও নিজের কথাটা ধরিয়া রহিলেন। ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হওয়ার কথা চলিতে থাকিল; কিন্তু যতক্ষণ গান্ধীজী নিজের দাবি না ছাড়েন, ততক্ষণ তাহা হইবার নয়। শেষে একদিন গান্ধীজী নিজের দিক হইতে ভাইসরয়ের নিকট পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সময় চাহিলেন। ইহাতে দেখা সাক্ষাতের পথ খুলিয়া গেল। দিল্লীতে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হিসাবে আমাদেরও ডাকা হইল। আমিও গিয়া ডাঃ আনসারির বাড়িতে উঠিলাম, অন্যেরাও সেখানে উঠিয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি দিন ধরিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে রোজ দেখা হইতে লাগিল। কখনও কখনও তো গান্ধীজী সমস্ত দিন ভাইসরয়ের বাড়িতে থাকিয়া যাইতেন, কখনও কখনও অনেক রাত্রি কাটাইয়া ফিরিয়া আসিতেন। যেদিন ওখানেই থাকিয়া যাইতেন, সেদিন মীরা বহিন তাঁহার খাবার লইয়া যাইতেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মহাত্মাজী আমাদের সকলকে একত্র ডাকিয়া সেখানকার কথাবার্তার সারাংশ বলিয়া আমাদের মত লইতেন। যেদিন রাত্রে দেরি করিয়া আসিতেন আর আমরা ঘুমাইয়া পড়িতাম, সেদিনও সকলে তখন আবার উঠিয়া তাঁহার নিকটে সব কথা শুনিয়া লইতাম।

আন্দোলনে গুজরাতের কৃষকদের অনেক জমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল; সরদার বল্লভভাই প্যাটেল এই কথাটা জোর করিয়া ধরিয়া রহিলেন যে, সব ফিরাইয়া দেওয়া হউক। বোম্বাই সরকার এই কথায় রাজি ছিলেন না। শেষে, এ-বিষয়ে তদন্ত করা হইবে বলিয়া মীমাংসা হইল। লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল। মহাত্মাজী ইহার উপর খুব জোর দিতেছিলেন যে এ-বিষয়ে গরিবদের যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া চাই। পণ্ডিত জওহরলালজী এ-সমস্ত কথাবার্তায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল যে এই প্রকার

চুক্তিতে দেশ পিছনে পড়িয়া থাকিবে। অন্য সকলের মত ছিল এই যে, সন্তোষজনক শর্তে বোঝাপড়া হইলে ভাল, খারাপ নয়। মহাত্মাজী রোজ সকালে বেড়াইতে যাইতেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম। একদিন আমি বলিলাম, এমন উপায় করুন যাহাতে বোঝাপড়া একটা হইয়া যায়, কিন্তু এমনভাবে বোঝাপড়া হয় যে, আমাদের হার বলিয়া মনে না হয়, জিত বলিয়াই মনে হয়। মহাত্মাজী হাসিয়া বলিলেন, বোঝাপড়ায় হারজিতের কথা অল্পই মনে হইবে—যদি জিত হয় তবে বোঝাপড়া যেমনই হউক, তাহা জিতই থাকিবে, আর লোকেও তাহা জিত বলিয়াই বুঝিবে; যদি হার হয় তবে উপর হইতে আমরা যাহাই বলি না কেন, আমরা হারিয়াই গিয়াছি, আর লোকেও তেমনি বুঝিবে। শেষে বোঝাপড়ার শর্ত যাহা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা লইয়া কয়েকদিন ধরিয়া খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা হইতে থাকিল। মহাত্মাজীকে ওদিকে লর্ড আরুইনের সঙ্গে তাহার প্রত্যেক শব্দ লইয়া আলোচনা করিতে হইত, এদিকে আমাদের সঙ্গে।

লর্ড আরুইন ও মহাত্মাজী দুইজনেই খুব সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার মুসাবিদা শেষে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। যখন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হইল তখন তাহার মধ্যে একটা কথা এমন ছিল যে, মহাত্মাজী তাহার মধ্যে অসত্যের গন্ধ দেখিতে পাইলেন। লর্ড আরুইনের সঙ্গে কথা বলিবার সময় তাঁহার ঐসব কথার যে ঐ অর্থ হইতে পারে তাহা মনে হয় নাই। যখন আমাদের সঙ্গে কথা-বার্তা হইতে লাগিল. তখন আমাদের মধ্যে কেহ ঐ বাক্যের এই নূতন অর্থ দিয়া কিছু আলোচনা করিলেন। শুনিয়াই মহাত্মাজীর কান খাড়া হইয়া গেল। তিনি প্রথম হইতে আবার পড়িলেন আর বলিলেন যে. এই অর্থও হইতে পারে। কিন্তু এই অর্থ হইলে কথাটা হইবে অসত্য। ইতিমধ্যে লর্ড আরুইন বিলাত হইতে বোঝাপড়ার ঐরূপে মঞ্জুরী আনাইয়া লইয়া-ছিলেন। মহাত্মাজী যখন গিয়া এই কথা তাঁহাকে বলিলেন তখন লর্ড আরুইনও বিপদে পড়িলেন। মহাত্মাজী কোনও প্রকারেই ঐরূপে তাহা স্বীকার করিতে পারিবেন না, কারণ তাহাতে অসত্যের গন্ধ আছে। শেষে লর্ড আরুইন ঐ কথাটা বদলাইয়া দিলেন এবং মহাত্মাজী এই সংশোধিত রূপে তাহা গ্রহণ করিলেন। কথাটার মীমাংসা হইয়া গেল। আমি তো বোঝাপড়ায় খুশি ছিলাম। পণ্ডিত জওহরলালজী ছাড়া প্রায় সকল সদস্যই খুশি ছিলেন। পণ্ডিতজীর খুব দুঃখ হইয়াছিল। মহাত্মাজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না।

এ-পর্যন্ত সত্যাগ্রহ স্থগিত করা হয় নাই। বোঝাপড়ার কথাবার্তা চলিতেছিল, সত্যাগ্রহও চালু ছিল। কথাবার্তা চলিতেছিল বলিয়া স্বভাবত সত্যাগ্রহের অগ্রগতিও মন্থর হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহার মধ্যে কয়েক

জায়গায় গুরুতর ঘটনা হয়। মহাত্মাজী ভাইসরয়কে সে-সব কথা জানাইয়াছিলেন। ভাইসরয় তাহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন বলিয়া কথাও দিয়াছিলেন। চুক্তিনামা সই করিবামাত্র ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত প্রদেশে আদেশ দিলেন যে সত্যাগ্রহ স্থগিত করা হউক। গভর্নমেণ্টও কংগ্রেস-কমিটির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লইলেন।

সেই সময়ে আমার ছোট ছেলে ধনুর বিবাহের কথা চলিতেছিল। তাহার জন্য দিনও ঠিক করা হইয়াছিল। দাদা এই মনে করিয়া সেই দিন স্থির করেন যে তাহার পূর্বেই লর্ড আরুইনের সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা হইবার তাহা শেষ হইয়া যাইবে এবং আমি বিবাহে যোগ দিতে পারিব। কিন্তু কথা বাড়িয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, ঐ দিনের মধ্যে কোনও মীমাংসা হইতে পারিবে না। আমি খবর পাঠাইলাম যে, যদি কথা ইতিমধ্যে শেষ হইয়া যায় তবে আমি যাইব, আর যদি না হয় তবে আমার জন্য অপেক্ষা না করিয়া নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ স্থির হউক। কিন্তু বিবাহের ঠিক দুইদিন পূর্বে চুক্তি সই হইয়া গেল। আমি সেইদিনই জীরাদেঈ রওনা হইলাম। বরযাত্রীরা রওনা হইবার প্রায় পনেরো ঘণ্টা পূর্বে জীরাদেঈ গিয়া পৌঁছিলাম। চুক্তিনামার শর্তের মধ্যে সত্যাগ্রহীদের মুক্তিলাভের কথাও ছিল। এইজন্য আমি হাজারীবাগ জেলে ছিলেন এমন কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। কিন্তু কেহ আসিতে পারিলেন না। আমি কোনও প্রকারে বরযাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিলাম।

আমার মত এই যে, লর্ড আরুইন খাঁটি মনে চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে-সমস্ত কথার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে তাহা যেন ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা হয় এবং পূরণ করা হয়। চুক্তিপত্র সিভিল সারভিসের লোকেরা পছন্দ করিল না। তাহারা বাধা দেওয়ার জন্যই ইহার মীমাংসা হইতে এতটা সময় লাগিল। ভারতবর্ষে লর্ড আরুইন ও ইংলণ্ডে লেবার গভর্নমেণ্ট এই কথাটার উপর জোর দিয়া বোঝাপড়া করাইয়া লইলেন। আমরা আশা করিতেছিলাম যে কথাটা একবার ঠিক হইয়া গেলে সমস্ত কাজকর্ম ঠিকভাবে চলিবে, আমরা স্বচ্ছন্দভাবে গঠনমূলক কার্য করিতে পারিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত লর্ড আরুইনের সময় শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শীঘ্রই, একমাস দেড় মাস পরেই, চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল। তাঁহার স্থানে লর্ড উইলিংডন ভাইসরয় হইয়া আসিলেন। তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্নর ছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁহার খুব পূর্বের পরিচয় ছিল। তিনি আসিয়া সিভিল সার্ভিসের সঙ্গেই যোগ দিলেন। তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছিতেই হাওয়া বদলিয়া গেল। বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল, খোলাখুলিভাবে তাহা তিনি

ভাঙিগতে চাহেন নাই, কিন্তু তাহার শর্ত পালনে সকল প্রকারের অসুবিধা হইতে লাগিল।

আমি স্বীকার করি, এই বোঝাপড়ার ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম কথা তো এই যে, এই প্রথমবার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় জনসাধারণের কোনও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙেগ কথাবার্তা কহিতে ও বোঝাপড়া করিতে প্রস্তুত হইলেন। আর একটা কথা এই যে, লবণের সম্বন্ধে গরিবদের অনেক কিছু সুবিধা পাওয়া গেল। তৃতীয়ত, কংগ্রেসকে গোল-টেবিল কনফারেন্সে গিয়া শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দিতে হইল। ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে-সব শর্ত শাসনতন্ত্রে রাখার কথা ছিল, তাহা ভারতের পক্ষেও হিতকর কি না, এখন এই দৃষ্টিতে দেখিবার ছিল এবং জনসাধারণের পক্ষে হিতকর হইলে তবেই তাহা মানিবার কথা। চতুর্থত, সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য এক কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু প্রদেশগুলির নিজেদের ব্যবস্থা করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, আর এই কেন্দ্রীয় তন্ত্রে দেশীয় রাজন্যবর্গও যোগ দিবেন। এইভাবে কয়েকটি প্রস্তাবের আভাস—অবশ্য ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবে—সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইজন্য আমি তো ইহার পক্ষপাতী ছিলাম এবং ইহাতে সন্তুষ্টও ছিলাম। আফশোস শুধু ইহাই ছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের দিক হইতে পূর্বের বহু ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির মত, ইহাও পালন করা হয় নাই।

করাচি কংগ্রেস

দিল্লীতে বোঝাপড়া হইয়া যাওয়ার পর কংগ্রেসের অধিবেশন করা স্থির হইয়া গেল। ঠিক হইল যে, মার্চের ভিতরেই করাচিতে অধিবেশন হইবে। সময় ছিল খুব কম। কিন্তু করাচির কর্মকর্তারা ব্যবস্থা করিবেন স্বীকার করিলেন। লাহোরে খুব ঠাণ্ডা ছিল বলিয়া স্থির হইল যে ডিসেম্বরে না হইয়া অধিবেশন ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে হইবে। এইজন্য যে অধিবেশন সাধারণত লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত ডিসেম্বরে হইত, তাহা এই বৎসর মার্চ মাসে হইলে নিয়ম-মাফিকই হইল। ঘটনাক্রমে বোঝাপড়া হইয়া যাওয়ার জন্য পথে যে বাধা ছিল তাহাও দূর হইল। সরদার বল্লভভাই সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্রের মকদ্দমার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহার

শুনানি অনেক দিন ধরিয়া চলিল। তাহার শেষ সিদ্ধান্ত এখন হইল। সরদার ভগৎসিংহকে তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীশুদ্ধ প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। অন্য সকলকে দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড অথবা দ্বীপান্তর দেওয়া হইল। অনশনে যতীন্দ্রনাথ দাশের মৃত্যুতে দেশে গোলমাল শুরুই হইয়াছিল। এখন এই ঘটনাতে আরও উত্তেজনার সঞ্চার হইল। বিশেষত যুবকেরাই এই মকদ্দমায় অভিযুক্ত ছিল। মকদ্দমার সংবাদ বহুদিন পর্যন্ত সংবাদপত্রে ছাপা হইতেছিল; কারণ অনেকদিন ধরিয়া মকদ্দমা চলিতেছিল। ইহাতে অনেক লোক এই মকদ্দমা সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া পড়িয়াছিল। সরদার ভগৎসিংহ খুব বুদ্ধির সঙ্গে মকদ্দমা চালাইয়াছিলেন, লোকের মনে তাহার প্রভাবও খুব পড়িয়াছিল। এইজন্য ফাঁসির কথা শুনিয়া সমস্ত দেশে ক্রোধ ছড়াইয়া পড়িল। মহাত্মাজী লর্ড আরুইনকে বলিলেন, ফাঁসির বদলে কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তরের বিধান করুন। লর্ড আরুইনের যাওয়ার সময়ও খুব নিকটে আসিয়াছিল; তিনি মহাত্মাজীর কথায় রাজি হইতে পারিলেন না; তিনি তো বোঝাপড়া করিয়াছিলেন নিজের সঙ্গী অফিসারদের মতের বিরুদ্ধে, এখন আর এই একটি কর্ম তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে করিতে পারিলেন না। মামলা এমনিতেই অনেক দিন ধরিয়া ঝুলিতেছিল। লোকদের আশা হইতে লাগিল, যদি ফাঁসি হইতে ইঁহারা বাঁচিয়া যান।

অবশেষে লর্ড আরুইন গান্ধীজীকে তাঁহার অক্ষমতা জানাইলেন; কিন্তু ইহাও বলিলেন যে, গান্ধীজী যদি চান তো কংগ্রেস না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত ফাঁসি স্থগিত রাখিবেন। হয়তো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, ফাঁসিতে ক্ষুব্ধ হইয়া কংগ্রেস যদি মীমাংসাটা অগ্রাহ্য করে অথবা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় কংগ্রেসের লোকেরা গান্ধীজীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। তিনি ইহা যাহাতে না-হয় তাহা চাহিতেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিয়া দিলেন, ফাঁসি হইতে তাঁহাকে মুক্ত যদি নাই করিতে পারেন তাহা হইলে যাহা কিছু করার তাহা কংগ্রেসের পূর্বেই করিয়া দেওয়া ভাল, কারণ সেরূপ না করিলে দেশ ও কংগ্রেসকে ধোঁকা দেওয়া হইবে। হইলও তাহাই। কংগ্রেসের অধিবেশনের ঠিক পূর্বে ফাঁসি হইয়া গেল। এই খবর সংবাদপত্রে ছাপা হইল। তাহার সঙ্গে ইহাও ছাপা হইল যে শবের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করা হয় নাই। ইহাতে লোকের মনে অত্যন্ত ক্ষোভের সৃষ্টি হইল। যুবকেরা গান্ধীজীর প্রতিও অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা বুঝিল না যে, গান্ধীজীর দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে তাহা তিনি করিয়াছেন, এবং যদি তিনি সরদার ভগৎসিংহকে বাঁচাইতে না পারিয়া থাকেন তবে ইহাতে তাঁহার কোনও দোষ নাই। করাচির পথে গান্ধীজীর সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করানো হইল। কোথাও বা লোকে কাপড়ের কালো ফুল, নিজের শোক ও ক্রোধ দেখাইবার জন্য,

গান্ধীজীকে দিতে লইয়া আসিল। তিনি ঐসব ফুল গ্রহণ করিলেন এবং নিজের দিক হইতে একটুও ক্রোধ অথবা অস্থিরতার চিহ্ন দেখাইলেন না।

করাচি কংগ্রেসেও এই প্রকার উত্তেজনা বরাবর থাকিল। ইহার অর্থ এই নয় যে, লোকে গান্ধীজীর প্রতি অনাদরের ভাব পোষণ করিত। সকালে সন্ধ্যায় খোলা ময়দানে যখন তিনি প্রার্থনা করিতেন, তখন সেখানে জনসাধারণের প্রকাণ্ড ভিড় হইয়া যাইত। তাঁহার দর্শনলাভের জন্য অন্যত্র যেমন সেখানেও তেমনি ভিড় হইত। কিন্তু লোকের মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা দেখাইবার এই এক পথ পাওয়া গেল, লোকে যাহাতে নিজের মনের ব্যথা প্রকাশ করিতে পারে। এই মনের ব্যথার এক বিশেষ কারণও ছিল। সরকার ভগৎসিংহ ও তাঁহার সঙ্গীদের বাহাদুরির জন্য তো ব্যথা ছিলই, তাঁহার বিরুদ্ধে ইহাও অভিযোগ ছিল যে, তিনি সেই ইংরেজ অফিসারকে মারিয়াছিলেন যে নাকি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় লালা লাজপত রায়ের বিরুদ্ধে লাঠি চালাইয়াছিলেন, যাহাতে শেষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, করাচির অধিবেশন উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

লাহোরেই স্থির হইয়াছিল যে, কংগ্রেস যখন ফেব্রুয়ারি-মার্চে হইবে, তখন তাহা সন্ধ্যার সময় হইতে পারিবে, আর সেজন্য পাণ্ডালের উপর ছাউনির প্রয়োজন হইবে না। এইভাবে খোলা ময়দানে আকাশের নীচে কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন। সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত বৈঠক হইত। দিনে বিষয়নির্বাচনী সমিতির বৈঠক ঘেরা পাণ্ডালে হইত। ইহাতে পাণ্ডাল তৈরি করিবার খরচ বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তাহার বদলে আলোর ব্যবস্থা খুব করিতে হইল। দৃশ্যটি ছিল খুব সুন্দর। তখন উহা একেবারে নূতন ছিল বলিয়া অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উৎসাহের সীমা ছিল না। সত্যাগ্রহের পরে ইহাই ছিল প্রথম অধিবেশন। লোকে একথা ভুলিতে পারিত না যে, সত্যাগ্রহের ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছে। এমন অনেক লোক ছিল যাহারা সত্যাগ্রহে বন্দী হইয়াছিল আর ঐ সন্ধিপত্রের জন্য যথাসময়ের পূর্বেই ছাড়া পাইয়াছিল। যদিও তখনও অনেকে ছাড়া পায় নাই, তাহাদের ছাড়া পাওয়ার বিষয়ে লেখালেখি হইতেছিল অথবা কোনও কারণে সরকার সন্ধির শর্তের মধ্যে তাহাদিগকে ছাড়া উচিত মনে করেন নাই। তাহা হইলেও বোঝাপড়া হওয়ার দরুণ যে-সব সত্যাগ্রহী মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহাদের অনেকে সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। লাহোর ষড়যন্ত্রে অভিযুক্তদের ফাঁসি ও সাজারও প্রভাব পড়িয়াছিল। এ-সকলের লক্ষণ সেখানকার তর্ক ও কথাবার্তায় ফুটিয়া উঠিত।

করাচিতে দুইটি প্রধান প্রস্তাব ছিল। এক প্রস্তাব তো বোঝাপড়ার

বিষয়ে, তাহাতে মীমাংসাটা গ্রহণ করা হইল। ইহা লইয়া প্রচুর বাদানুবাদ হইল। সময়ও ইহাতে অনেক লাগিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবের খুব গুরুত্ব ছিল। তাহাতে স্বরাজ পাইলে ভারতবর্ষের কর্মপদ্ধতির পরিকল্পনা বর্ণনা করা হইয়াছিল। ইহাতে একপ্রকার ভারতবাসীদের মৌলিক অধিকার (তাহাতে আর্থিক স্বতন্ত্রতার কিছু কথাও আসিয়া গিয়াছিল) সর্বপ্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে ঘোষণা করা হয়। নেহরু রিপোর্টে এই ধরনের কিছু কথা ছিল; কিন্তু এই পরিকল্পনা যতটা স্পষ্ট ও বিস্তৃত ছিল, বিশেষত আর্থিক বিষয় লইয়া, নেহরু রিপোর্টে ততটা ছিল না। এই প্রস্তাব রচনার কৃতিত্ব পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুরই। মহাত্মাজী ও সর-দার বল্লভভাই তাঁহারই কথায় রাজি হইয়া ইহা গ্রহণ করিলেন। ইহা ছিল একেবারে নূতন বিষয়, যাহার উপর বেশি আলাপ-আলোচনা হয় নাই। বিষয়নির্বাচনী সমিতির সামনেও তাড়াতাড়িতে এবং অধিবেশন শেষ হইবার সময়েই ইহা উপস্থিত করা হয়। সেখানে লোকদের অভিযোগ হইল এই যে, এত বড় সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্বে প্রতিনিধিদের ভাবনা চিন্তা করিবার জন্য পুরাপুরি সময় দেওয়া হয় নাই। এইজন্য কংগ্রেস প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটা কথা যোগ করিয়া দিলেন। কথাটা এই—এই প্রস্তাব লইয়া সমস্ত প্রাদেশিক কমিটি নিজেদের মতামত জানাইবে আর সে-সমস্ত আলোচনা করিয়া এক উপ-সমিতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ন্যায্য সংশোধন সমেত তাহা উপস্থিত করিবে, এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যথাযোগ্য সংশোধনের পর তাহার শেষ স্বীকৃতি দিবে।

করাচি কংগ্রেসে ইহাও স্থির হইল যে গভর্নমেণ্ট ডাকিলে গোলটেবিল কনফারেন্সে কংগ্রেসের প্রতিনিধিও যোগ দিবে। প্রতিনিধি কতজন হইবে এবং এ-বিষয়ে গভর্নমেণ্টের নিকট আমাদের কি দাবি হইবে, তাহা তখনও স্থির হয় নাই। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা তো হইয়াই গিয়াছিল, আর ভবিষ্যতের গঠন-প্রণালী কিরূপ হইবে, সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এবং করাচির প্রস্তাবের দ্বারা তাহাও খানিকটা স্পষ্ট করা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল যে, আর যাহা কিছু হইবে তাহার বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নির্দেশ দিবে। কথা-বার্তা চলিবার পর ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মাজীর মত গ্রহণ করিল—যদি পাঠাইতেই হয় তো কংগ্রেস যেন তাঁহাকেই নিজের প্রতিনিধিরূপে পাঠায়। সেখানে হাত বা ভোট গণিয়া কিছু হইবার জো নাই। যদি তাহারা কথা মানে তবে একজনই যথেষ্ট; যদি না মানে তবে প্রকাণ্ড দলও তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য করিতে পারিবে না।

করাচি হইতে ফিরিবার পর, যাহারা তখনও জেলে বন্দীভাবে ছিল সেইসব সত্যাগ্রহীদের মুক্তির জন্য পত্র লেখালেখিতে আমার অনেকটা সময় লাগিয়া গেল। এইরূপে নিজের নিজের প্রদেশে সকলকেই খুব লেখালেখি করিতে হইল। আপোসের শর্তের মধ্যে আমাদের তো শুধু সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা ছিল। আমরা এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া এবং সমস্ত সংশিলষ্ট কমিটির নিকট নির্দেশ পাঠাইয়া তাহা পালন করিলাম। কিন্তু সরকারের তো অনেক কিছু করিবার ছিল। লর্ড আরুইন চলিয়া যাইবার পর তাহা অনেকটা চাপা পড়িবার মত হইল। মহাত্মাজী এবং কংগ্রেসের সভাপতি সরদার বল্লভভাই প্যাটেল সমগ্র ভারতের বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। স্থানীয় সমস্যা লইয়া প্রাদেশিক কমিটির প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে লেখালেখি ও কথাবার্তা চলিতে থাকিল। মহাত্মাজীকে এ-বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে দেখাও করিতে হইল। আমাকেও নিজের প্রদেশে চিফ সেক্রেটারি মিঃ হ্যালেট ও প্রাদেশিক গভর্নর স্যর স্টিফেন্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। অনেক ব্যাপারে যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইলামও বটে। কিন্তু এই সমস্ত কাজে এতখানি সময় লাগিল ও এত ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইল যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। যাহা আমরা স্পষ্ট ও নিশ্চিত বলিয়া মনে করি তাহা কি ভাবে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আজ ইহার উদাহরণ মনে নাই; কিন্তু তখনকার সংবাদপত্র দেখিলেই এ-কথা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া যাইবে। উৎসাহ করিবার শুধু একটাই কারণ ছিল। পাটনা ক্যাম্প জেল এবং অন্যান্য জেল হইতে দলে দলে বন্দী মুক্তি পাইয়া সদাকত আশ্রমে আসিত, এবং এক রাত্রি বা কিছু সময় থাকিয়া আহারাদি করিয়া নেতাদের জয় ঘোষণা করিতে করিতে নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া যাইত। বাড়ি যাওয়ার রেল ভাড়া ইত্যাদি তো তাহাদের সরকারের নিকট হইতে মিলিত, কিন্তু প্রাদেশিক ভাণ্ডার হইতেও আমাকে কিছু সাহায্য দিতে হইত। স্বরাজের দেশভক্ত সৈনিকদের এই প্রবাহ মনের উদ্বেগকে খানিকটা শান্ত করিত।

কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল। তখন ইহাও এক প্রধান প্রশ্ন ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় কংগ্রেসের কি মনোভাব হইবে। কলিকাতা কংগ্রেসের পরেই বহু মুসলমান কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। সেই মুসলমানেরা পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করিয়া নিজেদের দাবি পেশ করিতেছিলেন। মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবি চালু হইয়া গিয়াছিল। গভর্নমেণ্ট যে গোলটেবিল কনফারেন্স ডাকিতে-ছেন তাহাতে যোগদান করিবার পূর্বে নিজেদের কথা তো পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে উক্ত অধিবেশনে আলোচনা হইল। আমি বোম্বাইয়ে পেণছিয়া অসুখে পড়িলাম। এইজন্য, যদিও আমি যে ঘরে ছিলাম তাহার পাশের ঘরেই বৈঠক হইতেছিল, তথাপি আমি যোগ দিতে পারিলাম না। সেখানে স্থির করা হইল যে, কংগ্রেস, মুসলমান ও সংখ্যালঘু জাতিদের সঙ্গে এইরূপ আপোসই করিতে পারে যাহা রাষ্ট্রীয় কল্যাণের বিরোধী নয়—যদি অন্য সব দল কোনও আপোস মানিয়া লয় তাহা হইলে কংগ্রেসও তাহা স্বীকার করিয়া লইবে। আপোসের প্রধান সিদ্ধান্তের বিবরণও সংক্ষেপে তাহাতে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ওয়ার্কিং কমিটির মুসলমান সভ্যেরা তাহা স্বীকারই করে নাই। তাহাদেরই প্রভাবে ওয়ার্কিং কমিটি উহা তৈয়ার করিয়া গ্রহণ করিল। তাহারা চাহিয়াছিল যে, যখন অন্য লোকেরা অনেক কিছু বলিতেছে তখন কংগ্রেসকেও নিজের মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, যাহাতে দেশের লোকে তাহা জানিতে পারে আর কংগ্রেস প্রতিনিধিরা যেখানে সুবিধা পাইবে সেখানে জোর করিয়া তাহা বলিতে পারে ও উপস্থিত করিতে পারে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইল, তাহাতে মৌলিক অধিকার লইয়া করাচিতে যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহার উপর আলোচনা হয়। সাব-কমিটি নিজের কাজ শেষ করিয়াছিল, সমস্ত প্রাদেশিক কমিটির সম্মতি পাইয়া নিজের রিপোর্ট তৈয়ার করিয়াছিল। কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হয় নাই। সাধারণ কিছু কথা জুড়িয়া মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব ঐ অধিবেশনে গৃহীত হইল।

ঐ সময়ে আর একটি ঝগড়া চলিতেছিল। রাষ্ট্রীয় ত্রিবর্ণ পতাকা কখনও বিধিমত মঞ্জুর করা হয় নাই; কিন্তু ১৯২১ সালেই ইহা প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। এই পতাকায় তিনটি রঙের কাপড় থাকিত। সকলের নীচে লাল, তাহার উপরে সবুজ, সকলের উপরে সাদা; মাঝখানে চরখার ছবি থাকিত। গান্ধীজী ও অন্যান্য সকলে তিন বর্ণের অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সকলে তাহা মানিয়া লইয়াছিল। লাল রং হিন্দুদের বুঝাইত, তাহাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলিয়া সকলের আধার স্বরূপ উহাই থাকিত সকলের নীচে। তাহার পরে মুসলমানদের সংখ্যা, এইজন্য লালের উপরে সবুজ রং বসিত। সাদা রঙে আর সকলে মিশিয়া ছিল; তাহাদের সংখ্যা হিন্দু ও মুসলমানের চেয়ে কম বলিয়া তাহা সকলের চেয়ে উপরে রাখা হইত। আমরা অহিংসার দ্বারাই স্বরাজ পাইতে চাহিতাম, তাই মাঝখানে

তাহার চিহ্ন চরখা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে শিখদের অসন্তোষ হইয়াছিল। তাহারা বলিত, তাহাদের জন্য এক পৃথক বর্ণ হওয়া উচিত, এবং পতাকায় তাহাদেরও স্থান দিতে হইবে। তাহারাও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের জাতি সংখ্যায় অল্প হইলেও জীবিত ও জাগ্রত জাতি। যদিও হিন্দু মহাসভা তাহাদিগকেও হিন্দুই মনে করে এবং ঐতিহাসিক বিচারেও তাহারা হিন্দু জাতিরই এক উপজাতি, তথাপি তাহারা নিজেদের পৃথক করিতে চাহিতেছিল। এই কথা আলোচনা করিবার জন্য এক সাব-কমিটি গঠিত হইল। তাহা এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিল এবং পতাকার রূপ পরিবর্তন করিয়া দিল। তাহাদের রিপোর্ট নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করিয়া লইল। পতাকা ত্রিবর্ণই থাকিল, কিন্তু তাহার রঙে ও রঙের স্থানে পরিবর্তন হইল। লাল রং উঠাইয়া দেওয়া হইল, তাহার জায়গায় সোনালি গেরুয়া রং দেওয়া হইল। সকলের নীচে সবুজ, তাহার উপরে সাদা, সকলের উপরে গেরুয়া। সাদা কাপড়ের উপর চরখার ছবি। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রংগুলির জাতি-গত যে অর্থ দেওয়া হইয়াছিল তাহা নাকচ করা হইল। এখন কোনও রং কোনও জাতিবিশেষের চিহ্ন থাকিল না। ইহাতে শিখেরাও রাজি হইয়া গেল। তাহাদের রং গেরুয়া। যদিও পতাকার সৌন্দর্যের জন্য তাহা গ্রহণ করা হইল, তথাপি তাহারা উহাতে খুব সন্তুষ্ট হইল। নূতন রাষ্ট্রীয় পতাকা দেখিতেও বেশি সুন্দর ছিল। এইজন্য, এই প্রস্তাবে দেশের শুধু এক যে সুন্দরতর রাষ্ট্রীয় পতাকা পাওয়া গেল তাহা নয়; বরং রঙের জাতিবিশেষ বুঝাইবার জন্য যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিষ্পত্তি হইল এবং সমস্ত দেশের সামনে কংগ্রেস বিধিমত নিজের প্রস্তাবের দ্বারা পতাকা উপস্থিত করিল।

এ-বৎসর আমি বিহারের বহু জেলায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। লোককে গঠনাত্মক কাজে লাগাইবার কথা মনে করিয়াই এবার গিয়াছিলাম এবং ইহাতে খানিকটা সফলকামও হইলাম। একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে লিখিয়া জানানো ভাল মনে করি। ১৯২১ সালে যখন সাঁওতাল পরগণায় গিয়াছিলাম, তখন সেখানে দমন-নীতি এত প্রচণ্ডভাবে পালন করা হইতেছিল যে, কোথাও থাকিবার জায়গা পাইতে অসুবিধা হইত। সেখানকার পাকুড় গ্রামের ঘটনার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এবার জেলার ভিতরে দূর-দূরান্তরের গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছিলাম। খুব আদর-অভ্যর্থনা পাইলাম। পাকুড়ে রাত ৯টায় রেলগাড়ি হইতে নামিলাম। সেখানে স্টেশনে লোকেরা দেওয়ালি সাজাইয়াছিল। আলোতে চারদিক ঝলমল করিতেছিল। খুব ধুমধামের সঙ্গে শহর পর্যন্ত মিছিল বাহির হইল। সেখানে বড় জমিদারদের বাড়িতে আমাকে রাখা হইল। তাঁহাদেরই মোটরে

চড়িয়া সমস্ত জেলা ঘুরিয়া আসিলাম। ১৯২১-এর ত্রুটির খানিকটা মার্জনা হইল, এ-কথাও তাঁহারা বলিলেন।

গোলটেবিল সভায় গান্ধীজী

গোলটেবিল কনফারেন্সের দিন কাছে আসিল। কিন্তু এ-পর্যন্ত আপোসের সমস্ত শর্ত পালন করা হয় নাই। বিশেষ করিয়া একটা কথার উপর সরদার প্যাটেল খুব জোর দিয়াছিলেন। গুজরাতের গ্রামে যে-সব জমি বাজেয়াপ্ত বা নিলাম করিয়া লওয়া হয় তাহার বিষয়ে তদন্তের কাজ এ-পর্যন্ত শুরু হয় নাই। সরকারের পক্ষ হইতে অনেক বাধা উপস্থিত করা হইয়াছিল। মহাত্মাজী পত্র লেখালেখি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছিল, মহাত্মাজীকে সেখানে কোনও না কোনও উপায়ে নিশ্চয় যাইতেই হইবে। আপোসের জন্য মহাত্মাজীকে সিমলাতেও যাইতে হইল। মনে হইতেছিল, এবারও বুঝি কংগ্রেস গোলটেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে পারিবে না। শেষে সকল কথাই মানিয়া লওয়া হইল। এতখানি দেরি হইয়া গেল যে, যদি মহাত্মাজী সেই সপ্তাহের জাহাজে না রওনা হইতেন তবে সেখানে পৌঁছিতে অনেক দেরি হইয়া যাইত। এইজন্য মহাত্মাজীকে সিমলা হইতেই সোজা বোম্বাই গিয়া জাহাজ ধরিতে হইল। জাহাজকেও তাঁহার জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। বিশেষ চেষ্টা করিয়া খুব অসুবিধার মধ্যে তাঁহাকে সিমলা হইতে বোম্বাই পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

গুজরাতে তদন্ত শুরু হইল। সরদার আমাকে সেখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গেলাম। বারদোলিতে তদন্ত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেসাই জনসাধারণের পক্ষ হইতে উকিলের কাজ করিতেছিলেন, সরকারের পক্ষে ঐ জিলার সরকারি উকিল ছিলেন। আমিও কখনও কখনও তদন্ত আদালতে যাইতাম। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এই পরীক্ষার কাজ চলিল। শেষে কয়েকখানি সরকারি কাগজ পেশ করিবার কথা উঠিল, তাহা পেশ করা হইল না, আর হাকিমও তাহা মানিয়া লইলেন। ভুলাভাই উহা ন্যায়বিচারের প্রতি আঘাত বলিয়া মনে করিলেন এবং তদন্তের সম্পর্কে কিছু করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহার পর সরকারের পক্ষের রিপোর্ট একতরফা হইয়া গেল। সরদারকে ঐ কাজে কিছু সাহায্য করিতে পারিব, এই ভরসায় আমি সেখানে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সাহায্যের তাঁহার

প্রয়োজনই হইল না। সেখানেই কাজ করিবার যথেষ্ট লোক ছিল। হাঁ, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁহার নিকটে যে-সংবাদপত্র আসিত অথবা তাঁহাকে যে-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার বিষয়ে কথাবার্তা হইত। আমি প্রায় দু সপ্তাহ সেখানে থাকিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিলাম। সেখানে থাকিতে থাকিতে আমি বিহারের সংবাদপত্রে কিছু লিখিয়াছিলাম তাহাতে মহাত্মাজীর চম্পারণ-যাত্রা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ ছিল।

মহাত্মাজী ইংলণ্ডে পেঁীছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি পেঁীছিতে না পেঁীছিতেই সেখানকার মন্ত্রিমণ্ডল বদল হইয়া গেল। এখন ওয়েজউড বেনের জায়গায় স্যর সামুয়েল হোর ভারত-সচিব হইলেন। কিন্তু ম্যাক-ডোনাল্ড নিজের দলের (লেবার পার্টি) অধিকাংশ লোক হইতে সরিয়া গিয়া প্রধানমন্ত্রী হইয়া থাকিলেন। যদিও এইসব দলের মন্ত্রিমণ্ডল নামের জন্যই হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল কনসার্ভেটিভ বা রক্ষণশীল দলেরই মন্ত্রিমণ্ডল। তাই উহা হইতে অল্পবিস্তর যে উদারতা আশা করা যাইত তাহারও পথ বন্ধ হইল। গান্ধীজী কংগ্রেসের দাবি পেশ করিলেন। তাঁহার খুব অভ্যর্থনা ও খাতিরও হইল। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য কোনও সন্তোষজনক শাসন-ব্যবস্থাই হইতে পারিল না। পণ্ডিত মালব্যজী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুও সেখানে আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। কংগ্রেসের দিক হইতে শুধু মহাত্মাজীই ছিলেন, আর উহার পক্ষ হইয়া তিনি বলিতেন। যেমন বরাবর হইয়া আসিয়াছে, অন্যসব লোক ছিল সরকারের বাছা বাছা। বাছিয়া বাছিয়া এমন লোক জোটানো হইয়াছিল যে, সকলের কখনও একমত হইতেই পারিত না। মহাত্মাজী খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন, একজনও কংগ্রেসী মুসলমানকে অন্ততঃ আহ্বান করা হউক, কিন্তু গভর্নমেণ্ট ইহাতে রাজি হইলেন না। হয়তো অন্য মুসলমান সভ্যেরা ইহাতে আপত্তি করিয়াছিল। সেখানে নিজেদের মধ্যে কলহের নিষ্পত্তির চেষ্টাও হইল কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। সেখানে হয়তো হইতেই পারিত না।

একতা তো হইল না, বরং তাহার বদলে ইংরেজ, মুসলমান ও হরি-জনদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইল। যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা মিটিল না তখন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে নিজের পরামর্শ দিলেন, তাহাতে মুসলমানদের প্রায় সমস্ত দাবি পূরণ করা হইল। তাহাতে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে খুব ক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ইহাতে হরি-জনদের জন্যও স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। মহাত্মাজী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি নিজে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এতদূর বলিয়া দিলেন যে, হরিজনদের জন্য যদি পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র স্থাপন করা হয় আর তাহাদের যদি বর্ণহিন্দুদের নির্বাচনে অথবা উহাদের নির্বাচনে বর্ণ-

হিন্দুদের যোগ দিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে এইপ্রকার স্বতন্ত্র নির্বাচনবিধির তিনি তীব্র বিরোধিতা করিবেন, এবং প্রাণ পর্যন্ত দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। ব্রিটিশ সরকারের তো কিছু করিবার ছিলই না, এইজন্য আমাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্র করিয়া রাখিল। এদেশ হইতে মুসলমান যাহারা গিয়াছিল তাহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল। তাহারা নিজেদের মধ্যে মত করিয়া আগা খাঁকে নেতা বাছিয়া লইয়া এক সম্মিলিত শাসনতন্ত্র তৈয়ার করিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু তাহাদেরও কোনও কথা শোনা হইল না। তখন, ইংরাজ যেমন চাহিতেছিল ঐরূপ শাসনতন্ত্রই করিবার জন্য তাহারা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লইল।

এদিকে ভারতবর্ষেরও অবস্থা দিন দিন খারাপের পথে চলিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, গভর্নমেণ্ট এমন কোনো অজুহাত খুঁজিতেছে যাহার আশ্রয়ে সন্ধির অভিনয় শেষ করিয়া, কংগ্রেসকে দিয়া তাহা বদলাইয়া লইতে চাহিতেছে। প্রথম হইতেই তো সিভিল সারভিসের মত ছিল এইরূপ। লর্ড উইলিংডনেরও এইরূপ উদ্দেশ্যই ছিল। এইজন্য এখন কোনও উপযুক্ত সুযোগেরই অপেক্ষা। প্রায় দুই বৎসর হইতে সমস্ত জিনিসের দামই কমিতেছিল—বিশেষত ধানের। এইজন্য কৃষকদের টাকা পাওয়া খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা খাজনা দিতে পারিত না, কারণ ফসল এত হয় নাই যে বেচিয়া খাজনা দিতে পারে, অথবা নিজের অন্যান্য দরকারি কাজ চালাইতে পারে। বিশেষত সংযুক্ত প্রদেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া যাইতেছিল। ১৯৩০-এর সত্যাগ্রহের সময় হইতেই চাষীদের অবস্থা খারাপ হইতেছিল, আর সেখানকার অনেক চাষী কংগ্রেসের নিকট আশা করিতেছিল যে কংগ্রেস তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিবে। কোথাও কোথাও, বিশেষ করিয়া এলাহাবাদ জেলায়, খাজনা-বন্ধের আন্দোলনও চলিতেছিল। সন্ধি হইয়া গেলে এখন খাজনা-বন্ধ থামাইতে হইত; কারণ আমাদের সর্বপ্রকারের সত্যাগ্রহ থামাইবার কথা। কিন্তু আসলে ওখানকার অবস্থা রাজনীতি লইয়া ছিল না, চাষীদের আর্থিক ব্যবস্থাই এত খারাপ ছিল যে যদি খাজনা দিয়া দিতে চাহিত তাহা হইলেও দিতে পারিত না। কংগ্রেস সত্যাগ্রহ তো বন্ধ করিয়া দিত, কিন্তু এই আর্থিক অসামর্থ্য দূর করিয়া তাহাদিগকে খাজনা দেওয়ানো কংগ্রেসের বা কাহারও ক্ষমতায় কুলাইত না। যদি খাজনা দিতে না বলে তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, মিলনের শর্ত ইহারা পূরণ করিতেছে না। এইজন্য সেখানে আবশ্যক হইয়া পড়িল, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা পৃথক করিয়া দেখা, খাজনা-বন্ধের আন্দোলন—যাহা ছিল সত্যাগ্রহের অঙ্গ—তাহা না চালাইয়া, চাষীদের আর্থিক অবস্থা অনুসারে, তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে লাভ হয়

তাহার জন্য চেষ্টা করা। কার্যত তাহাই করা হইল, কিন্তু গভর্নমেণ্ট কবে সে কথা শুনিবার পাত্র!

ওদিকে জমিদারও নিজের প্রাপ্য উশুল না করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার পাত্র নহেন। গভর্নমেণ্ট খাজনা কিছু মাফ করিলেন, কিন্তু তাহা এত কম যে তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। এ-ছাড়া চাষীরা যে অল্প-বিস্তর কিছু শোধ দেওয়ার চেষ্টা করিল ও দিল, তাহাদের পক্ষে তাহার ফল ভাল হইল না; কারণ যাহা বাকি থাকিল তাহার জন্য তাহাদের খেত বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং তাহাদিগকে নিজের নিজের জমি হইতে বঞ্চিত করা হইল। পূর্বের বকেয়া যেমনকার তেমন পড়িয়াই থাকিল। অনেক চেষ্টা করা হইল যে, আরও কিছু মাফ করাইয়া খাজনা কমাইয়া তাহাদের সাহায্য করা হউক। কিন্তু একে তো গভর্নমেণ্ট কিছু করিতেই রাজি নহেন, তাহাতে আবার রাজি হইলেও তাহা এত কম যে তাহাতে চাষীদের কিছু সুবিধা পাওয়া যায় না। পণ্ডিত জওহরলাল, শ্রীপুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন আর তখনকার প্রাদেশিক পদাধিকারী সভাপতি স্বর্গত তস্‌দাদুক আহমদ শেরওয়ানি যাহাতে কিছু হয় সেজন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। সফল হইবেন কি করিয়া? গভর্নমেণ্ট অন্য কিছু ভাবিতেছিলেন। যদি তাঁহারা কিছু করিতে চাহিতেন তাহা হইলে কংগ্রেসের আগ্রহে তাহা করিবেন না; কারণ তাহা হইলে চাষীদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বাড়িয়া যাইবে। সর্বপ্রকারে হারিয়া তাই সেখানকার প্রাদেশিক কমিটি স্থির করিল যে চাষীদের পরামর্শ দিবে যাহাতে নিজেদের অক্ষমতার জন্য খাজনা না দেয়। ইহাকে একপ্রকার খাজনাবন্ধের আন্দোলন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি বিনা এরূপ করিতে পারা সম্ভব ছিল না। তাই প্রাদেশিক কমিটি অনুমতি চাহিল।

ওদিকে বাংলা দেশেরও ভয়ানক অবস্থা। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সর্বদা বিপ্লবীদলের ভয়ে ভয়ে থাকিত আর এমনিতেই বিস্তর যুবককে জেলে বন্দী করিয়া রাখিত। গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে সত্যাগ্রহী বন্দীদের ছাড়িয়া দিবারই কথা হইয়াছিল, আর তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়ার কথাতেই অনেক বাধা ছিল। গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে নানা প্রকারের বাহানা বাহির করা হইত। বিপ্লবীদের কথা আর বলিব কি! ইহাতে তাহারা সকলে খুব ক্ষুব্ধ ছিল। ইতিমধ্যে হিজলি ক্যাম্প জেলে যেখানে বিপ্লবীরা নজরবন্দী কয়েদী ছিল, সেখানে এক ঘটনাও হইয়া গেল, যাহাতে জেলের ভিতরে গুলী চলিল, কিছু বন্দী আহত হইল, জনকয়েক বন্দী মারাও গেল। ইহাতে আরও উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চাটগাঁয়ে কোনও পুলিশ কর্ম-চারীকে একজন বিপ্লবী মারিয়াই ফেলিল। ইহা তো হিন্দু-মুসলমানের

কথা নয়, কারণ বিপ্লবীরা কয়েকজন হিন্দু পুলিশ কর্মচারীকেও মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা কোনও সরকারি কর্মচারীকে তাহার জাতি বা ধর্মের জন্য মারিত না, শুধু যাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করিত তাহাকেই মারিত, তা সে যে জাতির বা যে ধর্মের লোকই হউক না কেন। কিন্তু সেখানে ইহাকে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার রূপ দেওয়া হইল আর সেখানকার হিন্দুদের উপর খুব অত্যাচার করা হইল। ইহাতে ইংরেজ এবং এংলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পূর্ণ হাত ছিল।

এই সব কারণে বাংলাদেশে খুব গণ্ডগোল চলিতেছিল। গভর্নমেণ্টও নূতন অর্ডিন্যান্স জারি করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। প্রবীণ প্রসিদ্ধ কংগ্রেসী নেতা হরদয়াল নাগের সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হইল। সরদার প্যাটেল কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অ্যানে ও আমাকে সেখানে পাঠাইলেন। আমরা সম্মেলনে যোগ দিলাম এবং আমি বাংলায় বক্তৃতাও করিলাম। সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও এইরূপ এমন কিছু ভাল ছিল না। সেখানেও দমন নীতি কাজ করিতেছিল। এইভাবে যেমন যেমন গোলটেবিল কন-ফারেন্সের কাজ শেষ হইয়া আসিতেছিল তেমন তেমন এখানকার অবস্থা ক্রমশ আরও কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম যে এখন ব্যাপার আরও গড়াইবে এবং আবার ঝগড়া হইবে।

যখন ওয়ার্কিং কমিটির সামনে সংযুক্ত প্রদেশের আবেদন সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল, তখন আমরা নিজেদের গুরুদায়িত্ব অনুভব করিলাম। এখনও গান্ধীজী ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে খাজনা বন্ধ আরম্ভ করা আমাদের পক্ষে কতদূর উচিত হইবে, আর যদি উচিতও হয় তবে আমরা কত দূর তাহা চালাইতে পারিব, ইত্যাদি—প্রতি ক্ষণ কয়েকদিন পর্যন্ত আমরা আলোচনা করিতে থাকিলাম। আমার মনে সন্দেহ ছিল, সেখানকার জনসাধারণ খাজনা বন্ধ করার দরুণ যে অত্যাচার হইবেই তাহা কতদূর সহ্য করিতে পারিবে। বিহারে চৌকিদারি টেক্স এক মামুলী সাধারণ ব্যাপার, বৎসরে বারো টাকার বেশি তাহা কাহারও উপর ধার্য হইতে পারে না এবং সাধারণ গরিবদের উপর বৎসরে ছয় আনা কি বারো আনা ধার্য হয়—সাধারণ কৃষকের উপর এক টাকা দেড় টাকা কি তার চেয়েও কিছু বেশি অনুসারে ধরা হয়। ইহা বন্ধ করিলে যতখানি অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আমি গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়া নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এই সমস্ত যে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহার পর এখন এক বৎসরও কাটে নাই। খাজনা বন্ধ করিলে ব্যাপার বড় গুরুতর হয় বলিয়া আমার খুব ভয়। খাজনা বন্ধ হইলে জমিদার সরকারি মালগুজারি দিতে পারিবে না। তাহাতে গভর্নমেণ্টের আয়ের এক খুব বড় অংশ

আটকাইয়া যাইবে, গভর্নমেণ্টও নিজের কাজ চালাইতে গিয়া অসুবিধায় পড়িবে। এইজন্য ইহা বন্ধ করিয়া দিলে সরকারের পক্ষেও খুব সংগীন ব্যাপার হইবে। এই সমস্ত কারণে আমি বার বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, জনসাধারণ কতদূর পর্যন্ত দমননীতি সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। নিশ্চয় করিয়া তাহার তো কোনও উত্তর দেওয়া যায়ই নাই; কিন্তু সেখানকার ভাইয়েরা এ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, জনসাধারণ বহুদূর পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছে।

সরদার প্যাটেলের মত ছিল এই যে যখন স্থানীয় প্রাদেশিক কমিটি ও নেতারা সেখানকার অবস্থা বুঝিয়া বলিতেছেন যে, ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই, আর এজন্য যে দমননীতি হইবে তাহাও সহ্য করিবার জন্য জনসাধারণ প্রস্তুত বলিয়া মনে করেন, তখন আমরা নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যেরা কেমন করিয়া অনুমতি দিতে ইতস্তত করিতে পারি? শেষকালে অনেক ভাবনাচিন্তার পর, অনেক বাঁধাবাঁধির সঙ্গে অনুমতি দেওয়া হইল। তাহাও, এখন তাড়াতাড়ি খাজনা বন্ধ করিবার জন্য নহে, প্রস্তুতির জন্য। সরকার তো এজন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা অবিলম্বেই হাঙ্গামা শুরু করিয়া দিলেন। আসল কথা তো এই যে, ফসলের দাম এতই নামিয়া গিয়াছিল যে খাজনা দেওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকদিন পরে সেখানকার গভর্নর হেলী সাহেব এই কথাটা খোলাখুলি ভাবে স্বীকারও করিয়াছিলেন। তিনি এমনও বলিয়াছিলেন যে, যতদিন এই বিষম খাজনার আইনের মূলগত সংশোধন না হয়, ততদিন সমাজের সমস্ত গঠন বিশৃঙ্খল হইয়া থাকিবে। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেসকে দাবানোই ছিল কাজ; অন্য ধরনের হাঙ্গামা শুরু করিয়া দেওয়া হইল।

সরকারি চণ্ডনীতি

গোলটেবিল কনফারেন্সের কাজ শেষ হইতেই গান্ধীজী নিরাশ হইয়া ভারতবর্ষের দিকে রওনা হইলেন। তিনি যেদিন দেশে পেঁছিলেন সেই-দিন বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সকলে আপন-আপন প্রদেশ হইতে বোম্বাই রওনা হইয়াছিল। বাংলায় দমনচক্র চলিতেছিল। ইতিমধ্যে সীমান্ত-প্রদেশেও খান আবদুল গফর খান, ডাঃ খান সাহেব ও অন্যান্য নেতাদের একে একে গ্রেপ্তার করা হইল;

তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রদেশের বাহিরে নজরবন্দী করিয়া যেখানে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইলে। সংযুক্ত-প্রদেশে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন ও শেরওয়ানি সাহেবও গ্রেপ্তার হইলেন। আমরা যে গাড়িতে যাইতেছিলাম পণ্ডিত জওহরলালজীও সেই গাড়িতে বোম্বাই যাইতেছিলেন। ডাকগাড়ি প্রয়াগ হইতে সামান্য দূরে, এক ছোট স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সেখানে পূর্ব হইতে মোটর লইয়া পুলিশের লোকেরা আসিয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতজীকে সেখানেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমরা সোজা বোম্বাই চলিয়া গেলাম।

বোম্বাইয়ে মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার জন্য খুব আয়োজন ছিল। যেসব রাস্তা দিয়া তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল সে সকলের সমস্ত বাড়ি লোকের ভিড়ে আনাচে কানাচে পরিপূর্ণ। গলিগুলিও লোকে গিজ-গিজ করিতেছিল। কাহাকেও দেখিবার জন্য অন্য কোনও সময় এই ধরনের ভিড় কদাচিৎ দেখা যায়। গান্ধীজী নির্দিষ্ট স্থানে পেঁীছিলেই সমস্ত কথা তাঁহাকে বলা হইল। তিনিও বুঝিলেন যে গভর্নমেণ্ট এখন খোলাখুলিভাবে দমননীতি অনুসরণ করিতে চাহিতেছেন। ওয়ার্কিং কমিটির নিয়মমত বৈঠক বসিল। তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। গান্ধীজী ভাইসরয়কে তারযোগে প্রস্তাবের সারাংশ জানাইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাহিলেন। এইসব হইয়া গেলে আমরা সকলে নিজের নিজের জায়গায় যাইবার জন্য রওনা হইলাম।

আমি রওনা হইবার সময় যখন মহাত্মাজীর নিকটে শেষ বিদায় লইতে যাই তখন দেখিলাম মিঃ বেন্থল তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তিনিও গোলটেবিল কনফারেন্সে ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি মুসলমান ও ইংরেজের মধ্যে গাঁঠছড়া বাঁধার জন্য অনেকরকম কাণ্ডকারখানা করিয়াছিলেন। আমরা তো বুঝিয়াছিলাম যে, এখন কিছু হইবার নহে—খুব শীঘ্রই দমন চলিবে, কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া আবার সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে কাহারও ইচ্ছা ছিল না যে, সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়—না ছিল তাহার জন্য আয়োজন, না ছিল মানসিক তৎপরতা। হাঁ, আমাদের মাননীয় সঙ্গীদের গভর্নমেণ্ট অকারণে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রথম ভাইসরয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরকার ছিল। আর, যদি এইরূপই অনিবার্য হয়, তাহা হইলে কিছু করাও যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরিবার পূর্বেই এখানকার গভর্নমেণ্ট সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের দিক হইতে যুদ্ধও শুরু হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের আয়োজনের কিছু খবর আমরা প্রথমেই এদিক ওদিক হইতে পাইয়াছিলাম। এমন কি ডাঃ আনসারি এ-খবরও পাইয়াছিলেন যে, কোন্ প্রকার অর্ডিনান্স জারি

করা হইবে। তাঁহারা এই সব কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়াছিলেন। এখন তো ব্যাপার আরও স্পষ্ট হইয়া গেল।

বোম্বাই হইতে রওনা হইয়া আমি ভাবিলাম, এখন তো বিহারেও দমন হইবেই, এইজন্য আত্মীয়দের সংগে একবার দেখা করিয়া যাওয়া ভাল হইবে। ইটারসি জংশনে আমি কয়েকটা তার করিলাম, তাহাতে বিহার প্রদেশের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক পাটনায় করার কথা ছাড়া তাহাদের সভ্যদের নিমন্ত্রণও ছিল। পরের দিন সকালে যখন পাটনায় পেঁাছিলাম তখন মনে হইল সেখানে তো তার যায় নাই! সমস্ত তার গভর্নমেণ্ট বুঝি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন! তাহা হইলেও কেহ কেহ পাটনায় পেঁাছিয়া গেলেন। সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও আমরা করিয়া লইলাম। সেই রাত্রেই মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহার সংগে সরদার বল্লভভাই ও অন্য কয়েকজন কংগ্রেসের প্রধান নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসব বৃত্তান্ত আমরা খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, আর বুঝিয়াছিলাম যে আমাদিগকেও শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে। তাই আমরা পাটনায় পেঁাছিয়াই ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শেষ করিয়া লইলাম। সকলের জন্য নির্দেশ তৈয়ার করিয়া তাহা ছাপিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিলাম। এ-সমস্ত কাজ শেষ করিয়া যখন প্রস্তুত হইলাম, ততক্ষণে পুলিশ আসিবার ইংগিত পাইলাম, তখনও তাহারা সদাকত আশ্রম পর্যন্ত আসিয়া পেঁাছায় নাই, তবে আসিতেছে বটে। আমরাও গ্রেপ্তার হইবার অপেক্ষায় থাকিলাম। শ্রীযুক্ত রামদয়ালু বাবু, প্রফেসর আবদুল বারি, আরও দুই একজন সদস্য কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ত্রিহুতের কয়েকজন সদস্য দুপুরের স্টীমারে দীঘাঘাট পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু জেল হইতে বাহিরে থাকিয়া কংগ্রেসের কাজ করিতে থাকিব এই ধারণায় ওপারেই থাকিয়া গেলেন।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকজন সশস্ত্র সিপাই লইয়া আসিয়া উপস্থিত! তাহারা আসিয়া আশ্রম ঘিরিয়া ফেলিল। আমরা যে দুই চার জন আসিয়া বসিয়াছিলাম, তাহাদের তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমরা কি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক করিতেছি। আমরা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিলাম যে সে কাজ হইয়া গিয়াছে, অনেক সদস্য এখানে ওখানে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেখাইল, তাহাতে কংগ্রেস কমিটি ও তাহার সকল শাখাই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। পুলিশ প্রথমে তো টেলিফোন নিজেদের দখলে করিয়া বসিল। তাহার পরে রাষ্ট্রীয় পতাকার স্থানে নিজেদের—ব্রিটিশ সরকারের—পতাকা লাগাইয়া দিল। তাহার পর সেখানকার খানাতল্লাশী শুরু হইল। খানাতল্লাশীতে কোনও বিশেষ বস্তু তো পাইল না। কিন্তু তাহাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিয়া গেল।

আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হইল; কিন্তু এখনও সেখানেই থাকিলাম। বেলা প্রায় একটা কি দুইটা হইতে রাত্র আটটা পর্যন্ত আমরা সকলে সেখানেই থাকিলাম। আশ্রম ও বিদ্যাপীঠের সব বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইল। বিদ্যাপীঠের যতজন ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন, সকলেরই চলিয়া যাইবার আদেশ হইল। শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ, মথুরা প্রসাদ, কৃষ্ণবল্লভ সহায়, জগৎনারায়ণ বি. এস.-সি, আমি এবং প্রজাপতি মিশ্রও গ্রেপ্তার হইলাম। রাত ৯টায় আমাদের বাঁকীপুর জেলে পেঁছাইয়া দেওয়া হয়। নিজের নিজের জিনিসপত্র লইয়া আমরা সকলে পুলিশের লরীতে চড়িয়া বসিলাম। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও সঙ্গে সঙ্গেই জেলে আসিয়া পেঁছিলেন। নিজের নিজের বাক্স বিছানা প্রভৃতি সব জিনিসপত্র আমাদের নিজেদেরই নামাইতে ও বহিতে হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ইহাই ছিল আদেশ!

রাত্রে এক দুর্গন্ধ ওয়ার্ডে, যাহা খালি রাখা হইয়াছিল, আমাদিগকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিছাইবার জন্য কিছু কম্বল পাওয়া গেল। খাওয়ার জন্য বাজার হইতে কিছু পুরী আনিয়া দেওয়া হইল। সেখানে প্রস্রাবের এত দুর্গন্ধ যে আমরা সমস্ত রাত্রি শান্তিতে ঘুমাইতে পারি নাই। বাজারের পুরীও এমন ছিল যে খাইতে ইচ্ছা হয় না। পরের দিন সকালে ইংরেজ সিভিল সার্জন আসিলেন, ইনিই ছিলেন জেলের সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট। তিনি বলিলেন, আমরা ইচ্ছা করিলে নিজেদের খাবার বাহির হইতে আনাইতে পারি। আমরা জানাইলাম, জেলে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে আমরা তাহাই খাইব। সকল কয়েদীরা যাহা পায় আমরাও সেই লোহার খাট ও সেই খাবার পাইলাম। আমরা তাহাই লইলাম। দুই দিন পরে গভর্নমেণ্টের হুকুম আসিল যে আমরা আপার ডিভিসনের (উচ্চ শ্রেণীর) কয়েদী রূপে পরিগণিত হইয়াছি। তখন হইতে স্বতন্ত্র কিছু খাদ্য পাইতে লাগিলাম। পরের দিন হইতেই আমাদিগকে অন্য এক ওয়ার্ডে লইয়া গিয়া রাখা হইল। জেলেই আমাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা ও বিচার হইল। ব্রজকিশোরবাবুর পাঁচ মাস ও বাকি সকলের ছয় মাসের সাজা হইল। কয়েকদিন পরে আমাদের সকলকে হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হইল। সেখানেই আমাদের মেয়াদ পূর্ণ হইল।

আমরা তো গ্রেপ্তার হইয়া গেলাম, তাই বাহিরের আন্দোলনে কোনই অংশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু বাহিরের লোকেরা অনেক কিছু করিল। লর্ড উইলিংডন দম্ভ করিয়াছিলেন যে দুই সপ্তাহে তিনি সমস্ত ব্যাপার শেষ করিয়া দিবেন, কিন্তু এই আন্দোলনও প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকিল। তখন তো লোকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ ছিল। জানি না কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিল নূতন নেতা, যাহারা নিজের নিজের মতো কার্যক্রমও তৈয়ার করিয়া লইল এবং আইনভঙ্গের কাজ জোরে চলিতে

লাগিল। আইনভঙ্গ করাও বিশেষ কঠিন ছিল না। সরকারের দিকে সর্বত্র সভা, মিছিল প্রভৃতি বারণ ছিল। এই আদেশের প্রতিবাদ হইতে লাগিল, সভা হইতে লাগিল, মিছিল বাহির হইতে লাগিল। সভা ও মিছিলের উপর লাঠি চলিত, কোথাও কোথাও গুলীও চলিতে লাগিল; তবু ঐরূপ হইতেই থাকিল। সমস্ত কংগ্রেস কমিটির বাড়ি ও আশ্রম সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল। লোকে তাহার উপর চড়াও হইত, আর বীপুরের (ভাগলপুর) আশ্রমের উপর গত সত্যাগ্রহে যেমন বরাবর আক্রমণ হইত, অনেক আশ্রমের উপর ঐ ধরনের চড়াও হইতে লাগিল। সদাকত আশ্রমের উপরও রোজ রোজ চড়াও হইত, এবং কাহাকেও বা গ্রেপ্তার করা হইত। বিশেষ করিয়া হামলা হইত এখানকার পতাকার উপর। যে দণ্ডের উপর 'ইউনিয়ন জ্যাক' লাগানো হইত, লোকে শেষ পর্যন্ত তাহা নামাইয়া তবে ছাড়িল।

এ ব্যাপার গভর্নমেণ্ট ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পদিনের পরেই ২৬ জানুয়ারি তারিখে লোকে স্বাধীনতা দিবস পালন করার সংকল্প করিল। ঐ দিন কয়েক জায়গায় গুলী চলিল। মতি-হারিতে সেখানকার জেলা কমিটির বাড়ির সামনে যে-ময়দান, সেখানে বড় সভা হইল, তাহাতে সমস্ত গ্রাম হইতেও অনেক লোক আসিয়াছিল। সেখানে গুলী চলিল, কয়জন মারাও গেল, কিন্তু লোকে তবু পালাইল না। আজও সেখানে শহীদদের নামে চত্বর তৈরী হইয়া আছে। শেষে যখন পুলিশের লোকে গুলী চালানো বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, তখনও জন-সাধারণ সেখান হইতে নড়িল না। রাত্রে সেখানে থাকিয়া লোকেরা সেই জায়গায় আটার লেচি পোড়াইয়া খাইল। পরের দিন গ্রামের লোকেরা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া গেল। মুঙ্গের জেলার তারাপুর ও বেগুসরাইয়েও অনেক লোক গুলীতে মারা পড়িল। একজন ছাত্র গুলী খাইয়া মরিবার সময়ে এই কথা বলিল—"আমি স্বরাজের জন্য মরছি, লোকমান্য তিলকের কাছে গিয়ে খবর দেব।" বিহারে অনেক জায়গার লোকে এই ধরনের সাহস দেখাইয়াছিল। আবার ১৯৩০ সালের মত সারা প্রদেশের সমস্ত জেলখানা ভরিয়া গিয়াছিল, পাটনা ক্যাম্পজেলও তাহাই। ১৯৩০ সালের সঙ্গে এবারকার প্রভেদ এই যে জেলের ভিতরে নিয়মের কঠোরতা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। 'আপার ডিভিসনে' অল্প লোককেই রাখা হইয়া-ছিল। এমনিতেই তো বিহারে পূর্বেই এরূপ লোক কম ছিল; এবার তাহাদের সংখ্যা আরও কম হইয়া গেল। গভর্নমেণ্ট যত তাড়াতাড়ি ও জোরের সঙ্গে আন্দোলন বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারিলেন না, আন্দোলন চলিতেই থাকিল। হাজারিবাগে আমরা ঐ ভাবেই দিন কাটাইতে লাগিলাম। নূতন কথা এই হইল যে, এবার আমাদের কার-

খানায় যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল না; কারণ বোঝা গিয়াছিল যে, সেখানকার সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইবে, এবং আমরা তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দিব বা ফুসলাইব। এইজন্য এবার আমরা ঐ ধরনের কিছু কাজ করিতে পারিলাম না; কিন্তু অনেক সুতা কাটা হইল। ধর্মগ্রন্থ খুব পড়া হইল—কোরান শরিফ, বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ, বাইবেল ইত্যাদিও পড়িলাম।

এবারের জেলযাত্রায় এক অদ্ভুত ঘটনা হয়। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ ছিলেন একজন খুব স্বাস্থ্যবান যুবক। তিনি অনেক কসরত ইত্যাদি করিতেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনার ভার তাহারই জিম্মায় ছিল। এপ্রিল মাসে একদিন খুব গরম পড়িয়াছিল, দুপুর বেলায় তিনি রান্নাঘর হইতে আসিলেন। শরীর কিছু দুর্বল হইয়া গিয়াছিল, সকলে মনে করিল বুঝি সাধারণ ব্যাপার। পরের দিন হইতে আস্তে আস্তে তাঁহার কথা বন্ধ হইতে লাগিল। দিনের বেলায় তাহা এভাবে বন্ধ হইয়া গেল যে আ-আ উঁ-উঁ পর্যন্ত করিতে পারিতেন না! যাহা কিছু বলিবার, সব লিখিয়া বুঝাইতেন। কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু বলিতে পারিতেন না। সেখানকার ডাক্তার ও সিভিল সার্জন দেখিলেন ও পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তাঁহার মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এইজন্য তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। কলিকাতায় তাঁহার চিকিৎসা করানো হইল। সেখানকার ডাক্তার-কবিরাজ হাজার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার গলার স্বর বাহির করিতে পারিল না। সকলে বলিত যে কণ্ঠ-নলীতে কোনও দোষ নাই, তবু স্বর বাহির হইতেছিল না। এই ঘটনা প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া থাকিল। ১৯৩৪ সালে যখন ডাঃ আনসারি ইউ-রোপে গেলেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সেখানে ভিয়েনাতে (অস্ট্রিয়া) এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা করেন। তাহাতে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই গলার স্বর কিছু কিছু বাহির হইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে একেবারে সুস্থ হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এখন তাঁহার গলার স্বর আগের মত হইয়া গেল। বড় বড় সভাতেও তিনি বক্তৃতা করিতেন আর তাঁহার কণ্ঠধ্বনি সকলের কাছে পোঁছিত।

এইভাবে সর্বত্র আইনভঙ্গ চলিতেছিল, এমন সময় কংগ্রেসের অধিবেশন লইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। উপরে বলিয়াছি, এবারে ব্রিটিশ সরকার ৪ঠা জানুয়ারি তারিখেই গ্রেপ্তার করা আরম্ভ করিলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন মার্চ মাসে হইবার কথা ছিল। উড়িষ্যার লোকেরা কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। যখন একে একে গ্রেপ্তারের পালা শুরু হইয়া গেল, তখন সেখানকার লোকেরাও গ্রেপ্তার হইল। বিহার ও উড়িষ্যা একই প্রদেশে যুক্ত ছিল। তাই সেখানকার প্রধান প্রধান কংগ্রেসকর্মী,

যাঁহারা আপার ডিভিসনে ছিলেন, তাঁহারা হাজারিবাগেই আসিলেন, আর আমাদের সকলের সঙ্গেই থাকিলেন। এখন তো আর উড়িষ্যায় অধিবেশন হইবার কথা ছিল না; কিন্তু যাহারা বাহিরে ছিল তাহারা ভাবিল যে অধিবেশন মার্চ মাসে কোথাও না কোথাও অবশ্যই করিতে হইবে। গভর্নমেণ্টের স্থিরসংকল্প যে-কোনও প্রকারেই অধিবেশন করিতে দেওয়া হইবে না। লোকেরা স্থির করিল যে অধিবেশন হইবে দিল্লীতে। তাহার জন্য দিনও স্থির করিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতি হইবেন, তাহাও ঘোষণা করা হইল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লোক কোন না কোন উপায়ে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই দিল্লীতে পেঁৗছিয়া যেখানে সেখানে থাকিয়া গেল। লোকেরা ইহাও ঘোষণা করিল যে, নির্দিষ্ট দিনে বেলা দশটায় ঘণ্টাঘরের সামনে চাঁদনীচকে অধিবেশন হইবে। মালব্যজী দিল্লী রওনা হইলেন। তিনি সোজা রেলে দিল্লী পর্যন্ত গেলেন না, রাস্তা হইতে কোথাও মোটরে উঠিয়া গেলেন। গাজিয়াবাদ ও দিল্লীর মাঝখানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। এ-খবরও লোকে পাইল। ঠিক অধিবেশনের দিন ভিতরে ভিতরে এই খবর চালাইয়া দেওয়া হইল যে চাঁদনীচকে অধিবেশন না হইয়া, নয়া দিল্লীতে কোথাও হইবে। এ-খবর এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে পুলিশও ইহা বিশ্বাস করিল। এইজন্য সেইদিন পুলিশের আয়োজন হইয়া রহিল অন্য স্থানে, চাঁদনীচকে নয়। যথাসময়ে বাহির হইতে আগত প্রতিনিধিগণ, যাঁহারা ঘণ্টাঘরের পাশে অলিতে গলিতে যেখানে সেখানে ছিলেন, তাঁহারা চারদিক হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা ঘণ্টাঘরের সামনে রাস্তার মাঝখানেই জমায়েৎ হইলেন। কংগ্রেসের নিয়মানুসারে মনোনীত সভাপতির অনুপস্থিতিতে আমেদাবাদের এক মিলের মালিক শেঠ রণছোড়দাসকে সভাপতি নির্বাচিত করা হইল। তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ হইল। এক সময়োপযোগী প্রস্তাব বিধিমত উপস্থিত করা হইল এবং সকলে তাহা মঞ্জুর করিলেন। এইসব হইতেছিল এমন সময়ে পুলিশ খবর পাইয়া গেল। ঘোড়সওয়ার পুলিশ ও লরিতে চড়িয়া অন্যান্য দল আসিয়া পেঁৗছিল, আর উপস্থিত লোকদের লাঠি দিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই সব কাজকর্ম শেষ হইয়া গিয়াছিল। এই খবর সংবাদপত্রে ছাপা হইল। লোকদের ইহাতে খুব ফুর্তি হইল। ঘটনাক্রমে শেঠ রণছোড়দাসকে গ্রেপ্তার করাও হয় নাই। জানি না, সত্যই ঐ নামের শেঠ সভাপতি হইয়াছিলেন, না তাঁহার নাম এমনিতেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু একথা ঠিক যে এই অধিবেশন কংগ্রেসের বিধিমত অধিবেশনের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। অন্যান্য অধিবেশনের সভাপতিদের মতো ইহার সভাপতিকে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আজীবন সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই!

এবার দেশ কংগ্রেসের সঙ্গে পুরাপুরি চলিয়াছে। গভর্নমেণ্ট গতবারই দেখিয়াছিল, টাকার মার খুব লাগে বেশি। এইজন্য এবার বড় বড় অঙ্কের জরিমানা ধার্য হইল। কংগ্রেসের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া গেল। কংগ্রেসের নিজস্ব বাড়ি তো কোথাও ছিলই না, ব্যাঙ্কে কংগ্রেসের হিসাবে যাহা কিছু জমা ছিল তাহাও বাজেয়াপ্ত হইল। কিন্তু গভর্নমেণ্ট, কংগ্রেসের অনেক কিছু পান নাই। গভর্নমেণ্ট ও অন্যালোকেরা খুব ভুল করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল কংগ্রেসের নিকটে অনেক টাকা আছে, আর সেই টাকার জোরেই কাজ করাইয়া লয়। ১৯২১ সালে কংগ্রেস একবার বিস্তর টাকা জমা করিয়াছিল। তাহার অনেক অংশই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ও খাদিতে খরচ হইয়া গেল। এ-ছাড়া কংগ্রেসের সংগঠনেও খরচ হইল। তাহার পর কংগ্রেসের সকল প্রদেশের কমিটিগুলি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে খরচের জন্য টাকা জমাইত। সেই টাকার পরিমাণ বড় বেশি হইত না। যদি কংগ্রেসের সামনে কোন অভাব আসিয়া জুটিত তখন তাহার জন্য তখন তখন অর্থ সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু কংগ্রেসের কোনও কমিটির কাছে বেশি টাকা জমা থাকিত না। হ্যাঁ, যেখানে সেখানে ছোট ছোট বাড়ি কংগ্রেসের হইয়া গিয়াছিল। তাও স্থানীয় লোকদের তখন তখনি সংগৃহীত পয়সা হইতে তৈরি করা হইয়াছিল। কিন্তু একথা ঠিক যে যখন যেমন প্রয়োজন, লোকের কাছ হইতে পয়সা পাওয়া যাইত। যেখানে কংগ্রেসের কাজ ভাল—কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে,—এবং লোকদের কাছে পয়সা আছে, সেখানে বেশি পয়সা পাওয়া যাইত; কিন্তু যেখানে ইহাদের কোনও একটার অভাব আছে, সেখানে তাহা কম পাওয়া যাইত।

গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল, আর তিনি সেই নীতি অনুসারে চলিতেনও বটে যে, সাধারণ প্রতিষ্ঠানের নিজের খরচের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া জমা রাখা উচিত নয়; প্রয়োজনমত পয়সা জমা করিয়া কাজ চালানো উচিত। তাহাতে ঐ প্রতিষ্ঠান যদি ঠিকমত কাজ না করে, তবে জনসাধারণের প্রীতি হারাইবে, আর পয়সাও পাইবে না। এইরূপে ঐ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সাধারণের উপর নির্ভর করিতে হইবে, আর নিজের কর্তব্য ঠিক ঠিক নির্বাহ করিতে পারিলে তবেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। আমার অভিজ্ঞতায়, এ-কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের প্রদেশ দরিদ্র; বড় বড় জমিদারদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। কিন্তু যখন কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রয়োজনমত আমাদিগকে টাকাকড়ি দিয়াছে। স্বীকার করি, অর্থসংগ্রহে আমাদের অনেক শক্তি ও সময় যায়, আর যদি ঐ চিন্তা হইতে আমরা মুক্ত থাকিতে পারি তাহা হইলে হয়তো বেশি কাজ করিতে পারি। কাজ করিবার লোক আছে বিস্তর—যাহাদের ভাল বুদ্ধিশুদ্ধি

আছে, এবং যাহারা কংগ্রেসের কথা সত্য সত্য মানিয়া চলে। কিন্তু টাকা পয়সা কম বলিয়া আমরা তাহাদিগকে আশ্রমে থাকিবার জন্য পর্যন্ত খরচ দিতে পারি না, তাহাদের ছেলেপিলে আর বাড়ির লোকদের কথা আর কি বলিব? অনেকে তো এই কারণে বাধ্য হইয়া কখনও কখনও নিজের আহার্য সন্ধানের ফিকিরে কংগ্রেসের কাজ হইতে সরিয়াও দাঁড়াইয়াছে। এইসব সত্ত্বেও আমি মনে করি যে অর্থাভাবে আমাদের কাজ কখনও বন্ধ হয় নাই। একদিক দিয়া আমাদের দারিদ্র্য আমাদের সাহায্যও করিয়াছে। গরিব প্রদেশের প্রাদেশিক কমিটি গরিব থাকিয়াই সেখানকার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাও স্বীকার করি যে আমরা নিজেদের প্রদেশের সত্যকারের প্রতিনিধি হইয়া কাজ করিয়াছি।

আমি এক প্রয়োজনীয়—অথচ অপ্রাসঙ্গিক—বিষয়ের আলোচনায় ভাসিয়া গিয়াছি! যাহা হউক, আমাদের প্রদেশে গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের দরুণ বেশি টাকা পায় নাই। কিন্তু আমাদের সব বাড়িই বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যখন ফিরিয়া পাইলাম, অনেকগুলিরই অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

গভর্নমেণ্ট এবার কংগ্রেস অথবা তাহার কোনও কর্মীকে আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকারের সাহায্য প্রদান করা দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়া দিলেন। কয়েকটা নূতন অর্ডিন্যান্স চালানো হইল, সাধারণত অন্যান্য দেশে যুদ্ধের সময়েই সে-সব প্রবর্তিত হয়। এই কারণে আমাদের যে-সব কর্মী বাহিরে থাকিয়া কাজ চালাইতেছিলেন, তাঁহাদের জন্য বহুস্থানে ভাড়া দিয়াও বাড়ি পাওয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি যানবাহনও পাইতেন না। অত্যন্ত ভীতি সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কাজ বন্ধ হইল না; কারণ জনসাধারণ সর্বদা সাহায্য করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, এমন কয়েকজন লোক ছিলেন যাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় নিজেদের হাতে রাখিয়া সমস্ত দেশে মাঝে মাঝে আদেশ পেঁছাইতেন এবং সকল স্থানের কাজকর্ম কিভাবে চলিতেছে তাহার খবর লইতেন।

এইভাবে, যদিও কংগ্রেস অবৈধ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করা হইয়া গিয়াছিল, না ছিল তাহার ঘর, না ছিল কার্যালয়, না পয়সা, না সভ্য বা কর্মী, তাহা হইলেও, যেমন কোনও গুপ্ত স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে জল আসিতেই থাকে, তেমনি কংগ্রেসের কার্যক্রমও কোনও গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিত, আর তাহা পালন করিবার জন্য কর্মীও যথাস্থানে যথাকালে আসিয়া জুটিত। লর্ড উইলিংডনের সেই অহঙ্কারপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী যে কংগ্রেসকে তিনি দুই সপ্তাহে শেষ করিয়া দিবেন—তাহা পূর্ণ হইল না। হাজারিবাগ জেলের ভিতর এতখানি কড়াকড়ি ছিল যে খাঁ আবদুল গফর খাঁ ও খাঁ সাহেব ঐ জেলেই ছিলেন, অথচ আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের একবারও দেখা হয় নাই।

ছয় মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া হাজারিবাগ হইতে মুক্তি পাইলাম। কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে হাজারিবাগ শহরে থাকিতে হইল। সেই সময় আমার জোরে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। আমাকে খানিকটা সময় থাকিয়া যাইতে হইল। একটু সুস্থ হইয়া যখন পাটনায় আসিলাম তখনও রোগীই ছিলাম আর দুর্বল তো যা ছিলাম তাহা সীমা ছাড়াইয়া। একটু ভাল হইয়া বাহিরের অবস্থা জানিতে পারিলাম। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কার্যকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমাদের প্রদেশেরও যাঁহারা বাহিরে ছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে দিয়া যাহা কিছু হইতে পারে সেই সাহায্যও আমি করিলাম; কিন্তু কাজ চালাইবার ভার আমি নিজের হাতে রাখিলাম না, যাহারা চালাইতেছিল তাহাদের হাতেই রাখিলাম। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাজেই আমি বেশি আকৃষ্ট হইতাম এবং সময় দিতাম। আমি কাশীতে পণ্ডিত মালব্যজীর সঙ্গে গিয়া দেখা করিলাম আর সেখানে কয়েকদিন ধরিয়া থাকিলাম। আবার বোম্বাই ও কলিকাতাতেও গেলাম। সর্বত্র কর্মীদের সঙ্গে দেখা করিলাম এবং অর্থসংগ্রহে যথাসাধ্য তাহাদের কিছু সাহায্য করিলাম।

আমি স্বীকার করিতাম যে আমার বাহিরে থাকা উচিত নয়, এবং ভাবিয়াছিলামও যে সুযোগ পাইলেই আবার জেলযাত্রা করিব। ইহার মধ্যেই একদিন সংবাদপত্রে মহাত্মাজীর অনশনের কথা পড়িলাম। যেদিন বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া যাই, সেইদিন হইতে তাঁহার কোনও খবর আমি পাই নাই। কিন্তু গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁহার কিছুদিন হইতে পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল। পূর্বে বলিয়াছি, গোলটেবিল কনফারেন্সে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনক্ষেত্র রাখার বিরুদ্ধে প্রাণপণ তীব্র আপত্তি করিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার মীমাংসায় পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র স্থাপন করিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মাজী সেই বক্তৃতার কথা মনে করাইয়া দিয়া বলিলেন, যদি গভর্নমেণ্ট এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না করেন তবে তিনি আমরণ অনশন করিবেন, এবং সেইজন্যই গভর্নমেণ্ট রাজি না হওয়ায় তিনি অনশন আরম্ভ করিয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে যে-সব পত্র চলিয়াছিল সরকার তাহা প্রকাশিত করিলেন, আর তাহা প্রকাশিত হওয়ামাত্র সমস্ত দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

মহাত্মাজী ছিলেন যারবেদা জেলে। আমি খবর পাইয়াই বোম্বাইয়ে

গেলাম। পূজনীয় মালব্যজীও আসিয়া পেণীছলেন। ভাগ্যবশে শ্রীরাজা-গোপালাচারী বাহিরে ছিলেন, তিনিও আসিলেন। আরও যে-সমস্ত লোক বাহিরে ছিলেন, তাঁহারাও বোম্বাই আসিয়া পেণীছলেন। মহাত্মাজীর অনশন বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু কবে মহাত্মাজী তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন! মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা কথা ইহাও ছিল যে ঐ সিদ্ধান্ত ততদিন বলবৎ থাকিবে যতক্ষণ না সিদ্ধান্তের সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ, সেইরূপ সকল জাতির লোকেরা নিজে-দের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে, তাহাদের স্থানে অন্য কোনও কথা স্থির করিয়া ফেলে। স্বভাবতই লোকদের এইদিকে দৃষ্টি গেল। এখনও চেষ্টা চলিতে লাগিল যে অস্পৃশ্য শ্রেণীদেরই রাজি করাইয়া স্বতন্ত্র নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ে ডক্টর আম্বেদকর থাকিতেন। সরকার তাঁহাকেই অস্পৃশ্যদের নেতা করিয়া গোলটেবিল কনফারেন্সে পাঠাইয়া-ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতে থাকিল। দুই এক দিন কাটিয়া গেল, তবু কোনও কথা ততক্ষণ মীমাংসা হইতে পারিল না যতক্ষণ গান্ধীজীর নিকট সম্মতি লওয়া না হয়। ইহার মধ্যে অস্পৃশ্য শ্রেণীদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গেল; কারণ অস্পৃশ্যতা নিবারণে গান্ধীজী অনেক কাজ করিয়া-ছিলেন। উক্ত শ্রেণীর লোকেরা দেখিতে লাগিল যে যদি এই কারণে ইঁহার মৃত্যু হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের এই কলঙ্ক আর মিটবে না।

গান্ধীজী যেজন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনক্ষেত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন সেই কারণও কেহ কেহ বুঝিয়াছিল। গান্ধীজীর কথা এই ছিল যে অস্পৃশ্য শ্রেণীরাও হিন্দু; তবে কোনও কারণে সমাজে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে, হিন্দুজাতির অন্যান্য শ্রেণীরা তাহাদের আজ অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে। তিনি নিজে এই অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের কলঙ্ক বলিয়া মনে করেন এবং ইহা দূর করিয়া দিতে চাহেন। এমনিতে তো যে অস্পৃশ্য সে খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক হইয়া একেবারে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, এবং যদিও সেখানেও কিছু দূর পর্যন্ত অস্পৃশ্য থাকিয়াই যায়, তথাপি সে হিন্দুদের পক্ষে আর অস্পৃশ্য নয়। এইজন্য এই প্রশ্ন তাহাদের সম্বন্ধেই হয় যাহারা হিন্দু থাকিয়া যায়। গান্ধীজী মনে করিতেন যে রাজনৈতিক নির্বাচনের জন্যও যদি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হয়, তবে তো তাহা হইবে এক নূতন অস্পৃশ্যতা, আর যেখানে অস্পৃশ্যতা দূর না করিবার চেষ্টা হইতেছে ও যেখানে ইহার অন্যরূপ দূর হইতেছে সেখানে ইহা তাহার এক নূতন রূপ ও কারণ হইয়া যাইবে। অস্পৃশ্যদের শিক্ষিত নেতারা ইহা স্বীকার করেন যে, যখন সমস্ত অধিকার নির্বাচনের জোরেই হইবে, তখন তাহাদেরও নিজেদের সংখ্যানুযায়ী শক্তি লাভ করা চাই, আর তাহাও পুরাপুরি লাভ

করিবে যখন তাহাদের নির্বাচনক্ষেত্র পৃথক হইবে। এইজন্য গোলটেবিল কনফারেন্সে ডাঃ আম্বেদকর ইহার উপর জোর দিয়াছিলেন।

বোম্বাই ও পুণার মধ্যে কেহ কেহ দৌড়ঝাঁপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু, ইহাতে বড়ই অসুবিধাবোধ হইত। এইজন্য সকলে, যাঁহাদের এ-বিষয়ে কিছু করণীয় ছিল, পুণাতেই চলিয়া গেলেন। ডাঃ আম্বেদকর ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীও পুণাতে গেলেন। সেখানে দুই-তিন দিন ধরিয়া কথা-বার্তা চলিল। মহাত্মাজীর সঙ্গেও জেলে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে ফটকের কাছেই এক ছোটখাটো ওয়ার্ডে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হইত, সেখানে এক আম গাছের নীচে তাঁহার চৌকি থাকিত। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি, পণ্ডিত মালব্যজী, শ্রীযুক্ত ঠক্কর বাপ্পা, শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস প্রভৃতি অনেক কিছু করিয়াছিলেন। ডাঃ আম্বেদকর, ডাঃ সোলাঙ্কি প্রভৃতিও তাঁহাদের দিক হইতে বরাবর কথাবার্তার সময় একসঙ্গে ছিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আমিও অস্থির হইয়া পড়িলাম; কারণ কথাবার্তায় গান্ধীজীর পুরা পরিশ্রম হইত, আর আমি ভয় পাইতাম যে তিনি এত পরিশ্রম করিয়া বেশি দিন পর্যন্ত অনশন সহ্য করিতে পারিবেন না। কথাবার্তা যখন হইত, তখন আমিও উপস্থিত হইতাম; কিন্তু নিজের প্রকৃতি অনুসারে কথা খুব কম বলিতাম। একদিন সন্ধ্যায় গান্ধীজী ডাঃ আম্বেদকরের সঙ্গে অনেক কথা বলিলেন এবং তাঁহাকে এ-বিষয়ে মর্মস্পর্শী ভাবে অনুরোধও করিলেন। কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। প্রধান শর্ত ইহাই ছিল যে, স্বতন্ত্র নির্বাচনক্ষেত্র থাকিবে না, তাহার বদলে নির্বাচনের পদ্ধতি এই হইবে যে নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের জন্য স্থান রক্ষিত থাকিবে, নির্বাচনের সময় অস্পৃশ্য ভোটদাতাদিগের অধিকার থাকিবে যে প্রত্যেক স্থানের জন্য চারজন প্রার্থীকে মনোনীত করিতে পারিবে; চারজনের বেশি প্রার্থী হইলে শুধু তাহাদেরই ভোট হইতে চারজনই বাছিয়া লইতে পারিবে, আর এই চারজনেরই প্রার্থিত্ব স্থির থাকিবে; চার-জনের নামে ভোট লওয়া হইবে এবং অস্পৃশ্য ও সবর্ণ সকল হিন্দুই ভোট দিবে, সবচেয়ে বেশি ভোট যে পাইবে সেই নির্বাচিত হইবে। এই ব্যবস্থা দশ বৎসর পর্যন্ত চলিবে, তাহার পরে আবার এ-বিষয়ে বিচার করা হইবে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের মীমাংসায় অস্পৃশ্যেরা যত জায়গা পাইয়াছিল তাহার সংখ্যা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সংখ্যার অনুপাতেই বাড়ানো হইল। এই সমস্ত কথা স্থির হইয়া গেল, অমনি প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নিকট তার পাঠানো হইল। তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিজের যে সিদ্ধান্ত তাহা ইহার অনুযায়ী বদল করিলেন।

এতসব হইয়া গেলে গান্ধীজীর অনশনের আর কোনও কারণ থাকিল না। তাই তিনি অনশন ভঙ্গ করিলেন। এই সমাধানে আমরা খুব খুশি হইলাম। রাজাজী ও ডাঃ আম্বেদকর নিজেদের মধ্যে কলমের অদলবদল করিলেন। রাজাজীর ইচ্ছাতেই তাহা হইল; কারণ তিনি খুবই খুশি হইলেন। বিলাত হইতে উত্তর আসিতে বেশি দেরি হইল না, হয়তো ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঞ্জুরি আসিয়া গেল। কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টাও আমাদের পক্ষে কাটানো কঠিন হইয়াছিল। ঐদিন সকাল হইতেই আমরা সকলে ক্লান্ত শ্রান্ত ছিলাম। হইতে করিতে দুপুরবেলা হইল। বুঝিলাম যে উত্তর আসিয়া গিয়াছে এবং তাড়াতাড়ি জেলে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। ঐদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পুণায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য রওনা হইয়াছিলেন। সেপর্যন্ত মীমাংসা হওয়ার খবর তিনি পান নাই। পুণা পৌঁছিয়া তবে তিনি এ-সংবাদ পাইলেন। তিনি ঠিক সেই সময়ে জেলে পৌঁছিলেন যখন মঞ্জুরির খবর সেখানে সবে আসিয়াছে আর গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ করিবার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। সে বড়ই শুভ মুহূর্ত। প্রার্থনা করা হইল। গুরু-দেব এক সুন্দর গান গাহিলেন এবং আশীর্বাদ দিলেন। তাহার পর গান্ধীজী কমলালেবুর রস খাইয়া উপবাস শেষ করিলেন। সারা দেশময় আনন্দের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িল। অস্পৃশ্যতাবর্জনের প্রবল প্রবাহ আসিল।

অস্পৃশ্যতাবর্জনের চেষ্টা

রাজনৈতিক প্রশ্নের একটা কিছু মীমাংসা হইলেই গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। তাঁহার হৃদয়ে তো অস্পৃশ্যতা পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে আগুন শুধু নির্বাচনে অস্পৃশ্যদের একটা কিছু সুরক্ষিত স্থান পাইলেই নেভে কি করিয়া? এ-সব প্রশ্ন ততদিন পর্যন্ত উঠিতেই থাকিবে যতদিন তাহাদের সঙ্গে অস্পৃশ্যতার ব্যবহার হইতে থাকিবে, আর হিন্দুজাতি তাহাদিগকে মনুষ্য শ্রেণী হইতে একপ্রকার পৃথকই মনে করিতে থাকিবে। এইজন্য তিনি ইহাও চাহিতেছিলেন যে ইহাকে নির্মূল করিবারও যদি উপায় করা যায়। সেখান হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়া এক প্রকাণ্ড সভা হইল, সেখানে হিন্দুদের তরফ হইতে প্রতিজ্ঞা করা হইল যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য তাহারা সর্ব-প্রকার চেষ্টা করিবে। এই কাজ চালাইবার জন্য এবং অন্যভাবে অস্পৃশ্যদের

সেবা করিবার জন্য এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হয়। গান্ধীজী এই সময়ে 'অস্পৃশ্য' শব্দটার বদলে 'হরিজন' শব্দের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইজন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম 'হরিজন-সেবক-সংঘ' রাখা হইল। তাহার সভাপতি হইলেন শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, আর মন্ত্রী বা সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঠক্কর, যাঁহাকে লোকে ভালবাসিয়া 'ঠক্কর বাপ্পা' বলিয়া ডাকে। ঐ প্রতিষ্ঠান এখনও ভালভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। সমস্ত দেশে উহার বিস্তর শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ঠক্কর বাপ্পার পায়ে যেন চাকা বাঁধা! তিনি বৃদ্ধবয়সেও সমস্ত দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সর্বত্র হরিজনদের সুবিধা ও শিক্ষার চেষ্টা করিয়া সর্বপ্রকারের সেবা করিয়া যাইতেছেন।

ঐ সময় ইহাও মনে হইল যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার এক সুস্পষ্ট পদ্ধতি, যাহা সকলে বুঝিতে পারে এবং নিজের চোখে দেখিতে পারে, তাহা হইবে, মন্দিরে যেখানে যেখানে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ আছে সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে প্রবেশ করানো; অন্য হিন্দুদের জন্য যেমন মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হয় তাহাদের জন্যও সেইরূপই মন্দির দ্বার খোলানো। এই-রূপে, সাধারণের কূয়াতে তাহাদের জল ভরিবারও অধিকার হওয়া চাই। যেখানে অন্যান্য হিন্দু যাইতে পারে, বসিতে পারে, সেখানে যাইবার বসি-বার অধিকার তাহাদেরও অনায়াসে পাওয়া চাই। গান্ধীজীর উপবাসের সময়েই অনেক জায়গায় হিন্দুরা মন্দিরের দরজা তাহাদের জন্য খোলাইতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের অন্যান্য অধিকারও অনেক স্থানে স্বীকার করিল। কিন্তু এত বড় দেশের পক্ষে এইরূপ স্থানের সংখ্যা এখনও ছিল অতি অল্প। এই উৎসাহের অন্যতম ফল হইল, বোম্বাইয়ের সভার পরে অনেক স্থানে এই বিষয়ে সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিল যাহাতে অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রস্তাব গৃহীত হইত, মন্দির খোলানো হইত ইত্যাদি। এই প্রকারের এক সম্মেলন বিহারে ছাপরায় অল্পদিন পরেই হইল, তাহাতে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ডাঃ ভগবানদাস সভাপতির আসন সুশোভিত করিয়াছিলেন। অনেক উৎসাহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। জনসাধারণের দিক হইতে হরিজনদের প্রতি অতিশয় প্রীতি ও কার্যত সহানুভূতি দেখানো হইয়াছিল।

বোম্বাইতেই রাজাজী আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আমি যেন তাঁহার সঙ্গে মান্দ্রাজ যাই। অস্পৃশ্যতার কঠোরতা ও ভীষণতা সর্বাপেক্ষা ঐ অঞ্চলেই দেখা যায়। মালাবারে তো অস্পৃশ্যতা এতদূর যে বর্ণহিন্দু যে পথ দিয়া চলে, কোনও কোনও জাতি সেই পথ দিয়া চলিতে পায় না। যেখানে তাহারা রাস্তা দিয়া চলিতে পারে সেখানেও তাহাদিগকে হাঁক দিয়া যাইতে হয় যেন অন্য কেহ না জানিয়া কোথা হইতে তাহাদের নিকটে না আসিয়া পড়ে। কূয়ায় ও পুকুরে জল ভরিবার তো কথাই হইতে পারে

না। এ-ছাড়া দক্ষিণে অনেক বড় বড় মন্দির আছে। কয়েকটি তো এমন মন্দির যে সেখানে ভারতবর্ষের প্রত্যেক কোণ হইতে যাত্রী উপস্থিত হয়। পঞ্চায়েৎ এইসব মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ করে। পঞ্চায়েৎ কোথাও কোথাও জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, কোথাও কোথাও বা গভর্নমেণ্ট দ্বারা মনোনীত হয়। যদি তাহাদের মধ্যে প্রচার হয় আর তাহারা মন্দির সব খুলিয়া দেয় তাহা হইলে খুব বড় কথা হয়। আমি রাজাজীর সঙ্গে সেখানে গেলাম। মাদুরা ও শ্রীরঙ্গমের মন্দির খোলাইবার জন্য খুবই চেষ্টা করা গেল। সেখানকার পূজারী ও পরিচালকদের সঙ্গে অনেক কথা হইল। কিছু সহানুভূতিও তাঁহারা দেখাইলেন। আমরা কয়েকদিন ধরিয়া এই দুই জায়গায় এই চেষ্টা করিতে থাকিলাম। সাধারণ সভা করা হইল। পণ্ডিতদের সঙ্গেও অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু এইসব বড় বড় মন্দির আমরা খোলাইতে পারিলাম না। অন্য কয়েকটি মন্দির, নিখিল ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে যাহাদের ততটা গৌরব নাই, তাহা খোলা হইল। ইহাতে এইটুকু তো অবশ্য জানা গেল যে কাজটি যদিও কঠিন, তথাপি অসম্ভব নয়। যাহাদের খুব কঠোর বলিয়া মনে করিতাম তাহারাও কথা শুনিতে ও বলিতে প্রস্তুত ছিল। আমরা সেখান হইতে নিরাশ হইয়া নয়, বরং অধিক আশা লইয়াই উত্তরদিকে আসিলাম।

আমাদের চেষ্টার ফল তো তাড়াতাড়ি দেখা গেল না; তবে কয়েক বৎসর পরে মালাবারে, যেখানে সকলের চেয়ে বেশি গোঁড়ামি ছিল সেখানে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সেখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শ্রীপদ্মনাভজীর মন্দির খুলিয়া দিলেন; সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সমস্ত মন্দিরই খুলিয়া দেওয়া হইল। মান্দ্রাজেও আইন তৈয়ারি করিয়া রাজাজী—তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—মাদুরার মন্দির খুলাইয়া দিলেন। ঐসময় এ-কথাও প্রচারিত হইল যে আইনের সাহায্যে মন্দির খোলানো হইবে। আইনের রূপ কি হইবে, তাহাতে শর্ত কি কি থাকিবে, এ-বিষয়ে পণ্ডিতেরা আলোচনা করিতে লাগিলেন; তাহার ফল দেখা গেল পরে। দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে অদ্ভুত দেখিলাম, সেখানকার অব্রাহ্মণ বর্ণহিন্দুদের অপেক্ষা সেখানকার ব্রাহ্মণেরাই এই সংস্কারের জন্য বেশি প্রস্তুত। সেখান হইতে ফিরিবার সময় অন্ধ্র প্রদেশের কয়েক জায়গায় থামিতে থামিতে আসিলাম। সেখানেও ঐরূপ সংস্কারের ঢেউ দেখিতে পাইলাম। সেখানেও কয়েকস্থানে মন্দির খুলিবার উদ্যোগে যোগ দিলাম।

উত্তর ভারতেও এইরূপ ঢেউ খেলিয়া গেল। বিস্তর জায়গায় সভা হইতে লাগিল। মন্দির খুলিতে আরম্ভ হইল। অন্য প্রকারেও অস্পৃশ্যতা দূর করিবার প্রমাণ কার্যত দিতে আরম্ভ করিল। গান্ধীজী জেল হইতেই এ-বিষয়ে বিবৃতি দিতেন। গভর্নমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন যে অস্পৃশ্যতা-

বর্জন সম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতি সংবাদপত্রে ছাপিবার জন্য পাঠানো যাইতে পারিবে। তিনি তৎপর হইয়া এই অধিকার খাটাইলেন এবং তাঁহার অনেক লেখা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে তিনি অনুভব করিলেন যে এইভাবে সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাপানো যথেষ্ট নয়, তাহার জন্য নিজেদের এক সংবাদপত্র বাহির করা চাই। তাঁহার ইয়ং ইণ্ডিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; তাই হরিজনদের সেবার জন্য ইংরেজিতে হরিজন, আর ভারতীয় ভাষায় হরিজন-বন্ধু ও হরিজন-সেবক নামে সাপ্তাহিক পত্রের জন্ম হইল, তাহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে আরও অনেক কথা হইল, যাহার উল্লেখ প্রথমে করা উচিত।

একদিকে এইভাবে হরিজন সেবা ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য অভূতপূর্ব উৎসাহের সৃষ্টি, অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত দিক হইতে বিরোধের কিছু কিছু লক্ষণও দেখিতে পাওয়া গেল। একে তো সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হইল এই যে কোন কোন হরিজন এইসব চেষ্টা পছন্দ করিত না, বলিতে চাহিত যে এটা শুধু একটা ঢং, ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাতন্ত্র্য আসিলেই অস্পৃশ্যতা আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে; যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ বর্ণহিন্দুদের এ-ধরনের চেষ্টা তাহাদিগকে আবার আলস্যের নিদ্রায় অভিভূত করিয়া দিবে, তাহাতে তাহারা অন্য সকলের অপেক্ষা পৃথিবীর ভিড়ে পিছনে পড়িয়া থাকিবে। এইজন্য তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে উহাদের মধ্যে যে-অসন্তোষ আছে তাহা আরও বাড়িয়া জাগরণ আনিয়া দিক। তাহাদের পক্ষ হইতে হরিজন নামেরও প্রতিবাদ করা হইল। তাহারা এই প্রশ্নকে ধর্ম ও সমাজের প্রশ্ন বলিয়া মনে করে নাই, শুধু আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক হইতেই ইহা দেখিত। হরিজন সেবক-সংঘ ও গান্ধীজীর চেষ্টার উদ্দেশ্য তো আর তাহাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক উন্নতির পথে বাধা দেওয়া ছিল না—সত্যই তো পুণার চুক্তিপত্রে উহাদের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতখানি জায়গা মিলিয়াছিল যাহা মিঃ ম্যাকডোনাল্‌ডও দেন নাই। আর কোনও রকমের প্রকৃত বিরোধ তো ছিলই না, কিন্তু তাহাদের মনে ছিল সন্দেহ, তাহার কোনও উপায় ছিল না। যখন জোরে কাজ চলিতে লাগিল তখন অনেকের মনের সন্দেহ খানিকটা দূর হইল; তবে তাহার মূল এত গভীরে ছিল যে পরে তাহা আবার স্পষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ছিল এবং দেশবিদেশের কথা বুঝিতে পারিত, তাহারা ইহাও দেখিত যে শাসনবিধান যাহারা করিবে তাহারা ভোট দেওয়ার অধিকার পাইবে, আর সেই কারণে নিজেদের সংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া তাহা হইতে পুরাপুরি লাভ পাইতে চাহিত। কেহ এ-বিষয়ে অভিযোগও করিতে পারিত না; কিন্তু এই কারণে অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিবার চেষ্টাকে ঢং বলিয়া মনে করা একেবারেই

ভুল ছিল। বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও কেহ কেহ এমন নিশ্চয় ছিল যাহারা তাহাদের এই ভাব দেখিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হইত, আর বুঝিত যে রাজনৈতিক অধিকার হইতে ব্যক্তিগত লাভের অনুরোধে কিছু শিক্ষিত লোকেরই এই বিরোধ। যাহা হউক, বিরোধের রূপ ক্রিয়াত্মক হয় নাই, শুধু মন্তব্য ও বিবৃতির দ্বারা যেখানে সেখানে প্রকাশিত হইতে থাকিল।

কংগ্রেসের লোকদের মধ্য হইতেও কাহারও কাহারও দিক হইতে অন্য বাধা আসিতে লাগিল। প্রকাশ আছে যে গান্ধীজী যখন অনশন আরম্ভ করিলেন, তখন সত্যাগ্রহ চলিতেছিল, গভর্নমেণ্ট প্রবলভাবে দমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই, এই সময় মহাত্মাজী এই ঝগড়া বাধাইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি সত্যাগ্রহের দিক হইতে টানিয়া লইয়া এক সামাজিক প্রশ্নের উপর নিবদ্ধ করিলেন— দেশের পক্ষে এই সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার, হিন্দু সমাজের হাজার হাজার বৎসরের দোষ দূর করিবার নয়। তাহারা মনে করিত, এই সত্যাগ্রহকে এইভাবে দুর্বল করিয়া দেওয়া হইল, কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী অস্পৃশ্যতাবর্জনের কাজে লাগিয়া গেল; কয়েকজন তো বিধিমত হরিজন সেবকসংঘের পদাধিকারী হইয়া নিজেদের সমস্ত সময় তাহাতেই দিতে থাকিল। যদিও এ-কথা ঠিক যে, দৃষ্টি ঐদিকে টানিয়া লওয়া হইল, এবং কয়েকজন কর্মীও হরিজন সেবায় লাগিয়া গেল, তথাপি একথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে যাহারা সত্যাগ্রহ ছাড়িয়া এদিকে আসিতে পারিল, তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই সত্যাগ্রহ করিতে প্রস্তুত ছিল। কোন না কোন কারণে তাহাদের মধ্যে অনেকে সেই কাজ ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিল; আর তাহারা এই কাজে লিপ্ত হইল বলিয়া সত্যাগ্রহের কাজ ছাড়ে নাই; এ-কাজ না লইলেও তাহারা সত্যাগ্রহ ছাড়িতই! ইহাও একটা কথা যে হরিজন সেবকসংঘের কর্মীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা কংগ্রেস ও সত্যাগ্রহের কিছু করিতেন না। ইহার সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ তো ঐ সংঘের সভাপতি শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা ও সম্পাদক শ্রীঠক্কর বাপ্পাই।

যাহা হউক, কংগ্রেসী দলে এই প্রকারের অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। যাহারা এইরূপ মত পোষণ করিত, তাহারা দেখিতে পাইত না যে আমাদের দেশে বিদেশী শাসনের প্রধান ও মূল কারণ আমাদের দুর্বলতা, যাহা সমাজে বা ব্যক্তিগত রূপে আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে। আরম্ভ হইতেই গান্ধীজী এই দুর্বলতাগুলি দূর করিবার জন্য গঠনমূলক কাজের উপর এতটা জোর দিয়াছেন। আমরা যেমন যেমন অগ্রসর হই, তেমনই এই দুর্বলতা অনুভব করি, দেখি যে এই নিমিত্ত আমাদের গাড়ি পায়ে পায়ে থামিয়া যাইতেছে। যদি এই দুর্বলতা আমরা দূর করিতে পারি, কোটি কোটি ভাইবোনদের ইহার কবল হইতে বাঁচাইতে পারি, তবে তাহা খুব

বড় দরের সেবা হয়। ইহাতে স্বরাজও, যদি সে স্বরাজ প্রকৃত স্বরাজ হয় এবং সকলের জন্য এক ধরনের হয়, নিকটবর্তী হইবে। আমি তো সর্বদা গঠনমূলক কার্যক্রম মানিয়া থাকি, যথাসাধ্য নিজের দিকে চেষ্টাও করিতে থাকি; কিন্তু কংগ্রেসের সকলের পক্ষে এ-কথা খাটে না। দুই চিন্তাধারায় বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে। কে বলিতে পারে দুইটির কোনটি ঠিক। আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে আমরা নিজেদের মত দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ঠিক বলিয়া মনে করি। আমরা ইহাও বুঝি যে এরূপ মনে না করিলেই আমাদের পথের বাধাগুলি দূর করিবার জন্য ততটা জোর চেষ্টা করা হইবে না যতটা করা উচিত, আর এইজন্য তাহা দূর হয় নাই।

এই অপ্রত্যাশিত বিরোধ ছাড়া গোঁড়া সনাতনী-লোকদের সঙ্গে বিরোধ তো ছিলই। কয়েকদিন পরে তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিল, যখন গান্ধীজী দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। কয়েক স্থানে তাঁহার উপর আক্রমণ হইল। পুণা, যেখানে এই সমগ্র আন্দোলনের উগ্ররূপ প্রথম দেখা গিয়াছিল, সেই পুণাতেই সাধারণ সভায় যাওয়ার পথে গান্ধীজীর উপর বোমা ফেলা হয়। বিহারের মতো গান্ধীভক্ত ও শ্রদ্ধাবান প্রদেশেও গান্ধীজীর মোটরের উপর লাঠির আঘাত হয়। এই কাণ্ড দেওঘর-বৈদ্যনাথে হইয়াছিল, মোটরের হুড ছিল বলিয়াই বাপু চোট পান নাই, মোটরের ছাত তো লাঠির ঘায়ে গুঁড়াই হইয়া গেল। আজ যখন এতদিন পরে সমস্ত কথা ভাবিয়া দেখি, তখন বুঝিতে পারি যাহা ঘটিয়াছে বা করা হইয়াছে সমস্তই ঠিক হইয়াছে। এই কুপ্রথা দূর করায় সফলতাও হইয়াছে যথেষ্ট, যদিও এখনও আমরা বলিতে পারি না যে ইহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছি। প্রকৃত কথা এই, এখনও অনেক ঘুরিয়া বেড়ানো বাকি আছে। কিন্তু যখন আমি স্মরণ করি যে হাজার হাজার বৎসরের প্রথা—যাহা আমাদের প্রতি লোমে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যাহার সঙ্গে আমাদের ধর্মের একপ্রকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের মত ঘটিয়া গিয়াছে—সে-প্রথা কত দৃঢ়, তখন এ-বিষয়ে এ-পর্যন্ত যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহা কম বলিয়া মনে হয় না। আরও কিছু ধাক্কা লাগিবে, তখন এই পুরানো দেওয়াল পড়িয়া যাইবে। প্রয়োজন, কর্মীদের বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করিতে থাকা।

দিল্লীতে নব স্থাপিত হরিজন সেবকসংঘের বৈঠক হইল। আমি কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলাম না, তবু আমার ডাক পড়িল। দিল্লী গেলাম। দুর্ভাগ্যবশে জ্বরে পড়িলাম। হাঁপানির আক্রমণও শুরু হইয়া গেল। কয়েকদিন আমাকে সেখানে থাকিয়া যাইতে হইল। সে সময়ে দিল্লীতে ঠক্কর বাপ্পা সবজীমণ্ডীতে বিড়লা মিল্‌স্‌-এ থাকিতেন। আমিও সেখানে রহিয়া গেলাম; কিন্তু শরীর যখন কিছু বেশি খারাপ বলিয়া মনে হইল তখন শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা আমাকে নয়া দিল্লীতে বিড়লা-হাউসে, যেখানে তিনি নিজে থাকিতেন, সেখানে আনাইয়া লইলেন। কলিকাতায় যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমি শুরু করিয়াছিলাম, এখনও তাহাই যথাসাধ্য চালু রাখিয়া আসিতেছিলাম। এইজন্য সেখানেও হোমিও-প্যাথি চিকিৎসাই করাইলাম। ডাঃ যুদ্ধবীর সিংহ ভাল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, কংগ্রেসের লোকও বটে। তাঁহারই চিকিৎসা হইতেছিল। লাভও হইল। এখন একটু ভালই হইতেছিলাম, এমন সময় খবর আসিল, এলাহাবাদে .Unity Conference—একতা সম্মেলন হইতে চলিয়াছে। তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমাকেও ডাকা হইল। আমি দিল্লী হইতে সোজা প্রয়াগ চলিয়া আসিলাম।

এই সম্মেলনে প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান শিখ ও খ্রীষ্টান নেতা যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে অধিকাংশই তো ছিলেন জেলে। তবে যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহাদের ডাকা হইল। মৌলানা শৌকত আলি ও মৌলানা জাফর আলিও শুরুতেই আসিয়া গেলেন। কয়েকদিন পরে মৌলানা শৌকত আলি কি কাজে চলিয়া গেলেন, কিন্তু অন্য লোকেরা বরাবর সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। মিঃ ম্যাক-ডোনাল্‌ডের সিদ্ধান্ত তো বাহির হইয়াই গিয়াছিল। তাহাতে মুসল-মানদের তরফ হইতে যে-সব দাবি পেশ করা হইয়াছিল তাহা প্রায় সমস্তই মানিয়া লওয়া হয়। একটা জিনিস থাকিয়া গিয়াছিল—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হওয়া চাই, আর সিন্ধুকে লইয়া এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা চাই। এইসব বিষয়ে তখনও কোনও মীমাংসা হয় নাই। কনফারেন্সের কাজ খুব দীর্ঘ হইয়াছিল, খুব বাড়িয়া গিয়া-ছিল। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমরা প্রতিদিন সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত বসিতাম, আবার বিকালবেলা হইতে রাত আটটা-নয়টা পর্যন্ত বৈঠক করিতাম। বৈঠক হইত ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর আবাসগৃহে, তাঁহার

বাড়ির বড় হলঘরে। প্রত্যেক কথা লইয়া নিজেদের মধ্যে খুব তর্ক হইত। মুসলমানদের দিক হইতে যাহাই বলা হইত, অথবা ম্যাকডোনাল্ড চুক্তি হইতে তাহারা যাহা পাইয়াছিল, সে সবই শিখদের দিক হইতে দাবি করা হইত! ভাইসরয়ের কৌনসিলে যদি মুসলমানদের জায়গা অবশ্যই দিতে হয়, তবে শিখদেরও সেইরূপ অবশ্যই হইবে! মুসলমানদের জন্য যদি পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে শিখদেরও তাহা অবশ্যই চাই! এই-ভাবে সব কথাতেই জোর তর্ক চলিত। শিখ আর মুসলমানদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও প্যাঁচ খুঁজিয়া বাহির করিবার যেন হিড়িক পড়িয়া যাইত। কিন্তু লোকের মেজাজ গরম বা খারাপ হইত না। এতদিনের গরমাগরম তর্কের মধ্যে মাত্র দুই তিনবারই একটু বেসামাল হইয়া কেহ কড়া কথা বলিয়াছে অথবা সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে। মালব্যজীর ধৈর্যের সীমা ছিল না। অন্য লোকে তো তর্ক করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া যাইত, আর চাহিত যে কোনও একটা মীমাংসা হইয়া যায় কিংবা যে-কথায় একমত না হয় তাহা ছাড়িয়া অন্য কথা লইয়া আলোচনা করা যায়; কিন্তু মালব্যজী ছাড়িতেনই না। শেষে অনেক বিষয়ে একমত হইয়াও গেল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ স্থান সুরক্ষিত রাখিতে হইবে, এ-বিষয়ে একমত হইতে পারিল না। এ-বিষয়ে হিন্দুদের পক্ষ হইতে সর্বশুদ্ধ ত্রিশটি জায়গা দিবার কথা বলা হয়। কয়েকদিন ধরিয়া কথাবার্তা চালাইবার পর সবশুদ্ধ একত্রিশ কি বত্রিশটি জায়গা পর্যন্ত দেওয়ার বিষয়ে একমত হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইল, কিন্তু তখনও ৩৩⅓টি পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। ঐরূপ সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশ করিয়া গঠন করিবার ব্যাপারেও সকলে একমত হইতে পারিল না। কিন্তু বোঝা গেল যে ইহাতে হয়তো একমত হইতেও পারে।

শেষ পর্যন্ত মত স্থির হইল, যে, যে-তিনটি কথা এইভাবে অনিশ্চিত থাকিয়া গেল, তাহার বিষয় এক সপ্তাহের পরে কলিকাতায় ফিরিয়া সকলে একত্র হইয়া সেখানেই শেষ মীমাংসা করিবেন। ম্যাকডোনাল্ডের মীমাংসায় এই কথা ছিল যে, সে মীমাংসা রদ করিয়া দেওয়া হইবে যদি হিন্দু মুসল-মান ও অন্য সকলে নিজেদের মধ্যে একত্র হইয়া অন্য কোনও একটা বোঝা-পড়া করিয়া লয়। এই শর্তের জন্য পুণার বোঝাপড়া হইয়া গেলে পরে, অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্র মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সরাইয়া দিলেন। এই আশাতেই সম্মেলন করা হইয়াছিল যে যদি নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে ম্যাকডোনাল্ডের মীমাংসা হইতে যে কটুতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা তখনও ব্রিটিশ সরকারের কূট কৌশল বুঝিতে পারি নাই। যখন অনেক বিষয়ে এক মত হইয়া গেল, আর মনে হইল এখন শুধু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার জায়গার

কথাই বাকি রহিয়া গিয়াছে এবং তাহাও হয়তো কলিকাতায় গিয়া মীমাংসা হইয়া যাইবে, ঠিক সেই সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইংলণ্ড হইতে এক বিজ্ঞপ্তিপত্র বাহির করিল। আমরা কলিকাতায় যাওয়ার পথে রাস্তায় ট্রেনের উপরই এক বিজ্ঞপ্তিপত্র দেখিতে পাইলাম। ইহাতে কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্ব্লির এক-তৃতীয়াংশ জায়গার দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল! যে জিনিস লইয়া আমরা এতখানি তর্ক করিতেছিলাম, যাহা লইয়া আরও একবার আলোচনা করিবার জন্য আমরা কলিকাতা যাইতেছিলাম, সরকার ঠিক এই সময়েই সে-বিষয়ে রায় দিয়া দিলেন! আমরা বুঝিতে পারিলাম, এখন এই সম্মেলনের কাজ শেষ হইয়া গেল! ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ম্যাকডোনাল্ডের সিদ্ধান্তকে কোনও প্রকারে বদলাইতে চাহে নাই। তাহা কায়েম থাকিলেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কায়েম থাকিবে। তাহা আমাদের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য রদ করিয়া দিলে এবং তাহার পরিবর্তে আমাদের নিজেদের সন্ধিপত্র থাকিলে, যাহা সকলে স্বীকার করিবার জন্য নৈতিক রূপেও বাধ্য থাকিবে, ব্রিটিশ রাজের আর পায়রার লড়াই লাগাইয়া তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ থাকিবে না, বিড়ালদের লড়াইয়ে বানরের দুই-ভাগ খাইবার সুযোগও থাকিবে না। এই কারণে, এই অবসর উক্ত সিদ্ধান্তের এক অভাব পূরণের ঠিক উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হইল, আর তাহা শীঘ্র ঘোষণা করা হইল। সম্মেলন শেষ হইয়া গেল। আমরা কলিকাতায় আসিয়া একত্র হইলাম, কিন্তু একত্র হওয়ার কোনও মানে ছিল না।

সম্মেলনের প্রভাব সমস্ত দেশময় এমন ভালভাবে পড়িয়াছিল যে, সকলে আশা করিয়াছিল, এখন এ ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াই যাইবে। এ সংবাদ পাইয়া আলোয়ারের মহারাজা প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ও পণ্ডিত মালব্যের ইচ্ছা ছিল, সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে, যাহা প্রকাশ্য সভার রূপে হইবে, তিনিও বক্তৃতা করেন। সে সভাও হইল, যাহাতে বলা হইল যে সমস্ত বিষয়ে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, আর যা দুই একটা কথা বাকি আছে তাহাও মীমাংসা হইয়া যাইবে। মহারাজার বক্তৃতাও ভাল হইল। তাঁহার সঙ্গে পরে যে ব্যবহার হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতি তিনি যতটা অসন্তুষ্ট ছিলেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহার প্রতি তাহার চেয়েও বেশি অসন্তুষ্ট ছিল। অল্প দিন পরেই তাঁহাকে গদি হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল। কিছু দিন পরে তিনি ইংলণ্ডে আত্মহত্যা করেন।

ঐ সভা পর্যন্ত আমরা ইহাই বুঝিতেছিলাম যে, এই সম্মেলন দ্বারা আমরা একতা সাধন করিব। আমার এই সম্মেলনে হইতে একটা আশা হইয়াছিল দেখিয়াছিলাম অনেক বিষয়ে একমত হইয়া গিয়া-

ছিল। কিন্তু তর্কে আমিও কখনও কখনও জড়াইয়া পড়িতাম, যদিও আমি তর্কে খুব কমই যোগ দিতাম। কখনও কখনও আমি তো এমনই অনুভব করিতাম যে ছোটখাটো কথা লইয়া আমরা নিজেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি এক-মত হইতে পারি না। ৩২ ও ৩৩৪, এই দুইয়ের মধ্যে খুব সামান্যই প্রভেদ, কিন্তু আমরা ইহাও দূর করিতে পারিলাম না! এইজন্য সম্মেলনকে স্থগিত রাখিতে হইল, যাহার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিল, এবং যে-গ্রন্থি বাধিয়া গেল তাহা পরে খোলা যেন অসম্ভব হইয়া গেল।

দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার ও বিহারের ইউনাইটেড পার্টি

আমি একতা-সম্মেলনের কাজে কলিকাতায় গিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে খানিকটা থাকিয়া যাইতে হইল। সেখানে আন্দোলনের জন্যও কিছু কাজ করিয়া লইলাম। তখনকার দিনে টাকার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমি কিছুটা হাত দিলাম। লোকদের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ ও শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু লোকে খুব ভয় পাইয়া গিয়াছিল। তাই কোনও ধনী ব্যক্তি খোলাখুলিভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু চুপে-চুপে টাকা দিবে, এমন লোক বিস্তর ছিল। ইহার এক খুব ভাল দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া উপযুক্ত মনে করি। আমি যখন কাশীতে থাকিয়া গিয়াছিলাম, এক-দিন কোথাও যাইবার সময়, রাস্তায় এক পুরাতন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, গান্ধীজীর কাছে তাহার আসা-যাওয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার কিছুটা আশ্চর্য লাগিল। সেখানে সে আমার কাছে এইটুকুই জানিয়া লইল যে আমি বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তের বাড়িতে আছি। সে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিল। সে বলিল—শুনেছি, আন্দোলনে টাকার দরকার আছে, আর এই দরকার মান্দ্রাজ ও বিহারে বেশি করে বোধ হচ্ছে। আমি বলিলাম, টাকার দরকার তো আছেই। সে টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল। আজ আমার ঠিক মনে নাই, কিন্তু সমগ্র ভারতের কাজের জন্য আট-দশ হাজার টাকার নোট সে আমার হাতে দিয়া দিল। আমি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম এবং তাহার ইচ্ছানুসারে টাকা এখানে-ওখানে পাঠাইয়া দিলাম। এইভাবে লোকের সাহায্য কলিকাতাতেও পাইলাম। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

জেল হইতে বাহির হইবার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। দিন

কাটিতে দেরি লাগে না। ইহার মধ্যে দুইবার অসুস্থ হইয়া পড়িলাম, গান্ধীজীর উপবাস ও পুণার চুক্তির সময় সেখানে হাজির ছিলাম, হরিজন সেবক সংঘের অনুষ্ঠান ও সভাদি করিলাম। প্রয়াগের একতা সম্মেলনের দীর্ঘ অধিবেশনে কাজ করিতে ও তাহার জন্য আবার কলিকাতায় আসিতে হইল। এই সমস্ত করিতে করিতেও বরাবর বোধ করিতাম যে আমার বাহিরে থাকা উচিত নয়। আমাকেই কংগ্রেসের সভাপতি অথবা ডিক্টেটর বলিয়া মনে করিত, আর তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে নিজের জায়গায় কাহাকেও মনোনীত করিতে হইত। প্রয়াগে একতাসম্মেলন সমাপ্ত হইবার সময়েই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে এখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই জেলে যাত্রা করিব। সেখানে রাজাজী ও শ্রীযুক্ত অ্যানেও ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম, রাজাজীকে মনোনীত করিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি এখন কিছুদিন পর্যন্ত হরিজন সেবার কাজ আরও করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিজেদের মধ্যে মতামতের পর আমি শ্রীযুক্ত অ্যানেকে মনোনীত করিয়া ছিলাম। আমি গ্রেপ্তার হইয়া গেলে তিনিই ডিক্টেটর হইলেন।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আমি পাটনায় উপযুক্ত দিনের অপেক্ষায় থাকিলাম। বড়দিনের ছুটি আসিয়া গেল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, ৪ঠা জানুয়ারি (১৯৩৩) কোনও প্রকারে গ্রেপ্তার হইয়া যাইব। ১৯৩২ সালে ৪ঠা জানুয়ারি তারিখেই গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া দমনকার্য শুরু করিয়াছিলেন। তাহারই স্মরণে এবৎসরেও সর্বত্র কংগ্রেসের তরফ হইতে এক বিজ্ঞপ্তিপত্র পড়িবার কথা ছিল। ইহার মধ্যে একদিন শ্রীযুক্ত কৃপালনী, যিনি বাহিরে ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি কিছু টাকার বন্দোবস্তর জন্যই আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় যাহা কিছু হইয়াছিল, সে সমস্ত তাঁহাকে বলিয়া দিলাম। কাহাকে পত্র দিয়াছিলাম তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু কোনও বন্ধুর নামে তাঁহাকে এক পত্রও দিয়াছিলাম। তিনি সেই পত্র লইয়া যাইতেছিলেন। পাটনা স্টেশনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রেপ্তার করিতেই তিনি পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু পুলিশ টুকরাগুলি একত্র করিয়া সাঁটিয়া আবার পুরা পত্র তৈয়ার করিয়া লইল। তাহার উপর মকদ্দমা চলিল। বাঁকীপুর জেলের ভিতরেই তাহা পেশ করা হইল। আমিও মকদ্দমা শুনানীর সময় গেলাম। মকদ্দমা শেষ হইলে বাহিরে আসিলাম। যেমনই নিজের গাড়িতে উঠিতে গিয়াছি, অমনি পুলিশ অফিসার আসিয়া আমাকে খবর দিল যে আমাকে এখানে থাকিয়া যাইতে হইবে! আমি তাড়াতাড়ি আবার ফটকের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। কৃপালনীজী ও বাবু মথুরাপ্রসাদ প্রথম হইতেই আসিয়া গিয়াছিলেন—মথুরাবাবু ৪ঠা জানুয়ারির ঘোষণা

পড়িবার জন্য। আমিও তাঁহাদের সঙ্গী হইয়া গেলাম। দুই এক দিন পরে আমার নামেও মকদ্দমা আরম্ভ হইল। মথুরাবাবুর ১৮ মাস, কৃপালনীজীর ৬ মাস, আমার ১৫ মাস সাজা হইল। আমার আশ্চর্য লাগিল, আমারই বা ১৫ মাস সাজা হইল কেন, যখন মথুরাবাবুর ১৮ মাস হইয়াছে। আমি মজা করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসাও করিলাম। ইনি সেই পূর্ব-পরিচিত ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি আমাকে ছাপরায় সাজা দিয়াছিলেন এবং আমি যখন ওকালতি করিতাম তখন আমার পুরনো মক্কেলও ছিলেন। যাক, কিছুদিন পরে আমাদিগকে হাজারিবাগ পেঁৗছাইয়া দেওয়া হইল।

হাজারিবাগে আবার ঐভাবে পড়াশুনা ও চরখা চালাইবার কাজে সময় কাটিতে লাগিল। খাঁ সাহেবেরা দুই ভাই তখন পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। কয়েকদিন পরে খবরের কাগজে জানা গেল যে গান্ধীজী হরিজনদের সম্বন্ধে লিখিবার যে সুবিধা পাইয়াছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনশন করিয়াছেন, শেষে সরকারকে সুবিধা দিতে হইল ও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেও হইল। বাহিরে আসিয়া তিনি দেশের অবস্থা দেখিলেন। তিনি হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের দিক হইতে প্রায়শ্চিত্ত ও কর্তব্যের সূচনা দেওয়ার জন্য ২১ দিন উপবাস করিলেন। ইহাতে আমরা খুব চিন্তিত হইলাম। সেখানে প্রতিদিন আমরা প্রার্থনা করিতাম। এমনিতেই তো সন্ধ্যাকালে, ঠিক কুঠুরি বন্ধ হইবার পূর্বে, আমরা বরাবর একত্র প্রার্থনা করিতাম; কিন্তু এই উপবাসের দিনে আরও বেশি করিয়া প্রার্থনা হইত। কেহ গীতাপাঠ করিত, কেহ রামায়ণ আবৃত্তি করিত, কেহ শুধু ফল খাইয়া থাকিত। নিজের নিজের রুচি ও শক্তি অনুসারে অনেকে আত্মশুদ্ধির জন্য ঐরূপ কিছু না কিছু করিত। যেদিন এই ২১ দিনের ব্রত নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল, সেদিন আমরা একত্র হইয়া বিশেষ প্রার্থনা করিলাম, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

এই উপবাসের ফল হইতে সুস্থ হইয়া গেলে পর গান্ধীজী যে সব কংগ্রেসী কর্মী বাহিরে ছিলেন তাঁহাদের লইয়া সভা করিলেন। তাহাতে দেশের অবস্থা লইয়া অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। ঐ সময়ে পণ্ডিত জওহরলালজীও বাহিরে আসিয়া গিয়াছিলেন। আমরা সম্পূর্ণ সংবাদ তো পাইতাম না; কারণ তখনকার দিনে খবরের কাগজই আমরা পাইতাম না—শুধু স্টেটসম্যানের যে বিদেশের জন্য প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংস্করণ, তাহাই পাইতাম। কিন্তু কেহ না কেহ বাহির হইতে নূতন ধরা পড়িয়া আসিয়াই যাইত, আর তাহার কাছে কিছু কিছু খোঁজ-খবর পাইতাম। আমরা হয়তো স্টেটসম্যানেই পড়িয়াছিলাম, না হয় বাহির হইতে কেহ সেখানে আসিয়া বলিয়াছিল, সত্যাগ্রহের রূপ এখন ব্যক্তিগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল প্রদেশে আবার কিছু কিছু জাগরণ দেখা দিল। কেহ

কেহ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে আবার জেলে গেল। এ-বিষয়ে বিহার ভাল মতো উৎসাহ দেখাইল। এখানে ছয়-সাত শতের বেশি লোক গ্রেপ্তার হইল। কিন্তু আমাদের এমনও মনে হইতে লাগিল যে লোকদের মধ্যে খানিকটা শৈথিল্য আসিয়া গিয়াছে। জনসাধারণ এই সত্যাগ্রহেও পূর্ণ উৎসাহ দেখাইয়াছিল এবং ইহা আরম্ভ হওয়ার প্রায় ১৮ মাস পরে এই শৈথিল্য দেখা গেল। আমার নিজের ধারণা যে ইহার অন্যতম কারণ ইহাও যে কর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ গোপনে কাজ করিতে লাগিয়া গেল। সত্যাগ্রহে জনসাধারণের শ্রদ্ধা তখন পর্যন্ত স্থির থাকে যতক্ষণ কর্মীরা, বিশেষত প্রধান কর্মীরা, সাহস করিয়া নিজেদের উপর গভর্নমেণ্টের অত্যাচার টানিয়া লয় অথবা টানিবার জন্য তৈয়ারি থাকে। যখন প্রধান কর্মীরা, আন্দোলন চালাইবার জন্য নিজেদের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় মনে করিয়া বাহিরে থাকিয়া যায়—সরকারি দণ্ড হইতে বাঁচিবার বা পলাইবার জন্য নয়, তখনও লোকদের খানিকটা ধারণা অবশ্যই হইয়া যায় যে এ নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতেছে। এই জন্য জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগের উৎসাহ কম হইতে থাকে।

গভর্নমেণ্ট যখন খুব কঠোরতার সঙ্গে দমন করিয়া কংগ্রেসের জন্য থাকিবার বাড়ি, পয়সা কড়ি অথবা খোলাখুলিভাবে কাজ করিবার লোক কিছুই রাখিল না, তখন কেহ কেহ সংগঠনকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য গোপনেই কাজ করিতে শুরু করিয়া দিল। তাহারা কাজ করিল, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গিতেও দিল না। প্রায় সকল প্রদেশ হইতে প্রাদেশিক কমিটিগুলি কাজ করিতে থাকিল, ঐভাবে জেলায় জেলায়ও কমিটিগুলির প্রতিনিধি কাজ করিতে থাকিল। এই শৃঙ্খলা ভাঙ্গিতে পারিল না। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আদেশ ও মন্তব্য সকল প্রদেশে পৌঁছিতে থাকিল, সেই মতো অল্পবিস্তর কাজও হইতে থাকিল। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে, যাহাদের হইতে নূতন নূতন কর্মী ও সত্যাগ্রহী পাওয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে উৎসাহ কম হইতে লাগিল। লুকাইয়া লুকাইয়া কাজ করিবার প্রভাব অন্ততঃ ভাল হইল না। সত্যাগ্রহের লড়াই এ-বিষয়ে অন্য লড়াই হইতে পৃথক। ইহাতে নেতাদেরই আগে যুদ্ধে লাফাইয়া পড়িতে হয়—তাহাদের নিজেদেরই সর্বাগ্রে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। আজকালকার সশস্ত্র যুদ্ধে জেনারেল আগে যায় না, অধিকাংশ সময়ে তো তিনি লড়াইয়ের ময়দানেও যান না—তিনি পিছন হইতেই সেনা সঞ্চালন করিতে থাকেন। সেনাও আশা করে যে জেনারেল পিছনে থাকিয়া নিজেকে সুরক্ষিত রাখিয়া সৈন্যসঞ্চালন করিবেন। এইজন্য তিনি পিছনে থাকিলেও সেনাদের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু সত্যাগ্রহে সেনারাও আশা করে যে সর্দারই সর্বাগ্রে যুদ্ধ করিবেন। এইজন্য ইহাতে সর্দার পিছনে

পড়িলে সেনাদের মধ্যে স্বাভাবিক অসন্তোষ ও দুর্বলতা আসিয়া যায়। ১৯৩৩ সালেও এইরূপই হইল।

আমি যখন বাহিরে ছিলাম, তখন ১৯৩২ সালে এই প্রদেশে একটা ব্যাপার হয়। গোলটেবিল কনফারেন্স প্রভৃতি কাজকর্মে এতখানি নিশ্চিত মনে হইয়াছিল যে কিছু না কিছু শাসনতন্ত্রে সংস্কার হইবে। আর সে সংস্কার কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করুক আর নাই করুক, নূতন করিয়া তো নির্বাচন হইবেই। তাহার মধ্যে জনসাধারণকে যোগ দিতে হইবে। বিহারের কথা কি, সমস্ত দেশে কিষাণদের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের হাতে অনেক ভোট থাকিবে। তাহাদের মধ্যে কংগ্রেসের পুরা প্রভাব ছিল। ১৯২৩ ও ১৯২৬-এর নির্বাচনে তাহা দেখা গিয়াছিল। ১৯৩০ ও ১৯৩২-৩-এর সত্যাগ্রহের পরে এই প্রভাব বাড়িয়াই গিয়াছিল। কমে নাই। ইহা বুঝিয়া বিহারের গভর্নর বিহারের জমিদারদের কিষাণদের মধ্যে সংগঠন করিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছিলেন। প্রকাশ ছিল যে কিষাণদের ঝগড়া এখন জমিদারদের সঙ্গেই হইত। এইজন্য তাহারা এক নূতন পার্টি তৈয়ারি করিল। তাহাতে চেষ্টা হইল কিষাণদেরও মিলাইবার। পার্টির নাম হইল 'ইউনাইটেড পার্টি।' তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে যতক্ষণ কংগ্রেসের লোকেরা যুদ্ধ করিতেছে, তাহার মধ্যে আমরা খাজনা আইনের এমন কিছু পরিবর্তন করিব যাহাতে কিষাণদের খানিকটা সাহায্য হয় আর এইভাবে তাহাদের পার্টিতে আনিতে পারিব—যখন নূতন নির্বাচন হইবে এবং কংগ্রেস যোগ দিবে, তখন এই ইউনাইটেড পার্টি এতখানি শক্ত হইয়া যাইবে, এবং কিষাণেরা ইহাতে এতখানি যোগ দিবে যে কংগ্রেস বিরোধিতা করিতে পারিবে না।

এই পার্টির নিয়ম কিছু খারাপ ছিল না। যদিও কংগ্রেসের দৃষ্টিতে তাহা যথেষ্ট ছিল না। ইহাতেও ঔপনিবেশিক স্বরাজ উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা হইল এবং লিবারেল ফেডারেশনে যেভাবে প্রস্তাব হইত, ঐ ধরণের প্রস্তাবও কিছু কিছু করা হইল। বিহারে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও দল ছিল না। একদিকে ছিল ইংরেজ সরকার ও তাহার সাহায্যকারীদের দল, অন্য দিকে কংগ্রেস বা সরকারের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধে রত তাহাদের দল; লিবারেলদের মত মাঝখানে থাকিয়া বিচার করিবার কোনও দল ছিল না। এই পার্টি লোকদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তাও হইল। আমি বুঝিলাম যে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল খাড়া করিবার জন্য এই চেষ্টা, এবং ইহাতে গভর্নরেরও ইশারা-ইঙ্গিত আছে। তথাপি আমার মনে মুহূর্তের জন্যও এই সন্দেহ হয় নাই যে এই দল কংগ্রেসের সহিত বিরোধিতা করিতে পারিবে। কংগ্রেসের প্রভাবের কারণ তাহার সেবা ও ত্যাগ। এই পার্টিতে তো তাহা হইতে পারিবে না। আমি ইহাও বুঝিতেছিলাম যে, নির্বাচনে স্থান পাওয়াকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মানিয়া

যে পার্টি গঠন করা হইতেছে, তাহা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করিয়াও থাকিতে পারিবে না, কারণ পার্টির ভিতরে উমেদারের সংখ্যা স্থানের অপেক্ষা কয় গুণ অধিক হইবে। এ ছাড়া নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হইতে থাকিবে। এই কারণে, এই পার্টি যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে পারিবে সে ভয় আমার ছিল না। আমি ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে মাঝখানে যদি এমন এক পার্টি গঠিত হয় তবে তাহাতে কিছু মন্দও হইবে না; কারণ যখন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে লড়াইয়ে কংগ্রেস আটকাইয়া যায়, তখন গঠনকর্ম করিবারও কেহ থাকে না। হয়তো এই পার্টি হইতে সুযোগমত দেশের কিছু সেবাও হইতে পারিবে। ইহাও ভাবিলাম যে যদি এই পার্টি কিষাণদের নিজের দিক হইতে কিছু সাহায্যও করে তাহা হইলে উহাতে কিষাণদের লাভই হইবে—আবার যখন কংগ্রেসের সঙ্গে ইহার বিরোধিতা হইবে তখন কিষাণ শুধু কংগ্রেসেরই সাহায্য করিবে, স্বরাজের কথা ভুলিবে না। এইজন্য আমি এই পার্টি গঠনে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম। ইহার প্রধান কর্মীদের সঙ্গে কথা হইলে আমি নিজের মতও বলিয়া দিলাম। তাঁহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে আমি এবিষয়ে এক মন্তব্য প্রকাশিত করিয়া দিই। আমি রাজি হইয়া গেলাম। সংবাদপত্রে আমি এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম, তাহাতে ইহাই লিখিলাম যে এই পার্টি যদি নিজের প্রকাশিত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করিয়া যায় তবে আমি আশা করি যে তাহাতে দেশের ভালই হইবে, মন্দ নয়।

এই বিবৃতির সংবাদ হাজারিবাগের বন্ধুরা পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমি সেখানে পেঁাছিলে এ-বিষয়ে কথা-বার্তা হইল। আমি নিজের মত খুলিয়া বলিলাম। কিন্তু হয়তো উঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। আমরা সেখানে থাকিতে থাকিতেই এই পার্টির তরফ হইতে খাজনা-সম্বন্ধীয় আইনের কিছু সংশোধনের কথা বলিল। আমি তো এ-সব কথা জানিতামই, আর জানিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু কোন কোন বন্ধু ইহাতে ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, এই-ভাবে পার্টি তাহার প্রভাব কিষাণদের মধ্যে বিস্তার করিবে। তাঁহাদের মত হইল যে ইহার বিরোধিতা করা প্রয়োজন। কংগ্রেস তো ছিল জেলে, আর তাহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এইজন্য কিষাণ-সভাই বিরোধিতা করিতে পারিত। হয়তো পূর্বেরই সভা, কংগ্রেসের শক্তির জন্য বিশেষ কিছু কাজ করিতেছিল না। কেহ কেহ তাহাকে পুন-র্জীবিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে তাহাদের উৎসাহবাণী পাঠানো হইল। স্বামী সহজানন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল যে তিনি কিষাণ-সভা সংগঠন করিয়া খাজনা আইনের সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা করুন। আমি ইহা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে

করিতাম, কারণ উপরে বলিয়াছি; কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া থাকিলাম। ব্রজকিশোর বাবুও কিষাণ-সভার মতো অন্য এক প্রতিষ্ঠান যে প্রয়োজনীয় তাহা বোঝেন নাই। কিন্তু তিনি বাহিরে থাকিয়াও এবং আমি ভিতর হইতে ইহার বিরোধিতা করিলাম না। এই-ভাবে আমাদের অনুপস্থিতিতেই কিষাণ-সভার সংগঠন দৃঢ় হইতে লাগিল। খাজনা আইন সংস্কারের বিরোধিতা প্রবলভাবে হইতে লাগিল। পূর্বেকার কয়েকটি কিষাণসভার প্রধান প্রধান কর্মী এই কিষাণসভার বিরোধিতা ও সংস্কারের সমর্থন উৎসাহের সঙ্গে করিয়া চলিল। প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার হইতে লাগিল, আমরা জেল হইতে ছাড়া পাওয়া পর্যন্ত ইহার মীমাংসা হইল না।

কঠিন রোগ

১৯৩৩-এর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। একটু কাশ আরম্ভ হইয়া গেল। হয়তো অজানিতে ঠাণ্ডা লাগাতেই ঐরূপ হইল। প্রথমে তো আমরা ভাবিয়াছিলাম যে ইহা সাধারণ কাশ, শীঘ্র সারিয়া যাইবে। কিন্তু উহা না কমিয়া দিন দিন বাড়িতে থাকিল। হাঁপানিরও আক্রমণ হইল খুব। একবার তো আক্রমণ এত প্রবল হইল যে প্রায় দুই-তিন দিন পর্যন্ত আমি খুব ক্লান্ত শ্রান্ত ছিলাম। তাহার পর ইঞ্জেকশন দেওয়া হইল। হাঁপানি খানিকটা কমিয়া গেল, তাহার পর কিছু খাইবার জন্য আমি উঠিয়া বসিলাম। সবে চামচ করিয়া দুধ ও রুটির টুকরা মুখে দিয়াছি অমনি খুব জোরে হাঁপানির টান উঠিল, আর শ্বাস এত ঘন ঘন উঠিতে লাগিল যে মনে হইল প্রাণ বুঝি গেল। আমি বেহুঁসের মত হইয়া গেলাম। জেল ডাক্তার আসিয়া কিছু শুঁকিতে দিল, তবে জ্ঞান হইল। তাহার পর উৎকট আমাশয় হইল। দিনে ২৪।২৫ বার দাস্ত হইতে লাগিল। দুর্বলতা খুব বাড়িল। শরীর খুব দুর্বল হইয়া গেল। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গভর্নমেণ্টকে লিখিলেন, ইঁহাকে চিকিৎসার জন্য পাটনা হাসপাতালে পাঠানো হউক। প্রথমে এ-বিষয়ে কিছু ভাবা যায় নাই। দাদা খবর পাইয়া ঘাবড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার অবস্থা দেখিয়া খুব চিন্তিত হইলেন। রাঁচী গেলেন। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। শেষে গভর্নমেণ্টের আমাকে পাটনায় পাঠাইবার হুকুম হইল। তাহা হইল সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। রোগ আরম্ভ হইবার দুই মাস

পরে। আমাকে পাটনা জেলে পাঠানো হউক এবং পাটনা হাসপাতালে রোগের পরীক্ষা করা হউক, এই ছিল হুকুম। যখন আমাকে হুকুম বলা হইল তখন আমি বলিলাম, পাটনা হাসপাতালে যদি যাওয়া না হয়, পাটনা জেলেই যাওয়া হয়, তাহা হইলে এখানে থাকাই ভাল। কিন্তু আমাকে বলা হইল যে লিখিবার ধরণই এই, ইহার অর্থ এই যে আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হইতেছে।

পরের দিন সকালে কোনও প্রকারে আমাকে পাটনায় লইয়া আসা হইল। দাদাও সঙ্গেই আসিলেন। প্রথমে জেলে আনিয়া সেখান হইতে তাড়াতাড়ি করিয়াই হাসপাতালে লইয়া গেল। হাসপাতালে আমি সেই সব ঘরের একটিতে জায়গা পাইলাম যেখানে রোগী ভাড়া দিয়া থাকে, আর যেখানে বাড়ির ছেলেপিলেদের থাকিবার জন্যও অল্প জায়গা থাকে। আমার বৌদিদি, স্ত্রী ও চাকরও সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে লাগিল। ডাঃ ব্যানার্জি আমি পৌঁছিবামাত্র পরীক্ষা করিলেন। অবস্থা খারাপ দেখিয়া শীঘ্র চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ডাঃ রঘুনাথশরণ এবং অন্য যে-ডাক্তার আগে হইতে আমাকে জানিতেন যাওয়া-আসা করিতেন। পুলিশ পাহারা থাকিত; কিন্তু কাহারও যাওয়া-আসার বারণ ছিল না। কয় দিন ধরিয়া তো অবস্থা খারাপ থাকিল; পরে আস্তে আস্তে ভাল হইতে লাগিল। মল ও জ্বর খানিকটা সামলাইয়া লইলাম। কাশও একটু কম পড়িল। তখনও অসুখ দূর হয় নাই, তাহার উগ্রতা একটু কম হইয়াছিল। রোগ দূর করিবার জন্য চিকিৎসা আরম্ভ হইল এমন সময়ে বিকালে তিনটা চারটায় আচমকা খবর আসিল—গভর্নমেণ্টের হুকুম আসিয়াছে, আমাকে শীঘ্র বাঁকিপুর জেলে পাঠানো হউক। হয়তো কেহ গভর্নমেণ্টের নিকটে কোনও খবর দিয়া থাকিবে বা নালিশ করিয়া থাকিবে যে আমার সঙ্গে অনেক লোক দেখা করিতে আসে আর আমি সেখানে খাটে বসিয়া আন্দোলন চালাইতে থাকি। কথাটা ছিল একেবারেই মিথ্যা। লোকে অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত—আর রোগের জন্য তাহা ছিল স্বাভাবিক; কিন্তু আমি কাহারও সঙ্গে আন্দোলনের সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই।

যাহা হউক, হাসপাতাল হইতে তাড়াতাড়ি বাঁকিপুর জেলে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল। খবর পাইয়াই ডাঃ ব্যানার্জি সাহেব চলিয়া আসিলেন। তাঁহার খুব দুঃখ হইল; কারণ তিনি রোগের চিকিৎসা এখন শুরু করিয়া দিয়াছিলেন, এপর্যন্ত তো উগ্র কারণগুলিই কম করিতে পারিয়াছিলেন। সেখানে যে-সব ঔষধপত্র তিনি দিতেছিলেন তাহা লিখিয়া তিনি এক রিপোর্টও সঙ্গে দিয়া দেন। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে (তিনি আবার জেলার সিভিল সার্জেনও বটে) তাঁহার কথাবার্তাও

হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহারই চিকিৎসা যাহাতে চলে তাহার জন্য বলিয়া দিলেন। জেলে সেই ঔষধই চলিতে থাকিল। আমি খানিকটা সুস্থ তো হইয়াই গিয়াছিলাম। জেলেও সংস্কার হইয়া গিয়াছিল। এখন ঠাণ্ডার দিন আসিতেছে, আমার শরীর সবদা খারাপ হইতেছে। একদিন আবার হঠাৎ খুব জোরে হাঁপানি শুরু হইল। দুই দিনের মধ্যে অবস্থা খুব খারাপ হইয়া গেল। সিভিল সার্জন অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। অবস্থা দেখিয়া তিনিও খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি আবার গভর্নমেণ্টকে লিখিলেন বা টেলিফোন করিলেন; ডাঃ ব্যানার্জিকেও আমাকে দেখিবার জন্য লইয়া আসিলেন। ডাক্তার ব্যানার্জি কিছু ঔষধ দিলেন। সে রাত্রে আমি খানিকটা ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বেশি উপকার হয় নাই। শেষটায় সিভিল সার্জন আবার গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কথা বলিয়া আমাকে জেল হইতে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যখন তিনি আমাকে বলিলেন যে গভর্নমেণ্টের আমাকে হাসপাতালে পাঠাইবার হুকুম আসিয়া গিয়াছে, তখন আমি বলিলাম যে এইভাবে জেল হইতে হাসপাতাল ও হাসপাতাল হইতে জেল আসা-যাওয়া আমি বরদাস্ত করিতে পারি না, যাহা করিবার তাহা এখানেই হউক। ইহার পরে তিনি আশ্বাস দিলেন যে এবার যতক্ষণ ডাক্তারেরা আমাকে সুস্থ করিয়া ফিরাইয়া না দিবে ততক্ষণ আমাকে হাসপাতালেই রাখা হইবে।

কথাটা এই যে প্রথমবারের হুকুমে শুধু পরীক্ষার জন্যই হাসপাতালে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু সেখানে ডাক্তারেরা ঔষধপত্র দিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, ইহার জন্য গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের কাছে কৈফিয়ৎ চায়! কিন্তু জেলের ইনস্পেক্টর-জেনারেল, সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের ডাক্তার সকলে জবাব দিয়াছিলেন যে চিকিৎসা ছাড়া পরীক্ষার কোনও মানে নাই, আর অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই কথার রিপোর্ট ডাক্তারি ভাষায় গভর্নমেণ্টকে দেওয়াও হইয়াছিল। তাহাতে গভর্নমেণ্টের মুখ বন্ধ হইল বটে. কিন্তু আমাকে তাড়াতাড়ি ফেরৎ পাঠাই-বার হুকুম বাহির করা হয়। যখন জেলে দ্বিতীয়বার রোগ খুব বাড়িয়া যায় তখন সকলে মিলিয়া সোজা হুকুম করাইয়া লয় যে না সারিয়া ওঠা পর্যন্ত আমাকে ওখানেই থাকিতে হইবে।

আমাকে যখন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ। এইবার জেলের কঠোরতাও ছিল যথেষ্ট। হুকুম হইয়াছিল যে বাড়ি হইতে দুইজন স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতে পারিবে, কাজের জন্য দুই এক-জন চাকর, আর কেহ দেখাশুনা করিবার জন্য আসিতে পারিবে না। হপ্তায় একবার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারিবে—তাহাও পুলিশ ও জেল কর্মচারীদের সাক্ষাতে। আমার ইহাতে বিশেষ কোনও

কষ্ট হয় নাই, কারণ আমি প্রথম হইতেই কাহারও সঙ্গে আন্দোলনের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতাম না, আর এখন তো এতই অসুস্থ ছিলাম যে চৌকি হইতে উঠিয়া চেয়ারেও বসিতে পারিতাম না। এবারের অসুখ প্রথম হইতে বেশি শক্তও ছিল, হাজার চেষ্টাতেও কমিতেছিল না। কখনও কখনও ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দিবার প্রয়োজন হইত। শ্বাস কষ্ট চার পাঁচ ঘণ্টার জন্য একটু কমিত, আবার যে কে সেই, বাস, আবার ইনজেকশন দেওয়া হইত। নভেম্বর ডিসেম্বর খুব খারাপভাবে কাটিল। রোগে ভুগিতাম বটে কিন্তু এতখানি কঠিন রোগ আগে কখনও হয় নাই। ডিসেম্বরে হাসপাতালের ডাক্তারেরা গভর্নমেণ্টকে লিখেন যে অবস্থা খারাপ, রোগকে কায়দা করা যাইতেছে না, রাত্রে এত ক্লান্তি হয় যে মেডিক্যাল কলেজের দুইজন ছাত্র পালা করিয়া জাগিয়া দেখাশুনা করে। কিন্তু গভর্নমেণ্টের কাজ তাড়াতাড়ি তো হয় না। শেষে হুকুম হইল, মেডিক্যাল বোর্ড আমাকে পরীক্ষা করিবে। এই বোর্ডে সেই ডাঃ ব্যানার্জি, সেই সিভিল সার্জন, আর তৃতীয় ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল। আমার অভিজ্ঞতা ছিল, ডিসেম্বরের শেষে প্রত্যেক বৎসর রোগের জোর কিছু কম হয়। এ-বৎসরও সেইরূপই হইল। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মেডিক্যাল বোর্ড যখন পরীক্ষা করিতে আসে, তখন রোগের প্রকোপ কমিয়া গিয়াছিল। সমস্ত অবস্থা ও প্রতিদিনের রিপোর্ট দেখিয়া বোর্ড আমাকে ছাড়িয়া দিবার সুপারিশ করিল। আমাকে তাহা বলা হয় নাই। জেলে এক বৎসরের বেশি হইয়া গিয়াছিল—সাজা ছিল পনেরো মাসের। হয়তো মেয়াদের বাকি ছিল দেড় মাস কি দুই মাস। রিপোর্টের উপর গভর্নমেণ্ট ১৯৩৪-এর ১৫ই জানুয়ারি বিচার করিলেন—আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া স্থির হইল। আমি সেদিন খাওয়ার পর চৌকিতে শুইয়াছিলাম। একজন লোক আসিয়া চাকরকে দিয়া খবর দিল, স্যর গণেশদত্ত সিংহ খবর পাঠাইয়াছেন—গভর্নমেণ্ট আজ স্থির করিয়াছেন, আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এখন এক আধ দিনের মধ্যে এই হুকুম জেলের মারফৎ পৌঁছিয়া যাইবে। চাকর আসিয়া এই কথা আমার বৌদিদি ও স্ত্রীকে বলিল—তাহারা আবার আমাকে খবর দিল।

হাসপাতালে চৌকির উপর শুইয়া শুইয়া ভাবিতাম—রোগের যখন প্রকোপ ছিল, যখন এখন-তখনের নহবৎ বাজিতেছিল, তখন তো গভর্নমেণ্ট কিছু করে নাই; এখন যে কিছু ভাল হইয়া গিয়াছি, দিন দিন স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার সম্ভাবনা ও আশা আছে, এবং মেয়াদও প্রায় পুরা হইতে চলিয়াছে, তখন এই বিনামূল্যের আরাম আমার উপর কেন চাপানো হইল! রোগ যখন কঠিন ছিল, তখন তো ঘরের কোনও লোকের সঙ্গে, দাদার সঙ্গেও, সপ্তাহে একবারই পুলিশের সামনে সাক্ষাৎ হইতে পারিত! রোগ এত কঠিন ছিল যে একবার আমার বৌদিদি চলিয়া গিয়াছিলেন আর আমার ভাইপোর স্ত্রী দুইবার দিনের জন্য সেবা করিতে আসিলেন, তাহার চার বৎসরের এক শিশুসন্তান ছিল যে তাহাকে ছাড়িয়া আলাদা থাকিতে পারিত না; তাহার উপরও ওজর হইল যে দুইজন লোকের থাকিবার হুকুম আছে, এই শিশু তৃতীয় ব্যক্তি, সঙ্গে থাকিতে পারিবে না! তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল! এখন কেন এই বৃথা উপকার লইব?

আমি এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে চৌকির উপর পাশ বদলাইতেছিলাম এমন সময়ে চৌকি নড়িতেছে বলিয়া মনে হইল। আবার বাড়ির দরজা জানালা নড়িতে লাগিল। আমার মনে হইল, রোগে ভুগিয়া আমি এতটা দুর্বল হইয়া গিয়াছি, আর এতক্ষণ ধরিয়া ভাবনা-চিন্তায় পড়িয়া আছি, তাই আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। আমি ইহা ভাবিতেছিলাম এমন সময় আমার বৌদিদি অন্য ঘর হইতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, ভূমিকম্প হইতেছে। আমি চট্ করিয়া বুঝিয়া লইলাম। বলিলাম যে সকলে বাহিরে পালাও। শীঘ্র চৌকি হইতে নামিয়া বাহিরে গেলাম, সামনের ময়দানে গিয়া দাঁড়াইলাম। মাটি এত জোরে কাঁপিতেছিল যে দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক ঘর্ঘর শব্দ ছিল। শত শত রেলগাড়ি একসঙ্গে চলার মত আওয়াজ হইতেছিল। অন্যান্য রোগীদের কেহ কেহ, যাহারা আশপাশে বাড়িতে ছিল, আর যাহারা চলিতে পারিত, তাহারা নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মাঠের মধ্যে অনেক গরু চরিতেছিল, তাহারা লেজ উঠাইয়া এদিক-ওদিক ছুটিতে লাগিল। একবার সকলে মিলিয়া আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানে এভাবে ছুটিয়া আসিল যে মনে হইল বুঝি আমাদের উপর আক্রমণ করিতেছে! কিন্তু সেরূপ কিছু না করিয়া আমাদের নিকটে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল, যেন তাহারা ঐ জায়গাটা নিরাপদ বলিয়া মনে করিল, অথবা

আমাদের নিজেদের হিতৈষী মনে করিয়া আমাদের নিকটে থাকাই ভাল মনে করিল। ইহারই মধ্যে, খানিকটা দূরে, নার্সদের থাকিবার বড় দোমহল্লা বাড়ি ধড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু গর্‌গর্ শব্দ এত জোরে হইতেছিল যে বাড়ি পড়িবার আওয়াজ কমই শোনা গেল, শুধু ধুলামাটি প্রবলবেগে উড়িতে দেখিয়াই বুঝিলাম যে ঐ বাড়ি পড়িয়া যাইতেছে। হাসপাতালের খানিকটা অংশ এখানে-ওখানে পড়িয়া গেল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কেহ মারা পড়ে নাই, কেহ আহতও হয় নাই। খানিকটা পরে সব শান্ত হইল।

আমি আন্দাজ করিলাম, প্রায় সাড়ে চার মিনিট ধরিয়া ভূমিকম্প হইতেছিল। পরে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে খবর আসিলে জানা গেল, সাড়ে চার হইতে সাত মিনিট পর্যন্ত ভূমিকম্প হইয়াছিল। এখান-ওখান হইতে লোকেরা ভয়ে ঘাবড়াইয়া বাহির হইতে লাগিল। এই সময়ে ঘরের ভিতরে যাইতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। যে সময়ে হাসপাতালে আসিয়াছিলাম তখন হইতে এই প্রথম ঘরের বাহিরে আসিলাম, এই প্রথম অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। কথা আর কি হইতে পারিত, ভূমিকম্পের বিষয়েই কথা হইল। বন্ধুরা শহর হইতে দৌড়াইয়া দেখিতে আসিলেন, আমার অবস্থা কিরূপ। ধীরে ধীরে খবর আসিতে লাগিল যে শহরে অনেক বাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। হাসপাতালে কাহাকে কাহাকে আহত অবস্থায় লইয়া আসাও হইল। আমাদের চৌকি বাহিরে মাঠেই বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই পড়িয়া ছিলাম। জানুয়ারির শীত। বাতাস প্রবলবেগে বহিতেছিল। খুব ঠাণ্ডা পড়িতেছিল। আমার সামনে প্রশ্ন হইল, রাত্রে কি করা যায়। ঘরের ভিতরে গিয়া লোকেরা দেখিল, কোথাও কোথাও দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনও অংশ পড়িয়া যায় নাই। আমি ভাবিলাম, রাত্রে বাহিরে থাকিলে তো ঠাণ্ডার জন্য অবশ্যই আমার রোগ বাড়িয়া যাইবে, বাঁচিতে পারিব না, যদি রাত্রে আবার ভূমিকম্প হয় তাহা হইলে আবার বাহিরে আসিব। সাহস করিয়া আমি বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলাম। দেখাদেখি আরও কোনও কোনও রোগী গেল, সকলে নয়। নিকটে শিশুদের ওয়ার্ড ছিল, তাহার এক অংশ পড়িয়া গিয়াছিল, দেওয়ালও খানিকটা দুর্বল হইয়া গিয়াছিল; এইজন্য হাসপাতালের লোকেরা সকলে চৌকি মাঠের মধ্যেই রাখিয়া দিল, ঐ ঠাণ্ডার মধ্যেই তাহারা রাত কাটাইতে লাগিল। রাত একটায় ভূমিকম্পের আর একটা ধাক্কা আসিল। রাত্রিটা কোনও প্রকারে কাটিল। বাহিরের খবর সে-দিন কিছু পাইলাম না। শহরের খবর অল্পই পাইলাম, তাহাতে জানিলাম যে শহরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

পরের দিন সকাল দশটায় ডাঃ ব্যানার্জি আমাকে দেখিতে আসিলেন।

তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বারান্দা হইতে নীচে নামিতেছিলাম এমন সময়ে আর একবার ভূমিকম্প। আমরা দুজনে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সর্বপ্রথম তাঁহার নিকটে জানিলাম যে মুঙ্গেরের অবস্থা খারাপ, যদিও কোনও সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই। তিনি মুঙ্গেরেই থাকিতেন, তাই খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে গভর্নমেণ্টের আদেশ হইয়াছে, যত জন ডাক্তার পাওয়া যায় তাহাদের প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে, যেখানে যাওয়ার হুকুম পাওয়া যায় শীঘ্র যেন চলিয়া যায় এবং হাসপাতালেও আহতদের জন্য স্থান এবং অন্যান্য ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে। এখন খানিকটা খবর পাওয়া গেল যে এই ভূমিকম্প কিছু-দূর পর্যন্ত বাহাদুরি দেখাইয়া আসিয়াছে। ইহাও শুনিতে পাইলাম যে সরকারি সেক্রেটারিয়েটের এক ভাগ পড়িয়া গিয়াছে, সব কাজকর্ম লণ্ড-ভণ্ড, গোলমালে আমার মুক্তির হুকুমও আসিতে পারে নাই। আমাকে দুই দিন পরে ছাড়া হইল। সে-দিন সিভিল সার্জন আসিয়া বিকাল চারটায় আমাকে বলিলেন যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। পুলিশের পাহারা সরাইয়া লওয়া হইল। কাহারও কাহারও ধারণা, বুঝি ভূমিকম্পের জন্যই গভর্নমেণ্ট আমাকে ছাড়িয়া দেন। উপরে যেমন বলিয়াছি, ভূমিকম্পের কয়েকঘণ্টা পূর্বেই অসুস্থতার জন্য আমাকে ছাড়া স্থির হইয়া গিয়াছিল, তাহার আভাসও আমি পাইয়াছিলাম। ভূমিকম্পের জন্য মুক্তি পাইতে দুই দিন দেরি হইয়া গেল; কারণ সমস্ত ব্যাপারই গোলমাল হইয়া যায়। যখন দুই দিন পরে উত্তর বিহারের শোচনীয় অবস্থার সংবাদ কিছু কিছু আসিতে লাগিল, তখন গভর্নমেণ্ট সেখানকার অধিবাসী কোনও কোনও সত্যাগ্রহীকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে আমিও মুক্তি পাইয়াছি। আমি ভাবিতেছিলামই যে ভূমিকম্পে পীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য কিছু না কিছু করিতে হইবে, এমন সময়ে তাঁহারা আসিলেন। তাঁহাদের আমি ত্রিহুত জেলায় পাঠাইলাম। কিছু টাকা ধার করিয়া তাঁহাদের জন্য কম্বল কিনাইলাম, তাঁহাদের নিকট পরিবার কিছু ছিল না, গ্রীষ্মকালে তাঁহারা গ্রেপ্তার হন, আর চলিয়া যাওয়ার সময় সেই গ্রীষ্মকালের ধুতি ও কুর্তা ফেরৎ লইয়াছিলেন। কিছু খরচের টাকা দিয়া কোনও রকমে চম্পারন, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও সারণের খবর লইবার জন্য তাঁহাদের পাঠাইলাম। রেল, তার, সব বন্ধ ছিল। ইঁহারা কেমন করিয়া যাইতে পারিবেন তাহাও কিছু জানা ছিল না। তাঁহারা সাহস করিয়া নৌকায় করিয়া অথবা পায়ে হাঁটিয়া গিয়া খবর লইতে শুরু করিলেন।

আমি সাহায্যের জন্য টাকার জোগাড় করিলাম এবং এক আবেদন প্রকাশ করিব বলিয়া ভাবিলাম। কয়েকটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, এপর্যন্ত কোনও

ঠিক খবর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অল্পবিস্তর যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা অতি ভয়ানক। ডাক্তারেরা আমাকে হাসপাতালেই বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার খুব দুর্বলতা ছিল, কিন্তু জানি না এ-সময়ে কোথা হইতে উৎসাহ ও শক্তি আসিল। আমি জিদ করিয়া কাজ শুরু করিয়াই দিয়াছিলাম, কিন্তু হাসপাতাল হইতেই। হাজারিবাগ হইতে মথুরাবাবু ও সত্যনারায়ণবাবু ছুটিয়া হাসপাতালে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধু হাসপাতালেই আসিয়া দেখা করিলেন আর মত হইল যে এক আপিল বাহির করা যাক এবং রিলিফ কমিটির নামে এক কমিটি গঠন করা যাক। আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে এই কমিটি শুধু কংগ্রেসের লোকদেরই না হইয়া সকল দলের লোকদের হইবে। কোনও সংকট কখনও আসিয়া পড়িলে আমরা বরাবর এইভাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলাম। এজন্য এবারও তাহাই করিবার ছিল, কিন্তু এখনও বুঝিতে পারি নাই যে একাজ কত বড় হইবে। তখন পর্যন্তও ক্ষতির সম্বন্ধে পূরা খবর পাওয়া যায় নাই। গভর্ণরও এক সর্বসাধারণের সভা করিবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। মিঃ সৈয়দ আবদুল আজিজ তখনকার দিনে ছিলেন একজন মিনিস্টার, তিনি আসিয়া হাসপাতালেই আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি বলিলেন, পৃথক আপিল না করিয়া গভর্নমেণ্টের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিলেই ভাল হইবে। শফী দাউদী সাহেবও আসিয়া দেখা করিলেন, তাঁহারও এই মত হইল। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে আপিলে যে টাকা সংগ্রহ হইবে তাহা ছাড়া গভর্নমেণ্ট নিজের টাকাও খরচ করিবেন, এবং আমাদের আপিলে বেশি টাকা আদায় হইবে বলিয়া আশা করা যায় না, কারণ সত্যাগ্রহের জন্য কংগ্রেসের সংগঠন ওলটপালট হইয়া গিয়াছে এবং কর্মীদের মধ্যেও অনেকে জেলে আছে। আমি উঁহাদের বলিয়া দিলাম যে এই ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট যাহাই করুক, তাহার সঙ্গে আমাদের বিরোধ তো হইবে না-ই, কিন্তু এমনও কেহ কেহ থাকিবে যাহারা গভর্নমেণ্টকে পয়সা না দিয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও কাজ করে ইহা চাহিবে; আমরা প্রতি সংকটকালে এই ধরনের কিছু করিয়া আসিতেছি, তাই জনসাধারণও আমাদের কাছে কিছু আশা রাখিবে; গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই; লোকে আমাদের যাহা দিবে তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা চুপ করিয়া থাকিব, এবং গভর্নমেণ্ট আমাদের দিয়া যদি কিছু কাজ করাইয়া লইতে চায়, তবে তাহা করিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। এইরূপ বলিয়া আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিলাম, তখন তাঁহারা আমার মত অনুমোদন করিলেন।

এক দিন এক ছোট সভা হইল, তাহাতে বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির নামে এক প্রতিষ্ঠান্ স্থাপিত হইল। আমাকে তাহার নেতা স্থির

করা হইল, তাহার নামে আমি আপিল বাহির করিলাম। তাহার পর গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে সর্বসাধারণের সভা হইল। তাহাতে আমিও যোগ দিলাম। তাঁহারাও আপিল বাহির করিলেন। আমার আপিলের উত্তরে চারদিক হইতে টাকা ও জিনিসপত্র আসিতে লাগিল। সংবাদপত্রে এখন ধ্বংসের বিবরণও ছাপা হইতে লাগিল। তাহা পড়িয়া সমস্ত দেশে এবং বিদেশেও বিহারে প্রতি গভীর সহানুভূতির সৃষ্টি হইল। পণ্ডিত জওহরলাল পাটনায় আসিলেন। সবচেয়ে ধ্বংসলীলা বেশি হইয়াছিল ত্রিহুত ও মুঙ্গেরে, সেখানে গিয়া তিনি নিজের চোখে অবস্থা দেখিলেন। মুঙ্গেরে তো তিনি পতিত গৃহের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করার কাজেও সাহায্য করিলেন এবং এই দিক দিয়া সকলের জন্য আদর্শ স্থাপন করিলেন। বাংলা হইতে সংকটত্রাণ সমিতির তরফ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত টাকা ও জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া আসেন। আমি টেলিগ্রাম করিয়া গান্ধীজীকেও খবর পাঠাইলাম। তিনি তখন বহু দূরে মান্দ্রাজ প্রদেশে কোথাও হরিজনদের জন্য পদব্রজে ঘুরিতেছিলেন। তার পাইয়াই তিনিও আপিল বাহির করিলেন, আর নিজেও অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কমিটির তরফ হইতে সব জেলায় প্রধান কার্যকর্তা নিযুক্ত করা হইল, আর তাঁহাদের অধীনে অনেকানেক কর্মী কাজ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে টাকা আসিতে লাগিল—কাপড়, চাউল, অন্যান্য খাদ্যবস্তু, বাসন, কম্বল, ঔষধ-ইত্যাদি পৌঁছিতে লাগিল। সব জিনিসের প্রয়োজন হইল। পাটনা হইতে আমরা প্রয়োজনমত সকলকে দুর্দশাগ্রস্ত জেলায় পাঠাইতে লাগিলাম। দুই চার দিনের মধ্যেই কাজ খুব বাড়িয়া গেল। আমাদের বিস্তর সঙ্গী জেলে ছিলেন। ত্রিহুত, ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগে যাঁহাদের বাড়ি, গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের সকলকেই প্রায় ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারাও আসিয়া কাজে জুটিয়া গেলেন।

পণ্ডিত জওহরলালজী একদিন পাটনায় থাকিয়া কেন্দ্রীয় অফিসের সংগঠনের ব্যাপারে ও অন্যান্য কথায় পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিলেন। তিনি দুইবার এই প্রদেশে আসিলেন এবং প্রাণপণ করিয়া মন দিয়া কাজ করিতে থাকিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার পরেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আবার জেলে বন্ধ করা হইল। এইজন্য আমাদের তাঁহার নেতৃত্বে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব হইল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও জেলেই ছিলেন। গুজরাতে প্রলয়ংকর বন্যার সময়ে তিনি লোকসেবার যে ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন তাহার অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা কিছু লাভ করিতে পারিলাম না। কিন্তু মহাত্মাজী, শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও সর্দারের সহকারী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস পুরুষোত্তম প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংযুক্ত প্রদেশ হইতে আচার্য নরেন্দ্রদেব ও শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশজী পৌঁছিয়া

গেলেন। বাহির হইতে যে সমস্ত ভাইবোনেরা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের নাম গণনা করা কঠিন। যদি কাহারও নাম বাদ পড়ে তাহা হইলে আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা হইবে। কিন্তু কয়েকজনের নাম এমন যে তাহা উল্লেখ না করিলে বড়ই কৃতঘ্নতা হইবে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জে. সি. কুমারাপ্পা একজন। তিনি হিসাব পরীক্ষার কাজ করিতেন, বিলাত হইতে ইহা শিখিয়া বোম্বাইয়ে বড় বড় কোম্পানীর হিসাব পরিদর্শন করিতেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আসিয়া ঐ কাজ ছাড়িয়া গুজরাত বিদ্যাপীঠে কাজ করিতেছিলেন। যখন কংগ্রেস এমন এক কমিটি গঠন করিল যাহার অধিকার হইল ভারতবর্ষের উপর চাপানো ঋণভার পরীক্ষা করা, তখন ইঁহাকেও তাহার সদস্য করিয়া লওয়া হয়; মহাত্মাজী ইঁহাকে হিসাব দেখাশুনা করি-বার জন্য এখানে পাঠাইয়াছিলেন। এইটুকু বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ইনি না আসিলে এবং সমস্ত হিসাবের একটা সুব্যবস্থা না করিয়া দিলে, আমরা বিপদে পড়িতাম। আমাদের কর্মীদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজারেরও বেশি হইবে। তাহারা ১২টা জেলায় ভাগ করা ছিল। তাহাদের মধ্যে অল্প লোকই সামান্য হিসাবও জানিত। কাজও ছিল অনেক রকমের এবং সকলের হিসাব পৃথক পৃথক রাখিতে হইত। এ-কাজ এতখানি ছড়াইয়া-ছিল যে তাহা সামলানো ছিল বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ইঁহার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হিসাব রাখিয়া সব কাজ ঠিকমত হইল।

আমি শুরুতেই বিহার ব্যাঙ্ককে কমিটির খাজাঞ্চি করিয়া দিয়াছিলাম। টাকা আসিত কমিটির নিকটে আর সোজা ব্যাঙ্কের নিকটে। দিনে দুই তিন শত মণিঅর্ডার আসিত। রোজ শত শত পার্শেল আসিত আর তাহাদের মধ্যে আসিত হরেক রকমের জিনিস। সকলের হিসাব পৃথক পৃথক রাখা হইত। কেন্দ্রে পোঁছিয়া যখন টাকা বা জিনিসপত্র খরচ হইত, তখন তাহারও হিসাব কেন্দ্রীয় অফিসের দৃষ্টিতেই রাখা হইত। কিছুদিন পরে যখন আমাদের প্রথম রিপোর্ট বাহির হইল আর তাহার সঙ্গে পয়সা ও জিনিসপত্র যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা ছাপা হইল, তখন তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার পুস্তক হইয়া গেল। আমরা জন-সাধারণকে আবেদন জানাইলাম যে, যদি কোনও দাতার নাম উহাতে ছাপা না হয় তাহা হইলে তিনি যেন আমাদের জানাইয়া দেন। আনন্দের বিষয় এই যে যদিও কয়েক হাজার দাতা সোজা আমার নিকটে অথবা ব্যাঙ্কের নিকটে পয়সা ও জিনিসপত্র পাঠাইয়াছিলেন তথাপি আমার নিকট অল্পই, হয়তো দশ বারোখানাই, পত্র আসিয়াছিল যাহাতে নাম ছাপা হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করা হয়। যখন পরীক্ষা করা হইল তখন তাহাদের নামও ছাপা হইয়াছে দেখা গেল, কেবল এই ভুল হইয়াছিল যে অন্য কোনও প্রদেশ বা শহরের নীচে তাহাদের নাম ছাপা গিয়াছিল। হিসাবের কাজ যে খুব

পাকাভাবে হইত তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। এখানে আমি এবিষয়ে এতটা জোর দিতেছি এইজন্য যে সর্বসাধারণের কাজে টাকা-পয়সার ব্যাপারে পরিষ্কার থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কর্মীরা ঠিকমত সংগত উপায়ে পাবলিকের দেওয়া টাকা খরচ করিলেও হিসাব যদি ঠিক ঠিক না রাখে তবে বদনাম হয়। সর্বদাই প্রায় দুর্নামের কোনও ভিত্তি থাকে না, কারণ খরচ তো ঠিক হইয়াই থাকে, হিসাবের জ্ঞান থাকে না বলিয়া অথবা কর্মীদের শিথিলতা বা আলস্যের জন্য, হিসাব ঠিক থাকে না বলিয়া দুর্নাম হয়। লোকদের মধ্যে আশাতীত উৎসাহ যখন দেখিলাম ও টাকার বৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন আমার এই চিন্তা ছিল যে লোকদের বিশ্বাস যেন কোথাও মিথ্যা না হয়। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায়, বিশেষ করিয়া কুমারাপ্পাজী ও তাঁহার অধীনে কর্মী শত শত কার্যকর্তার চতুরতা এবং তৎপরতায় কাজ-কর্ম ভালমত নির্বাহ হইতে পারিল। আমরা বলিতে পারি যে লোকদের দেওয়া টাকা ও জিনিসপত্র খুব ভাল কাজে লাগিয়াছিল। বাস্তবিক যেরূপ সদ্ব্যয় হওয়া প্রয়োজন সেরূপই হইয়াছিল।

বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির সেবাকর্ম

আমি কয়েদ হইতে মুক্ত হইবার পরেও দশ দিন পর্যন্ত হাসপাতালে থাকিলাম। কিন্তু এখন বাহিরেও যাওয়া-আসা করিতাম। ডাক্তার ব্যানার্জিকে ভয় করিতাম যে কোথাও কাজ করা বন্ধ না করিয়া দেন; কিন্তু দিন দিন গায়ের জোর বাড়িতে থাকিল। কাজের ভিড় এত ছিল যে ভোর চারটায় উঠিতাম আর চৌকিতেই লিখিবার কাজ শুরু করিয়া দিতাম। চিঠিপত্রের একরাশি। তাহার উত্তর দেওয়া, চিঠিতে যে খবর আসিয়াছে তাহার সারাংশকে আবার নূতন আপিলের রূপে পাঠাইয়া লোকদের থাকিবার দুর্দশার আভাস দেওয়া এবং নিজেদের কেন্দ্র হইতে যে সব চিঠিপত্র আসিয়াছে তাহাদের উত্তর দেওয়া, ইহা কিছু কম কাজ ছিল না। মিঃ অজীজ তাঁহার একটা ছোট বাড়ি আফিসের জন্য দিয়াছিলেন, কিন্তু কাজ শীঘ্রই এত বাড়িয়া গেল যে সেখানে জায়গায় কুলাইল না। তখন আমরা আর একটা বড় বাড়ি ভাড়া করিলাম। আফিসের কয়েকটা ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। সবগুলির চার্জে এক একজন প্রধান কার্যকর্তা রাখা হইল। গোড়ায় শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশজীই কার্যালয়ের ভার লইয়াছিলেন। পরে যখন অনুগ্রহবাবু ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসিলেন, আর কাজও খুব বাড়িয়া গেল, তখন

সমস্তই তিনি সামলাইয়া লইলেন। আমরা যে কমিটি গঠন করিলাম তাহাতে সকল দল ও প্রদেশের লোকদের—যাহারা সাহায্য পাঠাইয়া দিয়াছিল—সদস্য করিয়া লওয়া হইল।

অল্পদিনের পরেই গান্ধীজী আসিলেন। তিনি আসিবার পূর্বেই আমি ভাবিয়াছিলাম যে তাহার পূর্বেই একবার গিয়া, যেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হইয়াছে সেইসব স্থান দেখিয়া আসি। ভূমিকম্পের প্রায় এক মাস পরে এই কথা। এ পর্যন্ত আফিসে বসিয়াই কাজ করিতাম, খানিকটা দুর্বল বলিয়া, খানিকটা কাজের চাপের জন্য। এখন সাহায্য করিবার লোক আসিয়া গিয়াছে, কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছি, আর তাঁহারা সামলাইয়া লইয়াছেন, তবেই আমি বাহিরে আসিলাম। যেখানে যেখানে গেলাম সেখানকার অবস্থা দেখিয়া রিপোর্ট পাঠাইতাম, তাহা ছোট পুস্তিকার আকারে ছাপাও হইল। নিজেদের কার্যকর্তা, দাতা ও সহানুভূতিসম্পন্ন লোকদের সমস্ত কথার পরিচয় রাখিবার জন্য আমরা এক বুলেটিন বাহির করিতে শুরু করিয়া দিলাম, তাহা কিছু দিন ধরিয়া নিয়মিতরূপে বাহির হইল, পরে অনাবশ্যক মনে করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

যাঁহারা কমিটির নিকট টাকা ও জিনিসপত্র পাঠাইতেন অথবা নিজেরা আসিয়া তাহার সংগঠনে যোগ দিতেন তাঁহারা ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের ভাবে কাজ করিতে আসেন। ইঁহাদের সকলের আমাদের কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা ছিল। আমরা চেষ্টা করিতাম, আমাদের সকলের কাজে যেন বিরোধিতা না হয়, এবং একই কাজ যেন দুই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দুইবার না করা হয়। ইহাতে লাভ হইল এই যে সর্বসাধারণের অর্থের সদ্ব্যবহারই হইল, চাই সে অর্থ-কমিটির কাছেই আসুক বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের নিকটেই আসুক। এরূপ প্রতিষ্ঠান তো অনেক ছিল, তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত রিপোর্টে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া এখানে প্রধান কয়েকটির নামই দিতে পারি। তাহারা ছিল মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি, মেমন রিলিফ সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন। বাবা গুরুদত্ত সিংজীর দলও ভাল কাজ করিয়াছিল। রেডক্রস ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনও সাহায্য করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের মারফত বাংলার সংকটত্রাণ কমিটিও ঔষধপত্র, যানবাহন ইত্যাদি দিয়া খুব সাহায্য করিয়াছিল।

একদিকে ছিল গভর্নমেণ্টের আবেদন, অন্যদিকে ছিল বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির। কিছুকাল পর্যন্ত তো জনসাধারণের আর দাতাদের এত উৎসাহ ছিল যে উভয়ের ফণ্ড প্রায় সমান সমান চলিতেছিল। আমরাও প্রত্যহ যে-টাকা আসিত তাহা প্রকাশ করিতাম, গভর্নমেণ্টও তাহা করিতেন। যখন মহাত্মাজী আসিয়া পোঁছিলেন ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ

তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া বিহারে বসিয়া গেলেন তখন আমার মাথা হইতে বোঝা কিছু হালকা হইয়া গেল। লোকদের সাহায্য পেঁছানোর ব্যাপারে অনেক বাধা ছিল। প্রথম তো রেল লাইন সব ভাঙিগয়া গিয়াছিল; মাল রেল লাইনের উপর দিয়া যাইতে পারিত না। রাস্তার পুল ভাঙিগয়া গিয়াছিল; এই কারণে বলদগাড়ি ও মোটরলরীর উপরও লইয়া যাওয়া সহজ ছিল না। থাকিবার জন্য বাসাবাড়ি অনেক জায়গায় পাওয়া যাইত না। অনেক জায়গায় জলের কষ্ট ছিল। আমাদের রিলিফ কমিটির তরফ হইতে কয়েকটি মোটরলরী কিনিতে হইল। আস্তে আস্তে রাস্তা কিছু মেরামত হইল। পুল তো তৈয়ারি করা হয় নাই, তবে তাহার পাশ দিয়াই, বড় নদী না থাকিলে, অন্য রাস্তা বাহির হইয়া গেল। নদীর মধ্যে নৌকা দিয়াও কাজ করিয়া লইতে হইল। রিলিফ কমিটির কুটির সর্বত্র তৈয়ারি করা হইল। কর্মীদের সংগঠনে শ্রীযুক্ত কৃপালনী, শ্রীযুক্ত হার্ডিকর ও শ্রীমতী সোফিয়া সোমজী অনেক কাজ করিয়াছিলেন। কর্মীদের দেখাশুনাও বড় সহজ ছিল না। কার্যকর্তাদের জন্য আমাদের শত শত সাইকেল দিতে হইল। তাঁহাদের থাকিবার জন্য কুটির তৈয়ারি ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইল। কিন্তু ইহা জানিয়া আশ্চর্য হইতে হয় যে আমাদের কার্যকর্তাদের খাইবার খরচ আমরা রোজ দুই আনার বেশি দিতাম না। তাহার মধ্যে যাহা কিছু হইতে পারিত তাহাই খাইয়া তাহারা কাজ করিত। তাহাদের পক্ষে তাহাই ছিল যথেষ্ট। যেখানে খুব ক্ষতি হইয়াছিল সেই সব জেলায় মহাত্মাজীও গেলেন। তাঁহার যাওয়া দুই দিক হইতে আবশ্যক ছিল। এক তো ক্ষতিটা তিনি নিজের চোখে দেখেন, আর যেখানে এতটা ও এত প্রকারের ক্ষতি হইয়াছে, সেখানে আমরা কোনটি পূরণ করিবার চেষ্টা করিব তাহা স্থির করিতে তিনি আমাদের সাহায্য করেন। আর একটা কথা ইহাও ছিল যে তিনি যাওয়ায় লোকদের সাহস বাড়িত, বিপদে দৃঢ়তা আসিত। এইজন্য সকল স্থান হইতে এই কথার উপর খুব জোর দেওয়া হয় যে মহাত্মাজী সর্বত্র যাইবেন। তাহা তো সম্ভব হয় নাই, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি অনেক জায়গায় গিয়াছিলেন। ভূমিকম্পে যাহা ঘটিয়াছিল সেই সকল অভূতপূর্ব হৃদয়বিদারক দৃশ্য তিনি দেখিয়াছিলেন।

আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন ছিল দুই প্রকারের। ভূমিকম্পের জন্য লোকদের বাড়িঘর পড়িয়া গিয়াছিল, ঘরে যাহা কিছু ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। না ছিল খাইবার অন্ন, না ছিল পরিবার কাপড়। অন্ন পাইলেও তাহা রাঁধিবার বাসন ছিল না। থাকিবার ঘর নাই। কূয়া ধ্বসিয়া গিয়াছিল। পুকুরের মধ্যে বালি ভরিয়া গিয়াছিল—তাই খাইবার জল ছিল না। এসব ছিল এমন দাবি যে শীঘ্র পূর্ণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই মহাত্মাজীর আসিবার পূর্বেই আহার্য, বস্ত্র, বাসন-আদি, যতদূর

সম্ভব লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলাম। তাহারও পূর্বে যতদূর সম্ভব, ঘরের ধ্বংসস্তূপ দূর করিবার চেষ্টা করা হইল। তাহার নীচে যাহারা চাপা পড়িয়াছিল তাহাদের বাহির করা হইল। এই কার্যে রিলিফ কমিটি বেশি কিছু করিতে পারে নাই। এই কাজ যাহা কিছু হইল, তাহা স্থানীয় লোকেরাই করিল; কারণ রিলিফ কমিটি গঠিত হইতে ও কার্য-কর্তাদের পেঁাছিতে পেঁাছিতে যাহারা বাড়ি চাপা পড়িয়াছিল তাহাদিগকে হয় বাহির করা হইল নয়তো মারা পড়িল; কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া গেল তাহাদের তখনকার মত সাহায্য করিবার জন্য রিলিফ কমিটি সম্পূর্ণ চেষ্টা করিল। মহাত্মাজী পেঁাছিতে পেঁাছিতেই এই কাজও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, যদিও তখনও একেবারে শেষ হয় নাই। এখন যাহা কিছু বাকি ছিল তাহা বেশির ভাগ ছিল স্থায়ী কাজ। ইহাতে দুই তিন প্রকারের কাজ ছিল প্রধান, এবং আমরা কি কাজ করিব তাহা স্থির করিবার ছিল।

উপরে বলা হইয়াছে যে লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর পড়িয়া গিয়াছিল। বাড়ি তৈয়ার করিতে লোকদের সাহায্য করা এক খুব বড় কাজ ছিল। এইভাবে লক্ষ লক্ষ কুয়া বালিতে ভরিয়া গিয়াছিল। এমন অনেক গ্রাম ছিল যেখানে কুয়াতে জল ছিলই না। এমন কি, কোথাও কোথাও গভীর গর্ত এতদূর ভরিয়া গিয়াছিল যে সেখানে যে কখনও গর্ত ছিল তাহার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। কোথাও কোথাও ছোটখাটো নদীর মধ্যভাগ বালিতে একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল। জলকষ্ট ছিল প্রচণ্ড। ইহা কোনও একটা গ্রাম বা এলাকার কথা নয়; গঙ্গার উত্তরে প্রায় সমস্ত জেলায়, এক শত মাইল দীর্ঘ ও প্রস্থে ৪০/৫০ মাইল ভূখণ্ডের অল্প-বিস্তর একই অবস্থা। কি উপায়ে জল পেঁাছানো যাইবে, তাহা ছিল বড় কঠিন প্রশ্ন। তৃতীয় প্রশ্ন, যাহা আমাদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছিল, তাহা খেতের মধ্যে বালি আসার ব্যাপার। খেতের মধ্যে জলের ফোয়ারা বাহির হইল, জলের সঙ্গে সঙ্গে বালিও বাহির হইল। এত বেশি বাহির হইল যে বালিতে খেত ছাইয়া গেল। জল শুকাইয়া গেলে দেখা গেল, সমস্ত অঞ্চল বালুকাময় মরুভূমি হইয়া গিয়াছে! যদি এই বালি এখানেই ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে এখানে আর কোনও ফসল হইবে না, এরূপ ভয় হইতে লাগিল। তাই এই বালি কোনও প্রকারে পরিষ্কার করিতে পারা যায় কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইল। আমরা নিজেরা দেখিয়াছি, কোথাও কোথাও বালি পাঁচ ছয় ফুট গভীর হইয়া পড়িয়াছিল। এক জায়গায় অল্প পরিসরের মধ্যে বালি পরিষ্কার করিবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তাহাতে এত অধিক খরচ পড়ে যে তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

তখনকার দিনে আর এক প্রশ্ন আখের ব্যাপারে উঠিয়াছিল। উত্তর বিহারে চিনির অনেক কারখানা ছিল। লোকেরা আখের চাষ করিত এবং

ঐ সব কারখানায় আখ বেচিয়া দিত। ইহাতে তাহারা পয়সা পাইত। ভূমিকম্পে প্রায় সমস্ত কারখানাই অচল হইয়া গেল। সে-সব বন্ধ হইল। কোটি কোটি টাকার আখ খেতে থাকিয়া গেল। এখন তাহা হইয়া রহিল অকাজের। আমরা ভাবিলাম, পুরানো আখ মাড়াই কল আবার চালু করিলে তাহা হইতে কিছুটা তো আখের গুড় হইবে, চাষীরাও খানিকটা তো বাঁচিবে। গভর্নমেণ্টেরও ইহা মনে ধরিল। দুই প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে উহা বিতরণ করা হইল। কিন্তু উহা পাওয়াই ছিল কঠিন, কারণ তাহা এত বেশি সংখ্যায় তৈয়ারি ছিল না। উহার কোন বাজারই ছিল না। এই জন্য তাহা তৈয়ারি করা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও আমরা ও গভর্নমেণ্ট মিলিয়া কয়েক হাজার আখ মাড়াই কল বিতরণ করিলাম, আর কিছু আখ এইভাবে বাঁচানো গেল। কিন্তু ভাগ্যবশে কয়েকদিন পরে অনেকগুলি মিল মেরামত হইতে পারিল, তাহারা নিজের নিজের কাজ শুরু করিল। এইভাবে, যতটা ক্ষতি হইতে পারিত, ততটা হইল না।

এ ছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক প্রশ্ন ছিল। এসমস্ত আলোচনা করিয়া তখনকার মত সাহায্যের কাজ শেষ করা ছিল প্রথমে বিচারণীয়। এইজন্য পাটনাতে কমিটির এক বৈঠক করা হইল। তাহাতে সমস্ত প্রদেশের প্রধানেরা আসিলেন, তাঁহারা ইহার সদস্য ছিলেন। ইহাতে প্রস্তাব হইল যে গভর্মেণ্টের কাজে আমরা সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কাজ করিবার জন্য ইহা এক কার্যকরী সভা গঠন করিল। সাধারণ নিয়মও প্রস্তুত করা হইল। এত বড় কমিটি বারবার একত্র হওয়া কঠিন ছিল। এইজন্য কার্যকরী সভার উপরই সমস্ত কাজের ভার আসিয়া পড়িল। উহা সর্বদা বসিত এবং সমস্ত বিষয় নির্ধারণ করিত। মহাত্মাজীর মত হইল এবং আমরাও এবিষয়ে একমত হইলাম যে বালি সরাইয়া ফেলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এইজন্য আমরা উহাতে হাত দিব না; বাড়ি তৈয়ার করার কাজে আমরা সাহায্য করিতে পারি, কিন্তু তাহার চেয়েও অধিক আবশ্যক ও উপযোগী কাজ হইল জল পৌঁছাইয়া দেওয়া; তাহাতে ব্যক্তিগত সাহায্য দেওয়ারও সুযোগ থাকিবে, এইজন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত করিবার সুযোগ কম পাওয়া যাইবে এবং আমাদের কাজও হইবে বেশি পরিষ্কার; তাই আমরা প্রথমে কুয়া ও পুষ্করিণী করিয়া দিলাম, যাহাতে মানুষ ও পশুর জন্য জলের সুবিধা হয়।

কিন্তু এই কাজও এত বড় ছিল যে আমাদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করিলেও ইহার সামান্য অংশও পূর্ণ হইত না। প্রথমে ইহার উপরেই পুনরায় জোর দেওয়া স্থির হইল। ইহাতেও প্রশ্ন উঠিল, আমরা টিউব ওয়েল করিয়া দিব না পাকা কুয়া তৈরি করিব। টিউব ওয়েল খুব তাড়াতাড়ি তৈয়ার

করা যাইতে পারে, আর সে-কাজ ঠিকাদারদের দিয়া সহজেই হইতে পারে। আমরা কিছু কিছু তৈয়ারও করিলাম। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে ইহাতে কাজ চলিবে না। এক তো এই যে, একটা টিউব ওয়েল হইতে এক ঘড়া জল বাহির করিতে একজন লোকের যতটা সময় লাগে ঠিক ততটা সময়ে কুয়া হইতে চার পাঁচ জন লোক এক সঙ্গেই চার পাঁচ ঘড়া জল তুলিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এসব মেরামত করিবার প্রশ্নও ছিল বিকট। কল বিগড়াইয়া গেলে গাঁয়ের লোকে ইহা মেরামত করাইবে কি করিয়া? তাহার জন্য আমাদের বড় 'স্টক' রাখিতে হইবে। আবার কিছুদিন পরে তাহাও অকেজো হইয়া যাইবে। ইহাও দেখা গেল যে কোথাও কোথাও টিউব ওয়েল ও কুয়াতে সমানই খরচ পড়ে। এইজন্য আমরা কুয়া তৈয়ার করাই স্থির করিলাম। সর্বত্র কর্মীরা গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় কুয়া তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমরা চাহিতেছিলাম যে বর্ষার পূর্বেই বেশির ভাগ কুয়া তৈয়ারি করা হউক। তাহা ছাড়া পুরানো কুয়া মেরামত করারও প্রয়োজন ছিল। বালি বাহির করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেই অনেক জায়গায় কাজ চলিয়া যাইত। এসব ব্যাপারে গাঁয়ের লোকেরা নিজের শরীর দিয়া সাহায্য করিতে পারিত। ঐরূপে পুরানো পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইয়া দিলে গোরু-মহিষের জন্য জলের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। আমরা কয়েক হাজার নূতন কুয়া খোঁড়াইলাম এবং বিস্তর পুরাতন কুয়া মেরামত ও পরিষ্কার করাইলাম। কয়েকটা পুকুর খোঁড়াইলাম, এবং অসংস্কৃত পুষ্করিণীর সংস্কার করাইলাম। এসব কাজ এপ্রিল হইতে জুলাইয়ের পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর অন্যসব প্রশ্নই উপস্থিত হইল, তাহাতে আমরা ব্যস্ত থাকিলাম।

জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার মত খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, কারণ তাহা হইতে আমরা এক স্থায়ী কাজ করিতে পারিলাম। একটা কুয়া বা পুষ্করিণী হইতে বহু লোকের লাভ। এতখানি স্থায়ী কাজ যে হইতে পারিল তাহা গান্ধীজীর দূরদর্শিতারই ফল। না হইলে সব টাকা হয় বাড়িঘর মেরামতের কাজে, নয় তো বালি সাফ করিবার কাজে লাগিয়া যাইত। তাহা হইলে ফল এতটা ব্যাপক হইত না। পক্ষপাতের অভিযোগ হইতেও—মিথ্যা অভিযোগ হইলেও—আমাদের প্রতিষ্ঠান রক্ষা পাইতে পারিত না।

আমি এই কাজে লাগিয়া থাকিতেই অন্য প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বত্র নদীনালা ভরিয়া গিয়াছিল। তাই ভয় ছিল যে, গঙ্গা, সরযূ, গন্ডকের মত বড় বড় নদীর গর্ভও বালিতে খানিকটা ভরিয়া গিয়া থাকিবে। জমি উঁচু নীচু হইয়া গিয়াছিল। এই সব কারণে আশঙ্কা হইতেছিল যে বর্ষাকালে বন্যার জন্য নূতন বিপদ আসিতে পারে। তাহার জন্য আমাদের আয়োজন করিতে হইল। গভর্নমেণ্টও নিজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। আমাদের অনেকে নৌকা তৈরি করিয়া বা কিনিয়া যেখানে যেখানে বন্যার ভয় বেশি সে-সব জায়গায় রাখিতে হইল।

ভূমিকম্পের পর যাহারা মজুরি খাটিয়া খায় সেই সব গরিবের জন্য কাজের অভাব ছিল না। কোন না কোন প্রকারের কাজ তাহাদের জুটিতে লাগিল। কিন্তু ভয় ছিল যে বর্ষাকালে তাহারা কাজ পাইবে না। বিপদের সময়ে গরিবদের দুই চারি দিন পর্যন্ত খাইতে দেওয়া ভালই; কিন্তু কাজ না করাইয়া দান খয়রাতের মতো তাহাদের খাওয়াইলে তাহাদের নিষ্কর্মা ও অলস করিয়া তোলা হয়। এই কারণে আমরা প্রথম হইতেই এই নীতি পালন করিয়া আসিতেছিলাম যে যথার্থ কাজ না করাইয়া যেন তাহাদের খাওয়ানো না হয়। জনসাধারণের মজুরের তো প্রয়োজন ছিলই। যাহারা কাজ করাইয়া লইতে পারিত তাহারা সকলেই নিজের নিজের পড়িয়া-যাওয়া বাড়িঘর পরিষ্কার বা মেরামত করাইত। অনেকে তো নূতন বাড়িতেও হাত লাগাইত। চাষের কাজও তো ছিলই। রিলিফ কমিটি যে এক হাজার কুয়া তৈরি ও মেরামত করাইল এবং হাজার পুকুর খোঁড়াইল বা পরিষ্কার করাইল, তাহাতেও অনেক মজুর কাজ করিতেছিল। কোনও কোনও জায়গায় আমরা নূতন সড়ক তৈয়ারি করাইলাম, অথবা পুরানো ভাঙ্গা সড়ক মেরামত করাইয়া ছিলাম। এইভাবে আমরা সমস্ত প্রদেশে হাজার মাইল রাস্তা তৈয়ারি করিয়া দিই, অথবা মেরামত করাই। জলের নালা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উহা বর্ষার পূর্বে পরিষ্কার করিয়া না দিলে জল-নিষ্কাশনই হইবার কথা নয়। বর্ষায় গাঁয়ের অবস্থা শোচনীয় হইবে। এই-ভাবে এই ধরনের বালিও আমরা অনেক জায়গায় পরিষ্কার করাইলাম।

মজঃফরপুর জেলায়, সীতামারি যাইবার পথে, ভরতুয়া নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ভূমিকম্পের পূর্ব হইতেই সেখানকার অবস্থা এমন খারাপ হইয়া গেল যে বাগমতী নদীর জল সর্বদা সেখানে জমিয়া থাকিত। যাহা পূর্বে ছিল সবুজে ভরা, যেখানে বিস্তর ধান হইত, সেখানকার সমস্ত

মাটি এমনভাবে জলে ডুবিয়া থাকিত যে কিছুই জন্মিত না। সেখানে জলও এতদূর খারাপ ছিল যে সেখানকার বড় বড় গাছপালাও শুকাইয়া গিয়াছিল। বড় বড় বাগিচাও এমনি ধারা শুকাইয়া গিয়াছিল যে দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হইত। এই ভাবের দৃশ্য আমি কুশী নদীর ধারে কয়েকটি গ্রামে দেখিয়াছি, সেখানে ঐ ধরনের বড় বড় পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। গান্ধীজী পরিদর্শনক্রমে সেখানে গিয়া ও সেখানকার অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিছু উপায় হওয়া উচিত, এই কথার উপর সেখানকার কার্যকর্তারা খুব জোর দিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল যে প্রথমে এক নালা বা 'নহর' ছিল, যাহা দিয়া সেখানকার জল বাহিরে চলিয়া যাইত। বাগমতী তাহার পুরাতন ধারা ছাড়িয়া দিল, আর অমনি এই নালা ভরিয়া গেল। ফলে সেখানকার জল বাহিরে যাইতে না পারিয়া জমিয়া গেল। সে নালা কোনও রকমে আবার খুলিয়া দিলে সেখানকার শত শত বর্গমাইল আবার সবুজে ভরিয়া যায়।

আমরা স্থির করিলাম যে গভর্নমেণ্ট যদি এবিষয়ে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে রিলিফ কমিটির দ্বারা এই কাজ করানো হইবে। আমার অনুমান ছিল, ইহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে লেখাপড়া হইল। তাঁহারা নালা খুঁড়িবার ভার লইলেন। এইভাবে ছোটোখাটো নহর আমরা আরও কয়েক স্থানে খোঁড়াইয়া, যে জমি অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইতেছিল তাহা আবার সবুজে ভরাইয়া দিলাম। যেখানে গরিব মেয়েরা অন্য কাজ করিতে পারিত না, সেখানে চরখার দ্বারা তাহাদের কাজ দেওয়া হইল। এইভাবে রিলিফ কমিটি সুতা ও খাদির কাজও কয়েক জায়গায় চালাইয়া দিল। পরে যখন কমিটির কাজ শেষ হইয়া গেল তখন এই খাদির সমস্ত কাজ বিহার চরখা সংঘের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল। এত বাড়ি তৈয়ারি করিবার ছিল যে লোকদের বাড়িঘর, তৈয়ারি করার মালমশলার খুব প্রয়োজন ছিল। ইট, খাপড়া, রসি, বাঁশ, কাঠ ও লোহার জিনিসপত্র-ইত্যাদির খুব চাহিদা ছিল। আমরা অনেক জায়গায় কমিটির তরফ হইতে দোকান খুলিয়া দিয়াছিলাম, সেখানে নামমাত্র দামে জিনিসপত্র দেওয়া হইত। কিন্তু তাহার চেয়েও আমরা বেশি করিয়াছিলাম—ইট, কাঠ, সিমেণ্ট প্রভৃতির ব্যাপারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া নামমাত্র দামে অথবা খুব কম লাভে জিনিসপত্র বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করাইয়াছিলাম। যাহারা আমাদের পত্র লইয়া যাইত তাহারা ঐ নির্ধারিত মূল্যে জিনিসপত্র পাইত। কমিটির তরফ হইতে তাহাদিগকে সামান্য কিছু কমিশন দেওয়া হইত—কোথাও কোথাও তাহা ছাড়াও কাজ চলিয়া যাইত। এইভাবে আমরা যে কমিটি করি, তাহার দিক হইতে, অথবা সোজাসুজি সাহায্য করি।- তাহা ছাড়াও এই সকল জিনিসের মূল্য

নিয়ন্ত্রণে অনেক বড় অংশ লইয়া উচিতমূল্যে লোকদের জিনিস সরবরাহ করাইলাম।

এ কথারও সম্পূর্ণ আশঙ্কা ছিল যে বর্ষার কয় মাস আমাদের প্রদেশের অনেক স্থলে চাউলের অভাব হইবে। দেখা গেল যে চাউলের দাম কিছু বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা বর্মা হইতে অনেক চাউল কিনিয়া যেখানে যেখানে অভাবের ভয় ছিল সেই সব স্থানে চাউলের রিলিফ দোকান খুলিয়া দিলাম। ফলে চাউলের দাম আর বাড়িল না, লোকে উচিত মূল্যে চাউল পাইতে লাগিল। রিলিফ কমিটির টাকাও চাউল বিক্রি হইয়া গেলে ফিরিয়া আসিল। ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপের ভয় তো স্বতন্ত্র ছিল। কোথাও কোথাও তাহাদের প্রাদুর্ভাবও হইল। এইজন্য কমিটির ডাক্তারী বিভাগ বহু স্থানে নিজের শাখা খুলিয়া দিল, তাহা হইতে লোকদের অনেক উপকার হইল। বন্যার সময়ে লোকের সাহায্য করিতে খুব বেগ পাইতে হইত। কমিটি ও গভর্নমেণ্টের বিচার-অনুসারে যেখানে যেখানে বন্যার ভয় সেইসব জায়গায় নৌকা রাখা হইল। এই সব নৌকার সাহায্যে বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্য পোঁছাইবার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হইল।

ইহা ছাড়া আমরা বহু লোককে বাড়ি মেরামত করিবার অথবা তৈয়ারি করিবার জন্য নগদ টাকাও দিয়াছিলাম। কমিটি স্থির করিয়াছিল যে যাহারা ভূমিকম্পের পূর্বে ধনী ও সম্মানিত অবস্থায় ছিল, কিংবা যাহাদের বড় বাড়ি ছিল, কিংবা যাহারা বড় বাড়ি তৈয়ারি করিতে চাহিত, কমিটি তাহাদের সাহায্য করিতে অসমর্থ ছিল; কারণ তাহাদের কাছে অত টাকা কড়ি ছিল না। কমিটি তো শুধু গরিব ও মধ্যবিত্তদেরই সাহায্য করিতে পারিত। তাই উহা স্থির করিল যে কোনও এক ব্যক্তিকে আড়াই শত টাকার বেশি নগদ সাহায্য দেওয়া হইবে না। ইহা ভিন্ন রিলিফের দরে ইট, বাঁশ, কাঠ, সিমেণ্ট ইত্যাদি জিনিস দেওয়া যাইতে পারে। গভর্নমেণ্ট বেশি পরিমাণের সাহায্য দিতেছিলেন। আমরা ঐ শ্রেণীর লোকদের সাহায্যের ভার গভর্নমেণ্টের উপরই ছাড়িয়া দিলাম। এইভাবে পাঠক হয়তো খানিকটা অনুমান করিতে পারিতেছেন যে কত রকমে সাহায্য দিতে হইয়াছিল, কত প্রকারের কাজ কমিটিকে করিতে হইয়াছিল। তাহার রিপোর্ট সময়ে সময়ে ছাপা হইতে থাকিল। সে রিপোর্ট লোকদের মধ্যে, বিশেষতঃ সাহায্যকারীদের মধ্যে, বিতরণ করা হইল।

এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী যেমন ভূকম্প-পীড়িত ক্ষেত্রে ঘুরিতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ইংলণ্ডের দুই জন মহিলা অনেক জায়গায় গিয়াছিলেন। একজন কুমারী মুরিয়েল লিস্টার, গোলটেবিল কনফারেন্সের সময় মহাত্মাজী ছিলেন তাঁহার অতিথি। অন্যজন ছিলেন সেখানকার, ভারতের প্রতি সহানুভূতি-

সম্পন্ন, সর্বসাধারণের হিতসাধনে রত কুমারী আগাথা হ্যারিসন। এমনিতেই তো আরও অনেক বিদেশীরা ভূমিকম্পে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সকলে নিজের নিজের বন্ধুদের লিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুস তো যেখানে যেখানে বিপদ হইত সেই সকল স্থানে যাইবেনই; তিনি বিহারেও আসিয়াছিলেন। তিনি এক পুস্তক লিখিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ছাপাইয়াছিলেন। এই সব কাজের ফলে সেখানকার লোকের মধ্যেও বিহারের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হইল। গভর্নমেণ্টের আপিলও সেখানে পোঁছিয়াছিল। তাহাতে লোকেরা অর্থসাহায্যও করিয়াছিল।

ইউরোপে এক প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানকার সদস্যেরা যুদ্ধবিরোধী। কিন্তু তাহারা স্বীকার করে যে রাষ্ট্র যখন সৈন্য সংগ্রহ করে, আর লোকদের সর্বস্ব অর্থাৎ প্রাণ পর্যন্ত দিবার সুযোগ হয়, তাহাতে বিস্তর যুবক সেদিকে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু যদি এই উৎসাহ ও ত্যাগশক্তিকে নরহত্যার কাজে না লাগাইয়া জনসেবায় লাগানো যায়, তাহা হইলে খুব বড় কাজ হয়। এইজন্য, এই সংস্থার সদস্যেরা, নিজেদের সৈনিকের মত নিয়মের বাঁধনে রাখিয়া, যেখানে কোনও বিপদ ঘটে সেখানে গিয়া জনসাধারণের সেবা করে। ইহাতে তাহারা দেশ বা জাতির বিচার করে না। ইউরোপে গত মহাযুদ্ধের পর কয়েক স্থানে, যেখানে খুব ধ্বংসকাণ্ড হইয়াছিল, তাহারা গিয়া সেবা করিয়াছিল। এইভাবে কয়েক জায়গায় আর্তজনের সেবার অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল। তাহাদের নেতা ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের পিয়র সেরেসোল। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তাঁহার পরিবারের লোকেরা নিজের দেশে শাসন বিভাগে উচ্চপদে—বিশেষ করিয়া সৈন্য বিভাগে—অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পিতা হয়তো সেখানকার প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হইয়াছিলেন। যুদ্ধবিরোধী মতবাদের জন্য ইনি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন আর সামরিক শিক্ষা লইতে অস্বীকার করায় ইঁহাকে শাস্তিভোগও করিতে হইয়াছিল। কয়েকজন সহকর্মী লইয়া ইনি বিহারে সেবা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছিলাম যে কয়েক স্থানে এতখানি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল যে সেখানকার লোকদের ঐ স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া আসাই সঙ্গত ছিল। আমরা খুব চেষ্টা করিয়াছিলাম, লোকেরা জায়গা ছাড়িয়া দূরে কোথাও গিয়া বাস করিতে যাহাতে রাজি হয়। এইজন্য অন্য জায়গায় জমিদারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া জমি বন্দোবস্ত করাইবার যত্নও আমরা করিতেছিলাম; কিন্তু কেহ যে নিজের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া দূরে যাইবে এমনটি কোথাও পাইলাম না। এইজন্য খুব বড় পরিসরে স্থানান্তরের বা স্থান পরিবর্তনের কোনও কার্যক্রম অসম্ভব মনে করিয়া আমরা ছাড়িয়া

দিলাম। কিন্তু মজঃফরপুর জেলায় কয়েকটি গ্রামের লোক বন্যায় এতখানি পীড়িত ছিল যে গ্রাম ছাড়িয়া অল্প দূরে সরিয়া বাস করিতে রাজি হইয়া গেল। আমরা ভাবিলাম যে ইহাতে বাড়িঘর বানানোর কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আমরা তাহাদের সাহায্য করি। গভর্নমেণ্টও এই কথায় রাজি হইয়া গেলেন যে রিলিফ কমিটি ও গভর্নমেণ্ট উভয়ে মিলিয়া ইহাতে খরচ করে। কাজের ভার এক স্থানীয় কমিটিকে সমর্পণ করা হইল। ডাঃ সেরেসোল এই কার্যের ভার লইলেন। আমরা রিলিফ কমিটির তরফ হইতে উঁহাকেই ঐ কমিটির সদস্য করিয়া লইলাম, এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য নিজেদের কর্মী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন দত্তকে দিয়া দিলাম।

সেখানে কয়েকটি নূতন গ্রাম বসানো হইল। ইহাতে এক বৎসরেরও বেশি সময় লাগিল। ডাঃ সেরেসোল সেখানে বরাবর থাকিলেন। মধ্যে একবার ইউরোপেও গিয়াছিলেন, তাহা হইলেও আবার কয়েক দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া কাজে জুটিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে ইউরোপের কয়েকটি দেশের চার-পাঁচ জন সহকর্মী ছিলেন। তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমও খুব করিয়াছিলেন। ডাঃ সেরেসোলের বয়স ষাটের বেশি হইয়াছিল। খুব দীর্ঘকায় ও জোয়ান ছিলেন। এখানকার গ্রীষ্মাধিক্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তবু ঐ গাঁয়েই থাকিতেন। সেখানে খাওয়ার কষ্ট ছিল, অভ্যস্ত আরামের কোনও উপকরণ ছিল না। তথাপি দিনরাত দৌড়ঝাঁপ করিতেন। তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া অন্য সকলরেও উৎসাহ হইত। যে সমস্ত গ্রাম বসানো হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে প্রধান গ্রামের নাম রাখা হইয়াছিল শান্তিপুর। এই সম্পন্ন ও সুন্দর গ্রামটি আজও লোকজনে পূর্ণ আছে এবং এক আদর্শ বসতি হইয়া আছে।

ভূমিকম্প ও বন্যার জন্য কয়েক জায়গায় ম্যালেরিয়ার খুব প্রকোপ হইয়াছিল। রিলিফ কমিটির দিক হইতে কয়েক জায়গায়, ম্যালেরিয়া হইতে লোকদের বাঁচাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল রামপুরহরি ও মানুষমারার অঞ্চল—মজঃফরপুর জেলায়, দ্বারভাঙ্গা জেলায় পাণ্ডোল ও মধুবনী অঞ্চলে আর ভাগলপুর জেলায় সুপৌল অঞ্চলে। কর্মকর্তাদের উৎসাহ ও ত্যাগের বলেই ইহা এত বড় কাজ হইতে পারিয়াছিল। তাঁহাদের যতই প্রশংসা করা হউক, তাহা অল্প হইবে। যদি মাসোহারা দিয়া সব কর্মীদের রাখিতে হইত, তাহা হইলে রিলিফ কমিটির অনেক টাকা শুধু কর্মীদের জন্যই খরচ হইয়া যাইত। আমি আরম্ভ হইতেই এই কথার উপর বেশি দৃষ্টি রাখিলাম যে নিঃস্বদের সাহায্য দিতেই যেন আমাদের সবচেয়ে বেশি খরচ হয় এবং সাহায্য পেঁাছাইয়া দেওয়ার কাজে সবচেয়ে কম খরচ হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে কর্মীদের খুব মোটা খাবার আমরা দিতাম যাহার জন্য গড়ে প্রত্যহ প্রায় দুই আনা

মত পড়িত। কাজ প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া চলিল। এজন্য আফিসে কিছু লোক রাখিতেই হইল যাহাদের কিছু খরচের টাকাও দিতে হইত; কিন্তু তাহাও আমরা খুবই কম হারে দিতাম। তা ছাড়া আফিসের জন্য বাড়ি-ঘর, জিনিসপত্র ইত্যাদির খরচও করিতে হইত। মাল টানিবার জন্য ও কর্মী এবং পরিদর্শকদের সবচেয়ে কম সময়ে নিজের নিজের জায়গায় পৌঁছাইবার জন্য আমাদিগকে লরী ও গাড়ী প্রভৃতি কিনিতে হইয়াছিল। এ সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের নামে লেখা হইত। সর্বদা আমরা এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতাম যে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও সাহায্যের পরিমাণের অনুপাত যতদূর কম থাকিতে পারে তাহা যেন থাকে। আমরা নিজেদের রিপোর্টে ইহারও উল্লেখ বরাবর করিতাম। শুরুতে যখন লোকদের অন্নবস্ত্রাদি পৌঁছাইতে হইত তখন কেন্দ্র হইতে ইহাদের টানিয়া সাহায্যদানের স্থানে লইয়া যাইতে এবং বিতরণ করিতে খরচ পড়িত বেশি। ইহাই ছিল স্বাভাবিক। যখন কুয়া, পুকুর, রাস্তা, পুল, নালা-ইত্যাদিতে হাত লাগানো গেল, তখন প্রতি-ষ্ঠানের খরচ হইল কম। যখন বাড়ির জন্য টাকা বিতরণ করিবার সময় আসিল তখন এই খরচ আরও কম হইয়া গেল।

এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। গভর্নমেণ্ট তাঁহার সিভিল সার্ভিসের এক সুযোগ্য অফিসর মিঃ ব্রেট্‌কে রিলিফ কমিশনার করিয়া দেন। রিলিফের সমস্ত কাজের ভার তাঁহার উপরই ছিল। তিনি রিলিফের উপর এক রিপোর্ট লিখিলেন এবং তাহাতে বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটিরও উল্লেখ করিলেন, তাহার খরচের সারাংশও ঐ রিপোর্টে দিয়া দিলেন। সেখানে তিনি লিখিয়া দিলেন যে রিলিফ কমিটির প্রতিষ্ঠা-ব্যয় বেশি পড়িল। ঐ রিপোর্ট লিখিয়া নিজের কাজ শেষ করিয়া তিনি ছুটিতে ইংলণ্ড চলিয়া গেলেন। এই রিপোর্ট তিনি চলিয়া যাওয়ার পর ছাপা হইল। আমরা দেখিলাম, এই প্রতিষ্ঠা-ব্যয়ের হিসাব একেবারে ভুল। আমরা গভর্নমেণ্টকে লিখিলাম, আমাদের পরী-ক্ষিত ও মুদ্রিত হিসাবে প্রতিষ্ঠা-ব্যয় তো অতটা নাই গভর্নমেণ্টের অঙ্কে ভুল আছে। আমরা জানিতে চাহিলাম, ঐ সব অঙ্ক কোথা হইতে কি করিয়া পাওয়া গেল। মিঃ ব্রেটের অনুপস্থিতিতে উত্তর আসিল যে মিঃ ব্রেটই ঐসব অঙ্ক তৈয়ার করিয়াছিলেন, গভর্নমেণ্টের জানা নাই যে কি ভাবে তিনি ঐসব অঙ্কে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় গভর্ন-মেণ্টের নিজের ভুল স্বীকার করাই উচিত ছিল; কিন্তু সেরূপও করা হইল না, গভর্নমেণ্টের রিপোর্টে সেই ভুল অঙ্ক আজও আছে।

রিলিফের কাজ শেষ হইয়া গেলে যে টাকা বাঁচিল তাহা এক ট্রাস্টের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল। যখন কখনও এই ধরনের বিপদ বিহারে উপ-স্থিত হইবে তখন তাহা খরচ হইবে। সৌভাগ্যবশত তখন হইতে কোনও

বড় বিপদ আসে নাই। এখানে-ওখানে ছোটখাটো বন্যা আসিলে অল্প-বিস্তর সাহায্যের প্রয়োজন হইল। ঐ সাহায্য উহা হইতেই দেওয়া হইল। ট্রাস্টির টাকা খালি না রাখিয়া মহাত্মাজীর পরামর্শমত অধিকাংশ টাকা চরখা সংঘকে কর্জ দিয়া রাখিয়াছিল। চরখা সংঘ সামান্য কিছু ব্যাজ দিত, আর চরখা দিয়াও গরিবদের সেবায় টাকাটা লাগাইত। এই প্রকারে এক পথে দুই কাজ হইত। ট্রাস্টী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, আর আমি। শেঠজীর স্বর্গলাভের পর এখন দুইজনই রহিয়াছি।

সত্যাগ্রহ স্থগিত

রিলিফ কমিটির কাজের জন্য মহাত্মাজী যখন বিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিতেছিলেন তখন একটি ঘটনা হয়, তাহার প্রভাব এখানকার রাজনীতির উপর খুবই পড়িয়াছিল। উপরে বলা হইয়াছে যে ১৯৩৩-এর মধ্যভাগেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শৈথিল্য আসিয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলে খানিকটা জাগরণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল। যখন ভূমিকম্প হয়, গান্ধীজী তখন দক্ষিণ ভারতে হরিজন কর্মে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। সেখান হইতেই তিনি বিহারে আসেন। এপর্যন্ত নূতন শাসন সংস্কারের কথা ইংলণ্ডে খানিকটা অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিল কনফারেন্সের পর অন্য কিছু কাজকর্ম হয় আর এক হোয়াইট্ পেপার প্রকাশিত হয়, তাহাতে নূতন সংবিধান প্রণয়ন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। লোকেরা মনে করিত, শীঘ্রই 'শ্বেতপত্র' অনুসারে আইন রচিত হইবে, এবং নূতন বিধান কাজে আসিবে। কেহ কেহ ভাবিতেছিল যে এই নূতন সংবিধান যতই খারাপ হউক না কেন, তাহার অনুযায়ী আমরা কাজ করিতে স্বীকার করি বা নাই করি, তাহা হইলেও কংগ্রেসকে নির্বাচনে যোগ দিতে হইবে। চারিদিকে এই কথার আলোচনা চলিতে লাগিল, কংগ্রেসের লোকেরাও এই কথা বলিতে লাগিল। ডাঃ আনসারি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীভুলাভাই দেশাই কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে এই কথা চালাইলেন। আমি তো রিলিফের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। এইজন্য আমার তো এদিকে মন দিবার অবকাশ ছিল না। মহাত্মাজী কিছু না কিছু ভাবিতেছিলেন হয়তো।

উত্তর বিহারে ঘুরিবার সময় একদিন ভাগলপুর জেলার সহরসা গ্রামে আমরা অবস্থান করিলাম। পরের দিন ছিল সোমবার, মহাত্মাজীর মৌন

দিবস। মহাত্মাজী মৌনাবস্থায় কিছু লিখিতে ছিলেন। আমি এমনিতেই তো কখনও তাঁহার সময় অনর্থক নষ্ট করি নাই, সেদিন তো তিনি লিখিতেছিলেন। এইজন্য সারাদিন আমি তাঁহার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা করিতে পারি নাই। সন্ধ্যা প্রায় চার-পাঁচটার সময় তিনি আমার হাতে এক কাগজ দিলেন, আর লিখিয়া জানাইলেন যে ইহা পড়িয়া সম্মতি দাও। আমি তাহা পড়িয়া লইলাম। উহাতে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা ছিল, আর ছিল নির্বাচনের বিষয়ে ইঙ্গিত। তিনি উহাতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া তাঁহার কোনও কোনও বিশ্বস্ত লোক যাহা বলিয়াছে তাহা হইতে তাঁহাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে। দেশব্যাপী শৈথিল্য ছাড়া আমাদের প্রদেশে ভূমিকম্পের পর হইতে বাতাবরণ অন্য প্রকারেরই হইয়া গিয়াছিল। এখানে তো সত্যাগ্রহ হইতেই ছিল না, বরং আমাদের প্রায় সকল বন্ধুকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, রিলিফের কাজে তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগিতা না পাওয়া গেলেও তাঁহাদের সঙ্গে কোনও প্রকারের বিরোধ ছিল না। যদি পূর্ণ সহযোগিতায় কোনও প্রকারের অভাব থাকিত তাহা হইলে তাহা আমাদের জন্য হইত না, গভর্নমেণ্টই পূর্ণ সহযোগিতা চাহিতেন না, আমাদের সকল কার্য সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। এইজন্য, যে আন্দোলন আপনা হইতেই অল্পবিস্তর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে নিয়মমতো বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথায় আমার খটকা লাগে নাই। অন্যান্য কথাও এমন কিছু ছিল না যাহাতে আপত্তি হয়। এই কারণে মন দিয়া পড়িবার পর আমি ঐ বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্মতি প্রকাশ করিলাম। অবিলম্বে তাহার নকল করা হইল, মহাত্মাজী স্থির করিলেন উহা সংবাদপত্রে পাঠাইবেন। সেখান হইতে তো তারও পাঠাইতে পারা যাইত না। এইজন্য আমি কাহাকেও উহা লইয়া পাটনায় পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম এমন সময়ে এক ব্যক্তি পাটনা হইতে আসিলেন।

পাটনায় ডাক্তার আনসারির তার আসিয়াছিল। তাহা লইয়া একজন লোককে সেখানকার লোকেরা পাঠাইয়া দেয়। পাটনায় লোকেরা বুঝিয়াছিল যে সহরসায় তার পাওয়া যাইবে না। ঐ তারে ডাঃ আনসারির পাটনায় আসিবার কথা ছিল। তিনি এই সব বিষয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলিবার জন্য আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাইও আসিবেন। এই তার পাইয়া মহাত্মাজী নিজের বক্তব্য সংবাদপত্রে পাঠানো বন্ধ করিলেন এবং পাটনা যাওয়া স্থির করিলেন। ডাঃ আনসারী পৌঁছিবার সময়ে আমরাও পাটনায় পৌঁছিলাম। ডাঃ আনসারী প্রভৃতির সহিত মহাত্মাজীর কথা হইল, এবং তাহার পর ঐ সব বক্তব্য সংবাদপত্রে পাঠানো হইল। এইরূপ বলিবেন স্থির করিয়াছেন জানিয়া কংগ্রেসের অনেকে সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু যে কারণ নির্দেশ করা হইয়াছিল

তাহা তাঁহাদের ভাল লাগে নাই। ফলে এখন প্রধান কংগ্রেস কর্মীদের একত্র হইয়া এবিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। মহাত্মাজীর বিহার পরিভ্রমণ তখনও শেষ হয় নাই। ছোটনাগপুরে যাওয়া বাকি ছিল; ওদিকে ভূমিকম্প হইতে লোকসান হয় নাই; কিন্তু গান্ধীজী হরিজনদের কাজে ওদিকেও যাওয়া ভাল মনে করিলেন। তিনি ওদিকে চলিয়া গেলেন। পরামর্শাদির জন্য প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের রাঁচিতে ডাকিয়া আনা হইল। এ বৈঠক নিয়মমাফিক ছিল না, লোকদের মতামত জানিবার জন্য ডাকা হইয়াছিল। আমিও সেখানে গেলাম। সকল প্রদেশ হইতে বিস্তর লোক আসিল। দুই-তিন দিন ধরিয়া কথাবার্তা চলিল। স্থির হইল যে পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকা হইবে। ইহার মধ্যে মহাত্মাজী অন্যান্য স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৯৩৪-এ মে মাসে পাটনায় এই অধিবেশন হইল।

এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল; এ পর্যন্ত সকল কংগ্রেস কমিটি ছিল অবৈধ। তাহাদের মধ্যে যে কোনটিরও অধিবেশন অবৈধ হইত। কিন্তু গভর্নমেণ্ট ধরনধারন বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের দিক হইতে কোন প্রকারের বাধা হইল না। রাধিকা সিংহ হলে বৈঠক হইল, সন্ধ্যাবেলায়, তাহার মাঠেই। দুই দলের লোকই ছিল। যে প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটির তরফ হইতে পেশ করা হয়, তাহাতে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার আদেশ ছিল, শুধু গান্ধীজীকে সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার দেওয়া হইল। কাউনসিল নির্বাচনে যোগ দিবারও কথা ছিল। তাহার সঙ্গে মহাত্মাজীর কথাকে সমর্থন করা হইল। কাহারও কাহারও এ প্রস্তাবে সম্মতি ছিল, কেহ কেহ তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিল—প্রতিবাদ ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তো বটেই, মহাত্মাজীর মন্তব্যে যে কারণ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ। কেহ কেহ সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার বিরোধী না হইলেও কাউনসিল নির্বাচনে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। খুব গরম গরম বক্তৃতার পর প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাঁহারা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গ্রুপ করিয়াছিলেন তাঁহারাই এই বিরোধিতায় বেশি যোগদান করিয়াছিলেন। এই সুযোগে পাটনাতেই সোশ্যালিস্টরা নিজেদের এক স্বতন্ত্র কনফারেন্স করিল। তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই পার্টি সংগঠন করে। ইহার প্রধান কর্মী ও নেতা ছিলেন আচার্য শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রতিবাদে আচার্য নরেন্দ্র দেবই ছিলেন প্রধান।

যাহা হউক, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দিল, এখন এজন্যও গভর্নমেণ্টের রাস্তা খুলিয়া তাঁহারা কয়েকদিন পরে কংগ্রেস কমিটির উপর হইতে অবৈধ বলিয়া যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা উঠাইয়া

লইলেন। কয়েকদিন পরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল। তাঁহারা নির্দেশ দিলেন, কংগ্রেসকে পুনরায় খুব তাড়াতাড়ি সংগঠিত করা হউক, এবং সকল কমিটি নিয়মমাফিক কাজ শুরু করুক; এবারে দুইপক্ষ নিজ নিজ মন্তব্য স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত করিল, তাই কাহারও উপর কাহারও দাবি বা বন্ধন ছিল না। গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত পালন করা বড় শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবার সে সমস্ত হাঙ্গামা ছিল না। কিছুদিন পরে গভর্নমেণ্ট এক এক করিয়া সমস্ত আশ্রম ও কংগ্রেস ভবন ফিরাইয়া দিল। তাহারা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় আমাদিগকে লইতে হইল এবং মেরামত প্রভৃতি সমস্ত কাজ আমাদিগকে করিতে হইল; এইজন্য এবার লেখাপড়ায় না দিতে হইল সময়, না হইল মাথা ঘামাইতে। ওয়ার্ধা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইল তাহাতে পারিবারিক কারণবশতঃ যাইতে পারিলাম না। তখন শেঠ যমুনালাল বাজাজকে তখনকার মত সভাপতি করা হইল। আর তাঁহাকেই কংগ্রেসকে চালাইতে হইল; স্থির হইল, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশন অক্টোবর মাসে হইবে। তখন পর্যন্ত সব সত্যাগ্রহী মুক্তি পায় নাই। সর্দার বল্লভভাই, জওহরলাল প্রভৃতি বন্দী ছিলেন। সর্দার তো বোম্বাই কংগ্রেসের পূর্বেই বাহিরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলালজী বোম্বাই কংগ্রেসের পরে অনেক দিন পর্যন্ত জেলেই ছিলেন।

দাদার মৃত্যু ও ঋণসংকট

এদিকে আমার বাড়িতে বড় বিপদ। এইজন্য আমি পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হইবার পর ওয়ার্ধায় যে ওয়ার্কিং কমিটি বসিবার কথা ছিল তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হইবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিপদ ঘটে।

রিলিফের কাজে দাদাও খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ছাপরাতেই তাঁহাকে বেশি কাজ করিতে হইত, প্রাদেশিক কাজেও তিনি অনেকটা ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি উপরে এক জায়গায় লিখিয়াছি যে তিনি আসামে খানিকটা জমি লইয়াছিলেন, কখনও কখনও সেখানে যাইতেন। এপর্যন্ত তাহার কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে নাই। তিনি মে মাসে সেখানে একবার যান, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জ্বর হইয়া গেল। ঐ জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। সেখানেই তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে; তাহার ফল বাড়ি ফিরিয়া জানা গেল। কিন্তু তাহা

হইতে তিনি সারিয়া উঠিলেন। আমি একদিন ভালই দেখিলাম। দেখিলাম যে তিনি ব্যাঙ্কের কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ সময় তিনি খুব দুর্বল ছিলেন। আমি বারণ করিলাম, বলিলাম যে এখন আরও কিছু বিশ্রাম করিয়া লও, গায়ে জোর হইলে কাজ করিবে। এইসব বলিয়া আমি পাটনায় চলিয়া আসিলাম। আমার পাটনায় আসিবার দুই-চার দিনের মধ্যেই ছাপরা হইতে তার আসিল যে তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে, ডাক্তার রঘু-নাথ শরণকে যেন পাঠাইয়া দিই, অথবা যেন সঙ্গে লইয়া যাই। তার পড়িয়া আমার চিন্তা বাড়িয়া গেল। এই তার ছাপরার সিভিল সার্জেন ডাক্তার রাজেশ্বর প্রসাদের মতানুসারে করা হইয়াছিল।

যতক্ষণ ডাক্তার শরণের সাথে দেখা করিয়া ছাপরা যাওয়া স্থির করিতে-ছিলাম ততক্ষণ দুপ্রহরের ষ্টিমার, যাহাতে গঙ্গা পার হয়, ছাড়িয়া গেল। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক মনে হইল না, মোটরে ডাক্তার শরণের সহিত রওনা হইলাম। নৌকায় করিয়া মোটরকে গঙ্গা পার করিয়া আমরা আগে আগে চলিলাম, ভূমিকম্পের জন্য রাস্তা খারাপ ছিল, রেল বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য অনেক গোরুর গাড়ী ও লরী চলিতেছিল তাহাতে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমরা প্রায় রাত দশটায় ছাপরায় পেঁাছিলাম। সেখানকার সব ডাক্তারেরা খুব যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন। ডাক্তার রাজেশ্বর প্রসাদ তো রাতদিন সেখানেই থাকিতেন। তিনি যখন দেখিলেন অবস্থাটা সাধ্যের বাহিরে, তখন তার করেন। জ্বর ছাড়া এ সময় মূত্রাশয়ের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। পূর্বে তাঁহার কিছু অসুবিধা ছিল, তাহার জন্য চিকিৎসা করা হয়, ফলে তিনি খানিকটা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এখন শরীর দুর্বল থাকায় তাহাও হয়তো আবার বাড়িয়াছিল।

রাত্রেই প্রস্রাব-ইত্যাদি লইয়া পাটনায় লোক পাঠানো হইল। ডাক্তারেরা অনেক পরিশ্রম করিল, কিন্তু রোগ দিন দিন বাড়িয়া চলিল। পাটনা হইতে বৈদ্যরাজ পণ্ডিত ব্রজবিহারী চৌবেজীকেও ডাকা হয়। তিনিও কিছু ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, শেষকালে ডাক্তারদের মত হইল, হয়তো একটা কিডনি বাহির করিয়া দিলে কিছুটা উপকার হইতে পারে। ডাক্তার রাজেশ্বর প্রসাদ ভাল সার্জন, কিন্তু তিনি এই দায়িত্ব একা লইতে চাহিলেন না। ডাক্তার ব্যানার্জিকে ডাকিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হওয়ায় তিনি পাটনায় ছিলেন না। মুঙ্গেরের সিভিল সার্জেন ডাক্তার বটুকদেবপ্রসাদ শর্মাও ভাল সার্জন। তাঁহাকে ডাকা হইল, কিন্তু তাঁহার হাতে অন্য একজন রোগী ছিল, তাহাকে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া তিনি কোথাও বাহিরে যাইতে পারিলেন

না। লখনৌতে তার পাঠানো হইল, সেখানকার নামকরা সার্জন ডাঃ ভাটিয়াকে ডাকা হউক, কিন্তু তিনিও আসিতে পারিলেন না। কলিকাতায় তার করা হইলে সেখানকার বন্ধুরা নামকরা সার্জন ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জিকে পাঠাইলেন। পাটনার কর্ণেল অলেকজান্ডারকেও ডাকা হইল। সকলে দেখিয়া ঐ কথাই বলিল যে এতখানি দুর্বল অবস্থায় ছুরি লাগানো ঠিক হইবে না। হার মানিয়া অস্ত্রোপচারের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহার দুই দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিল!

আমরা তার করিয়া জামসেদপুর হইতে জনার্দন ও তাহার স্ত্রীপুত্রদের ডাকিয়া আনাইয়াছিলাম। লখনৌ হইতে জামাই-মেয়েও আসিয়া গিয়াছিলেন। শিকারপুরের বৌদিদি মৃত্যু হইবার পর আসিয়া পৌঁছিলেন। পাটনা হইতে সঙ্গে সঙ্গে ভাই মথুরাপ্রসাদজী আসিলেন। পূজনীয় ব্রজকিশোরবাবুও আসিয়া পড়িলেন। এইভাবে সকল ইষ্ট বন্ধুদের মধ্যে পুত্রাদি বেষ্টিত হইয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সকলে রামনাম ও গীতাপাঠ করিতেছিলাম। আমাদের সকলের মাথায় যেন পাহাড় ভাঙিয়া পড়িল। কখনও বাড়িঘরের সহিত সম্বন্ধ রাখি নাই, সবকিছু তিনিই করিতেন, যখন ওকালতি করিতাম, টাকা রোজগার করিতাম, তখনও তিনিই দেখাশুনা করিতেন। আমার স্ত্রী ও ছেলেরা তাঁহার নিকটেই থাকিত। আমি কখনও গেলে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিতাম। বাড়ির স্ত্রীদের ইনি কখনও একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক হইতে দেন নাই, ছেলেদের মধ্যে কোনও প্রকারের ভেদ করেন নাই। ছেলেরাও তাঁহাকেই পিতা বলিয়াই জানিত ও মানিত। হঠাৎ এই বিপদ আসিল; তাহাও তখনই আসিল, যখন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

আমরা তাড়াতাড়ি দায়ক্রিয়ার জন্য সরযূর তীরে চলিয়া গেলাম; তখনকার দিনে ছাপরা হইতে কিছু দূরের পথ। দাহক্রিয়া করিতে করিতে দেরি হইয়া গেল। পরের দিন সকালে বাড়ির সকলের সঙ্গে মোটরে করিয়া আমি জীরাদেঈ চলিয়া গেলাম। সেখানেই বাড়িতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিলাম। দাদা সমস্ত প্রদেশেই সুপরিচিত ছিলেন, সাধারণের সেবায় তিনি অনেকখানি সময় দিতেন। তাহা ছাড়া ছাপরা এবং অন্যান্য স্থানে লোকদের সেবা ও সাহায্য করিতেন। যে বাড়িতেই যজ্ঞ হউক তিনি তাহার অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন, যেখানে যে কোন প্রকারের সভা সমিতি হউক তিনি ব্যবস্থা করিতে জুটিয়া যাইতেন। লোকদের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহার এত ভাল ছিল যে, কাহারও কোন প্রয়োজন হইলে তাহা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইজন্য তাঁহার মৃত্যুর খবর ছাপা হইলে, সমস্ত প্রদেশ হইতে অনেক বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতিজ্ঞাপক তার ও পত্র আসিতে লাগিল। এইসব দেখিয়া আমার

মনে সাহস আসিল, মহাত্মাজীর সান্ত্বনাবাণীর প্রভাব তো না পড়িয়া থাকিতেই পারে নাই।

এ সব সত্ত্বেও এসময় আমার পক্ষে ছিল বড়ই কঠিন ও দুঃসময়। বলিয়াছি যে বাড়ির কাজকর্মের সঙ্গে আমার কিছু সংস্রব থাকিত না। সব কিছু দাদাই দেখাশুনা করিতেন। এমন কি, আমি যখন টাকা রোজগার করিতাম তখনও আমার নিজের আরাম ও প্রয়োজনের বস্তুর দিকে তিনিই দৃষ্টি রাখিতেন। পাটনায় আসিলে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমার কাপড় ঠিক আছে কি না, আমার ধুতি ভাল আছে না পুরানো হইয়া গিয়াছে, আমার কয়টা জামা আছে, আমি জলখাবার কি খাই—ইত্যাদি। আর দরকার মত সেই চাকরকে, হয়তো আমার ক্লার্ক মৌলবী শরাফৎ হোসেনকে, যাঁহাকে আমরা সকলে মুন্সীজী বলিয়া ডাকিতাম, টাকা দিয়া যাইতেন। আমিও খরচ বাদে যাহা কিছু বাঁচিত সমস্ত তাঁহারই জিম্মা করিয়া দিতাম। বাড়িতে জমিদারি ছিল অল্প, তাহা হইতে মাসে চার হইতে পাঁচ শ টাকা পর্যন্ত বাঁচিত। বাবা জমিদারির কাজ হইতে আলাদা হইয়াই থাকিতেন, ইহাতে দেখাশুনা কিছু খারাপ হইত, তাই এত আয় সত্ত্বেও কখনও কখনও কষ্ট হইত। প্রথমেই লিখিয়াছি যে দাদা যখন প্রয়াগে বি. এ. পড়িতেন তখন পরীক্ষার সময়ে তিনি পরীক্ষার ফিয়ের জন্য টাকা চাহিয়া পাঠাইতেন; পরিমাণ এমন কিছু বেশি নহে; কিন্তু দেখাশোনার সমস্ত ভার দেওয়ানের উপর ছিল, দেওয়ান তাড়াতাড়ি না দিতে পারিলে বাবা ধার করিয়া টাকা পাঠাইতেন। এ তো গেল এক সাধারণ উদাহরণ। টাকার অসুবিধা সর্বদাই লাগিয়া থাকিত।

যখন ছাপরায় পড়িতাম, তখন নগদ টাকার প্রয়োজন হইত খুব কম। দুইজন মুদীর সঙ্গে পাকা কথা ছিল। আমি চিঠা লিখিয়া দিতাম, তাহারা প্রয়োজন মত জিনিস দিত। সব চিঠা লইয়া তাহারা জীরাদেঈ যাইত, সেখান হইতেই টাকা পাইত। শুধু স্কুল ফি আর বই অথবা কাপড় কিনিবার জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হইত। যখন বাড়ি হইতে কেহ জমিদারির মকদ্দমা তদ্বিরের জন্য আসিত, তখন তাহার নিকট হইতে আমি নগদ টাকা লইতাম। ইহার জন্য একজন লোক নিযুক্ত ছিল, তাহার নাম কিম্নু রায়। সে সর্বদা ছাপরায় যাওয়া-আসা করিত। এজন্য আমার কখনও কোনও কষ্ট হয় নাই। কিন্তু দাদার বিষয়ে এরূপ হয় নাই। পাটনা বা প্রয়াগে খরচের জন্য তাঁহার প্রতি মাসে নগদ টাকার প্রয়োজন হইত। এজন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট পোহাইতে হইয়াছিল। একথা তিনি ভুলেন নাই। এজন্য, বাবার দেহত্যাগের পরে, তিনি যখন জমিদারি দেখাশোনার ভার লইলেন তখন আমার নিকটে খরচ পাঠাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; কিন্তু বাবা বাঁচিয়া থাকিতেই, তিনি যখন প্রয়াগ হইতে বি. এ. পাশ

করিয়া আসেন, তখন হইতেই জমিদারির কাজ দেখিতে থাকিলেন। ব্যবস্থা তিনি ভালই করিয়া দিয়াছিলেন।

বাবার মৃত্যুর সময় অল্প ধার ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এক ভাইঝির বিবাহ হয়, তাহাতেও কিছু ধার হইয়া গেল। এইভাবে কয়েক হাজার টাকার ধার ছিল। কিন্তু এতখানি জমিদারির পক্ষে এই কর্জ এমন কিছু বড় নহে, কিংবা আদায় না হইবার মত নহে, বিশেষত যদি বাইরের কিছু নগদ আয় হয়। দাদা ছিলেন বিহার ব্যাঙ্কের ছাপরা শাখার ম্যানেজার। কিন্তু তাঁহার এত বেতন নয় যে সেখানকার সব কিছু খরচ চালাইয়া কিছু বাঁচাইতে পারেন। আমি তো কিছু রোজগার করিতামই; কিন্তু খরচও করিতাম যথেষ্ট। এইজন্য এই কর্জ শোধ হইতে পারিল না। আরও একটি মেয়ের বিবাহ আসিয়া পড়িল। তাহাতেও খরচ হইল। খুড়িমা মারা গেলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধে খরচ লাগিল। কিন্তু এ সমস্তের জন্য কর্জ বাড়ে নাই; বরং আয় কিছু বাড়িয়া গেল; কারণ খুড়িমা বৎসরে তীর্থ-ভ্রমণের জন্য যে ১২০০৲ পাইতেন, তাহা এখানে বাঁচিয়া যাইতে লাগিল। তাহা হইলেও বোঝা কোনও প্রকারে হালকা হইল না। কিন্তু সকলে খুব আরামে থাকিতে লাগিল। উপরের ঠাট খুব ভাল ছিল; নাম যশ খুব ছড়াইয়া পড়িল। দাদার মন ছিল খুবই উদার। খরচ যথেষ্ট করিতেন, কোনও ব্যসনে বা শখে নয়; কিন্তু রকম রকমের খরচ ছিল। তাই ব্যবস্থা ভাল হইলেও প্রথমবারের ধার শোধ হইতে পারিল না। তিনি আশায় ছিলেন, আমি এত টাকা রোজগার করিব যে অক্লেশে ধার শোধ হইয়া যাইবে। যখন ওকালতি ছাড়া স্থির করিলাম, তখন তাঁহার সকল আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি কখনও মুখ দিয়া একটি কথাও আমাকে বলেন নাই।

তিনি জানিতেন, জনসাধারণের সেবায় আমার রুচি হইয়াছিল তাঁহারই উৎসাহে। যতদূর সম্ভব, তিনি ইহাতে আমার সাহায্যই করিতেন। কখনও অসন্তোষ দেখাইতেন না। আমাকে এই ধরনের কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার কল্পনাও নিজের মনে আসিতে দিতেন না। তাই, নিজের সকল আশায় ছাই দিতে দেখিয়াও তিনি খুশিই ছিলেন, আর সর্বদা আমাকে খুশি রাখিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ইহা ভাবিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চাকুরি হইতে আয় বেশি হইতে পারে না। বেশি মাহিনার অন্য চাকুরি চাহিলে হয়তো পাওয়া যাইত; কারণ ভাল ম্যানেজার বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু যে-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কোনও প্রকারে ছাড়িতে চান নাই। ইহা ভিন্ন তাহাতে সুবিধাও ছিল। তিনি কর্মচারীর মত নয়, মালিকের মত কাজ করিতেন। কোনও ম্যানেজার কোনও ব্যাঙ্কের জন্য ঐরূপ পরিশ্রম করিত কি না সন্দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রায় প্রতি রবিবার জীরাদেঈ চলিয়া আসিতেন এবং বাড়ির ব্যবস্থা দেখিয়া যাইতেন। সর্বসাধারণের কাজেও তিনি অনেকটা সময় দিতেন। ব্যাঙ্কের মালিকের দিক হইতে তাহাতে কখনও বাধা প্রদান করা হইত না। এই সব কারণে তিনি ব্যাঙ্ক হইতে সরিয়া যাওয়া পছন্দ করিতেন না, তবে অন্য কোনও উপায়ে আয় যদি কিছু বাড়ানো যায় সে কথা চিন্তা করিতেন। এইজন্য তিনি একটা চাউলের কল খোলেন।

আমি তো কংগ্রেসের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, মিলের কাজ খুব আগাইয়া গেলে তবে আমি এ ব্যাপারের সন্ধান পাইলাম। দাদার হাতে ব্যাঙ্কের কাজ, কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজ, অন্যান্য এত কাজ ছিল যে তিনি এই মিলের দেখাশোনায় নিজে সময় দিতে পারেন নাই। তিনি অন্যের উপর নির্ভর করিলেন। তাহার অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়াই হউক আর শৈথিল্যের জন্যই হউক, কি আর কোনও কারণেই হউক, ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। মিলে টাকার অভাব হইয়া গেল। ধানের মৌসম চলিয়া যাইতেছিল। ঐ সময় ধান না কিনিলে লাভ হইবে না। কিন্তু আশা করা হইত যে যদি কাহারও নিকটে টাকা লইয়া খাটানো যায়, তাহা হইলে মৌসম কাটিয়া গেলে চাউল বিক্রয় হইলে টাকাটা ফিরিয়া আসিবে এবং মহাজনকে শোধ করিয়া দেওয়া চলিবে। বাজারের অবস্থা এমন মনে হইতেছিল যে, ঐ যে টাকা খাটানো হইবে তাহার ব্যাজ দেওয়ার পরও ভাল মত লাভ থাকিবে। তিনি এইরূপই মনে করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, শেঠ যমুনালালজীর কাছ থেকে এক 'সীজন'-এর জন্য কিছু টাকা এনে দাও। শেঠজী এই কথা মঞ্জুর করিলেন। টাকা আসিল। মিল খুব জোরে চলিতে লাগিল। চাউল তৈয়ার হইবার পূর্বেই বিক্রয় হইয়া যাইত। খরিদ্দারের ভিড় লাগিয়া থাকিত। সকলে মনে করিত যে খুবই লাভ হইবে। মিলের ম্যানেজার মহাশয় দাম ধরিতেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহার কম দরেই চাউল বিক্রয় হইতেছিল। এ অবস্থায় খরিদ্দার ভাঙ্গিয়া পড়া আশ্চর্যের কথা নয়। যত বেশি চাউল তৈয়ারি হইত ও বিক্রয় হইত, ঘাটতির পরিমাণ ততই বাড়িতে থাকিত। শেঠজীর টাকাটা আসিয়া গেলে আমিও কিছু কিছু মন দিতে লাগিলাম। একদিন মিলে গেলাম। সেখানে থাকিয়া হিসাব দেখিলাম। বুঝিতে পারিলাম যে খরচ অপেক্ষা কম দরেই চাউল বিক্রয় হইতেছে। ম্যানেজার আমার কথা স্বীকার করেন নাই। শেষে ভাইসাহেবকেও সময় দিতে হইল। তিনিও হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে অনেক লোকসান হইয়া গিয়াছে। ফলে শেঠজীর টাকা ঠিক সময়ে দেওয়া গেল না। আস্তে আস্তে কিছু কিছু শোধ হইল, কিন্তু খুব বেশির ভাগই বাকি থাকিয়া গেল।

এরূপ অবস্থা যখন বুঝিতে পারা গেল তখন আমরা দুইজন খুব

লজ্জা পাইলাম, কিন্তু কিছু করিতে পারিলাম না। তাগিদ দেওয়া হইতে-ছিল, কিন্তু টাকা শোধ হইতে পারিল না। শেঠজীর এক মারোয়াড়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কেডিয়া বিহারে কোথাও অল্পস্বল্প জমি লইয়া চাষ করিতে যাইতেছিলেন। একবার শেঠজী ও কেডিয়াজী দুইজনে জীরাদেঈ আসিলেন। আমার জমিদারিতে ৭০।৮০ বিঘা জমি নিজের জোতভুক্ত, তাহাতে ধান, গম, আখ ইত্যাদি সব রকমের ফসল জন্মিতে পারে। সে জমি আমার বাড়ি হইতে প্রায় এক মাইলের ভিতরেই। শেঠজীর ও অন্যান্য কর্জ মিলাইয়া ৬০।৬৫ হাজার টাকার হইবে। তিনি ইহাতে রাজি হইয়া গেলেন যে এই জমি বাড়ি তাঁহাকে যদি বিক্রী করিয়া দিই তবে তিনি সকলের সব কর্জ চুকাইয়া দিবেন। বাড়ি পাকা, দেখিতে জম-কালো; তৈরী তো হইয়াছিল ঠাকুরদাদার সময়ে, কিন্তু দাদা তাহাতে কয়েক হাজার টাকা ফেলিয়া বাড়িটা বাড়াইয়া লইলেন এবং কিছু অংশ দোতালা করিলেন। বাড়ি ও জিরাতের জমি যদি আমরা ঐ সময় বেচিয়া ঋণ হইতে মুক্তি পাইতাম, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত। ইহার পরেও জমিদারি হইতে মাসিক অন্ততঃ পাঁচ শত টাকা অক্লেশে বাঁচিয়া যাইত। হাঁ, অন্য কোথাও বাড়ি অবশ্য তৈরী করিতে হইত। কিন্তু এই সময়ে বাড়ির লোকেরা বেশির ভাগ থাকিত ছাপরায়। ছোট বাড়ি নিজেদের জমিদারিতে কোথাও একটা তৈরী করিয়া লওয়া কঠিন ছিল না। এই মত আমার ভাল লাগিল, এবং এই কথাটার উপর জোর দিলাম যে কর্জ শোধ করিবার পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল রাস্তা এখন হইতে পারে না। তাই ইহা চুকাইয়া ফেলা উচিত।

শেঠদের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। তাঁহারা তো রাজিই ছিলেন। শেঠ যমুনালাল বাজাজও এই কথাটার উপর খুব জোর দিয়াছিলেন যে এই ভার সরাইয়া দেওয়া উচিত, না হইলে ভবিষ্যতে ইহা গলা টিপিয়া ধরিবে। বাপদাদার তৈয়ারি ও আমাদের সকলের জন্মস্থান পুরানো বাড়ি বিক্রয় করি-বার কথায় দাদা খুব কুণ্ঠিত হইতেছিলেন; কিন্তু বাধ্য হইয়া কিছু কিছু রাজীও হইলেন। পরে বাড়ির মেয়েদের এবং কয়েকটি বন্ধুর—তাঁহাদের মধ্যে বাবু মথুরাপ্রসাদও একজন—মত নাই বলিয়া ঐ বাড়ি ও ক্ষেত বিক্রয় করিতে রাজি হইলেন না, ব্যাপার চুকিয়া গেল। পৈতৃক বাড়ি ও ক্ষেত বিক্রয় করা হইল না; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য মহাজনেরা এত জোর করিলেন যে জমিদারির অনেকখানিই বিক্রয় করিতে হইল।

দাদা চাউলের কলের ঘাটতির জন্য অসুবিধাতেই পড়িয়াছিলেন, এখন অন্য কিছু ব্যবসা করিতে চাহিলেন। ছাপরায় ইলেক্ট্রিক কারখানা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। ১৯৩০ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম তখন এই কথা স্থির হয়। টাকাতো নিজের কাছে ছিলই না। ছাপরার ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই

কোম্পানী স্থাপিত করা হইল। গভর্নমেণ্ট তাঁহাকেই লাইসেন্স দিল, কোম্পানীকে নয়; এইজন্য তিনিই বিজলীকল তৈয়ার করিলেন। টাকা জোগাড় হইল কর্জ করিয়া। কিছুটা কোম্পানীর ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া দিয়াছিলেন, কিছু শেয়ার বিক্রয় করিয়া, কিছুটা নিজের দায়িত্বে ধার লইয়া টাকার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমবারের ও এখনকার কর্জ মিলাইয়া অনেক হইয়াছিল। মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্বেই তাঁহাকে বাৎসরিক প্রায় বাইশ শত টাকা আয়ের জমিদারি বেচিতে হইল। তাহা হইলেও সমস্ত কর্জ শোধ হইল না। শেঠ যমুনালালজীর টাকাতো পড়িয়া রহিল, অন্যান্য কয়েক জায়গার টাকাও বাকি ছিল। শেঠজী ছাড়া অন্য কাহারও কর্জের খবর আমার জানা ছিল না। জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেলে ভাবিলাম, এখন বুঝি বোঝা হাল্কা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা আর কোথা হইতে হইবে। খানিকটা খরচের জন্য, খানিকটা এই ধরনের ব্যাপারের জন্য কর্জ বাড়িয়াই চলিল। কখনও কখনও তিনি বলিতেন যে ইলেক্‌ট্রিক শেয়ার বিক্রি করিলে ও যে টাকা লাগানো হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া আসিলে বোঝা হালকা হইতে পারে, কিন্তু ইহাও তিনি আশাবাদী ছিলেন বলিয়াই বলিতেন। কিছু শেয়ার বিক্রয় করিবার চেষ্টাও করা হইল, কিন্তু বিজলী কলের উপর কোম্পানীর স্বত্বই ছিল না বলিয়া শেয়ার বিক্রয় করা কঠিন হইল। এইভাবে নিজের উপরে কর্জের বোঝা বাড়িতে থাকিল। সুদও বাড়িতে থাকিল, শোধ করিবার কোনও উপায় নজরে পড়িল না। ছেলেদের মধ্যে আমার ভাইপো ইংলণ্ড হইতে লোহা তৈয়ারি করার কাজ শিখিয়া আসিয়াছিল, টাটা কোম্পানীতে তাহার কাজ জুটিয়াছিল। সেখানে সে প্রায় তিনশ, সাড়ে-তিনশ পাইত, কিন্তু সেখানকার খরচ ও বাড়ির লোকদের সেখানে থাকিবার খরচ এত বেশি হইত যে, সে বেশি কিছু বাঁচাইতে পারিত না। হয়তো দাদা আমার কাছে যেমন কখনও কিছু চাহিতেন না, কখনও আমাকে অর্থ চিন্তায় ফেলিতে চাহিতেন না, তেমনি উহাকেও কখনও কিছু বলিতেন না বা উহার কাছে কিছু চাহিতেন না। আমরা যে কতখানি গভীর জলে পড়িয়াছি তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহা বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার উপর লোকদের এত বিশ্বাস ছিল যে কোন লেখাপড়া না করিয়াই লোকেরা হাজার হাজার টাকা তাঁহাকে কর্জ দিয়াছিল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, আরও কত হাজার যে তিনি তাহাদের নিকট হইতে পাইতেন, তাহা জানি না।

তাঁহার মৃত্যুর পর যখন এইসব দেখিবার পালা আমার উপর পড়িল, তখন প্রথমে তো আমি ইহাই জানিতাম না যে কাহাকে কতখানি দিতে হইবে, বা কতখানি পাওনা আছে। আমি পাটনাতেই রহিয়া গেলাম, তাঁহার এক বিশ্বাসী ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিল, সে তাঁহার লেনদেনেরও

খবর রাখিত। সে আমাকে কিছু বলিল আর পরে মহাজনেরা এক এক করিয়া নিজেরাই আমার কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল। কতখানি দেনা আছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে আমি অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলাম, কারণ সবকিছু বিক্রয় করিয়া দিলেও সকলের কর্জ শোধ করা কঠিন হইত। যদি ভাল দাম আসিয়া যায় তাহা হইলে হয়তো সমস্ত ধার শোধ হইতে পারে, কিন্তু এখন জমিদারির ভাল দাম কে দেয়, আর তাহাও যখন তাড়াতাড়ি বিক্রয় করিতে হইবে। এতখানি কর্জের ভার মাথায় রাখা আমার পক্ষে ছিল অসহ্য। কোনপ্রকারে লোকে যদি জমিদারি লইয়া ঋণমুক্ত করিয়া দিত তাহাই আমি চাহিতেছিলাম, তাহা হইলে খুব অনুগ্রহ হইত, কিন্তু সব মহাজন জমিদারি লইতে চাহে নাই। আমি সকলকে বলিলাম, কোন না কোন ব্যবস্থা করিয়া এক বৎসরের মধ্যে টাকা শোধ দিতে চেষ্টা করিব। আর যদি জমিদারি লইতে চাহেন তাহা হইলে তখনই লিখিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। দাদার উপর লোকদের এতখানি বিশ্বাস ছিল—তাঁহার প্রতি এতখানি ভালবাসা ছিল যে সকলে আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমার কথা মানিয়া লইল। আমি চাহিতেছিলাম যে এখন সব কাজ ছাড়িয়া জমিদারি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থায় লাগিয়া যাই, আর এই বোঝা সরাইয়া আবার সাধারণের কাজে লাগি।

ঋণমুক্তি ও বোম্বাই কংগ্রেস

ইহার মধ্যেই বোম্বাইয়ে যে কংগ্রেস হইবার কথা ছিল তাহার সময় নিকটে আসিল আর সভাপতির জন্য আমার নাম আসিল। করাচী কংগ্রেসের পরে উড়িষ্যায় যে কংগ্রেস হইবার কথা ছিল, তাহার সভাপতি পদের জন্যও আমার নাম আসিয়াছিল এবং একপ্রকার নির্বাচিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া যাওয়ার জন্য সেই কংগ্রেস হয়ই নাই। আবার যখন কংগ্রেস নিয়ম মতন হইতে লাগিল, তখন স্বাভাবিক রীতিতে আমারই নাম লোকের নিকট উঠিল। তাছাড়া ভূমিকম্পের সংকট-ত্রাণের কাজের জন্য সমস্ত দেশে লোকের আমার প্রতি খুব ভালবাসা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। গান্ধীজীরও ইচ্ছা ছিল যে আমিই সভাপতি হই।

দাদার মৃত্যুর আঘাতে আমি তো কাতর ছিলামই, তাহার উপর কর্জের বোঝার সন্ধান পাইয়াই আমি আরও কাতর হইয়া গিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় মনে করিলাম, কংগ্রেসের সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করা অনুচিত

ও অসম্ভব। মহাত্মাজীর তরফ হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেবভাই দেশাই লিখিলেন যে, ভূমিকম্পের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া দেশ আমার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখাইতে চায়, এভার আমার লওয়া উচিত, কর্জের বিষয়ে শেঠ যমুনালালজীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হইয়াছে, তিনি দেখিবেন। হয়তো সেখানে সকলে মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহারই নিকটে অধিক কর্জ, সুতরাং তিনি কোন উপায় ভাবিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

শেঠজী একবার আমার বাড়ির লোকদের সহিত দেখা করিতে জীরাদেঈ আসেন। আমার বৌদিদি, স্ত্রী ও দুই পুত্রবধূ অনেকদিন পর্যন্ত সাবরমতী আশ্রমে ছিলেন। সেখানেই তাঁহার সঙ্গে সকলের পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য দাদার মৃত্যুর পর তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আসিয়াছিলেন। বাড়ির সমস্ত অবস্থা ও কর্জেরও কিছু অবস্থা শুনিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে সমস্ত জমিদারি যদি ঠিক দামে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে সমস্ত কর্জ শোধ হইতে পারিবে, কিন্তু জমিদারির লোভ একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমিতো ইহাতে রাজী ছিলাম। এইজন্য মহাত্মাজী তাঁহাকে ভার দিয়াছিলেন, ও কর্জের চিন্তা তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া কংগ্রেসের দায় উদ্ধার করিতে বলিলেন। এদিকে মহাজনেরাও এক বৎসরের সময় দিয়াই দিয়াছিলেন। আমি সভাপতিত্বের গুরুতর ভার স্বীকার করিয়া লইলাম। শেঠজী নিজের মুনীমকে পাঠাইয়া দিলেন, সে সব মহাজনদের সঙ্গে হিসাব করিয়া যেন দেখে যে কতখানি দেনা আছে, তাহা পুরাপুরি জানা যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে জমিদারী লইতে কে কে রাজী আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াও সে যেন খবর সংগ্রহ করে।

কিন্তু আমার বিপদের এখনও শেষ হয় নাই। আমার ভাইপো জনার্দ্দনের এক শিশু ছিল। হয়তো ছয় বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইহার পূর্বেও যেমন লিখিয়াছি, তাহাকে সকলে খুব ভালবাসিত, আমারও খুব আদরের ছিল। তাহার জ্বর হইয়া গেল। তাহার মাথায় কখনও কখনও ব্যথা হইত। দাদার মৃত্যুর সময় সে তাহার মার সঙ্গে জামসেদপুর হইতে আসিয়াছিল। চিকিৎসা করাইবার জন্য আমি তাহাকে পাটনায় লইয়া আসিলাম। সেখানে তাহার টাইফয়েড হইয়া গেল। আঠার-কুড়ি দিন ধরিয়া রোগে ভুগিয়া সেও চলিয়া গেল। ইহার আঘাতও আমার খুব লাগিল। দাদা তো চলিয়া গিয়াছেন, এখন এই শিশুও চলিয়া গেল! এই-সব কারণে আমি অত্যন্ত শোকাকুল ছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছি, একদিক দিয়া ভালই হইয়াছে, তাহাতে মন বসিয়া গিয়াছে, এখন আর বাড়ির চিন্তা করিবার সময়ই হয় না। কংগ্রেসের সভাপতির পদের কথা বলিবার পূর্বে বাড়ীর কথা শেষ করা ভাল, যদিও সভাপতিত্বের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত এই অধ্যায় চলিতে থাকিল।

যখন সমস্ত দেনার হিসাব করা হইল এবং শেঠজীর রিপোর্ট দেওয়া হইল, তখন এইজন্য চেষ্টা করা হয়, যে রাজি হইবে তাহাকে জমিদারি দেওয়া যাক। কোনও কোনও মহাজন রাজি হইয়া গেলেন। তাঁহাদের নিকট জমিদারি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। মহাজনদের মধ্যে একজন ছাড়া প্রায় সকলে খুব ভালভাবে জিনিসটি গ্রহণ করিলেন। একজন ভদ্রলোক কষিয়া সুদব্যাজ লইলেন—সব মহাজন মুক্তি-পত্র লিখিবার সময়ে যেমন কিছু ছাড়েন। ইনি এক পয়সাও ছাড়িলেন না। অন্য সকলে, দাদার মৃত্যুর পর হইতে সাত-আট মাস অর্থাৎ ঋণ শোধ হওয়ার দিন পর্যন্ত ব্যাজ লন নাই। কেহ কেহ আরও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। জমিদারি প্রভৃতির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়াও কোনও কোনও মহাজনের—যাহারা জমিদারি লইতে চাহে নাই—ও শেঠজীর টাকা বাকি রহিয়া গেল। আমি বাকি সমস্ত জমিদারি শেঠজীর নামে বন্ধকী লিখিয়া দিলাম, তিনি অন্য মহাজনদের নগদ টাকা শোধ করিয়া দিলেন। সমস্ত টাকা সে সময় তিনি নিজে হইতে দিতে পারেন নাই, তাই শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার কাছ হইতে লইয়া দেওয়াইয়া দিলেন, কিছুটা নিজে দিলেন। এইভাবে সমস্ত ধারই শোধ হইয়া গেল, কিন্তু নিজের জমিদারি হইতে একটুকরা জমিও বাঁচিল না। বিহারে জমিদারি লইবার ইচ্ছা শেঠজীর ছিল না। ঐ সময় তিনি এইজন্য উহা লিখাইয়া লইয়াছিলেন যে আস্তে আস্তে জমিদারি বেচিয়া তাঁহার টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। ঘনশ্যামদাসজীরও এই মত ছিল। এই-ভাবে আমি কর্জের বোঝা হইতে মুক্ত হইলাম।

হ্যাঁ, জমিদারি বেচিয়া শেঠদের টাকা শোধ করিবার কথা ছিল, শোধ না হওয়া পর্যন্ত সুদ দিতে হইত। এখন জমিদারি হইতে আমি এক পয়সাও ঘর-খরচার জন্য লইতে পারিতাম না। জিরাতের জমিও বন্ধকী ছিল। কিন্তু চাষআবাদ সবই আমাদেরই করাইতে হইত। তাহার সুদ বৎসর বৎসর শোধ হইতে থাকিত। জমিদারির ভার তিনি আমার ছোট-ছেলে ধনুর নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন। এইমতে যদিও আইনতঃ শেঠজী হইলেন বন্ধকীর মালিক, তথাপি জমিদারি ও জিরাত আমাদেরই দখলে থাকিল। তাঁহার শুধু বৎসর বৎসর সুদ পাওয়ার কথা, আর যেমন যেমন হওয়া সম্ভব তেমন আসল টাকাও পাওয়ার কথা। ছেলেরা কিছু না কিছু উপার্জন করিতেছিল এইজন্য জমিদারি হইতে খাওয়ার ভরসা করার প্রয়োজন ছিল না। আমি যে জমিদারিটুকু বাঁচিল তাহা বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এখন জমিদারির দাম আরও কমিয়া গেল। কংগ্রেস মন্ত্রীরা খাজনা কমাইয়া আয়ও কম করিয়া দিল, এখন জমিদারির না থাকিল সেই মূল্য, না থাকিল সেই ইজ্জত, সেইজন্য জমিদারি এই পর্যন্ত বিক্রয় হয় নাই। কিন্তু আমি কেবল বিক্রয়ের ভরসায় বসিয়া ছিলাম না।

চম্পারণে কিছু জমি আমি ওকালতির জীবনের সময়ই লইয়াছিলাম, তাহার কাছেই চিনির কল হওয়ার আখ হইতে কিছু পয়সা পাইতে লাগিলাম। জীরাদেঈয়ের নিকটস্থ চাষের আখ হইতে কিছু উপাজর্ন হইতে লাগিল। খানিকটা জনার্দনের উপার্জনে, খানিকটা ধন্নুর আখের দরুণ উপরি টাকা হইতে, খানিকটা বাড়ীর পুরানো বহুমূল্য শালদোশালা বেচিয়া আমরা সুদ ও আসল শোধ করিতে চেষ্টা করিলাম, এমনিতে যাহাকিছু আসিত তাহা সমস্ত এইরূপে খরচ হইতে লাগিল। এইরূপে ঐ কর্জ অনেকটা শোধ হইয়াছে, এখনও কিছু পরিমাণে বাকি আছে। সুদ সর্বদা শোধ হইতে হইতে চলিয়াছে, এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে আমি আশা করি আসলও কয়েকদিনের মধ্যেই জমিদারি না বেচিয়াই শোধ হইয়া যাইবে। যেদিন এতখানি কর্জের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল, সেদিন আমার পক্ষে ছিল বড়ই অন্ধকারময়। শেঠ যমুনালালজীর উদারতা পথ বাহির করিয়া দিল, আর ঘনশ্যামদাসজীর সাহায্য লইয়া তিনি আমার মাথার বোঝা হাল্কা করিয়া দিলেন। জমিতো বাঁচিল না কিন্তু ইজ্জত বাঁচিল, সম্মান বাঁচিল। সব মহাজন আমার উপর যে বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা পাইল—সঙ্গে সঙ্গে দেশের মহত্ত্বপূর্ণ কাজের ভার উঠাইবার শক্তিও বাঁচিয়া গেল।

দাদা চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্থান লইলেন যমুনালালজী। আমি পূর্বের মতই অচল হইয়া রহিলাম। ভাষা দিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। এই সঙ্গেই আমার ভাইপো জনার্দ্দন ও আর দুইজন, মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয়কেও প্রাণ হইতে আশীর্বাদ করিতেছি ঋণ সঙ্কটের এই কঠিন সময়েও তাহারাও অধীর হয় নাই। ঘরের সবকিছু খুশী মনে হাসিতে হাসিতে তাহারা দিয়াছিল। একপ্রকার বলিতে গেলে প্রথম কাজ হইল তাহাদের এই বোঝাটানা ও শোধ করিবার জন্য দলিলের উপর দস্তখত করাই। তাহারা কখনও অভিযোগ করে নাই, কখনও মুখ বিকৃত করে নাই। এখন তাহারা নিজেরাই রোজগার করিয়া আনে ও খায়। এখন যে বোঝা থাকিয়া গেল তাহাও সরাইয়া ফেলিবার চিন্তায় আছে তাহারা, এই সাহস ও ধৈর্যের জন্য তাহাদেরও অভিনন্দন করিতেছি। ঈশ্বর তাহাদের মঙ্গল করুন! মনে হইল এখনই সুদিন বুঝি ফিরিতেছে।

বোম্বাই কংগ্রেসের দিন নিকটে আসিয়া গেল। ১৯৩১-এর মার্চের পর সেখানেই কংগ্রেসের বিধিমত অধিবেশন হইবার কথা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহ হইয়া গিয়াছিল। শাসন-সংস্কার সম্বন্ধেও নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট শ্বেতপত্ররূপে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছিল। সেই অনুসারে বিলাতে নূতন শাসন বিধান প্রস্তুত হইতেছিল, এখন আর কংগ্রেস অবৈধ প্রতিষ্ঠান নহে। এইসব বিষয়ে তাহার এখন মত দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গেই, ১৯৩৪-এর নভেম্বরেই অর্থাৎ কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েক হপ্তার ভিতরেই কেন্দ্রীয় এসেম্‌ব্লির সদস্যদের নির্বাচন হইবার কথা ছিল। এই বিষয়েও কংগ্রেসের চরম সিদ্ধান্ত দিতে বাকী ছিল, ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের নীতিও স্থির করিবার অপেক্ষায়। এইজন্য এই অধিবেশনের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। আমি পরিপাটী করিয়া নিজের বক্তৃতা লিখিলাম। কিন্তু উহা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ভাবিলাম যে কিছু পূর্বেই ওয়ার্ধায় চলিয়া যাইব আর সেখানে একান্তে বসিয়া তাহা সমাপ্ত করিব। সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গেও কথা বলিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমি যে বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম তাহাতে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা ছিল। আমি উহা ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহকে তাহা দেখাইলাম, কোথাও কোন অংশে অজ্ঞানে ও অসাবধানে কিছু ভুল করি নাই তো! তিনি উহা দেখিয়া আমাকে আশ্বাস দিলেন, আলোচনা ঠিক হইয়াছে, কোন ভুল নাই। আমি পাটনা হইতে জামসেদপুর গেলাম, সেখান হইতে ওয়ার্ধায় যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে আমার উপর জ্বরের ও হাঁপানির আক্রমণ হইল। সেইখানেই থাকিয়া যাইতে হইল। সুস্থ হইয়া ওয়ার্ধায় গেলাম। সেখানকার ভাল জল হাওয়ায় তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিলাম। বক্তৃতাও সেখানেই শেষ করিতে পারিলাম।

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আয়োজন ও কর্মাধিকারী

বোম্বাইয়ের লোকেরা কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থার জন্য কম সময় পাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা খুবই উত্তম ও প্রকাণ্ড আয়োজন করিয়াছিল। রিলিফ কমিটির টাকা সংগ্রহ করিবার সময় লোকদের মধ্যে যেমন উৎসাহ হইয়া গিয়াছিল, তেমনই এই অধিবেশনের জন্যও যথেষ্ট উৎসাহ হইয়াছিল। লোকেরা বুঝিয়াছিল যে কংগ্রেস যে মরে নাই তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত। তাহারা এক কংগ্রেস নগর বসাইল। সেখানে সমুদ্রের ধারে, খোলা ময়দানে, অধিবেশনের জন্য, আকাশের নীচে, বিরাট্ প্যাণ্ডাল তৈরি করি, যাহাতে প্রায় এক লাখ লোক বসিতে পারে। খাদি-প্রদর্শনীরও ঐরূপই সুন্দর ও বিস্তৃত ব্যবস্থা করিল। সভাপতিকে স্বাগত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল। কল্যাণ স্টেশনেই আমাকে নাগপুর মেল হইতে নামাইয়া লওয়া হইল। সেখানে হাতমুখ ধুইয়া জলখাবার খাইয়া আমি প্রস্তুত হইয়া লইলাম। কল্যাণেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের

তরফ হইতে আমাকে মানপত্র দেওয়া হইল। সেখান হইতে আমি বাড়ির লোকদের ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে স্পেশাল ট্রেণে চলিয়া গেলাম। কল্যাণ স্টেশনেই শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ নামিয়া আমার সঙ্গ লইলেন। আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ অনেক দিন হইতেই ছিল। আমাকে সভাপতি হইতে দেখিয়া তাঁহার খুশীর অবধি ছিল না। বিশেষ করিয়া এই জন্যই তিনি সেখানে নামিয়া আমার সঙ্গী হইয়া গেলেন।

খুব ধুমধামের সঙ্গে বোম্বাই পেঁাছিলাম। পথে যেখানে যেখানে গাড়ি থামিল, সেখানেই অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল। ফুলের মালায় গাড়ির কামরা ভরিয়া গিয়াছিল। লোকে নানা বর্ণের জিনিসপত্র উপহার দিল। বোম্বাই স্টেশনের উপর এত ভিড় ছিল যে আমাকে নামাইয়া ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত লইয়া যাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। লোকে চার ঘোড়ার গাড়িতে আমাকে চড়াইয়া মিছিল করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। আমি দুর্বল ছিলাম। কিন্তু লোকদের ইচ্ছা ও অভ্যর্থনা-সমিতির সংকল্প ও ব্যবস্থার প্রতিকূল কোনও কিছু করা অসম্ভব ছিল। এজন্য শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত নরীম্যান ও আমার স্ত্রীর সঙ্গে গাড়িতে চড়িয়া মিছিলে চলিলাম। সেদিন পর্যন্ত অনেকে জানিত না যে আমার স্ত্রী আছে; কারণ তিনি কখনও আমার সঙ্গে সভা-ইত্যাদিতে যাইতেন না। সেদিনও যদি শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহাকে সঙ্গে না লইতেন তো তিনি হয়তো অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সঙ্গে সোজা বাসাবাড়িতে চলিয়া যাইতেন।

খুব লম্বা মিছিল হইয়াছিল। শহরের আয়োজনও ছিল অপূর্ব। লোকের ভিড়ও তেমনি। সমস্ত দোকান সাজানো হইয়াছিল। জায়গায় জায়গায় লোকে সুন্দর 'ম্যারাপ' তৈরী করিয়াছিল। বাজারে যেখানে যে বস্তুর প্রাধান্য ছিল, সাজানো ও ম্যারাপে সেই বস্তুরই প্রাধান্য চোখে পড়িয়াছিল। যেখানে কলার দোকানগুলি ছিল সেখানে সাজানোও হইয়াছিল কলা দিয়াই। তুলার বাজারে আভরণ হইয়াছিল তুলার গাঁট দিয়াই। শুনিয়াছি যে ঐ ম্যারাপে, তাহা খুবই প্রকাণ্ড ছিল, লাখ টাকার বেশি দামের গাঁট লাগিয়াছিল। সমস্ত রাস্তায় অসংখ্য স্থানে লোকে ফুল, মালা, আরতি ইত্যাদি দিয়া অভ্যর্থনা করিল। কত জিনিস যে উপহার দেওয়া হইল তাহা বলিতে পারি না। এই সব জিনিস দিয়া গাড়ি একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল। এই মিছিল ও অভ্যর্থনার বিষয়ে লোকে বলিতে চাহিতেছিল যে বোম্বাইতে ইতিপূর্বে কখনও কাহারও এ ধরনের অভ্যর্থনা হয় নাই। ১৯১৮ সালে হাসান ইমাম সাহেবেরও খুব অভ্যর্থনা হইয়াছিল, যখন তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু এবারের আয়োজন তাহার চেয়েও খানিকটা বেশি ছিল, কারণ

১৯১৮ সালের তুলনায় জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এখন কিছু বেশি হইয়াছিল। মিছিলে প্রায় তিন ঘণ্টার বেশি লাগিয়াছিল। শেষে কংগ্রেস-ভবন হইয়া আমার নিবাসস্থানে, যাহা কংগ্রেস নগরেই ছিল, আমাকে পৌঁছানো হইল। খুবই শ্রান্তক্লান্ত হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু অসুস্থ হই নাই।

পরের দিন হইতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এবং বিষয়নির্বাচনী সমিতির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতারাও আসিয়া গেলেন। বিষয়নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে খুব গরম গরম তর্ক উঠিতেছিল। এমনও কয়েকটা কথা হইয়া গিয়াছিল যাহার জন্য ইহা স্বাভাবিক ছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছু পূর্বে গান্ধীজী এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি একথা বলিয়াছিলেন যে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন, আর তাঁহার যাহা কিছু সেবা ও সাহায্য তাহা কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়াই তিনি করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের বিধানে হেরফের করা প্রয়োজন, যাহাতে উহা আরও অধিক দৃঢ় ও জনসাধারণের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়। মহাত্মাজীর এই মতে সমস্ত দেশে একপ্রকারের চঞ্চলতা দেখা গেল। যদিও মহাত্মাজী পুরা মাত্রায় আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বাহিরে থাকিয়াও তিনি কংগ্রেসের পুরাপুরি সাহায্য করিতে পারিবেন, আর তিনি এইভাবে সরিয়া যাওয়ায় কংগ্রেসে দুর্বলতার ভাব না আসিয়া তাহার শক্তি বাড়িবে, তাহা হইলেও এই আশ্বাসবাক্যে লোকদের সন্তোষ হইল না। আমার বক্তৃতায় আমিও মহাত্মাজীর এই সংকল্পকে সমর্থন করিয়াছিলাম। কিন্তু নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের মধ্যে এজন্য বড় অসন্তোষ ছিল।

আমি ভাবিতেছিলাম যে কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য কিংবা তাহার কোনও প্রকার অকল্যাণ করার জন্য তো মহাত্মাজী এ সংকল্প করেন নাই; আমরা যখন ইচ্ছা তাঁহার সহিত শলা-পরামর্শ করিতে পারিব, আর সকল গুরুতর বিষয়ে তাঁহার পরিচালনা আমরা সর্বদা পাইতে পারিব; কিন্তু তিনি সরিয়া যাওয়ায় একটা জিনিস অবশ্য হইবে—যাহারা থাকিয়া যাইবে তাহাদিগকেই বুঝিয়া সুঝিয়া সমস্ত নির্ধারণের ভার লইতে হইবে। যখন হইতে মহাত্মাজী কংগ্রেসে আসিয়াছেন, তখন হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে অন্য লোকে খানিকটা ম্লান হইয়া যায়। অন্য সকলে কিছু যেমন-তেমন নয়। আমাদের নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট যোগ্যতা, দূরদর্শিতা ও ত্যাগশক্তি আছে। তাঁহারা সমস্ত প্রশ্নই সকল দিক হইতে আলোচনা করিতে পারেন। দেশের ভালোর জন্য তাঁহারা যথাযোগ্য সংকল্পে পৌঁছিতে পারেন। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমাদের মধ্য হইতে কেহ

কেহ তাঁহার উপর এত বেশি নির্ভর করেন যে তিনি যাহা কিছু বলিয়া-দেন আমরা তাহাই মানিয়া লই। আমরা নিজেদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে কাজে লাগাইবার প্রয়োজন বোধ করি না। তাহা হইলেও আমি স্বীকার করি, গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যাহা স্থির করিয়াছে, তাহা না বুঝিয়া করে নাই। মহাত্মাজী বুঝিয়াছিলেন যে তিনি সরিয়া দাঁড়াইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিবার ভার সকলের উপর দিয়া দিবেন। আর এই যে মনে হয় যে যাহা কিছু ঘটে তাহা তাঁহার বলিবার জন্যই ঘটে, এই চিন্তা দূর হইয়া যাইবে।

আমি এই সব কথা স্বীকার করিয়াই তাঁহার সংকল্প সমর্থন করিয়া-ছিলাম। কিন্তু অন্য লোকেরা বিষয়টি এই দৃষ্টি হইতে বিচার করে নাই। কেহ কেহ তো ঘাবড়াইয়া গেল যে মহাত্মাজীর পিছাইয়া যাওয়ার অর্থ হইল তাঁহার কংগ্রেস হইতে একেবারে সরিয়া যাওয়া, তাঁহার সলা বা সম্মতিও আর এখন পাওয়া যাইবে না। কেহ কেহ একথা মানিতেন যে তাঁহার পিছাইয়া যাওয়ায় কংগ্রেসের উপর জনসাধারণের এখন ততটা বিশ্বাস থাকিবে না যতটা আজ আছে, এজন্য কংগ্রেস কম-জোর হইয়া যাইবে। কেহ কেহ হয়তো ইহাও মনে করেন, কংগ্রেসের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন মতের লোক আসিয়াছে বলিয়া গান্ধীজী রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে কোনও না কোনও উপায়ে রাখিতেই হইবে। এই সব কারণে বিষয়নির্বাচনী সভায় এবিষয়ে খুব তর্ক হইল। তাহাতে গান্ধী-জীকে অনুরোধ করা হইল যে তিনি নিজের মত পরিবর্তন করুন এবং যেভাবে নেতৃত্ব করিতেছেন, করুন। কিন্তু তিনি নিজের সঙ্কল্পে অটুট রহিলেন। তিনি এই কথার উপর জোর দিতেছিলেন যে তিনি সরিয়া গেলে কংগ্রেসের কোনও ক্ষতি হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে, জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সলা-পরামর্শ দিবেন বলিয়া আশ্বাসও দিতেছিলেন, কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সংস্কার করিবার কথাও বলিতেছিলেন। শেষে যখন জানা গেল যে তিনি নিজের সঙ্কল্প হইতে কোনও মতেই বিচ্যুত হইবেন না, তখন অন্য আলোচনা চলিতে লাগিল।

গঠনতন্ত্রের সংশোধনেও যথেষ্ট তর্ক চলিল। এক সাবকমিটি গঠন করা হইল তাহাতে সংশোধনের মুসাবিদা প্রস্তুত হইল। তাহাতে বিশেষ হাত ছিল নবগঠিত সোশালিষ্ট পার্টিরই। আরেকটি বিবাদের কথা ছিল, প্রস্তাবিত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। উপরে বলা হইয়াছে যে গোলটেবিল কনফারেন্স-এর সময় প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বিচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার এক অংশের বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে অনশন করিতে হইয়াছিল এবং হরিজনদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া তাহা বদলানো হইয়াছিল। ঐ বিচারে আরও এমন এমন সব কথা

ছিল যাহা কোন রাজনৈতিক মতের লোক স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে একটি সর্ত লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহা এই যে যদি ঐ সমস্ত লোক যাহাদের উহার সহিত সম্বন্ধ ছিল অথবা যাহাদের অধিকারে উহার প্রভাব পড়িতেছিল তাহারা যদি নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া লয় আর এই বোঝাপড়া দিয়া উহা বদলাইতে চায়, তাহা হইলে উহার অদল বদল হইতে পারিবে। এই শর্ত অনুসারে উহার সেই অংশ, হরিজনদের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ ছিল—তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ঐ বিচার অন্যায় মনে করিয়াও স্থির করিয়াছিলেন যে উহা গ্রহণও করিবেন না উহার বিরোধিতাও করিবেন না।

ওয়ার্কিং কমিটির এই বিচারের অর্থ এই নয় যে তাঁহারা উহার সমর্থন করেন অথবা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কঠোর বাক্যে উহার নিন্দা করিয়াছিলেন। এইজন্য একথা কেহ বলিতে পারে না যে তাঁহারা একভাবে উহার সমর্থন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উহার বিরোধিতা করিতে চাহিতেন না কারণ বিরোধের অর্থ হইত অন্যের সঙ্গে খোলাখুলি ঝগড়া আর এই বিরোধের প্রয়োজনও ছিল না। কমিটি তো সমস্ত বিধানই নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছিল, এইজন্য বিধানের এই অংশও সকলের সঙ্গেই নামঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। পৃথকভাবে নামঞ্জুর করার অর্থ ইহাও হইত যে আমরা পরোক্ষভাবে এবং অংশ বিশেষকে মানিয়া লইতেছি, তবে না এক অংশকে বিশেষ করিয়া নামঞ্জুর করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে, বিধানের এই অংশ এমনিই ছিল যাহা বদলাইবার অধিকার আমাদের হাতে ছিল; বিধান অনুসারে অন্য কোন অংশ বদলাইবার শক্তি আমাদের ছিল না। এই সমস্ত চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া ওয়ার্কিং কমিটি তাহার নির্ধারণ প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহার সারাংশ এই যে কমিটি সমস্ত বিধানই নামঞ্জুর করিতেছে এবং সমস্ত বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই অংশ বাদ দেওয়া হইবে। আর যদিও তাঁহারা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে ইহাকে বাধা বলিয়া মনে করেন, তথাপি তাঁহারা না করেন ইহাকে স্বীকার, না করেন ইহার বিরোধিতা। এই বিষয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালবজী ও যুক্ত এনের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল। কিন্তু না পারিলেন তাঁহারা গান্ধীজীকে বুঝাইতে না পারিলেন গান্ধীজী তাঁহাদের বুঝাইতে। কংগ্রেস-এর বিষয়নির্বাচনী সভাতে এ-বিষয়েও যথেষ্ট তর্ক উঠিল। কিন্তু একথা স্পষ্ট ছিল যে ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গেই কংগ্রেস একমত। কিছুদিন ধরিয়া গরম গরম তর্কের পর প্রস্তাব তৈয়ারী হইল আর কংগ্রেসের বিশেষ সভার সময় আসিল।

আমি যদিও খুব দর্বল হইয়া গিয়াছিলাম তথাপি ঐ সময় জানি না কোথা হইতে যেন শক্তি আসিল, আর সব কাজ ঠিক মত শেষ করিতে

পারিলাম। সোশ্যালিষ্ট দলের লোকেরা দলবন্ধরূপে তর্কে যোগ দিতেছিল, তাঁহাদের মধ্যে সুবিদ্বান ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহারা সকল কথায় নিজস্ব স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন। আমার সামনে সর্বদা নিয়মের প্রশ্ন উঠিতেছিল। আমি কখনও কোন এসেমব্লি বা কোন কাউন্সিলের সদস্য ছিলাম না। কংগ্রেস-এর নিয়মাবলীর মধ্যে এইসব নিয়ম নাই। সেখানে এই ধরনের প্রশ্ন উঠিলে তাহা নিষ্পত্তি করা হয় পার্লামেণ্ট-এর নিয়মানুসারে। এখানকার এসেমব্লি ও কাউন্সিলের নিয়মও ঐ আধারের উপর রচিত হয়। দেশের সভাসমিতির নিয়মগুলির আধারও ঐ। ঐসব নিয়মের সঙ্গে আমার কোন বিশেষ পরিচয় ছিল না। এই উপলক্ষ্যে এমন অনেক প্রশ্ন উঠিল যাহার বিচার আমাকে তখনই সেখানে করিতে হইল। আমি নিজের বুদ্ধিমত, যাহা আমার ঠিক মনে হইল সেইভাবে বিচার করিলাম। আমার বিচার নিয়মানুগামী হইতেছিল পরে একথা জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

আমি কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজের ভাষণ সম্পূর্ণ পড়ি নাই। গান্ধীজীর কথা হইতে আমি ভাবিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের অধিবেশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করিতে হইবে। যে ধরনের বিতণ্ডার প্রশ্ন আসিতেছিল সময় না বাঁচাইয়া গেলে তাহা নিষ্পত্তি হইতে পারিত না একথা স্পষ্ট। অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও দেখিয়াছি যে সভাপতির মুদ্রিত বক্তৃতা পড়িয়া যাওয়াটা লোকে খুব পছন্দও করে না—মন দিয়া তাহা শোনেও না; কারণ মুদ্রিত প্রতিলিপি তাহাদের হাতে থাকে আর তাহা নিজেদের সুবিধামত পড়িয়া লয়। বেলগাঁও কংগ্রেসে গান্ধীজী নিজের বক্তৃতা অধিবেশনের পূর্বেই বিতরণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, প্রতিনিধিগণ যেন উহা পড়িয়া অধিবেশনে আসেন। আমিও এই মত অনুসারে বক্তৃতা পড়িতে গিয়া কংগ্রেসের সময় লই নাই, কিছুটা অংশ পড়িয়া গিয়াছিলাম। তাহার পর প্রধান প্রস্তাব লইয়া তর্ক আরম্ভ হইল। উহা ছিল ভারতের শাসনতন্ত্র লইয়া প্রস্তাব। উহাতে ছিল ওয়ার্কিং কমিটির এবিষয়ে নির্ধারণের সমর্থন। পণ্ডিত মালব্যজী উহার সংশোধন প্রস্তাব দিয়াছিলেন ও খুব জোরালো বক্তৃতাও করিয়াছিলেন, পরের দিনও উহার উপর খুব জোর তর্ক চলে।

শেষকালে, যখন উহার সম্বন্ধে মত লইবার সময় আসিল, তখন পণ্ডিত মালব্যজী ওবিষয়ে আবার কিছু বলিতে চাহিলেন। নিয়মানুসারে তাঁহার কিছু বলিবার অধিকার ছিল না; কিন্তু তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমার পক্ষে বড় কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল, যদি তাঁহার ব্যক্তিত্বের জন্য নিয়ম ভঙ্গ করি তাহা হইলে অন্যের জন্যেও আবার ঐরূপ করিতে হইবে। আমি স্থির করিয়াছিলাম তাঁহাকে আমি এ বিষয়ে অনুমতি দিব না। খুব নম্রভাবে আমি তাঁহাকে নিয়ম উল্লেখ করিয়া নিজের অক্ষমতা স্বীকার

করিলাম। তাঁহার যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহার সারমর্ম কংগ্রেসকে নিজে বলিব এরূপ কথাও দিলাম। আমি এই সমস্ত কথা কংগ্রেসের নিকটও বলিয়া দিয়াছিলাম। কংগ্রেসে খুব জোরালো লাউডস্পীকার লাগানো হইয়াছিল, সেখানে যাহা কিছু হইতেছিল, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কুটীরে বসিয়া শুনিতেছিলেন। একথাও তিনি শুনিলেন। পরের দিন তিনি আমাকে হাসিতে হাসিতে এ কথাও বলিলেন, তুমি মালব্যজীকে বলিতে দিলে না! আমারও দুঃখ হইয়াছিল যে এমন পূজনীয় ব্যক্তির কথা মানিতে পারিলাম না। কিন্তু সেখানে আমি রাজেন্দ্র ছিলাম না, কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম। উভয়ের মধ্যে খুব বড় প্রভেদ। সম্মতি লওয়ার বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে খুব বেশী ভোট পড়িল, কিন্তু কেহ কেহ, যাহারা উহার বিরোধী ছিল তাহারা নিজে হইতে বাহির হইয়া গেল। দুই চারিজন জুতা দেখাইল, যাহা তীব্র আলোতে আমার চোখে পড়িল।

কংগ্রেসে দুটি প্রস্তাবের বেশী আলোচনা হইল না। কংগ্রেসের নিয়মাবলী প্রস্তাব তো একপ্রকার সকলের সম্মতিক্রমে বেশী তর্ক বিনাই মঞ্জুর হইয়া গেল। কারণ উহা লইয়া বাহিরেই অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছিল। এই প্রস্তাবের খুব গুরুত্ব ছিল। এই পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সংখ্যা প্রদেশে অধিবাসীদের হিসাব অনুসারে হইত। ইহার ফল হইত এই কোন প্রদেশে কংগ্রেসের কাজ কিছু হোক্ না হোক্ সেখানে কংগ্রেস কমিটিগুলি কাজ করুক আর না করুক, সেখানকার অধিবাসীদের অনুযায়ী প্রতিনিধি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সংখ্যা অদল বদল হইত না। অন্য প্রদেশ অনেক কাজ করিয়াও নিজেদের সংখ্যা হইতে অধিক সদস্য পাঠাইতে পারিত না। বোম্বাইয়ের শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধির সংখ্যা কংগ্রেস সদস্যদের অনুপাতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে প্রত্যেকে প্রতিনিধির জন্য অন্ততঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য হওয়া চাই। যেখানে ঐ সংখ্যার সদস্য নাই, সেখানে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারও নাই। বোম্বাইয়ের পাঁচশত সদস্যকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই সংখ্যা পরে বদল করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধারণা ছিল যে সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের সংখ্যা যেন সেখানকার অধিবাসীদের হিসাবেও হয়। ইহার ফলে এই হইল যে যদি সমস্ত প্রদেশে অধিবাসীদের হিসাবে যতজন প্রতিনিধি হয় ততগুলি পাঁচশত সদস্য নাই তাহা হইলে প্রদেশের প্রতিনিধিদের সংখ্যা কম হইবে। যদি প্রত্যেক প্রতিনিধির উপর পাঁচশর অধিক সদস্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য পাঁচশত প্রতিনিধির ক্ষেত্র তৈয়ারী করিতে হইবে। এইভাবে সদস্য করিবার উপর জোর দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যার প্রতিও দৃষ্টি থাকিল।

দ্বিতীয় গুরুতর প্রশ্ন ছিল এই যে, অল্পসংখ্যক মতাবলম্বীর প্রতিনিধিত্ব কি করিয়া হইবে? সোজাসুজি ভোট লইলে তাহাদের একজনও নির্বাচিত হয় না, কিন্তু তাহাদের মতাবলম্বী প্রদেশগুলি একত্র করিলে তাহাদের কয়েকজন লোক চলিয়া আসে। সোস্যালিস্টরা, যাহারা সংখ্যায় কম ছিল, 'পরিবর্তনীয় ভোটের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের' উপর জোর দিলেন (proportional representation by a single transferable vote)। কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না, কিন্তু নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনের পক্ষে এই নিয়ম গ্রহণ করা হইল। নিয়মাবলীর মধ্যে যাহা পরিবর্তন করা হইল তাহা কার্যে রূপান্তরিত করিবার পর তাহার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি বাহির হইল। তাহার পর হইতে কয়েকবার পরিবর্তন করিতে হইল, কিন্তু নিয়মের যে ভিত্তি তখন তৈয়ার করা হয় তাহা আজও স্বস্থানে বর্তমান আছে। হ্যাঁ, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব লইয়া অনেক মতভেদ আছে বটে; কিন্তু এখন অনেকে একথা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে খুব অল্প লোকের হাতে নির্বাচনের অধিকার থাকিলে ইহা খুব কুফলও সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের নিয়মানুসারে প্রতি আটজন প্রতিনিধি হইতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একজন মেম্বার হয়—অর্থাৎ যদি আটজন লোক একত্র হয় তবে একজনকে নির্বাচন করিতে পারে। নির্বাচনে দেখা গিয়াছে কোন একজনের পক্ষে আটজনকে জুটাইয়া লওয়া কঠিন নয় যাহারা নির্বাচনে সাহায্য করিতে পারে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে নিজের নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে না, অথবা যাহার বন্ধুরা তাহার নির্বাচনে আগ্রহ করে না, সে যতই কেন ভাল কর্মী হউক না, নির্বাচিত হইতে পারে না। ইহাতে ছোট ছোট দলের বৃদ্ধি হয়, ভাল ভাল লোক নির্বাচিত হইতে পারে না আর যাহারা দল গড়িতে পারে তাহারাই নির্বাচিত হয়। এইজন্য এখন অনেক লোক এতদিনের অভিজ্ঞতার পরে বুঝিতে পারিয়াছে যে ইহা তেমন কাজের কথা নয়। কিন্তু এনিয়ম এখনও আছে। যেখানে বোম্বাই অধিবেশনের সময়ে একথা বোঝা যাইতেছিল যে ইহার বিরোধের একই অর্থ হইতে পারে—সোস্যালিস্টদের নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে প্রবেশ করিতে না দিবার কথা। যাহা হোউক, সেখানে তো ইহা গৃহীত হইয়াছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে, প্রায় রাত বারোটায়, তৃতীয় দিন কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। আমি কাজ সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম। লোকে খুব উৎসাহ করিয়া নিজের নিজের স্থানে গেল। যাইতেই কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লীর সভ্যদের নির্বাচনসংগ্রাম আরম্ভ হইল। কংগ্রেসের উৎসাহ হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় হইবে।

আমি কংগ্রেসের কাজ শেষ করিয়া নিজের বাসায় গেলাম, আর রাত দুইটা হইতে হাঁপানির আক্রমণ শুরু হইল। পরের দিন অন্য কোনও বিশেষ কাজ ছিল না, ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা ছাড়া। এ ভার আমারই উপরে ছিল। আমি সেখানেই কিছু কিছু স্থির করিয়া লইলাম, কিছু পরে স্থির করিলাম। সংবাদপত্রে নাম দিয়া দেওয়া হইল। সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন ছিল, সম্পাদক নির্বাচন। আমি এমন লোক চাহিতেছিলাম যিনি সমস্ত সময় এই কাজে দিতে পারিবেন, আর যাঁহার মত আমার সঙ্গে সমস্ত কথায় মেলে। অনেক চিন্তার পর আমি আচার্য কৃপালনীকে নিযুক্ত করিলাম।

বাংলা হইতে একজন লোককে ওয়ার্কিং কমিটিতে লইতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু এমন কিছু ঘটনাচক্র হইল যাহাতে কাহাকেও লইতে পারিলাম না। ইহাতে সেখানকার বন্ধুরা আমার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। আমাকে অনেক গালাগালিও খাইতে হইল। বাংলার সঙ্গে আমার পুরানো পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাংলার মহত্ত্ব আমি ভাল করিয়াই জানি। বাঙ্গালীদের মধ্যে আমার কয়েক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আছেন। কিন্তু সেখানে এমন কিছু ঘটনাচক্র হইল যে ব্যাপারটি হইতে পারিল না। এজন্য আমার খুবই দুঃখ রহিল। বাংলায় দুইটি দল ছিল, কোনও একজনকে ওয়ার্কিং কমিটিতে লওয়া মানে অন্যকে শত্রু করা। দুইজনের জায়গা ছিল না। যদি বা থাকিত তাহা হইলে সেখানকার ঝগড়া ওয়ার্কিং কমিটিতে আসিয়া যাইবার ভয় ছিল। এইজন্য নিজে বদনাম লইয়াও ওয়ার্কিং কমিটিকে এই ঝগড়া হইতে রক্ষা করি।

আমি বোম্বাইতেই ভাবিয়া লইয়াছিলাম যে যখন গান্ধীজীর কথানুসারে আমরা তাঁহাকে কংগ্রেসের প্রতিদিনের কাজ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং গুরুতর প্রশ্নেই শুধু তাঁহার মত লওয়া ঠিক, তখন আমি তাঁহাকে বেশি কষ্ট দিব না, প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে তাঁহাকে আসিবার কষ্ট দিব না। হ্যাঁ, গুরুতর বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথা বলিয়া লইব। আমি যখন সভাপতি ছিলাম তখন এই নীতি অনুসারে কাজও লইয়াছিলাম; গান্ধীজীকে কমিটিতে আসিবার কষ্ট দিই নাই। আমি বরাবর ওয়ার্ধায় যাওয়া-আসা করিতাম এবং সেখানেই তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া লইতাম।

বোম্বাই হইতে আমি পাটনায় আসিলাম। প্রথমেতো কংগ্রেসের কাজ ছিল কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য নিজেদের প্রার্থীদের দাঁড় করানো ও তাঁহাদের নির্বাচিত করানো। গভর্নমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন যে ১৯৩০—১৯৩৪ এর সত্যাগ্রহের জন্য তাঁহারা কংগ্রেসকে এতখানি দমাইয়া দিয়াছেন যে তাহা এখন আর উঠিতে পারিবে না। ১৯৩২-এর আরম্ভে লর্ড উইলিংডন যখন রাউণ্ড টেবিল হইতে ফিরিবার পরে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটিকে আবার সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য করিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে দুই-চার সপ্তাহে আন্দোলন ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া যাইবে। তিনি এবিষয়ে পুরাপুরি চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই-চার সপ্তাহ ছাড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া ইহা চলিয়াছিল। আর প্রথমে তো ইহা খুব জোরেই চলিয়াছিল। তাহা হইলেও এ পর্যন্ত এমন কোন উপলক্ষ আসে নাই যাহাতে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের সাহায্যদান ও বোম্বাই-এর অধিবেশনে সামান্য কিছু সন্ধান মিলিয়াছিল, কিন্তু এখনও সমস্ত লোকের বিশেষ করিয়া গভর্নমেণ্ট-এর লোকদের বিশ্বাস হয় নাই যে কংগ্রেস সমস্ত দেশের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব কতখানি করে এই নির্বাচনে তাহার একরূপ পরীক্ষা হওয়ার কথা। আমরা এইজন্য এই নির্বাচনকে অতিশয় গুরুত্ব দিতেছিলাম।

১৯২০ সাল হইতেই মাদ্রাজ প্রদেশে সেখানকার জাস্টিস পার্টির মন্ত্রিত্ব চলিতেছিল। তাহারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে ও নিজেদের সংগঠিত করিতে কিছু বাকী রাখে নাই। তাহার মধ্যে যোগ্য লোকেরও অভাব ছিল না। ঐ দলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন প্রায় সব জাতির লোক যোগ দিয়াছিল এই-জন্য ইহাতে কোন সন্দেহ ছিল না যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সমস্ত দিক হইতে ঐ দল জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাঁড়াইত। একপ্রকারে উহা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ-এর এতখানি ঝগড়া সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল যে মনে হইতেছিল, সেখানে কংগ্রেস অর্থে ব্রাহ্মণ মনে করা হইত, এইজন্য উহা কংগ্রেসকে নিজের বিরোধী প্রতিষ্ঠান মনে করিত। গভর্নমেণ্টেরও উহার পর সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল কারণ সেখানকার জমিদার ও অন্যান্য ধনী শ্রেণী এবং জন-সাধারণের খুব বড় সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ ছিল সেইসব জাতির যাহারা উহাতে যোগদান করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন ছিল।

সমস্ত ভারতেই তো নির্বাচন হইবার কথা। সমস্ত প্রদেশে নির্বাচনের জন্য একদিন নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয় না, ইহা অবশ্য ভাবা গিয়াছিল যে

এক জায়গার নির্বাচনের প্রভাব অন্যত্র অবশ্যই পড়িবে। একই প্রদেশে পৃথক পৃথক জিলায় নির্বাচনের সময়ের এতখানি প্রভেদ থাকিবে যে এক জায়গার ফল জানা গেলে অন্য জায়গায় নির্বাচন হইবে, এরূপ ব্যবস্থা তো করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল আর কর্তারাও এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের উপর তাঁহারা সবচেয়ে নির্ভর করিতেন বলিয়া তাঁহারা সেখানে সর্বপ্রথমে নির্বাচন করাইলেন, তারপর অন্যান্য প্রদেশে নির্বাচন করিলেন। নির্বাচনে সর্বত্র কংগ্রেস নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাইলেন এবং সর্বত্র তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও দাঁড়াইয়া গেল। উহারা এই ধরনেরই লোক ছিল যাহাদের হয় গভর্নমেণ্টের সহিত বনিবনাও হইত অথবা কোন বিশেষ দলের তরফ হইতে দাঁড়াইত। কিন্তু জাস্টিস পার্টি ছাড়া অন্য কোন এমন শক্তিমান প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার তরফ হইতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছিল।

আমি তো বোম্বাই হইতে অসুস্থ হইয়াই ফিরিলাম আর মোটামুটি ডিসেম্বর পর্যন্ত অসুস্থ হইয়াই পড়িয়া থাকিলাম। ইহার মধ্যে সমস্ত নির্বাচনের ব্যাপার শেষ হইয়া গেল। আমি তাহাতে বিশেষ কোনও অংশ লইতে পারিলাম না। কিন্তু অন্যেরা, বিশেষ করিয়া সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, খুব হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলেন। তিনি বিহারেও ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশেও গিয়াছিলেন। আমি বিহারেই দুই-চার জায়গায় যাইতে পারিয়াছিলাম, বেশি কিছু করিতে পারি নাই। মান্দ্রাজে নির্বাচনের ফল সবচেয়ে প্রথমে জানা যাইতে লাগিল; কারণ সেখানেই সর্বপ্রথমে নির্বাচন হয়। সে ফল সরকারি মহলে বড়ই চমক লাগাই-বার মত হইল। সেখানে শুধু সর্বত্র কংগ্রেসের প্রার্থী যে নির্বাচিত হইলেন, তাহা নয়, কংগ্রেসপ্রার্থীরা সকলেই বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইলেন। এমনকি যে সব জায়গার বিষয়ে জাস্টিস পার্টির লোকদের কোনও সন্দেহ হইতে পারে না আর যেখানে জয়লাভ আমরাও কঠিন বলিয়া মনে করিতাম, সেখানেও কংগ্রেসের ভারি জয় হইল। উদাহরণস্বরূপ, এরূপ দুইটি স্থান গ্রহণ করা হইল। একটি জায়গা ছিল যেখানে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তি নির্বাচিত হইলেন। ইঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন একজন অত্যন্ত যোগ্য ও জাস্টিস পার্টির প্রসিদ্ধ প্রধান ব্যক্তি, স্যর রামস্বামী মুদালিয়ার। দ্বিতীয় স্থান ছিল সেখানকার ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধির। সেখান হইতে কংগ্রেসের বিপক্ষে দাঁড়াইলেন শ্রীসন্মুখম্ চেট্টী ও কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়াইলেন শ্রীবেঙ্কটাচলম্ চেট্টী। শ্রীসন্মুখম্ চেট্টী পূর্বে পণ্ডিত মতি-লালজীর সঙ্গে কংগ্রেসের দিক হইতে নির্বাচিত হইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য ছিলেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যেও লোকে তাঁহার যোগ্যতা স্বীকার

করিত। তিনি কাজও ভাল করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহের সময়ে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবার এই নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিলেন। তিনি জাতিতে চেট্টী ছিলেন। চেট্টীরাই মান্দ্রাজে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি করে। তিনি অব্রাহ্মণও ছিলেন। জাস্টিস পার্টি তাঁহাকে নিজেদের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করাইল। কিন্তু হইলে কি হইবে! সফলতার সমস্ত কারণই তাঁহার অনুকূলে ছিল। এছাড়া লর্ড উইলিংডনও নাকি তাঁহাকে খুব মান্য করিতেন। কিন্তু তিনিও খুব বেশি রকম হারিয়া গেলেন।

মান্দ্রাজের ফল যেমন যেমন সংবাদপত্রে বাহির হইতে লাগিল, বিশেষত কংগ্রেসী পক্ষের সংখ্যা, তেমন তেমন দেশে উৎসাহ বাড়িয়া চলিল। সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসের খুব জয় হইল। বিহারেও তাহাই হইল। এখানে এক বড় লক্ষণীয় কথা এই যে, একজন খুব বড় শেঠের সঙ্গে বিরোধিতা হইল। তিনি হইলেন শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। ইঁহার সহানুভূতি থাকিত কংগ্রেসের সঙ্গে। প্রথমে যখন তখন পয়সা দিয়াও সাহায্য করিতেন। এইবারকার নির্বাচনে তিনি দাঁড়াইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। পরে আমাকে বলিলেন যে, কংগ্রেসী প্রার্থী শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংকে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হউক। ইহা সম্ভব ছিল না, কারণ কংগ্রেসের নীতি ছিল যথাসাধ্য সর্বত্র প্রার্থী দাঁড় করানো। শ্রীযুক্ত ডালমিয়া কংগ্রেসের অনুশাসনের ভিতরে আসিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত সদ্ভাব থাকিল। তিনি অনেক খরচ করিলেন, কিন্তু তিনিও বেশ হারিয়া গেলেন।

এক দিকে এই ধরনের সফলতা, তাহাতে সকলের খুব আনন্দ হইল; অন্য দিকে এই নির্বাচনে এমন একটা ব্যাপার হইল যাহা খুব দুঃখকর। প্রথমে বলা হইয়াছে যে বোম্বাই কংগ্রেসের পূর্ব হইতেই প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বিচারের জন্য কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়, আর বোম্বাই কংগ্রেসে পণ্ডিত মালব্যজী সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন যাহাতে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র বিষয়ে মত বিবৃত করা হইয়াছিল—তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে নামঞ্জুর করা হয়। ঐ মতাবলম্বী লোকেরা নিজেদের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করাইল। বিহারেও শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লাল দাঁড়াইলেন। বাংলায় তো প্রায় সব জায়গা হইতে প্রার্থী দাঁড় করানো হইল। অন্যান্য প্রদেশেও কিছু কিছু লোক দাঁড়াইল। ইহারা তো এমনিতে অন্য সব কথায় কংগ্রেসের সঙ্গে একমত, কিন্তু এক এই বিষয়েই কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। শ্রীযুক্ত এণের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনও প্রার্থী দাঁড় করাইল না। আর তিনি বিনা বাধায় নির্বাচিত হইলেন; কিন্তু অন্যান্য জায়গায় দুই

প্রকারের কংগ্রেসীদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গেল। বিহারে তো কংগ্রেসকে কেহ হারায় নাই, কিন্তু বাংলায় প্রায় সর্বত্র কংগ্রেসকে হার মানিতে হইল, আর ঐ দলের লোকদের জিৎ হইল। ইহার বিশেষ কারণ ছিল এই যে মিঃ ম্যাকডোনালডের নির্ধারণে বাংলার বর্ণহিন্দুদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হইয়াছিল। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫৫—৫৬ ও হিন্দুদের ৪৪ এর কাছাকাছি। সংখ্যায় অল্প হওয়ার জন্য হিন্দুরা সেখানে কিছু সুবিধা পাইতে থাকিত। কিন্তু উক্ত নির্ধারণ অনুযায়ী শতকরা দশটি স্থান ইউরোপিয়ানেরা পাইল আর বাকি নব্বইটি স্থান ভাগ করিয়া শত-করা মুসলমানদের ৫১টি এবং হিন্দুদের ৩৯টি দেওয়া হয়, অর্থাৎ নিজেদের সংখ্যার অনুপাত হইতেও তাঁহারা আইন পরিষদে কম জায়গা পাইলেন। ইহার পর যখন মহাত্মাজীর উপবাসের পর পুণাতে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বোঝাপড়া হইল, তখন হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত স্থানের সংখ্যাও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা হিন্দুদের জায়গা হইতেই হইতে পারিত। এইজন্য সেখানে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে খুব অসন্তোষ ছিল। তাহারা এই নির্ধারণের প্রবল বিরোধিতা করিতে চাহিতেছিল। ইহাতে কংগ্রেসী ও কংগ্রেসবিরোধী সব হিন্দুই যোগ দিয়াছিল। এইজন্য সেখানকার নির্বাচনে কংগ্রেসের হার হইল, আর এই নূতন দলের জয় হইল। তাহাদের মধ্যে কংগ্রেসীরাই নির্বাচিত হইল, যাহারা অন্যান্য ব্যাপারে কংগ্রেসেরই অনুবর্তী ছিল। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেশে নির্বাচন হইয়া গেল, আর কংগ্রেসের খুব বড় রকমের একটা জয় হইল। কংগ্রেস এখন নীতিও নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদে কাজ হইবার কথা ছিল।

মিঃ জিন্নার সঙ্গে বোঝাপড়া ও সারাদেশ ভ্রমণ

যদিও নির্বাচনে কংগ্রেসের জিত হইয়াছিল এবং অন্য প্রকারেও বোঝা যাইতেছিল যে কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে, তথাপি আমরা ইহা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম যে তাহার গঠন দৃঢ় করিয়া দেওয়া হউক, কারণ চার বৎসরের লড়াইয়ে, যখন কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেসের সংগঠন শিথিল হইয়া যায়। উহাকে একবার পুনর্জীবিত ও সুদৃঢ়ভাবে গঠিত করার প্রয়োজন ছিল। এইজন্য একবার সব জায়গায় ঘুরিয়া আসা আবশ্যক

মনে হইল। প্রাদেশিক কমিটিগুলির পক্ষ হইতে এবিষয়ে তাগিদও আসিল যে আমি সভাপতি হিসাবে ঘোরাফেরা করি। শীতকালে তো আমার পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি ভাবিলাম যে শীত কম হইতেই আমি নিয়ম মাফিক ঘোরাফেরা করিব, ইতিমধ্যে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিয়া সম্ভব হইলে এখানে সেখানে যাইব।

দিল্লীতে এসেম্ব্লির কাজ জানুয়ারিতে শুরু হইবার কথা। সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও করা হইল। ঘটনাচক্রে মহাত্মাজীও সেখানে আসিয়াছিলেন। সেখানকার লোকদের ইচ্ছাও ছিল যে কংগ্রেসের সভাপতির ঘোরাফেরা সেখান হইতেই শুরু করা হয়। এইজন্য আমি যখন সেখানে গেলাম তখন সেখানকার লোকেরাও খুব তৎপরতার সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিল। বোম্বাই, অভ্যর্থনার এক ভাল নমুনা চালাইয়া দিল। দিল্লীতেও ঐ প্রকারের অভ্যর্থনায় খুব বড় মিছিল যোগে করা হইয়াছিল। শহরের লোকেরা খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিল। আমি তখন পর্যন্ত দুর্বল ছিলাম, এইজন্য অভ্যর্থনার দিন ভীড় বরদাস্ত করা কিছু সহজ ছিল না; কিন্তু আমি তাহা কোন প্রকারে সামলাইয়া লইলাম।

মিছিলের কিছু পরেই আমি মহাত্মাজীর সংগে দেখা করিলাম। তিনি সমস্ত খবর পাইয়াছিলেন। তিনি একটা মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ হয়তো আমি স্বতন্ত্রভাবে উপরে করিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন: শেষকালে আমাদের বাধ্য হইয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে হইয়াছিল, কারণ জনসাধারণের তাহাতে উৎসাহ ছিল না, আর লোকে যেন খানিকটা দমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের ভালবাসা কম হয় নাই, কোন উপলক্ষ্য পাইলে তাহা দেখাইবে ইহাই ছিল তাহাদের ইচ্ছা: এইজন্য এই ধরনের অভ্যর্থনায় এতটা উৎসাহ চোখে পড়ে, যেমন তুমি বোম্বাইতে দেখিয়াছ অথবা দিল্লীতে দেখিতেছ—যেখানে যাইবে লোকে এইরূপই অভ্যর্থনা করিবে।

আমি এই ধরনের ভীড়কে বড়ই ভয় করি। বিশেষতঃ অভ্যর্থনা ও মিছিল দেখিয়া খুবই ঘাবড়াই। কিন্তু ঐ পদের জন্য ইহাকে সহ্য করা মানিয়া লইয়াছিলাম। মহাত্মাজী আমার এই মত অনুমোদন করিলেন যে আমি সকল প্রদেশে ঘোরাফেরা করিব। কংগ্রেসের সংগঠনের কথা ভাবিয়া ইহা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছিলাম যে ১৯৩২-৩৩ সালে অনেক জায়গার লোক যেখানে কংগ্রেসি কর্মকর্তাদের নিজেদের বাড়িতে থাকিতে দিতেও কুণ্ঠিত হইত, সেখানে ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের সভাপতিকে এতটা হৈচৈ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে তাহারা প্রস্তুত। সব জায়গা হইতে এই ঘোরাঘুরির বিষয়ে আমার সংগে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইতে লাগিল। দিন তারিখ নির্দিষ্ট হইতে লাগিল।

এই যাত্রা সুরু করিবার পূর্বে নিজের কাজের জন্য শ্রীযুক্ত চক্রধর শরণকে নিজের সঙ্গে রাখিয়া লইলাম। ইনি মজঃফরপুর জেলার বেলসংড থানার অন্তর্গত পরতাপুর গ্রামের অধিবাসী। ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেসের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ভূমিকম্পের সময় মজঃফরপুরে তিনি ভাল কাজ করিয়াছিলেন। রিলিফেও তিনি খুব উৎসাহ ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই যাত্রা সুরু করিবার পূর্বে আর একটি প্রশ্নের সমাধান করা আবশ্যক ছিল। মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রায় দিয়া মুসলমানদের খুব খুশী করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা উহাতে খুব ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বুদ্ধিমান লোকেরা সকলেই স্বীকার করিতেছিল যে একটা বোঝাপড়া হইলে সবচেয়ে ভাল হয়। এইজন্য ডাঃ আনসারি খুবই উৎসুক ছিলেন। তিনি মিষ্টার জিন্নার সঙ্গে চিঠিপত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির সামনে তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ওয়ার্কিং কমিটি বলেন যে যদি কোন রাস্তা বাহির করা যায় তাহা হইলে উহা অবশ্যই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইতিমধ্যে মিষ্টার জিন্নাও দিল্লীতে পৌঁছিয়া গেলেন। একদিন ডাঃ আনসারির বাড়িতে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হইল। কিন্তু এই কথাবার্তা এমন ছিল না যে এতগুলি লোক একসঙ্গে ঠিক করিতে পারে, আর এত তাড়াতাড়ি তাহার মীমাংসা হইয়া যায়। শেষকালে মিষ্টার জিন্নার সিদ্ধান্ত হইল এই যে তিনি ও কংগ্রেসের সভাপতি কথা বলিবেন ও যদি কিছু রাস্তা বাহির হইয়া আসে তবে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান হইতে উহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। ডাঃ আনসারির বাড়িতে প্রথম দিন যে সব কথা যেভাবে হইল তাহাদের হইতেও ঐ ধরনের বিশেষ কিছু আশা আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। তাহা হইলেও এরকম কথা হয় নাই যে ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে কোনপ্রকারে লাঘব করা যায় না। এইজন্য আমি ইহাতে গোলমালে পড়িয়া গেলাম। আমার ভয় ছিল যে এই ধরনের কাজের পক্ষে আমি কতদূর উপযুক্ত। কিন্তু ডাঃ আনসারি ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমাকে পুরাপুরি সাহায্য করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর আশীর্বাদও ছিল। ইহা হইতে আমি বুঝিতেছিলাম যে কোন ভুল হইবে না। সুদীর্ঘ কথাবার্তা চলিল। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমাকে দিল্লীতে থাকিয়া যাইতে হইল। মিষ্টার জিন্না ও আমি খোলাখুলি স্পষ্ট কথা বলিলাম। যতদূর বুঝিতে পারিলাম আমাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মনোভাব ভালই ছিল। আলোচনার পর যাহা কিছু কথা হইল, ঐদিনই তাহা লিখিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতাম। ঐ সময়কার ঐ লেখা নোট আজও কোথাও না কোথাও পাওয়া যাইবে।

সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত কৃপালনীও প্রায় বরাবর দিল্লীতেই ছিলেন। তাঁহাকে ও ডাঃ আনসারিকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিতাম। শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুও অনেকটা সময় দিল্লীতে ছিলেন। তিনিও সমস্ত কথা জানিতে পারিতেন। মহাত্মাজী ও সর্দারকেও আমি পত্রে দ্বারা অবগত রাখিতাম। সমস্ত কথা এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

শেষকালে কথা শেষ করিতে হইল। বোঝাপড়া হইতে পারিল না। আমার ইহাতে খুব দুঃখ থাকিয়া গেল; কারণ আমি জানিতাম, যে সব শর্তে বোঝাপড়া করিতে চাহিতেছিলাম ও যাহাদের সম্বন্ধে মিঃ জিন্নাকে রাজী করিয়া লইয়াছিলাম সেই সব শর্ত দেশের পক্ষে হিতকর হইত। ইহার চেয়েও বেশি দুঃখ হইয়াছিল এইজন্য যে, বোঝাপড়া যে হইতে পারিল না তাহা এমন কথার জন্য যাহা বিশেষ কোনও গুরুত্ব ছিল না—তাহা না মানা অথবা তাহা লইয়া জিদ করা, আমার ধারণায় দুই-ই ছিল নিরর্থক।

কথাবার্তা শুরু করিবার পূর্বেই আমি এই কথা পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলাম যে আমি শুধু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কথা বলিতেছি; অন্য কোনও দলের পক্ষ হইয়া কথা বলিবার অধিকারও আমার নাই, অন্যের জবাবদিহি লইতেও আমি পারি না—তবে আমি যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করিব, কংগ্রেস হইতে তাহা আমি মঞ্জুর করাইয়া লইব; ঐভাবে মিঃ জিন্নার নিকট হইতেও আমি এই আশা রাখি যে তিনিও মুসলিম লীগকে দিয়া চুক্তিটা মঞ্জুর করাইয়া দিবেন। তিনি ইহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে এখনই আমরা কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িক নির্ধারণের বিষয়ে নিজের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলাম এবং সেজন্য আমাদিগকে পণ্ডিত মালব্যজীর মত মান্য ও ধুরন্ধর নেতারও বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছে। তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন যে আমরা একটি প্রদেশ ভিন্ন আর প্রায় সর্বত্র নির্বাচনেও জয়লাভ করিয়াছিলাম। এইজন্য তিনি ইহাতে রাজী ছিলেন। আমি একথাও পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলাম যে যদি তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়সংকল্প হন, তাহা হইলে কথাবার্তার কোনও অবকাশ নাই; কারণ আমরা পৃথক নির্বাচনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এতটা ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি যে যদি তাহা থাকিয়া যায় তাহা হইলে কোনও বোঝাপড়ায় কোনও কাজ হইবে না। তাই কথাবার্তা এই ভিত্তির উপর শুরু হইবে যে তিনি পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র ছাড়িতে প্রস্তুত আছেন। ইহাতে তাঁহার পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইল যে এই অধিকার মুসলমানেরা পাইয়াছে এবং কয়েকদিনের মধ্যে ইহাকে কাজে লাগাইবে; তাহার বদলে যতক্ষণ কিছু নির্দিষ্টরূপে না বলিতে পারি ততক্ষণ তাঁহাকে মানাইয়া বা রাজী করিয়া চলা সম্ভব হইবে না।

আমি তাঁহার জন্য কতগুলি জায়গা রাখিতে হইবে বলিয়া স্বীকার করিলাম, সাম্প্রদায়িক বিচারে তিনি যতগুলি পাইয়াছিলেন। আমরা দুই-জনে এই দুইটি কথা মানিয়া লইয়াই কথাবার্তায় অগ্রসর হইলাম। তাঁহার দিক হইতে দাবি হইল, নির্বাচনক্ষেত্রে, যেখানে মুসলমান ভোটদাতাদের সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে কম, সেখানে ভোটাধিকারের পক্ষে আবশ্যক গুণ (qualification) কমাইয়াও মুসলমান ভোটদাতাদের সংখ্যা লোক সংখ্যা অনুসারে করা হউক। তাঁহার বক্তব্য ছিল এই যে, মুসলমান গরিব, অনেক জায়গায় তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষাও কম, এইজন্য যেখানে টেক্স দেওয়াই ভোটাধিকারের লক্ষণ, সেখানে অনেক মুসলমান ছাঁটিয়া ফেলা হইবে এবং ভোটদাতাদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতে খুবই কম হইবে; এইজন্য এইরূপ হওয়া প্রয়োজন। পাঞ্জাবের বিষয় যাহা কিছু হিসাব (figures) পাওয়া গেল, আমি তাহা খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি। যতদূর খোঁজ লইতে পারিয়াছি, তাহাতে ভোটদাতাদের সংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতে কয় জায়গায় কিছু কম হইত, কিন্তু খুব বেশি প্রভেদ ছিল না—হয়তো শতকরা দুই বা তাহার চেয়েও কমেরই প্রভেদ ছিল। যখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সংযুক্ত নির্বাচনক্ষেত্র হইবার কথা, তখন মুসলমানদের এই দাবি যে ভোটদাতাদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতেই হউক, আমার নিকটে ন্যায়-সংগত বলিয়া মনে হইল, আর আমি ইহা মানিয়া লইলাম—বিশেষতঃ যখন কংগ্রেস ইহা স্থির করিয়া লইয়াছিল যে নির্বাচনের ভোটাধিকার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের দেওয়া হইবে, তখন এই দাবি স্বীকার করিয়া লওয়ায় আমার কোনও আপত্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু যখন শিখ ও হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলিলাম তখন শিখেরা ইহার প্রবল প্রতিবাদ করিল। পাঞ্জাবের হিন্দুদের সঙ্গে কথা হইবার পর তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইহা মানিয়া লইলেন; কিন্তু বাংলার হিন্দুরা ইহা মানিতে রাজি হইলেন না। বাংলা হইতে যাঁহারা কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে প্রথমে আমার কথা হয়। তাঁহারা সব কথা শুনিয়া বুঝিয়া বোঝাপড়াটা পছন্দ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বাংলার অন্যান্য লোকদের মত লওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন।

পণ্ডিত মালব্যজীর সঙ্গে কথা হইলে তিনি শিখ ও বাঙালি হিন্দুদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে যতক্ষণ তাহারা স্বীকার না করিবে ততক্ষণ তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। আমি বাংলার হিসাব (figures) অনেক খুঁজিলাম; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কোন রিপোর্ট অথবা বই হইতে এ বিষয়ে বাস্তবিক অবস্থা কি হইবে তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। এই-জন্য, যেমন পাঞ্জাবের হিন্দুদের সামনে হিসাব রাখিয়া তর্ক করিতে

পারিয়াছিলাম বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে তেমন পারি নাই। তখন আমিও জিন্নার সঙ্গে তর্ক চালাইলাম যে তিনি এই দাবীকে না আঁকড়াইয়া থাকেন; কারণ ইহার মধ্যে কোন নীতির কথা নাই। যেখানে মুসলমানদের অনেক বেশী ভোট আছে সেখানে শতকরা দুই-একজন কম হইলে নির্বাচন ফলে কোন বিশেষ প্রভেদ হইবে না। কিন্তু তিনি ইহাতে রাজী হইতেছিলেন না। কংগ্রেসের দিক হইতে তাহা মানিয়া লইতেও রাজি ছিলাম। কিন্তু তিনি পণ্ডিত মালব্যজীর মতেরও প্রয়োজন আছে এই কথার উপর জোর দিলেন। কারণ মীমাংসা হইয়া গেলেও যদি পণ্ডিত মালব্যজীর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক নির্ধারণের বিরোধী আন্দোলন হইতে থাকে তাহা হইলে সেই বোঝাপড়া হইতে মুসলমানদের কোনই লাভ হইবে না।

ওদিকে তখন দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক বিচার বিরোধী এক সম্মেলন হইল, তাহাতে বাংলাদেশের কেহ কেহ যোগদান করিল। তাহারা সম্পূর্ণভাবে ইহার প্রতিবাদ করিল। আমি পণ্ডিত মালব্যজীকে কোনমতেই রাজী করাইতে পারিলাম না। শেষটায় তিনি এই কথার উপরও জোর দিলেন যে মুসলমানদের যতখানি জায়গা মিলিয়াছে, বিশেষ করিয়া বাংলায় ও কেন্দ্রীয় পরিষদে, তাহাও কমাইতে হইবে, আর যতক্ষণ তাহা কমানো না যাইবে ততক্ষণ তিনি রাজী হইতে পারেন না। ওদিকে মিষ্টার জিন্নাও এই কথায় আটকাইয়া গেলেন যে যতক্ষণ পণ্ডিত মালব্যজীর সই না হয় ততক্ষণ তিনি রাজী হইবেন না। নিজের কথায় তিনি বলিতেছিলেন যে মুসলমান নেতাদের দিয়া তিনি অনুমোদন করাইতে পারিবেন। এইভাবে, যদিও কথাবার্তা আমি কংগ্রেসের তরফ হইতে সুরু করিয়াছিলাম—এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভাপতির মধ্যেই এই কথাবার্তা চলিতেছিল —তথাপি শেষকালে ইহা এইজন্য ভাঙ্গিয়া গেল যে মিষ্টার জিন্না শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করিলেন না, আর হিন্দুসভার অনুমতি আবশ্যক মনে করিলেন।

এদিকে তো কথা অন্যপ্রকার দাঁড়াইল। এখন তিনি চাহিতেছেন যে কংগ্রেস, মুসলীম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লয় এবং নিজে হিন্দুদের দিক হইতে বোঝাপড়া করিতে রাজী হইয়া যায়। কংগ্রেস সে সময় শুধু হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান ছিল না, আজও নাই। উহা সর্বদাই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যাহাতে সমস্ত জাতি ও সকল ধর্মের লোকদের জন্য স্থান আছে ও থাকিবে। উহার নীতি রাষ্ট্রীয় নীতি, ঐরূপেই থাকিবে। সেদিন বোঝাপড়া হইল না। ইহা দুঃখের কথা, কারণ তাহার পরে অবস্থা বরাবর খারাপ হইয়াই চলিয়াছে, আর আজ তো বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত।

যতক্ষণ এই কথাবার্তা চলিতেছিল ততক্ষণ আমি দিল্লীতেই ছিলাম।

কিন্তু মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দুই একদিনের জন্য চলিয়া যাইতাম। এই সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ও আগ্রা হইয়া আসিলাম। মার্চ মাস হইতে নিয়মমাফিক ঘুরিয়া বেড়াইব স্থির করিলাম।

সর্বাগ্রে পাঞ্জাবে যাওয়াই স্থির করিলাম। মার্চ মাসে সেখানে গেলাম। প্রথমে জলন্ধরে নামিলাম। সেখান হইতে কিছুদূরে খাদির প্রধান কেন্দ্র আছে আদমপুরে। আমি গিয়া সেখানকার কাজ দেখিলাম। জলন্ধর হইতে লাহোর গেলাম। সেখান হইতে অন্য জায়গায় যাইবার কার্যক্রম প্রস্তুত ছিল। লাহোরে রেল হইতে নামিবার পর বড় মিছিল বাহির করা হইল। মিছিল কিছুদূর যাওয়ার পরেই খুব জোরে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি খুব ভিজিয়া গেলাম। কিন্তু মিছিল শেষ করিয়াই আমাকে অবসর দেওয়া হইল। মিছিল শেষ ইহতে হইতে কিছু রাত্রি হইল। আমি লোক-সেবক সমিতির লাজপত রায় ভবনে খাইতে গেলাম। খাওয়ার পর ডাঃ সত্যপালের ভবনে থাকিতে গেলাম। জলে ভেজা ও তাহার পর রাত্রে ঠাণ্ডা লাগা আমার সহ্য হইল না। পরের দিন সকালেই হাঁপানি কাসি সুরু হইয়া গেল। আমি আশা করিলাম যে আমার শরীরের পক্ষে সুদিন আসিয়াছে এই অনিয়ম দুই-একদিনেই ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপ হইতে পারিল না, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। ফলে হইল এই যে আমাকে সমস্ত কার্যক্রম বদলাইতে হইল। লাহোরে কয়েকদিন ধরিয়া পড়িয়া থাকিলাম। কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টিও কিছু না কিছু হইতে লাগিল। পাঞ্জাব ভ্রমণের জন্য যতটা সময় দিয়াছিলাম আমি ভাল হইতে হইতে তাহার সবটাই শেষ হইয়া গেল। পাঞ্জাবে ঘোরাফেরা স্থগিত রাখিয়া আমি সোজা বিহারে ফিরিয়া আসিলাম।

দুঃখের কথা যে পাঞ্জাবের মত প্রদেশে কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে পরস্পরের খুব মতভেদ আছে। ইহা তখনও খুব প্রবল ছিল। খানিকটা দূর পর্যন্ত আমিও ইহার জালে পড়িলাম। একথাটা মজার, এইজন্য এখানে ইহার উল্লেখ করা খারাপ হইবে না। ইহাতে কাহারো নামে দোষ দিবার উদ্দেশ্য নাই। পাঠকের মনোবিনোদনের জন্য এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদ হইলে আগন্তুক অতিথিরও কোথাও কোথাও অসুবিধা হইতে পারে এই কথা পাঠকদের জানাইবার জন্য ইহা লিখিতেছি।

প্রথম হইতে স্থির ছিল যে আমরা জলন্ধরে নামিব।—আমরা যে গাড়ীতে গেলাম তাহা ভোর প্রায় তিনটা-চারিটায় সেখানে পৌঁছায়। জলন্ধরে দুইটা স্টেশন আছে—এক সিটি দ্বিতীয় ক্যানটনমেণ্ট। কোন্ স্টেশনে নামিতে হইবে তাহা আমার জানা ছিল না; কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম যে যেখানেই নামিতে হউক, কিছু লোক তো আসিবেই এবং আমাকে নামাইয়া লইবে এইজন্য আমি এই বিষয় নিশ্চিন্ত ছিলাম। প্রথমে

যে স্টেশন পাইলাম সেখানে কয়েকজন লোক আমাকে নামিতে বলিল। আমার সংগে কৃপালনীজীও ছিলেন। আমরা সেখানে নামিয়া গেলাম। তাহারা আমাদিগকে স্টেশনের মুসাবিদ খানায় লইয়া গেল আর সেখানে হাত-মুখ ধুইয়া তৈয়ারি হইতে বলিল। আমরা ভাবিলাম যে লোকেরা ঠিক করিয়াছে যে ভোর হইয়া গেলে আমাদিগকে সেখান হইতে লইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের আশ্চর্য বোধ হইল এই জন্য যে, যাঁহার বাড়িতে আমরা উঠিতে চাহিয়াছিলাম ও যাঁহাকে আমরা তার করিয়াছিলাম তিনি (রায়জাদা হংসরাজ) স্টেশনে আসেন নাই। আমরা ভাবিলাম, তিনি হয়তো ভোর হইয়া গেলে আসিবেন আর তখন আমাদের সংগে লইয়া যাইবেন। আমরা মুখ-হাত ধুইতে ধুইতেই একটু পরে মোটরে চড়িয়া রায়জাদা সাহেব আসিলেন। জানিতে পারিলাম যে তিনি অন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমরা সেখানে না পৌঁছানোয় তিনি এখানে খোঁজ করিতে আসিলেন; যাঁহারা আমাদের নামাইয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা অন্য দলীয় ছিলেন, রায়জাদা সাহেবের বাড়িতে উঠি এ তাঁহাদের পছন্দ নয়—আমাদের অন্য কোথাও উঠাইবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন! উভয়পক্ষে নিজে-দের মধ্যে কিছু কিছু কথাবার্তা হইল। আমরা অতিথিরা কিছুটা মুস্কিলে পড়িলাম! শেষে স্থির হইল যে আমরা রায়জাদা সাহেবের বাড়িতে দুপুরবেলা ভোজন করিব, আর সকালে জলযোগ করিব সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে অন্যদল যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিল। আমি রায়জাদা সাহেবকে পূর্ব হইতেই খুব জানিতাম। এইজন্য তাঁহাকে তার করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানকার লোকদের এই অবস্থা দেখিয়া যে ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন তাহাই মানিতে হইল। আমরা রায়জাদা সাহেবের বাড়ি গেলাম। হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিবার জন্য অন্যত্র গেলাম। সেখান হইতে আদমপুর গেলাম। আবার ফিরিয়া রায়জাদা সাহেবের বাড়ি ভোজন করিয়া রেলে লাহোর রওনা হইয়া গেলাম।

কিন্তু আমাদের অসুবিধা এখানেই শেষ হইল না। লাহোরে কোথায় উঠিতে হইবে, এ সমস্যা এখনও সমাধান হয় নাই। রেলে ডাঃ সত্যপালের স্ত্রীর পত্র লইয়া একজন আসিয়া দেখা করিল। ডাক্তার সাহেব তখন ছিলেন জেলে। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি। তিনি বাহিরে থাকিলে সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইত। তিনি না থাকায় অন্য লোকেরা ব্যবস্থা করিল। আমি বুঝিলাম যে লোক-সেবক-সদস্যেরা, যাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত বন্ধু ছিলেন, আমার সভা-ভবনে উঠিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সত্যপালগৃহিণী লিখিলেন যে তাঁহার স্বামী জেলে আছেন, অতএব তিনি আশা করেন যে আর কিছু না হইলে এজন্যও আমি তাঁহার বাড়িতে থাকা স্থির করিব। আমি আবার দ্বন্দ্বে

পড়িয়া গেলাম। উভয়পক্ষের লোকদের মধ্যে রেলেতেই কথাবার্তা হইতে লাগিল। কৃপালনীজী তাঁহার উগ্র স্বভাব অনুযায়ী চটিয়া গেলেন। তিনি উভয়কেই ধমক দিলেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা মীমাংসা করে নেও না আর অতিথিকে ফেল গোলমালে। ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে ঐ দিন সন্ধ্যা ভোজনের জন্য লোকসেবক সমিতি শহরের অনেক মান্যগণ্য অধিবাসীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি সেখানে না গেলে তাঁহাদেরও অসম্মান হইবে। শেষকালে কথাটার নিষ্পত্তি হইল এই যে সন্ধ্যা ভোজন তো লাজপত রায় ভবনেই হউক, কিন্তু আমি গিয়া উঠিব ডাঃ সত্যপালের বাড়িতেই। মিছিলে বৃষ্টিতে ভিজিবার কারণও ছিল এই ধরনের কিছু। ব্যবস্থাকারীরা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে মিছিল কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া যাইবে। তাঁহারা কয়েকটি অলি-গলি ছাড়িয়া দিয়া মিছিলের রাস্তা কিছু ছোট করিতে পারিলেন না।

আমি ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। দুর্ভাগ্যবশে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। এখন প্রয়োজন হইল কোনও ডাক্তার বা বৈদ্যের; একথারও মীমাংসা হইতে পারিল না। প্রথমে যে ডাক্তার আসিলেন তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিতীয় দল সন্তুষ্ট হইল না; তাহারা চাহিল নিজেদের ডাক্তার ডাকিতে! শেষে এলোপ্যাথিক ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথিকের কথা উঠিল। কিছু ভাল হইতেই আমি বিহারে ফিরিয়া আসিলাম।

এপ্রিল হইতে যে যাত্রাক্রম প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আমি বিনা বাধায় প্রায় জুনের শেষ পর্যন্ত ঠিক ঠিক সম্পূর্ণ করিতে লাগিয়াছিলাম। এপ্রিল মাসে জবলপুরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক করা হইল। এই বৈঠকের জন্য কোনও বিশেষ কার্যক্রম অথবা গুরুত্বের প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু আমি ভাবিলাম যে বৎসরে দুই-তিনবার নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অবশ্য অধিবেশন হওয়া উচিত, কারণ সদস্যদের কংগ্রেসের সম্বন্ধে প্রশ্ন আলোচনা করিবার অবসর পাওয়া যায়। অনেক দিন হইতে মধ্যপ্রদেশে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কোনও বৈঠক হয় নাই। এইজন্য আমি সেখানকার লোকদের ইচ্ছানুসারে সেখানেই বৈঠক ডাকাইলাম। তাহা সফলতাপূর্বক শেষ হইল। সেখান হইতে আমি ভ্রমণে বাহির হইয়া গেলাম। আরম্ভ করিলাম বেরারে। সেখানে ছিল প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনফারেন্স, যাহার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। কনফারেন্স শেষ করিয়া আমি বেরারের সমস্ত জেলায় গেলাম।

সর্বত্র সভা হইত, অভ্যর্থনা হইত, মিছিল বাহির হইত; লোকের মধ্যে উৎসাহ দেখিতাম যথেষ্ট। নিজের প্রদেশের বাহিরে এই প্রকার ভ্রমণের আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা ছিল ভাল ও সুখ-

কর; কারণ বিভিন্ন দেশ দেখা ছাড়া কংগ্রেসের সংগঠন সুদৃঢ় করিবার কিছু সুযোগ পাওয়া যাইত, আর জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িত।

বেরার ভ্রমণ শেষ করিয়া সোজা কর্ণাটক চলিয়া গেলাম। সেখানকার সমস্ত জেলায় ঘুরিলাম। তাহার পর সমস্ত মহারাষ্ট্রে গেলাম। ভোর-বেলায় উঠিতাম এবং স্নানাদি শেষ করিয়া প্রায় ৭টার সময় মোটরে চড়িয়া বাহির হইতাম। স্থানে স্থানে সভা করিতে করিতে বেলা বারোটা আন্দাজ কোথাও পৌঁছিতাম, সেখানে আহারাদির ব্যবস্থা থাকিত। আহার ও বিশ্রামের পরে প্রায় দুইটার সময় আবার বাহিরে যাইতাম, আর রাত্র আটটা নয়টা পর্যন্ত সভা করিতাম। রাত্রে বিশ্রামের স্থানে চলিয়া যাইতাম। রেলে চড়িতাম কম, বেশির ভাগ মোটরে করিয়াই সমস্ত ভ্রমণ শেষ হইল। বেরার, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক ঘুরিতেই প্রায় অর্ধেক এপ্রিল, পুরা মে এবং প্রায় সমস্ত জুন কাবার হইয়া গেল। ইহার মধ্যে, শুধু দুই-তিন দিনের জন্য, একবার বাড়ি গিয়াছিল্যাম—জুনের আরম্ভে, দাদার বার্ষিক শ্রাদ্ধের উপলক্ষে।

সর্বত্র বড় বড় মিছিল বাহির হইল, বড় বড় সভা হইল। ছোট ছোট পাড়া ও গ্রাম পর্যন্ত যাইবার ও লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিবার সুযোগ পাইলাম। কর্ণাটের পাহাড়-জঙ্গল হইয়া সমুদ্রের ধার ঘুরিয়া মহীশূর পর্যন্ত গেলাম। আবার সেখান হইতে ফিরিবার সময় শোলাপুর, সাতারা, পুণা, বেলগাঁও, মালবন, রত্নাগিরি নাসিক, আহমদনগর ইত্যাদি নগরেও যাইবার সুযোগ পাইলাম। অতিশয় সুন্দর প্রদেশ ও দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের প্রাকৃতিক দীপ্তি, জংগলের সুন্দর শোভাময় দৃশ্য, দক্ষিণ ভারতের হরিদ্বর্ণ ও সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি, সব দর্শন হইল। মোটরে চড়িয়া যাওয়ার জন্য এই সব দৃশ্য দেখিবার আরও সুবিধা হইল। লোকের রং-বেরঙের বেশভূষা ও ভাষার পার্থক্য দেখিলাম। কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে ভারতবর্ষের ঐক্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহা কেহই নষ্ট করিতে পারে নাই। একদিকে সাতারা ও শোলাপুরের পোড়ানো রোদ, অন্যদিকে মহীশূর ও কুর্গের জংগলের ঠাণ্ডা হাওয়া শরীর জুড়াইয়া দেয়। মরকরায় উঁচু পাহাড়ের সমতলে সভার জন্য এক অতি মনোরম স্থান আছে। সেখানে হাজার ফুট উঁচায় একদিকে সভা হইত অন্যদিকে হাজার ফুট নীচে, যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ জংগলের পরে জংগল দেখা যায়। জমি কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। কিন্তু সর্বত্র সবুজ ভাবই নজরে পড়ে। সেখানকার লোকদের পোষাকও নিজেদের ধরনের। মেয়েরা মাথার চুলে একবেণী বাঁধে। পুরুষ আঙগরাখা পরে, আর এক জাতীয় কুকড়ি বা তলোয়ার কোমরে বাঁধে। জংগল এতটা বেশী ঘন যে, শুনিয়াছি সেখানে হাতিও আছে আর বাঘ প্রভৃতি তো আছেই।

মহারাষ্ট্রের ভ্রমণ প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। আমি দেখিলাম যে সেখানকার লোকের ফুলের ভারি শখ। অভ্যর্থনার জন্য তাহারা অনেক ফুলের মালা লইয়া আসিত। সেখানকার রেওয়াজই ছিল এই যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনায় বহু প্রতিষ্ঠানই যোগ দেয়, এবং সকলের তরফ হইতে পৃথক পৃথক মালা দেওয়া হয়। এইভাবে এক এক সভায় আমাকে কতগুলি মালাই দেওয়া হইত। ফুলের মালা এমন কিছু টিঁকিবার জিনিষ নয়; দিন শেষ হইতেই ম্লান হইয়া যায়, আর তাহা ফেলিয়া দিতে হয়; রাস্তায় গাড়ির পক্ষেও বোঝা বাড়িত। স্থানীয় বাজারে ফুলের মালা পাওয়া না গেলে লোকেরা দূর দূর স্থান হইতে পার্শেল করিয়া ফুলের মালা আনাইত। ইহাতে পয়সাও লাগিত, কোনও কাজও পূরা হইত না। ইহাতে আমরা এক আপিল বাহির করিলাম যে লোকেরা যদি সাদর অভ্যর্থনা করিতে চায় তবে ফুলের মালা না দিয়া হাতে কাটা সূতার মালা যেন আমাকে দেয়। শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও আমার এই কথাটি পছন্দ করিলেন। তিনিও এই কথার উপর জোর দিলেন। ফলে মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রদেশে আমি যেখানে যেখানে ঘুরিতে গেলাম সেখানে আমাকে সূতার মালা দেওয়া হইল। আমি সূতার মালাগুলি জমাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিলাম। বুনাইয়া এত বেশি কাপড় হইল যে কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধবদের বিতরণ করিয়া দিয়াও আমার কয়েক বৎসর পর্যন্ত খাদি কিনিতে হয় নাই।

মহারাষ্ট্র কমিটি ইহাও স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে আমি যেখানেই যাই, লোকে যেন কিছু অর্থও উপহার দেয়। ঐ প্রদেশে এই ব্যাপার আরম্ভ করা হইল। ছোট ছোট সভায় লোকে পূর্ব হইতেই কিছু না কিছু জমা করিয়া রাখিত, থলি উপহার দিত। ছোট ছোট গ্রামেও এই ধরনের ভেট পাইতাম। কোথাও কোথাও রাস্তাতেও গাড়ি থামাইয়া ভেট দেওয়া হইত। এইভাবে প্রায় ২০/২২ হাজার টাকা জমা হইয়া গেল। ইহার সামান্য অংশ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জন্য কৃপালনীজী গ্রহণ করেন, আর প্রায় তিন-চতুর্থাংশেরও বেশির ভাগ সেখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে সেখানকার কাজের জন্য দেওয়া হইল। এই ভ্রমণ ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের কার্যকুশলতা ও কার্য করিবার প্রণালী দেখিয়া আমি অত্যন্ত খুশি হইলাম। যাত্রা-ক্রম এমন করিয়া প্রস্তুত করা হইল যে ঠিক সময়ে সর্বত্র যাইবার সুযোগ পাইলাম। শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও আমাকে ইহাও বলিয়া দিতেন যে কোথায় কতক্ষণ থাকিতে হইবে, সেই মত আমি বক্তৃতাতেও সময় দিতাম। কিছু দেরি হইলে তিনি ছড়ি দিয়া ইসারা করিতেন। চাই ভোরেই রওনা হই আর দুপুরে বিশ্রাম করিয়া চলিতে শুরু করি, চাই কোনও স্থানের

সভার কাজ শেষ করি, তিনি সর্বত্র খুব কড়াকড়ি করিয়া সময় মত কাজ করিতেন ও করাইতেন। ইহাতে বিনা কষ্টে সমস্ত কার্যক্রম দিনের মধ্যেই শেষ হইত, আর আহার ও বিশ্রামের জন্য যথোচিত সময় পাওয়া যাইত।

সব প্রদেশে এরূপ হয় নাই। কোথাও কোথাও তো রাত্রে একটা দুইটা বাজিলেও গিয়া সভা করিতে হইত। আমাদের নিজেদের প্রদেশেই ১৯৩৭ সালে যখন পণ্ডিত জওয়াহরলালজী আসেন, তখন বাঁকীপুরে রাত বারোটায় আর পাটনা সিটিতে রাত দুইটায়—জানুয়ারি মাসে—সভা হইল। জনসাধারণ সেই ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে, সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত দুইটা পর্যন্ত, খোলা ময়দানে বসিয়া থাকিল! আমি যখন মহারাষ্ট্রের সেই সংগঠনের কথা মনে করি তখন সেখানকার লোকদের কর্মপটুতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু নিজের প্রদেশের অব্যবস্থার কথা আর কি বলিব! লোকদের অতক্ষণ অপেক্ষা করায় তাহাদের উৎসাহ ও ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল বটে, তবে অতিথিদের আনিতে অতটা দেরি করা আমাদের অকর্মণ্যতার পরিচয়। কিন্তু আমি দেখিলাম, এই দেরি হওয়ার কারণে লোকদেরও সম্পূর্ণ দায়িত্ব আছে। লোকেরা বিপুল সংখ্যায় জমা হইত। তাহারা যদি প্রথম হইতে নিজের নিজের জায়গায় স্থির হইয়া নিয়মমত বসিয়া থাকে, তাহা হইলে অতিথিকে মঞ্চ পর্যন্ত লইয়া আসায় অসুবিধা হয় না, তিনিও মঞ্চে পেঁীছিয়া নিজের কাজ তাড়াতাড়ি করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ হয় না। লোকেরা ভিড় করিয়া অতিথিকে ঘিরিয়া লয়। তাঁহার অগ্রসর হওয়া হয় কঠিন। তাহার পর মঞ্চ পর্যন্ত পেঁীছিতেও যথেষ্ট সময় লাগিয়া যায়। আবার তাহার পরেও খানিকটা সময় লাগে লোকদের বসাইতে ও শান্ত করিতে। কার্যক্রম প্রস্তুত করিতে গিয়া আমরা এই সমস্ত দেখি না। যেখানে সভা হওয়ার কথা সেই সব জায়গার জন্য যদি ব্যবস্থা রাখি, তাহা হইলেও রাস্তার মাঝখানে ভিড় আসিয়া গাড়ি আটকাইবে, আর যে জায়গায় কার্যক্রমে নাই, সেখানেও অতিথিকে কিছু বলিতে বাধ্য করিবে! ইহা তো আমরা প্রথম হইতে জানিও না, আর কার্যক্রমে ইহার জন্য সময়ও দেই না। এইজন্য সময়মত কোথাও যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে সংযমও দেখিয়াছি। তাহারা কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোথাও থামায় নাই। লোকে কোথাও এই ধরনের ভিড়ও করে নাই, যে সময় অনর্থক নষ্ট করিতে হয়। সোলাপুরে ইহার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেখানকার লোকেরা অভ্যর্থনার জন্য খুব আয়োজন করিয়াছিল, সমস্ত শহর সাজাইয়াছিল। সেখানে গিয়া জানিলাম যে গভর্মেণ্ট মিছিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কর্মকর্তারা তো আদেশ মানিয়া লইল, কিন্তু সকলে যাহাতে আমাকে দেখিতে পায় তাহার

সুন্দর ব্যবস্থা করিল। এ সমস্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করা হইল। লোকদের বলা হইল যেন সকলে নিজের নিজের জায়গায়—রাস্তায় হোক বা দোকানে হোক বা বাসায় হোক—থাকে। আমাকে সেই সব রাস্তা দিয়া লইয়া যাইবে যে-দিক দিয়া মিছিল বাহির হইবার কথা ছিল। তাহা হইলে লোকেরা আমাকে দেখিতেও পারিবে আর লোকেরা যে অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিল তাহা আমিও দেখিতে পারিব। লোকেরা ব্যবস্থাকারীদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। আমি বাসা হইতে এক খোলা গাড়ি করিয়া রওনা হইলাম, তাহা সুগন্ধি ফুল দিয়া খুব সাজানো ছিল। আস্তে আস্তে ঐ সব রাস্তা দিয়া চলিলাম যে-সব জায়গা দিয়া মিছিল যাইবার কথা ছিল। গাড়ির সঙ্গে শুধু দুই-একটা অন্য গাড়ি ছিল, তাহারা সামনে ও পিছনে চলিতেছিল। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, দোকানের বারান্দা লোকে ঠেসাঠেসি ভরা। কিন্তু কেহ নিজের জায়গা ছাড়িয়া আমাদের গাড়ির পিছনে বা পাশে দৌড়াইল না। গাড়ি ধীরে ধীরে চলিল বলিয়া সকলে আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। গাড়ি ধীরে ধীরে চলিলেও মিছিলে যতটা সময় লাগিত তাহার চেয়ে এইভাবে যাওয়ায় সময় কম লাগিল। লোকেরা চাহিলে গাড়ি থামানো হইত, লোকেরা মালা ইত্যাদি লইয়া অভ্যর্থনা করিত। এই প্রকারে আমার শহর দেখিবারও সুযোগ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ছুটিতেছে, তাহাদের চাপ হইতে আর কর্ণভেদী সোরগোল হইতে আমি একেবারেই বাঁচিয়া গেলাম। লোকেরাও দৌড়-ধাপের কষ্ট হইতে বাঁচিল। গভর্মেণ্ট মিছিল বন্ধ করিয়া দিল এইজন্য যে লোকে অভ্যর্থনায় যোগ দিতে না পারে আর ভিড় বেশি না হয়। সূক্ষ্মদর্শী কার্যকর্তাদের প্রবীণতা ও জনসাধারণের সংযমের ফল হইল এই যে লোকদের উপর মিছিল হইতে যতটা প্রভাব পড়িত তাহার চেয়ে খানিকটা বেশি প্রভাব পড়িল।

সব জায়গায়, সব অবস্থায়, যেখানে গভর্মেণ্টের প্রতিবন্ধক না হয়, সেখানেও কি এইরূপ হইতে পারে না? হইতে পারে, আর অবশ্য হওয়াও চাই। আমাদের কর্মীদের অনেকটা সময় ভিড় সামলাইতে লাগিয়া যায়। কিছু কিছু মাতব্বর লোক কোনও অধিকার না থাকিলেও মিছিলের ব্যবস্থা নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। ফলে কেহ কেহ অতিথির গাড়ির সঙ্গে চলিতে থাকে তাহাতে অতিথি চাপা পড়িয়া যায় আর পাশের লোক তাহাকে দেখিতে পায় না। তখন যাহারা দেখিতে পায় নাই তাহারাও কিছু দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায়. এইভাবে মিছিলে গণ্ডগোল হইতে থাকে। এত লোক এক সঙ্গে হাঁটে বলিয়া খুব ধুলা উড়িতে থাকে। সঙ্গের লোকেরা সর্বদা ধ্বনি করিতে থাকে। অতিথির নাক ধুলায় ও কান ধ্বনিতে ফাটিবার মত হয়। তিনি যদি আমার মত হাঁপানীর রোগী

হন তাহা হইলে ইহার ফল সে-দিন না হইলে শীঘ্রই ভুগিতে হয়। মিছিলে অনেকটা সময় লাগে বলিয়া যাহারা অতিথিকে দেখিবার ইচ্ছায় সত্যই দূর হইতে আসে তাহারা বঞ্চিত থাকিয়া যায় আর পরবর্তী কার্যক্রমেও দেরি হইয়া যায়।

এই যাত্রায় কোথাও কোয়েটার ভয়ংকর ভূমিকম্পের খবর শুনিলাম। শুরুতে কয়েকদিন ধরিয়া সেখানকার সমস্ত সংবাদ পাই নাই। কিন্তু যখন সংবাদপত্রে তালিকা বাহির হইতে লাগিল তখন বুঝিলাম যে সেখানকার অবস্থাও কিছুটা বিহারের মত হইয়া থাকিবে। আমি এক রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া দিলাম, আমিই তাহার সভাপতি হইলাম। টাকা জমা হইতে লাগিল। বিহার ও কোয়েটায় দুই বিষয়ে খুব প্রভেদ ছিল। কোয়েটার ভূমিকম্প কোয়েটা শহর ও তাহার চারিপাশের পক্ষে বিহারের মতই প্রলয়ংকর ছিল। কিন্তু তাহার ক্ষেত্র বিহারের মত বিস্তৃত ছিল না। কোয়েটা হইল এক সামরিক ছাউনী। তাই সেখানে সৈন্যদল ছিল। তাহাদিগকে সাহায্যদানের কার্যে লাগানো হইল। কিন্তু এইজন্য সেখানে কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করিতে পারে নাই। সরকারী মঞ্জুরি না পাইলে খবর ছাপিতে পারিবে না। সংবাদপত্রের উপর এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইল! খবর ছাপিয়া দেওয়ার জন্য দুই-একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে খুব কঠোর ব্যবহার করা হইল! বাহির হইতে লোকদের সেখানে যাওয়া একদম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই কারণে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা যে কিরূপ ছিল তাহার সন্ধান কেহ পাইল না। যে খবর পাওয়া গেল তাহা শুধু সরকারি বিজ্ঞপ্তির দ্বারাই, অন্য কোনও উপায় ছিল না। এই কথা লইয়া সংবাদপত্রে জোর আলোচনা হইল। কিন্তু শুনিবে কে! সৈন্যদল ও সরকারি কর্মচারীরা যাহা ন্যায়সংগত মনে করিল তাহাই করিল। সেখানকার সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যদলের বিরুদ্ধে বহু প্রকার অভিযোগ, সেখান হইতে যাহারা আসিয়াছে এমন সব লোকের মুখে, শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু কেহ তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কেহ পরীক্ষা করিতেও পারিল না। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই প্রকারে সেখানে খবরের কাগজ যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং বাহিরের কোনও লোককে সেখানে যাইতে মানা করিয়া দেওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল। ইহাতে সাধারণ লোকে এই অর্থ করিল যে অভিযোগগুলি সত্য এবং তাহা ঢাকিবার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার করা হইয়াছে। লোকের ইচ্ছা ছিল, অনেক প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতও ছিল যে সেখানে গিয়ে পীড়িতদের সাহায্য করে; কিন্তু কেহ সেখানে যাইবার অনুমতিই পাইল না।

সেখানে বিস্তর লোক ছিল সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশের। যাহারা বাঁচিল তাহার মধ্যে অনেকে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখ

হইতেই রকম রকমের খবর ছড়াইয়া পড়িল। বাহিরের লোকেরা এইরূপ নিরাশ্রয় ব্যক্তিদেরই সাহায্য করিল। ইহাদেরও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল; কারণ ইহাদের সর্বস্ব সেখানে খোয়া গিয়াছিল। অনেকের ব্যবসায়ী ও রোজগারী আত্মীয় সেখানে মারা পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে প্রথমে তো এমন কোনও স্থানে পেঁছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইল যেখানে তাহারা থাকিতে পারে। কিন্তু এমন স্থানে পেঁছাইবার পরও তাহাদের কোনও ঠিকানা পাইবার আশা ছিল না। এইজন্য তাহাদের কোথাও লইয়া গিয়া কয়েক দিনের জন্য তাহাদের থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া এবং আবার কোনও কাজের মধ্যে তাহাদিগকে লাগাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমার খুব ইচ্ছা হইল যে আমি সেখানে গিয়া বিহারের ভূমিকম্পে কাজ করিতে করিতে যে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার লাভ সেখানকার লোকদের দিয়া তাহাদের সাহায্য করিব। কিন্তু গভর্মেণ্ট অনুমতি দিল না। ইহা লইয়া সংবাদপত্রে সরকারের নিন্দা করা হইল; কিন্তু সরকার একটুও নড়িলেন না।

অধিকাংশ লোক কোয়েটা হইতে পলাইয়া করাচিতে আসিয়াছিল; আমি করাচিতে গেলাম। যেখানে যেখানে এরূপ দুঃস্থ লোক আসিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল সিন্ধুর সেই সকল শহরেও গেলাম। হাজার হাজার শরণাগত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিলাম। তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিলাম। তখন গভর্মেণ্টকে এক পত্র লিখিলাম। যে সকল অভিযোগ কানে আসিয়াছিল উহাতে তাহাদের উল্লেখ করিলাম। সেখানে যাইবার অনুমতিও চাহিলাম। তাহার উত্তর তখনকার ভারত সরকারের হোম মেম্বার মিঃ হ্যালেট্—সংযুক্ত প্রদেশের গভর্ণর স্যার মরিস হ্যালেট্—দুই ছত্র চিঠিতে দিলেন যে অনুমতি পাওয়া যাইবে না আর অভিযোগ শুনিয়াও গভর্নমেণ্ট পরীক্ষা করিবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। আমাকে তাই বাহির হইতেই সেবাকার্য করিতে হইল। আমি কোয়েটায় গেলাম না বটে কিন্তু করাচী, জেকোবাবাদ, সক্কর, শিকারপুর প্রভৃতি সিন্ধুর শহরগুলিতে গেলাম। কোয়েটা হইতে পলাইয়া লোকে পাঞ্জাবের ডেরাগাজীখাঁ, মুল-তান, লাহোর ইত্যাদি শহরে আসিয়াছিল আমি সে-সব জায়গায়ও গেলাম। সর্বত্রই তাহাদের সাহায্যের জন্য কমিটি গঠন করিলাম। কমিটি তাহা-দিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিল। কোয়েটা রিলিফ কমিটি আপিলের ফলে কয়েক লাখ টাকাও আসিল তাহা বিতরণ করা হইল। এখানকার সাহায্য-দানের প্রকার বিহার হইতে একেবারে ভিন্ন ছিল। বিহারে যে সমস্ত সাহায্য করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কোয়েটায় যেখানে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল সেইস্থানে তো আমরা যাই নাই, সেই-জন্য খাস কোয়েটায় যাইয়া আমরা কিছু করিতে পারি নাই। এদিকেই

কিছু টাকা শরণাগতদের খাওয়া ও ঔষধপত্রের জন্য খরচ হইল। কিন্তু বেশী খরচ করা হইল তাহাদের ব্যক্তিগতভাবে কোথাও আবার তাহাদের জীবন আরম্ভ করিবার উপায়ের ব্যবস্থা করায়। এই কাজের ভার সিন্ধু-দেশে শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস ও পাঞ্জাবে ডাঃ গোপীচাঁদ ভারগবই গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সাহায্য করিতেছিলেন স্থানীয় লোকেরা, তাঁহারা খুব তৎপরতার সহিত কাজ করেন।

উপরে বলা হইয়াছে যে আমি ভ্রমণ করিতে করিতে কোয়েটার খবর পাই। কিছুদিন পর্যন্ত তো আমি আমার ঘোরাফেরা বন্ধ করিলাম না কিন্তু যখন সেখানকার ভয়ঙ্কর অবস্থার ঠিক ঠিক সংবাদ পাইলাম তখন আমাকে ভ্রমণ বন্ধ করিয়া ঐদিকে যাইতে হইল। তখন আমি নাগপুরে ঘুরিতেছিলাম। তাহার পরেই বর্ষার জন্য ঘোরাফেরা বন্ধ করিতেই হইত। এইজন্য অল্প কয়েক জায়গায় যাওয়াই বন্ধ করিতে হইল। বর্ষা শুরু হইয়া গেল। আমি সিন্ধু ও পাঞ্জাবে চলিয়া গেলাম। সেখানে বর্ষা খুব কম হয়, যাহাও হয় তাহা খুব দেরী করিয়া হয়। এইজন্য জুনের খানিকটা ও জুলাইয়ের কতকটা ঐ দুই প্রদেশে কাটাইলাম। সেখানে ঘোরাঘুরি ও কার্যক্রম দুইটীতে কিছু প্রভেদ হইল। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘোরা-ঘুরিতে যে কাজ হয় তাহা তো হইতেই লাগিল। যেখানে যাই সেখানে প্রথমে হাসপাতালে গিয়া কোয়েটার আহতদের দেখি আবার তাহাদের জন্য যে ছাউনি হইতেছে সেখানে আশ্রয়প্রার্থী লোকদের সঙ্গে দেখা করি। স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করি। রিলিফের কাজ করি, সাধারণ সভায় বক্তৃতাও দি। সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবে তো শুধু এই কাজ হইল। কিন্তু যেমন যেমন কোয়েটা হইতে দূরে পূর্ব পাঞ্জাবে যাই অন্য কাজও কিছু করিতে পারি। এইজন্য যে দুই মাস অন্য প্রদেশে বর্ষার জন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া কাটাইতে পারিতাম না তাহা সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কাটাইলাম। সেখানেই যথাসাধ্য কাজ করিলাম। এ যাত্রাতেও বিশেষতঃ পাঞ্জাবে বেশীর ভাগ মটরে করিয়া ঘুরিতে হইল। এইজন্য মধ্য পাঞ্জাবের ও পূর্ব পাঞ্জাবের কয়েকটি জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানকার অবস্থা ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম।

কংগ্রেসের ইতিহাস ও দেশীয় রাজ্যের সমস্যা

কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল ১৮৮৫-ইর ডিসেম্বরে, যখন তাহার প্রথম অধিবেশন বোম্বাইয়ে হয়। ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে তাহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হইতেছিল। এই কারণে স্থির হইল যে কংগ্রেসের অর্ধশতাব্দী (স্বর্ণজয়ন্তী) ধূমধাম করিয়া পালন করা হইবে। ইহার জন্য কার্যক্রম গঠন করা হইল, তাহার উল্লেখ পরে করিব; কিন্তু এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। যদিও কংগ্রেসের প্রায় ৫০ বৎসর কাটিয়াছে তথাপি কংগ্রেসের কোনও প্রকৃত ইতিহাস, শুরু হইতে আজ পর্যন্ত একত্র লেখা, পাওয়া যাইতেছিল না। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া একটি ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু উহা এখনও ছাপা হয় নাই। সিদ্ধান্ত হইল এই যে এই জয়ন্তী উপলক্ষে একটি ইতিহাসও প্রকাশিত করা হইবে। ডাঃ সীতারামিয়াকে আমি অনুরোধ করিলাম যে তাঁহার লেখা ইতিহাস তিনি যেন শেষ করিয়া দেন, কংগ্রেসের দিক হইতে উহা ছাপানো হইবে। তিনি ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। বর্ষাকালে আমি আর তিনি ওয়ার্ধায় বসিয়া উহা আর একবার দেখিয়া দিলাম। ইহাতে কয়েকটা দিন লাগিল। যাহা কিছু বাকি থাকিল তাহা আমি এলাহাবাদে, স্বরাজভবনে বসিয়া, দেখিয়া দিলাম।

ঐ ইতিহাস ইংরাজীতে লেখা হইয়াছিল। আমরা ইহাও স্থির করিয়াছিলাম যে দেশী ভাষাতেও উহার সংস্করণ ঐ সময়ে বাহির হইবে। এজন্য হিন্দী, মারাঠি, কানাড়ি, তেলেগু, তামিল, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তাহার অনুবাদ ছাপিবার ব্যবস্থাও করা হয়। ইংরাজী সংস্করণ ছাপিবার ব্যয়-ভার তো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করেন, কারণ আমরা জানিতাম যে ইহাতে যে পয়সা লাগিবে তাহা পুস্তক বিক্রয় হইলে ফিরিয়া আসিবে। অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইবার ও তাহা ছাপিবার ভার কোনও কোনও প্রকাশক অথবা যেখানকার ভাষায় অনুবাদ হইবে সেই সব প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলি গ্রহণ করেন। যেদিন কংগ্রেসের জয়ন্তী স্থির হইল সেইদিন—যতদূর মনে আছে—ইংরাজী, হিন্দী, মারাঠি, কানাড়ি, তেলেগু, তামিল ও উর্দু সংস্করণ ছাপিয়া তৈয়ার হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে যে কিনিতে চাহিত সে বই পাইতে পারিত। যদি আর কিছু পূর্বে বইগুলি ছাপিয়া তৈয়ার করিতে পারা যাইত তাহা হইলে আরও অনেক কপি বিক্রী হইত। তাহা হইলেও হিন্দী ও মারাঠির দুই সংস্করণ ঐ কয়দিনের মধ্যেই বাহির করিতে হইল। ইংরাজীও কয়েক হাজারের সংস্করণ সম্পূর্ণ

বিক্রী হইয়া গেল, কিছু আবার ছাপিতে হইল, তাহার সামান্য কয়েকখানি কপি পরবর্তীকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিল। এই পুস্তক দেখিয়া দিতে আমার যথেষ্ট সময় দিতে হইয়াছিল, ইহার জন্য একখানি ভূমিকাও লিখিয়া দিতে হয়।

এই জয়ন্তী উপলক্ষে কংগ্রেসের বিষয়ে ছোটখাটো আরও অনেক পুস্তক ছাপা হয়। একটিতে কংগ্রেসের গৃহীত সমস্ত প্রস্তাব একত্র করিয়া ছাপা হয়। আর একটিতে সব নয়, প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলি ছাপা হইয়াছিল। মান্দ্রাজের জি. এ. নটেশন্ কংগ্রেসের সভাপতিদের অভিভাষণ-গুলি একত্র করিয়া প্রথমেই ছাপিয়াছিলেন। তিনি উহা ১৯৩৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। এই প্রকারে এ বৎসর কংগ্রেসের বিষয়ে সাহিত্য অনেক ছাপা হয় ও বিক্রয় হয়।

বর্ষার জলহাওয়া আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। এই বৎসরেও শরীর কিছু খারাপ ছিল। কিন্তু এমন কিছু কষ্ট হয় নাই। আমার কাজ বন্ধ হয় নাই। কাজও এক জায়গায় বসিয়া বেশির ভাগ করিতে হইয়াছিল। এইজন্য দৌড়ধাপে যে অনিয়ম হইত তাহা হয় নাই। আমি প্রথম হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে বর্ষার পর দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রা করিব। এই জন্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনটি প্রদেশে—তামিলনাদ, কেরল ও অন্ধ্রে—যাত্রার প্রোগ্রাম তৈরী করা হইয়াছিল। দশহরার পরে সেখানে যাত্রা করিব ভাবিয়াছিলাম। যাত্রা শুরু করিবার পূর্বে মান্দ্রাজে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন করা স্থির হয়। এক বিশেষ কারণে তাহা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

কংগ্রেসের নীতি প্রথম হইতে ইহাই ছিল যে দেশীয় রাজ্য ও এষ্টেটের ভিতরের ব্যাপারে তাহারা হস্তক্ষেপ করিবে না। প্রথমে যে কারণেই এই নীতি মানা হইয়া থাকুক এখন ইহার বিষয়ে অনেক মতভেদ হইতে থাকিল। রাজাদের ইচ্ছামতই সব কাজ চলে, কোথাও কোথাও পরামর্শদাতা মন্ত্রী ভাল হয়, প্রজাদের কিছু লাভও হয়, কিন্তু কোথাও রাজ্যশাসনে প্রজার কোনও অধিকার ছিল না। এই সমস্ত সামন্ত রাজার সংখ্যা ছয়-সাত শত হইবে। ইহাদের মধ্যে কয়েক বিঘা জমি ও কিছু লোকের বসতি আছে এমন ছোট রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার হাজার বর্গমাইল ও কোটী কোটী লোকের বসতি লইয়া বড় বড় রাজ্য পর্যন্ত আছে। তাঁহাদের অধিকারও এইভাবে ভিন্ন। বড় বড় রাজ্য আভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রায় স্বাধীন। তাহাদের নিজস্ব থানা, কাছারি, আদালত, পুলিশ প্রভৃতি আছে। যাহারা খুব ছোট তাহারা জমিদার বা জায়গীরদারদের সমান। ইহাদের মধ্য হইতে কয়েকটির সঙ্গে ব্রিটিশরাজের সম্বন্ধ চুক্তিপত্রে নির্দিষ্ট আছে, অনেকগুলি সম্বন্ধ আছে সনদের দ্বারা নির্ধারিত। আরম্ভে

যে সম্বন্ধই থাকুক, এখন তো ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট তাহাদের মাথায়। যদিও ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট তাহাদের কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে না, তথাপি ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বা অন্য কর্মচারী নিজের এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ দেওয়ান বা মন্ত্রী নির্বাচনে তাঁহাদের কথা খুবই চলে। এইরূপে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করেন।

কোনও দেশীয় রাজ্যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর কাজ হইতে পারে না। এ ছাড়া যখন কোনও রাজা বা নবাব ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে অসন্তুষ্ট করে, তা সে যে কারণেই হউক, তখন তাহার মঙ্গল হয় না। তাহাকে শীঘ্রই গদি ছাড়িতে হয়। তাহার জন্য কোনও না কোনও কারণ সহজেই সামনে আসিয়া পড়ে। এমনিতেই তো লোকে বলে যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নিজের হাতে অধিকার রাখিয়াছেন যে কোনও রাজা প্রজাদের উপর অত্যাচার করিলে, অথবা কু-শাসন করিলে, তাহাকে পদচ্যুত করা যায়। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে অসুখী করিলেই কু-শাসনের খোঁজ হয়, আর কু-শাসনের নামে রাজাকে পদচ্যুত করা হয়। যদি কু-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে কোনও রাজা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে খুশিও রাখিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর কোনও ভয় নাই, সে নিরঙ্কুশ! কিন্তু যদি কু-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রিটিশ-গভর্মেণ্টকেও অখুশি করে, তবে আর কোথাও তাহার কোনও আশ্রয় নাই। এইভাবে প্রতি বৎসরই প্রায় এক আধজন রাজাকে পদচ্যুত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতেও এই সব রাজের দাবি এই যে তাহারা শুধু ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গেই নিজের সম্বন্ধ রাখিবে, তাহারা যে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন! এই দাবি একেবারেই ফাঁপা, কারণ যখন ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাঁড় করাইতে হয়, তখন ব্রিটিশ সরকার তাহাদের সঙ্গে চুক্তিনামার দোহাই দেন; কিন্তু যখন উহাদের বিষয়ে সরকারের মনোমত ব্যবস্থা করিতে হয়, তখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়াই ফেলেন—তাহাদের বা তাহাদের প্রজাদের কথা একটাও শোনে না! ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ইঁহারা দাবি করেন যে নিজের রাজ্যের মধ্যে তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এইজন্য ইঁহারা নিজেদের এলাকায় প্রজাতন্ত্রের স্ফুরণ হইতে দিতে চান না।

ব্রিটিশ ভারতে পঞ্চাশ বৎসরের বেশি হইল রাজনৈতিক সভা হইতেছে; সেখানে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট জাগরণ হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে বাধ্য হইয়া ও ব্রিটিশ রাজনীতি প্রজাতন্ত্রাত্মক বলিয়া—ভারতের জন্যও প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করিবে বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া যে শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে, তাহা ভারতকে সেই দিকেই লইয়া যাইতেছে। আমরা যতদূর যাইতে চাই ততদূর পর্যন্ত উহা যে আমা-

দিগকে পেঁাছিতে দেয় না, সে কথা আলাদা। তাহা হইলেও এখানকার শাসনতন্ত্রের দৃষ্টি যে সেই দিকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য, দুইটি এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া আছে যে তাহাদের মধ্যে সাধারণত কেহ প্রভেদ দেখিতে পারে না। প্রভেদ আছে শাসন পদ্ধতির মধ্যে, জনসাধারণের মধ্যে নাই। সীমানার একদিকে যাহারা বাস করে, অন্য দিকেও তাহারাই বাস করে; একই কথা বলে; একই ধর্ম মানে; একই সংস্কৃতি পালন করে; নিজেদের মধ্যে লেন-দেন ও বিয়ে-সাদিও করে। কিন্তু শাসনপ্রণালীতে অনেক পার্থক্য পড়িয়া যায়। এইজন্য যখন ব্রিটিশ ভারতে জাগরণ হইল, তখন তাহার প্রভাব দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের উপর না পড়িয়া থাকিতে পারিল না। সেই সকল প্রজাদের মধ্যেও রাজ্য শাসনে স্বাধিকার পাইবার ইচ্ছা ও অভিলাষ উৎপন্ন হইল। সেখানকার অত্যাচারী রাজশক্তির জন্য এই স্বাধিকারের প্রয়োজনীয়তাও খুব অনুভব হইতে লাগিল। সেখানেও লোকেরা কিছু কিছু সংস্থা গঠন আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারাও ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাগ লইতে লাগিল। এইভাবে তাহারা এদিককার মতবাদ নিজেদের সঙ্গে নিজেদের রাজ্যের ভিতরে লইয়া চলিল। তাই কংগ্রেসের পুরানো নীতি যে দেশীয় রাজ্যের ভিতরের ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহা লোককে বিঁধিতে লাগিল।

১৯২০-এর ডিসেম্বরে, নাগপুর কংগ্রেসের সময়, কংগ্রেস যখন নূতনভাবে তাহার গঠননীতি প্রস্তুত করে, এবং ভাষা অনুসারে কংগ্রেসী প্রদেশ সংগঠিত করে, তখন তাহা দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে নিকটস্থ ব্রিটিশ-ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশের কমিটিতে যোগ দিবার অধিকার দেয়। এই প্রকারে গুজরাতী ভাষা যেখানে যেখানে চলে, সেই সকল দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে গুজরাত-প্রাদেশিক-কংগ্রেস কমিটির অধীনস্থ কমিটিগুলির সভ্য হইবার ও নির্বাচিত করিবার অধিকার দেওয়া হইল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জন্য অথবা কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য গুজরাত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ততগুলি সদস্য বা প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার পাইল, যতগুলি ব্রিটিশ গুজরাত ও রাজন্যদের গুজরাতের (কাঠিওয়াড়) অধিবাসীদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য ছিল অর্থাৎ শুধু ব্রিটিশ গুজরাতের অধিবাসীদেরই গুজরাতের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই, তাহার সঙ্গে রাজন্যদের গুজরাতের অধিবাসীদেরও যোগ দেওয়া হয়, যেখানে গুজরাতি কথা বলা হয় তেমন সব জায়গায়। এইরূপে আজমীর একটি ক্ষুদ্র স্থান, ব্রিটিশ সরকারের ভিতরে। কংগ্রেসের গঠন-তন্ত্রে তাহাও এক প্রদেশ, তাহার অধিবাসী শুধু ঐ ছোট জায়গাটির অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই, বরং তাহার সঙ্গে সমগ্র রাজপুতানার

অধিবাসীদেরও জুড়িয়া দেওয়া হয়, সেই জন্য আজমীরের অনেক বেশি প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার লাভ হইল।

এই নিয়মের অর্থ ও কারণ তো এই যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যদের ভিতর কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করিতে চাহে নাই; কারণ ঐরূপ করিলে, সেখানকার শাসন ব্যাপারে কোনও কথায় মতভেদ হইলে, অথবা তাহারা কংগ্রেস কমিটিগুলি স্থাপিত হইতে দেওয়া পছন্দ না করিলে, তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হইতে পারে; কংগ্রেস ইহা পছন্দ করিত না। দেশীয় রাজ্যদের প্রজাসাধারণ মধ্যে জাগরণ আরম্ভ হইলে তাহাদের দিক হইতে কংগ্রেসের নিকট দাবি করা হইল যে কংগ্রেস তাহার নীতি বদল করিয়া প্রজাতন্ত্রের জন্য সামন্তরাজ্যদের মধ্যেও ব্রিটিশ ভারতের মতই চেষ্টা করুক। তাহাদের এ দাবি ছিল ন্যায্য; কারণ উভয় ক্ষেত্রেই জনসাধারণের মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না, কংগ্রেসের পক্ষে দুইটিতে প্রভেদ করা ঠিক হইত না। কংগ্রেস দুইটির মধ্যে তফাৎ করিতে চাহিতও না, কিন্তু উহা এই ঝগড়াকেও হাতে লইয়া নিজের বাধা বিপত্তি বাড়াইয়া তুলিতে চাহে নাই। ইহাও কংগ্রেস স্বীকার করিত যে আমরা যদি ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শক্তির সঙ্গে কিছু একটা করিয়া লইয়া এখানে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যেও তাহা সহজে হইতে পারিবে; কারণ তাহারাও ব্রিটিশ শক্তির উপরই অনেকটা নির্ভর করিতে পারে। এ-সব সত্ত্বেও এদিকে কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য হইতেছিল। ইহার কয়েকটা কারণ ছিল।

গোলটেবিল কনফারেন্সে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদেরও ডাকা হইয়াছিল। সেখানে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়েরই সমাবেশ ছিল। উভয়ের জন্য একই শাসনতন্ত্র গঠন তখনই আরম্ভ করা যাইতে পারে, যখন গোলটেবিলে উপস্থিত রাজারা অনুমোদন করিলেন যদি সন্তোষপ্রদ গঠনতন্ত্র তৈরী করা যায় ও তাঁহাদের স্বত্ব যদি তাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাও ঐ গঠনতন্ত্রের ভিতর নিজের নিজের রাজ্যকে আনিতে পারিবেন। ১৯৩৫-এর গঠনতন্ত্রে যে কেন্দ্রীয় পরিষৎ গড়িয়া উঠিবার কথা ছিল, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি ব্রিটিশ ভারতের আর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি দেশীয় রাজ্যদের রাখিবার কথা ছিল। কিন্তু ইহাতে এক খুব বেশি প্রভেদ হইবে যে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি তো সেখানকার প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে; কিন্তু দেশীয় রাজ্যদের প্রতিনিধির নাম সেখানকার রাজাদের দ্বারা স্থির করা হইবে! এই কথা সেখানকার প্রজাদের তো পীড়াই দিতেছিল। আমাদের সকলেরও খুব খারাপ লাগিতেছিল; কারণ আমরা বুঝিতে-

ছিলাম যে এইভাবে ব্রিটিশ সরকার মুখের কথায় কেন্দ্রীয় পরিষৎকে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের নিয়োগে, রেসিডেন্টের মারফৎ, তাহা পুরাপুরি হাত দিতে পারিবে। ইহাও ছিল এক বিশেষ কারণ যাহার জন্য কংগ্রেসের উপর বেশি জোর দিতে আরম্ভ করা হইল, এখন দেশীয় রাজন্যবর্গের ভিতরেও কংগ্রেস সেই ধরনের কাজ করে তাহা ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে জনসংগঠনের কাজ যেমনভাবে করে।

দেশীয় রাজাদের মধ্যে কোথাও কোথাও শাসকেরা আধুনিক আব-হাওয়ায় প্রভাবান্বিত হইয়া কিছু কিছু সংস্কার করিয়াছেন, কোথাও কোথাও শুধু নামের জন্য অনেক কম অধিকার দিয়া ব্যবস্থাপক সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও এ পর্যন্ত অতখানি অধিকার লাভ হয় নাই ব্রিটিশ ভারতে ১৯২০ সালের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রদেশেরা যতখানি পাইয়াছিল। কিন্তু কোথাও কোথাও—যেমন বরোদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে—শিক্ষা বিষয়ে অন্য কিছু এমন সব সংস্কার হইল যাহা কোনও কোনও ব্যাপারে ব্রিটিশরাজ্যের অপেক্ষাও অগ্রসর। কিন্তু প্রজাদের শাসনাধিকার এ পর্যন্ত সেখানেও পাওয়া যায় নাই। এই ধরনের সংস্কারও এখন পর্যন্ত সামান্য কিছু রাজ্যেই হইতে পারিয়াছে। অনেক স্থানে প্রজাদের মধ্যে জাগরণ হইতেছে। ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় কয়েকটি রাজ্যের অবস্থা দেখিয়া সমস্ত রাজ্যের প্রজা নিজের নিজের দেশেও সংস্কার চাহিতেছে।

১৯৩০—১৯৩৪-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা অনেক জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যায় যোগ দিয়াছিল। গুজরাতীরা ও মারোয়াড়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব অগ্রসর। তাহারা বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে ব্যবসার জন্য যায়। সে সব জায়গায় যে আন্দোলন বাড়িয়া উঠিল তাহা হইতে তাহারা নিজেদের সরাইয়া রাখিতে পারিল না। যখন কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মত শহরের গুজরাতী ও মারোয়াড়ী লোকেরা সেখানকার সত্যাগ্রহে যোগদান করিল, তখন তাহারা নিজেদের রাজ্যেও স্বভাবত আন্দোলনকে সেইসব অধিকারের জন্য চালাইতে চাহিল, যাহাদের জন্য তাহারা কংগ্রেসে যোগ দিয়া ব্রিটিশ ভারতে লড়িয়াছিল। এইভাবে কংগ্রেসের ভিতরে বিশেষ এক বড় দল তৈয়ার হইয়া গেল যাহা কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন করিতে চাহিত। কংগ্রেসের ভিতরে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে এরূপ ছিলেন যে ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে চাহিতেন না। তাই বোম্বাই কংগ্রেসের সময়েই এই কথা উঠানো গেল যে কংগ্রেসের নীতি বদলানো হউক।

স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর জন্ম এক দেশীয় রাজ্যে হইয়াছিল। তিনি

কাঠিয়াবাড়ের রাজ্যগুলিতে সুপরিচিত। ব্রিটিশ-গুজরাত শুধু যে দেশীয় রাজ্যগুলি দিয়া ঘেরা তাহা নয়, মাঝে মাঝে উভয়ের গ্রাম পরস্পরে এভাবে মিশিয়া আছে যে কোথায় ব্রিটিশ রাজ্য আর কোথায় কোনও দেশীয় রাজ্যের অধিকার তাহা বলা কঠিন। এই প্রকারে, তাঁহার ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের উভয়েরই দেশীয় সামন্তরাজ্যের অবস্থা সম্পূর্ণ জানা আছে। সেখানকার প্রজাদের সঙ্গেও তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। মহাত্মাজী ভাবিয়াছিলেন, যদি আমরা ব্রিটিশ-ভারত হইতে দেশীয় সামন্তরাজ্যে কাজ করিতে শুরু করি, তাহা হইলে সেখানে কাজ ঠিক মত হইতে পারিবে না; সেখানকার প্রজাদের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার সেই সুযোগও আসিবে না যাহাতে উহাতে আবশ্যক শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে। এইজন্য, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সঙ্গে যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি চান নাই যে কংগ্রেস ব্রিটিশ-ভারতে যেমন সামন্তরাজ্যেও তেমনি নিজের কাজ চালাইতে থাকে। হাঁ, সেখানকার প্রজারা এভাবের আন্দোলন অবশ্য করিতে পারে আর তাহার সঙ্গে কংগ্রেসের সহানুভূতি অবশ্যই আছে ও থাকিবে—সেই সহানুভূতি প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে সক্রিয় হইতে পারে ও হইবে; কিন্তু সেখানকার আন্দোলন ও সংগঠনের ভার কংগ্রেস নিজের উপর এখনও লইতে পারে না।

মহাত্মাজী নিজে এক মন্তব্যে এই মত প্রকাশিত করিয়া দেন। কিন্তু যাহারা দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের সোজাসুজি হস্তক্ষেপ চাহিয়াছিল তাহারা ইহাতে খুশি হইল না। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আমি এক বিবৃতি বাহির করিলাম, কিন্তু তাহাতেও লোকে খুশি হইল না। শেষকালে, ওয়ার্কিং কমিটিও এক বিবৃতি বাহির করিল। তাই মান্দ্রাজে নিখিল কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ইহাও এক কারণ ছিল যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব লইয়া আলোচনা চলিতে পারিবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, আর এই ঝগড়া কংগ্রেসের ভিতরে চলিতে থাকিল; হয়তো এখনও তাহা পুরাপুরি শেষ হয় নাই।

কিন্তু এই সকলের ফল যাহা হইল তাহা সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় ছিল, আর গান্ধীজীর নীতির উদ্দেশ্যও ছিল তাহাই। এখন রাজন্যদের এলাকার মধ্যে তাঁহাদের প্রজাগণ নিজেদের সংস্থা গঠন করিয়া লইয়াছে। অনেক রাজ্যে প্রজামণ্ডল বা অন্য কোনও নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। 'নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের প্রজামণ্ডল'ও গঠিত হইয়াছে। এইভাবে স্থানীয় লোকেরা নিজেদের আন্দোলন নিজেরাই চালাইতে আরম্ভ করে। কংগ্রেসও যেখানে প্রয়োজন হইবে নিশ্চয় তাহাদের সাহায্য করিবে। এই অবস্থায় আসিতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। ১৯৩৫-এ প্রচণ্ড তর্ক চলিতেছিল।

এইজন্য নীতি স্থির করিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন ছিল। এই মতভেদ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়েই ছিল। প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতির কথায় কংগ্রেসও তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ-ভারতের মত নিজের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। কংগ্রেস ইহা ঘোষণাও করিয়াছিলেন। রচনাত্মক কাজের সম্বন্ধেও কোনও মতভেদ ছিল না। কয়েকটি রাজ্যের ভিতর অস্পৃশ্যতা বর্জন, খাদি উৎপাদন ও প্রচার কয়েক বৎসর ধরিয়া খুব চলিতেছিল, ইহাতেও কোনও মতভেদ ছিল না।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ

আমি ওয়ার্ধা হইতে মান্দ্রাজ রওনা হইলাম। সেখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর দক্ষিণ ভারত যাত্রা আরম্ভ করিলাম। সেখানকার কার্যক্রমও সেইরূপই ছিল—সমস্ত দিন মোটরে চড়া, পথে জায়গায় জায়গায় বক্তৃতা দেওয়া, দুপুরে কোথাও খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য খানিকক্ষণ থামা, আবার রাত্রি নয়টা-দশটা পর্যন্ত ঐভাবে চলা। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কোন একটা বড় জায়গায় পৌঁছাইয়া সেখানে রাত্রে থাকিতাম, সন্ধ্যার পরেই সভা হইত।

দক্ষিণ ভারত যাওয়ার সময় ভাষার প্রশ্ন আসিয়া পড়িল। মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের প্রায় সব জায়গায় আমি হিন্দীতেই বক্তৃতা করিয়াছিলাম। কোথাও কোথাও, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও আমার বক্তৃতা অনুবাদ করিয়া দিতেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই হিন্দী দিয়াই কাজ চলিয়া যাইত। তবে তামিল দেশে অন্যকথা, সেখানে তো মান্দ্রাজ হইতেই আমাকে ইংরেজী বক্তৃতা করিতে হয়। আমি যাহা কিছু বলিতাম তাহার প্রত্যেক বাক্যের অনুবাদ স্থানীয় কোন ভদ্রলোক করিয়া দিতেন।

মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণাতে দক্ষিণ ভারতে হিন্দী প্রচারের কাজ ১৯১৮ সাল হইতেই চলিতেছিল। তামিল দেশেই হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। কোন বড় শহরে গেলে হিন্দী প্রচারকের সঙ্গে দেখা হইত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানকারই লোক, হিন্দী শিখিয়া লইয়াছে; কেহ কেহ উত্তর ভারতের লোক, বিহার অথবা যুক্তপ্রদেশ হইতে আসিয়া এই কাজে লাগিয়াছে। হিন্দীর প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রেম ও শ্রদ্ধা বর্ণনা করা যায় না। হিন্দী প্রচারের কাজ বিশেষ করিয়া লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যেই বেশি হইত। পুরুষদের

যেমন উৎসাহ, স্ত্রীলোকদেরও তেমনই। বালক ও বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ, একসঙ্গে হিন্দী পাঠশালায় শিক্ষা পাইত। আর একবার দক্ষিণে গিয়া দেখিলাম, একই সভায় পিতা ও পুত্র, মাতা ও কন্যা হিন্দী পরীক্ষা পাশের প্রমাণ-পত্র একসঙ্গেই পাইতেছে। এই কার্যপদ্ধতি এখনও চালু আছে। লক্ষ লক্ষ লোক হিন্দীর জ্ঞান পাইয়াছে। তাহা হইলেও হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়া এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই; কারণ হাজার হাজার উপস্থিত লোকের মধ্যে হিন্দী বুঝিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই হইত। হিন্দী জানে এরকম লোকের চেয়ে ইংরেজী জানে এরকম লোকের সংখ্যা কোথাও কোথাও বেশি হইত, তাহা হইলেও উপস্থিত জনতার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এইজন্য আমি ইংরেজীতেই বলি বা হিন্দীতেই বলি, সভায় উপস্থিত শতকরা নব্বইজন লোক না বুঝিত হিন্দী, না বুঝিত ইংরেজী, আর তাহাদের জন্য বক্তৃতার অনুবাদ সকল অবস্থাতেই প্রয়োজন হইত।

মান্দ্রাজের মত বড় শহরে ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা গাঁয়ের অপেক্ষা অনেক বেশি হইত কিন্তু সেখানেও ইংরেজী বক্তৃতা বুঝিবার লোক সংখ্যায় অল্পই হইবে।

হিন্দী জানা লোক, সংখ্যায় সামান্য ইংরেজী জানা লোকের সমানও ছিল না। কিন্তু ইহার চাইতে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার বড় কারণ ছিল এই যে ইংরেজী হইতে তামিলে অনুবাদ করিবার লোক সহজে সব জায়গায় পাওয়া যাইত; কিন্তু হিন্দী হইতে তামিলে অনুবাদ করিবার লোক পাওয়া কঠিন হইত। এইজন্য আমাকে তামিল ও কেরল দেশে বেশির ভাগ ইংরেজীতেই বক্তৃতা করিতে হয়। অনেকদিন হইতে ইংরেজী বেশি বলিবার অভ্যাস চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু দুই-চারিটি সভায় বলিবার পরেই আবার মুখ খুলিয়া গেল, এবং ভালভাবে বক্তৃতা করিতে পারিলাম।

আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করিলে ভাল হয়। মান্দ্রাজে 'হিন্দু' নামে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বহুদিনের ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইহার খুব বেশি বিক্রি। ছাপা ইত্যাদিও খুব সুন্দর। সম্পাদক ও সমাচার সংগ্রহও খুবই ভাল। ভারতবর্ষের ইংরেজীতে ছাপা ভারতীয় সমস্ত সংবাদপত্রের মধ্যে ইহাকে সবচেয়ে ভাল বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না। আমি সেখানে একথার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিলাম। যে-দিন মান্দ্রাজে পৌঁছিলাম সে-দিন তো স্টেশনে সকলে অভ্যর্থনা করিল। সেখানে এক ছোট-খাটো সভা হইয়া গেল—ছোট-খাটো, অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে যে-সব সভা হয় তাহাদের তুলনায়। তবু সেখানে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিল। আমাকে সেখানে সসম্মানে নামাইয়া লইয়া গেল। সেখানেই আমাকে সে-প্রদেশে সর্বপ্রথম কিছু বলিতে হইল। সেখান

হইতে মিছিল বাহির হইয়া শহরের কয়েক অংশ দিয়া ঘুরিয়া মৈলাপুরে গেল। সেখানে আমার থাকিবার কথা ছিল। পথে পড়িল 'হিন্দু'র অফিস। মিছিল যখন 'হিন্দু' অফিসের সামনে পৌঁছিল, 'হিন্দু'র এক সংখ্যা, যাহা তখনকার দিনে সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইত, আমার হাতে দেওয়া হইল। তাহাতে স্টেশনের অভ্যর্থনা বর্ণনা, সেখানকার দৃশ্যের চিত্র এবং নিজের বক্তৃতাও দেখিতে পাইলাম। যেখানে যেখানে যাই, 'হিন্দু'র সংবাদ-দাতাকে উপস্থিত দেখিতে পাইতাম। সে আমার সম্পূর্ণ বক্তৃতা, যাহা ইংরেজীতেই হইত, পুরাপুরি নিজেদের পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইত। এই প্রকারে তামিল ও কেরল প্রদেশে আমার বক্তৃতার যেরূপ পুরা ও ভাল রিপোর্ট ছাপা হয় আর কোথাও সেইরূপ হয় নাই। 'হিন্দু'র সংবাদদাতা সর্বত্র থাকিত। কোনও সংবাদদাতা আমার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইত, এমন নয়। স্থানীয় সংবাদদাতাও দ্রুতলিপি (shorthand) জানিত, ইংরেজীর ভাল জ্ঞান ছিল। আর নিজের কাজে এতখানি তৎপর ছিল যে মান্দ্রাজ হইতে কাহারও আমার সঙ্গে ঘুরিবার প্রয়োজন হয় নাই।

যেখানে যেখানে গিয়াছিলাম সব জায়গার নাম দেওয়া তো কঠিন। যদি বলি যে সমস্ত প্রদেশে এমন খুব কম তালুক বা শহর আছে যেখানে আমি যাই নাই, আর এক তালুক হইতে অন্য তালুকের পথে এমন খুব কমই প্রধান স্থান আছে যেখানে আমি অনেকক্ষণ থামি নাই, তাহা হইলে বেশি বলা হইবে না। এই ভ্রমণেও প্রায় সমস্ত রাস্তা মোটরেই কাটিল। কোথাও কোথাও এমন হইল যে এক রাস্তার উপর দুইবার যাইতে হইল। তখন একদিক দিয়া রেলে চড়িয়া ঘুরিয়াছি।

উপরে বলিয়াছি যে মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের ঝগড়া, খানিকটা উত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলমানের অথবা বিহারে বাঙ্গালী-বিহারীর ঝগড়ার মতো। জাস্টিস পার্টি অব্রাহ্মণের দল। সেখানে আমি যাওয়ার এক বৎসর পূর্বেই উহা কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসের নিকট হারিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রভাব তো এখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। এইজন্য কোথাও কোথাও এই ভাবের কথাবার্তা চলিত যে লোকে মনে করিত কংগ্রেস বুঝি ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠান। আমি কত জায়গায় পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছি, কংগ্রেসে সকলের জন্য স্থান আছে, আজও ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেক অব্রাহ্মণ আছেন। উদাহরণস্বরূপ মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী ও নিজের নামও করিলাম। দেখিয়াছি, যে কারণেই হউক এই ধরনের প্রচারের খারাপ ফল হইল এই যে, কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠানও লোকের মধ্যে সন্দেহস্থল হইয়াছে।

কিন্তু ইহার চেয়েও মজার জিনিস কোথাও কোথাও নজরে পড়িল। ওদেশে একদল অব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিল, নিজেদের তাঁহারা স্বাভিমানী (self-

respecting) দল বলিত। কোথাও কোথাও অভ্যর্থনার সময়ে সেই দলের তরফ হইতে কালো পতাকা দেখাইত, আর 'গো ব্যাক্', 'ফিরিয়া যাও' বলিয়া চিৎকার করিত। কিন্তু এই দল সংখ্যায় এতই কম ছিল যে তাহাতে আর কোনও ফল হইত না, শুধু কৌতুকেরই সৃষ্টি হইত। মনে আছে, এক সভায় কয়েকজন লোক মিলিয়া 'গো ব্যাক' চিৎকার করিয়া গোল করিতেছিল। আমি হাসিয়া সবাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কয়জন লোক চায় যে আমি ফিরিয়া যাই, আর কয়জনই বা চায় যে আমি না যাই। লোকেরা হাত উঠাইয়া নিজের নিজের মত জানাইলে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, যাহারা 'গো ব্যাক' বলিয়া চিৎকার করিতেছিল তাহাদের সংখ্যা বড়ই কম। আমি এই প্রশ্ন দিয়া বক্তৃতা শুরু করিলাম—এতজন লোক চান যে আমি না যাই, আর এই কয়জন লোক চান যে আমি যাই; এই অবস্থায় আমি কি করিব? আমি জিজ্ঞাসা করিতেই সমস্ত সভায় হাসির রোল উঠিল। লোকে এত হাসিতে আরম্ভ করিল যে যাহারা বলিতেছিল 'গো ব্যাক' তাহারাও হাসি সামলাইতে পারিল না, তাহারাও এই হাসিতে যোগ দিল। ইহার পর শান্তিতে সভা হইল।

অন্য এক জায়গায় রাত্রে সভা হইতেছিল। কয়েকজন গোল করিতে আরম্ভ করিল। প্রকাণ্ড সভা, আমি যেখানে ছিলাম, গোলমালের শব্দ সে-পর্যন্ত আসিতেছিল না। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাহাতে অস্থির হইল। পুলিশের লোকেরাও চটিয়া গেল। যাহারা গোলমাল করিতেছিল তাহাদের সংখ্যা বড় কম। পুলিশের লোকেরা তাহাদের ধরিয়া লইয়া নিকটের এক বাড়িতে তাহাদের বন্ধ করিয়া রাখিল। যতক্ষণ সভা চলিতেছিল ততক্ষণ ইহাদের বন্ধ করিয়াই রাখিল। পরে আমি এ-সংবাদ পাইলাম। তবে আমি দেখিতাম যে যাহারা কালো ঝাণ্ডা দেখাইবার জন্য আসিত তাহারাও খনিকক্ষণ ধরিয়া হৈ চৈ করিয়া বক্তৃতা হইতে আরম্ভ করিলে চুপ করিয়া যাইত এবং মন দিয়া বক্তৃতা শুনিত। মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া মিছিল ও অভ্যর্থনার সময়েই, তাহারা শক্তি ক্ষয় করিত, আমার বক্তৃতার সময়ে নয়।

তামিলনাড, কেরল ও অন্ধ্র প্রদেশে খুব জোর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। প্রচার কার্যও হইয়াছিল যথেষ্ট। সভার শেষে অন্ধ্র প্রদেশে আসিলাম। সেখানে নূতনত্বের মধ্যে আমার ভ্রমণের সময় সর্বদা হিন্দী প্রচার সভার শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সঙ্গে ছিলেন। তিনি অন্ধ্রদেশের অধিবাসী! কিন্তু তাঁহার হিন্দী জ্ঞান এত ভাল ছিল যে তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে কোনও হিন্দী ভাষীর সন্দেহই হইত না যে তিনি হিন্দী ভাষী নন। এইজন্য সেখানে আমার বক্তৃতার ভাষান্তরের প্রশ্ন খুব সহজেই সমাধান হইয়া গেল। তামিল অপেক্ষা অন্ধ্র প্রদেশে হিন্দী প্রচার হইয়াছিলও বেশি।

এখানে আমি ইহাও দেখিয়াছিলাম যে অনেক জায়গায় লোকে আমার বক্তৃতা হিন্দীতেই শুনিতে চায়। তাই অন্ধ্রদেশে কয়েক জায়গা বাদ দিয়া আমি হিন্দীতেই সর্বত্র বক্তৃতা করি। সত্যনারায়ণজীর মত অনুবাদক সঙ্গে ছিলেন। যতদূর বুঝিতে পারিতাম, আমার বক্তব্য বিষয় তিনি খুব সুন্দরভাবে তেলুগুতে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। ব্যাপারটা হইত এই যে সেখানেও শতকরা নব্বইজন এমন থাকিত যাহারা না জানিত হিন্দী না জানিত ইংরেজী; আমি ইংরেজীতেই বলি আর হিন্দীতেই বলি, সর্বদাই তাহাদের তেলুগু অনুবাদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত। তামিলনাডেও এই অবস্থা ছিল। কিন্তু অন্ধ্রে যে সামান্য কয়েকজন ইংরেজী-জানা লোক থাকিত, তাহারাও হয় হিন্দী বুঝিয়া লইত, অথবা তেলুগু অনুবাদের জন্য অপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। তামিলনাডে ইংরেজী-জানা লোক এতক্ষণ সবুর করিতে পারিত না।

এই ভ্রমণ হইতে বুঝিতে পারিলাম, হিন্দী প্রচার সভা কত বড় কাজ করিয়াছে, সে কাজ রাষ্ট্রগঠনে কতখানি সাহায্য করিয়াছে, ভবিষ্যতেই বা কতখানি সাহায্য করিবে। আরও একটা কথা দেখিতে পাইলাম। যেখানেই গিয়াছি, অল্প যে কয়েকজন মুসলমান আসিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে টুটা-ফুটা হিন্দী কিছু না কিছু বুঝিতে পারিত। তাহাদের ভাষা তো নিশ্চয় সেই জায়গারই ভাষা হইবে, কিন্তু জানি না কি উপায়ে তাহারা এমন কিছু কিছু কথা বুঝিত যাহা আমি বুঝিতাম। তাহা না হইত শুদ্ধ হিন্দী, না হইত ফারসী-মিশানো শুদ্ধ উর্দু। তাহা তো হইত এমন এক সরল ভাষা যাহা প্রত্যেক হিন্দীভাষী বুঝিতে পারে। এই ভাষাকে সেখানকার লোকে 'মুসলমানী' বলিত। ইহা হইতে অনুমান হয় যে মুসলমানেরাই ইহা উত্তর ভারত হইতে ঐদিকে লইয়া গিয়াছিল।

তামিলনাড ভ্রমণে আমি দুইটি স্থানের উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমি যখন তিরুবন্নমলয়ে পৌঁছিলাম, তখন জানিলাম রমণ মহর্ষি এখানে বাস করেন। যাত্রার ক্রম এত কড়া ছিল যে সেখানে বাস করিতে পারিলাম না, কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহাকে দর্শনমাত্র করিলাম। কিন্তু ইচ্ছা হইল যে সম্ভব হইলে কখনও গিয়া ভাল করিয়া দর্শন করিব। কয়েক দিন পরে শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারও আমাকে সেখানে যাইবার পরামর্শ দেন। তিনি নিজে সেখানে কয়েকবার গিয়াছিলেন, আর তাঁহার মনে খুব ভাল ধারণা হইয়াছিল। এইজন্য কয়েক বৎসর পরে একবার শেঠ যমুনালালজীর সঙ্গে আমি সেখানে গিয়াছিলাম। কয়েক দিন থাকিয়া মহর্ষিকে দর্শন করিলাম। আর একটি স্থান যাহার উল্লেখ করিতে চাই তাহা হইল চিদম্বরম্। এখানে অন্নামলয় বিশ্ববিদ্যালয় রাজা অন্নামলয় চেট্টিয়ারের দানে নির্মিত হইয়াছে। তখনকার দিনে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

ছিলেন এখানকার ভাইস-চ্যানসেলর। তিনি আমাকে লেখেন্ যে আমি যখন সেখানে যাইব তখন যেন তাঁহারই বাড়িতে উঠি। একথা আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। আমি দুই দিন তাঁহার অতিথি ছিলাম। এমনিতেই তো শাস্ত্রীজীর সঙ্গে আমার পূর্বের পরিচয় ছিল; তাঁহার সঙ্গে দুই-এক দিন থাকার সুযোগ কিন্তু এই প্রথম। ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

কেরল প্রদেশে আমি কোচিনেও গেলাম। সেখানে তাতাপুরমে তেলের বড় কারখানা দেখিলাম। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দুই-একটি স্থানই দেখিতে পারিলাম। এক তো কন্যাকুমারী। সেখানে গিয়া কিছু সময় কাটাইলাম। ভারতবর্ষের সবচেয়ে দক্ষিণের অন্তরীপ, যেখানে বঙ্গোপ-সাগর ও আরবসাগর মিশিয়াছে, সেখানে আছে ভারতবর্ষের পক্ষে ও পৃথিবীর পক্ষে এক বিশেষ মাহাত্ম্য। লোকে চেষ্টা ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর ভারতমাতাকে এক পে সুন্দরভাবে দেখাইতে; চিত্রে মাতার চরণ পড়ে ঐখানটায়। শুনিয়াছি, যখন স্বামী বিবেকানন্দ এই জায়গায় আসিয়া মাতার চরণে এখানকার শেষ প্রস্তর খণ্ড দেখিলেন, যে চরণ সমুদ্র সর্বদা নিজের ঢেউ দিয়া ধোয়াইয়া যাইতেছে, তখন তিনি স্বতই সেখানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মায়ের চরণে পড়িয়া গেলেন। ঐ স্থানে আমার চিন্তাও খানিকটা ঐ ধরনেরই হইল। আবার যখন আমি পড়িলাম যে কন্যাকুমারীর সামনে দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অন্য কোনও দ্বীপ বা জমির টুকরা পাওয়া যায় না, তখন এই চিন্তা আরও দৃঢ় হইল যে প্রকৃতি এখানে পৃথিবীকে এক প্রকার শেষ করিয়া দিয়াছে। জমি উত্তর মেরু হইতে সাইবিরিয়া, চীন, তিব্বত, হিমালয় হইয়া ভারতবর্ষ পার হইয়া এই কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। সেখানেই তাহার শেষ হইয়া যাইতেছে। তাহার দক্ষিণে শুধু জল আর জল, একেবারে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। উহা সত্যই আমাদের পক্ষে এক অতি সুন্দর, মনোহর, পবিত্র স্থান, এস্থান দেখিয়া কোনও ভারতবাসী ভারতবর্ষের একতা ও একসূত্রতা ভুলিতে পারে না।

কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে প্রায় জগন্নাথপুরী পর্যন্ত বরাবর মোটরে করিয়া ঘুরিয়াছি। এই তো হইল ভারতবর্ষের পূর্বাংশে সমুদ্রের ধারে ধারে ভ্রমণ। ঐরূপে, পশ্চিম তীরেও কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র ভ্রমণে, বাঙ্গালোর হইতে আরম্ভ করিয়া গুজরাত পর্যন্ত মোটরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। মাঝের শহরগুলিতেও সেখানকার প্রায় সব প্রধান প্রধান স্থান দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। অল্প সংখ্যক যে-সব স্থানে যাওয়া হয় নাই সে-সব স্থানে পরে গিয়াছিলাম। কেবল হায়দরাবাদের ভিতরের জায়গাগুলি বাদে, বিন্ধ্যের দক্ষিণে সমগ্র ভারত এইভাবে পুরাপুরি ঘুরিয়া আসিয়াছি।

কার্যক্রম এইভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে ডিসেম্বরের ২০/২১ তারিখ পর্যন্ত আমি প্রায় তিন মাসে ভ্রমণ শেষ করিয়া ওয়ার্ধায় আসিয়া পেঁীছাইব, সেখান হইতে বোম্বাই যাইব, বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের জয়ন্তী পালনের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে সবচেয়ে পরে বিশাখাপত্তনে পেঁীছিলাম। সেখান হইতে ট্রেণে চড়িয়া রায়পুরে আসি। রায়পুরে, পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লের আগ্রহে সেখানকার সেবা-সমিতির উৎসবে যোগ দিব বলিয়া প্রথম হইতেই কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই উৎসব দেখিয়া ওয়ার্ধা গিয়াছিলাম। ওয়ার্ধায় দুই-একদিন থাকিয়া বোম্বাই চলিয়া গেলাম।

কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী

কংগ্রেস জয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপী উৎসব পালনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রধান উৎসব বোম্বাইয়ে ঠিক সেই জায়গায় হইবার কথা ছিল, যেখানে ১৮৮৫ ডিসেম্বরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক কমিটি এই উৎসবের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন বোম্বাই পেঁীছিলাম, তখন জানিতে পারিলাম স্যর দিনশাওয়াচা অত্যন্ত অসুস্থ। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনিই হয়তো একমাত্র জীবিত ছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী হয়তো দুই-এক বৎসর পর হইতে কংগ্রেসে আসিতে শুরু করেন। স্যর দিনশাওয়াচা শুধু সবচেয়ে পুরানো কংগ্রেসীই ছিলেন না, তখন জীবিত কংগ্রেসের সভাপতিদের মধ্যেও সবচেয়ে বৃদ্ধ ছিলেন। এই-জন্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া উৎসবের আরম্ভ করা কর্তব্য মনে করিলাম। এদিকে কয়েক বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার সুগভীর মতভেদ হইয়া গিয়াছিল। তিনি কংগ্রেস হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইলেও কংগ্রেসের ইতিহাসের সঙ্গে যাহার পরিচয় আছে এমন কোনও ভারতীয় তাঁহার সেবার কথা ভুলিতে পারে না। তাঁহার প্রায় অচেতন অবস্থায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাও ছিল আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

জয়ন্তী উৎসব বোম্বাইয়ে সমারোহে সম্পন্ন হইল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শহরে উহা খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। লোকে আলো দিল, বড় বড় সভা করিল, কংগ্রেসের ইতিহাস লইয়া বক্তৃতা দিল। এক বিশেষ বিবৃতি বাহির করা হইয়াছিল, উহা পড়িয়া সর্বত্র লোকদের

বোঝানো হইল। আমি আর কোন জায়গার উৎসব তো দেখি নাই, তবে বর্ণনা পড়িয়াছি। পাটনায় ফিরিবার পর পাটনায় যে-ভাবে উৎসব সম্পন্ন করা হইয়াছিল তাহা সঙ্গীদের নিকট শুনিতে পাইলাম। হয়তো ইহার পূর্বে এই ধরনের উৎসব কখনও সমস্ত দেশে লোকেরা এত উৎসাহ করিয়া পালন করে নাই। সে বৎসর ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার জন্য রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। লোকের মনে হয়তো এমন একটা প্রতিযোগিতার ভাব ছিল যে কংগ্রেসের জয়ন্তীও জাঁকজমকে পালন করা হউক। তাঁহাদের এই চিন্তা উৎসব উপলক্ষে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল।

এবারকার ভ্রমণে আমার বক্তৃতার লক্ষ্য ও তাৎপর্য একই ছিল—কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় করিতে হইবে। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এই ভ্রমণের প্রভাব ভালই হইয়াছিল; কারণ লোকের ইচ্ছা ছিল যে, ১৯৩০—১৯৩৪-এর সত্যাগ্রহের পরে যখন গভর্ণমেণ্ট নিজেদের জ্ঞাতসারে কংগ্রেসকে খুব নিপীড়ন করিয়াছিল তাহাদের ইহা দেখাইবার সুযোগ হয় যে তখনও কংগ্রেসের প্রতি লোকের সেই প্রেম ও শ্রদ্ধা আছে। আমি যতদিন সভাপতি ছিলাম ততদিন এইভাবে খুব দৌড়ধাপ করিয়া কাটাইলাম। আমার পূর্বে অন্য কোনও সভাপতি এত দীর্ঘ ভ্রমণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। আমার পরেই পণ্ডিত জওয়াহরলালজী যখন দ্বিতীয় বার সভাপতি হইলেন, তখন তিনি এই ক্রমকে চালু রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক শক্তি অধিক ছিল বলিয়া তিনি ইহার চেয়েও বেশি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৯২৯ ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেসের অধিবেশন ফেব্রুয়ারি বা মার্চে করা হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে করাচির অধিবেশন ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে না হইয়া ১৯৩১-এর মার্চেই হইবার কথা ছিল। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। এইজন্য তখন অধিবেশন হইতে পারে নাই। কিন্তু নিয়ম মত উহা ১৯৩১-এর মার্চেই হইবার কথা ছিল, আর উহা করাচিতে হইলও বটে। ১৯৩২-৩৩-এ সত্যাগ্রহের জন্য নিয়মিত অধিবেশন হয় নাই। কিন্তু পুলিশের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কলিকাতায় ও দিল্লীতে লাঠির ঘায়ের মধ্যে অধিবেশন হইয়াছিল। ১৯৩৪-এ নির্দিষ্ট অধিবেশন হইল, কিন্তু মার্চে নয়। কারণ কংগ্রেস তখন ছিল বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। এই অধিবেশন অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে হইল। ১৯৩৫-এর মার্চে যদি অধিবেশন হইত, তবে উহা পরবর্তী অধিবেশনের পাঁচ মাস পরেই ডাকিতে হইত। এইজন্য স্থির করা হইল যে ১৯৩৫-এর পরেই অধিবেশন করা হইবে—১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারি বা মার্চে। পণ্ডিত জওয়াহরলালজী বোম্বাই অধিবেশনের সময় জেলে ছিলেন। জেল হইতে

মুক্তি পাইলে শ্রীমতী কমলা নেহরুর পীড়ার জন্য তিনি তাঁহার কাছে ইউরোপে চলিয়া গেলেন। সেখানে কমলা দেবীর দেহান্ত হয়। পণ্ডিত জওয়াহরলালজীকেই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা হইল। এইজন্য তিনি ফিরিয়া আসিলে, ও তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পর তিনি দেশের অবস্থা বুঝিয়া গেলেই অধিবেশন হইতে পারিত। এইজন্য দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ১৯৩৬-এর এপ্রিলে লখনউএ। ১৯৩৫-এর শেষ পর্যন্ত আমি ভ্রমণ ও জয়ন্তী উৎসবে ব্যস্ত ছিলাম। তাহার পর ঠান্ডা লাগিয়া খানিকটা অসুস্থও হইয়া পড়িলাম। কিছু বিশ্রাম করিয়া লওয়াও প্রয়োজন ছিল। এইজন্য বেশি দীর্ঘ ভ্রমণ করিতে পারি নাই।

যে-দিন পণ্ডিত জওয়াহরলালজী ইউরোপ হইতে কমলা দেবীর 'ফুল' লইয়া উড়ো জাহাজ হইতে নামিলেন, সে-দিন আমি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রয়াগে গেলাম। উহা ছিল শোকের দিন; কারণ কমলা দেবীর মত নিপুণ-কর্মী ও দেশের প্রতি ভক্তিমতী নারী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর তাঁহার বিদেশে মৃত্যু ও জওয়াহরলালজীর তাঁহার ভস্ম লইয়া ফিরিয়া আসা—সবই উত্তরোত্তর দুঃখ বৃদ্ধি করিবার হেতু। ত্রিবেণী সংগমে খুব সমারোহ করিয়া তাঁহার অস্থি-বিসর্জন করা হইল। ইহার পর হইতেই লখনউ কংগ্রেসের আয়োজন চলিতে লাগিল।

জওয়াহরলালজীর সভাপতিত্ব লইয়া একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের এক অলিখিত নিয়ম মানা হইত যে, যে-প্রদেশেই বাৎসরিক অধিবেশন হউক, সেই প্রদেশের লোক সভাপতি হইতে পারিতেন না। জওয়াহরলালজী শুধু যুক্তপ্রদেশের লোক নহেন, সেখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রধান বা সভাপতি, অন্ততঃ প্রধান কর্মী তো অবশ্যই ছিলেন। এইজন্য কোনও কোনও লোক একটা কথা উঠাইল যে তিনি সভাপতি হইতে পারিবেন কি না। কিন্তু গান্ধীজী রায় দিলেন, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে এমন কোনও কথা নাই, আর তাহার কোনও প্রয়োজনও নাই; এইজন্য পণ্ডিতজীকে সভাপতি নির্বাচন করায় কোন বাধা উপস্থিত হওয়া উচিত নয়।

লখনউ অধিবেশনের পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক দিল্লীতে হইয়াছিল, তাহাতে মহাত্মাজীও আসিয়াছিলেন। জওয়াহরলালজী অনেক দিন বাদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বিলাত যাওয়ার পূর্বেও অনেক দিন জেলে ছিলেন। এইজন্য তাঁহারও ইচ্ছা ছিল আর কথাটাও সংগত যে কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছু পূর্বেই, ভাবী সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে পরিচয় করেন এবং অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় লইয়াও মতের আদান-প্রদান করেন। জওয়াহরলালজীর মত প্রথম হইতেই সাম্যবাদের পক্ষে ছিল, আর ইউরোপ যাত্রার পরে তাঁহার মত আরও দৃঢ় হইয়াছিল। আমরা সকলে উহা বেশী বুঝিতামও না, মানিতামও না। দেশে কংগ্রেসের ভিতরে সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম হইয়াই গিয়াছিল। পণ্ডিতজী যদিও ঐ পার্টিতে যোগ দেন নাই, তথাপি অনেক বিষয়ে একমত হওয়ার জন্য তাঁহার কথা ঐ পার্টির কথার সঙ্গে মিলিয়া যাইত। দিল্লীর বৈঠকে দেখিয়াছি, কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে। এই মতভেদ দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া যতখানি, কার্যত ততখানি নহে। আমরা দুইজন যদি কোনও কার্যক্রম লইয়া একমতও হইতাম, তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্তে আমরা দুই ভিন্ন পথ দিয়া গিয়া পেঁৗছিতাম। যদি এক কথাই বলিতে চাহিতাম তবে উহা বলিতাম দুই প্রকার ভাষায়। যদি একই রাস্তায় চলিতে চাহিতাম, তাহা হইলে চাহিতাম দুই প্রকার যানবাহনে চড়িতে। যদি একই প্রস্তাব করিতে চাহিতাম, তাহা হইলে তাহার পৃথক পৃথক ভূমিকা রচনা করিতাম। এখানে এতটা ভূমিকা করা প্রয়োজন; কারণ পরে গিয়া ঐ মতভেদ প্রকাশ পাইল, আর লখনউ কংগ্রেসে তো উহা সর্বপ্রকারে স্পষ্ট হইয়া গেল।

লখনউ অধিবেশনের কয়েক দিন পূর্বে প্রয়াগে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছিল যে ওয়ার্কিং কমিটিতে কংগ্রেসের জন্য প্রস্তাব প্রস্তুত করিতে অনেকটা সময় লাগিয়া যায়। শুরুতে তো আমরা ঢিলাভাবে কাজ করিতাম, ছোটখাটো কথা লইয়াও অনেক সময় লাগাইতাম; কিন্তু যখন বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকের সময় আসিয়া যাইত তখন তাহার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তাব রচনা করিতে হইত। ফলে সময়মত সকল প্রস্তাব তৈয়ার হইতে পারিত না, অথবা ঠিক সময়ে ছাপিয়া সদস্যদের মধ্যে বিলি করা যাইত না, এবং তাঁহাদের এবিষয়ে অভিযোগ থাকিয়াই যাইত। তাই লখনউ কংগ্রেসের কিছু পূর্বে ভাবা গিয়াছিল যে ওয়ার্কিং

কমিটির বৈঠক কিছু পূর্বেই হউক, এবং প্রস্তাবগুলি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশিত করা যাক, অথবা ছাপাইয়া লওয়া হউক, যাহাতে বিষয়-নির্বাচনী সভায় তাড়াতাড়ি না করিতে হয়। অবশ্য যদি কোনও নূতন কথা ওঠে অথবা এমন কোনও বিষয় উপস্থিত হয় যাহা লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তখনও উহা লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। তাই, যদিও নিয়মাবলীর মধ্যে এমন কোনও কথা ছিল না, তথাপি এই বৈঠক কয়েক দিন পূর্বেই করা হইয়াছিল। সেখানেই কিছু কিছু প্রস্তাব তৈরী করা হইল, আর কিছু রাখিয়া দেওয়া হইল লখনউ-এর জন্য।

উপরে তো বলিয়াছি, লখনউ অধিবেশনে মতভেদ ছিল। যদি কেহ একথা জিজ্ঞাসা করে যে কোন বিষয়ে মতভেদ, তাহা হইলে হয়তো সেদিক দিয়া তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন; কিন্তু উপরে যেমন বলিয়াছি, মতভেদ বেশির ভাগ ছিল দৃষ্টিভঙ্গীর। বলা হইয়াছে যে বোম্বাই কংগ্রেসের সময়ে শাসন-সংস্কার সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব জানা গিয়াছিল, যদিও এখন তাহা পুরাপুরি আইন করা হয় নাই, বিধিবদ্ধ হয় নাই। বোম্বাই কংগ্রেস তাহা নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছিল, গ্রহণ করে নাই। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়ে আমাকে ইহা লইয়া প্রশ্ন করা হইত—বিশেষত নূতন শাসন অনুসারে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে কি না। কংগ্রেসের মধ্যে এক দল গড়িয়া উঠিয়াছিল যাঁহারা বলিত কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা চাই; অন্য দল ছিল ইহার বিরুদ্ধে। সোস্যালিস্টেরাই ছিল বিরোধী দলে সবচেয়ে মুখর। কংগ্রেস যদিও শাসন-যন্ত্র নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছিল তথাপি সেই অস্বীকারকে কিভাবে প্রকাশ করিবে তাহা স্থির করে নাই। কংগ্রেস অস্বীকার করিল বলিয়া সেই আইন তো বন্ধ হইল না। এইজন্য, সেই আইন অনুসারে যে নির্বাচন হইবে তাহাতে কংগ্রেস যোগ দিবে কি না সেই ভাবে নির্বাচন বর্জন করিবে, যেভাবে ১৯২০ সালের নির্বাচন বর্জন করিয়াছিল? যদি নির্বাচনে যোগ দেয় তাহা হইলে নির্বাচনের পরে কি করিবে? যদি কংগ্রেসের ভোটাধিক্য হয়, তবে সে অবস্থায় কংগ্রেস নিজে মন্ত্রিদল না গড়িয়া অন্য কাহাকেও মন্ত্রিত্ব লইতে দিবে না কি? অথবা, অন্য কোনও প্রকারে বিরোধী নীতির সাহায্যে ঐ শাসনতন্ত্রকে ব্যর্থ করিবে? তাহার নীতি সফল হইবে কি না তাহা বেশির ভাগ নির্ভর করিত তাহার সভ্যদের ভোটে জিতিয়া নির্বাচিত হইলে; এইজন্য নির্বাচনের পূর্বে কোনও স্থিররূপে মীমাংসা করা সম্ভবও ছিল না উচিতও হইত না। তাই আমাকে কেহ প্রশ্ন করিলে আমাকে ইহাই বলিতে হইত যে কংগ্রেস এই শাসনবিধান নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে-নামঞ্জুরী কিভাবে কার্যে পরিণত হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, সময় আসিলেই স্থির করা যাইবে। লোকে এই উত্তরের নানাপ্রকার অর্থ বাহির করিত।

কিন্তু কথা তো ইহাই ছিল যে কংগ্রেস এপর্যন্ত ইহার চেয়ে বেশি কিছু স্থির করে নাই। যদি আমি সভাপতিরূপে কিছু বলিয়া দিতাম তাহা হইলে এখন হইতে নিজেদের মধ্যে মতভেদ ইহা লইয়া রূপ ধারণ করিত—দিন-রাত ইহা লইয়াই তর্ক চলিত।

আর একটি প্রশ্ন সম্বন্ধে মতান্তর মূলগত না হইলেও তাহা যখন-তখন সামনে আসিয়া উপস্থিত হইত। ইউরোপে যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়া তাহা দখল করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ইংলণ্ড উপর হইতে হয়তো ইতালির ঐ কার্যকলাপ অপছন্দ করে বলিয়া বলিত, অথবা ইংলণ্ডের কেহ কেহ ইহার নিন্দা করিত। কিন্তু সত্য সত্যই এই কথা লইয়া সে ইতালির সঙ্গে ঝগড়া করিতে যায় নাই। রাষ্ট্রসংঘ আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতি দেখাইল, কিন্তু তাহার বেশি কিছু করিল না। কিছুকাল ধরিয়া ইংলণ্ড ইতালির উপর অর্থনৈতিক চাপ দিতেও চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাও এমন কিছু নয়। ভারতবর্ষ কোনও যুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য করিবে না এরূপ কোন প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতিও দেখাই, আমাদের কংগ্রেসের সোস্যালিস্টরা তাহাই চাহিতেছিল। নিপীড়িত দেশের সহিত সহানুভূতির প্রশ্ন যতদূর চলে, তাহার মধ্যে কোন প্রকারের মতভেদ ছিল না; কিন্তু অন্য দিক দিয়া এই প্রকার আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিজের মত দিয়া দেওয়া আমি কংগ্রেসের পক্ষে অসঙ্গত মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে আমি ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে সাহায্য করিবার পক্ষে ছিলাম। এইজন্য যদি এইরূপ বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে হইত, তাহা হইলে আমি শুধু সহানুভূতির কথাই লিখিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষের লোকেরা সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিরোধী মতও দেখাইতে চাহিত।

যাহা হউক, পণ্ডিত জওয়াহরলালজীর মত আমাদের মতের সঙ্গে মিলিত না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমরা স্বীকার করিতাম যে তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানিতেন ও তাঁহার মতামতকে আমরা খুব মূল্য দিতাম। এইজন্য তাঁহারই কথা মানিয়া লইতাম। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত স্পষ্ট ছিল। তিনি মন্ত্রিত্বে কংগ্রেসের যোগদান পছন্দ করিতেন না। আমরা এ পর্যন্ত নিজেদের মত স্থির করি নাই। যে পর্যন্ত আমাদের সংখ্যা ও শক্তি ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারি সে পর্যন্ত আমরা সত্য সত্যই এ প্রশ্ন উঠাইতে চাহি নাই। জওয়াহরলালজী নিজের মত প্রকাশ করিয়া দিলেন—যদিও সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিলেন যে উহা তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত মত, কংগ্রেস এ পর্যন্ত কিছু স্থির করে নাই।

কোন্ কথা লইয়া লখনউয়ে মতভেদ হইল, আজ তাহা বলা মুস্কিল।

কিন্তু এ-কথা ঠিক যে কতকগুলি ব্যাপারে মতভেদ হয় আর কমিটিতে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের পক্ষে ভোট হয়। কিন্তু উপরে যেমন বলিয়াছি, সে-সব কিছু মূলগত কথা নয়। যাহার জন্য আমাদের উভয় পক্ষের পৃথক হইয়া যাওয়া অনিবার্য ছিল—যেমন গয়ায় স্বরাজ্য পার্টি ও অপরিবর্তন-বাদীদের (no-changer) হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া কার্যক্রমে কোনও মূলগত ভেদ ছিল না। আমরা জওয়াহরলালজীর কার্যদক্ষতা, ত্যাগ, পরিশ্রম ও চিন্তার গভীরতা দেখিয়া লজ্জা পাইতাম, তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাওয়া আমরা কখনও কোনও প্রকারেই পছন্দ করিতাম না। তিনিও মনে করিতেন, প্রদেশের মধ্যে কাজ করিবার পক্ষে ও প্রভাব স্থাপন করিবার পক্ষে হয়তো আমরা বেশি প্রবল। সেই জন্য তিনিও আমাদের পৃথক করিয়া দিতে বা আমাদের হইতে পৃথক হইতে চাহিতেন না। কথাটা ছিল এই যে, দুই পক্ষ পরস্পরকে পুরাপুরি সম্মানের চোখে দেখিতেন, জানিতেন যে নিজেদের মধ্যে ভেদ হওয়া দেশের পক্ষে হিতকর হইবে না। হয়তো আমরা বুঝিয়াছিলাম যে একে অন্যের ত্রুটি পূরণ করিতেছি। আমরা ইহাও বুঝিতাম যে আমাদের মধ্যে যতই মতান্তর হউক আমরা যে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব ইহা দেশ বরদাস্ত করিবে না। আমি এক জায়গায় কত কথাই না বলিয়া ফেলিলাম! ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, তখন দুইটি দল দানা বাঁধিয়াছিল। চিন্তাধারা দুইটি ছিল মাত্র—কেহ কাহাকেও দলভুক্ত করে নাই, নূতন মতান্তর তখনও এমন তীব্র হয় নাই যে আমাদের পক্ষে পৃথক হওয়ার কথা উঠে। এক দিক দিয়া এই চিন্তার পার্থক্যের ধারা ভিতরে ভিতরে তখন হইতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। গান্ধীজী অবশ্য সে-সময়ে লখনউ কংগ্রেসে আসিয়াছিলেন তো, কিন্তু তিনি এই তর্কে বেশি যোগ দেন নাই, আমরা যাহা কিছু করিয়াছিলাম নিজের বুদ্ধি অনুসারেই করিয়াছিলাম। পরে যখন এই জগদ্ব্যাপী মহাসমর বাধিল, তখন নানা বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গেও যে মতভেদ আছে তাহা জানা গেল।

কংগ্রেসের পরে যখন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবার সময় আসিল, তখন জওয়াহরলালজীর কিছু অসুবিধা অবশ্যই হইল। তিনি নূতন মতের লোকদের উহাতে লইতে চাহিলেন। আমরাও তাহার বিরুদ্ধে ছিলাম না; কিন্তু আমরা নিশ্চয় ইহা চাহিয়াছিলাম যে যদি আমরা ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকি তবে তাহার গঠন এরূপ হইবে যে আমাদের কথাও শোনা যায়। মহাত্মাজী এবিষয়ে জওয়াহরলালজীকে তাঁহার মত জানাইলেন যে তিনি যাহাদের উচিত মনে করেন, সমাজবাদীদের মধ্য হইতে ওয়ার্কিং কমিটিতে লইতে পারেন, হয়তো নামও তিনি বলিয়া দিয়া থাকিবেন। আমরাও ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম। ওয়ার্কিং কমিটি

গঠিত হইল, তাহাতে চলিল দুই প্রকারের চিন্তাধারা, যদিও তখনও কার্য-ক্রমে কোনও প্রভেদ হয় নাই। সমাজবাদীদের মধ্য হইতে মতভেদ যাহাই হউক তাহার জন্য কাজে অসুবিধা হইত না, কিন্তু তাহাদের প্রচাররীতি এমন কিছু ছিল যাহা আমাদের ভাল লাগিত না। অনেক ব্যাপারে, গান্ধীজী ১৯২০ সাল হইতেই যে নীতি চালাইয়াছিলেন তাহারা উহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরোধ করিত, আর আমাদের উপর তাহার এই ফল হইত যে তাহারা গান্ধীজী যে কার্যক্রম ও নীতি চালাইয়াছিলেন এবং যাহা লইয়া কংগ্রেস কাজ করিয়া আসিতেছিল ও দেশকে এতখানি আগে লইয়া গিয়াছিল উহারা তাহা সবটাই তছনছ করিতে চাহিত। যতদূর জানি, জওয়াহরলালজীও এ বিষয়ে উহাদের সংগে একমত ছিলেন না; কারণ অনেক বিষয়ে গান্ধীজীর সংগে মতভেদ হইলেও তিনি তাঁহার নেতৃত্বের মহত্ত্ব বুঝিতেন ও স্বীকার করিতেন—কোনও প্রকারেই তাহা দুর্বল করিতে চাহিতেন না। অন্য সকলের পক্ষে একথা বলা চলিত না। এই কারণে মতভেদ সত্ত্বেও আমরা জওয়াহরলালজীর সংগে কাজ করিতে পারিতাম, অন্যদের সংগে কঠিন হইত। যাহা হউক, কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইল। সকলে নিজের নিজের জায়গায় রওনা হইল।

নাগপুরে হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন : রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন

আমার লখনউ হইতেই নাগপুর যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন হইবার কথা, আমি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম এবং ঠিক কংগ্রেসের পরে তিন-চার দিনের মধ্যেই উহা হইবার কথা ছিল। এইজন্য মহাত্মাজী যে-গাড়িতে গেলেন আমিও সেই গাড়িতেই গেলাম। সেখান হইতেই ওয়ার্ধা যাই ও সেখান হইতে সম্মেলনের দিন নাগপুরে আসি।

ওয়ার্ধায় বসিয়া অভিভাষণ লিখিলাম। কয়েক দিন হইতে এই লইয়া তর্কবিতর্ক হইতেছিল যে, হিন্দীর শব্দাবলীর মধ্যে বিদেশী শব্দ লওয়া উচিত কি না। সত্য কথা কি, প্রশ্নটি এই রূপ দেওয়াই উচিত নয়; কারণ হিন্দীর কোনও লেখকই—তিনি বিদেশী শব্দের যতই বিরোধী হউন না কেন—সব বিদেশী শব্দ বর্জন করিতে চান না। নিজের লেখা বা বক্তৃতায় তাহা বর্জন করেনও না। এ ঝগড়া হইল হিন্দী ও উর্দুর। হিন্দী যে রূপ আজ হইয়াছে ও হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আছে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য। উর্দু আজ যেমন বাড়িয়াছে ও তাহার বিকাশ যে পথে হইতেছে,

তাহাতে আরবী ও ফারসী শব্দের বাড়াবাড়ি হইতেছে। দুই ভাষাতেই এমন অনেক সুলেখক আছেন যাঁহারা সাদাসিধা সহজ ভাষায়ও লেখেন। উভয়ের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছেন যাঁহারা সংস্কৃত, আরবী বা ফারসী শব্দ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যান, এবং ইহাতে হিন্দীর রূপ বিকৃত হইয়া যাইবে ও তাহা উর্দু হইয়া যাইবে, অথবা উর্দু নষ্ট হইয়া হিন্দী হইয়া যাইবে বলিয়া ভয় পান। এমনও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা হিন্দীকে হিন্দুর ও উর্দুকে মুসলমানের ভাষা বলিয়া মনে করেন। এইভাবে এই ঝগড়ায় খানিকটা সাম্প্রদায়িকতাও আসিয়া গিয়াছে—যদিও এমন অনেক মুসলমান কবি ও লেখক হইয়াছেন যাঁহারা হিন্দীর সেবা করিয়াছেন এবং এইরূপে অনেক হিন্দু উর্দুর সেবা করিয়াছেন।

কংগ্রেসের বিধানে যেখানে ভাষার উল্লেখ হইয়াছে সেখানে সেখানে 'হিন্দী' শব্দের ব্যবহার করা হয় নাই, 'উর্দু' শব্দেরও নয়; সেখানে 'হিন্দুস্থানী' শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে। গান্ধীজী যখন ১৯১০ সালে দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রভাষার প্রচার আরম্ভ করেন, তখন হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের তত্ত্বাবধানেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ইন্দোরে সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হন। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে হিন্দুস্থানী শব্দের ব্যবহার করেন মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন। তাঁহাদেরই শব্দ কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে যে-সভার দ্বারা রাষ্ট্রভাষা প্রচারের কাজ আজও চলিতেছে তাহার নাম দক্ষিণ ভারত হিন্দী প্রচার সভা। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে গান্ধীজী যখন হইতে এই কাজ হাতে লন, তখন তিনি হিন্দী ও উর্দুকে দুই বিভিন্ন ভাষা বলিয়া মনে করেন নাই। যদিও উভয়ের শব্দাবলীতে অন্তর আছে এবং এই অন্তর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তথাপি উভয়ের ব্যাকরণ প্রায় একই, এবং এই ব্যাকরণ অন্য কোনও ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে পুরাপুরি মেলে না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের বক্তব্য এই যে শব্দাবলীতে ভাষার বিভেদ এতটা হয় না যতটা তাহার বাক্য-গঠনে ও ব্যাকরণের নিয়মের জন্য হয়। এইজন্য একথা মানিয়া লওয়া অনুচিত নয় এবং ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মেরও প্রতিকূল নয় যে হিন্দী ও উর্দু একই ভাষার নাম, অথবা একই ভাষার দুই রীতি—দুই বিভিন্ন ভাষা নয়। হিন্দুস্থানী হিন্দীও বটে, উর্দুও বটে; কারণ তাহা প্রায়ই ক্লিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করে না। উহার রূপ এমন রাখে যে হিন্দী ও উর্দু উভয় ভাষার লোকই উহাকে নিজের বলিয়া বুঝিতে পারে।

যে-ভাষার শব্দভাণ্ডার যত পরিপূর্ণ হইবে সেই ভাষা তত উন্নত, একথা আমি সমর্থন করি। যদি একই অর্থের কয়েকটি শব্দ থাকে তবে সময় পাইলে তাহার অর্থে অল্পবিস্তর প্রভেদ হইতে থাকিবে, আর তাহাতে সূক্ষ্মতা আসিতে থাকিবে। চিন্তার সূক্ষ্মতা প্রকাশ করিবার শক্তি এরূপ

ভাষায় অধিক হইতে থাকিবে। জীবন্ত জাগ্রত ভাষা অন্য ভাষার সম্পর্কে, যদি তাহাতে গ্রহণ ও সংগ্রহ করিবার শক্তি থাকে তবে লাভবান হইতে থাকিবে, ও তাহার শব্দভাণ্ডার বাড়িতে থাকিবে। উহা গুটিপোকার মত এক কথায় ভয় পাইয়া নিজের কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়া নিজেকে বন্ধ করিয়া রাখিবে না যে বাহিরের হাওয়ায়, বাহিরের শব্দে উহা পিষিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্বই খোয়াইয়া ফেলে। উহা সাহস করিয়া খোলাখুলি সংঘর্ষের মধ্যে আসিবে এবং অন্যান্য ভাষার ভাল ভাবগ্রাহী শব্দ নিজের মধ্যে মিলাইয়া লইবে। এইরূপ করিলে উহা নিজের নিয়ম, নিজের রূপ বদলাইবে না—নিজের বেশভূষা, যতই বদলাক, যতই তাহাতে বিচিত্রতা আনুক।

আমি ইহাকেই বক্তৃতার বিষয় করিলাম, আর হিন্দী সাহিত্য সেবীদের আলোচনার জন্য এই প্রশ্ন উপস্থিত করিলাম। আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম, বিদেশী শব্দ গ্রহণ করা বিষয়ে হিন্দীকে ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না—আরবী-ফারসী হইতেই হউক, আর ইংরেজী হইতেই হউক হিন্দীতে যে-শব্দ আসিবে তাহাকে হিন্দীই হইতে হইবে, অর্থাৎ হিন্দীতে আসিয়া উহা যেন সংগে করিয়া আরবী-ফারসী বা ইংরেজীর ব্যাকরণ হিন্দীতে আনিয়া না হাজির করে, বরং হিন্দী ব্যাকরণের অধীন হইয়া থাকে। আজও আমি এই মতই পোষণ করি। তখন হইতে আজ পর্যন্ত ইহা লইয়া অনেক তর্ক চলিয়াছে; কিন্তু আমার নিজের মত আরও দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। আর কেবল এই তিন ভাষার শব্দ লইলে চলিবে না, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হইতে গেলে অনেক গ্রাম্য শব্দও লইতে হইবে। প্রাদেশিক ভাষার শব্দও অনেক লইতে হইবে।

এ-বিষয়ে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। আধুনিক হিন্দী ও উর্দু কি আজ এক, না এক হইতে পারে? ব্যাকরণ প্রায় এক হইলেও শব্দের প্রভেদ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ শুধু হিন্দী অথবা উর্দু জানা লোকের সভার মধ্যে এরূপ ভাষা বলা যাইতে পারে, যাহা শ্রোতা বুঝিতে পারিবে না—এরূপ সংস্কৃত মিশানো হিন্দী, যা উর্দু জানা লোকেরা বুঝিবে না, আর এরূপ আরবী-ফারসী মেশানো হিন্দী, হিন্দী জানা লোকেদের বোধগম্য হইবে না। ইহাও সম্ভব বেশী কঠিন না—এরূপ ভাষা বলা চাই যাহা শুধু হিন্দী জানা লোক বা শুধু উর্দু জানা লোক বুঝিবে। আমি ইহাকে হিন্দুস্তানী বা হিন্দুস্থানী নাম দিই। বড় বড় সভার পক্ষে, সাধারণ সংবাদপত্রের পক্ষে, গল্প-সল্প বলার পক্ষে আর মর্মস্পর্শী কবিতার পক্ষেও এমন সহজ ভাষা হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যখন উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে হইবে তখন তাহার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন

হইতে পারে। এরূপ শব্দ সর্বদা সহজ ও সুবোধ হইবে এমন নহে—এমন কোন ভাষাতেই নাই। ইংরেজীকে লোকে এক উন্নত ভাষা মনে করে। ইংরেজীতে লেখা বিজ্ঞানের কোন বই যদি ভাল ইংরেজী জানা লোককেও দেওয়া যায় তাহা হইলে সেও উহা ভাল বুঝিতে পারিবে না; কারণ তাহাতে প্রতি চরণে এমন সব পারিভাষিক শব্দ থাকিবে যাহা শুধু ইংরেজী সাহিত্য জানা লোক বুঝিতে পারিবে না—যাহারা ঐ বিশেষ বিজ্ঞানটি জানে তাহারাই শুধু সেই বিশেষ শব্দটির অর্থ জানে। এমনিতেই তো আজকাল এরূপ সব গল্প-উপন্যাস লেখা হইতেছে যাহাদের মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক কথা আছে বৈজ্ঞানিক শব্দ আসিয়া যায়। কিন্তু আমি এখন এই ধরনের বিশেষ পুস্তকের কথা ভাবিতেছি না। সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে-কোনো সাধারণ ইংরেজী জানা লোকের সামনে পদার্থ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ের বই রাখিয়া দিলে সে উহা ঠিক বুঝিতে পারিবে না, যদিও ব্যাকরণ উহার পক্ষে সহজ হইবে। কিন্তু উহাতে অনেক শব্দই এরূপ থাকিবে যাহা তাহার একেবারেই অজানা।

এইভাবে, যদি হিন্দী ও উর্দুতে এই প্রকারের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থ লওয়া যায় তবে উহাদের ভাষা হইবে এক ভিন্ন ধরনের। পারিভাষিক শব্দ কোনও সংস্কৃত (অথবা সংস্কারযুক্ত) ভাষা হইতেই লওয়া যাইতে পারে, অথবা কোনও সংস্কৃত বা সংস্কারযুক্ত ভাষার সাহায্যে গঠন করা যাইতে পারে, তা সে ভাষা সংস্কৃতই হউক আর আরবীই ইউক। ইংরেজীতেও এই ধরনের শব্দ বেশির ভাগ লাটিন হইতেই গঠন করা হয়। এখানে আমি স্বীকার করি, এই সব বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দের জন্য আমাদিগকে সংস্কৃত অথবা আরবীর দিকে যাইতে হইবে—হইতে পারে ইউরোপীয় ভাষা হইতে অনেক শব্দ যেমনকার তেমন লইতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে তো এই ধরনের শব্দ বেশির ভাগ সংস্কৃত হইতে লওয়া হইলে তাহার বেশি প্রচার হইবে; কারণ এখানকার যত সব প্রাদেশিক ভাষা আছে, সকলের সঙ্গে সংস্কৃতের গভীর সম্বন্ধ। এমন কি, দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলিও সংস্কৃত দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত। উহাদিগকে যদি নূতন শব্দ লইতে হয়, যাহা নিজে নিজে গঠন করা যায় না। তাহা হইলে উহারা সংস্কৃত হইতে লওয়াই পছন্দ করিবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদিগকে 'জ্যোতিষ' শব্দটি লইতে হয় তবে উহা 'ইল্‌মনজুম' অপেক্ষা অনেক সহজে হিন্দী-ভাষী প্রদেশের লোকদের বোধগম্য হইবে—আবার বাংলা, গুজরাত, মহা-রাষ্ট্র, তামিল, তেলুগু, কেরল, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশেও লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে। ঐ বিজ্ঞানের শব্দ 'নক্ষত্র' এবং 'গ্রহ' সমস্ত ভারতবর্ষের লোকেরা বেশি সহজে বুঝিবে। তাই আমার মতে এই সব পারিভাষিক শব্দের জন্য রাষ্ট্রভাষাকে, তাহার যে নামই দিই না কেন, আমাদের সংস্কৃতের

উপরই নির্ভর করিতে হইবে। হইতে পারে যে বিদেশ হইতে এমন কিছু শব্দ আসিয়াছে যাহা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেগুলি ঐরূপেই থাকিতে দেওয়া উচিত ও তাহা অনিবার্যও বটে। কিন্তু যেখানে নূতন শব্দ গড়িতে হইবে সেখানে সংস্কৃতের সাহায্য লওয়াই উচিত ও সহজ। ইহাতে উর্দু-ওয়ালাদের আগ্রহ হইলে তাহারা ইচ্ছামত নিজেরা শব্দ বানাইয়া লইবে। কিন্তু তাহারা যেন মনে রাখে যে তাহাদের সে-সব শব্দ সর্বত্র চলিতে পারিবে না—শুধু উর্দু হইয়াই থাকিবে। এইজন্য, যতদূর মামুলি কথা-বার্তা ও সংবাদপত্রের ভাষার সম্বন্ধ, ততদূর আমরা এইরূপ ভাষাই ব্যবহার করিতে পারি যাহা হিন্দী ও উর্দু উভয়ের পক্ষে গ্রাহ্য। কিন্তু যেখানে পারিভাষিক শব্দের দরকার হইবে, সেখানে উভয়ে ভিন্ন হইতে পারে—যদিও ইহাও আবশ্যক বা অনিবার্য নয়। আর, উপরে যেমন বলা হইয়াছে, উহা (পারিভাষিক শব্দ) তখনই সর্বজনমান্য ও সার্বভৌম হইতে পারে যখন উহা সংস্কৃতের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়।

প্রতিদিনের কারবারের সঙ্গেই রাষ্ট্রভাষার সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া থাকে। এই জন্য, যতদূর বুঝিতে পারি, উহা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে হিন্দী ও উর্দু উভয়েই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের, হয়তো উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেরও, ভাষা হিন্দী ও উর্দুতে পৃথক পৃথক হইবে। যদি আমরা এই পার্থক্য মানিয়া লই, তাহা হইলে হিন্দী-উর্দুর ঝগড়া অনেকখানি মিটিয়া যাইতে পারে। আমরা তো চাই সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একই রাষ্ট্রভাষা —উহা ইংরেজী হইতে পারিবে না, হিন্দীই হইতে পারিবে, তা আমরা উহাকে হিন্দুস্থানী, হিন্দী বা উর্দু যাহাই বলি না কেন। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব ভাষা প্রচলিত আছে তাহাদের স্থান উহা লইতে পারে না; সেগুলি নিজের নিজের জায়গায় পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রদেশের কার্যে ও প্রদেশের সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে। সকল দেশে ব্যবহারের জন্যই আমরা চাই রাষ্ট্রভাষা। যদি উহা আবরী-ফারসীর অনেক অপ্রচলিত শব্দ দিয়া ভরিয়া কঠিন করিয়া দিই তাহা হইলে উহা বাংলা, আসাম, উৎকল, অন্ধ্র, তামিল, কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ইত্যাদি প্রদেশে সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব রাষ্ট্রভাষা সে সব প্রদেশে সহজে প্রবেশ করাইতে গেলে যতদূর সম্ভব এই সকল প্রাদেশিক ভাষার প্রচলিত শব্দ লওয়াই হিতকর ও অনুকূল হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ কথাও ভুলিতে পারি না যে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম ভাগের খানিকটার ভাষায়ও উর্দুর ভাগ বেশি আছে—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সেখানে আরবী-ফারসীর শব্দ বেশি সহজে বলিতে ও বুঝিতে পারে। রাষ্ট্রভাষা এ সকল লোককেও

নিজের এলাকার বাইরে রাখিতে পারে না। এইজন্য রাষ্ট্রভাষাকে উদার-নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, বর্জন নীতি ছাড়িতে হইবে।

আমি নিজে দেশব্যাপী ভ্রমণে দেখিয়াছি যে আমাকে দুই প্রকারের হিন্দী বলিতে হয়। যখন আমি সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গেলাম—বিশেষত যে-সব সভায় মুসলমানদের সংখ্যা অধিক—তখন আমি ফারসী-মেশানো হিন্দী বলিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলাম, লোকদের বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। বাংলা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি স্থানে এবং দক্ষিণ ভারতেও, যেখানে লোকে খানিকটা হিন্দী বুঝিতে পারিত, সেখানে সংস্কৃতবহুল হিন্দী বলিয়াই কার্যোদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম। আমি আরবী-ফারসীতেও 'আমিল' নই, সংস্কৃতেও পণ্ডিত নই। আরবীর জ্ঞান তো একেবারেই নাই। ফারসীর সামান্য জ্ঞান আছে। সংস্কৃতের সঙ্গেও ঐরূপই আন্দাজে পরিচয়। কিন্তু আমি দুই প্রকারের ভাষা কিছু কিছু বলিতে পারি। দুই প্রকারের শ্রোতা আমার বক্তৃতা সহজে বুঝিতে পারে। এই সব ভাষায় জ্ঞানাভাবই ইহার এক বিশেষ কারণ বলিয়া আমি মনে করি। এইজন্য আমি স্বীকার করি, আমার মত লোকের জন্য—আর এই ধরনের লোকের সংখ্যা বেশি আছে ও থাকিবে—এরূপ রাষ্ট্রভাষার প্রয়োগ সহজ। আলিম ও পণ্ডিতের নিকট উহা বেশি কঠিন বোধ হয় ও হইবেও; কারণ যেখানে কোনও শব্দের অভাব মনে হইবে, তাঁহারা সেখানে চট্ করিয়া সংস্কৃত বা আরবীর শরণ লইতে ছুটিবেন, আমাদের মত লোক সেখানে পোঁছিতে পারিবে না; এইজন্য আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার হইতেই কাজের জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে বাধ্য হই, তাহা বেশির ভাগ আমার মত লোকের নিকট বিশেষ পরিচিতই হইবে।

আমি এখানে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আমার মত সবিস্তারে বলিলাম; কারণ সম্মেলনের সঙ্গে ইহার যোগ আছে। আমার বক্তৃতাতে আমি এই ধরনের আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্মেলন রাষ্ট্রভাষা প্রচারের কাজও করিয়া আসিতেছিল। এইজন্য উহাকে দুইটি বিষয়ে মন দিতে হইয়াছিল—হিন্দী সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থরচনায় ,ও ভাষা প্রচারে। এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য বা বিরোধ না থাকাই উচিত, কিন্তু কোথাও কোথাও হওয়া অসম্ভবও নয়। পরবর্তীকালে সম্মেলনের ভিতর এই বিষয় লইয়া কিছু কিছু মতভেদও হইয়াছিল। নাগপুরেই এই মতভেদ দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানকার কার্যক্রমে কোনও প্রভেদ হইল না। সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা-প্রচার সমিতি গঠিত হইল; আমাকে তাহার সভাপতি করা হইল। সম্মেলনের নিয়ম অনুসারে এক প্রচার সমিতিও গঠন করা হইত। নাগপুর সম্মেলনে অনুভব করিলাম যে প্রচার সমিতি হিন্দীভাষী প্রদেশে সাহিত্য প্রচারের কাজ করে, আর রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি যেখানকার ভাষা

হিন্দী নয়, সেই সমস্ত প্রদেশে রাষ্ট্রভাষার প্রচার করে। দক্ষিণ ভারতে—অন্ধ্র, তামিল, কেরল ও কর্ণাটকে—দক্ষিণ ভারত হিন্দী-প্রচার সভা খুব ভাল কাজ করিয়া আসিতেছে, আর তাহার দ্বারা প্রচারের কাজও খুব ভাল-ভাবে চালানো হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য হিন্দী বর্জিত প্রদেশে এই প্রকার প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই। এইজন্য গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বাংলা, আসাম, উৎকল ,ইত্যাদি প্রদেশে প্রচার কার্য করিবার ভার এই রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিকে দেওয়া হইল। আমি তো ইহার সভাপতি হইলাম; কিন্তু ইহার নীতি-নির্দেশের কাজ গান্ধীজী লইলেন, এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ লইলেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ। ইহাতে সম্মেলনের প্রধান কয়েকজন ব্যক্তি—শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টেন্ডন, পণ্ডিত দয়াশংকর দুবে, ডাঃ বাবুরাম সক্সেনা প্রভৃতি—সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন। অ-হিন্দী প্রদেশের প্রতিনিধিরূপে সেখানকার কয়েকজন হিন্দীপ্রেমীকে গ্রহণ করা হইল। এই সমিতি তিন বৎসরের জন্যই গঠিত হইল। কিন্তু ঐ তিন বৎসর কাটিবার পর পুনরায় তাঁহাদের মনোনীত করা হইল। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত ছয় বৎসরে এই সমিতি অ-হিন্দী প্রদেশে—বিশেষ করিয়া গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্য-প্রদেশের মহারাষ্ট্র জেলায়, উৎকল ও আসামে—অনেক কাজ করিল। ছাত্রদের জন্য পুস্তক রচনা করাইল, পরীক্ষা গ্রহণ করিল। হাজার হাজার বিদ্যার্থী পরীক্ষা দিল, আর উত্তীর্ণও হইল। শেঠ পদ্মপৎ সিংঘানিয়া পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বার্ষিক ১৫,০০০৲ হিসাবে মোট ৭৫,০০০৲ দান করিয়া ইহার অর্থাভাব অনেকটা দূর করিয়া দিলেন। কাকা কালেলকর, শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ, শ্রীযুক্ত শ্রীমন্নারায়ণ ও দাদা ধর্মাধিকারীর পরিশ্রম ও উৎসাহে গান্ধীজীর বরদায়ী হস্তের নীচে ইহাকে ব্যাপক প্রভাবসম্পন্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন সার্থক প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত করা হইল।

নাগপুরে আর একটি সম্মেলন হইল। গান্ধীজী দেখিলেন, হিন্দী-উর্দুর মধ্যে পরস্পরে মনকষাকষি বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, উভয়ের সমন্বয়ের জন্য একটা চেষ্টা করা হয়। এজন্য এমন এক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল যাহাতে উভয় ভাষায় পণ্ডিতেরা যোগ দেন, এবং যেখানে কোনও সংকোচ না করিয়া শুধু ভাষার উন্নতির দিক হইতে কাজ হয়। তিনি ইহাতে গুজরাতী সাহিত্যে খ্যাতিবান শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল মুনসিকে লাগাইতে চাহিয়াছিলেন। মুনসি প্রেমচন্দ ও মৌলবী আবদুল হক সাহেবের সহায়তাও লইতে চাহিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানের (রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ্) অধিবেশন নাগপুরেই করা হইল। উপরোক্ত ভদ্রলোকদের ও অন্যান্য লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল। ঐ সভায় মৌলবী আবদুল হক সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হয়। তিনি সম্মেলনের পরে এমন কিছু লেখা লিখিলেন যাহাতে গান্ধীজীর উপর কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়। এই-

জন্য এই পরিষদ্ মুসলমানদের সাহায্য করিতে পারিল না। কিন্তু মুনসি প্রেমচন্দ ও শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল মুনসি পরিষদের তরফ হইতে কাশীর হিন্দী মাসিকপত্র 'হংস' কিছুদিন পর্যন্ত চালাইলেন। দুঃখের বিষয়, মুনসি প্রেমচন্দ অল্পকাল পরেই পরলোকগমন করিলেন। পরিষদ্ বেশী দিন ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না—যদিও একথা বলা যায় না যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও নিষ্পন্ন করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন সভা নূতনভাবে গঠিত হইবে, তাহার নির্বাচনের আয়োজনে ১৯৩৬ সাল কাটিয়া গেল। লখনৌতে স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড় করাইবে ও নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধি অনুসারে কোটি কোটি স্ত্রী-পুরুষের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার এই প্রথম সুযোগ। সেই কোটি কোটি ভোটদাতাদের এমনভাবে সংগঠন করিতে হইবে যে তাহারা কংগ্রেসের সকল প্রার্থীদের ভোট দেয়। ইহা বড় সহজ কাজ ছিল না। ১৯৩৫-৩৬ সালে কংগ্রেস আবার সংগঠিত হইয়া গেল। ১৯৩৪ সালে উহা কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য নির্বাচনে নামিয়াছিল। তাহাতে খুব জয়লাভও করিয়াছিল। কিন্তু সে নির্বাচনের তুলনায় এবার ক্ষেত্র অধিক ব্যাপক ছিল। সে নির্বাচনে ছিল প্রায় শত প্রার্থী নির্বাচন করিবার কথা, এবার প্রায় দুই হাজার কেন্দ্রের জন্য লোক নির্বাচন করিতে হইবে। খরচও অনেক বেশি পড়িবে। প্রার্থীদের নাম বাছাই করাও সহজ কাজ ছিল না।

সবচেয়ে গোড়ার কাজ ছিল এমন এক ঘোষণাপত্র রচনা করা, যাহা কংগ্রেসের তরফ হইতে ভোটদাতাদের সামনে রাখা যাইতে পারে আর যাহা পূরণ করিবার জন্য তাহাদের কাছে ভোট চাওয়া যায়। কংগ্রেসের প্রস্তাব ও এই ধরনের ঘোষণার মুসাবিদা প্রথমে মহাত্মাজী তৈয়ার করিতেন। যখন হইতে পণ্ডিত জওয়াহরলালজী সভাপতি হইলেন তখন হইতে একাজ তাঁহাকেই বেশির ভাগ করিতে হইত। তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় এক অতি সুন্দর ঘোষণা প্রস্তুত করিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহা স্বীকার করিয়া লইল।

আমাদের সামনে এক অসুবিধা ছিল। কংগ্রেস এ পর্যন্ত স্থির করে নাই, উহা সভ্যদের মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দিতে দিবে কিনা। কেহ কেহ

চাহিতেছিল যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয় আর নূতন শাসনতন্ত্রে যাহা কিছু অধিকারও পাওয়া যায় তাহার প্রযোগ করে। অনেকে চাহিত যে কংগ্রেস শুধু অদ্ভুত বাধা দেওয়ার নীতি অনুসারে কাজ করে—নিজেরা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবে না, করিতেও দিবে না, আর গঠিত হইলেও তাহাদের কাজে বাধা দিতে থাকিবে। কংগ্রেস শাসনতন্ত্রকে অস্বীকার করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনে যোগ দিবার অনুমতিও তো দিয়াছে, তবে নির্বাচনের পর সভ্যেরা কি করিবে তাহা বলিয়া দেয় নাই। এইজন্য ঘোষণাপত্রে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া চলে নাই যে আমরা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিব ও তাহাতে থাকিয়া অমুক অমুক কাজ করিব। উহাতে একথাও বলা মুস্কিল ছিল যে আমরা সেখানে কিছু করিব না, কাহাকে কিছু করিতেও দিব না। উহাতে খুব সাবধান হইয়া এমন সব কথা বলা গিয়াছিল যাহা করাচি কংগ্রেসে, আমাদের মৌলিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লইয়া যে সব প্রস্তাব হয় তাহাতে মঞ্জুর করা হইয়াছিল। এই-রূপ করাতে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিব কি না তাহা না জানাইয়া কাউনসিলের কার্যক্রম বলিয়া দেওয়া হইল। এই ঘোষণা ছিল সমস্ত দেশের জন্য। ইহার কথা মত কংগ্রেসের সকল সদস্য, তাহারা যে প্রদেশেই থাকুক না কেন, কাজ করিবে এই অভিপ্রায় ছিল। এ ছাড়া প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে অধিকার দেওয়া হইল যে তাহারা নিজেদের অবস্থা অনুসারে যদি সেখান-কার জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে চায় তো তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে।

এই ঘোষণাপত্রে বেশির ভাগ কৃষকদের অবস্থাই উন্নত করিবার কথা বলা হইয়াছিল। তাহাদের জন্য খাজনা আইনে রদবদল করিয়া তাহাদের নিজের জমিতে, যেখানে তাহারা চাষ করে ও শস্য বোনে, সেখানে স্থায়ী স্বত্ব দিবার কথা ছিল। খাজনা কমাইবার উপরও জোর দেওয়া হইয়াছিল। মজুরদের অবস্থাও সংশোধন করিবার প্রতিশ্রুতি ছিল—তাহাদের চাকরি পাকা করিয়া, তাহাদের থাকিবার খাইবার সুব্যবস্থা করিয়া ও তাহাদের মজুরির হার বাড়াইয়া। সঙ্গে সঙ্গে মজুর সংঘকে স্থাপিত ও সংগঠিত করি-বার অধিকার দেওয়া হইবে ও অন্য প্রকারে তাহাদের অবস্থা ভাল করা হইবে, একথাও বলা হইয়াছিল। দেশে মদ্যপান নিষেধের কথাও বলা হইয়াছিল। অর্থাৎ ইহাতে সেই সকল কথাই ছিল যাহা যেকোনও লোকপ্রিয় মিনিষ্ট্রী করিতে পারে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, আমরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে তো এসব কাজ করিবই; কিন্তু যদি না-ও করি তবে যে মন্ত্রিমণ্ডলই হউক না কেন, এ ধরনের কথা সকলকে দিয়াই করাইতে পারিব এবং করাইব।

অন্য একটা কাজ ছিল এত অধিক সংখ্যক প্রার্থী বাছা। এ-কথা স্পষ্ট যে এ-কাজ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত

দেশের জন্য করিতে পারিত না। দুই জন প্রার্থীর মধ্যে কাহাকে কংগ্রেস টিকেট দিতে হইবে, একে তো ইহা স্থির করিবার মত উপাদান উহার কাছে থাকিবে না; শুধু শুধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অথবা তাহার কার্যকারিণী সভার উপরই বেশি নির্ভর করিতে হইবে। তাহা হইলেও একথা স্পষ্ট ছিল যে কোথাও কোথাও স্থানীয় কমিটির মধ্যে দলাদলি ছিল, হইতে পারে এই দলাদলির জন্য কোনও প্রার্থীর প্রতি অবিচার করা হইল, অথবা এমন প্রার্থী নির্বাচন করা হইল যে জনসাধারণের সামনে জবাবদিহি করিতে পারে না। কোথাও কোথাও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও ইহা চাহিতেছিল যে শেষ বিচার ওয়ার্কিং কমিটির হাতে থাকিলেই ভাল হইবে। এইজন্য স্থির হইল যে শেষ বিচার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিই করিবে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটিও এই কাজের জন্য সকল সভ্যকে একত্র করা কঠিন বলিয়া মনে করিল। এইজন্য উহা তিন জন সভ্য লইয়া এক পারলামেণ্টারি কমিটি গঠন করিল, তাহার উপর এই সব কাজের ভার দেওয়া হইল। এই পারলামেণ্টারি কমিটির প্রধান করা হইল সরদার বল্লভ-ভাই প্যাটেলকে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও আমি সভ্য হইলাম। নির্বাচনের সময় নিকটে আসিলে অভিজ্ঞতা হইতে বোঝা গেল, এই সব সভ্যেরও সর্বদা একত্র হইয়া কোনও কথার মীমাংসা করা, সময়ের অভাব ও পরস্পরের দূরত্বের জন্য, অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি সমস্ত ওয়ার্কিং কমিটির উপর এই কাজের ভার থাকিত তাহা হইলে হয়তো উহাকে কয়েক মাস ধরিয়া এক স্থানে অধিবেশন করিতে হইত। গোড়ায় আমাকে কিছু-কালের জন্য এই কমিটির কাজে বোম্বাইয়ে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেখানকার জলবায়ু প্রতিকূল বলিয়া আমি বর্ষায় সেখানে থাকিতে পারি নাই। আমরা তিন জন নিজের নিজের জায়গা হইতে কাজ করিতে লাগিলাম।

সদস্যদের নাম বাছাইয়ের কাজ প্রাদেশিক কমিটির কার্যকরী সভাই করিত। কিন্তু উহা নিজের পছন্দমত গৃহীত সব নাম পারলামেণ্টারি কমিটির নিকট পাঠাইয়া দিত। প্রাদেশিক নির্বাচনে অসন্তুষ্ট হইলে যে কেহ পারলামেণ্টারি কমিটির নিকট আপিল করিতে পারিত আর এ-বিষয়ের সমস্ত কাগজপত্র, রিপোর্ট ইত্যাদি প্রদেশ হইতে উহার নিকট আসিত। যে-সব স্থান লইয়া কোনও আপিল বা অপছন্দের কথা না উঠিত সেগুলি বিনা সংকোচে প্রাদেশিক কমিটির নির্ধারণ অনুসারেই থাকিয়া যাইত। কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে আপিল হইত, পারলামেণ্টারি কমিটি তাহাদের পরীক্ষা করিয়া লইত। প্রয়োজন হইলে উহার সদস্যেরা ঐ স্থানে গিয়া, সেখানকার লোকদের সঙ্গে দেখা করিয়া ও তাহাদের নিকটে তথ্য সংগ্রহ করিয়া শেষ মীমাংসা করিয়া আসিতেন। এ কাজ সহজ ছিল না। কিন্তু

সন্তোষের কথা এই যে খুব কম মীমাংসা সম্বন্ধেই পারলামেণ্টারি কমিটি পর্যন্ত আপিল আসিয়া পৌঁছিত। যে-সব আপিল আসিত তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলি শুধু পত্রাদি লিখিয়া সকলের সম্মতিক্রমে শোনা হইয়া যাইত। কোনও একজন লোক বা দলের বিরুদ্ধে রায় দিতে হইয়াছে, এমন স্থান অতি অল্পই ছিল।

নির্বাচনের ব্যাপারে দুইটি কথা ছিল প্রধান। এক তো এই যে মনোনীত প্রার্থী কংগ্রেসের কার্যক্রম অনুসারে ঠিক ঠিক সত্য ও ন্যায় বিচারের সঙ্গে কাজ করিবে কিনা। দ্বিতীয়ত, উহার নির্বাচিত হইবার পুরাপুরি আশা ছিল কিনা। তৃতীয়ত আর একটি কথা ছিল, তাহা এই দুটি প্রশ্নের তুলনায় গৌণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। তাহা এই যে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নিজে করিতে পারিবে কিনা, যদি না পারে তবে তাহার জন্য পারলা-মেণ্টারি কমিটিকে কি সাহায্য করিতে হইবে? প্রথম প্রশ্নের বিচার প্রার্থীদের পূর্বকার সেবা ও কংগ্রেসের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ও তাহার কাজকর্মের কথা ভাবিয়াই হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিত জনসাধারণের মধ্যে তাহার লোকপ্রিয়তার উপর। এই লোকপ্রিয়তার বহু কারণ থাকিতে পারে। কেহ বা কংগ্রেসের দ্বারা সেবা করেন বলিয়া অত্যন্ত লোকপ্রিয়; কেহ বা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যবিধ সেবার দ্বারা লোকপ্রিয় হইয়া গিয়াছেন। কোনও ক্ষেত্র এমন ছিল যে কোনও বিশেষ জাতি বা সমাজের লোকের বাহুল্য ছিল। সেখানে সেবা ছাড়া ঐ বিশেষ জাতি বা সমাজের লোক হওয়াই লোকপ্রিয়তার—অর্থাৎ ভোট পাইবার ক্ষমতার—কারণ হইতে পারিত। কোনও ক্ষেত্র এইরূপ হইতে পারিত যেখানে বেশি কাজ হয় নাই আর যেখানে কংগ্রেসের প্রভাব বেশি নাই, সেখানে অন্যান্য কারণেই প্রার্থী নির্বাচনের আশা হইতে পারিত। এ-সব কথার মীমাংসা প্রাদেশিক কমিটিগুলিই বেশির ভাগ করিতে পারিত। এইজন্য তাহাদেরই কথা মানিতে হইত।

যে-সব জায়গায় কংগ্রেসের দুইজন কর্মী একই জায়গা হইতে প্রার্থী হইত, আর তাহাদের মধ্যে কেহই হটিতে প্রস্তুত হইত না, সেই সব জায়গায়ই সব চেয়ে কঠিন হইত। সেবার দৃষ্টি হইতে উভয়ের মধ্যে ভেদ করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন তো নিশ্চয় হইত। জনসাধারণের মধ্যেও উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকিত। এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে কোনও এক পক্ষকে নারাজ করিয়াই রায় দিতে হইত। পয়সার প্রশ্নও এমন কিছু সামান্য ছিল না। দুই হাজার স্থানের জন্য নির্বাচন ব্যয়ও বেশি পড়িত। অল্প অল্প করিয়াও অনেক খরচ হইয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যও খরচ কিছু বাড়িয়া যাইতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী ধনী হইলে ও বেশি খরচ করিবার

জন্য প্রস্তুত থাকিলে, নিজের দিক হইতেও খরচের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে হয়; কারণ প্রতিদ্বন্দীর প্রচারের প্রতিকার করা আবশ্যক।

সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পারলামেণ্টারি কমিটি এই সব কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছিল, ইহা সন্তোষের বিষয়। নিখিল ভারতীয় নির্বাচন ছাড়া আমাকে নিজের প্রদেশের কাজও দেখিতে হইত। যতদিন কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলাম, ততদিন প্রদেশে কংগ্রেসের কাজ কিছুই করিতে পারি নাই। পূর্বে যেমন বলিয়াছি। বরাবর সমস্ত দেশে দৌড়-ধাপ করিয়া বেড়াইয়াছি। সেবারকার পরিভ্রমণেও নিজের প্রদেশে তো আসিতেই পারি নাই। আমাদের প্রদেশ ১৯৩০ হইতেই সত্যাগ্রহের কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল। তখন নিজের প্রদেশে খুব ঘুরিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। একবার ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন প্যাক্টের সময়েও কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিয়াছিলাম। ১৯৩৪-এ, শুধু ভূমিকম্পের সম্পর্কে কার্যোপলক্ষেই, যেখানে পারিয়াছিলাম গিয়াছিলাম। তাহার পর সভাপতি হইয়া তো অন্যান্য প্রদেশেই ঘুরিতেছিলাম। এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর হইতে আমার সঙ্গে আমার প্রদেশের সম্পর্ক খুব কম হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও এই কাজ তো আমাকে দেখিতেই হইত। হয়তো এ বৎসর আমি প্রাদেশিক কমিটির সভাপতিও নির্বাচিত হইয়া থাকিব। এইজন্য প্রাদেশিক প্রার্থীদের নির্বাচনে অনেক সময় আমাকে দিতে হইল, অনেক কষ্টও করিতে হইল। উপরে যত কথা বলিয়াছি, আমি যাহার সভাপতি ছিলাম সেই প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটিকে সে সমস্ত বুঝিতে ও মীমাংসা করিতে হইল!

আমাদের প্রদেশে আর একটা কথা আছে যাহা অন্যান্য প্রদেশে বেশির ভাগ সাধারণত দেখা যায় না। জিলা কমিটিগুলি প্রায়ই প্রাদেশিক কমিটির উপর বিচারের ভার ছাড়িয়া দিতে চাহিত; কারণ সেগুলি জানিত যে নিজেরা বিচার করিলে নিজেদের মধ্যে মতভেদ বাড়িয়া যাইবে এবং এই কারণে নির্বাচন করার অসুবিধাও বাড়িবে। কিন্তু প্রাদেশিক কার্যকরী সভার পক্ষে রায় দেওয়া সহজ ছিল না; কারণ উহাও স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিল না। তাহা হইলেও আমি মনে করিতাম যে প্রাদেশিক কার্যকরী সভার হাতে একাজ ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। উহাতে প্রায় সকল মীমাংসা সর্বসম্মতিক্রমে হইত। কয়েকটিতে মতভেদ হইয়াছিল, কখনও কখনও এই মতভেদ তীব্রও হইয়া গেল; কিন্তু শেষে সমস্ত কথা সকলের সম্মতিক্রমে নির্ণয় হইতে পারিয়াছিল। কয়েকটি বিচারের সম্পর্কে আমাকে খুব অসুবিধা করিয়া নিজেকে মানাইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত বিচার—যাহার সম্বন্ধ ছিল ব্যক্তির সঙ্গেই—চাপিয়া গিয়া কমিটির অধিকাংশের মতকেই মানিয়া লইলাম। যতদূর মনে

পড়ে, কখনও এই চিন্তা আসিতে দিই নাই যে আমার জন্য কাহারও নাম লইয়া ভোট দেওয়ার প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, যেখানে প্রয়োজন হইত, নিজের মত বলিয়া দিতাম; কিন্তু তাহা বলিতাম সংযত ভাষায়, যাহাতে কটুতা না আসিতে পারে। যাহা হউক, প্রদেশের নাম বাছাই এইভাবে চুকিয়া গেল।

আমাদের প্রদেশে আমরা এই কথার উপর জোর দিয়াছিলাম যে বিশেষ করিয়া এমন লোকই লইতে হইবে যাহারা কংগ্রেসের কর্মী ও সেবক। এরূপ লোকের উপরই অবশ্য অধিক ভরসা করা যাইতে পারিত; কারণ তাহারা নিজেদের কাজ দিয়া পরিচয় দিত যে তাহারা বিশ্বাসের যোগ্য, আর তাহাদের নিকট হইতে আশাও করা যাইত যে তাহারা কংগ্রেসের যেমন আজ্ঞা তেমনই কাজ করিবে। কিন্তু কোথাও কোথাও অবস্থা বিশেষে ইহার জন্যও এরূপ লোকও লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম যাহারা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং তাহার সেবাও কিছু কিছু করিয়াছিল, কিন্তু যাহাদের কর্মী বলিয়া মনে করা যাইত না—ইহা স্থানীয় অসুবিধার জন্য, কখনও কখনও খরচের কথা ভাবিয়াও, করিতে হইয়াছিল।

আমাদের প্রদেশে এক বিশেষ অবস্থা ছিল। এখানে কিষাণ সভা কাজ করিয়া আসিতেছিল। উহা কোন প্রকারে ১৯৩৩-৩৪ সালে স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বে উৎসাহ লাভ করিয়াছিল—এ সম্বন্ধে কিছু উপরে উল্লেখ করিয়াছি। উহা এই তিন-চারি বৎসরের মধ্যে কোথাও কোথাও, বিশেষ করিয়া গয়া ও পাটনা জেলায়, জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বেগে কাজ করিতে পারিয়াছিল। কংগ্রেস ও কিষাণ সভার মধ্যে বিরোধ ছিল না। উভয়ের অনেক প্রভাবশালী কর্মীরা একই ছিলেন। যেখানে যেরূপ দরকার পড়িত, কংগ্রেস তাঁহাদের সাহায্যও করিত। নির্বাচনের প্রার্থীদের নাম বাছাই করিবার সময়ে প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হিসাবে স্বামী সহজানন্দ এমন কয়েকজন লোক লওয়ার উপর জোর দিতে লাগিলেন যাহাদের সঙ্গে কিষাণ সভার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এ সমস্ত লোকের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যের বিশেষ বিরোধ ছিল না; কিন্তু কোথাও কোথাও এমন উপলক্ষ হইল যে কিষাণ সভার কর্মী ও কংগ্রেসের কর্মী উভয়ের মধ্যেই বিরোধ হইয়া গেল। তাহা হইলেও কার্যকরী সভা সামলাইয়া লইল। শেষে যে-সমস্ত কথা স্থির হইল সবগুলি সকলের পছন্দ ও অনুমোদিত হইল।

আরেকটি বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রার্থী নির্বাচনে আমাদের এ-কথার উপরে মন দিতে হইয়াছিল যে কোন প্রার্থী কোন জাতির লোক। কংগ্রেসের পক্ষে ইহা কোন সন্তোষজনক কথা ছিল না; কিন্তু অবস্থা-গুণে আমরা নিজেদের ইহা হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে পারি নাই। এই প্রদেশের পক্ষে ইহা দুঃখ ও লজ্জার কথা যে আমরা এই নাম বাছাইয়ের

কাজে জাতির কথা একেবারে ভুলিতে পারি নাই আর আমাদিগকে এ-কথা ভাবিতে হইয়াছিল যে অমুক স্থানের অমুক প্রার্থীর নির্বাচনে অধিকার আছে এবং ইহাও দেখিতে হইয়াছিল যদি অমুক প্রার্থীর নাম আমরা গ্রহণ না-করি তাহা হইলে ইহার প্রভাব ঐ জাতির লোকের উপর তো খারাপ হইবেই, নির্বাচনের পক্ষেও খারাপ হইবে! আমাদের ইহাও ভাবিতে হইত যে যতগুলি প্রার্থী মনোনীত করা হইল তাহাদের মধ্যে সকল জাতির প্রার্থী লওয়া হইয়াছে কি না—লওয়া হইয়া থাকিলে এমন সংখ্যা লওয়া হইয়াছে কি না যে আমরা ঐ জাতির লোকদের সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি! এই সব কথা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের নয়। কিন্তু আমাদের নির্বাচনেও জিতিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাবিয়াও আমরা খুশী থাকিতাম যে সকল জাতির মধ্যে কংগ্রেস কর্মী এমনভাবে উপস্থিত থাকিত যে আমরা কংগ্রেসের নীতি অনুসারে তাহাদিগকে নির্বাচনও করিতে পারিতাম। এইজন্য কাহারও নির্বাচনে আমাদের বেশী আঘাতও খাইতে হইত না; কারণ যাহাদের নাম আমরা বাছিয়া লইতাম তাহারা প্রায়ই অন্যান্য দিক হইতেও যোগ্য হইত। কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে এই চিন্তা আসিতে দেওয়াই ঠিক ছিল না।

পুণায় হরিজনদের সঙ্গে যে-বোঝাপড়া হইয়াছিল তাহাতে স্থির হয় যে হরিজনদের জন্য সুরক্ষিত স্থানে এক প্রাথমিক নির্বাচন হইবে। তাহাতে শুধু হরিজনরাই যোগ দিবে। এই নির্বাচনে যদি চার বা তার চেয়ে কম হরিজন প্রার্থী হয় তাহা হইলে ভোট লইবার প্রয়োজন হইবে না, সকলের নামই বাছাই করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি প্রার্থীদের সংখ্যা বেশি হয় তাহা হইলে হরিজনেরা ভোট দিয়া ইচ্ছামত যে-কোনও চারজনকে নির্বাচিত করিবে। আবার নির্বাচন হইবে, তাহাতে হরিজন ও অন্য সকলে ভোট দিবে, যাহার সবচেয়ে বেশি ভোট হইবে সে-ই নির্বাচিত হইবে। ফলে সবর্ণ হিন্দুদের শেষ নির্বাচনে যোগ দিবার সুবিধা মিলিত, কিন্তু তাহারা ইচ্ছামত নির্বাচন করিতে পারিত না। হরিজনেরা প্রাথমিক নির্বাচনে যাহাদের বাছিয়া লইত সেই চারজনের মধ্যের একজনকেই তাহারা ভোট দিতে পারিত। এই বোঝাপড়ার ফল এই দাঁড়াইল যে হরিজনেরা দুইবার করিয়া ভোট দিবার অধিকার পাইল। সঙ্গে সঙ্গে হরিজন প্রার্থীদের একবার শুধু হরিজন ভোটদাতাদের মধ্যে, পরের বার হরিজন ভোটদাতা ও বর্ণহিন্দু ভোটদাতাদের মধ্যে প্রচার করিতে হইত, ইহা সহজসাধ্য ছিল না; কারণ ইহাতে খরচ বেশি পড়িত। এই প্রদেশে হরিজনদের ছিল ষোলটি আসন। আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম, ঐ সব আসনগুলিতেই কংগ্রেসী প্রার্থী দাঁড় করাইব, আর তাহারাই জিতিবে। এইজন্য তাহাদের মধ্যে প্রধান কর্মী ও প্রভাববান লোকদের সম্মতি লইয়াই আমরা নিজেদের

হরিজন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলাম। ইহার ফলে কংগ্রেসের এমন সব হরিজন জুটিয়াছিল যাহারা উহার নিয়মানুসারে কাজ করিতে চাহিত। হরিজনেরাও তাহাদিগকে পছন্দ করিত; কারণ তাহাদের সম্মতি লইয়াই তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া হয়। ইহাতে খরচও অনেক কম হইয়া গেল; কারণ অধিকাংশ আসনে শুধু একজনই হরিজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো হইল যে প্রথম নির্বাচনে বিনা বিরোধে নির্বাচিত হইল, পরের বার একই প্রার্থী বলিয়া তাহার নামে ভোট লওয়া-দেওয়ার কথাই উঠিল না। হ্যাঁ, কয়েকটা আসনে এমন হইয়াছিল যেখানে নির্বাচন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু শেষকালে ১৬টির ১৫টি আসন কংগ্রেসী প্রার্থীরাই পাইল। অন্যান্য প্রদেশে ইহা এতটা ভালভাবে হইতে পারে নাই বলিয়া হরিজনদের একাধিক দল হইয়াছিল। কেহ কেহ কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল, কেহ কেহ কংগ্রেসের বিরোধী। এই বিরোধের জন্য কংগ্রেসের প্রতি হরিজনদের অশ্রদ্ধাও হইয়াছিল। আমরা এই সমস্ত সমস্যা হইতে বাঁচিয়া গেলাম। তাহার এক কারণ ইহাও হইতে পারে যে আমাদের প্রদেশে উহাদের মধ্যে শিক্ষার খুব অভাব আছে; উহাদের মধ্যে এমন লোক বেশি ছিল না যাহারা নিজের নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য নিজেদের স্বতন্ত্র দল আবশ্যক বলিয়া মনে করিত।

নাম বাছাইয়ের পর সমস্ত দেশে প্রচারের কাজ সংগঠন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহের ভারও ছিল পারলামেণ্টারী কমিটির উপরেই। এ-কাজ বিশেষ করিয়া সরদার বল্লভভাই-ই করিতেন। প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে প্রয়োজন মত সাহায্য করা হইত। প্রাদেশিক কমিটিগুলি নিজেদের পৃথক ব্যবস্থাও সাধ্যমত করিত। উপরে যেমন বলিয়াছি, বিহারে প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিল কংগ্রেসী কর্মী। কংগ্রেস-কর্মীরা, বিশেষ করিয়া বিহারে, পয়সাওয়ালা লোক নয়। যাহাদের ঘরে খাওয়া-পরার সামান্য সংস্থান আছে, তাহারাও নির্বাচনে বেশি কিছু খরচ করিবার মত ছিল না। তাহা হইলেও যাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব সকলে নিজের নিজের খরচ করিল। প্রদেশের দিক হইতে যেখানে বেশি প্রয়োজন মনে হইত সেখানেই সাহায্য দেওয়া হইত। সমস্ত প্রদেশে যে প্রচার হইল তাহার খরচ প্রাদেশিক কমিটি দিল আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খরচ দিল সেখানকার প্রার্থীরা। নির্বাচন-প্রার্থীর মধ্যে যাহার সাহায্যের প্রয়োজন হইত, প্রাদেশিক কমিটি তাহাকে সাহায্য করিত। এইভাবে প্রাদেশিক কমিটিকে তো খরচ অবশ্য করিতে হইল, কিন্তু যদি আমরা হিসাব করিয়া দেখি যে কতগুলি ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটি কতখানি ব্যয় করিয়া সফলতা পাইল, তাহা হইলে সে খরচ বেশি বলিয়া মনে হইবে না। খানিকটা খরচ তো অনিবার্য। ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। এইটুকু তো অবশ্য করা উচিত যে প্রার্থী ও অন্য কংগ্রেসী কর্মী সর্বত্র গিয়া সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে

কংগ্রেসের বার্তা পেঁছাইয়া দেয় এবং ভোটদাতাদের সঙ্গে প্রার্থীদের পরিচয় হয়। ইহাতেই খরচ পড়িত অনেক।

কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র ও কংগ্রেস বিষয়ক অন্য সাহিত্য ছাপিয়া বিলি করাও আবশ্যক। উহা কেবল নির্বাচনের জন্যই নয়, জনসাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন। এই ধরনের খরচ তো সকল অবস্থাতেই অনিবার্য। কিন্তু শুধু সভার দ্বারাই প্রচার করা হইবে না, ইহারও প্রয়োজন ছিল। ভোটের জন্য প্রত্যেক ভোটদাতার নিকটেও কোথাও কোথাও যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—বিশেষ করিয়া কোন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে। ইহাতে অনেক খরচ পড়িত। আজকাল মোটর ছাড়া নির্বাচন হইতেই পারে না; কারণ দ্রুতগামী যানবাহন ভিন্ন সর্বত্র পেঁছান একপ্রকার অসম্ভব। প্রতিদ্বন্দ্বী যখন সেখানে বার বার আসিতেছে, তখন আমাদেরও সেইরূপই করিতে হয়। তাহা হইলেও আমার অনুমান যে বিহারে খরচ খুব বেশি পড়ে নাই; আমরা আমাদের কাজ সুবিধার সঙ্গেই শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু একথা তো আমাদের মানিতেই হইবে যে, আমরা যত ইচ্ছা কম খরচ করি, দেখা গেল যে গান্ধীজীর আদর্শ হইতে তাহা অনেক নিচে।

গান্ধীজীর মত তো এই ছিল যে কংগ্রেসের উপর লোকের এতখানি বিশ্বাস হওয়া চাই—এই বিশ্বাস কংগ্রেস নিজের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারাই অর্জন করিতে পারে—আর তাহার প্রার্থী এমন খাঁটী ও জনপ্রিয় সেবক হওয়া চাই যে কংগ্রেসকে নিজের তরফ হইতে শুধু ঘোষণা-পত্র ছাপাইয়া বিলি করা ও তাহার প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট হইবে—জনসাধারণের মধ্যে এতখানি উৎসাহ হওয়া চাই যে তাহারা কোন প্রেরণা ও উৎসাহ বিনাই ঠিক সময়ে গিয়া কংগ্রেসের প্রার্থীদের পক্ষে নিজের নিজের ভোট দিয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে নির্বাচনের সময়ে প্রচার ততটা বেশি আবশ্যক নয়, যতটা জনসাধারণের মধ্যে সর্বদা থাকিয়া তাহার সেবা করা। জনসাধারণের সেবাই প্রচারের সবচেয়ে অধিক বলিষ্ঠ উপায় হওয়া উচিত।

কথাটা তো ঠিক; কিন্তু এখনও আমরা এতখানি সেবা করি নাই। যতদূর পর্যন্ত আমাদের সেবা পেঁছিতে পারে সেই সীমানা পর্যন্ত আমরা জনপ্রিয় হইতে পারি, এবং সেই অনুপাতে নির্বাচনে আমাদের কম অসুবিধায় পড়িতে হয়। গত কুড়ি বৎসরের সেবা নিষ্ফল হয় নাই; কিন্তু উহা আরও বিস্তৃত ও স্থায়ী হওয়া উচিত ছিল। যেখানে স্বার্থের লেশ আসিয়া যাইবে, আমাদের অসুবিধাও তেমনি বাড়িতে থাকিবে।

দুঃখের সঙ্গে লিখিতে হইতেছে, নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আমাকে ইহা মানিতে বাধ্য করাইল যে অনেক কংগ্রেস কর্মী নিজের সেবার দাম গণনা করেন, তাহার বদলে কিছু-না-কিছু খুঁজিতে থাকেন—চাই এসেম্ব্লির

সভ্যপদই হউক আর জেলা মিউনিসিপালিটির সভ্য পদই হউক আর কিছু না হইলে কংগ্রেসের ভেতরে কোন প্রতিষ্ঠা বা অধিকারের স্থান! এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই সমস্ত স্থানে গিয়া মানুষ সেবা করিতে পারে—কোথাও কোথাও তো সেবার শক্তি বাড়িয়াও যায় যদি এই চিন্তা হইতে ঐ সমস্ত পদ বা স্থানের ইচ্ছা করা হয়, তাহা তো ঠিকই। কিন্তু কে বলিতে পারে যে এই ইচ্ছার মধ্যে সেবার ভাবই প্রবল, না উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল? একথা মনুষ্যের হৃদয়ও হয়ত ঠিক করিয়া বলিতে পারে না; কারণ এরূপ ব্যাপারে উহা সর্বদাই নিজেকে ধোঁকা দেয়, এই ধরনের লোক নিজের মনকেই বোঝায় যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে নয়, সেবার জন্যই সে

গান্ধীজী কোনও প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন যে যে-ব্যক্তি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব পাইবার জন্য লালায়িত, তাহাকে সভাপতি না করা উচিত। যে এ-পদ সেবার জন্য গ্রহণ করে, প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, সে ইহার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে না—অবসর আসিলে উহা শিরোধার্য করে। যে-সব স্থানে জনসাধারণ বাছিয়া বাছিয়া জনসেবক নিযুক্ত করে, সেই সকল স্থানের জন্য এই কথা মানিয়া চলা উচিত। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি এমন যে নিজের ঢোল নিজেকেই পিটাইতে হয়! স্বভাবের স্থান উচ্চাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করে। আমরা মনে করি এ-সকল আসন নিজের জীবনে নিজের উন্নতির উপায়, সংসারের ভিড়ে এগুলিকে নিজের অগ্রসর হওয়ার এক উপায় বলিয়া ভাবি। ইহা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিকূল, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য মতের অনুকূলই বুঝিতে হইবে। আজ ইহা হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া গিয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে আমাদের সামনে আজ এই আদর্শ রাখিতেও সংকোচ হয় যে নির্বাচনের জন্য কাহাকেও নিজে দাঁড়াইতে হইবে না—যাহাদের নির্বাচনের অধিকার আছে তাহাদের উপরই যোগ্য ব্যক্তি খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার সমর্পণ করা উচিত—যদি তাহাদের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িয়া যায় আর তাহারা আমাদের নির্বাচন করে তাহা হইলে তাহাদের আজ্ঞা মানিয়া নিজের সাধ্যমত ঐ আসন হইতে যতদূর সম্ভব তাহাদের সেবা করিয়া যাওয়া উচিত। সংসারে সত্যকার প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ততক্ষণ হইতে পারে না, যতক্ষণ এই প্রকারের কোনও কথা না চালানো যায়। ইহার জন্য ত্যাগের ভাবনা দৃঢ় হওয়া উচিত, ভোগের ভাবনা ক্ষীণ করা উচিত; আমাদের ধ্যেন হউক সেবা, প্রতিষ্ঠা নয়, অন্য কোনও স্বার্থ নয়।

এদিকে পারলামেণ্টারি কমিটি এইভাবে নির্বাচনের জন্য আয়োজনে ব্যস্ত, ওদিকে পণ্ডিত জওয়াহরলালজী দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া লোকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি

যে পরিমাণ পরিশ্রম ও উৎসাহের সঙ্গে দেশ-ভ্রমণ করিয়া লোককে জাগাইয়াছিলেন, অতখানি জোরে প্রচার সম্ভবত আর কোনও সভাপতি তাঁহার সভাপতিত্বের সময়ে করেন নাই। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, আর তাহা ঠিকই বলিয়াছিলেন, যে এই প্রকারের নির্বাচনে, যেখানে কোটি কোটি লোকের ভোট লইবার কথা, প্রত্যেক ভোটারের নিকটে যাওয়ার আশা ব্যর্থ; আর যদি তাহা সম্ভব হয়ও তাহা হইলেও উহাতে যে কতটা ফল পাওয়া যাইবে বলা যায় না। সবচেয়ে বেশি দরকার হইল বাতাবরণ পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার, যাহাতে যদি কেহ বাহিরে সরিয়া পড়িবার চেষ্টাও করে, যেন বাহির হইতে না পারে। তিনি এই বাতাবরণ প্রস্তুত করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেন। ফল হইল খুব ভাল।

ফৈজপুরে কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রথম গ্রামে অধিবেশন

লখনউয়ের অধিবেশন হইয়াছিল এপ্রিলে। সেখানে এক প্রস্তাব এরূপও হইয়াছিল যে করাচিতে ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন না-করিয়া ফেব্রুয়ারি-মার্চে করিবার যে-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেই প্রস্তাব বদল করা হউক। এইজন্য ইহার পরের বার্ষিক অধিবেশন ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরেই হইবার কথা ছিল। ইহা শুধু আট মাসের ভিতরেই পড়িত। দেশ জওয়াহরলালজীকে তৃতীয় বারের জন্য আবার সভাপতি নির্বাচিত করিল। এই অধিবেশন ফৈজপুরে হইল। স্থানটি বোম্বাই প্রদেশে—কংগ্রেসী মহারাষ্ট্র প্রদেশে—পূর্ব খান্দেশে। ইহা একটি গ্রাম মাত্র, শহর বলেন তো ছোট শহর। গান্ধীজী মত প্রকাশ করিলেন যে কংগ্রেসের অধিবেশন গ্রামে হইলে জনসাধারণ তাহাতে বিশেষ লাভবান হইতে পারে। প্রথম কথা তো ইহাই হইবে যে গ্রামের লোকদের উহার ব্যবস্থায় যোগ দিতে হইবে আর এইভাবে তাহারা উহার সমস্ত কাজকর্মে রস গ্রহণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয় কথা এই হইবে যে অতিথিদের আদর-অভ্যর্থনা ও থাকা-খাওয়ার জন্য যে-ব্যবস্থা করা হইবে তাহাতে গ্রামের লোকদের আর্থিক লাভও হইবে। গান্ধীজী চাহিতেছিলেন, ব্যবস্থাও এইরূপ হউক যে তাহাতে গ্রামের জিনিষেই কাজ চলিয়া যায়। এইভাবে উহা যেন গ্রামোদ্যোগের উৎসাহের কারণও হয়। তিনি মহারাষ্ট্রের লোকদের অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন এই কংগ্রেসের ব্যবস্থা যথাসাধ্য গ্রামোদ্যোগের দ্বারা উৎপন্ন বা উপস্থিত করা হইয়াছে এরূপ বস্তু দিয়াই করে। কাজ কঠিন ছিল, কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতি যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিল।

আজকাল কংগ্রেসের অধিবেশন খুব বড় আকারে করিতে হয়। উহা যেখানেই করা হউক না কেন, খুব বড় আয়োজন করিতে হয়। গাঁয়ে এই আয়োজনের বিস্তার আরও বাড়িয়া যায়। সেখানে তো কোনও জিনিস পাওয়া যায় না, সব কিছু জুটাইয়া লইতেই হয়। যেখানে লাখ লাখ লোক একত্র হইবে, সেখানে তাহাদের জন্য শুধু জলের ব্যবস্থা করাই কঠিন কাজ হইয়া পড়ে। তাহাদের থাকিবার ও খাইবার, আলো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা কিছু কম কঠিন নয়। সঙ্গে সঙ্গে, যেখানে এতজন লোক একত্র হইয়াছে সেখানে তাহাদের দেখিবার মত কিছু কলাবস্তু থাকাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। গান্ধীজীর আদেশে সেখানে যথাশক্তি গাঁয়ের জিনিসই ব্যবহার করা হইল।

বাংলার বিশ্বভারতীর প্রসিদ্ধ কলাকার শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সেখানে গিয়া কংগ্রেস-নগর ও প্যাণ্ডেল এবং প্রদর্শনীর সাজসজ্জা ইত্যাদির খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেন। প্রশংসার কথা এই যে সাজানোর জন্য গাঁয়ে যে বাঁশ ও কাঠ মিলিত তাহাই কাজে লাগানো হয়। যে ফটো তৈয়ারি করা হইল বা অন্য যে সমস্ত সাজের জিনিস তৈয়ারি হইল তাহার সাদাসিধার মধ্যেও খুব সৌন্দর্য ছিল। ইহা দেখিয়া লোকদের আশ্চর্য বোধ হইল যে এই সব ছোটখাট সাধারণ জিনিস দিয়া কলাবিদ তো বিচিত্র ও সুরুচির শিল্প তৈয়ারি করিতে পারেন। শেষটায় তো প্রকৃতির সৌন্দর্য এই সমস্ত জিনিস দিয়াই তৈয়ারি হয়। আমরা কি প্রকৃতি হইতেও বেশি সুন্দর কোন জিনিস তৈয়ারি করিতে পারি? কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আজ দূষিত হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না। আমরা কলাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বস্তু বলিয়া মানিয়া বসি। যাহা হউক, ফৈজপুরের বিশেষত্ব ছিল সেখানকার সরলতার সৌন্দর্য।

জলের জন্য সেখানে লোকেরা অনেক বড় বড় কূয়া খোঁড়াইয়াছিল, তাহা কংগ্রেসের পরেও সেখানকার জনসাধারণের কাজে আসিবে। থাকিবার জন্য ঝুপড়ি তৈয়ার করা হইল, তাহাতে গ্রামেরই খড়পাতা, বাঁশ, চাটাই ইত্যাদি কাজে লাগিল। এইভাবে ফৈজপুরের অধিবেশন হইল প্রথম গ্রামের অধিবেশন, যাহাতে গ্রামোদ্যোগেরই প্রাধান্য থাকিল। এখানে খাদির স্থান তো সর্বাগ্রে বটেই, আর খাদি দিয়াই সব জায়গা ঢাকিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু অধিবেশন হইল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, তখন খুব ঠাণ্ডা পড়ে। এইজন্য বাহির হইতে যে হাজার হাজার লোক আসিলেন তাঁহাদের খুব কষ্ট হইল; কারণ ঐ ছোট জায়গায় এতগুলি আগন্তুকের থাকার মতো কোন পাকা বাড়ি, ধর্মশালা এমন কি কুঠির পর্যন্ত পাওয়া যাইত না। ঐ হাজার হাজার লোক এমনিতেই খোলা ময়দানে ও ক্ষেতে সারারাত পড়িয়া থাকিত। একথা গান্ধীজীর মনে খুব লাগে। তিনি ঐ নিয়মকে আবার

বদলাইয়া দিলেন। তখন হইতে কংগ্রেস আবার মার্চ মাসে হইয়া আসিতেছে।

ফৈজপুরের অধিবেশন হইয়াছিল নির্বাচনের সামান্য কয়েক দিন পূর্বে। এই জন্য সেখানে নির্বাচনের সম্বন্ধে খুব উৎসাহ ছিল। কয়েকটি জায়গার কত প্রধান কর্মী আসেন নাই, নিজের নিজের স্থানে নির্বাচনের ব্যবস্থায় লাগিয়া থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া। এখানেও নূতন গঠনতন্ত্র নামঞ্জুর ও নির্বাচনে যোগ দিবার কথা হইয়াছিল। ব্যাপারটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল যাহাতে নির্বাচনের পরে তাঁহারা স্থির করিয়া দেন যে মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে কংগ্রেসের কিরূপ নীতি হইবে। জওয়াহরলালজীর মত ছিল ইহার বিরোধী ও তাহা সকলের জানাই ছিল; কিন্তু সেখানেই জানা গেল যে কংগ্রেস আছে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পক্ষে, এবং প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখনও ঐ প্রস্তাব পর্যন্ত যাওয়ার সময় হয় নাই; এইজন্য ঐ অধিকার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকেই দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এই অধিবেশনের কিছু পূর্বে, শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়) বিদেশ হইতে ফিরিবার পর, সাজা খাটিয়া জেল হইতে বাহির হন। তিনি এই অধিবেশনে সর্বপ্রথম যোগ দেন। হইতে পারে যে যতদিন তিনি এতটা বিখ্যাত হন নাই, বিদেশে যাওয়ার পূর্বে, কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু এদিকে ইহাই ছিল উহাতে যোগ দিবার তাঁহার প্রথম অবসর। আমার সঙ্গেও তাঁহার সর্বপ্রথম ঐখানেই পরিচয় হয়। এখনও তাঁহার মতের সঙ্গে দেশের পরিচয় হয় নাই, আর কংগ্রেসে স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল। তিনি সংযুক্ত প্রদেশের প্রতিনিধি ছিলেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হন। এইভাবে তিনি কংগ্রেসে ভাল করিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন।

নির্বাচনের জন্য ভ্রমণ ও তাহার ফল

কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেলে আমরা সকলে নিজের নিজের প্রদেশে নির্বাচনের কার্যে যোগ দেওয়ার জন্য চলিয়া গেলাম। সেখানেই আমরা পণ্ডিত জওয়াহরলালের নিকট হইতে বিহারের কোনও কোনও অংশে ঘুরিয়া যাইবেন বলিয়া কথা লইয়াছিলাম। অল্প কিছুদিন পরেই তিনি বিহারে ঘুরিয়া যাইতে আসিলেন। আমিও ঘুরিবার শক্তি পাইয়া-

ছিলাম। আমার নিজের জন্যও যাত্রাক্রম প্রস্তুত করিলাম। সর্বত্র জওয়াহরলালজীর যাওয়া সম্ভব ছিল না; কারণ তাঁহাকে তো সমস্ত দেশ ঘোরাইতে হইবে। এইজন্য আমরা এরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে তিনি যেখানে যাইবেন না আমি সেখানে যাইব। আমি তাঁহার সঙ্গে ঘুরিতে বাহির হইলাম না। আমি নিজের যাত্রা আরম্ভ করিলাম পৃথকভাবে। এইভাবে, আমরা দুই জনে মিলিয়া প্রায় সমস্ত প্রদেশ ঘুরিয়া ফেলিলাম। পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ প্রভৃতি অন্যান্য নেতারাও আসিলেন। যেখানে যেখানে শক্তি ক্ষীণ দেখা গেল সে-সব জায়গায় তাঁহারা গেলেন। জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব উৎসাহ ছিল। ভ্রমণের পর আমাদের মনে আর সফলতার সম্বন্ধে কোনও প্রকারের সন্দেহ বা আশঙ্কা থাকিল না। যখন নির্বাচনের ফল বাহির হইল তখন জানা গেল যে আমরা যতটা আশা করিয়াছিলাম তাহার চেয়েও বেশী সফল হইয়াছি। উপরে বলা হইয়াছে, হরিজনদের জন্য যে-ষোলটি স্থান নির্দিষ্ট ছিল তাহার মধ্যে পনেরোটিতেই কংগ্রেসী প্রার্থী নির্বাচিত হইল। মেয়েদের জন্য যে-স্থান নির্দিষ্ট ছিল তাহার মধ্যে তিনটি অ-মুসলমানের স্থান কংগ্রেস পাইল। শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে একটা বাদে আর সমস্ত কংগ্রেসী প্রার্থীরাই পাইয়াছিলেন। আদিবাসীদের স্থানেও অল্পস্বল্প বাদ দিয়া কংগ্রেসের লোকেরাই সমস্ত জিতিয়া লইল। হ্যাঁ, তবে জমিদারদের আসন কংগ্রেস পায় নাই। কিন্তু একটি ছাড়া অন্য কোনটির জন্য কংগ্রেস প্রার্থীও দাঁড় করায় নাই—তাহার মধ্যেও কংগ্রেসের হার হইল। তাহা আমরা তো জানিতামই। এইজন্য ইহা হতাশ হইবার কোন কারণ হয় নাই।

বিহারের পরিষদে মুসলমানদের জন্য ৩৯ কি ৪০টি স্থান নির্দিষ্ট আছে। নির্বাচনের অনেক পূর্ব হইতেই কংগ্রেসী মুসলমান ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মতাবলম্বী মুসলমান উভয় দলে কথাবার্তা হইতেছিল। কাহারও কাহারও মত ছিল যে যতদূর সম্ভব কংগ্রেসের তরফ হইতেই সর্বত্র প্রার্থী দাঁড় করানোর। কাহারও মত ছিল যে রাজনৈতিক মুশ্লিম সঙ্ঘের সঙ্গে —যেমন, জমায়েৎ উলেমার সঙ্গে—বোঝাপড়া করিয়া লওয়া হউক—যাহাতে কংগ্রেসী ও অন্যান্য দলের মধ্যে কোন বিরোধ না হয়। কিন্তু কংগ্রেসী মুসলমানেরাই একমত হয় নাই। এজন্য কংগ্রেস কমিটিগুলি কিছু বিপন্ন বোধ করিতেছিল। তাহা হইলেও, অল্প কয়টি জায়গার জন্য কংগ্রেসী প্রার্থী দাঁড় করানো হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জন্য রাষ্ট্রীয় মুসলমানেরা বিরোধিতা করিবার জন্য প্রার্থী দাঁড় করায় নাই। কয়েক জায়গায় বিরোধিতাও হইল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মুসলমান ছাড়া অন্যান্য মুসলমান দলও কিছু কিছু ছিল। তাঁহারাও নির্বাচনে যোগ দিল। মুশ্লিম লীগের শক্তি কিছু ছিল না। যতদূর মনে পড়ে লীগের পক্ষ

হইতে কদাচিৎ এক-আধ জন প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছে। জমায়েৎ উলেমার সাহায্যে এক দল গড়িয়া উঠিল, যাহাদের বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন জমায়েৎ-উলেমার মান্য নেতা ও ইমারত-সরায়েতের নায়েব-আমীর, মৌলানা আবুল মোহাম্মদ মহসীন সাজ্জাদ। মিঃ মহম্মদ ইউনুস আসিয়া এই দলে যোগ দিলেন। মুসলমানদের এই দল সবচেয়ে প্রবল বলিয়া মনে হইত। এই দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কথাবার্তা হয়, ফলে কংগ্রেস অল্প কয়েক স্থানেই প্রার্থী দাঁড় করায়। কয়েকজন এমন মুসলমান যাহাদিগকে সর্বপ্রকারে কংগ্রেসী বলিয়া মনে হইত আর যাহারা কংগ্রেসের কার্যক্রম অনুসারে জেলে পর্যন্ত গিয়াছিল, তাহারা ঐ দলের তরফ হইতে দাঁড়ায়। উক্ত দল যথেষ্টরূপে কৃতকার্য হইয়াছিল। পরিষদের মুসলমান সভ্যদের মধ্যে বেশির ভাগ আসিয়াছিল ঐ দল হইতে। পরে যখন মুসলিম লীগের জোর বাড়িল, তখন হয়ত এইরূপ আর রহিল না; কিন্তু কাহার দিকে বেশি মুসলমান সভ্য থাকিবে সে তো পরিষদ বসিলে জানা যাওয়ার কথা। ইউনিভারসিটির আসন শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ কংগ্রেস-প্রার্থীকে হারাইয়া গ্রহণ করেন।

বিহারের নির্বাচন প্রথমেই শেষ হইয়া গেল। এইজন্য এখানকার কয়েকজন কর্মী সংযুক্ত প্রদেশে চলিয়া গেল। এখানকার সফলতার কথা সেখানে পূর্বেই পৌঁছিয়াছিল, আর ইহারাও গিয়া কিছু কাজ করিল। আমিও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে গেলাম। অল্প কিছু দিনের জন্য অন্য প্রদেশেও যাই। সেখানকার লোকেরা আমাকে যেখানে লইয়া যাওয়া উচিত মনে করিল সেখানেই লইয়া গেল। মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুর জেলায় আমাকে দিয়া সবচেয়ে বেশি কাজ করান হয়। সেখান হইতে এক-দিনের জন্য জব্বলপুর জেলায় কাটনির নিকটবর্তী ক্ষেত্রেও যাইতে হয়। সেখানে বিলাসপুরের এক ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরোধিতা করিতেছিলেন। উহাতে কংগ্রেসের হার হয়; কিন্তু অন্য যে-সমস্ত জায়গায় গিয়াছিলাম, সর্বত্র কংগ্রেস জয়লাভ করে। ঐরূপে কাটনিতেও কংগ্রেসের জিত হইল। সংযুক্ত প্রদেশে অযোধ্যার কয়েকটি জেলায় আমি গিয়াছিলাম। আবার ধামপুর জেলায় গেলাম, সেখানে কংগ্রেসের বিরোধিতা ছিল অতিশয় প্রবল। ধামপুর হইতে কিছু দূরে তরাইয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে কষ্টে-সৃষ্টে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারা যাইত। লোকেরা বলিত যে কোনও কংগ্রেসী নেতা ইতিপূর্বে সেখানে আসে নাই। এইজন্য সেখানে খুব বড় ভিড় জমা হইয়াছিল। লোকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল প্রচুর। গিয়া ভালই হইয়াছিল; কারণ সেখানে কংগ্রেসের জিত হয় অল্প সামান্য কিছু ভোটের জোরেই।

সংযুক্ত প্রদেশ হইতে আবার চলিয়া গেলাম মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে।

মহারাষ্ট্রে কিছুদিন ধরিয়া ঘুরিলাম। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যেরূপ সফলতা পাইয়াছিলাম সেখানে ততটা হইল না। এক জায়গায় তো সভায় আমাদের পৌঁছিবার পূর্বেই আমাদের বিপক্ষ, আমার কথা শুনিবার জন্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট বক্তৃতা করিয়া সকলকে নিজের নিজের বাড়ি যাইতে বলিয়া দিল! সে দয়া করিয়া ইহার কারণও বলিয়া দিল, আমি নাকি সেখানে আসিতে পারি নাই আর সেখানে আসিবও না! হয়তো একথাও বলিয়া দিয়া থাকিবে, কোন কংগ্রেস কর্মীই এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, ইহাতেও আশ্চর্য হইবার কথা নয়! কিন্তু অন্যান্য জায়গায় খুব সভা হইয়াছিল। অনেক স্থানও আমরা পাইয়াছিলাম; কিন্তু যতখানি আশা করিয়াছিলাম ততখানি নয়। সবচেয়ে বেশি হার হইল রত্নাগিরিতে, লোকেরা ইহা হইতে বেশি আশা করিয়াছিল। মহারাষ্ট্র হইতে আমি কর্ণাটক গেলাম, কয়েকটি জায়গায় ঘুরিলাম। সেখানে ভালমত সফলতা পাইলাম। এক জায়গায় হার হইল, যেখানকার সম্বন্ধে সেখানকার লোকেরা অনেক আশা রাখিত। সেখানকার প্রার্থীও ছিলেন কংগ্রেসের কৃতি কর্মী শ্রীহনুমন্ত রাও কউজলজী। কিন্তু নির্বাচনে এরূপ ব্যাপার তো সর্বদাই হয়।

এ পর্যন্ত অন্য জায়গায় নির্বাচনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি অন্ধ্রপ্রদেশে একটি মাত্র জায়গায় যাইতে পারিয়াছিলাম, বেলাড়ি জেলা। সেখানকার ভ্রমণ শেষ করিয়া ওয়ার্ধায় ফিরিয়া আসিলাম। এই-ভাবে আমার দ্বিতীয় বার ভ্রমণ হইয়াছিল মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক প্রদেশের কয়েকটি জেলায়। কয়েকটি স্থান পূর্ব পরিচিত, পুনরায় দেখিবার সুযোগ মিলিল। এইভাবে সমস্ত দেশে নির্বাচন দ্বন্দ্ব শেষ হইল। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে কংগ্রেসের যথেষ্ট জয়লাভ হইল। পাঞ্জাব, বাঙলা ও সিন্ধু প্রদেশেও কংগ্রেসের লোক নির্বাচিত হইল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অন্য দলের চেয়ে বেশি ছিল না। সীমান্ত প্রদেশেও কংগ্রেসের দল ছিল সবচেয়ে বড়। কিন্তু একবারও তখন কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ভোট হয় নাই।

নির্বাচনের পর এখন স্থির করিবার সময় আসিল যে কংগ্রেস মন্ত্রীপদ লইবে কি লইবে না। এতগুলি প্রদেশে বেশি ভোট পাইয়া কংগ্রেস কি মন্ত্রীত্ব লইয়া কাজ করিবে, না পদ না-লইয়াই কাজ করিবে? এ-বিষয় আলোচনার জন্য দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন করা হইল। সভাপতির মত হইল এই যে কংগ্রেসের সকল সভ্যকে এই সময় সেখানে ডাকা হউক আর কংগ্রেস-নির্বাচিত সদস্যদেরও এক সভা হউক। তাহাতে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতি নিজের নিজের শ্রদ্ধা ও কর্তব্য পালনে বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতিশয় উৎসাহের মধ্যে এই পরিষদের

অধিবেশন হইল। এই পরিষদের সকল সদস্য লইয়া কংগ্রেসের নিয়মানুবর্তিতা ও দেশোদ্ধারের কার্যে সেখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইল যাহাতে স্থির হইল যে কংগ্রেস তখনই মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবে যখন গভর্নর কথা দিবেন শাসনতন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে যে বিশেষ অধিকার দেওয়া হইবে তিনি তাহা প্রয়োগ করিবেন না বরং সকল বিষয়ে মন্ত্রীদের পরামর্শ মতই কাজ করিবেন। গান্ধীজী এই কথার উপর খুব জোর দিয়াছিলেন যে এই কথা না দিলে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা অনুচিত; কারণ শাসনতন্ত্রে গভর্নরের জন্য অনেক অধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে —যদি তিনি সেগুলি প্রয়োগ করেন তাহা হইলে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ কোন মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারিবে না; এইজন্য যদিও কংগ্রেসকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবার ভার অস্বীকার করিলে চলিবে না তথাপি গভর্নর উপরে লিখিত মতো কথা দিলে তবেই কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিবেন।

যখন শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছিল তখন এই সব বিশেষ অধিকারের কথায় খুব টিকা-টিপ্পনী হইতেছিল। যে-সব কারণে ঐ শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য হইল গভর্নরের এই বিশেষ অধিকার তন্মধ্যে এক বিশেষ কারণ। সেই সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের এই মতের বিষয়ে মন দেন নাই, নিজের ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। এখন গান্ধীজী এই দৃষ্টিতে প্রাদেশিক গভর্নরদের এই সমস্ত অধিকার ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ পুস্তকে এই অধিকার লেখা থাকিলেও গভর্নর যদি কাজে না-লাগান তাহা হইলে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এক দারুণ অভিযোগ দূর হইয়া যায়। আমাদের মধ্যে যাহারা মন্ত্রীপদ লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহবান ছিলেন তাঁহারাও ইহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন; কারণ তাঁহারাও বুঝিতেন এই গোঁণ-রীতি অনুসারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গঠনতন্ত্রের সেই সব ধারা রদ করিবে না আর যদি কংগ্রেস এই শর্ত হইতে না নড়ে তাহা হইলে মন্ত্রীত্ব গঠন হইবে না। কিন্তু যাহারা মন্ত্রীত্ব গঠনের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা খুশী হইলেন। কারণ তাঁহারাও বুঝিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইহা মানিবেন না।

গান্ধীজী এই বিষয়ে অটল রহিলেন। তিনি বলিলেন তাঁহার মতে মন্ত্রীত্ব গঠন না-করা খুব ভুল হইবে; কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি ভুল হইবে এই শর্ত-বিনা মন্ত্রীপদ গ্রহণ করা। শেষকালে ইহা গৃহীত হইল। কংগ্রেসের সভ্যদের আদেশ দেওয়া হইল যে তাঁহারা নিজেদের নেতা নির্বাচন করিয়া লউন। গভর্নমেণ্ট যখন নেতাকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে ডাকিবেন তখন নেতাই ইহা প্রস্তাব করিবেন ও বলিবেন যে গভর্নমেণ্ট যদি নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিবেন না বলিয়া কথা দেন তাহা হইলেই মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হইবে, অন্যথায় নয়।

১৯৩৭-এর পয়লা এপ্রিল নূতন শাসন-বিধান অনুসারে মন্ত্রীমণ্ডল

গঠন করার কথা ছিল। ঐদিন সকল প্রদেশের শাসনতন্ত্র ঐ বিধান অনুসারে আরম্ভ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেসের এই সংকল্পের পরে গভর্নর-দের এবং তাঁহাদের কর্তা ভাইসরয়কে এখন ভাবিতে হইল তাঁহারা এখন কি করিবেন। শাসনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী তাঁহাদিগকে এসেম্ব্লির মধ্যে যে-দল সবচেয়ে বড় সেই দলকে তিনি বলিয়া দিবেন যেন তাঁহারা মন্ত্রী-মণ্ডল গঠন করেন। এসেম্ব্লি পার্টি-মেম্বারদেরও নিজেদের নেতা নির্বাচন করিতে হইবে। এইজন্য সর্বপ্রথমে সকল প্রদেশে মেম্বারদের নিজের নিজের নেতা বাছিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিহারে পার্টি ও প্রাদেশিক কমিটির অধিবেশন একদিনেই হইল যাহাতে নেতা বাছাই করিতে হইল। এ-বিষয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় ইহা আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আমি মনে করিতাম সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচন করাই ভাল। আমি দেখিলাম কোন কোন লোক কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা করিতেছে, কয়েকজন আমার কাছেও আসিলেন। আমি দলাদলি করিতে মানা করিলাম এবং এই মত প্রকাশ করিলাম যে যাহার সম্বন্ধেই কথা বলিতে চান প্রথমে তাহার নিকটেই বলিতে হইবে যে তিনি একথা পছন্দ করেন কি না। সভা বসিলে এই স্থির করা হইল যে আমিই প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান সাথে আলাদা আলাদা কথা বলিয়া লইব আর যেমন যেমন মত বুঝিতে পারিব তেমন তেমন উহার অনুসারে নির্ধারণ করিব, তাহা হইলে ভোটাভোটির গোলমাল আর আসিবে না।

আমি সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া নিজের মত স্থির করিয়া লইলাম, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে পার্টির নেতা করা হউক। এ-বিষয় স্থির করিতে আমার এই কথা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল যে অন্য জনও—শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, যাঁহার কথা কেহ কেহ বলিতেছিল—আমাকে নিজে হইতে বলিয়াছিলেন, তিনি এই পদ চান না। আর যাঁহারা ও-বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতেছিলেন তাঁহারা তাঁহার সম্মতিক্রমে কাজ করিতেছিলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন ডাক্তার সৈয়দ মামুদ, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইতেছিল। তিনি কয়েক বৎসর হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন। খিলাফত কমিটির সময়ে তাহার প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। রাজনীতির আলোচনায় তিনি কংগ্রেসের একজন পাকাপোক্ত পুরানো সমর্থক ও পোষক ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ কাহারও চেয়ে কম ছিল না। তথাপি, বিহার প্রদেশে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসী কর্মীদের মধ্যে, উপরের দুইজনের তুলনায় কম লোকপ্রিয় ছিলেন। প্রদেশের বাহিরে কাজ করিতেন বলিয়া ঐ দুইজনের মতো সকলের তাঁহার

সঙ্গে ততটা পরিচয় ছিল না। ঐ দুইজনের মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তাঁহার বক্তৃতা শক্তির দ্বারা নিজেকে বেশি লোকপ্রিয় করিতে পারিয়াছিলেন। ত্যাগের পরিমাণে ও নির্ভীকতায়ও তিনি প্রশংসনীয়। অনুগ্রহবাবুর সংগঠন শক্তি ও আফিস চালাইবার ক্ষমতা সকলেরই জানা। এই সব কারণে আমার মত ছিল শ্রীকৃষ্ণবাবুর পক্ষে। আমি যখন সমস্ত জেলাগুলির লোকদের সঙ্গে কথা বলি, তখন অধিকাংশ লোকের মতও আমার সঙ্গে মিলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামদয়ালু সিংহও প্রদেশের এমন একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি যাঁহার কথাও কেহ কেহ ভাবিতে পারিত; কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি তুলিত এবং এই বিরোধী দলের মধ্যে তাঁহার নিজের জেলারও কেহ কেহ ছিল। কেহ কেহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল যে আমি একজনের সম্বন্ধে প্রচার করিয়া জেলার লোকদের দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করাইয়া লইয়াছি। কথা ঠিক তাহা ছিল না; হইলেও আমার কিছু দুঃখ বা লজ্জা হইত না; কারণ, যতদূর বুঝিতে বা দেখিতে পারিয়াছি, জেলার লোকেরা শ্রীকৃষ্ণবাবু ও অনুগ্রহবাবু, এই দুইজনের মধ্য হইতেই একজনকে নেতা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অনুগ্রহবাবু এই গণ্ডগোলে পড়িতে চাহেন নাই। এইজন্য, যদি আমি কিছু করিয়াই থাকি, তাহা হইলে তাহার প্রভাব এতটুকু মাত্র ছিল যে আমি দুইটি নাম প্রস্তাব করিতে দিই নাই। শেষে একটি নামই প্রস্তাব করা হইল। তাহা হইল শ্রীকৃষ্ণবাবুর নাম, লোকে সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গ্রহণ করিয়া লইল।

পরে এই কথায় মুসলমানদের মধ্যে—বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের বাহিরের মুসলমানদের মধ্যে—কিছু অসন্তোষ বাড়িল। তাহারা নিজেদের এই মতও প্রকাশ করিল যে ডাক্তার মামুদকে কেবল মুসলমান বলিয়াই নেতা করা হইল না—যদিও তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্যে অন্য সকলের তুলনায় বেশি বিখ্যাত ছিলেন এবং বেশি কাজ করিয়াছিলেন। এই কথা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের কানে পর্যন্ত উঠিল। আজও যখন সব কথা আবার আলোচনা করি তখন আমার মনে হয় না যে ডাক্তার সাহেবকে নেতা করায় আমি কিছু ভুল করিয়াছিলাম। ইহার অর্থ এই নয় যে শ্রীকৃষ্ণবাবুর প্রতি আমার যে-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি তাহা নাই। আমি তাঁহার গুণের অনুরাগী। কিন্তু যখন এমন সময় আসে যে দুই বা ততোধিক বন্ধুর মধ্যে কোন একজনকেই কোনও স্থানের জন্য দেশের দিক হইতে নির্বাচন করিতে হয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে হইতেও একজনকে বাহির করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যদি কেহ একথা বলেন যে যে-সমস্ত কারণে 'ক'-কে লওয়া হইল ও 'খ'-কে লওয়া হইল না, সেগুলি একে একে সমস্ত বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে উহা অসম্ভব

না-হইলেও অন্ততঃ কঠিন তো বটেই। আমরা কাহারও বিষয়ে সব কথা বলিতে চাই না বলিয়া কঠিন নয়। আমার অভিজ্ঞতা এই যে এরূপ ব্যাপারে সব কিছু ভাবিয়া ও বিচার করিয়া লোকে একটা কিছু স্থির করে, আর তাহার সমস্ত কারণগুলি সে নিজেও স্পষ্ট করিয়া সকলের সামনে বলিতে পারার মতো জানে না—তাহা হইলেও তাহার নিজের মনে সন্তোষ থাকে যে সে ঠিক করিয়া যাইতেছে। এখানেও সেই কথা। ইহা আমার পক্ষে সন্তোষের কথা যে পরে যখন একথা অভিযোগরূপে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সামনে রাখা হইল তখন তিনি অভিযোগকারীদের নিকট এই কথাই বলিলেন যে যদি তিনি আমার জায়গায় থাকিতেন তাহা হইলে তিনিও সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া হয়ত আমি যে-ব্যবস্থা করিয়াছি তাহাই করিতেন।

বিহারে এই প্রথম নির্বাচন এইভাবে ধুমধামের সহিত শেষ হইয়া গেল। কিন্তু সকল প্রদেশে এইরূপ হইল না। কয়েক স্থানে, যেমন মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায়, নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য হইল, যাহার ফল দেখা গেল যখন নিজেদের দলাদলি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পাইল। সংযুক্ত প্রদেশে হয়ত কোনও প্রকারের মতভেদ হয় নাই। বোম্বাইয়ে এমন একজনকে নেতা করা হইল যাঁহার যোগ্যতা ও চরিত্র বিষয়ে কাহারও তো কোনও সন্দেহ ছিলই না, কিন্তু যিনি সেখানকার সুপরিচিত লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন না। ইনি হইলেন লালাসাহেব খের। ইনি সর্বদা নিজেকে পিছনে রাখিতেন। যদিও তিনি মতবাদে দৃঢ় ও কর্মে নিপুণ ছিলেন তথাপি ইঁহাকে বাহিরের লোকেরা জানিত কমই। একটি ঘটনা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফৈজপুর কংগ্রেসের সময় ইঁহার উপর ছিল স্টেশনে কংগ্রেস যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করিয়া অভ্যর্থনা করার ভার। সেখানেও যাঁহারা ইঁহাকে প্রথম হইতে জানিতেন না তাহারা বড় একটা জানিতে পারেন নাই যে বোম্বাই প্রদেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী—তাও আবার এক অতি সার্থককর্মা ও কার্যদক্ষ প্রধানমন্ত্রী—তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের আসবাবপত্র গাড়িতে বোঝাই করিতেছেন, অথবা নিজে আগাইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে গাড়িতে চড়াইয়া দিতেছেন। সংযুক্ত প্রদেশেও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে সকলে জানিতেন ও চাহিতেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনি যে-ধরনের কাজ করিয়াছিলেন তাহা হইতে সেখানে বা অন্যান্য প্রদেশের লোকদের মনে এ-ধারণা উঠিতেই পারিত না যে তিনি ছাড়া সেখানে আর কেহ এই পদে নির্বাচিত হইতে পারেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারীর বিষয়েও এই কথা ছিল।

গভর্নরেরা নিজের নিজের প্রদেশে, যেখানে কংগ্রেসের ভোট বেশি অথবা যেখানে সবচেয়ে বড় দল ছিল কংগ্রেসীদের, কংগ্রেস পার্টির নেতাকে

ডাকিয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহাকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করায় সাহায্য করিতে বলা হইল। সেই নেতারা নিজেদের দিক হইতে সেই কথাই উপস্থিত করিলেন, যাহার আদেশ তাঁহারা পাইয়াছিলেন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিকট হইতে। গভর্নরেরা কোথায়ও এ-কথায় রাজি হন নাই যে তাঁহারা বিশেষ ও সংরক্ষিত অধিকার প্রয়োগ করিবেন না। তাঁহাদের বলার ছিল যে শাসনতন্ত্র বদলাইবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না এবং এই ধরনের কথা দিয়া গৌণভাবে সেই নিয়ম বদলাইতে পারেন না। যতদূর জানি, সবচেয়ে প্রথমে মান্দ্রাজের গভর্নরই ডাকেন রাজাজীকে। সেখানে যাহা ঘটিল সর্বত্র তাহার পুনরাবৃত্তি হইল। সেখানকার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হইল এই যে গভর্নর অস্বীকার করিলে রাজাজী মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাই সর্বত্র হইল।

কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই শাসনতন্ত্রকে, যাহা গঠন করিতে তাহার কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল, আর যাহার বিষয়ে এতটা প্রচার করা হইয়াছিল, এইভাবে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেই মরিতে দিতে চাহিলেন না। তাহার কর্মচারিগণের মনে হয়ত আশা ছিল যে কংগ্রেসের লোকেরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণের লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না; এইজন্য ১লা এপ্রিল না হইলে কয়েক দিনের মধ্যে ছিদ্র বাহির করিয়া পরে তাহার ভোটাধিক্য এদিক-ওদিক করিয়া দিতে পারা যাইবে। এইজন্য গভর্নমেণ্ট স্থির করিয়া লইল যে, যে-ভাবেই হউক, যাহাকেই হউক, অল্পদিনের জন্য হইলে তাহাই সই, পরিষদের ভোটের বিরুদ্ধেই হউক না কেন, মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে হইবে —কাহাকেও না কাহাকে প্রধানমন্ত্রী ও তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে জুটাইয়া ১লা এপ্রিলে মন্ত্রীমণ্ডলের নাম অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দেওয়া চাই। এখন এই চেষ্টা সকল প্রদেশেই হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহা কংগ্রেসের পক্ষে খুব গৌরবের কথা যে, কোনও প্রদেশে একজনও কংগ্রেসী এরূপ পাওয়া গেল না যে এই ধোঁকায় পড়িয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে। এইজন্য কংগ্রেসের বাহিরের লোকদের মধ্য হইতেই কিছু লোক নিযুক্ত করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। গভর্নর এরূপ করিতেও পারিতেন; কারণ শাসনতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে, ছয় মাস পর্যন্ত, পরিষদের অধিবেশন না-করিয়াও, শাসনকার্য, গভর্নরের অনুমতি ও তাঁহার বাজেট মঞ্জুর করিয়া দিলে, চলিতে পারিত। তাঁহারা এই আশায় সর্বত্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিলেন, যে পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে হয়ত হাওয়া বদলাইবে—হয়ত কংগ্রেসের জোর কিছু কমিবে।

বিহারে এই কাজের ভার গভর্নমেণ্ট দিলেন মিঃ মহম্মদ ইউনুসকে। এই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির তরফ হইতে নির্বাচন করা হয়; এই পার্টির প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মৌলানা আবুল মোহসীন

মোহম্মদ সজ্জাদ। মৌলানা সজ্জাদ ছিলেন জমিয়ৎ-উলেমার নেতা। মনে হইতেছিল যে তিনি কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। নির্বাচন ব্যাপারেও তাঁহার সঙ্গে বোঝাপড়া যদি না-ই হইয়া থাকে তবে ঝগড়াও কিছু হয় নাই। কত কংগ্রেসী মুসলমান তাঁহার পার্টিতে এইজন্য নাম লিখাইয়াছিল যে তাহারা ঐরূপে সহজে নির্বাচিত হইতে পারিবে, বিশেষত তাহারা যখন বুঝিতেছিল যে কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে মৌলানা সজ্জাদ অনেকটা একমত। কিন্তু এই উপলক্ষে মৌলানার ভুল হইল। তিনি নিজের পার্টিতে স্থির করিলেন যে তিনিই মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবেন। জানি না সেখানে কি-সব কথাবার্তা হইল। তখনকার হাওয়ায় নানা ধরনের কথা ছিল। কেহ কেহ বলিত, কংগ্রেসী মতের মুসলমানেরা আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আর সকলের তুলনায় দুই-একটি কম ছিল। কেহ কেহ বলিত, পার্টির শেষ পরামর্শ দেওয়ার সুযোগই হয় নাই; কারণ যখন এক জায়গায় বসিয়া পার্টি আলোচনা করিতেছিল যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবে কি না, তখন মিঃ ইউনুস গভর্নরের নিকট গিয়া কথা দিয়া আসিলেন যে তিনি মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন, এবং গভর্নরের কথায় তিনি মন্ত্রীদের নামও দিয়া দিয়াছেন, গভর্নর সে-সমস্ত গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, আর তখন তিনি আসিয়া পার্টির সভায়—যাহা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল—এই খবর দিলেন যে মন্ত্রীমণ্ডল নিয়োগ করা হইয়া গিয়াছে! ইহার পরে পার্টি কিছু বলিতে পারিল না—হয়ত তাহারাও এখন এ-বিষয়ে কিছু বলা অনর্থক বলিয়া মনে করিল! জানি না, কোন্‌টি সত্য!

এ-বিষয়ে বিহারে এক মস্ত কথা হইয়া গেল। আমরা খবর পাইলাম যে মিঃ ইউনুস কংগ্রেসের অন্য মেম্বারদের তো বাঁধিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি হরিজন মেম্বারদের উপর খুব জোর করিতে লাগিলেন, এবং তিনি শ্রীযুক্ত জগজীবনরামকে মন্ত্রীমণ্ডলে স্থান দিতে স্বীকার করিয়াছেন! এ-খবরও পাওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত জগজীবনরামকে সঙ্গে করিয়া গভর্নরের নিকটেও গিয়াছেন, অথবা তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য আর কোথাও তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন! সকলে একটু চিন্তায় পড়িল, কে জানে কংগ্রেসের কোনও একজনকেও তিনি না বাঁধিয়া ফেলেন! আমার এ-চিন্তা ছিল না, কারণ আমি প্রথমেই খবর পাইয়াছিলাম যে মিঃ ইউনুসের চেষ্টা অবশ্যই আছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম এই সব ধোঁকায় পড়িবার পাত্র ছিলেন না। শেষে এইরূপই হইল। মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইল; কিন্তু তাহাতে যোগ দেওয়ার কথায় শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম পরিষ্কার অস্বীকার করিলেন—অন্য কোন কংগ্রেসের লোকও যোগ দিলেন না। এইজন্য এই প্রথম প্রবল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মিনিস্ট্রী গঠন ব্যাপারে আমাদের কোনও চিন্তা ছিল না; কারণ আমরা জানিতাম, ছয় মাসের মধ্যে হয়ত মিনিস্ট্রী

ভাঙিবে, নয়তো শাসনতন্ত্রেরই রদবদল হইবে। কারণ এই যে কংগ্রেসী সভ্য এমন ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইয়াছেন যে অন্য কোনও পার্টি অথবা অন্য সকলে মিলিয়াও পরিষদে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না—পরিষদ ও কাউন্সিলের মিলিত অধিবেশন হইলেও কংগ্রেসের পক্ষেই বেশি ভোট থাকিবে। যে-দিন মিনিস্ট্রী গঠিত হইল সেই দিন পাটনায় জনকয়েক লোক মিঃ ইউনুসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল, ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণ। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলিবার পর তাঁহার কিছু সাজাও জুটিল। কিন্তু পরে মিঃ ইউনুস মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

এইভাবে অন্যান্য প্রদেশেও মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হইল। অন্তত নূতন বিধান অনুসারে শাসনকর্ম চলিতেছে ইহা দেখাইবার মতো হইল। কিন্তু একথা গভর্নরেরা এবং তাঁহার মন্ত্রীরাও জানিতেন যে এ হইতেছে অল্প কয় দিনের তামাসা। তাঁহারা এই চেষ্টায় ছিলেন যে যদি তাঁহারা ভেদ-নীতির দ্বারা নিজেদের অনুকূলে ভোটাধিক্য না পান, তাহা হইলে কংগ্রেসের সঙ্গে মিল করিবার কোন না কোনও রাস্তা করিতেই হইবে। কংগ্রেসের যে-সব সভ্য মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবার বিরোধী ছিলেন, কংগ্রেস যে ইহাতে কোনও মতে জড়াইয়া পড়ে নাই তাহাতে খুশিই ছিলেন এবং তাঁহাদের কুটীল নীতিকে কাজে লাগাইবার পক্ষে বর্তমানই উপযুক্ত সময়। যাঁহারা অনুকূলে ছিলেন তাঁহারা একথা বুঝিতেন যে আজ না হইলে অল্প কয়েকদিন পরেই কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব হইবেই, আর যখন হইবে তখন গভর্নরের বিশেষ অধিকারকে বন্ধ করিয়াই তাহা হইবে। এইজন্য এই সময়ে এই বিষয়ে কংগ্রেসীরা নিশ্চিত ছিলেন। মন্ত্রীমণ্ডল নিজেদের লোকপ্রিয় করিবার ফিকিরে ছিলেন, আর গভর্নরেরা ও ভাইসরয় এই সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন। গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে যখন-তখন বিজ্ঞপ্তি বাহির হইত, আর কংগ্রেসের তরফ হইতে উহা যথেষ্ট নয় বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

তিন মাসের পর ভাইসরয় এক বিজ্ঞপ্তি বাহির করিলেন, তাহা ওয়ার্কিং কমিটি আলোচনা করিয়া আরও কিছু স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহিলেন, এবং কংগ্রেস পার্টির নেতাদের আদেশ দিলেন যে ঐ স্পষ্টীকরণ তাঁহাদের নিকট সন্তোষজনক মনে হইলে তাঁহারা মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিতে পারেন। ব্যাপারটা এই—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একথা পরিষ্কার ভাষায় বলিতে পারেন না যে শাসনতন্ত্রের কয়েকটি ধারা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; কারণ তাঁহাদের ইহা বলিবার অধিকারও ছিল না। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের নীতি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়া দিলেন যে অধিকার সাথা সত্ত্বেও গভর্নর উহা কাজে

লাগাইবেন না। যেহেতু একথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হয় নাই, তাই স্পষ্ট করিয়া বলার দরকার ছিল। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবের পর বোঝা গেল, এখন শীঘ্রই আবার কংগ্রেসের লোকদের মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবার জন্য ডাকা হইবে!

এই সময়ে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন সারণ জিলার 'মসরক' গাঁয়ে করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। প্রফেসর আবদুল বারি ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। আমরা সকলে সেখানে গেলাম, এবং কনফারেন্সের কাজ শেষ করিয়া ছাপরায় পেঁছিলাম। সেখানেই জানিতে পারা গেল, গভর্ণর শ্রীবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, আর এক চাপরাশি পত্র লইয়া সেখানেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিল। সেখানে মন্ত্রীমণ্ডল সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়া লইবার সুযোগ আমরা পাইলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা স্থির করিতে পারিয়াছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটির কথামত যদি স্পষ্টীকরণ সন্তোষজনক হয় তবে আমরা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে প্রস্তুত, যদি গভর্নর মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে বলিয়া থাকেন তাহা হইলে সেজন্য সময় লইয়া শ্রীকৃষ্ণবাবু ফিরিয়া আসিবেন, তখন আমরা একত্র বসিয়া আলোচনা করিব যে মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে কাহাকে কাহাকে লওয়া যায়। ছাপরায় কিছু কিছু গোড়ার কথা হইয়া গিয়াছিল। চিন্তা বিনিময়ও হইয়া গিয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা সামান্য যে কয়েকজন লোক সেখানে একত্র হইয়াছিলাম সকলে ইহার মধ্যে ভাবিতে পারিত।

মন্ত্রী নির্বাচন করা ছিল এক কঠিন সমস্যা। প্রথমে তো এই যে কতজন মন্ত্রী হইবে। আমার মত ছিল, ইহার পূর্বে চারজন লোক শাসন-ব্যাপারের সমস্ত কাজ সামলাইত, সকল বিভাগ হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে পারিত। তাহার মধ্যে দুইজন তো ছিলেন গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউনসিলার আর দুইজন মিনিস্টার। এইজন্য আমি মনে করিতাম যে এই নূতন বিধানের পূর্বে যখন চারজন লোক সমস্ত কাজ সামলাইতে পারিত তখন এখনও চারজন মন্ত্রীরই সমস্ত কাজ নির্বাহ করা উচিত। বেশি মন্ত্রী করিলে খরচ বেশি হইবে, আর এমন ধারা কিছু মনে হইবে যে ইহারা নিজের জন্য পদ পাইবার বাসনা হইতে আসিয়াছে, যতটা সম্ভব ততটা পদ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতেছে। যেখানে যেখানে মন্ত্রীমণ্ডল পাকাপাকিভাবে গঠন করা হইয়াছিল, সেখানে মন্ত্রীদের সংখ্যা বেশি রাখা হইয়াছিল, আমরা তাহা লইয়া কিছু কিছু টিপ্পনীও করিয়াছিলাম! যদিও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বাড়ি ও যানবাহন ভিন্ন মাসে পাঁচশত টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এইভাবে খরচ খুব কম হইয়া যাইত, তাহা

হইলেও আমার এই মত দৃঢ় ছিল যে মন্ত্রীদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করিয়া বিহারে চারজনের বেশি স্থান নাই। আমার বলিয়া দেওয়া উচিত যে পরে দেখিয়াছি, আমার মত ভুল ছিল; কারণ আমাদের সব মন্ত্রী এই ধরনের কাজে এখনও নূতন ছিলেন, আর পূর্বকার কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ইহা ভিন্ন আমাদের মন্ত্রীদের পূর্ব নির্দিষ্ট ধারায় কাজ করিলে হইবে না। তাঁহাদের অনেক নূতন প্রোগ্রাম চালাইতে হইবে, এইজন্য ঐ সমস্ত প্রোগ্রামের বিষয় জানিতে ও মত স্থির করিতে সময় লাগিবেই। এইজন্য কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার পর আমি দেখিলাম, হয়ত চারজনের বেশি মন্ত্রী রাখিলেই ভাল হইত। কিন্তু তখন আমার ধারণা ছিল দৃঢ় ও আমি ভাবিতাম যে চারজনের বেশি মন্ত্রী রাখা বিহারের পক্ষে উচিত হইবে না।

এছাড়া আরেকটা কথা ছিল যাহার কিছু-না-কিছু প্রভাব এই প্রস্তাবে আসিতে নিশ্চয়ই কাজ করিয়াছিল। আমরা ভাবিতেছিলাম যে প্রদেশে এমন কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আছেন যাঁহার বিষয় কোন রকমের মতভেদ হইতে পারে না; কিন্তু যখন আমরা তাঁহাদের ছাড়াইয়া যাই তখন এমন কেহ কেহ সামনে আসিয়া পড়েন যাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচন করা— কাহাকে লওয়া, কাহাকে না লওয়া, ইহা স্থির করা—যথেষ্ট কঠিন বলিয়া মনে হইত। এইজন্যও মনে হইত যে আমাদের নির্বাচন যদি ঐ সকল প্রধান ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি তাহা হইলে খারাপ হইবে না। আরো দুই একটি কথা উল্লেখ করাও উচিত হইবে। এই বিষয় প্রায় সকলেই একমত হইয়া গিয়াছিলেন যে একজন হরিজনকে মন্ত্রী করিতে হইবে। অন্য সব বিচার ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারা যে মিঃ ইউনুস-এর কথা না শুনিয়া— অতিশয় প্রলোভনের লোভ সংবরণ করিয়া—মন্ত্রীপদের জন্য নিজেদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। এইজন্য ইহাতে সকলের মনে আপনি আপনিই স্থির হইয়াছিল। কোন বিতর্কের স্থান ছিল না। হাজারিবাগের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণের ইচ্ছা ছিল যে ছোটনাগপুরের দিক হইতে সেখানকার কাহাকেও মন্ত্রী নিযুক্ত করা হউক। তাঁহার বক্তব্য ছিল যে প্রদেশের ঐ ভাগ অনগ্রসর বলিয়া মনে করা হইত, কংগ্রেসও তাহার দিকে পুরা মন দিত না। তিনি আমার নিকট বন্ধুভাবে এই অভিযোগ বরাবর করিতেন যে আমিও ঐ অঞ্চলে যথেষ্ট মন দি না। এই অভিযোগের সমর্থনে তিনি বলিতেন যে আমি সেখানে গিয়া কখনও কিছুদিনের জন্য থাকি না। আমিও তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলিতাম যে গত বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যে আমি ছোটনাগপুরে যতটা সময় কাটাইয়াছি এমন কোথাও কাটাই নাই; কারণ কারাজীবন বরাবর হাজারিবাগেই কাটাইতে হইয়াছে। রহস্যের দিক দিয়া দেখিলে ইহাত ঠিকই উত্তর কিন্তু ইহাতে তিনি খুশী হইতে পারিতেন

না। এইজন্য তিনি জোর করিয়া বলিলেন যে ছোটনাগপুরেও মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি নিজে ছিলেন সেখানকার প্রধান কর্মী। এই সময় তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য। প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় তিনি দাঁড়ান নাই। এইজন্য তাঁহাকে মন্ত্রী করিলে কোন স্থান শূন্য করিয়া কয়েকদিনের মধ্যে সেই স্থানে তাঁহাকে প্রাদেশিক পরিষদের সভ্যও করিতে হইবে। কংগ্রেসে যিনি নির্বাচিত ছিলেন তিনি ইহা খুব খারাপ বলিয়া মনে করিলেন; কারণ তিনি মনে করিতেন, আর ঠিকই মনে করিতেন যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই পদের যোগ্য মনে করা হইল না এইজন্য নির্বাচিত লোকদের ছাড়িয়া বাহির হইতে একজনকে লইতে হইল। এই মত অনুসারে তাঁহাকে মন্ত্রীমণ্ডলে গ্রহণ করা অসম্ভব হইল, ইহাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আমার নিকটে কয়েকখানি চিঠিও লিখিয়াছিলেন, আমিও অবশ্য তাহার উত্তর দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে তিনি হয়ত সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সকলকে লইয়া যেখানে কাজ সেখানে কখনও কখনও এরূপ করিতে হয়। আমার মতো লোকের পক্ষে যাহার কাহারও সঙ্গে তিক্ত ব্যবহার করিতে খুব দুঃখ হয় এরূপ অনিচ্ছাকৃত কাজ ভারি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু কর্তব্যের দৃষ্টি হইতে আজও আমি মনে করি যে এই বিষয়ে আমি যাহা স্থির করিয়াছিলাম তাহা ঠিকই করিয়াছিলাম।

শেষটায় আমাকে আরো একটি সমস্যা সমাধান করিবার ছিল। হরিজনদের মধ্যে দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ছিলেন—এক শ্রীজগলাল চৌধুরী. ইনি ১৯২০ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এম. বি. পাশ করিয়া ডাক্তার হইতে পারিতেন। কিন্তু কংগ্রেসের আহ্বানে পড়া ছাড়িয়া তখন হইতে বরাবর একচিত্ত হইয়া কংগ্রেসের সেবায়, বিশেষতঃ গঠনমূলক কর্মে, নিযুক্ত আছেন, সত্যাগ্রহেও যোগ দিয়া জেল ঘুরিয়া আসিয়াছেন; দ্বিতীয় শ্রীজগজীবনরাম, ইনি অত্যন্ত উৎসাহী ও সুযোগ্য কর্মী ছিলেন। কংগ্রেসে অল্পদিন কাজ করিলেও ইঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং মিঃ ইউনুস যে-মন্ত্রীত্ব দিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সমস্ত কথা অনেকক্ষণ ভাবিবার পর আমরা স্থির করিলাম যে শ্রীজগলাল চৌধুরীকেই মন্ত্রী করা হইবে আর শ্রীজগজীবনরামকে করা হইবে পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি।

এইভাবে আমরা স্থির করিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে করা হইবে প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার সঙ্গে ডাঃ সৈয়দ মামুদ, শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ আর শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরী মন্ত্রী হইবেন এবং চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে আটজন হইবেন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারি। শ্রীযুক্ত রামদয়ালু সিংহকে স্পীকার ও প্রফেসার আবদুল বারিকে ডেপুটি স্পীকার করা হইবে তাহাত ঠিকই ছিল। পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়, শ্রীযুক্ত শার্ঙ্গধর সিংহ, শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন, শ্রীযুক্ত বিনোদানন্দ ঝাঁ, শ্রীযুক্ত শিবনন্দন মণ্ডল, শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম ও শ্রীযুক্ত সদুউল হককে নিযুক্ত করা হইল। ঐ সময়ে আমি বুঝিয়াছিলাম যে নিয়োগগুলি ঠিকই করা হইল, পরেও আমার মত বদলাইবার অবসর হয় নাই—যদিও কাহারও কাহারও মতে ইহার চেয়ে ভাল নির্বাচন হইতে পারিত। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম মন্ত্রীদের সকলেরও একথায় আমার সঙ্গে সায় ছিল।

আমি দুইটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—যদিও ইচ্ছা ছিল যে প্রথমেই তাহা বলি। একটি হইল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের (কাউনসিলে) নির্বাচনের সম্বন্ধে, অন্যটি এসেম্ব্লির সভাপতি বা স্পীকার নির্বাচনের বিষয়। কাউনসিলের ভোটারেরা বেশির ভাগ ধনিক শ্রেণীর, জমিদারির খাজনা অথবা অতিরিক্ত আয়কর দেওয়ার লোকেরই সংখ্যা বেশি। এই কারণে আমাদের যেমন জমিদারির আসনের জন্য নির্বাচনে জয়ের আশা ছিল না, তেমনি এই সব আসন জিতিবারও আশা ছিল কম। কিন্তু ইহাতে দুইভাবে সদস্য নির্বাচন করা হয়—কিছু ভোটারদের নিকট হইতে নির্বাচন করা হয়। কিছু নির্বাচন করেন এসেম্ব্লি বা পরিষদের সদস্যেরা। এসেম্ব্লি দ্বারা যাঁহারা নির্বাচিত হন তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের লোকেরা অনেককে নির্বাচন করিতে পারিত; কিন্তু ভোটারদের মধ্যে তাঁহাদের ততটা বেশি সাহায্যকারী হয়ত ছিল না। তাই আমরা প্রথম হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে আমরা সব আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইব না। কিন্তু যে-কয়টি জায়গা পাওয়া যাইতে পারিত সে-সকলের জন্য আমরা প্রার্থী দাঁড় করাইলাম, জয়লাভও করিলাম; তবে আমাদের শক্তির পরিচয় হইত এসেম্ব্লির দ্বারাই।

স্পীকার নির্বাচন করিবার জন্য একদিন পরিষদের অধিবেশন হইল। সেদিনের জন্য গভর্নর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহকে সভাপতি নিযুক্ত করেন। আমিও সেই একদিন এসেম্ব্লিতে গিয়াছিলাম। তাহার পূর্বে বিহার

এসেম্বলিতে কখনও যাই নাই। তাহার পরও কখনও আর যাইবার সুযোগ ঘটে নাই। ভাল কথা, শ্রীযুক্ত রামদয়ালু সিংহকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের পর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ এক কৌতুকপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রামদয়ালুবাবুর অভ্যর্থনা করিতে করিতে আমার এক বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি দেন। ঐ উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছিল যে, যে প্রার্থী কংগ্রেসের দিক হইতে নির্বাচিত হন তাঁহাকে তো কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণেও তাহার নীতি ও নিয়মের বন্ধনে থাকিতে হইবে; কিন্তু যিনি স্বতন্ত্ররূপে নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, তিনি মুক্ত বৃষের মতো, তাঁহার উপর কোনও প্রকারের বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। আমার এই কথা বলিয়া তিনি খুব রহস্য করিয়াছিলেন।

এইভাবে মন্ত্রীত্ব তো স্থির হইয়া গেল। আমি নিয়োগের দিনই মন্ত্রীদের বলিয়াছিলাম যে সব প্রার্থী যদি কয়েকদিনের মতো এক সঙ্গে থাকেন তাহা হইলে সবচেয়ে ভাল হয়, এরূপ না করিতে পারিলে কোন-না-কোনও বাহানায় তাহারা প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে একত্র হইয়া নিজেদের সমস্ত বিভাগের কথা লইয়া যেন খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা করেন; তাহা হইলে সমস্ত বিভাগের কাজের সঙ্গে সকলের পরিচয় থাকিবে, সকলের যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব স্থির করিবার পূর্বে অন্যের মতামত ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারিবে—বিশেষতঃ যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইবে অথবা কোনও বিশেষ স্থানের জন্য কোনও নূতন নিয়োগ করিতে হইবে তখন নিজেদের মধ্যে অবশ্য আলাপ-আলোচনা করিয়া লইবেন। এ পর্যন্ত এই ধরনের কাজে কাহারও অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া ইহার প্রয়োজন ছিল, সর্বদা একত্র থাকিয়া একে অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হইতে থাকিবেন, সকলের পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা হইতে পারিল না! পরে জানা গেল যে সব মন্ত্রীদের নিজের নিজের বিভাগ ছাড়া অন্যের বিভাগের সব কথা জানা থাকিত না। ইহার জন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু অভি-যোগেরও সৃষ্টি হয়। বোম্বাইতে শ্রীযুক্ত খের শুরু হইতেই এই নীতি প্রবর্তিত করেন। সেখানকার মন্ত্রীরা প্রায় প্রত্যহ একত্র হইয়া একে অন্যের কার্যকলাপের সম্পূর্ণ খোঁজ-খবর রাখিতেন। সংযুক্ত প্রদেশে ও মান্দ্রাজে তো শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারির এরূপ ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁহারা নিজেরা মন্ত্রীদের কার্যকলাপের সমস্ত খোঁজ-খবর রাখিতেন; এইরূপে সেখানেও কাজকর্ম ঠিকভাবে চলিতে থাকিত।

মন্ত্রীত্ব উপলক্ষ্যে আমাকে উড়িষ্যায়ও যাইতে হইয়াছিল। সেখানে পার্টির নেতা নির্বাচনের সময় নিজেদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে জানা গেল। এ-কথা পার্লামেণ্টরি কমিটি পর্যন্ত আসিয়াছিল। উড়িষ্যার নেতৃস্থানীয়-

দের মধ্যে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস একজন। ১৯২১ সাল হইতেই তিনি কংগ্রেসে অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তিনি স্বগীয় পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস মহাশয়ের সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন। ১৯৩০-৩৪-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমাদের সঙ্গেই হাজারিবাগ জেলে থাকিতেন। সে-সময়েও তাঁহার মত জানা গিয়াছিল, নূতন শাসনতন্ত্রে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা উচিত। ১৯৩৪-এ যখন কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য নির্বাচন হয় তখন উড়িষ্যা হইতে কংগ্রেসী সভ্যরূপে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের নূতন বিধান অনুসারে উড়িষ্যা বিহার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেলে বিহার পরিষদের জন্য সভ্য নির্বাচন যখন হয় তখন তিনি কোনও স্থান হইতে প্রাদেশিক পরিষদের জন্য দাঁড়ান নাই। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে যখন বেশি ভোট হইল এবং জানা গেল যে কংগ্রেস কখনও মন্ত্রিত্ব লইলে পরিষদের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হইবেন, তখন তিনি সেখানকার সভ্যদের মধ্য হইতে নেতা নির্বাচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। ঐ নির্বাচনের সফলতায় তাঁহার হাত ছিল। কিন্তু সেখানকার সদস্যদের সামনে এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, পরিষদের সদস্য নহেন এরূপ কোনও লোককে পরিষদের পার্টির নেতা কিরূপে নির্বাচন করা যায়। পরিষদের পার্টির নেতাকে পরিষদে হাজির থাকিতে হইবে। সেখানে থাকিয়াই তিনি নিজের কাজ করিয়া যাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, গভর্নর ডাকিলে তো তিনি পরিষদের কোনও সভ্যকেই ডাকিতে চাহিবেন, বাহিরের আর কোনও লোককে ডাকিতে তাঁহার অসুবিধা হইবে। অবশ্য বাহিরের লোকও, ছয় মাসের মধ্যে তিনি কোথাও হইতে সভ্য নির্বাচন হইবেন, এই শর্তে মন্ত্রী হইতে পারেন। কিন্তু পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস শুধু মন্ত্রী হইতে চাহেন নাই; তিনি প্রধানমন্ত্রীই হইতে পারেন; কারণ সে-পদ তাঁহার উপযুক্ত। পার্লামেণ্টারি কমিটির মত হইয়াছিল যে সভ্যদের মধ্য হইতেই কাহাকেও নেতা নির্বাচন করা যাইতে পারে। এইজন্য শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাসকেই নেতা নির্বাচিত করা হইল, তিনি ব্রহ্মপুরের লোক, পূর্বে মান্দ্রাজ পরিষদের সভ্য ছিলেন, যখন তাঁহার ও জেলা মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমাকে এইজন্য যাইতে হইয়াছিল যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে এই ঝগড়া হইতে কিছু মতভেদ হইবার ভয় ছিল। আমি সেখানে গেলাম। সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন ইহাই উঠিল যে, মুসলমানদের মধ্যে কাহাকে মন্ত্রী করা হইবে। সেখানকার পরিষদে মুসলমানদের সংখ্যা খুব অল্প। যে-অল্প কিছু দিনের জন্য মন্ত্রীত্ব লওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক মন্ত্রী ছিলেন। অন্য এমন কাহাকেও নজরে পড়িল না যিনি কংগ্রেসের তরফ হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং মন্ত্রীর কাজ করিতে

পারেন। এই ধরনের লোক, যাঁহার কাজ চালাইবার যোগ্যতা ছিল, তাঁহাকে কংগ্রেসী টিকিটে নির্বাচন করা হয় নাই এবং এখনও কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমি দুই-তিন দিন কটকে বসিয়া থাকিলাম। কোনও উপযুক্ত মুসলমানকে মন্ত্রী করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহা সফল হইল না। শেষকালে, কোনও মুসলমান না লইয়াই ঐ সময় মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হইল; কিন্তু এই ব্যাপারে শেষ মীমাংসা পরে মৌলানা আজাদকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সংযুক্ত প্রদেশেও মুসলমান মন্ত্রী লইয়া অসুবিধা ছিল; কারণ সেখানেও কংগ্রেস টিকেট লইয়া দুই-একজন মুসলমানই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অন্য লোকেরা স্বতন্ত্র প্রার্থীভাবেই নির্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহা লইয়া মৌলানা আজাদ কথা বলিয়াছিলেন। কয়েকজন মুসলমান—যাঁহারা কংগ্রেস-এর সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেন, কিন্তু কংগ্রেসের তরফ হইতে নির্বাচিত হন নাই—মৌলানা সাহেবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য তৈয়ারী ছিলেন। সেই বোঝাপড়া যদি হইয়া যাইত, তাহা হইলে লীগের সঙ্গে যে-ঝগড়া হইল তাহা সম্ভবতঃ হইত না। কিন্তু সেই সময় প্রদেশের কংগ্রেসী নেতারা এই কথায় রাজি হইলেন না। মৌলানা সাহেবেরও সেখানে পুরাপুরি থাকিবার সময় হইল না—বোম্বাই যাইতে হইল! এই-জন্য সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে শ্রীযুক্ত রফি আহমদ কিদোয়াই নামে একজন কংগ্রেসের কর্মী ও হাফিজ আহমদ ইব্রাহিম—ইনি কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত হন নাই—এই দুই জনকে মন্ত্রী করা হইল। এখানে বলা উচিত যে হাফিজ সাহেব পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত হন। বোম্বাইয়ের সমস্যা—মৌলানা সাহেবের মত অনু-সারে সমাধান হইয়া গেল এবং মিঃ নূরিকে মন্ত্রী করা হইল। এইভাবে মধ্যপ্রদেশে মিঃ শরিফ মন্ত্রী হইলে।

মুসলমান মন্ত্রীদের সম্বন্ধে এতখানি লেখা এইজন্য আবশ্যক হইল যে পরবর্তীকালে ইহা লইয়া মুসলিম লীগ খুব গণ্ডোগোল সুরু করিয়া-ছিল। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের এবং অন্য লোকেরা নির্বাচনের কথায় এবং শাসনতন্ত্র-বিহিত বিধানে গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলের কথায় ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীমণ্ডলের ছবি দেখিত। তাহারা সেখানকার রীতি-নীতি অনুসারে এখানকার মন্ত্রীমণ্ডল সংগঠিত ও উহার কাজকর্ম নিষ্পন্ন করিতে চাহিত। এইজন্য সকল দলই নিজের নিজের প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিল। নির্বাচনের সময় কিছু কিছু নূতন দলও হইয়াছিল যেমন বিহারের ইণ্ডিপেনডেণ্ট পার্টি। নির্বাচনের পরে যখন এক পার্টি অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষে ভোট কয়েকটি প্রদেশে প্রবল হইল, তখন উহাকে নিজের দলের বাহির হইতে কাহাকেও মন্ত্রী করিবার কথা এই প্রকার বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিতে হয় যে, কংগ্রেস দলেও মুসলমান ছিল। তাহাদের ছাড়িয়া বাহিরে গেলে তাহাদের প্রতি অন্যায় হইবে। নির্বাচন পর্যন্ত লীগের তেমন কিছু জোরও ছিল না, খুব কম জায়গায় লীগ প্রার্থী খাড়া করিয়াছিল। যেখানে যেখানে দাঁড় করাইয়াছিল সে-সব স্থানে খুব সফলও হয় নাই। এইজন্য লীগের পক্ষে কংগ্রেসের ভোটাধিক্য থাকিলে প্রায় সর্বত্রই মন্ত্রী গঠন করা অবৈধ হইত। কংগ্রেস এক ঘোষণা-পত্র অনুসারে নির্বাচন সংগ্রাম জিতিয়াছিল, সেই পত্র অনুসারে কাজ করা ছিল উহার কর্তব্য। সব সভ্যরা কংগ্রেসের আজ্ঞানুসারে তাহার কাজ করিবে, আদেশ হইলে পদত্যাগ করিবে।

কংগ্রেসের নিকট এক অস্ত্র ছিল পদত্যাগের, বৈধ রীতি অনুসারে মতভেদ হইলে সে ইহা দিয়া গভর্নরকে থামাইয়া রাখিতে পারিত। কংগ্রেসের বাহিরে কাহাকেও এই সর্ত স্বীকার না করাইয়া মন্ত্রী করাইয়া দিলে তাহার হাতে অন্য কোন অস্ত্র থাকিত না যাহা দিয়া গভর্নরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের মতে মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে সকলের সমান দায়িত্ব মানা হইয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে যে-কোন মন্ত্রী যে-কোনও কাজ করুণ, তাহার দায়িত্ব তাঁহার সহকর্মীদের উপর রহিয়াছে। এইভাবে সকলে একে অন্যে সাহায্য করিয়া থাকে, আর একে অন্যের কার্য-কলাপের উপর চাপও (অঙ্কুশ) রাখে। মতভেদ হইলে যাহার মত অধি-কাংশের হইতে পৃথক তাহাকে হটিয়া যাইতে হয়। যদি দুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের আজ্ঞা মানিতে বাধ্য অথবা বচনবদ্ধ মন্ত্রী কোথাও কোন মন্ত্রীমণ্ডলে থাকেন, আর ঐ দুই প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার সঙ্কল্প ও ব্যবস্থা না করিয়া থাকেন তাহা হইলে হইতে পারে যে দুই প্রতিষ্ঠানের পরস্পর বিরোধী আজ্ঞা আসিল এবং মন্ত্রীরা নিজের নিজের প্রতিষ্ঠানের আজ্ঞা পালন করিল, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যকলাপের মধ্যেই বিরোধের সৃষ্টি হয়। এইজন্য, ইহা আবশ্যক ছিল যে মন্ত্রী মণ্ডলের সকল মন্ত্রী কোন একটি প্রতিষ্ঠানেরই হুকুম মানিবার জন্য বাধ্য বা বাক্যবন্ধ হয়, অথবা নিজেদের মধ্যে অন্ততঃ এমন একটা চুক্তি হয় যাহাতে এই প্রকারের বিরোধী কার্যক্রম উপস্থিত হইতে না পারে, হইলেও তাহার নির্বাহ অবিলম্বে এবং তিক্ততা ভিন্নই হইতে পারে। কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যেখানে এই ধরনের শাসনতন্ত্রের মতে মন্ত্রীমণ্ডল কাজ করিতেছে, কোন এক দলের অনুকূলে বেশী ভোট না হইলে এবং একাধিক দল হইতে লোক লইয়া মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইলে, প্রথম হইতে ঐ সব দলের মধ্যে কথাবার্তা বলিয়া ইহার জন্য রাস্তা ঠিক করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। আবার কখনও মতভেদ হইলে যে-দলের মন্ত্রীর সঙ্গে মতভেদ হয়, সেই দল মন্ত্রীমণ্ডল হইতে নিজের মন্ত্রীকে হটাইয়া লয়, এবং অন্য মন্ত্রীদের

নিজের দলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করে। এখানে কথাটা ইহা নয় যে কংগ্রেস-এর এত ভোটাধিক্য ছিল যে আর সকল দল একসঙ্গে মিলিলেও কংগ্রেস একাই তাহাদের সকলের চেয়ে বেশি সভ্যকে নিজের দিক হইতে দাঁড় করাইতে পারিত ও একাই সকলকে ভোটে হারাইয়া দিত। এখানে অন্য কোন দলের সঙ্গে চুক্তির প্রশ্ন উঠিতই না, তাহা হইলেও মুসলমানদের প্রশ্ন যতখানি তাহার মধ্যে আমরা চেষ্টা করিলাম অন্য দলের মুসলমানদের সঙ্গে আমরা একটা বোঝাপড়া করিয়া লই কিন্তু তাহা হইল না।

আমরা তখন বুঝিয়াছিলাম যে বিধানের দিক দিয়া কংগ্রেস কিছু ভুল করে নাই; আজও আমার সেই মতই আছে। ইংল্যান্ডের বিধান অনুসরণ করা উচিত নয় এবং প্রজাতন্ত্রের প্রচলিত নিয়ম ও রীতিনীতি হইতে পৃথক করিয়া নিজেদের নিয়ম রীতিনীতি গঠন করিতে হইবে ইহা অবশ্য অন্য কথা। তখনকার দিনে কেহ এই ধরনের কথা বলেও নাই আর আমিও জানিতাম না যে মুসলীম লীগ ছাড়া আজ এমন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান আছে যাহা বলিয়া উঠিবে যে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র চলিতে পারে না এবং চলা উচিতও না। যদি প্রজাতন্ত্র নাই চলে তাহা হইলে দেশ তাহা বিবেচনা মতো যাহা উচিত মনে করিবে অন্য কোন বিধান প্রণয়ন করিবে। কিন্তু যতক্ষণ আমাদিগকে প্রচলিত প্রজাতন্ত্রের রাস্তায় চলিতে হইবে ততক্ষণ ঐ প্রজাতন্ত্রের নিয়ম ও রীতিনীতি হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারি না। আমি ইহাও স্বীকার করি যে দেশ কখনও প্রজাতন্ত্র ছাড়িয়া অন্য কোন প্রকারের বিধান গ্রহণ করিবে আর আমি স্বীকার করি যে তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য সকলে একমত হইবে। প্রজাতন্ত্র ছাড়িবার অর্থ হয় কোন এক ব্যক্তি অথবা কোন এক লোকের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া দেওয়া—ভারতের শাসনতন্ত্রকে গণ্ডি দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আমি স্বীকার করি না যে মুসলমানেরাও ইহা চায় যে জনসাধারণের হাতে অধিকার না-দিয়া কোন এক ব্যক্তি বা দলের হাতে দেওয়া যায়। অন্য কোন দিক হইতে কোন প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত এই ধরনের কথা বলেও নাই যে ভারতে প্রজাতন্ত্র হওয়া উচিত নয় এবং চলিতেও পারে না। শুধু মুসলিম লীগই অল্পদিন হইল এই কথা বলিয়াছে, আর তাহাও সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যই বলিয়াছে শুধু তাহাদের প্রদেশগুলির জন্যই নয়। কারণ যখন হইতে পাকিস্থানের কথা উঠানো হয় তখন হইতে তাহার সম্বন্ধেও একথা বলা হয় নাই যে পাকিস্থানে অথবা অন্য ভাগে—লোকে যাহার হিন্দুস্থান নাম দিয়াছে—প্রজাতন্ত্র হইতে ভিন্ন অন্য কোন শাসনতন্ত্র হইবে। পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান উভয় দেশেই স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা মনোনীত সভ্যেরাই শাসন করিবে—কোন এক ব্যক্তি অথবা দল নহে। যাহা হউক, মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইলে—সত্য কথা বলিতে গেলে,

কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ইস্তফা দিলে পরে এই ধরনের কথাবার্তা বেশি হইতে লাগিল।

ঠিক জুলাই ১৯৩৭ সালে তো নয়—যখন অন্যান্য প্রদেশে অস্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডলগুলি ইস্তফা দিলেন ও কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইল; কিন্তু তাহার কিছু পরে সীমান্ত প্রদেশে সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডলকে ইস্তাফা দিতে হইল, ঐ প্রদেশে নির্বাচনের সময় কংগ্রেস দলের হইতে সবচেয়ে বেশি নির্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না যে একাই অন্য সকল দলকে ভোটে হারাইয়া দিতে পারেন। এইজন্য সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডল অন্য লোকদের সঙ্গে লইয়া আরও কিছুকাল চলিতে থাকিল; কিন্তু তাহাও বেশিক্ষণ টিকিতে পারিল না—পরিষদের অধিবেশনের পর তাহাকে ইস্তাফা দিতে হইল। অন্যান্য প্রদেশে পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই সাময়িক মন্ত্রীমণ্ডল ইস্তাফা দিয়া দিয়াছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আমাকে সেখানেও যাইতে হইল ও সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সাহায্য করিতে হইল। ইহাতে এমন কিছু অসুবিধা হয় নাই; যাহা কিছু করিবার মৌলানা সাহেবই করিয়াছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা এই ছিল যে ডাঃ খাঁ সাহেব ও খাঁ আবদুল গফুর খাঁ থাকিতে বেশি কিছু করিবার প্রয়োজনই ছিল না। আমি তো এই সুযোগকে ঐ প্রদেশে যাইবার এক বাহানা মাত্র মনে করিয়াছিলাম।

সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ

সীমান্ত প্রদেশে যাওয়ার আমার এই প্রথম সুযোগ ঘটিল। আমরা প্রথমে সোজা অবটাবাদ গেলাম। সেকালে গভর্নর এখানেই থাকিতেন, এখানেই মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের কথাবার্তা চলিতেছিল। জায়গাটা পাহাড়ী, গরমের জন্য পরিষদের অধিবেশন এখানেই হয়। যাওয়ার সময় সেখানে পৌঁছিবার পর প্রথামত মিছিল তৈয়ারি ছিল। মৌলানা সাহেব ইহাতে যোগ দিলেন না—আমাকে দিতে হইল। কিন্তু পথে জোর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মিছিলও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের কাজ শেষ করিয়া আমরা কয়েক জায়গায় চলিয়া গেলাম একটি জায়গার নাম মানসেহারা; উহা পাহাড়ের উপরে, ডাকবাংলো হইতে চারিদিকে খুবই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পক্ষণের জন্য আমরা সেখানে গেলাম, এবং সেখান হইতে আমরা আসিলাম পেশোয়ারে। আবার খাঁ সাহেবের গ্রাম

'উতমানজই'তে গেলাম, চরসাদা হইয়া। তাঁহার বাংলোতে কিছুকাল থাকিলাম। সেখান হইতে স্বাধীন অঞ্চল দেখিয়া আবার পেশোয়ারে ফিরিলাম। পরের দিন আমরা আর এক দিকে একবার ঘুরিয়া আসিলাম। আবার খাইবারের ঘাঁটি পার হইয়া আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত পেঁৗছিলাম, সেখানে ব্রিটিশ সরকার ও আফগান সরকারের প্রহরী জোর পাহারা দিতেছে। খাইবারের ঘাঁটি বিচিত্র সৌন্দর্যপূর্ণ, এমনিতে তো একেবারে পাহাড়, ঘাস, পাতা, গাছপালা একদম কিছুই নাই, গ্রীষ্মে যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে; কিন্তু পাহাড়ের মাঝখান দিয়া রাস্তা চলিয়াছে, তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর ও শোভন।

সমস্ত ঘাঁটি শুদ্ধ ইহা দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইল হইবে; আত্মরক্ষার জন্য সামরিক ব্যবস্থা আছে। মাঝখানে একটা কেল্লা আর জমসদে একটা কেল্লা সেখানে একটা ঘাঁটি আরম্ভ হইয়াছে। সড়কের পাশ দিয়াই রেলও চলিতেছে, তাহা তৈয়ারি করিতে অনেক বুদ্ধি অনেক কৌশল লাগিবে। রাস্তা ছাড়িলে সমস্ত ঘাঁটিতে ব্রিটিশের কোন জিনিষ নাই। শুনিয়াছি, শুধু সড়ক ও তাহার আশেপাশে দুইদিকে কয়েক ফুট চওড়া জমি এই-টুকুই ব্রিটিশের, পাশের বসতি সবই স্বাধীন জাতিদের, তাহারা নিজের নিজের জায়গায় স্বতন্ত্র। ঐ স্বাধীন এলাকায় ব্রিটিশের আইন চলে না। এইজন্য সড়ক হইতে কয়েক ফুট বাহিরে যদি কিছু গোলমাল হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ কর্মচারী তাহার তদন্ত করিতে পারে না। শুনিতে পাওয়া যায় যে কখনও কখনও এমন হয়, যদি কোন যাত্রী সড়ক হইতে সরিয়া স্বাধীন এলাকায় চলিয়া যায় তাহা হইলে সেখানকার লোকেরা নিজেদের অধিকার কায়েম রাখিবার জন্য ও দৃঢ় করিবার জন্য তাহাকে গুলী মারিয়া দেয়। আমরা ইহাও দেখিতে পাইলাম যে স্বতন্ত্র এলাকার লোকেরা যখন ঘর হইতে বাহিরে যায়, তখন নিজেদের সঙ্গে বন্দুক লইয়া চলাফেরা করে, ঠিক যেমন আমাদের প্রদেশে লোকে লাঠি ডাণ্ডা লইয়া বাহির হয়।

সেখানকার গ্রামও খানিকটা অপূর্ব ধরনের। প্রত্যেক গ্রামে একটা উঁচা স্থান তৈরী করা হয়, প্রায়ই তাহা কোনও বাড়িতে একটা গম্বুজের মত থাকে, সেখান হইতে লোকে চারদিকে দূর পর্যন্ত দেখিতে পায়। 'কবিলা'র লোকেরা সেখান হইতে বরাবর দেখে যে কোথাও কোনও দিক হইতে কেহ আক্রমণ করিতে আসে কি না। সেখানকার লোকেরা দেখিতে খুব গরীব মনে হয়; কারণ ঐ পাহাড়ী অঞ্চলে জমি এমন কিছু ভাল বলিয়া মনে হয় না। জলের বড় অসুবিধা। এই স্বাধীন "কবিলা" বিশেষ করিয়া এই পাহাড়ী এলাকাতেই বাস করে। পেশোয়ার জেলার চরসাদার আশেপাশের জমি খুব ভাল মনে হইতেছিল সেখানে সোয়াথ ও অন্যান্য

নদী আছে; কিন্তু পাহাড়ী জমিতে বেশীকিছু জন্মে না। স্বাধীন কবিলাদের দারিদ্র্যই তাহাদের অব্যবস্থিত অবস্থার বিশেষ কারণ। আমি জানিতাম না, তাহাদের আর্থিক দশা উন্নত করিয়া তাহাদের জীবনকে সুব্যবস্থার মধ্যে আনিবার কোন চেষ্টা করা হইয়াছে কিনা। হয়তো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি তাহাদের সর্বদা অস্থির রাখিবার জন্যই করা হয়; কারণ যদি এইদিকে মন দেওয়া হইত তাহা হইলে সৈন্যদের জন্য যতটা খরচ করা হইয়াছে ও করা যাইতেছে ততটা খরচ করিলে এতদিনে ঐ অঞ্চল শ্যামল শস্যে পূর্ণ করা যাইতে পারিত—উপজাতীয়েরা অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমকক্ষ হইতে পারিত। হয়তো যতদিন তাহারা স্বাধীন আছে, ততদিন এইরূপ করা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সুব্যবস্থায় জীবন কাটাইতেছে এইরূপ স্বাধীন ভাল প্রতিবেশীও তো হইতে পারে। তাহাদিগকে স্বাধীন থাকিতে দিয়াও তাহাদের শিক্ষা ও সুব্যবস্থায় সেই খরচ করা যাইতে পারিত যাহা সময় সময় তাহাদের উপর তোপ ও হাওয়াই জাহাজের গোলার শিকার করিয়া দমনের কাজে খরচ হয়। সে-খরচ ভারতের পক্ষে ও তাহাদের পক্ষে—উভয়ের পক্ষেই—লাভজনক হইত।

সীমান্ত প্রদেশ হইতে ফিরিবার সময় আমি ও আমার সঙ্গী বাবু মথুরাপ্রসাদ, যিনি আমার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন, দুইজনেই তক্ষশীলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা জিনিসপত্র দেখিতে যাই। যে-সব জিনিস বাহির হইয়াছে তাহা সেখানকার যাদুঘরে দেখি। জিনিসগুলি তো ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। দেখিয়া বুঝিলাম যে এক খুব বিস্তৃত শহর সেখানে ছিল, যাহাতে চওড়া সড়ক ছিল, আর সড়কের দুই ধারে ছিল বাড়ি—বাড়িগুলিতে বাস করিবার ও আরামের সকল ব্যবস্থা ছিল। সব কিছু দেখিয়া মনে হইল যে এক অতি উন্নত সভ্যের চিহ্ন। প্রাচীন ভারতের যে-সব স্মৃতি নিদর্শনের জন্য আজও আমরা মাথা উঁচু রাখিতে পারিয়াছি, এগুলি তাহাদের অন্যতম। এখানে এক জগৎবিখ্যাত বিদ্যাপীঠ ছিল, ভারতবর্ষের বাহির হইতেও বিদ্যার্থীরা এখানে আসিত। এখানকার বিদ্যার্থীরা ভারতবর্ষের সকল স্থানে গিয়া নিজেদের কীর্তি বিস্তার করিত। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে সমস্ত সীমান্ত প্রদেশে বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়। যদি আমরা সেখানে কিছুদিন থাকিতে পারিতাম তাহা হইলে এই ধরনের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইতাম, কিন্তু তাহার সময় ছিল না। আমরা কোহাট ও ডেরা ইসমাইল খাঁর এলাকা পর্যন্ত যাইতে পারি বলিয়াও আরও সময় হইল। এইজন্য আমরা শুধু হাজারা ও পেশোয়ারের কোনও কোনও অংশ দেখিয়াই আফশোষ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলাম।

দানাপুরের সৈন্যনিবাস ছাড়া আমাদের মতো বিহারীর পক্ষে আর

কোথাও কোনও বিশেষ সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বা পাড়া দেখিবার সুযোগ হয় না। আমাদের চোখে সীমান্ত প্রদেশ লাগিল এক বিরাট সেনানিবাসের মতো। যেখানে যান, যেদিকে যান, সেনাদের ছাউনি দেখিতে পাইবেন—সামরিক পথঘাটে ও সামরিক কেন্দ্র সকল দিকে সামনে পড়ে। এই প্রণালী পাঞ্জাব হইতেই শুরু হয় এবং যেমন যেমন আমরা পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তেমনই এই সব সামরিক চিহ্ন বাড়িয়া চলে। সীমান্ত প্রদেশ যেন আগাগোড়া ফৌজেরই। খাইবারের ঘাঁটি দেখিয়া একটা কথা মনে না উঠিয়া পারে না। একটা এমন ঘাঁটি যেখানে অতি সহজে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে, বিশেষত যখন হাওয়াই জাহাজ ছিল না। ঈশ্বর এই দেশকে উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত দাঁড় করাইয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম সীমায় পর্বতশ্রেণীর দেওয়াল দাঁড় করাইয়া এমন এক সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যাহা ভাঙিগয়া বাহির হইতে আসিয়া বিদেশীরা হামলা করিতে পারিত না। এইরূপে একদিকে প্রকৃতি স্থল-আক্রমণ হইতে এই দেশকে রক্ষা করিয়াছেন, অন্যদিকে সমুদ্র এক প্রবল পরিখারূপে দেশ-রক্ষার কাজ করিতেছে। তাহা হইলেও এই দেশের লোক এতই অভাগা যে এই তৈয়ারী ঘাঁটিও নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার জন্য রক্ষা করিতে পারে নাই। ইংরেজদের পূর্বে আজ পর্যন্ত ভারতের উপর যে-সব আক্রমণ হইয়াছে, তাহা প্রায় সবই হইয়াছে এই ঘাঁটির ভিতর দিয়া। ইংরাজও বরাবর ভয় পায় যে কোনদিন রুশরা না এই পথে ভারত আক্রমণ করে। এইজন্য সেখানে সৈন্যদের এত আয়োজন। রুশের ভয় কম হইলে উহাদের জার্মানীর ভয় হইতে থাকিল। হয়তো মুসলমান রাজ্যগুলি দেখিয়াও তাঁহারা ভয় পান। হয়তো এখন যখন হাওয়াই জাহাজের যুগ আসিয়া গিয়াছে তখন ঐ ঘাঁটির অতখানি গুরুত্ব আর নাই, কিন্তু একথা ভাবিয়া দুঃখ না হইয়া পারে না যে আত্মরক্ষার সকল আয়োজন ঈশ্বর জুটাইয়া দিলেও মানুষ যদি নিজের অকর্মণ্যতার জন্য সেগুলির সদ্ব্যবহার না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। খাই-বারের ঘাঁটিও ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, যে-ব্যক্তি নিজের সাহায্য নিজে করিতে পারে না, ঈশ্বরও তাহাকে সাহায্য করেন না, আর যে ঈশ্বরের দেওয়া অস্ত্রও কাজে লাগাইবার যোগ্যতা রাখে না, তাহার পতন হইবেই। কন্যাকুমারীতে পেঁৗছিয়া ভারতের মহত্ত্বের আভাষ যেমন বিদ্যুতের মত চোখের সামনে খেলিয়া গিয়াছিল, খাইবারের ঘাঁটি দেখিয়াও ভারতবর্ষের অকর্মণ্যতার ছবি তেমন করিয়া চোখের সামনে নাচিতে লাগিল।

মন্ত্রীমণ্ডলের কাজ আরম্ভ হইয়া চলিতে থাকিল। বিহারে এক প্রশ্ন শীঘ্রই উঠিল, তাহার উত্তর দেওয়া খানিকটা কঠিন ছিল, এবং পরে তাহা লইয়া আমাদিগকে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। মিঃ ইউনুস যখন মন্ত্রী হইলেন, তখন তিনি স্যর সুলতান আহমদকে বিহারের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করিয়া দিলেন। স্যর সুলতান কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকারি এডভোকেট ছিলেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে গভর্নমেণ্টের এডভোকেটের স্থানে এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করিতে হইল। তিনি তখন গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কিছুদিনের জন্য ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শোনা গেল, তিনি ভাইসরয়ের কাউনসিলে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রস্তাবে জোরও দিয়াছিলেন। ভাইসরয়ের বিবৃতি প্রকাশিত হইলে তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইল, তখনও তিনি ভাইসরয়ের কাউনসিলের সদস্য ছিলেন। বিহার মন্ত্রীসভার সামনে এই প্রশ্ন উঠিল, নূতন করিয়া এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করা হইবে, না মিঃ ইউনিসের নিয়োগই বহাল থাকিবে। গভর্নমেণ্ট ও মন্ত্রীমণ্ডলের আইন-বিষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন এডভোকেট-জেনারেল। নূতন শাসনতন্ত্রে তিনি সদস্য না হইয়াও এসেম্বলি ও কাউনসিলে বক্তৃতা করিতে পারেন। এই অধিকার এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যাহাতে আইনের তর্ক উঠিলে এমন একজন লোক থাকিবেন যিনি গভর্নমেণ্ট ও মন্ত্রীমণ্ডলের তরফ হইতে কথা বলিতে পারেন। ইংলণ্ডে আইন-বিভাগে সবচেয়ে বড় অফিসার হইলেন লর্ড চ্যানসেলর। ইনি জজেরও ওপরে বলিয়া লোকে ইঁহাকে মান্য করে। লর্ড সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। ঐ সভায় আইনের ব্যাপারে কোনও আপিল পেশ হইলে তখনও তিনিই সভাপতিত্ব করেন। এইজন্য সর্বদা এক বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তিকেই এই পদ দেওয়া হয়। এ তো হইল জজদের সরদারের কথা। আইন বিষয়ে সবচেয়ে বড় পরামর্শদাতা এটর্ণি জেনারেলও মন্ত্রীমণ্ডলের একজন সদস্য থাকিতেন। তিনি কমনস্ সভার সদস্য। মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গেই এই দুইটি পদে নিয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যিনি প্রধানমন্ত্রী হন তিনি নিজের অন্য সঙ্গী-মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্তির জন্যও নাম দিয়া থাকেন এবং তাহাও সম্রাট গ্রহণ করেন।

আমাদের এখানকার লোকদের মত হইল এই যে, ইংলণ্ডে এটর্ণি-জেনারেলের যে-স্থান, এডভোকেট-জেনারেলেরও সেই স্থান হওয়া উচিত,

তাঁহার নিয়োগ ও পদত্যাগ মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গেই হওয়া উচিত। যদি গভর্নরের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার দরুণ অথবা এসেম্বলির অনাস্থা দেখাইবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও সরিয়া যাইতে হইবে। আর, যে নূতন মন্ত্রীমণ্ডল তৈরী হইবে তাহার ঐ জায়গায় নূতন লোক নিয়োগের ক্ষমতা থাকা চাই,—যেমন ইংলণ্ডে আছে। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। মন্ত্রীমণ্ডলের আইনের এমন পরামর্শদাতা রাখিবার অধিকার থাকা চাই যাঁহার উপর উহার বিশ্বাস তো আছেই, উহার মত ও কার্যক্রমের সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় ও মতের মিল থাকাও চাই, যাহাতে তিনি মন্ত্রীমণ্ডলের কার্যক্রম চালাইতে সর্বপ্রকারে আইনের দিক হইতে পুরাপুরি সাহায্য করিতে পারেন। বিহারে মন্ত্রীমণ্ডলের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, ঋণ সম্পর্কিত আইনের সংশোধন কি করিয়া হইবে। ইহা লইয়া মতভেদেরও যথেষ্ট জায়গা ছিল। মন্ত্রীমণ্ডলের মত ছিল যে কোনও পাকা কংগ্রেসীর, যাহার মত মন্ত্রীমণ্ডলের মতের সঙ্গে মেলে, এডভোকেট-জেনারেল হওয়া উচিত। মন্ত্রীমণ্ডলের মতে সায় দিয়াই যাইবেন, স্যর সুলতান এমন পাত্র ছিলেন না। যদি কোথাও কোনও বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হইল, তাহা হইলে আর মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহার মত ও তাঁহার যোগ্যতায় লাভবান হইতে পারিত না। এইজন্য, ইংলণ্ডেও এটর্ণি-জেনারেল মন্ত্রীমণ্ডলের দলের লোক হইতেই করা হয়। এই ভাবিয়া মন্ত্রীমণ্ডল আমার মত লইয়া স্থির করিল যে নিজেদের এডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত করিবে। আইন বিষয়ে নিজের পরামর্শদাতা বাছিবার ও স্থির করিবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে, মন্ত্রীমণ্ডল এ-বিষয়ে নজির স্থাপন করিতেও চাহিয়াছিল। এ-ব্যবস্থা একবার চালু হইলে তাহা শুধু কংগ্রেসের জন্যই হইবে না, যে-দলের লোকই হউক না কেন, নিজেদের মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবার সময় নিজের পরামর্শদাতাও নিয়োগ করিবে, এবং এই ব্যবস্থা হইতে লাভবান হইবে।

বোম্বাই প্রদেশেও এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। সেখানে ছিলেন এক ইংরেজ এডভোকেট-জেনারেল। কংগ্রেস যাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিতে-ছিল সে-ভদ্রলোকটি তখন কোথাও বিদেশে গিয়াছিলেন। যখন এ-কথা গভর্নর সাহেবকে বলা হইল তখন তিনি, মন্ত্রীমণ্ডলের যে এডভোকেট-জেনারেল নিয়োগের অধিকার আছে সে-কথা মানিতে চাহিলেন না। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ স্যর সুলতানকে সব কথা খুলিয়া লিখিয়া থাকিবেন। স্যর সুলতান সিমলা হইতে ইস্তফাপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করিবার সময়ও কোনও কারণে বাড়িয়া গেল। তাই, এমনি দেখিতে ব্যাপারটির তো মীমাংসা হইল এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল শ্রীবলদেব সহায়কে এডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু পর-

বর্তীকালে মুসলমানেরা ইহাকে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার রূপ দিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, স্যর সুলতান মুসলমান বলিয়াই তাঁহাকে হটাইয়া দেওয়া হইল। আমি এই সব আলাপ-আলোচনার সময় বরাবর মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে ছিলাম বলিয়া একথা বলিতে পারি যে এই নিয়োগের সময় হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন মুহূর্তের জন্যও কাহারও মনে আসে নাই। প্রশ্ন তো ইহাই ছিল যে, রাজনীতিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বিশেষতঃ ঋণ বিষয়ক আইনের সংশোধনের কথা সামনে রাখিয়া, কাহার নিকট হইতে বেশি সাহায্য পাওয়া যাইবে, আইনের পরামর্শদাতার নিয়োগ ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের নিয়ম গ্রহণ করিলে ভাল হইবে কি না। সেই নিয়ম অনুসারে শাসনতন্ত্র এমনভাবে সংশোধন করাইবার দিকে সকলের ইচ্ছা ছিল যাহাতে গভর্নর শুধু শাসনতন্ত্রানুযায়ী গভর্নরই থাকিয়া যান, আর সমস্ত অধিকার মন্ত্রীমণ্ডলের হাতে আসিয়া যায়। শাসনব্যবস্থায় এখনও যখন সংশোধন হইতে পারিল না, তখন কংগ্রেস গভর্নরের নিকট 'বিশেষ অধিকার বর্তাইবে না' এইরকম একটা প্রতিশ্রুতি লইয়া ঐ অভাব একপ্রকার দূর করাইল। এই ছিল আর একটি বিষয় যাহাতে আমাদের শাসনতন্ত্র ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের নিকট পৌঁছাইতে পারিত আর সেই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের মন্ত্রীমণ্ডল ইহার উপর জোর দিত।

বোম্বাইতে ইংরেজ এডভোকেট-জেনারেল ইস্তফা দিয়া দিলেন। কেহ আর তাঁহার অভিযোগ কানে তুলিল না। কিন্তু বিহারে ইহার শাসনতন্ত্রের রূপ স্থির করিয়াই লইল, ইহার সাম্প্রতিক গুরুত্বই রহিয়া গেল। দুঃখের কথা; কিন্তু একথা আজও স্বীকার করি যে ইহাতে মন্ত্রীমণ্ডল সাম্প্রদায়িক তর্ককে আমল দেয় নাই। আইন বিষয়ে ঋণের যখন সংশোধন উপস্থিত হইল, তখন একথা স্পষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক উঠিয়া গেলে আমাদের চোখ আর কিছু দেখিতে পারে না।

চাষী ও জমিদারের বোঝাপড়া

মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইলে পর আমার উপর ভার রহিল যথাসাধ্য, বিশেষ বিহারে, প্রয়োজন হইলে তাহার সাহায্য করি। সুরুতেই আমার সামনে দুটি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। যুক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ চাহিয়াছিলেন যে কানপুরে মিল শ্রমিকদের অবস্থার বিষয়ে তদন্ত করা হয় এবং তাদের অবস্থা ভাল করিবার চেষ্টাও করা হয়। ইহার

জন্য তিনি এক কমিটি গঠন করিতে চাহিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমি তাহার অধ্যক্ষ হই। কাজটি খুব দরকারি ছিল, কিন্তু ইহার জন্য আমার বিশেষ কোনও যোগ্যতা ছিল না; কারণ আমি তো কখনও মজুরদের মধ্যে কিছু কাজ করি নাই, তাহাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাও আলোচনা করি নাই। পন্থজীর কথা ছিল যে ইহাই তো আমার বিশেষ যোগ্যতা—এক দিক দিয়া দেখিলে; কারণ আমি সব কথা জানিয়া বুঝিয়া যাহা আমার উচিত মনে হইবে তাহা বলিতে পারিব, আর পূর্বার্জিত কর্ম বা মতবাদের বন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই নিজের মত স্থির করিব। তাহা ছাড়া, তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে আমাতে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের বিশ্বাস হইবে, আর আমার নিয়োগে উভয়েই সন্তুষ্ট হইবে। আমি প্রথমে তো ইহা একেবারে প্রত্যাখ্যান করিলাম। কিন্তু শেষে আমাকে উহা গ্রহণ করিতে হইল। যখন আমি সীমান্ত প্রদেশে সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডল সংগঠন করিতে যাইতেছিলাম, তখন লখনৌতে কিছুকাল থাকিয়া গেলাম। এই কমিটির কাজের আরম্ভ এক রকম তখন হইতেই হইল, যদিও ওদিক হইতে ফিরিবার পরই কার্যারম্ভ রীতিমত হইল।

আর একটি কাজ আমাকে শীঘ্রই শুরু করিতে হইল; নিজেদের প্রদেশের চাষী ও জমিদারদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া, খাজনা আইনের সংশোধনের জন্য সম্ভব হইলে উভয়কে একমত করানো। ইহার আরম্ভও মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইবার অল্প দিনের মধ্যেই হইল। যখন আমরা ১৯৩০-৩৪-এর সত্যাগ্রহে লিপ্ত ছিলাম, তখন বিহারের গভর্নর সাহেবের প্ররোচনায় 'ইউনাইটেড পার্টি' নামে ওখানে একটি দল গঠিত হয়। তখন নূতন শাসনতন্ত্রের বিষয়ে ইংলণ্ডে কথাবার্তা চলিতেছিল। বুঝা যাইতেছিল যে নূতন শাসনতন্ত্রে কিছু-না-কিছু অধিকার তো জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মিলিবেই। এইজন্য যদি এমন কোনও পার্টি হয় যে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের মত সম্পূর্ণ স্বাধীন না হয়, তাহা হইলে গভর্নমেণ্টেরও অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। এই কথা মনে করিয়া উক্ত পার্টির জন্যে তখনকার গভর্নর সাহেব সাহায্য করিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে তখনকার কাউনসিলে জমিদারদের তরফ হইতে এক বিল দাখিল করা হইল, তাহাতে জমিদারি খাজনার কিছু সংশোধনের ব্যবস্থা ছিল। এই সংশোধন চাষীদের অধিকার বিষয়ে ঠিক ছিল। আশা করা গিয়াছিল যে এইভাবে চাষী, যাহাদের সংখ্যা ভোটদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক হইবে, ইউনাইটেড পার্টির পক্ষে আসিয়া যাইবে, আর সেই পার্টি নির্বাচনে সফলকাম হইতে পারিবে। কোনও কোনও দূরদর্শী জমিদার ইহাও নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন যে এভাবে চাষীদের হাতে যখন অধিকার

চলিয়াই যাইতেছে তখন উহাদের খুশি রাখাই আমাদের পক্ষে হিতকর হইবে। এমন জমিদারও নিশ্চয় ছিলেন যে চাষীদের দাবি ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতেন আর সেজন্য আইনের সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতেন। যাহা হউক, যাহারা প্রথমে চাষীদের মধ্যে কাজ করিতে-ছিল, আর চাষীদের পথপ্রদর্শক ও নেতা বলিয়া যাহাদের মনে করা হইত, এমন কিছু কিছু লোকও এই পার্টিতে যোগ দিলেন।

স্বামী সহজানন্দ কিষাণ সভাকে জাগ্রত করিয়া এই বিলের বিরোধিতা করিলেন। সেই বিরোধের জন্য চাষীরা সংঘবদ্ধও হইয়া গেল। তখনকার দিনে কংগ্রেস ছিল বে-আইনি প্রতিষ্ঠান। তাহার নামে কোন কাজই চলিত না। তাহার কার্যকর্তাদের মধ্যে যাঁহারা এ-কাজ করিতে পারিতেন তাঁহাদের অনেকেই বন্দী হইয়া জেলে ছিলেন। এই বিরোধের ফলে সংশোধনের উপর সংশোধন হইতে থাকিল। শেষটায়, যখন আমরা ১৯৩৪ সালে জেল হইতে বাহির হইলাম তখন, আমাদের সাথেও কথা হইল যে সংশোধন সকলের মত লইয়া করিতে হইবে। তখনকার দিনে কাউনসিলে আমাদের লোক ছিল না। কথা-বার্তা এতদূর গড়াইয়াছিল যে কংগ্রেসের দিক হইতে আমরা বেশি কিছু করিতেও পারিতাম না। যাহা কিছু সংশোধন হইল এবং তাহা হইতে যাহা কিছু উপকার হইল তাহা চাষীদেরই হইল, কিন্তু ব্যাপারটির মীমাংসা হইল না। নির্বাচনের সময় যখন আসিল তখন পার্টিকে দেখা গেল কিছু আলগা হইয়া পড়িয়াছে। নির্বাচন হইতে ইহাও বোঝা গেল যে চাষীদের সঙ্গে জমিদারদের মেলাইবার চেষ্টাও সফল হইল না। কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে চাষীদের দুর্দশার প্রতিকারের কথা জোর করিয়া বলা হইয়াছিল। জমিদারেরাও জানিতেন যে এ-বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডল তাড়া-তাড়ি কিছু-না-কিছু অবশ্যই করিবেন। তাঁহারাও চাহিতেছিলেন যে,যদি পরামর্শ করিয়া কোনও কথা ঠিক হয় তবে তাঁহাদের পক্ষেও ভাল হইবে; কারণ তাহা হইলে তাঁহারা আর এ-বদনামের ভাগি হইবেন না যে তাঁহারা নিজের নিজের অধিকার আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন। কংগ্রেস জবরদস্তি আইন করিয়া চাষীদের ভাল করিল! মন্ত্রীমণ্ডল গঠন হইবার পরেই তাঁহাদের প্রধান কেহ কেহ আসিয়া মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে। তাঁহারা পরামর্শ দিল যে খাজনার আইন, আর চাষীদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট যাহা কিছু করিতে চায় তাহার জন্য জমিদারদের সঙ্গে কথা বলিয়া লইব। তাহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত ছিল। মন্ত্রীমণ্ডলের মত হইল—আমারও সেই মত—যে খাজনা আইনের সংশোধন বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়া যদি কোনও জিনিস স্থির হইয়া থাকে তবে ভালই; কারণ ওরূপ অবস্থায় যে আইনই হোক না কেন, তাহা তাড়াতাড়ি ও সহজেই এসেম্বলি ও কাউনসিলে পাকা হইতে পারিবে। উহা দিয়া গভর্ন-

মেণ্ট চাষীদের তাড়াতাড়ি লাভও করাইয়া দিতে পারে, আর নিজেদের মধ্যে মন কষাকষিও কমিয়া যাইবে। জমিদার বিরোধ করিয়া আইন তৈরী করা বন্ধ করিতে পারিবে না; কারণ কংগ্রেসের মত অনেকটা এইদিকে, তবে প্রত্যেকবার পা ফেলিতেই খানিকটা সময় ন্যায়সংগত বিচার-বিতর্কের দ্বারা ব্যয় হইতে পারে।

কংগ্রেসের স্থির ছিল—নূতন শাসনতন্ত্রকে নামঞ্জুর করিবে অর্থাৎ তাহাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করিবে। হইতে পারে যে তাড়াতাড়ি, কিছু অভিজ্ঞতা হইবার পরই, মন্ত্রীপদ ছাড়িয়া দিবে স্থির করিতে হইল, এইজন্য যাহা কিছু হইতে পারিল ও যতদূর তাড়াতাড়ি হইতে পারিল, জনসাধারণের সেবা ও ভালোর জন্য হইয়া যায় তো ঠিক হইবে। তাহা ছাড়া জমিদার ধনী, নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইবার শক্তি রাখে; কিন্তু চাষী হইল গরিব, আর তাহার মধ্যে সংগঠন শক্তি নাই। আইন হইয়া গেলেও তাহা ব্যর্থ করিবার হাজারো উপায় উকিলেরা বাহির করিতে পারেন। যদি ঝগড়ার পর সংশোধন হয় তবে চেষ্টার পরও তাহা হইতে লাভ করিতে গেলে চাষীদের অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। এইসব ভাবিয়া মন্ত্রীমণ্ডল, আমার কথামত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে পরামর্শ করিয়া যদি কোনও কথা স্থির হয় তো ভালোই হয়। হাঁ, যদি বোঝাপড়ার ফলে কোনও সন্তোষজনক কিছু না হয়, তাহা হইলে যেমন অভিরুচি তেমনই করা যাইবে। বোঝাপড়ার চেষ্টা হইতে, বিশেষ করিয়া জমিদারও যখন তাহা চায়, লাভই তো হইবে। এইজন্য ভাবা গেল যে সময় বুঝিয়া আমি তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করি। পার্লামেণ্টারি কমিটির অন্যতম সদস্য মৌলানা আজাদও ছিলেন। জমিদারেরা তাঁহার সঙ্গেও দেখা করিল। তাহারও কথাটা মনে ধরিল। এইভাবে মৌলানা আজাদ ও আমি, দুইজনে মিলিয়া পাটনায় জমিদারদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে থাকিলাম।

এ-বিষয়ে ইহাও প্রশ্ন হইল যে কিষাণ-সভা অথবা তাহার প্রধান কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি থাকিবে। আমরা একথা স্বীকার করিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের প্রতি কিষাণদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আর আমরাও তাহাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া, তাহাদের ভালর জন্য যাহা কিছু হইতে পারে করিতে পারিব। আমরা জমিদার ও কিষাণদের ছাড়িয়া দিলে ও তাহারা আপনা আপনির মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া নিলে সবচেয়ে ভাল হইত। কিন্তু যতদূর দেখিতে ও বুঝিতে পারিলাম, দুই পক্ষই কোনও কিছুতে রাজি হইবার আশা ছিল না। এইজন্য মাঝখানে আমাদের পড়িতেই হইবে। আমরা কংগ্রেসকে এইজন্য উপযুক্ত বলিয়াও মনে করিতাম। জানিতাম যে বোঝাপড়া করিয়া কোন বিষয় স্থির হইলে তাহাতে

কোনও পক্ষেরই কথা পুরাপুরি থাকে না, দুই পক্ষকেই কিছুটা নামিয়া আসিতে হয়। তাই ঐ দুই পক্ষের উপর ভার না রাখিয়া কংগ্রেসই যদি একাজ করিয়া লয় তো মন্দ হয় না। এর এক ফল তো কিষাণের অধিকার বিষয়ে নিশ্চয় এই হইবে যে, তাহারা যে-টুকু রেয়াৎ পাইবে তাহা খোলা-খুলিভাবে লইতে পারিবে, এবং তাহার চেয়ে যে-টুকু বেশি প্রয়োজনীয় মনে করিবে তাহা চাহিতে থাকিবে, কারণ তাহারা কোন প্রকারের বোঝা-পড়ার কোন শর্তে আবদ্ধ থাকিবে না। এ-কথা জমিদারদেরও বলা হইল; তাহারাও বুঝিতে পারিল যে আমরা কিষাণ সভার দিক হইতে কথা কহিতেছি না; যদিও তাহার নেতাদের নিকট হইতেও আমরা সকল বিষয়ের সম্মতি বরাবর গ্রহণ করিতেছিলাম।

আরও একটি কথা স্থির করিবার ছিল। এই বোঝাপড়া কি শুধু খাজনা আইন সম্বন্ধেই হইবে, না অন্যান্য বিষয়েও হইবে। গভর্নমেণ্টের আয় বারাইবার প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য গভর্নমেণ্ট একটি নূতন খাজনা বসাইতে চাহিতেছিলেন। তাহাতে জমিদারেরা বেশি দিবেন, আমরা ভাবিলাম, সম্ভব হইলে উহা কথাবার্তা কহিয়াই মীমাংসা করিব। কয়দিন ধরিয়া কথাবার্তা চলিল। সদাকত-আশ্রমেই বৈঠক বসিত। আমার শরীরটা কিছু অসুস্থও ছিল। এইজন্য লোকে আমার যাওয়া-আসার কষ্টও বাঁচাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। সকল প্রশ্নের ব্যাপারেই আমি আগে জমি-দারদের মত শুনিয়া লইতাম, মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গেও কথা বলিয়া লইতাম, তাঁহাদের মত ভাল করিয়া বুঝিতাম, চাষীদের নেতাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলিয়া তাঁহাদের মতও শুনিয়া জানিয়া লইতাম। এইভাবে, সকল দিক হইতে আলোচনা করিবার পর এমন কিছু একটা মীমাংসা করিতাম, যাহা জমিদার আর আমরা উভয় পক্ষ স্বীকার করিয়া লইতাম।

তিন-চারটি প্রশ্ন প্রধান ছিল। খাজনাতে যাহা কম হওয়া উচিত তাহা কি ভাবে ও কি পরিমাণে হইবে, যাহাতে কাহারও প্রতি অন্যায় অবিচার না হয়, আর সকলের লাভও হয়। ইহা সোজাসুজি টাকায় কয়েক আনা খাজনা করিয়া দিলেই হইতে পারিত। কিন্তু সমস্ত প্রদেশের এক প্রকার অবস্থা তো নয়। প্রদেশে চাষজমির উপর প্রতি বিঘায় চার আনা হইতে ২০/২৫ টাকা পর্যন্ত খাজনা ধার্য ছিল। কোথাও সম্প্রতি মালগুজারি বাড়িয়াছে, কোথাও বাড়ে নাই—কোথাও অনেক বেশি বাড়িয়াছে, কোথাও খুব কম বাড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারেই বাড়ে নাই। কোথাও খাজনা বদলাইয়া খাস করা হইয়াছে, কোথাও এমনটা হয় নাই। যদি সর্বত্র একই হারে খাজনা কমানো যায় তাহা হইলে কোনও কোনও চাষীর অনেক লাভ থাকিয়া যাইবে, কাহারও শুধু নামমাত্র বাদ যাইবে, কোনও কোনও জমিদারের প্রতি অন্যায় করা হইবে, কেউ কেউ মজা করিয়া বাঁচিয়া যাইবে।

বিশেষতঃ যে-সব চাষী খুব কড়া খাজনা হওয়ার জন্য খুব কষ্টে আছে, তাহাদের খুব কমই লাঘব হইবে; অথবা এমন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে কোনও কোনও চাষীর উপর বেশি ভার থাকিলে তাহারা প্রায় সেই বোঝা টানিয়াই চলিবে, আর যাহাদের উপর বোঝা কম তাহাদের উপর বোঝা আরও কম হইয়া যাইবে—যাহাদের কম করা সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন, তাহাদের নামমাত্র কম করা হইবে, আর যাহারা প্রথম হইতেই সুবিধা পাইয়া আসিতেছে তাহারা আরও কম দিতে থাকিবে। এইজন্য সোজাসুজি খাজনা কমাইবার কথা জমিদারেরা ও আমরা নামঞ্জুর করিয়া দিলাম। এমন এক পরিকল্পনা করা হইল, যাহাতে যেখানে অনেক বেশি খাজনা ধার্য হইয়াছে সেখানে বিশেষ করিয়া বেশি কম করা হয়, সে ধার্য খাজনা বৃদ্ধির জন্যই হউক অথবা জমি খাস করার জন্যই হউক, আর যেখানে কম আছে সেখানে কম করিয়া কমানো হউক অথবা একেবারেই কমানো না হউক। আমরা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিলাম, এইভাবে সমস্ত প্রদেশে খাজনার টাকায় চার আনা কম করা যাইবে। কোনও কোনও জায়গায় তো টাকায় আট-দশ আনা পর্যন্ত কম হইবে আর কোথাও কোথাও মোটেই কম হইবে না। যে জমিদার যত জোর করিয়া আদায় করিয়াছে আর যতটা খাজনা বাড়াইয়াছে তাহার আয় ততখানি কমিয়া যাইবে। যে কম বাড়াইয়াছে তাহার আয়ও কম হইবে। শেষটায়, যখন সরকারি কর্মচারীরা খাজনায় কমের ব্যবস্থা করিয়া খাজনাটা কমাইলেন, তখন দেখা গেল যে আমাদের সেই আন্দাজী হিসাব—প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব সিকি ভাগ কমিয়া যাইবে—প্রায় ঠিকই হইয়াছিল।

অন্য প্রশ্ন ছিল, চাষীদের নিজেদের চাষজমি হস্তান্তরিত করিবার কথা। বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব আইন অনুসারে, যাহা কিনা বিহারেও চালু ছিল, এই অধিকার তাহাদের সাধারণত ছিল না। এইজন্য কোনও চাষী তাহার চাষজমি বেচিতে পারিত না। কিন্তু উকিলের বুদ্ধি ও জজের বিচারে আইনকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছিল। যে ব্যক্তি আইনের কোনও ধার ধারিত না, তাহার পক্ষে ইহা বোঝা সহজ ছিল না যে চাষজমি কোন অবস্থায় আর কি ভাবে হস্তান্তরিত করা যায়—একেবারেই বিক্রয় করিয়া না সুদে খাটাইয়া না আগাম কিছু দিয়া; আর যদি হস্তান্তরিত করাই যায় তাহা হইলেও কতখানি—সমস্ত জমিটা না তাহার খানিকটা অংশমাত্র, আর অংশ বা ভাগ হইলেই বা কতদূর? এই ধরনের অনেক জটিল প্রশ্ন উঠিত। সময়ে সময়ে হাইকোর্টের বিচারও হইত; কখনও দুইজন জজের রায় হইল, তাহার উপর পুনর্বিচার করিলেন তিনজন কি পাঁচজন জজ মিলিয়া; রায় যদি কখনও বদলাইল তো তাহার উপর আর কিছু নূতন সূক্ষ্ম ব্যাপার আসিয়া চাপিল। বাংলা হইতে বিহার পৃথক হইয়া গেলে

পর এখানকার হাইকোর্ট নিজের বিচারই বহাল রাখিল, তাহা সর্বদা কলিকাতার বিচারের সঙ্গে মিলিত না। এইজন্য প্রয়োজন ছিল যে এই বিষয়ে যেন আইন পরিষ্কার হয় যে সকলে, বিশেষ করিয়া চাষীরা, যেন সহজে বুঝিতে পারে। ইহার দুইটি উপায় ছিল, হয় হস্তান্তরিত করিবার অধিকার একেবারেই না দেওয়া এবং কানুন সব একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া নয়তো পুরাপুরি অধিকার দেওয়া—যাহাতে কোন প্রকারের প্রতিবন্ধক ইহাতে না হইতে পারে। কিষাণসভার লোকেরা নির্বিবাদে জমি বিক্রয় করিবার পূর্ণ অধিকার চাহিয়াছিল। জমিদার তাহা মঞ্জুর করিতেছিলেন না; কারণ তাঁহাদের দাবি ছিল যে জমি তাঁহাদেরই, শুধু চাষ-আবাদ করিবার জন্যই ঐ জমি চাষীদের দিয়াছিলেন। তাই কিষাণদের জমি বেচিবার অধিকার নাই—হ্যাঁ, তবে যদি জমিদার বেচিবার অনুমতি দেন তবে উহা বেচিতে পারে। এ বিষয়ে কিষাণসভার খুবই জোর আপত্তি ছিল।

আমার নিজের মত ছিল—আজও সেই মত আছে—কোন বাধা না রাখিয়া যদি চাষীকে জমি বিক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল হইবে এই যে ছোট ছোট চাষীদের হাত হইতে জমি অন্যের হাতে চলিয়া যাইবে; সেইজন্য তাহাদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের এই অধিকার পুরাপুরি পাওয়া উচিত নয়। আমি জানি যে আজও যদি এ-কথা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, এই ধরনের অনেক জমিই কিছুদিন পরে গরিবদের হাত হইতে বাহির হইয়া বড় লোকদের হাতে চলিয়া যাইবে, আর জমি নাই এমন মজুরদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইবে। ইহা ছিল আমার ব্যক্তিগত মত। কিন্তু আমি জানিতাম যে, যে-সব চাষীরা বলিতে কহিতে পারিত, তাহারা সকলেই ইহার বিরোধী ছিল। জমিদারেরাও নিজেদের সংশোধনীয় আইন-কানুনে হস্তান্তরিত করিবার অধিকারকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে—শুধু একটা শর্ত ইহাই রাখিয়াছে যে জমি বিক্রয় করিবার পর তাহাদের যেন কিছু মেলে। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে স্থির করিয়াছিলাম যে বেচিবার অধিকার অবৈধ হইবে, কিন্তু জমিদারের যে-সেলামী মিলিত, তাহার পরিমাণ আরও কম হইয়া যাইবে।

তৃতীয় কথা এই ছিল যে, খাজনা বাকি পড়িলে বিহারে জমিদারদের চাষীকে সেজন্য জমি হইতে বেদখল করিবার কোনও অধিকার ছিল না। তাঁহারা আদালতে বাকি খাজনার জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী হাসিল করিতে পারিতেন, আর ডিক্রী জারি করাইয়া তাহার সমস্ত জোতজমা নিলাম করাইতে পারিতেন। চাষীদের নালিশ ছিল এই যে, সামান্য কিছু খাজনা বাকি পড়িলেও সমস্ত জোতজমা নিলামে চড়িত, তাহাতে তাহাদের খুবই

লোকসান হইত। জমিদারদের বক্তব্য ছিল এই যে, ধারেই যুক্তপ্রদেশে বাকি খাজনার জন্য রায়তকে তাহার জমি হইতে বেদখল পর্যন্ত করিতে পারা যায়; এখানে তো তাহা হইতে কড়াকড়ি কত কম। চাষীদের উপর যদি এতটা চাপ না থাকে, তাহা হইলে তাহারা খাজনা দিতে খুবই নারাজ থাকিবে, আর জমিদারের পাওনা আদায় করিতে অসুবিধা আরও বাড়িয়া যাইবে। এ বিষয়ে স্থির হইল যে বাকি খাজনার পরিমাণ-মূল্যের জমি নিলাম করা হইবে, সমস্ত জোত করা হইবে না। হ্যাঁ, যে রায়ত বরাবর জমির খাজনা বাকি রাখিয়া চলিবে, আর আদালত সর্বদা উহাকে এই ধরনের বাকি খাজনার দায়ে আসামী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে, তাহার সমস্ত জোত-জমি নিলাম করা যাইতে পারিবে।

চতুর্থ কথা, দর লইয়া। বিহারের পাটনা, গয়া ও মুঙ্গের জেলার কোনও কোনও অংশে অধিকাংশ জায়গায় এই প্রথা চলিত যে উৎপন্ন ধানের এক অংশ নগদ খাজনা বলিয়া গ্রহণ করা হইত। সর্বদাই উৎপাদনের অর্ধেক জমিদারকে আর অর্ধেক চাষীকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। ভাগ করিবারও দুইটি পথ ছিল। খেতে যাহা কিছু ধান উৎপন্ন হইত, তাহা জমিদারের সামনেই ঝাড়াই-বাছাই হইয়া খামারে তৈয়ার করা হইত। আবার ওজন করিয়া তাহাকে দুই ভাগ করা হইত, তাহার এক ভাগ পাইত চাষী, অন্যভাগ জমিদার; ইহাকে 'ভাওলী-বটাই' বলিত। অন্য উপায় এই ছিল যে ফসল যখন পাকিয়া প্রায় একরকম তৈয়ার হইয়া যাইত, তখন জমিদারের এক গোমস্তা বা জমিদার স্বয়ং খেতের এক ছোট হিস্‌সার ফসল কাটিয়া দেখিয়া লইত যে কতখানি ধান জন্মিয়াছে, আর তাহারই হিসাবে সারা খেতের উৎপাদন আটক করিয়া রাখিত, তাহার অর্ধেক জমি-দারের বলিয়া ধরা হইত, এবং তাহা যথাসময়ে উশুল করা হইত। ইহার নাম ছিল দানাবন্দী। ভাগ করার বিষয়ে রায়তদের নালিশ ছিল এই যে, যতক্ষণ জমিদারের লোক আসিয়া হাজির না হইত, ততক্ষণ তাহারা ফসল কাটিতে পারিত না; জমিদার যখন তাহাদের কষ্ট দিতে চাহিত তখন দানাবন্দী করিতে যাইতই না, অথবা কোনও কারণে দেরি করিয়া দিলে তাহারা নিজের খামারে তৈরী ধান থাকিলেও অন্ন বিনা কষ্ট পাইত, আর যদি জমিদারের গরহাজিরায় ধান তৈয়ারি করিয়া নিজেদের ঘরে উঠাইয়া লইত তাহা হইলে জমিদার তাহার উপর চাপ দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই আদায় করিয়া লইত, আর হাঙ্গামাবাজ জমিদার তো কত দিক দিয়া মিথ্যা দাবি করিয়াও বসিত। দানাবন্দীর বিষয়েও চাষীদের নালিশ ছিল এই যে, তাহাদের খেতের উৎপাদনে ইচ্ছামত দর বসাইয়া দানাবন্দী করা হইত, আর নামে-মাত্র উৎপন্নের অর্ধেকই জমিদারকে দেওয়ার কথা উঠিত; বাস্তবিক তো তাঁহাকে তাহাদের অনেক বেশি দিতে হইত। আইনে

প্রথমে এক দফা ছিল যাহার দ্বারা রায়ত ও জমিদার উভয়কেই এই অধিকার দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা 'ভাওলি' রাখিতে না চাহিলে আদালতের দ্বারা ভাওলি নাকচ করিতে পারে। আদালত, সমস্ত কথা শুনিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে পূর্বের কয়েক বৎসর আদায়ী ধানও প্রধানভাবে বিচার করা হইত, ন্যায্য বুঝিয়া নগদ খাজনা স্থির বা পাকা করিয়া দিতে পারিত।

১৯১৪-১৮-এর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে বড় দুর্মূল্যের সময় আসিল। চাষীদের ধানের আধা দেওয়া জবরদস্তি মনে হইল। অনেকে আদালতের সাহায্যে নগদ খাজনা স্থির করাইয়া লইল। কিন্তু দুর্মূল্যের সময় ধানের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় ওয়াশীলের ধানও বাড়িয়া গেল। ১৯২৯-৩০-এর পর জিনিষপত্রের দাম সস্তা হইয়া গেলে ঐ নগদ খাজনা আর কোনও প্রকারেই উৎপন্ন বস্তু হইতে আদায় হইতে পারিল না। খাজনা কমিয়া যাইবার মধ্যে ইহাও ছিল একটি অন্যতম প্রধান কারণ। উপরে বলা হইয়াছে, যেখানে খাজনা বাড়িয়া গিয়াছিল, সেখানেই অভাব বেশি। এখন এই সংশোধন হইতে স্থির করা গেল যে রায়তদের দরখাস্ত দেখিয়া 'ভাওলির' বদলে নগদ খাজনা আবশ্যিক করা হইবে এবং মালিকের অংশও আট আনার বদলে কিছু কম করিয়া দেওয়া হইবে। কিছু কম করাও হইয়াছিল।

জমির খাজনা সম্বন্ধে ইহাই ছিল প্রধান সংশোধন। এছাড়া গভর্নমেণ্ট এক নূতন কর—এগ্রিকালচারাল ইনকম্ ট্যাক্স—বসাইতে চাহিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধেও জমিদারদের সঙ্গে এই বোঝাপড়া হইল যে উহা কাহার উপর ধার্য হইবে, উহার হার কিরূপ হইবে এবং উহা হইতে কে রক্ষা পাইতে পারিবে। এসব মোটামুটি বলিলাম। কিন্তু ইহাদের সবগুলির মধ্যে তফশিলের কথা ছিল অনেক, যাহা স্থির করিতে প্রচুর সময় লাগিল। অনেক কথাবার্তা কহিতে হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী আইন ব্যাখ্যা করিবার সময় উহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া লইয়াছিলেন। এই সব বোঝাপড়ার ফল হইল, এই আইন দুই পক্ষের সম্মতিতে কয়েক মাসের মধ্যেই পাশ হইতে পারিল, আর ১৯৩৮-এই গভর্নমেণ্ট নিজের অনেক অফিসারদের—যাহারা ছিল একেবারে নতুন এবং শুধু এই কাজের জন্যই যাহাদের বহাল করা হইয়াছিল—নির্দেশ দিয়াছিল যে তাহারা নূতন কানুন অনুসারে রায়তদের খাজনা কমাইয়া তাহা খতিয়ানভুক্ত করিয়া লয়।

১৯৩৯-এর নভেম্বরে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ইস্তফা দিয়া দিল; তত-দিনে বিহারে খাজনা কমাইয়া খতিয়ান ঠিক করিবার কাজ প্রায় শেষ হইতে পারিয়াছিল, আর জমিদারদের উপর নূতন করও ধার্য হইয়াছিল। অন্য কোনও প্রদেশে এরূপ হইতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশে শলা-পরামর্শই শেষ হয় নাই। সেখানে কানুন তৈরী করিতে প্রতি পদে জমিদারদের বিরোধিতা

সহ্য করিতে হইয়াছিল। যদিও ইস্তফার কিছু পূর্বে পর্যন্ত কানুন সেখানে পাশ হইয়াছিল, তথাপি তাহার উপর গভর্নরের মঞ্জুরি যখন পাওয়া গেল তখন মন্ত্রীসভা ইস্তফা দিয়া দিয়াছেন। তাহার অনুসারে কতদূর ও কখন কাজকর্ম হইয়াছে তাহা আমার জানা নাই। উড়িষ্যায় কানুন পাশই হইতে পারিল না। মান্দ্রাজের মন্ত্রীসভা এক কমিটি স্বীকার করিয়া লইলেন। কমিটি বহু পরিশ্রমের ফলে একটা রিপোর্ট তৈয়ার করিয়াছিল। কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ হইবার পূর্বেই মন্ত্রীসভা ইস্তফা দিয়া দিল। ঐ রিপোর্ট যেমনকার তেমন পড়িয়া রহিল। বাংলায় কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ছিল না বটে, তবু সেখানেও এক কমিটি গঠিত হইল। তাহাও এমন রিপোর্ট দিল, যাহার উপর এ-পর্যন্ত কাজ হইতে পারিল না। বিহারে এই সব বোঝাপড়ার ফলে চাষীকে অতি শীঘ্র অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারিত। সব কথা আপোসে হইয়াছিল বলিয়া পরস্পরে মনোমালিন্য বেশি বাড়ে নাই—যদিও একথা মানিতে হইবে যে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে দুই পক্ষই অভিযোগ করিতেছিল—জমিদারেরাও বটে, কিষাণ-সভার লোকেরাও বটে। আমার বিশ্বাস, কিষাণসভার লোকেরা যদি বুদ্ধি-মানের মত কাজ আদায় করিয়া লইত আর মন্ত্রীসভার কারবার হইতে লাভ করিবার সময় নিজেদের অন্যান্য অসুবিধাও দূর করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকিত, তবে মন্ত্রীসভা আরও কাজ করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা সেপথে গেল না। তাহারা জমিদারদের চেয়েও মন্ত্রীসভার উপর বেশি উৎপাত করিতে লাগিল। মন্ত্রীসভার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করায় তাহাদের যথেষ্ট হাত ছিল।

একটা বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি হইতে পারিল না, সেজন্য মন্ত্রীসভাকে যথেষ্ট কষ্ট সহিতে হইয়াছিল, কিষাণসভাও তাহার বদনাম বা অভিযোগ করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়া গেল। যে-জমিটা বাকি খাজনার জন্য নিলাম করাইয়া জমিদার খরিদ করিয়া লইত তাহা যদি কোনও চাষী প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে বন্দোবস্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রায়তের স্বত্ব হইয়া যাইত। কত জায়গায় জমিদারের কাছে এই ধরনের নিলামে খরিদ প্রজার জমি অনেক পড়িয়া থাকিত। আইনের ভাষায় ইহার নাম 'বকাশ্‌ত মালিক'। জমিদার প্রজাদের চাষীস্বত্ব দিতে চাহিত না, কারণ একবার সে-স্বত্ব জন্মিলে জমির উপর প্রজার পুরাপুরি অধিকার হইয়া যায়। তাহার মৃত্যুর পরও এই স্বত্ব তাহার ওয়ারিশের উপর বর্তে। মালিক শুধু খাজনা আদায় করিয়া নিতে পারে, প্রজাকে বেদখল করিতে পারে না, এখন তো আদায় করিতে গিয়া সমস্ত জমিটা নিলাম করাইতে পারে না। তাই সম্ভব হইলে জমিদার নিজেই তাহা দখল করিয়া চাষ করিতে চাহিত, অথবা কোন না কোন উপায়ে জমির বন্দোবস্ত

করিয়া প্রজাদের চাষীস্বত্ব জমিতে দিতে চাহিত না। ওদিকে রায়ত দেখিত যে চাষীস্বত্বের উপর বেশি জোর দিলে জমিদার জমি দিবেই না, নিজের দখলে রাখিয়া লইবে। তাই অনেকে এই স্বত্বের উপর মন না দিয়া, সম্বৎসরের জন্যই রাজি হইয়া, চাষের জমি লইত, জমিদারও বৎসরান্তে হয় তাহা ফিরাইয়া লইত, নয় তো এই শর্তে ছাড়িয়া দিত যে চাষী যেন অধিকার দাবি না করে। এইভাবে এমন জমি অনেক থাকিত যাহা আইনের দিক হইতে চাষীস্বত্ব হইয়া গেলেও সেই স্বত্ব প্রমাণ করিবার জন্য কোনও প্রমাণ প্রয়োগ প্রজার কাছে থাকিত না। বড় বড় জমিদারিতে, নিলামে খরিদ করা জমি সর্বদাই আবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত; কারণ সমস্ত জমি নিজে চাষ করাইবার ভার লওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ছোট ছোট জমিদার সহজেই তাহা করিতে পারিত। কিছু কিছু বড় জমিদারও এখন মোটরওয়ালা হাল দিয়া বড় পরিমাণে চাষ করিবার কথা ভাবিতেছিল। এইজন্য তাহারা বকাশত্ জমি কিষাণের দখলে যাইতে দিতে চাহে নাই। এই ঝগড়ার কোনও নিষ্পত্তি সেই সময় হইতে পারে নাই। কত জায়গায় কিষাণেরা এইভাবের বকাশত্ জমির উপর গিয়া সত্যাগ্রহ করিয়া দখল করিতে চাহিয়াছিল। গভর্নমেণ্টকে ইহা আটকাইতে হইল। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল যতদিন চলিতেছিল, ততদিন এই ঝগড়া চলিল। এইজন্য তাহাকে অনেক অভিযোগ ও গালি শুনিতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ইস্তফা দিলে এই ঝগড়া নিজে নিজে শেষ হইয়া গেল বলিয়াই যেন বোধ হয়; কারণ ইহার পর সত্যাগ্রহের কথা কোথাও শোনা যায় নাই। এই বোঝাপড়াকে আশ্রয় করিয়া কিষাণসভার কেহ কেহ মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে আমার নামেও বহু অভিযোগ যত্র-তত্র করিয়াছিল। কিন্তু আমি মনে করি, এই বোঝাপড়ার দ্বারা আমরা চাষীর জন্য যতটা নিষ্কৃতির পথ খুলিয়া দিয়াছিলাম, যতটা তাহার রেয়াৎ করাইয়াছিলাম, কোনও প্রদেশেই তাহারা ততটা পায় নাই।

কিষাণসভা বোঝাপড়ার ব্যাপারে যোগ দেয় নাই। ইহা হইতে যাহা লাভ হইবে তাহা আদায় করিবার অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের দাবি পেশ করা, মন্ত্রীমণ্ডল ও জমিদারদের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করা, মিছামিছি ঝগড়ায় নিজের শক্তির অপব্যয় না করিয়া রচনাত্মক উপায়ে চাষীদের অবস্থার উন্নতি সাধনে তাহা প্রয়োগ করা—এসব বিষয়ে তাহার পুরাপুরি অধিকার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে তাহার শক্তির অনেকখানি মন্ত্রীমণ্ডলের বিরোধেই ব্যয় হইল। যেখানে সত্যাগ্রহ করা হয় সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলের খুব কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, বদনামের ভাগীও হইতে হইয়াছিল।

এই বোঝাপড়ার ব্যাপার চালাইতে চালাইতে আমার অসুখ হইয়া গেল। ১৯৩৭-৩৮-এর শীতে কিছুদিনের জন্য আমি আমার গ্রামে চলিয়া যাই। কিছুটা বিশ্রাম করিয়া আমাকে আবার কানপুরের মজদুর কমিটির কাজে লাগিতে হইল, ইহার কথা প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি। আমি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ওয়ার্ধা গেলাম। সেখান হইতে কানপুর আসিবার কথা ছিল। পথে হয়তো খাওয়ার কিছু গোলমাল হইয়া থাকিবে। পরে দেখা গেল, খাওয়ার মধ্যে বিষের লক্ষণ আসিয়াছিল। লখনউ হইয়া কানপুর আসিলাম যখন, তখন শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কমিটির কাজ করিয়া গেলাম। তদন্ত করিবার যাহা যাহা ছিল শেষ করিলাম। এই কমিটিতে আমার মতো কিছু কিছু নিরপেক্ষ লোক ছাড়া মিলের মালিক ও মজদুর, উভয়েরই প্রতিনিধি ও সভ্য ছিল। অচিরে বুঝিতে পারিলাম যে দুই পক্ষের প্রতিনিধি সঙ্গে লইয়া কমিটির কাজ নির্বাহ করা কঠিন হইবে; যদি এমন লোকই সভ্য হইত যাহারা মিল-মালিক ও মজদুরের কথা বুঝিয়া-সুঝিয়া নিজের রায় দিতে পারে—প্রতিনিধিদের যেমন উহাদের কথা অনুসারেই রায় দিতে হইত তেমন ধারা সোজাসুজিভাবে প্রতিনিধি না হইত—তাহা হইলে এতটা কঠিন হইত না। ওখানেও হয়তো তাহাদের উপর এতখানি বাধ্যবাধ্যকতা ছিল না। কিন্তু সমস্ত তদন্ত একই জায়গায়, আর সে-জায়গায়ও একই প্রকারের কাজকর্মের সম্বন্ধে। সেখানকারই মিলওয়ালা ও সেখানকারই মজুরদের প্রতিনিধিদের জন্য নিজেদের নৈতিক অধিকারের কথাও আসিয়া যায় যে তাহারা তাহাদেরই মতবাদের প্রতিনিধি হইয়া কাজ করিবে। এই সব ভাবিয়া গভর্নমেণ্ট শ্রীশিবরাওকে এক সদস্য স্থির করিয়া রাখিলেন, মান্দ্রাজ প্রদেশে শ্রমিক সংগঠনে ইঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। প্রঃ রুদ্র প্রথম হইতেই একজন সভ্য ছিলেন। যদিও মিলওয়ালা ও শ্রমিকসভার প্রতিনিধিরা তদন্ত কমিটির সম্মুখে পেশ করিবার জন্য কাগজপত্র ও সাক্ষী সাবুদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরা ইত্যাদি করিতে পারিতেন, এবং তাহা করিতেনও বটে। তথাপি চূড়ান্ত রিপোর্ট লিখিবার ভার আমাদের তিনজনের উপরই থাকিল। আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলেও এজাহার লওয়া ইত্যাদি কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলাম। হ্যাঁ, তবে মিলে মিলে ঘুরিয়া সব জিনিস দেখিতে পারি নাই; কারণ শরীর খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য কাজ শেষ করিয়া আমি পাটনায় আসিলাম। ভাবিলাম যে কিছু বিশ্রাম করিয়া, অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে একযোগে, রিপোর্ট তৈয়ার করা যাইবে।

পাটনায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ছিল। কথা ছিল, সেখানে খাজনা আইনের বিষয়ে যে বোঝাপড়া হইয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা হইবে। সেখানে খুব তর্ক-বিতর্ক হইল। প্রাদেশিক কমিটি উহা বিপুল ভোটাধিক্যে মঞ্জুর করিল। কিন্তু আমাকে এখন কানপুরের দুর্বলতা কষ্ট দিতেছিল। এখানেও যথেষ্ট পরিশ্রম হইল। আমি বার দুই কাজ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, কিন্তু নিজের এই অবস্থা কাহারও নিকটে প্রকাশ হইতে দিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল যে সে-দিনই কাজ শেষ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য জীরাদেঈ চলিয়া যাইব। সেই কথা মতো রওনাও হইয়াছিলাম। অনুগ্রহবাবু কোনও কার্যোপলক্ষে গয়া জেলায় গিয়াছিলেন। সেখানে দাউদনারের নিকটে রাত্রিবেলা তাঁহার মোটর গাড়ি রাস্তা হইতে নামিয়া গর্তে পড়িয়া যায়। তিনি খুব কঠিন রকম আঘাত পান। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন পরেশনাথ ত্রিপাঠী, তাঁহার তৎক্ষণাৎ সেখানেই মৃত্যু হয়। মোটর চালকও আহত হয়, তবে সাংঘাতিক কিছু নয়। অনুগ্রহবাবুকে কোনও রকমে পাটনায় আনিয়া হাসপাতালে রাখা হইল। আমার পাটনায় যাইবার পূর্বেই এ-সব ঘটনা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া আমার খুবই দুঃখ হইত। ভাবিয়াছিলাম, জীরাদেঈ যাওয়ার পথে হাসপাতালে তাঁহাদের দেখিয়া সেখান হইতেই ষ্টীমারে করিয়া চলিয়া যাইব—করিলামও তাহাই। কিন্তু ষ্টীমারে যাইতে যাইতে এত ক্লান্ত হইয়া গেলাম যে সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। কোনও প্রকারে বিশেষ অসুবিধায় সোণাপুরের গাড়িতে উঠিতে পারিলাম মাত্র। কিন্তু সুবিধাক্রমে আমার ভাইপো জনার্দন জামশেদপুর হইতে ছুটিতে ঐ গাড়ি করিয়া বাড়ি আসিতেছিল। সেই আমার জন্য জায়গা রাখিয়াছিল।

আমরা দুইজনে ভল্টাপোখর স্টেশনে রাত নয়টায় আসিয়া পেঁীছিলাম। সেখানে রেল হইতে নামিবার সময়ই জোর বমি হইতে শুরু করিল, যেমন কানপুরেও হইয়াছিল। কোনও প্রকারে আমি পালকি করিয়া জীরাদেঈ গিয়া পেঁীছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কয়েকটা দিন সেখানে বিশ্রাম করিলে সব ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু রাত্রে অবস্থা খারাপ হইয়া গেল। জনার্দন ও মৃত্যুঞ্জয় সে-দিন সেখানেই ছিল। অবস্থা খারাপ হইতে দেখিয়া পাটনায় খবর পাঠাইল। সকালে সীওয়ান হইতে ডাক্তার গিয়া পেঁীছাইল। একটু পরে ছাপরা হইতেও ডাক্তার সুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের আশঙ্কা হইল যে খাওয়ার মধ্যে বিষ নিশ্চয় মেশানো ছিল। তাঁহারা তাহারই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রাত্রে পাটনা হইতে ডাক্তার ব্যানার্জি ও ডাক্তার শরণও আসিয়া গেলেন। দুই-তিন দিনে অবস্থার পরিবর্তন হইল। কিন্তু এখন জোর হাঁপানির আক্রমণ শুরু হইল। ডাক্তার ঘোষালও পাটনা হইতে আসিয়া পেঁীছিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া

সেখানেই ঔষধপত্র চলিল। ডাক্তারেরা যেমনই আমাকে পাটনায় লইয়া যাইবার মত দিলেন অমনি আমাকে পাটনায় লইয়া আসিলেন। এখানে আমাকে হাসপাতালেই রাখা হইল। বাড়ির লোকেরাও সংগে ছিল। কিছু দিন রোগের আক্রমণ জোর ছিল, আস্তে আস্তে কম হইয়া আসিল। কয়েকদিনের মধ্যেই, অনুগ্রহবাবু যে-কটেজে ছিলেন আমাকেও সেখানেই লইয়া যাওয়া হইল। আমরা দুইজনে এক জায়গায় ছিলাম বটে—তিনি ছিলেন নীচের কামরায় আমি ছিলাম উপরে—তবু অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের পরস্পরে দেখা করা সম্ভব হইল না। তিনি তো চারপাইয়ের উপর চাদরও বদলাইতে পারিতেন না। আমি সিঁড়ি দিয়া ওঠানামা করিতে পারিতাম না। সেখানেই আমি প্রায় দুই মাস থাকিলাম। আস্তে আস্তে শরীরে কিছু শক্তিও আসিল। কিছুদিন পরে আমি নীচে নামিয়া আসিয়া অনুগ্রহবাবুর পাশে বসিতাম। তিনি চারপাইয়ে শুইয়া শুইয়া সরকারি কাগজপত্র দেখিয়া হুকুম লিখিতেন। প্রথম কয়দিন বাদ দিয়া—তখন তিনি একেবারে অকর্মা ছিলেন, কোনই কাজ করিতে পারিতেন না—বরাবর তিনি কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন।

মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ ও হরিপুরা কংগ্রেস

আমরা দুজন যখন ঐ বাড়িতে, তখন হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। আমরা দুইজন যাইতে পারি নাই। ১৯৩৭-এ কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়াছিল। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সাত-আট মাস মন্ত্রীমণ্ডল সকল প্রদেশেই নিজের নিজের কাজ প্রবল-ভাবে শুরু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও কাজ শেষ হইতে পারে নাই। এই সময়ে এক সংকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কংগ্রেসের নির্বাচন বিজ্ঞপ্তিপত্রে একটা প্রতিশ্রুতি এমনও ছিল যে আমরা রাজবন্দীদের মুক্তি দিব। তাঁহারা এজন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূর্ণ সফলতা হয় নাই। ইতিমধ্যে আন্দামান দ্বীপের রাজবন্দীরা অনশন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। অনেক কষ্টে ভারত সরকার এ কথায় রাজি হইলেন যে তাঁহা-দিগকে দ্বীপ হইতে সরাইয়া ভারতবর্ষে নিজের নিজের প্রদেশে পাঠানো হইবে। যখন ইহারা দেশে আসিয়া গেলেন, তখন তো প্রাদেশিক সরকারের অধিকারেই সকলে আসিয়া পড়িলেন। এইভাবে তাহাদের মুক্তি দিবার প্রশ্নটা আসিয়া পড়িল। মন্ত্রীমণ্ডল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে চাহিল।

কিন্তু গভর্নর ইহাতে রাজি হইতেছিলেন না। আমার পীড়িতাবস্থায়ই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাটনায় আসিয়া হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বেশি কথা বলিতে পারি নাই। তিনি এখান হইতে গিয়া সরদার বল্লভভাই ও মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। সকলের পরামর্শ হইল এই যে গভর্নর যদি রাজবন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে রাজী না হন, তবে মন্ত্রীরা ইস্তফা দিয়া দিক। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে মন্ত্রীমণ্ডল খুব চাপ দিল, কিন্তু গভর্নর রাজী হইলেন না। শেষটায়, হরিপুরা কংগ্রেসে যাওয়ার পূর্বে, দুই জায়গায়ই মন্ত্রীমণ্ডল ইস্তফা দিল। গভর্নর তখন উহা মঞ্জুর করিলেন না। এই কথা বলিয়া কথার জের টানিয়া রাখিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহারা এ-কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন ও অন্য মন্ত্রী খুঁজিতেছেন ততক্ষণ কাজ চালু থাকুক। বিহারের অন্য মন্ত্রীরা তো হরিপুরা চলিয়া গেলেন, শুধু অনুগ্রহবাবু চারপাইয়ে শুইয়া শুইয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। আমিও সেখানেই তাঁহাকে সঙ্গ দান করিতে থাকিলাম।

এই পদত্যাগের ফল কি হয় তাহা দেখিবার ছিল। যদিও ভাইসরয় ও গভর্নরেরা কথা দিয়াছিলেন যে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করিবেন না, তথাপি এই প্রথম উপলক্ষ্যে তাঁহারা উহা প্রয়োগ করিতে চাহিলেন। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল তাহা মানিয়া লইতে পারিল না, পদত্যাগ করিল। সমস্ত দেশে ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যেও এই কথা প্রচার হইল যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল নিজের কথায় ঠিক থাকিবে, নিজের কথামত কাজ করিতে না পারিলে তাহারা পদত্যাগ করিবে —নিজের কথা ছাড়িবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও মন্ত্রীমণ্ডল, উভয়ের এই প্রথম পরীক্ষা হইতে থাকিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মন্ত্রীমণ্ডলের কথা মানিয়া লইল, এবং রাজবন্দীদের ছাড়িবার ভারও তাঁহাদের উপরই দিয়া-দিল। হরিপুরায় পদত্যাগের সংবাদ পেঁাছাইতেই সেখানকার হাওয়া একেবারে বদলাইয়া গেল। যাহারা মন্ত্রীত্বের বিরোধী ছিল, বলিয়া বেড়াইত যে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার পর ইহারা নিজের নিজের জায়গায় সাটিয়া যাইবে, নিজেদের আদর্শও ভুলিবে, তাহাদেরও চোখ খুলিয়া গেল —তাহারা যদি সত্যসত্যই এরূপ ভাবিত তাহা হইলে তাহাদেরও মত বদলাইতে হইল। আমি তো কংগ্রেসে যাইতেই পারিলাম না। কিন্তু যাহা কিছু শুনিলাম তাহাতে মনে হইল যে এই পদত্যাগের ফলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিষয়ে যাহা কিছু অল্পস্বল্প বিরোধ জন্মিয়াছিল তাহা এখন চলিয়া যাইতেছে।

হরিপুরা কংগ্রেসের আড়ম্বরও ছিল অপূর্ব। সভাপতি ছিলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। সেখানকার আয়োজন এত বৃহৎ আয়তনে ও এত টাকা

পয়সা ব্যয় করিয়া হইয়াছিল যে এ-পর্যন্ত অন্য কোনও অধিবেশনে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নাই। আমরা হাসপাতালে থাকিতে থাকিতেই হরিপুরা হইতে লোক ফিরিয়া আসিল। পদত্যাগও ফিরাইয়া দেওয়া হইল। মন্ত্রীরা আবার কাজ করিতে শুরু করিলেন। এ পর্যন্ত যে কার্যক্রম প্রস্তুত হইয়াছিল, সাত-আট মাসে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। এজন্য মন্ত্রীদের আবার নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসা ভালই হইয়াছিল। এখন কাজ বেশি উৎসাহের সঙ্গে হইতে থাকিল; কারণ কেহ বলিতে পারিল না যে কখন ও কোন বিষয় লইয়া আবার পদ-ত্যাগ করিতে হইবে, এইজন্য যাহা কিছু হইতে পারে করিয়া ফেলাই ভাল।

বিহারের শ্রমিক-সমিতি

মন্ত্রীরা স্থির করিলেন যে বিহারের শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য ও উন্নতি করিবার জন্য এক কমিটি গঠিত হউক। কানপুরের কাজ এক প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য আমি এখন এ কাজ নিজের হাতে লইতে পারিলাম। কমিট নিযুক্ত হইল। আমাকে তাহার সভাপতি করা হইল। নিজে অসুস্থ বলিয়া কানপুরের কাজ আমার নিজের সন্তোষজনকভাবে করিতে পারি নাই। সেখানকার রিপোর্টের উপর গভর্নমেন্ট যখন কাজ করিতে চাহিলেন তখন মিল-মালিকেরা বিরোধিতা করিলেন। শ্রমিকদের দিক হইতে হরতাল করা হইল। ফলে অনেক দিন ধরিয়া টানাটানি চলিতে লাগিল। আমাদের সুপারিশ কতখানি গ্রাহ্য হইল তাহা আমার মনে নাই। আমার এইটুকু অনুতাপ থাকিয়াই গেল যে যদি আমার শরীর ভাল থাকিত ও কিছু সময় বেশি দিতে পারিতাম, এবং কানপুর গিয়া রিপোর্ট দিবার পূর্বে উভয় পক্ষের সঙ্গে খোলাখুলি কথা কহিয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলে রিপোর্টের বিরুদ্ধে এত প্রবল আপত্তি হইত না। এমন হইতে পারে যে আমাদের অনুমোদনের মধ্যেও খানিকটা হেরফের হইত—অন্ততঃ যাহা কিছু সুপারিশও করা হইত, মিল-মালিকেরা তাহা এতটা বিরক্তির সঙ্গে গ্রহণ করিত না।

যাহা হউক, এখন তো সে-কথা হইতে পারিল না। কিন্তু বিহারে আবার সেই প্রকার কাজ আমাকে করিতে হইল আর সেখান থেকেও এখান-কার সমস্যা ছিল বেশি জটিল; কারণ সেখানে তো কেবল একই শহরের একই রকমের কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা ছিল।

কিন্তু এখানকার কমিটির অধিকার ছিল সকল প্রকারের শ্রমিকদের লইয়া —যাহারা কারখানায় কাজ করিত—তাহাদের অবস্থা তদন্ত করিবে। আমি যতদূর বুঝিয়াছিলাম, হিন্দুস্থানে যত প্রকারের কারখানা আছে, প্রায় তাহার সব রকমই আছে বিহারে। হয়তো অনেক জিনিসে বিহার এ বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে খনির কাজ খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কয়লার খনি এত বেশি আছে যে অন্য কোনও প্রদেশে এতটা নাই, অথবা এমনও যদি বলিতে পারি যে বিহারে যত কয়লার খনি আছে, সারা হিন্দুস্থানের অন্য সমস্ত প্রদেশ একত্র করিলেও ততটা পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে ঠিক হইবে। লোহা ও তামার খনির একই অবস্থা। অভ্রের খনিও এত বেশি আছে যে অন্য কোনও প্রদেশে এতটা নাই, সমস্ত প্রদেশ একত্র করিয়াও নাই—হয়তো সমস্ত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে বিহারের মত এতটা নাই। অন্য কয়েকটা জিনিসও অল্পবিস্তর বিহারের খনি হইতেই পাওয়া যায়।

আখের ক্ষেতও এখানে প্রচুর। গত বারো বৎসরের মধ্যে চিনির কারখানাও অনেক হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ছাড়িয়া দিলে অন্য কোনও প্রদেশে বিহারের মত এত কারখানা নাই। জামশেদপুরের টাটা কোম্পানীর লোহার কারখানা হিন্দুস্থানের শুধু নয়, এশিয়ার সবচেয়ে বড় কারখানা বলিয়া লোকে মনে করে, উহা পৃথিবীর বড় বড় কারখানার মধ্যে একটি। সেখানে আরও অনেক রকমের কারখানা আছে—টিনের প্লেট তৈরি করার জন্য—তার, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক তার তৈরি করিবার জন্য—ক্ষেতের যন্ত্রাদি (কোদাল, গাঁতি ইত্যাদি) তৈরি করিবার জন্য—লোহার তার ও কাঁটা তৈরি করিবার জন্য অনেক অনেক কারখানা আছে। কয়েকটি তো আছে জামশেদপুরের আশেপাশেই। এ ছাড়া আরও লোহার কারখানা অন্যত্র আছে। লাক্ষার ক্ষেত ছোটনাগপুরের জঙ্গলে বেশি করিয়া হয়। বিহারে যত লাক্ষা হয়, তত আর কোথাও হয় না। লাক্ষা হইতে গালা তৈরি করিবার কারখানা ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় স্বাভাবিক রীতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে-সব জায়গায় জঙ্গলে যথেষ্ট লাক্ষা পাওয়া যায়। এখানে ওখানে পাট তৈরি করার ও তুলা হইতে কাপড় তৈরি করার কিছু কিছু কারখানাও আছে; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম।

এই প্রকারে বিহারের কমিটিকে প্রায় সব রকমের শ্রমিকের অবস্থা তদন্ত করিয়া দেখিতে হইল। জামশেদপুরের কারখানাগুলির শ্রমিকেরা এক আধুনিক রীতিতে নবগঠিত বড় শহরে বাস করে। সেখানকার কারখানায় দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলে, বৎসরে এক দিনও বন্ধ থাকে না। কিছু কিছু শ্রমিক এমন আছে যাহারা গাঁয়ে নিজের নিজের ঘরে বাস করে, আর বৎসরে চার-পাঁচ মাস শুধু চিনির কারখানায় কাজ করে। অন্যান্য

স্থানের মত কিছু কিছু মজুর বিভিন্ন কারখানায় প্রয়োজনমত বরাবর কিছু না কিছু করিতে থাকে। খনির ভিতরে যাহারা কাজ করে তাহাদের অবস্থা আবার ইহাদের সকলের থেকে ভিন্ন; কারণ ওখানকার কাজই অন্য ধরনের। খনির মধ্যেও যাহারা কাজ করে তাহাদের সকলের তো কাজ এক ধরনের নয়, চলাফেরাও তাহাদের এক ভাবের নয়। ঝরিয়ায় কয়লার খনির জমজমাট। কয় মাইলের মধ্যে অনেকগুলি খনি আছে। তাই সেখানকার শ্রমিকদের বসতি খানিকটা মিলিয়া জুলিয়া। অভ্রের খনিগুলি একটি অন্যগুলি হইতে পৃথক, জঙ্গলের মধ্যে ও পাহাড়ের উপর, দূরে দূরে। তাই সে-সব খনির মজুরদের থাকিবার কোনও এক জায়গায় ব্যবস্থা নাই। ঝরিয়ার সমস্ত কারখানার শ্রমিকদের জন্য একই জলের কল হইতে জল পাওয়ার ব্যবস্থা। অভ্রের খনিগুলির সেরূপ নাই, হয়তো সেরূপ হওয়া সম্ভবও নয়। এইরূপ, অনেক প্রকারের কাজের জন্য অনেক প্রকারের শ্রমিক আছে। তাহাদের থাকার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গেও স্বভাবতই যথেষ্ট প্রভেদ আছে। বিহার কমিটির কাজ ছিল, ইহাদের সকলের তদন্ত করিয়া কিছু সুপারিশ করিবে। কাজের বিস্তার ও গুরুত্ব দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম, কিন্তু ছাড়া পাইলাম না। আমিও স্থির করিলাম, সময় বেশি লাগে তো লাগুক, কিন্তু এ-কাজ ভাল করিয়া করা উচিত, এবং শেষ করা উচিত। কাজেও তাহাই করিলাম।

এ ছাড়া আরও প্রশ্ন উপস্থিত ছিল, তাহার বিষয়ে আমাকে কিছু না কিছু করিতে হইল। মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়া মাত্রই আখের সম্বন্ধে এক প্রশ্ন তাহাদের সামনে উপস্থিত হইল, তাহার বিষয়ে শীঘ্রই উহাদের কিছু করিতেই হইল। বিহারে চিনির কারখানার সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া এখানকার চাষীরা আখের চাষ খুব বেশি করে এবং তাহা আখের কারখানাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। কারখানা তৈয়ারি হওয়ার পূর্বে চাষী ততটা আখ চাষ করিত যতটা সে নিজে মাড়াই করিয়া গুড় তৈয়ার করিতে পারিত। চাষের কাজে এমন কিছু সুবিধা হইয়া গেল যে, যে সময়ে আখ মাড়াইয়ের কাজ হইত সে সময়ে বলদের অন্য কাজ বেশি কিছু থাকিত না; কারণ আখ মাড়াইয়ের কাজ কার্তিকের পর শুরু হইত, ততদিন রবিশস্য বুনিবার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য চাষী যতটা নিজের বলদের সাহায্যে মাড়াই করিতে পারিবে সেই হিসাবেই সে আখ বুনিত। এইভাবে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষের একটা স্বাভাবিক শেষ হইয়া যাইত। কারখানা যখন তৈয়ারি হইল, তখন হইতে চাষী আখ মাড়াইবার হাঙ্গামা হইতে মুক্তি পাইল। তাহারা উহা কারখানা পর্যন্ত বা নিকটের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজটাই করিত,

আর পা দিয়া মাড়াইবার কাজটা কারখানায় করাইয়া লইত। আখ হইতে নগদ পয়সাও পাওয়া যাইত। এইজন্য আখের চাষ খুব বাড়িয়া গেল। যদি কোনও কারণে কারখানায় আখ না যায় তবে চাষী একেবারেই অসহায় হইয়া পড়ে, তাহার সম্বৎসরের আয় নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থা ১৯৩৪-এ হইয়াছিল, যখন ভূমিকম্পের জন্য অনেক কারখানা বেকার হইয়া পড়ে। খেতে যে-সব আখ হইয়াছিল তাহার ফসল বাঁচাইবার জন্য গভর্নমেণ্ট ও রিলিফ কমিটিকে আখ মাড়াই কল চালাইবার জন্য চাষীকে উৎসাহ দিতে হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া আখ মাড়াইয়ের কল বিলি করা হইয়াছিল। তাহা হইলেও এই সব কল দিয়া পুরাপুরি কাজ হইবার কথা নয়। কিন্তু কিছুকাল পরে কলগুলি মেরামত হইতে পারিল, তাহারা চালু হইল। চাষীদের ফসলের কিছু অংশ বাঁচিয়া যাইতে পারিল। কারখানার লোকেরা চাষীদের আখ কিনিয়া লইত। গভর্নমেণ্ট দেখিল, চাষী কারখানার এতটা অধীন যে কারখানা ইচ্ছামত দাম কমাইতে পারিত। এইজন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার বহু পূর্বে আখের দাম বাঁধিয়া দিবার অধিকার গভর্নমেণ্ট আইনের দ্বারা নিজের হাতেই লইয়া রাখিয়াছিল। বলিয়া দেওয়া হইত, মণকরা এত আনার কম দামে কেহ আখ কিনিতে পারিবে না—তবে কেহ বেশি দিতে চায় তো দিতে পারে। এই-ভাবে চাষীরা অবশ্য খানিকটা টাকা পাইয়া যায়। কারখানায় হাঙ্গামা করিলে বেশিও পাইতে পারে।

১৯৩৬ সালে কোনও কারণে আখের চাষ কম হয়। কারখানাতে খুব দর কষাকষি হইল। ফলে চাষী দাম পাইল বেশি। পরের বৎসর তাহারা বেশি করিয়া আখের চাষ করিল। ১৯৩৭ সালে এত বেশি আখ হইল যে মনে হইল, কারখানায় সব আখ কিনিতে পারিবে না। চিনির দামও এতটা কমিয়া গেল যে গভর্নমেণ্টের বাঁধিয়া দেওয়া দামও খুব কম হইল; সেই দামেও কারখানায় আখ লইতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে চাষীর খুব লোকসান হইল। এই সময়ে অল্প কিছু দিনের জন্য মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভাও কিছু কিছু চেষ্টা করিল, কিন্তু উহা গঠিত হইল এপ্রিল মাসে, তখন আখের চাষ প্রায় উঠিবার মত। পূর্ব হইতেই আমরা কারখানার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তাহারা কোনও প্রকারে আখ অবশ্যই লইয়া যায়। কেহ কেহ রাজিও হইয়া গেল। তাহাদের নিজেদের অঞ্চলের আখ তাহারা লইল। যতদিন তাহা শেষ না হইল ততদিন কারখানা চলিতে থাকিল, যদিও বরাবর যেমন হইয়া থাকে এপ্রিলের অর্ধেক পার হইলেই আখের মধ্য হইতে চিনির পরিমাণ কম বাহির হয়। জুলাই মাসে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে তাহাকে এ-বিষয়ে ভাবিতে হইল—১৯৩৭ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে

চাষীদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, যাহা কিছু হাঙ্গামা পোয়াইতে হইয়াছিল, আবার যেন তাহা না হয়। ইহা লইয়া আমার ও এই বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর মামুদের কথাবার্তা হইয়াছিল, এক কনফারেন্সও করা গেল। দেখা গেল, আখের চাষ সবচেয়ে বেশি হয় যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে। তাই যাহা কিছু করিবার তাহা দুই প্রদেশ মিলিয়া করিলে ভাল হয়। উভয়ের সামনে একই সমস্যা। উভয়ের মধ্যেই কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল। তাই দুই প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল একত্র হইয়া এক কনফারেন্স করিল। তাহাতে নিজেদের কার্যক্রমও স্থির করিয়া লইল। আমাকেও তাহাতে যোগ দিতে হইল। যেহেতু ভারতবর্ষে যত চিনি হয় তাহার তিন-চতুর্থাংশ হইতেও বেশির ভাগ এই দুই প্রদেশে হয়, এইজন্য লোকে ভাবিল যে এই দুইয়ে মিলিয়া যেমনটি ব্যবস্থা করিতে চাহিবে তেমনটি করিতে পারিবে।

উভয় প্রদেশে আইন করা হইল। আইন অনুসারে শুধু আখের নহে, চিনিরও দাম ঠিক করিবার অধিকার গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে লইল। কোনও কোনও কারখানার মালিক ইহার বিরোধিতা করিল। কিন্তু শেষকালে রাজি হইয়া গেল সকলেই। কারখানার মালিকেরা এক সংঘ গঠন করিল। সেই সংঘ সব কারখানাই নিয়ন্ত্রণ করিত। যে কারখানা সংঘে যোগ দিল না, গভর্নমেণ্ট তাহাকে আখ মাড়াইয়ের লাইসেন্স দিবে না। এইভাবে, যাহাদের ইচ্ছা ছিল না তাহারাও বাধ্য হইয়া ঐ সংঘে যোগ দিল। সে বৎসর চাষীরা ঠিক ঠিক দাম পাইয়াছিল। আমার মনে খানিকটা সন্দেহ ছিল; কারণ আমি বুঝিয়াছিলাম, কারখানাগুলির সঙ্গে বেশি কড়াকড়ি করিলে এমনও হইতে পারে যে এই দুই প্রদেশের বাহিরে যে সব কারখানা আছে, যেখানে কোনও প্রকারের হস্তক্ষেপ বা প্রতিবন্ধক নাই, তাহাদের সঙ্গে ইহারা বিরোধিতা করিতে পারিবে না। তাই বলিয়াছিলাম যে সব প্রদেশ একত্র মিলিয়া যদি কিছু করা যায় তবে ভাল হয়। ভারত সরকার কিছু করিতে প্রস্তুত ছিল না। এইজন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যেই কথাবার্তা হইতে পারিত। অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল—কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলও—এই দুইটি প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়া নিজ নিজ প্রদেশের কারখানাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে রাজি হইল না। ফলে ঐ সব প্রদেশের কারখানার—বিশেষ করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির কারখানার—ভারি সুবিধা হইল। সেখানে নূতন নূতন কারখানা বসিল। পুরানো কারখানাগুলিতে খুব লাভ হইল। বিহারের দুই-একটি কারখানা জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া প্রদেশের বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা যাহা কিছু করিল তাহাতে ঐ সময়ে চাষীদের খুবই লাভ হইল। আর যতদিন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা থাকিল, ততদিন লাভও হইতে থাকিল।

শিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ মাহ্মুদ এই বিভাগের চার্জে ছিলেন। আমাকে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। এদিকে আমি কিন্তু ১৯২১ সনে সেনেটের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছিলাম। এই পদ পুনরায় লইবার জন্য তিনি আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় উপাচার্য ছিলেন, তিনিও অনুরোধ করিলেন। অগত্যা আমি সদস্যপদ গ্রহণ করিলাম। সেনেটের সভায় আমি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। সরকার শিক্ষা-বিধির সংস্কার সম্বন্ধে বিচার করুক আর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একটি বিধি রচনার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করা হউক। প্রস্তাব পেশ করিবার দিন আমি পীড়িত হইয়া পড়ি। অনেক কষ্টে মীটিংয়ে গেলাম। তবে, আমি আমার বক্তব্য লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। এক বন্ধু উহা পাঠ করিলেন। উহাতে প্রচলিত শিক্ষাবিধির কঠোর সমালোচনা ছিল। কয়েকজন সদস্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষক, অনেক মন্তব্য করিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দিনকতক পরে প্রস্তাবটি যখন সরকারের নিকট পাঠান হইল, মন্ত্রীরা একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন। আমাকেও ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য করা হইল। কমিটির অধ্যক্ষ হইলেন বোম্বাইয়ের শ্রী কে. টি. শাহ।

শিক্ষাসম্বন্ধে সমগ্র বিষয়টি আমার প্রস্তাব উপস্থিত করার আগেই এক পরিকল্পনা রচনা করিয়া দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। 'হরিজনে' কয়েকটি লেখাও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনার প্রধান কথা ছিল যে, আমরা বর্তমানে আমাদের শিশুদের কেবল আক্ষরিক শিক্ষাই দিতেছি। কেবল আক্ষরিক অর্থাৎ বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়া কিছু হস্তশিল্পের মাধ্যমে দেওয়া কর্তব্য। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ করিয়া ছাত্ররা যাহা উপার্জন করিবে তাহা দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে। ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে। আর এই প্রণালীতে প্রদত্ত শিক্ষা বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা অপেক্ষা উন্নততর হইবে অথচ সরকারের বেশি কিছু খরচ পড়িবে না। আগে যদি কখনও প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করার কথা উঠিয়াছে তখনই ইহার উপযুক্ত টাকা তাঁহাদের নাই, সরকার পক্ষ হইতে এই অজুহাত দেখান হইত। স্বর্গীয় গোখেলের সময় হইতেই জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই দাবি করা হইতেছিল, কিন্তু সরকার সর্বদাই অর্থাভাবের

বাহানায় ইহার বিরোধিতা করিতেছিলেন। দুই-এক জায়গায় নিঃশুল্ক শিক্ষা দুই-চারি জায়গায় আবশ্যিক শিক্ষা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে তাহা পরিমাণে এতই নগণ্য ছিল যে সারা ভারতে কোনও দিন উহার প্রয়োগ হইবে এমন আশা ছিল না।

বিহারের ছাপরা জেলায় একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন কাজে প্রধান উৎসাহী ছিলেন দুই জনে, আমার ভাইসাহেব বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ আর ছাপরা জিলার তদানীন্তন তৎকালীন বিদ্যালয়-পরিদর্শক বাবু রাধিকাপ্রসাদ। সরকার যদিও ইহা নামঞ্জুর করেন নাই, কিন্তু উৎসাহও দেন নাই। কোন রকমে কাজ চলিতেছিল। গান্ধীজী তাঁহার পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া আন্দোলনের ভাব আনিয়া ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী এবং এই শিক্ষার প্রচারে তৎপর, ওয়ার্ধায় এমন জনকয়েককে লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সেখানে তাঁহার পরিকল্পনাটি বিচার করিয়া দেখা হইল। সম্মেলনের একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়ার অধ্যক্ষ ডাক্তার জাকির হোসেন এই কমিটির অধ্যক্ষ হইলেন। সাবকমিটি একটি খসড়া রচনা করিলেন। পরে ইহাই ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে প্রসিদ্ধ হয়। গান্ধীজীর পরিকল্পনার বেশির ভাগই এই সাব-কমিটি সমর্থন করিয়াছিলেন আর প্রাথমিক শিক্ষা কারিগরদের সাহায্যে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিলেন। অবশ্য খরচের বিষয়ে এই কমিটি গান্ধীজীর যাহা মত ছিল ততদূর পর্যন্ত যাইতে রাজী হইলেন না, তবে হাতের কাছের মধ্য দিয়া শিশুরা যদি কিছু উপার্জন করে আর তাহাতে খরচের কিছুটা উঠিয়া আসে, তবে তাহা করাই ঠিক। সে-বিষয়ে তাঁহাদের কোনও অমতও রহিল না।

যে-সকল শিক্ষাবিদ এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাবিদদিগের বিচার অপেক্ষা গান্ধীজীর পরিকল্পনাটিকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর দেখা গেল, উঁহাদের বিচার না শুনিয়াই এবং উঁহাদের পুস্তকাদি না পড়িয়াও গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহাই অধুনাতম পণ্ডিতদেরও অভিমত। তাই আমি যখন সেনেটে আমার প্রস্তাব পেশ করি তখন আশা ছিল যে ওয়ার্ধা পরিকল্পনাও এই কমিটি বিবেচনা করিবে। আর যদি ইহাদের মতের সঙ্গে মিলিয়া যায় তবে গান্ধীজীর পরিকল্পনাকে বিহার সরকার সহজেই কাজে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আমি তখন এই কমিটির সভ্য হইতে রাজী হইয়া গেলাম। কাজও সুরু হইয়া গেল। তবে এই কমিটির কাজের ভার বিশেষভাবে অধ্যক্ষ শ্রী কে. টি. শাহের হাতে ন্যস্ত হইল।

বিহার সরকারের শিক্ষাবিভাগ কিন্তু আরেকটি কমিটি নিয়োগ

করিলেন। আমাকে তাহারও সভ্য করা হইল। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনে হিন্দী-হিন্দুস্থানী সম্বন্ধে আমার মতামত আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। বিহারে তখন প্রশ্ন উঠিল, হিন্দী আর উর্দু দুই ভাষাভাষীদেরই মন ওঠে এমন ভাষা পাঠ্যপুস্তকে কতদূর পর্যন্ত রাখা সম্ভব দেখিতে হইবে এবং নূতন করিয়া ইহার উপযোগী শব্দকোষ সংকলনে যত্নপর হইতে হইবে। ডাঃ মাহ্‌মুদ আমাকে এই কমিটির প্রধান নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। আমি কিন্তু রাজী হই নাই, কারণ আমার হাতে অন্য কাজ এত আসিয়া পড়িয়াছিল যে আমি ইহার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারিতাম না। তাহা ছাড়া মনে হইল আমার এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজের যোগ্যতাও নাই। তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ইহার সভাপতি করা হইল। কাজ আরম্ভ হইল। এইভাবে নিজের প্রদেশের নানারকম কাজের ভার আমার উপর আসিয়া পড়িতেছিল। ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা নিযুক্ত পার্লামেণ্টারি কমিটির মেম্বার তো আগে হইতেই ছিলাম। ১৯৩৭-৩৯ সন পর্যন্ত অনেকটা সময় তো ইহারই কাজে লাগিয়া থাকিতে হইত। অনেক সময় লাগিয়াছিল কেননা মীমাংসার বিষয়গুলি ছিল গুরুতর আর সহজে তাহাদের সমাধান সম্ভবও ছিল না। যে-সব মীমাংসা হইত তাহাদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইত। কাজেই মন্ত্রী-মণ্ডলের মধ্যে না থাকিলেও আপনার বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

অপর একটি বিষয়ে বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল অথচ মিটাইবার কোন রাস্তা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। তাহা হইলে বিহারের কোনও কোনও স্থানের জলপ্লাবন। ছাপরা ও পাটনার মাঝামাঝি সরযূ, গঙ্গা, শোণ আর গণ্ডক নামে চারটি বড় নদীর সঙ্গম। এই নদীগুলির উৎপত্তিস্থলে অথবা ইহাদের স্রোতপথে যদি বর্ষা কখনও অতি প্রবল হয় তবে জলপ্লাবনের জন্য ইহাদের চারিপাশের জনপদগুলির অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। গোড়া হইতেই এইরূপ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সনের ভূমিকম্পের পর হইতে এই বন্যার প্রকোপ বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ভূমিকম্পের ফলে নদীগুলির গভীরতা কমিয়া গিয়াছে, আর সেজন্য আগেকার মত জল-নিষ্কাশনের শক্তি ইহাদের নাই। এইজন্য এখন জল উপচাইয়া পড়িয়া বাহিরে বহু দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে আর এই জল যেখানে-যেখানে যায় সেখানেই প্লাবন ও বন্যা হয়। নদীগুলির মজিয়া যাওয়ার জন্য যে-সব জায়গায় বারবার বন্যা হয় সেই সব ছাড়াও বিহারের, বিশেষত উত্তর বিহারের, অন্য নানা স্থানেও প্রায়ই জলপ্লাবন হইতে দেখা যায়।

জনসাধারণের মতে, বন্যার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ রেলওয়ের বাঁধ। ইহা জলস্রোতকে বাধা দেয় আর অবাধে বহিয়া যাইতে

দেয় না। এই বাঁধগুলিতে পুল আর জলনিষ্কাশনের পথ অনেক কম। রেলকর্তৃপক্ষ লোকের কথায় কানই দেয় না। রেলের বাঁধ ছাড়া অন্য আরও বাঁধ আছে—শুধু জলের গতি রোধ করার জন্যই সেই সব বাঁধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার ফল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বিহারের বন্যা এক বিশেষ গুরুতর সমস্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই বিষয়ে কিছু লেখালেখিও করিয়াছিলাম, আর এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ায় তাঁহাদেরও এই বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তাঁহারা জনকতক সহৃদয় ইঞ্জিনীয়ার আর জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনকে লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। অনেক বিচার-বিবেচনা হইল। কিন্তু কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হইল না, কারণ না বন্যার কারণ সম্বন্ধে, না তাহার প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে, তাঁহাদের মতের মিল খুঁজিয়া পাওয়া গেল। আমি অসুস্থ হইয়া পড়ায় এই কনফারেন্সে যোগ দিতে পারি নাই। তবে আমার মতামত আমি জানাইয়া দিয়াছিলাম। বিহারের তো এই সব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আর আমি বিশেষভাবে এইগুলির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আর, এই সব বড় বড় বিষয় ছাড়া অন্য ছোটখাট সমস্যাও ছিল—যাহাদের জন্য লোকে আমার কাছে পরামর্শ চাহিত। স্বভাবতই অন্য প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে আমার তত যোগ ছিল না, যতটা বিহারের মন্ত্রীদের সঙ্গে ছিল।

গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘ

মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই থাকিতে হইল। শরীর একটু সুস্থ হইলে আর গায়ে একটু জোর পাইলে বাহিরে আসিলাম। সেই বৎসর উড়িষ্যা প্রদেশের পুরীর কাছাকাছি ডেলং গ্রামে গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন হইল। আমি সোজা সেখানে চলিয়া গেলাম। মহাত্মাজীরও সেখানে যাইবার কথা। আমার বোন, মৃত্যুঞ্জয়ের মা, আর আমার ভাজও আমার সঙ্গে চলিলেন। দিন কয়েক সেখানে রহিলাম। অন্যান্য সম্মেলনের মতই এখানেও তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা চলিত। সকলে সমবেতভাবে চরখা চালাইতাম। সন্ধ্যা বেলা অনেক লোক জড়ো হইত, কেহ কেহ ভাষণ দিতেন। গান্ধী-সেবা-সম্মেলন আরও চার-পাঁচ বার হইয়াছে, কিন্তু এই সম্মেলনের বিশেষত্ব এই যে, গান্ধীজীর সঙ্গে দিনকতক থাকিবার শুভ সুযোগ সদস্যরা পাইলেন। সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপসে বহু বাদবিতণ্ডা

হইল। উপস্থিত সব ব্যাপারে গান্ধীজীর সম্মতি পাওয়া গেল। সদস্যেরা যিনি যে-কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তিনি সেই কাজেই উৎসাহভরে লাগিয়া থাকিবেন।

সংঘের সদস্যগণ গঠনাত্মক কাজে অধিকতর মন দিবেন ঠিক হইয়াছিল। কেহ কেহ চরখাসংঘ মারফত বা অন্যভাবে খাদির প্রচারকার্যে মন দিলেন। কেহ বা হরিজন সেবায় তাঁহাদের সকল সময় ও শক্তি ঢালিয়া দিলেন। কেহ কেহ গ্রাম-উদ্যোগকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ও গঠন করিতে তৎপর হইলেন, কেহ বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সফলতার জন্য স্থাপিত নয়ী তালিমীর সংগে যোগ দিয়া শিক্ষা বিস্তারের কাজে লাগিয়া রহিলেন। কেহ কেহ আবার গোসেবায় ব্যাপৃত হইলেন, মৃত পশুর চামড়া শোধন ইত্যাদি করিয়া জুতা তৈয়ারির কাজও ইঁহারা হাতে লইলেন। বিশেষভাবে সেই সব কাজে এই সংঘের সদস্যগণ চিত্ত সমর্পণ করিলেন যে-সকলের জন্য গান্ধীজী উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছিলেন। জনকয়েক সদস্য অবশ্য ছিলেন যাঁহারা কংগ্রেসের গঠন-কার্যের জন্য কংগ্রেস-আপিসগুলির দিকে মন দিলেন। অবশ্য ইঁহাদের সংখ্যা খুব কম। কাউন্সিলের ইলেকশনের সময় আসিলে যখন দেখা গেল সদস্যদের মধ্যেও কেহ কেহ নির্বাচনপ্রার্থী, তখন এই সংঘে নানা রকম আলোচনা হইল। কাহারও কাহারও মতে সংঘের সদস্যদের নির্বাচনে দাঁড়ান উচিত নয়। কিন্তু সংঘ কতিপয় সদস্যকে নির্বাচনে দাঁড়াইবার অনুমতি দিল। আমার যতদূর মনে আছে, দুইটি অধিবেশনে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সদস্যদের মধ্যে শ্রীজগলাল চৌধুরী মন্ত্রী হইলেন আর শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি নির্বাচিত হইলেন। ইঁহাদের সংগে সংঘের ব্যবস্থা তো ছিল এই যে সংঘ ইঁহাদের খরচের জন্য যাহা দিবে তাহাতেই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন। কাজেই যখন ইঁহারা বেতনস্বরূপ কিছু টাকা পাইতে লাগিলেন তখন সংঘ ইঁহাদের খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। বেতন পাইলে তাহার পুরা হিসাব সংঘকে দিতে হইত। নৈতিক দৃষ্টিতে দেখিলে সত্যই এই মতে চলিলে ঐ সংঘের সদস্য হইলে মানুষের উন্নত হইবার কথা। এই সংঘের আশা ছিল সদস্যগণ গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার নীতি আপন আপন জীবনে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট থাকিবেন। এই সংঘের অনেক সদস্যের জীবন আমাদের সকলের পক্ষে আদর্শস্বরূপ।

কিন্তু রাজনীতিক দল গঠন করা কখনও এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল না। কখনও তাহা করাও হয় নাই। সংঘের পক্ষ হইতে কেহ কখনও কংগ্রেসের, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মিউনিসিপ্যালিটির বা এসেম্‌ব্লির কোন নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে নাই। অধিকাংশই এই সব সংস্থা হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন। কোন নির্বাচনে তাঁহারা যান নাই। যে-কেহ গিয়াছেন

ব্যক্তিগতভাবে, নিজেদের কাজের জন্যই তাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন, সঙ্ঘের সদস্য বলিয়া নয়। এই সঙ্ঘে যমুনালাল বাজাজ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও আমার মতো সদস্যও ছিলেন, যাঁহারা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন এবং নিজের নিজের এলাকায় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। গান্ধীজী নিজে অবশ্য সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন না, তবে তিনিই তো পথ-প্রদর্শক ছিলেন। তবু একথা বলিবার কোন ভিত্তি ছিল না যে কংগ্রেসের মধ্যে যেমন স্বরাজ্য পার্টি বা কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট পার্টি সেইরকমই ইহাও আর একটি সংস্থা। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সেবক তৈয়ার করা, যাঁহাদের সাহায্যে গঠনাত্মক কাজ অগ্রসর করা যাইবে। আপন আপন জীবন ও দৃষ্টান্ত দ্বারা গান্ধীজীর সিদ্ধান্তকে যথাশক্তি প্রচার করিবেন ইহাই ছিল তাঁহাদের কাছে প্রত্যাশা। তবু একদল লোক বলিতে লাগিল যে অন্যান্য দলের মত ইহাও একটি দল। রামগড় কংগ্রেসের আগে বাংলাদেশে যে বার্ষিক অধিবেশন হইল তাহাতে এই সঙ্ঘকে ভাঙিগয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল।

গ্রাম সংস্কারের পরিকল্পনা ও নাসিকে অবস্থান

উড়িষ্যাতেই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে স্থানীয় কংগ্রেস এসেম্‌ব্লি পার্টির মধ্যে অনেক মতভেদ চলিতেছে, মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ আছে। সর্দার বল্লভভাই ও আমি, পার্লামেণ্টারি কমিটির আমরা দুইজন সভ্যই, সেখানে হাজির ছিলাম। দুই পক্ষের সঙ্গে কথা কহিয়া সম্ভব হইলে বিবাদ মিটাইয়া ফেলা উচিত মনে করিলাম। এক পক্ষে মন্ত্রীমণ্ডল, অন্য পক্ষে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র প্রভৃতি। শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরী কোনও দলেরই ছিলেন না। সেখানে আমরা সকল কথা শুনিয়া নিজেদের রায় দিয়াছিলাম। শ্রীগোপবন্ধু দাস গান্ধী-সেবা-সঙ্গের দিক হইতে ঐ কটকেই আশ্রম করিয়া গঠনকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তিনি কংগ্রেস কমিটি হইতে পৃথক হইয়া ছিলেন; উভয়পক্ষের মত লইয়া তাঁহাকেই কংগ্রেসের কাজের ভার লইতে বলা হইল। ভাবিয়াছিলাম যে বিবাদ মিটিবে; কিন্তু তাহা হইল না। পরে ইহার অনেক কুফল দেখা গেল, তাহার উল্লেখ যথাসময়ে করা যাইবে।

সেখানে এক ঘটনা হয়, যাহা বর্ণনা করা উচিত। যাহারা সম্মেলনে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীজগন্নাথ দর্শনে পুরী চলিয়া যায়।

তাহাদের মধ্যে আমাদের বাড়ির মেয়েরাও ছিলেন। তাঁহাদের বিষয়ে নয়, কিন্তু অন্যদের যাওয়ায় মহাত্মাজীর খুব দুঃখ হইয়াছিল। জগন্নাথের মন্দির তখনও হরিজনদের জন্য খোলা হয় নাই, অর্থাৎ সবর্ণ হিন্দুরা যে-ভাবে পূজা ও দর্শনাদি করিতে পারিত হরিজনে তেমনটি পারিত না। হরিজনেরা যেখানে যাইতে পারিত না, মহাত্মাজী নিজে সেই সব মন্দিরে যাইতেন না। তাঁহার মতে হরিজনদের যদি দর্শন ও পূজার অধিকার না থাকে তবে আমাদের জন্যও সে-অধিকার চাই না। এইজন্য যখন তিনি সম্মেলনে আগত অন্তরঙ্গ লোকদের সম্বন্ধে শুনিলেন যে তাহারা দর্শন করিতে গিয়াছিল তখন তিনি আঘাত পাইলেন। পুরীতে যাওয়া তিনি খারাপ মনে করিতেন না, দর্শন-পূজাও নয়। কিন্তু দর্শন-পূজা আমরা যেন ততখানি করি হরিজনদেরও যতখানি অধিকার আছে। এই সব কথার আলোচনা সেখানে হইল। যাঁহারা নিজেদের গান্ধীজীর অনুচর মনে করিত তাহাদেরও এতখানি কড়াকড়িতে একটু খটকা লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে হরিজনদের প্রতি গান্ধীজীর প্রেম ও সহানুভূতির গভীরতার পরিচয় পাওয়া গেল।

হাসপাতাল হইতে বাহির হওয়ার পর ডাক্তারদের মত ছিল যে আমার আরও কিছুকাল বিশ্রামের দরকার। তাই গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইলে আমি স্থির করিলাম যে কিছুদিন কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকিয়া আসিব। আমি তাই নাসিকে গিয়া থাকা ঠিক করিলাম। সেখানে শেঠ বিড়লার এক বাড়ি ছিল, তাহা তিনি শুধু 'হাওয়া বদলাইবার বাড়ি'রূপে ব্যবহার করিতেন। সেখানে গিয়া থাকাই ঠিক করিলাম। শেঠ রামেশ্বরদাস বিড়লা বোম্বাই হইতেই সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অন্য কারণেও নাসিক যাওয়ার কথা হইয়াছিল। মে মাসে বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবার কথা ছিল। ভাবিয়াছিলাম যে নাসিক বোম্বাইয়ের নিকটে, সেখান হইতে সহজে সভায় উপস্থিত হইতে পারিব।

নাসিক যাওয়ার পূর্বে আর একটা কাজ ছিল, যাহার বিষয়ে আমার কিছু করিবার কথা ছিল। বিহার মন্ত্রীমণ্ডল গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকারি তরফ হইতে কিছু করিতে চাহিতেছিলেন। এজন্য তাঁহারা এক বিভাগ খুলিতে চাহিয়াছিলেন। এক পরিকল্পনাও নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যাহার অনুসারে কাজ হইবে। এজন্য এমন কর্মীরও প্রয়োজন ছিল যিনি মন্ত্রীসভার অভিপ্রায়-মত দৃষ্টি লইয়া এ-কাজ নির্বাহ করিবেন। এ-পর্যন্ত গ্রাম সংস্কারের কাজ গভর্নমেণ্টের দিক হইতে কিছুই হয় নাই। ইহাই ছিল প্রথম প্রোগ্রাম। ইহাতে বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীদের অবস্থা সর্বপ্রকারে উন্নত করিবারই কথা ছিল। এ পর্যন্ত যাঁহারা সরকারি কাজ

করিতেন তাঁহারা জনসাধারণের প্রভু ও শাসক হইয়াই করিতেন। প্রয়োজন ছিল কয়েকজনের সেবক হইয়া কাজ করার। এ বিভাগের কার্য এরূপই হইবে, স্থির করা গেল। আমি এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলাম। পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্রকে গভর্নমেণ্ট এই কাজের ভার দিলেন। অন্য কর্মীরাও নিযুক্ত হইলেন। কংগ্রেসের লোকদের চাকুরি দিতে হইবে বলিয়া এইরূপ হয় নাই। কাজই এমন ছিল যে ইহাতে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা যদি কাহারও থাকে তবে কংগ্রেস কর্মীদেরই ছিল, অন্যের নয়; কারণ বিহার প্রদেশে কেহ এইরূপ কাজ করেই নাই। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকও নিযুক্ত করা হইল। বোঝা গেল যে সকলকে কয়েক দিনের জন্য শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইবে। আমি যে-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে-ছিলাম তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই, তাই পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র নাসিকে গিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন। সেখানেই আমি তাহা সম্পূর্ণ করিলাম। যে পর্যন্ত ঐ বিভাগ সক্রিয় ছিল সে পর্যন্ত পরি-কল্পনা অনুসারে কাজ হইত। ইহাতে জনকল্যাণ হইত বলিয়া আমার মত; কিন্তু মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিবার পর উহার রূপ ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল, শেষটায় গভর্নমেণ্ট উহা ভাঙিয়া দিলেন।

নাসিক যাত্রায় আমার সঙ্গে শ্রীচক্রধর সারণ যাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্থানে শ্রীঅম্বিকাকান্ত সিংহ গেলেন। আর একজন সঙ্গী পাইয়াছিলাম, তাঁহার কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। তাঁহার নাম শ্রীদেবরাত ব্রহ্মচারী। তিনি কর্ণাটক প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী গোকর্ণ নামক তীর্থ-স্থানের ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি যখন মজঃফরপুরের সুহৃদ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সেখানে এক প্রশস্তির মত কিছু রচনা করিয়া তাহা পড়িয়া শোনাইয়া-ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বা পরিচয় হইতে পারে নাই। একদিন আমি সদাকত আশ্রমে বসিয়াছিলাম, সঙ্গে আমার ভগ্নীও ছিলেন। সেদিন কোনও পুণ্য-তিথি ছিল, সেজন্য বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল। দেখিলাম যে ঐ ভদ্রলোকটিও তাহাদের মধ্যে ছিলেন।

আমার ভগ্নীর দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি তাঁহার আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিলেন। আলাপ-আলোচনায় তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও কিছু সন্ধান পাইলাম। আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকিবার নিমন্ত্রণ তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তিনি এমনিই ভ্রমণ করিতে করিতে বিহারে আসিয়াছিলেন। আমি জীরাদেইতে গেলে তিনিও সেখানে আসিলেন। কয়েকদিন আমরা একত্রে কাটাইলাম। তাঁহাকে আমি নাসিকেও ডাকাইয়া লইলাম। তিনি ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। বেদ ছিল তাঁহার প্রায়

কণ্ঠস্থ। উপনিষদ তো তিনি পুস্তক না দেখিয়াই শোনাইতেন। তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম যে কর্ণাটকে আজও ইহাই রীতি। সেখানে ব্রাহ্মণেরা বেদ ও উপনিষদ কণ্ঠস্থ করিয়া লয়। তাহারা নিজেদের কাজকর্ম করিবার সময়, চাষ করিতে করিতেও, বেদ ও উপনিষদ পাঠ করেন। সেই সময়ে তিনি একটি চিত্র রচনা করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি বেদের অনুসারে সৃষ্টিক্রমকে চন্দ্রের রূপে দেখাইতে চাহিতেছিলেন। তাহাতে তিনি উপযুক্ত ঋক্ ও মন্ত্র এমনভাবে লিখাইয়াছিলেন যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পুরুষ-সুক্তও পড়িতে পারে, ঐ চিত্র হইতে অনেক কিছু বুঝিতেও পারে। তাঁহার বক্তব্য ছিল এই যে তিনি এই কর্মে অনেক বৎসর ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সে-কাজ শেষ হয় নাই। তিনি দেশ পর্যটনের সঙ্গে সঙ্গেই এই কাজ করিতেছেন। তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তি ও পাণ্ডিত্যের ইহা এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ; কারণ তাঁহার নিকটে একটিও পুস্তক ছিল না, সকল কিছুই তিনি তাঁহার স্মৃতি হইতে প্রস্তুত করিতেছেন। নাসিকে আমরা খুব বেড়াইতাম, আর তিনি সন্ধ্যাকালে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি ছিলেন যোগী। তাঁহার মত ছিল যে আমি নিয়মিতভাবে কোনও ক্রিয়া করিলে হাঁপানি সারিয়া যাইবে। আমি তাঁহার পর্যবেক্ষণে ধৌতি-ক্রিয়া আরম্ভ করিলাম। কিন্তু নাসিকে সর্বশুদ্ধ পনের-ষোল দিনই থাকিতে পারিলাম। তাহার পর বোম্বাই যাইতে হইল। সেখানে খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িলাম।

দেবরাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ খুবই ভাল হইয়াছিল। সেখানেই জানিতে পারিলাম যে তিনি প্রথমে কয়েকদিন শ্রীরমণ মহর্ষির সঙ্গে তিরুবন্নমলয়েই থাকিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমহর্ষির জীবনীতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তাঁহার প্রেমময় নাট্যের উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন মহর্ষির সঙ্গে যে-প্রসিদ্ধ বিদ্বান গণপতি শাস্ত্রী থাকিতেন, তাঁহারই শিষ্য। এই সম্পর্কের জোরে তিনি সেখানে আশ্রমে গিয়া কয়েক বৎসর পূর্বে ছিলেন। গোকর্ণে তিনি এক পাঠশালা ও গোশালা চালাইতেছিলেন। উত্তর-ভারতে তো আসিয়া-ছিলেন ভ্রমণের জন্য। হিন্দীও তিনি খুব ভালভাবেই শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা শুনিয়া কেহই তাঁহার সম্বন্ধে বলিবে না তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। তাঁহার সঙ্গে নাসিক হইতে ত্র্যম্বকেও দর্শনার্থে গেলাম। লোকে বলে, ইহা গোদাবরীর উদ্গম স্থান। পাহাড়ের উপর আমাকে চেয়ারে বসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। কারণ আমি এত উঁচুতে চড়িতে পারিতাম না। নিকটের পাহাড়গুলিতে পুরাতন গুহা আছে, আমি গিয়া সেগুলি দেখিয়া আসিলাম। ইহাদের মধ্য হইতেই সেই সব পুরানো দিনের কথার সঙ্গে সঙ্গে ঐ যুগের তপস্বী-জীবনেরও খানিকটা স্বাদ পাওয়া যাইতেছিল। এইভাবে আমি নানা জায়গায় ভ্রমণ করিয়া গুহা দেখিয়াছি; কিন্তু আমার

কাজ অন্য ধরনের এবং মন সর্বদা তাহারই উপর লাগিয়া থাকিত। তাই এই সব দৃশ্যের কথা মনেও বেশি আনিতাম না।

নাসিকে আরও কয়েকটা জিনিস দেখিতে পাইলাম। সেখানেই সেই সরকারি ছাপাখানা আছে যেখানে নোট এবং সকল প্রকারের আদালত ও পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প ছাপানো হয়। কারখানাটি খুব বড়; পাহারা কঠিন। কাগজের দাম খুব বেশি; কারণ কাগজের টুকরা টুকরা হইতেই এই সব প্রস্তুত হয়। সেখানে এক ইংরেজ অফিসার ছিলেন যিনি ইউরোপের ১৯১৪-১৮ ব্যাপী মহাযুদ্ধে সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন; সেখানে আহত হইয়া খোঁড়া হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সব জায়গায় লইয়া গিয়া এক এক করিয়া সব কিছু দেখাইয়াছিলেন। আমরা পোস্ট-কার্ড ও লেফাফা ছাপিতে ও প্রস্তুত হইতে দেখিলাম। পোস্ট অফিসের টিকিট প্রস্তুত হইতেও দেখিলাম। নোট ছাপিতে দেখিলাম। যেখানে সর্বপ্রথমে নোটের নক্সা বা মানচিত্র তৈয়ার করা হয় সে-সমস্ত প্রক্রিয়া দেখিলাম। এ-জন্য শিল্পী নিযুক্ত আছে, সে সর্বদা এই কাজে লাগিয়া আছে। ঐ মানচিত্র বা নক্সা অনুমোদিত হইলে পর উহারই আধারে নোট ছাপাইবার মালমসলা প্রস্তুত করা হয়। অন্য একটি বস্তু দেখিলাম, যাহা সামান্য, কিন্তু যাহার মহত্ত্ব এই সকল জিনিসের মতোই। দিয়াশলাইয়ের উপর কর ধার্য করা হয়। তাহা আদায় করিবার পদ্ধতি এই যে প্রত্যেক দিয়াশলাইয়ের বাক্স বা প্যাকেটের উপর এক মিহি কাগজের পাতের মতো সাঁটিয়া দেওয়া হয়। যতক্ষণ তাহা না ভাঙে ততক্ষণ ভিতর হইতে দিয়াশলাই বাহির করা যায় না, কারখানা হইতে ঐরূপ কাগজ না সাঁটা পর্যন্ত কোনও বাক্স বাহির করা যায় না। কারখানার মালিকেরা কর আদায় করিতে গিয়াই ঐ পাত সরকার হইতে কিনিতে পারে। ঐ পাতও (লম্বা ফিতার মতো) এই কারখানাতেই ছাপা হয়। উপরে বলিয়াছি যে এখানে কাগজের দাম খুব বেশি। কাগজের হিসাব খুব কড়াকড়িভাবে রাখা হয়। এক ইঞ্চি কাগজও এদিক-ওদিক হইতে পারে না। তাহা না হইলে কে বলিতে পারে যে হারানো কাগজে নোট ছাপিয়া বাহির করা হয় নাই? এইজন্য যদি কোথাও ছাপার ভুল হইতে বা অন্য কোনও কারণে, কোনও টুকরা খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাও ছাপা নোটের মত ততখানি সতর্কতার সহিত রাখা হয়। সকল কর্মীদের কারখানায় যাওয়া ও আসার সময় সকলের কাপড় জামা ভাল করিয়া খোঁজা হয়। এরূপ তালাস না করিয়া কাহাকেও ভিতরে যাইতে দেওয়া হয় না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আচরণে এই নিয়মের কড়াকড়ি করিলেন না, তবে আমাদের সঙ্গেও তাঁহাদের কয়েকজন অফিসার সর্বত্র ছিলেন। এখানেও এক বিচিত্র কথা এই যে এখানে কর্মীরা না জানি কত লক্ষ-লক্ষ টাকার নোট ছাপিতেছে ও

প্রতিনিদিন ছাপিয়া নানা দিকে পাঠাইতেছে, কিন্তু সে-বেচারীদের মজুরি প্রায় অন্য সব কারখানার মতই! তাহাদের মধ্যে অনেকে খুব দরিদ্রভাবে জীবন কাটাইয়া দেয়। যাহারা প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ টাকার কাগজের নোট প্রস্তুত করে তাহারা হয়তো এক টাকার দিন মজুরি পায়! সংসারের কি বিচিত্র লীলা! আজকার সংসার কেমন!

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের শোচনীয় কলহ

নাসিক হইতে বোম্বাই গেলাম। সেখানে ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবার কথা ছিল। হরিপুরা কংগ্রেসের পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই প্রথম অধিবেশন, যেখানে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করিবেন। আট-দশ মাস হইতে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা কাজ করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের কাজকর্মের উপর কড়া মন্তব্য করিয়া যাইতেছেন। কোথাও কোথাও কংগ্রেসের লোকেরাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে দলাদলি করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের কার্যে কিছু বাধাও পড়িতেছে। ঐখানেই আলোচনা হইবার কথা স্থির ছিল, যদিও হরিপুরার সময় উভয় প্রদেশের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করায় বায়ুমণ্ডলে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও যাহারা অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা নিজেদের অসুবিধার জন্য আসিতে পারে নাই। আমি তো ওখানে গিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। এক গুরুতর কাজ হইল। ওখানেই স্থির হইল যে সমগ্র দেশের জন্য এক প্ল্যানিং কমিটি নিযুক্ত করা হইবে, তাহা সকল প্রদেশ হইতে অনুমোদন ও সাহায্য লইয়া এক কার্যক্রম প্রস্তুত করিবে, সেই অনুসারে সমস্ত প্রদেশের মন্ত্রীসভা কাজ করিবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইহার সভাপতি ও প্রফেসর কে. টি. শাহ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। সকল প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা এই কমিটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এই কমিটি কয়েকটি উপ-সমিতিতে ভাগ করিয়া কাজ আরম্ভ করিল। ইহার রিপোর্ট প্রায় প্রস্তুত হইয়া ছিল। কিন্তু পুরাপুরি প্রস্তুত হইবার পূর্বেই কংগ্রেসের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের ঝগড়া লাগিল। রিপোর্ট গৃহীত হইয়া দেশের সম্মুখে আসিতে পারিল না।

বোম্বাইয়ে আমার ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হইয়া গেল। জ্বর খুব বাড়িয়া গেল। কাশিও খুব বেশি রকম হইল। আমি সেখানে বিড়লা হাউসে ছিলাম। তাঁহারা সর্বপ্রকারে আমার সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে হিটলারের দ্বারা বহিষ্কৃত বহু ইহুদী দেশ ছাড়িয়া নানা স্থানে চলিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কয়েক-জন ডাক্তারও ছিলেন, তাঁহারা বোম্বাইয়ে আসিয়া নিজের নিজের চিকিৎসা ব্যবসা চালাইতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিড়লা হাউসে যাওয়া-আসা করিতেন। তিনি আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। দুই-তিন দিন ধরিয়া তাঁহার ঔষধ চলিল। তথাপি কিছু উপশম হইতেছিল না। শুনিয়াছিলাম যে বোম্বাইয়ের কয়েকজন ডাক্তার বন্ধু, তাঁহাদের মধ্যে অধুনা স্বর্গীয় পুরুষোত্তম পটেলও ছিলেন, ইহা শুনিয়া কিছুটা রুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের না ডাকিয়া এক জার্মান ডাক্তারের চিকিৎসা হইতেছে। এ-সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের ডাকা হইল। পরে ডাক্তার গিল্-ডারও আসিলেন, তিনি তখন বোম্বাইয়ে একজন মন্ত্রী। তাঁহাদের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তাহাতেও ভাল হইল না দেখিয়া গান্ধীজী বলিলেন আমি যেন ওয়ার্ধা চলিয়া আসি, আমিও সম্মত হইলাম। বোম্বাইয়ের হাওয়ায় লবণ আছে, তাহা আমার সহ্য হইতেছিল না। তাই ওয়ার্ধায় চলিয়া আসিলাম। ডাক্তারেরা এই কথায় রাগ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা থাকিতে এক অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী ডাক্তারের চিকিৎসা কেন করানো হইল। ইহা তো তাঁহাদের ভালবাসারই পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রকাশ পাইল যে এখানকার ডাক্তারেরা নিজেদের কৌশলের উপর এতটা বিশ্বাস করিতেন ও এতটা দেশাভিমানী ছিলেন যে আমার মতো একজন দেশসেবকের চিকিৎসা অন্যের হাতে হইতে ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। ওয়ার্ধাতেও পৌঁছিয়াই আমি সত্বর সুস্থ হইলাম না। তার করিয়া পাটনা হইতে ডাক্তার ব্যানার্জি ও ডাক্তার শরণকে ডাকিতে হইল। ডাক্তার শরণ তো আসিতে পারিলেন না, কিন্তু ডাক্তার দামোদর প্রসাদের সঙ্গে ডাক্তার ব্যানার্জি ওয়ার্ধা গেলেন। তাঁহারা দুই-তিন দিন সেখানে থাকিলেন। শরীর সুস্থ হইলেও আমি সেখানে থাকিয়া গেলাম।

বোম্বাইয়ে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় নিজেদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা দিয়াছে। এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে। সে সময় পার্লামেণ্টারি কমিটি স্থির করিলেন যে তাঁহারা এই বিষয়ে তদন্ত করিবেন। তখনকার দিনে গভর্ন-মেণ্টের আসন ছিল পাঁচমারিতে। তাই সর্দার বল্লভভাই ও মৌলানা আজাদ সাহেব সেখানে গেলেন। আমি অসুস্থ ছিলাম বলিয়া যাইতে পারিলাম না। ঝগড়াটা ছিল প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার খরে ও পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের

মধ্যে। হিন্দী-ভাষাভাষী মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করিবার পূর্বে দুইটি দল ছিল—একটায় পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, অন্যটায় পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল। ১৯৩৭ সালে যখন পরিষদের নির্বাচন হইতেছিল তখন পঃ দ্বারকা-প্রসাদের বিরুদ্ধে একটা মকদ্দমা চলিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল। তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে খবর দিয়াছিলেন যে যেহেতু তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে সেই হেতু যতদিন না তিনি উহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিজের চরিত্রের সম্বন্ধে নিষ্কলুষতা প্রমাণ করিতে পারেন ততদিন তিনি কংগ্রেসের সমস্ত পদ হইতে সরিয়া থাকিবার জন্য প্রস্তুত। যতক্ষণ হিন্দুস্থানী ভাগের সভ্যদের সম্পূর্ণ সাহায্য না পাওয়া যাইতেছে ততক্ষণ সেখানে কেহই কংগ্রেস কমিটির নেতা হইতে পারে না। পণ্ডিত দ্বারকা-প্রসাদ ডাক্তার খরেকে সাহায্য করিলেন। তাঁহার সাহায্যেই তিনি নেতা নির্বাচিত হইলেন। যখন মন্ত্রীসভা গঠন করিবার সময় আসিল তখন তাঁহাকেই গভর্নর মন্ত্রীসভা গঠনের নির্দেশ দিলেন। যে মকদ্দমা পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদের বিরুদ্ধে চলিবার কথা ছিল, উহা ভিত্তিহীন মনে করিয়া সেখানকার হাকিম উহা উঠাইয়া লইলেন। তাহার পর পণ্ডিত দ্বারকা-প্রসাদও মন্ত্রীসভায় আসিলেন। এইভাবে বোঝা যাইতেছিল যে ডাক্তার খরে ও তাঁহার মধ্যে বড়ই বন্ধুত্ব ছিল। বাস্তবিকও তাহাই। পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লও মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের কার্যে তাঁহাকে পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হইত। মন্ত্রীসভায় শুক্লজী ও মিশ্রজীর মত অনেক বিষয়েই একরূপ হইত। ডাক্তার খরের সঙ্গে উভয়েরই মতানৈক্য হইল। এই পর্যন্ত হইলে কোনও ক্ষতি ছিল না; কারণ বন্ধুত্ব এক বস্তু আর দেশভেদ লইয়া মতভেদ অন্য বস্তু। ডাক্তার খরে মিশ্রজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন, মিশ্রজীও ডাক্তার সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলেন।

এই সকল অভিযোগ দূর করিবার জন্য সর্দার পাঁচমারি গেলেন। সেখানে কোন কোন কথার মীমাংসা হইল। আশা করা গেল এইবার ব্যাপারটির মীমাংসা হইয়া যাইবে, দুইজনে কাজ চালাইতে থাকিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। ডাক্তার খরে তাঁহার চিন্তার ধারা বদলাইতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন যে মিশ্রজীর সঙ্গে তাঁহার বনিবে না। ওদিকে মিশ্রজীর সঙ্গে কাজ করিতে করিতে শুক্লজী তাঁহার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করিলেন। মনে হইল, ডাক্তার খরে উভয়কে কোন-না-কোন উপায়ে মন্ত্রীসভা হইতে সরাইবেন। কিন্তু এই কলহ মিটাইবার জন্য যে-চেষ্টা করা হইল তাহা ব্যর্থ হইল। পরস্পরে মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিল। আমি সুস্থ হইয়া ওয়ার্ধাতেই বিশ্রাম করিতেছিলাম। এমন সময় একদিন হঠাৎ খবর আসিল, কলহ উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে।

দুইদিন পরেই পার্লামেণ্টারি কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইবার কথা। ডাক্তার খরে তাহার পূর্বেই মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছামত নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে চাহিতেছিলেন। তিনি এজন্য গভর্নরের সাহায্য লইলেন। আমি খবর পাইবামাত্র তাঁহাকে লিখিলাম, তিনি এমনধারা কাজ যেন না করেন, দুইদিনেই পার্লামেণ্টারি কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইবে, তাহার জন্য যেন অপেক্ষা করেন। রাত্রে সেই পত্র তাঁহার নিকটে পৌঁছিল। সেই রাত্রেই তিনি মন্ত্রীসভাকে দিয়া পদত্যাগ পত্র দেওয়াইলেন এবং গভর্নরকে দিয়া তাহা গ্রহণ করাইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াও লইলেন। আমার পত্র কোনও উপায়ে রাত্রে তাঁহার হস্তগত হইতে পারে নাই। পরের দিন সকালবেলায় নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। তাহাতে পূর্বের এই দুইজন মন্ত্রী ছিলেন না। কয়েকজন নূতন লোককে লওয়া হইয়াছিল। সমস্ত ব্যাপারটি এত তাড়াতাড়ি রাতারাতি হইয়া গেল যে নাগপুরের নিকটে থাকিয়াও আমরা সম্পূর্ণ সংবাদ পাইলাম মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হইবার পরে। পরের দিন পার্লামেণ্টারি কমিটি বসিলে সকলে ইহার খুব নিন্দা করিলেন। উভয়পক্ষের লোককে ডাকা হইল। যাহারা নূতন মন্ত্রী হইয়াছিল তাহাদেরও ডাকা হইল। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। যদিও তিনি পার্লামেণ্টারি কমিটির সভ্য ছিলেন না তথাপি তিনি কংগ্রেসের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার স্থান ছিল সকলের উপরে। তাঁহার উপস্থিতিতে দুই পক্ষের কথা শোনা গেল। কমিটির সিদ্ধান্ত হইল যে এইভাবে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করা অবৈধ হইয়াছে, বিশেষ করিয়া যখন শীঘ্রই পার্লামেণ্টারি কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবার কথা ছিল। নূতন মন্ত্রীসভার সদস্যদের পদত্যাগ করিতে বলা হইল। এই সব কথা হইতে হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। কিন্তু সেই সময়ে ডাক্তার খরে টেলিফোনে গভর্নরকে জানাইলেন যে তিনি ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতেছেন। পরের দিন তিনি পদত্যাগপত্র লিখিয়াও পাঠাইলেন। অন্যেরাও সেইরূপ করিলেন। এখন নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিবার কথা নিশ্চিতভাবে স্থির হইল। তাহাতে প্রধানমন্ত্রী হইলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল; পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রও একজন মন্ত্রী হইলেন। ডাক্তার খরে তাহাতে যোগ দিলেন না। ওখানকার পরিষদের কংগ্রেসী দলের অধিবেশন ওয়ার্ধাতে হইল, তাহাতে সুভাষবাবু ও আমরাও উপস্থিত ছিলাম। তাঁহারা শুক্লজীকেই নেতা নির্বাচন করিলেন, তাই তিনি হইলেন প্রধানমন্ত্রী।

এই সমস্ত ব্যাপারে ওখানে খুব গণ্ডগোল হইল। ডাক্তার খরের মনে খুব রাগ হইল। তিনি খুব জোরের সঙ্গে পার্লামেণ্টারি কমিটি ও

মহাত্মাজীর নিকট অভিযোগ করিলেন। সমস্ত ব্যাপারটিই তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। শুক্লজী ও মিশ্রজী ছিলেন উত্তর ভারতের হিন্দী ভাষাভাষী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। ওখানে এবং অন্যান্য স্থানেও মহারাষ্ট্রীয় ও অ-মহারাষ্ট্রীয়দের ঝগড়া-বিবাদ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল! কয়েক দিন ধরিয়া মনে হইতে লাগিল যে কংগ্রেসের ভিতর বুঝি খুব ঝগড়া শুরু হইয়া যাইবে। ডাক্তার খরের কার্যকলাপ এরূপ হইল যে কয়েক দিন পরে তাঁহার প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করিতে হইল। তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইল। এই ঝগড়া চলিতে চলিতে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। তাহাতে ডাক্তার খরের পক্ষ সমর্থন করা হইয়াছিল। ওয়ার্কিং কমিটির কার্যকলাপের নিন্দাও তাহাতে ছিল। সমস্ত বৃত্তান্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে আনিবার কথা হইল। সুভাষবাবু কয়েক দিন ওয়ার্ধায় ও তাহার পর নাগপুরে থাকিয়া গেলেন। তিনি সমস্ত কথা লিখিয়া এক খুব বড় বিবৃতি বাহির করিলেন। সেই বিবৃতি এক পুস্তকের রূপে ছাপাইয়া দিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে তাহা বিতরণ করাও হইল। তখন ডাক্তার খরেকে কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দেওয়া স্থির হইল। ১৯৩৪ সাল হইতেই আমি ডাক্তার খরেকে ভাল করিয়া জানিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনে ডাক্তার মুঞ্জের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তখন তিনি অনেক উৎসাহের সহিত কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। যখন শ্রীঅভ্যংকরের দেহান্ত হইল, তখন হইতে তাঁহাকেই মারাঠী-ভাষী মধ্য-প্রদেশের নেতা বলিয়া লোক স্বীকার করিতে লাগিল। আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁহার খুবই সদ্ভাব ছিল। প্রদেশ পরিষদের নির্বাচনের সময় তাঁহারই বিচার মত পার্লামেণ্টারি কমিটি সব স্থির করিতেন। মন্ত্রীসভা সংগঠনেও তাঁহাকে সর্বদা প্রধান বলিয়া লোকে মনে করিত। এইভাবে পার্লামেণ্টারি কমিটির লোকদের তাঁহার উপরে বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহারও ভাল ছিল। আমি যখন সভাপতি হিসাবে তাঁহাদের প্রদেশে যাই তখন তাঁহারই গৃহে অতিথি ছিলাম। তিনিই প্রদেশ ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন। এইভাবে তিনি সকলের মান্য ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে, কেন জানি না, তিনি এরূপ বিচার করিয়া বসিলেন। যে-ঝগড়া তাঁহার ও মিশ্রজীর মধ্যে ছিল, তাহার ফলে পার্লামেণ্টারি কমিটিকেও ধাক্কা দিয়া তিনি ফেলিয়া দিলেন। মহাত্মাজীকেও তিনি রেহাই দেন নাই। সমস্ত ঘটনাটিই ভারি দুঃখের, কারণ তাঁহার মতো উপযুক্ত লোক কংগ্রেসের বিরোধী হইয়া গেলেন। তাহার পর হইতে সুযোগ পাইলেই তিনি কংগ্রেসকে নীচু বলিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি এমন ধারা সব বিবৃতি দিলেন এবং কংগ্রেসের বিষয়ে এমন সব কথা বলিলেন যে কংগ্রেসের

কঠোর শত্রুরাও হয়তো কখনও দেয় না এবং বলে না। আমাদের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তাহার শাসন রক্ষা করিয়া চলা ছাড়া অন্য কোনও কিছু ছিল না। সত্য বলিতে কি, আমি ডাক্তার খরেকে যতটা জানিতাম এবং তাঁহার প্রতি যতটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতাম, মিশ্রজীর প্রতি ততটা করিতাম না; কারণ মিশ্রজীর সঙ্গে কাজ করিবার ততটা সুযোগ হয় নাই। ডাক্তার খরেও মিশ্রজীর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তাঁহার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেন। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে মতে না মেলায় তিনি এতই বিগড়াইয়া গেলেন যে একই মন্ত্রীসভায় দুইজনের থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল! তাঁহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার পর তাঁহার ওজন পাওয়া গেল, এবং সেই বাহির করিতেও হইল গভর্নরের সাহায্য লইয়া! যাহা হউক, এই দুঃখের ঘটনার পরিণাম ভাল হইল না। সে সময় যে ঝগড়া বাধিয়াছিল তাহা আজও শেষ হয় নাই—যদিও এখন উহা আর মারাঠি ও অ-মারাঠিরূপে নাই, আছে অন্যভাবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল কথাই ঠাণ্ডা হওয়া যায়। কিন্তু ডক্টর খরে কংগ্রেস হইতে পৃথকই রহিয়া গেলেন এবং হয়তো রহিয়াই যাইবেন।

আসাম ও উড়িষ্যার মন্ত্রীসভা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে-অধিবেশনে ডাক্তার খরেকে সরাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে মন্ত্রীসভার সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। ইহা হইতে বোঝা গেল যে কংগ্রেসের ভিতরেও কোন কোন লোক মন্ত্রীসভার কাজকর্মে সন্তুষ্ট ছিল না এবং যে-ভাবেই হউক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু-না-কিছু দোষারোপ করিতে চাহিত। কিন্তু যদিও সে-আলোচনায় অনেক কথা উঠিয়াছিল এবং যাহারা নিজেদের বামপন্থী বলিয়া পরিচয় দিত তাহারা খুব প্রবল হইয়াছিল তথাপি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রীসভার নিন্দা করে নাই, কাজ করিতেই দিয়াছিল।

এক দিকে তো যেখানে মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল, সেখানে তাহার উপর আক্রমণ করা হইয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে যেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা ছিল না সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টাও চলিতেছিল। আসাম সেই সকল প্রদেশের অন্যতম যেখানে বিধানের অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান ভিন্ন ইংরেজ ও আদিবাসীর বিশেষ প্রতিনিধিও পরিষদে আছে। কংগ্রেস অ-মুসলমান স্থানে নির্বাচনের সময় প্রচুর সমর্থন পাইয়াছিল,

কংগ্রেসের লোকেরাই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইয়াছিল, সমগ্র পরিষদে তাহারই দল ছিল সবচেয়ে বড়; কিন্তু সমগ্র পরিষদে তাহারই একক ভোটাধিক্য ছিল না। যখন অন্যান্য কংগ্রেসী প্রদেশে অল্পকাল-স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠিত হইতেছিল, তখন ওখানেও হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই পার্থক্য ছিল যে সেখানে শুধু কংগ্রেসী দলের একচ্ছত্র ভোটাধিক্য ছিল না, তাই যদি অন্যান্য দলের সকলে মিলিয়া একত্র হইত তবে কংগ্রেসী দলের ভোট অল্প হইয়া যাইত। সুতরাং যখন কয়েক মাস পরে অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হইতেছিল তখন সেখানে হইতে পারিল না, আর কয়েক দিন পর্যন্ত সেখানকার অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা অন্য সকলকে একত্র করিয়া নিজেদের ভোটাধিক্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। এই ভোটাধিক্য স্থায়ী হইল না। ১৯৩৮ সালের শেষার্ধে সেখানকার অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে উক্ত মন্ত্রীসভার হাতে আর ভোটাধিক্য থাকিল না। সেখানেও এমন সুযোগ আসিল যে অন্যান্য দলের সংগে মিলিত হইয়া কংগ্রেস নিজের ভোটাধিক্য রাখিতে পারিত আর এইভাবে অন্যান্য কোনও কোনও লোকের সংগে মন্ত্রীসভাও গঠন করিতে পারিত। এ অবস্থা উপস্থিত হইলে সেখানকার লোকেরা পার্লামেণ্টারি কমিটি ও কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশ জানিতে চাহিল। সভাপতি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং ও পার্লামেণ্টারি কমিটির সদস্য মৌলানা আজাদ, যাঁহার উপর উক্ত প্রদেশের দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হইয়াছিল, ঐ স্থানে গেলেন। সুভাষচন্দ্র মন্ত্রীসভা গঠনের পক্ষে পরম উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মৌলানা সাহেব তাহার অনুকূলে ছিলেন না। সর্দার বল্লভভাই ও আমার মতামত টেলিফোনে চাওয়া হইল। আমরা দুইজনে দুই জায়গায় ছিলাম। তাই কথাবার্তা বলিয়া কোনও মতামত দিতে পারিলাম না। যে যেখানে ছিলাম সেখান হইতেই মতামত জানাইলাম। আমি মৌলানা সাহেবের সংগে একমত, তাহা জানাইলাম। সর্দার সুভাষবাবুর কথা গ্রহণ করিলেন। আমাদের সম্মুখে সিদ্ধান্তের বা মতবাদের প্রশ্ন হইল। কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সিদ্ধান্ত বা মতবাদের জন্যই। শুধু পদের জন্য পদ গ্রহণ করিতে চাহি নাই। যেখানে তাহার সংখ্যাধিক্য ছিল না সেখানে তাহাকে অন্যান্য দলের অন্যান্য মতের লোকের উপর নির্ভর করিতে হইত। আমরা মনে করিলাম যে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য যে-সব প্রদেশে, সেই সব প্রদেশের মত সেখানে স্বতন্ত্রতা ও নির্ভীকতার সহিত কাজ হইতে পারিবে না। সংখ্যাধিক্যের বলেই বিহারে যুক্তপ্রদেশে পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রীসভা রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে এই ভোটাধিক্যের বলেই উড়িষ্যায় স্যার জন ডেনের গভর্নর হওয়া বন্ধ করিয়াছিল। এমন সুযোগ আসিলে আসামে অন্যান্য দলের জোরে কংগ্রেস এইভাবের কোনও কঠিন

কাজ করিতে পারিবে? ইহাতে সন্দেহ ছিল। তাই আমি বুঝিয়াছিলাম যে সেখানে মন্ত্রীত্ব তো পাওয়া যাইবে, আর মামুলি ধরনের মন্ত্রীসভার কাজও চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু কোনও সংকট অবস্থায় আমরা কংগ্রেসের নীতি চালাইতে পারিব না। কিন্তু সুভাষবাবুর মত ছিল এই যে পদ গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের শক্তি বাড়িয়া যাইবে, যাহারা পৃথক হইয়াছিল তাহারা সঙ্গে আসিয়া যাইবে, তাই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করাই ঠিক হইবে। সর্দার সভাপতির কথা রাখিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হওয়ার দুই-চার দিন পূর্বেই সেখানে মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। আসাম হইতে ফিরিবার পথে সুভাষবাবুর শরীর কিছু খারাপ হয়; তিনি ঐ বৈঠকে দেরি করিয়া পৌঁছিলেন।

উপরে উড়িষ্যার কথা বলা হইয়াছে। সেখানে মিঃ ডেন সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গভর্নর ছুটি লইয়া চলিয়া যাইতে চাহিলে কয়েক মাসের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল। মন্ত্রীসভা বলিলেন, যে-অফিসার আমাদের অধীনে কাজ করিতেছে ও গভর্নরের কার্যকাল পূর্ণ হইলে পুনরায় আমাদের অধীনেই কাজ করিতে পারে তাহাকে গভর্নর করা উচিত হইবে না; কারণ যে আজ আমাদের অধীনে সে কাল আমাদের উপরে চলিয়া গেলে তাহারই অধীনে আমাদের কাজ করিতে হইবে, ইহা ঠিক নয়—কাজ করিতে করিতে অসুবিধা হইতে পারে, আর সিভিল সার্ভিসের লোকদের উপর মন্ত্রীসভার শাসন ঠিকমত চলিবে না। মন্ত্রীসভা ভয় দেখাইলেন, যদি মিঃ ডেন গভর্নর নিযুক্ত হন তবে মন্ত্রীরা নিজ নিজ পদে থাকিতে পারিবেন না, মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিবেন। মিঃ ডেনের সঙ্গে মন্ত্রীসভার কোনও ব্যক্তিগত ঝগড়া ছিল না, যদিও কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার সঙ্গে কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছিল। তাঁহারা শুধু সিদ্ধান্ত বা আদর্শের দিক দিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছিলেন। ফলে হইল এই যে গভর্নর ছুটি লইলেন না। সুতরাং অস্থায়ী গভর্নর নিয়োগের সুযোগ তখন হইল না। অন্যান্য প্রদেশে গভর্নর ছুটি লইলে অস্থায়ী গভর্নর নিয়োগের অবসর আসিলে ঐ প্রদেশের সিভিলিয়ান আর ঐ পদ পাইলেন না; অন্য প্রদেশ হইতেই কাহাকেও লওয়া হইল। আদর্শের দিক হইতে তো ব্যবস্থা ঠিকই হইল। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখার কথা যে যদি কোনও সিভিলিয়ানেরই গভর্নর হইতে হয় তো তাহা চার মাসের জন্য। গভর্নরেরা সর্বদা ঐ সময়ের জন্যই ছুটি লইতেন। অন্য প্রদেশ হইতে কোনও সিভিলিয়ানকে আনিয়া গভর্নর করিলে প্রদেশের পক্ষে তাহা কতদূর হিতকর? চার মাসের মধ্যে তো তিনি সে-প্রদেশের অবস্থা বুঝিতেও পারিবেন না! ফলে শুধু তিনি স্থান পূর্ণ করিয়া থাকিবেন, কাজে কিছু করিতে পারিবেন না। সবচেয়ে ভাল উপায় হইবে যদি ঐ প্রদেশের কোনও

বেসরকারি লোককে গভর্নর করা যায়, যিনি প্রদেশের সমস্ত কথা জানেন এবং অন্য প্রকারেও যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু এ তো গেল সামান্য ত্রুটি বিষয়ে ব্যবস্থার কথা—ইহার চেয়ে বড় বড় ত্রুটি ছিল যেজন্য সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতেই হইল।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হইল, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা থাকিতে থাকিতেই ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিল, হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করিতে চাহিতেছে আর ইংলন্ডের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। যে-সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাতে ভয় হইল যে ইংলন্ড ও জার্মানীতে আবার যুদ্ধ না লাগে। ওয়ার্কিং কমিটি এইজন্য সেখানে থাকিয়া গেল, যুদ্ধ বাধিলে কংগ্রেসের কি করণীয় তাহা আলোচনা করিতে লাগিল। হিটলারের চেকো-স্লোভাকিয়া আক্রমণ অনুচিত হইয়াছে, সে-বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহ ছিল না—যদিও হিটলারের এই কথা বলার উপলক্ষ্য ছিল এই যে চেকো-স্লোভাকিয়া যে কিছু কিছু জার্মান ছিল, যাহারা জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের প্রতি সেখানকার গভর্নমেণ্ট উচিত মতো আচরণ করেন নাই। চেকোস্লোভাকিয়ায় অধিবাসীরা মিশ্র জাতির ছিল—কিছু জার্মান, কিছু চেক, কিছু স্লোভাক। প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্বে ইহা ছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন; যুদ্ধের পর উহা স্বাধীন হয়। ঐ সাম্রাজ্য যখন খণ্ড খণ্ড করা হইল তখন এই এক ভাগ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশের রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আবিসিনিয়ার যুদ্ধ যখন চলিতেছিল এবং ইটালি উহা আক্রমণ করিয়া নিজের অধীনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তখন কংগ্রেস আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল। সহানুভূতি তো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও দেখাইতেছিল! কংগ্রেস স্থির করিয়াছিল যে সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামে সে ব্রিটেনকে সাহায্য করিবে না। তখনও প্রশ্ন উঠিয়াছিল, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আবিসিনিয়ার মত দুর্বল দেশকে সাহায্য করিতে গিয়া ইটালির সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া বসে, তাহা হইলে কংগ্রেস বিপদে পড়িবে; কারণ কংগ্রেসের অভীষ্ট ছিল আবিসি-নিয়াকে সাহায্য করা, ইংলন্ডের সাহায্য করা নহে। এখন আবার সেই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিবার কথা দাঁড়াইল যে

কংগ্রেস কি সাহায্য করিতে পারে। একে তো কংগ্রেস অহিংসার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত নীতি স্বীকার করিয়া সশস্ত্র যুদ্ধে সাহায্য করিতে পারে কি না, এই জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছিল। সংগে সংগে আমরা ইহাও দেখিতেছিলাম যে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল কাজ করিতেছিল, এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথাও কোথাও দাংগাহাংগামার সময়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের অধিকারেও গুলী চালাইতে হইয়াছিল। পুলিশ ও জেলখানা নিজের নিজের কাজ করিয়াই চলিতেছিল। ভারতীয় শাসনের মধ্যে কংগ্রেসের অধিকার ছিল না, কিন্তু সেখানেও তাহার দিক হইতে এই বলিয়া সৈন্য দলের বিরোধ করা হয় নাই যে আমরা অহিংসা নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি সশস্ত্র সৈন্য-বল আমরা চাই না। তাহা ছাড়া, যদি সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া যায় তাহা হইলে উহা হইবে আমাদের অধিকারের বাহিরের বস্তু আর কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া হয় উহার বিরোধিতা নয় উহার অনুকূলতা করিতেই হইবে। এই সমস্ত প্রশ্ন হঠাৎ আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাত্মাজীও তখন উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তখন ইউরোপে গিয়াছিলেন। এইজন্য মহাত্মাজীর অভিমত তো পাওয়া যাইত, কিন্তু জওয়াহরলাল নেহরুর অভিমত বোঝা যাইতেছিল না। খুঁটিনাটি সবই আলোচনা করা হইল। বিশেষ করিয়া এই প্রশ্ন তো সম্মুখেই ছিল যে আমরা কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলকে কি বলিব, কি পরামর্শ দিব? এই সময়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া মতভেদ আছে মনে হইল; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সভাপতির অভিমত কি এবং তিনি কি নির্দেশ দিবেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। আমরা আলোচনা করিয়াই যাইতেছিলাম এমন সময়ে ওদিক হইতে খবর পাওয়া গেল যে তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কোনওরূপে জার্মানীর সংগে নিজেদের একটা বোঝাপড়া করিয়া ফেলিয়াছে, যুদ্ধ এখন আর হইবে না।

এ-বৎসরও প্রায় শেষ হইতে চলিল। এ-বৎসর কংগ্রেসের লোকেরা বিশেষ করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলের কাজেই লাগিয়া ছিল। এখানে ওখানে কংগ্রেস কমিটির মধ্যেও ঝগড়া বাধিল। কংগ্রেসের নির্বাচনদ্বন্দ্ব খুব উৎসাহের সংগে হইল। এই দুই-তিন বৎসরে কংগ্রেসের সভ্য অনেক হইল, কারণ কর্মীরা এদিকে খুব জোর দিয়াছিলেন। প্রথমে তো কিছু কালের জন্য কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ছিল, তাই যখন উহা পুনরায় কাজ আরম্ভ করিল তখন লোকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ দেখা গেল। তাহার পর নূতন বিধান অনুসারে এসেম্‌ব্লীর নির্বাচন হইবার কথা। কংগ্রেসের দিক হইতে নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য লোকে উৎসাহ দেখাইল। কেহ কেহ হয়তো ইহাও ভাবিয়া থাকিবে যে তাহাদের দলীয় যাহারা তাহারা যদি কংগ্রেসে

আসিয়া পড়ে, তবে সেই দলীয় ব্যক্তিগণকে দিয়া কাজ হাসিল করানো যাইতে পারে। এইরূপ অন্যান্য কারণও দেখা দিল যাহাতে কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইল। এখন কংগ্রেসের প্রতিনিধি, অখিল ভারতীয় কমিটি ও কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের সময়ও নিকটে আসিল। কেহ কেহ মনে করিতেছিল যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদই সভাপতি নির্বাচিত হউন। কেহ কেহ চাহিতেছিল যে সুভাষবাবু আবার নির্বাচিত হউন। কিন্তু এ-কথা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্মুখে আসে নাই। হরিপুরা কংগ্রেসের পূর্বে সকলের মত লইয়া, বিশেষ করিয়া মহাত্মাজীর অনুমতি ও আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবু সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন। যদি তিনি নিজের ইচ্ছা মহাত্মাজীর নিকট ব্যক্ত করিতেন ও আমরা সকলে মিলিয়া মত দিতাম তাহা হইলে হয়তো কোন একটা পথ বাহির করা যাইত, কথা আর আগে বাড়িতে পারিত না। কিন্তু তিনি বা তাঁহার সমর্থকেরা এরূপ করিলেন না। এজন্য পরে অতি বিশ্রী ধরনের ঝগড়া বাধিল।

১৯৩৯-এর মার্চ মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের নিকটে ত্রিপুরী নামক স্থানে হইবার কথা ছিল। জানুয়ারি মাসে বারদোলিতে ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইল। এ-দিকে কয়েক বৎসর ধরিয়া মহাত্মাজী প্রতিবার শীতের এক মাস বারদোলিতে কাটাইতেন। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ-জন্য অধিবেশনও সেখানেই করা হইল। যতদূর মনে পড়ে, সেখানে কোনও বিশেষ গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত ছিল না। সেখান হইতে ফিরিবার সময়ে আমরা নিজেদের মধ্যে অল্প বিস্তর যাহা আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে এবার মৌলানা সাহেবকেই আমরা নির্বাচন করিব। সুভাষবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কোনও কথাই হয় নাই। হয়তো তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গেও কথা বলেন নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়াছিলাম, তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, নিজের মতাবলম্বী কংগ্রেসীদের সঙ্গে নিজের বিষয়ে কথা বলিতেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে মৌলানা সাহেবের কথা হইয়াছিল, আর তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এ-বিষয়ে সম্মতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা শুনিলাম যে তিনি পরে নিজের মত পরিবর্তন করেন এবং নিজের অনিচ্ছা মহাত্মাজীর নিকটে ব্যক্ত করেন। আমি পাটনায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। সর্দার বল্লভভাইয়ের তার পাইলাম, ডাঃ পট্টভি সীতারামৈয়াকে সমর্থন করিবার জন্য বক্তব্যে আমার সই চাই। আমি রাজি হইলাম। তখন বুঝিলাম, ডাঃ পট্টভি সীতারামৈয়াকে নির্বাচিত করিতে হইবে। এ-সিদ্ধান্ত সরদার মহাত্মাজীর মত লইয়াই করিয়াছিলেন। এখন রাষ্ট্র হইয়া গেল যে মৌলানা সভাপতি-পদের প্রার্থী নহেন।

ডাঃ পট্টভি সীতারামৈয়া ও শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু এই দুইজনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে।

এমনিতে তো প্রতি বৎসর দুই-চার জনের নাম সভাপতি-পদে নির্বাচনের জন্য উপস্থিত করা হয়, তাহাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এদিকে কয় বৎসর ধরিয়া কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত না। প্রায়ই সকল প্রদেশের লোক, কেহ না বলিলেও, স্বীকার করিয়া লইত যে এবার অমুক ব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে হইবে। নির্বাচনও সেই মতো হইত। অন্যান্য যে-সব নাম থাকিত তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হইত না। এখানে ওখানে দুই-চার জন কয়েকটি ভোট পাইলেও, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন কেহ নির্বাচিত হইয়াছেন এরূপ অর্থ কেহ করিত না। এবার নির্বাচনের চেহারা বদলাইয়া গেল। মনে হইল, দুইজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এমনও মনে হইল যে একদিকে যাঁহারা আছেন তাঁহারা গান্ধীজীর চিন্তাধারার অনুগামী, অন্যদিকে যাঁহারা আছেন তাঁহারা গান্ধীজীর কার্যক্রমে বিশ্বাসী নহেন। যদিও গান্ধীজী বোম্বাই কংগ্রেসের সময় হইতেই কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি এ-পর্যন্ত তাঁহারই চিন্তাধারা কংগ্রেসে কাজ করিতেছিল। সমস্ত বিষয়ে তাঁহার কথামতই কাজ হইয়া আসিতেছিল। কোনও বিষয়ে মতভেদ হইলে তিনিই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতেন এবং শেষে সমস্ত ঝগড়ার তিনিই নিষ্পত্তি করিতেন। এবার মনে হইল বুঝি তাহা হইবে না, আর সেজন্য এমন লোকই নির্বাচন করিতে হইবে যাহারা নিজেই নিজের কার্যক্রম স্থির করিবে এবং নিজের প্রস্তুত পথে কংগ্রেসকে লইয়া যাইতে চাহিবে। এ-সকল কথা তো ছিল, কিন্তু নির্বাচনের সময় স্পষ্ট হয় নাই। গান্ধীজী নিজের দিক হইতে কোনও বিবৃতি দেন নাই। যদি মৌলানা থাকিয়া যাইতেন তবে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে তিনি অনেক বেশি ভোটে নির্বাচিত হইতেন; কারণ কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যেরা তাঁহাকে চাহিয়াছিলেন এবং তিনি গান্ধীজীর কার্যক্রম হইতে পৃথক রহিতেও চাহেন নাই। তাঁহারা এ-কথা বোঝেন নাই যে নির্বাচনে ডাঃ পট্টভি সীতারামৈয়া এক বিশেষ চিন্তাধারা ও এক বিশেষ কার্যক্রমের প্রতীকস্বরূপ নির্বাচন প্রার্থী। ভাল, নির্বাচন তো হইয়া গেল। ফলে খুব বেশি ভোটে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু নির্বাচিত হইলেন।

কয়েক বৎসর হইতে কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছু পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইত, তাহাতে আসন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনে বিষয়-নির্বাচনী সভার প্রস্তাবাদির মুসাবিদা তৈয়ার করা হইত। এবারও ঐরূপ হইবারই কথা ছিল। ওয়ার্কিং কমিটিতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুভাষবাবুর সহিত, যতদূর জানা যায়, একমত ছিলেন না। আমরা

ভাবিলাম যদি সুভাষবাবু তাহার মতাবলম্বীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রস্তাব তৈয়ার করেন তবে ভালই হয়; কারণ তাঁহাকেই কংগ্রেসের ভার লইতে হইবে, এবং তাঁহার জন্য ও গান্ধী-বিচার ধারায় বিশ্বাসী আমাদের জন্য ইহা ভালই হইবে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিয়া ও ঐ সকল প্রস্তাব তৈয়ার করিতে সাহায্য করিয়া যদি আমরা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে সেই সকল প্রস্তাবের বিরোধিতা করি তবে তাহা আমাদের পক্ষে অন্যায় হয়। সুভাষবাবুরও আমাদের উপস্থিতিতে সংকোচ হইবে এবং তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রস্তাব তৈয়ার করিতে পারিবেন না; কারণ ওয়ার্কিং কমিটিতে আমাদের ভোটাধিক্য ছিল। তাই আমরা ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিলাম এবং তাঁহাকে নিজের ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবার ও তাহার সাহায্যে প্রস্তাবও তৈয়ার করিবার পূর্ণ সুযোগ দিলাম। এইরূপ হইলে, সেই সকল প্রস্তাব দেখিবার পরে যদি আমরাও তাঁহার সহিত একমত না হই তাহা হইলে কংগ্রেসে তাঁহার বিরোধিতা করিবার স্বাধীনতা আমাদের থাকিবে। প্রজাতন্ত্রের সাধারণ নিয়মও ইহাই যে যাঁহার পক্ষে মত বেশি তিনিই উহা পরিচালনার ভার লইবেন এবং ভোটাধিক্যের অনুযায়ী কার্যক্রম প্রস্তুত করিবেন।

আমরা ওয়ার্ধায় গেলাম, সেখানেই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। সময়মতো গিয়াছিলাম, যাহাতে সব আলোচনা সামনা-সামনি হয় এবং এ-ব্যাপারে আমাদের কোনও ভুল-ভ্রান্তি না হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশে সুভাষবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, সেখানে গেলেনই না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগপত্র যেমনকার তেমন পড়িয়া রহিল। ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমরা নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে প্রস্তাব তৈয়ার করিয়া তাহা বিষয়-নির্বাচনী সভার সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টাও করিতাম। কিন্তু এরূপ আচরণ আমাদের পছন্দ হইল না, কারণ সভাপতি নির্বাচন অর্থে আমরা বুঝিয়াছিলাম যে প্রতিনিধিদের অধি-কাংশের মত সুভাষবাবুর পক্ষে, তাঁহাকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়াই আমাদের উচিত, কারণ তিনি যেমন উচিত মনে করিবেন সেইভাবে কাজ চালাইবেন। ফলে হইল এই যে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখিতে হইল। আমরা ত্রিপুরীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে এই নির্বাচন ও তাহার পরের ঘটনাগুলির বিষয়ে আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ হইতে থাকিল।

ও-দিকে কাঠিয়াওয়াড়ে অন্য এক অবস্থার সৃষ্টি হইতেছিল। সেখানে কোনও কোনও রাজ্যে রাজা-প্রজায় মনান্তর হইয়াছিল। সরদার বল্লভভাই এ-বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহার মত অনুসারেই কাজ করিতেছিল। কংগ্রেসের নীতি এ-পর্যন্ত ইহাই ছিল যে কংগ্রেস যেন

সোজাসুজি দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে; কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণ প্রজাতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে কংগ্রেসের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, এবং কংগ্রেসের সভ্যেরা ব্যক্তিগতভাবে এ-কার্যে সাহায্যও করিতে পারিত। এই নীতি অনুযায়ী পট্টভি সীতারামৈয়া ও তাঁহার পরে পণ্ডিত জওয়াহরলালজীও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজামণ্ডলের সভাপতি হইয়াছিলেন। মহাত্মাজীর পরামর্শ সব ব্যাপারেই চাওয়া হইত এবং তাঁহার সম্মতি ও আদেশে সকল বিষয়ের নির্বাহ হইত। গুজরাত ও কাঠিয়া-ওয়াড়ের দেশীয় রাজ্যগুলিতে সরদার বল্লভভাই অত্যন্ত তৎপরতা ও উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছিলেন। যেখানে প্রয়োজন হইত সেখানে যাইতেনও। শেঠ যমুনালালজী বিশেষ করিয়া রাজপুতানার রাজোয়াড়াদের সম্বন্ধে কাজ করিতেন এবং প্রজামণ্ডল স্থাপিত করার ব্যাপারে সাহায্য করিতেন।

এই সময়ে কাঠিয়াওয়াড়ের রাজ্য রাজকোটে রাজা-প্রজায় যে-মনান্তর হইয়াছিল তাহাতে সরদার বল্লভভাই গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় কতকগুলি সিদ্ধান্ত হইল, রাজা তাহা মঞ্জুর বা গ্রহণ করিলেন। এই বোঝাপড়ায় মহাত্মাজীরও অনুমোদন ছিল। পরে রাজা ও রাজ্যাধিকারী বোঝাপড়ার শর্তগুলি পালন করিতে অস্বীকার করেন। এ-কথা মহাত্মাজীর খারাপ লাগিয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা ও মুখের কথাকে খুবই মর্যাদা দিতেন। কাহারও কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে দেখিলে তাঁহার আন্তরিক কষ্ট হইত। বিশেষ করিয়া সাধারণের ব্যাপারে যে-সব প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি করা হয় তাহার স্থান আরও উচ্চে। তিনি চাহিয়াছিলেন, যে-কথা একবার স্থির হইয়া গিয়াছে রাজার তাহা পালন করা চাই। এই জন্য তিনি একান্ত চেষ্টা করিলেন, নিজে রাজকোট চলিয়া গেলেন। সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অনশন আরম্ভ করিলেন। অনশন তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু নয়। তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া হিন্দু-স্থানে কাজ আরম্ভ করিতেছিলেন তখন আমেদাবাদের মজুরেরা ধর্মঘট করিয়াছিল। সেই ধর্মঘটে শ্রমিকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে যতদিন না তাহাদের দাবি পূরণ করা হইবে ততদিন তাহারা কাজ করিবে না। প্রতিজ্ঞা করিবার সময় হয়তো তাহারা প্রতিজ্ঞার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। গান্ধীজীর নিকটও ভারতবর্ষ একেবারে নূতন। তখন পর্যন্ত কেহ প্রতিজ্ঞার উপর এতটা জোর দেয় নাই। শ্রমিকদের যখন কষ্ট হইতে লাগিল তখন তাহারা কাজে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। গান্ধীজী ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অনশন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফলে হইল এই যে একদিকে শ্রমিকেরা বিগড়াইয়া গেল অন্যদিকে মিলের মালিকও নরম হইয়া গেলেন। সন্তোষজনক বোঝাপড়া হইয়া গেল। সেই নীতি অনুসারে

তিনি রাজকোট রাজ্যের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা পালন করাইবার জন্য অনশন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ত্রিপুরীতে যখন কংগ্রেস হইতেছিল ঠিক সেই সময়েই এই অনশন আরম্ভ হইল। তাই গান্ধীজী ত্রিপুরীতে আসিতে পারিলেন না। সেখানে যাহা কিছু হইল, তাঁহার অনুপস্থিতিতেই হইল।

গান্ধীজীর অনশনের ফল হইল এই যে এই ব্যাপারে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো জড়াইয়া পড়িলেন। একভাবে তখন প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইল। গান্ধীজী অন্ন গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি এই অনশন হইতে মূলগত নৈতিক সিদ্ধান্ত বাহির করিলেন, যাহার সম্বন্ধে তিনি সবিস্তার আলোচনা সাপ্তাহিক 'হরিজন'-এ করেন। তাঁহার মতে এই অনশন অহিংসাত্মক হয় নাই। পুনরালোচনার পরে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন আর তাঁহার কার্য করিবার রীতি অনুসারে তিনি এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিতও করিলেন। যে সূক্ষ্মতার সহিত তিনি এইরূপ নৈতিক প্রশ্ন আলোচনা করিতেন আর যেখানে যেখানে তাঁহার হৃদয়ে কোনও বিষয়ের কোনও ব্যাপার এক চুলও সত্য হইতে দূরে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইত, তাহা তখনই স্বীকার করিয়া সরিয়া আসিতে তাঁহার আদৌ সঙ্কোচ হইত না। তিনিই শুধু এইরূপ করিতে পারিতেন; অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা এই সকল বিষয় এতখানি উচ্চ নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেনও না, সামান্যতম ত্রুটির জন্য কার্যক্রমও পরিবর্তন করিতেন না।

এক অদ্ভুত ও দুঃখজনক অবস্থায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। নির্বাচনের পর সংবাদপত্রে যে বাদ-প্রতিবাদ হইল তাহা হইতে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট কটুতা সঞ্চারিত হইল। সুভাষবাবুর দলের লোকেরা এই বলিয়া আমাদের উপর দোষারোপ করিতেছিলেন যে ভোটাধিক্যে তাঁহার নির্বাচন হইয়া যাওয়ায় আমরা রুষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম, তাঁহাদের হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং সর্বপ্রকারে তাঁহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছিলাম। আমরা বুঝিয়াছিলাম, যদি সত্যই ভোটাধিক্য তাঁহার অনুকূলে থাকে, তবে কংগ্রেস পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তাহাদের লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিয়া কার্যক্রম স্থির করিতে হইবে। আমরা বহু বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত ছিলাম না। তাঁহার সহিত একত্র কাজ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইত—যদি মত ও পথের কোনও পার্থক্য নাই ছিল তবে তাঁহার নির্বাচনে বিরোধিতা করাই ঠিক হয় নাই, আর যদি তাঁহার অনুকূলে ভোটাধিক্য নাই ছিল লোকের ভুল বোঝার জন্য অথবা অন্য কারণে তিনি নির্বাচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে-নির্বাচনেই ত্রুটি ছিল। যাহা হউক, আমরা চাহিয়াছিলাম যে কথাটা পরিষ্কার হইয়া যাক। তিনি এবং তাহার মতাব-

লম্বীরা কার্যক্রম প্রস্তুত করিবেন আর জবাবদিহি করিব আমরা—ইহা আমরা চাহি নাই; আমরা ইহাও বলিতে পারি নাই যে আমরা তাঁহার সহিত একমত নই। এই সকল ভাবিয়া আমরা কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে পূর্বে হইতে ইস্তফা দিয়াছিলাম। কিন্তু উপরে যেমন বলিয়াছি, পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় নাই, ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি কাজ করিতেছিল।

ত্রিপুরীতে অধিবেশনের পূর্বে ও অধিবেশনের সময়ে নিজেদের মধ্যে খুব মন কষাকষি ছিল। কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ ছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সুভাষবাবু অসুস্থও ছিলেন। ত্রিপুরীতে তাঁহার ক্লান্তি খুব অধিক ছিল। স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত সকল ব্যবস্থা করিয়াছিল। সভাপতির শোভাযাত্রার জন্য সমগ্র প্রদেশ হইতে যত বর্ষ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া আসিতেছিল, তত সংখ্যায় হাতী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। অনেক হাতী ছিল ঐ প্রদেশের রাজন্যদের। প্রতিনিধিদেরও থাকিবার-খাইবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। সভাপতির জন্য এক পৃথক শিবির ছিল, সেখানে বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অন্য এক শিবিরে রাখা হইয়াছিল, প্রতিনিধিরা ছিলেন নিজের নিজের প্রদেশের জন্য প্রস্তুত শিবিরে। প্রতিনিধি-শিবিরগুলিতে গরম গরম তর্ক চলিত। ওয়ার্কিং কমিটির বিধিমত বৈঠক হওয়াও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কারণ মনোনীত সভাপতি অসুস্থ ছিলেন, আর নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। আমরা এজন্যও খুব চেষ্টা করিয়াছিলাম যাহাতে মনোনীত সভাপতি নূতন কার্যকরী সভা গঠন করেন এবং আমাদের মুক্ত করিয়া দেন। তাহা হইলে আমরা স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেসের কার্যে যোগ দিতে পারি। কিন্তু সেরূপ হইল না। তিনি যে কার্যক্রম দিতে চাহিতেছিলেন, তাহা প্রথমতঃ আমাদের সম্পূর্ণ জানাই ছিল না, আর যতদূর জানা ছিল তাহাতে আমরা তাঁহার সহিত একমত ছিলাম না। এ-অবস্থায় কার্যকরী সমিতিকে নিজের মতো প্রস্তাব রচনা করিতে হইল। উহাতে আমরা সমগ্র অবস্থা নির্ণয় করাইয়া ইহাই বলিলাম যে সভাপতি যদি চাহেন তাহা হইলে নিজের ইচ্ছামত কার্যকরী সভা গঠন করিয়া তাঁহার কার্যক্রম কংগ্রেসকে দিয়া অনুমোদিত করিয়া লউন, আর যদি তাহা করিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে পুনরায় গান্ধীজীর মত কার্যক্রম প্রস্তুত করুন ও কার্যকরী সভা গঠন করুন। দুইটির তাঁহার মনঃপূত ছিল না, কারণ তিনি জানিতেন যে যদিও ভোটাধিক্যে তিনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার কার্যক্রম প্রকাশ্য অধিবেশনে কংগ্রেস গ্রহণ করিবে না—এ-অবস্থায় হয় তাঁহাকে গান্ধীজীর কার্যক্রম স্বীকার করিয়া সেই অনুসারে চলিতে হইবে নয়তো পদত্যাগ করিতে হইবে। তিনি না চাহিয়াছিলেন গান্ধীবাদীদের কার্যক্রম স্বীকার করিতে,

না চাহিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিতে। তিনি চাহিয়াছিলেন লোকে তাঁহার কার্যক্রম স্বীকার করিয়া তাহা চালায়। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যখন-তখন গিয়া এ-সকল বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিত; কিন্তু কোনও পথ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, শেষে ইহাই স্থির হইল যে আমরা আমাদের প্রস্তাব বিষয়-নির্বাচনী সভার সম্মুখে উপস্থিত করিব,—সভাপতি যাহা উচিত মনে করেন করিবেন।

বিষয়-নির্বাচনীর অধিবেশনে সুভাষবাবুকে অসুস্থ অবস্থায় কোনও প্রকারে আনা হইল। তিনি মঞ্চের উপর শুইয়া থাকিলেন। তাঁহার পূজনীয়া মাতা ও তাঁহার পরিবারের মেয়েরা তাঁহার পরিচর্যা করিতে থাকিলেন। তাঁহার ভাই ডাক্তার সুনীলবাবু ও অন্যান্য ডাক্তারেরাও তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকিলেন। তিনি শুইয়া শুইয়া ক্ষুদ্র একটি ভাষণও দিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মত স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলেন। আমাদের প্রস্তাবও উপস্থিত করা হইল, এবং তাহা ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। এ-কথা পরিষ্কার হইয়া গেল যে বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে, যাহার সদস্য অখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিরই সদস্য, তাঁহার ভোটাধিক্য নাই, এবং যে-পর্যন্ত না দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ও নূতন সদস্য নির্বাচন করা হয়, ততদিন নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরূপে তাঁহাদের সঙ্গেই সভাপতির কাজ করিতে হইবে। কিন্তু এখন কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রতিনিধিদের কি অবস্থা হইবে তাহা জানা গেল না। আমরা জানিতাম, সেখানেও বিপুল ভোটাধিক্য আমাদের অনুকূলেই হইবে, তাহা হইলেও যতক্ষণ অধিবেশন শেষ না হইতেছে ততক্ষণ এ-বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারে না। এখন অধিবেশনে দুইটি প্রস্তাব পেশ করা হইবে—একটি সভাপতির দিক হইতে, অন্যটি আমাদের দিক হইতে, প্রকাশ্য অধিবেশনে কি ফল দাঁড়ায় তাহাই এখন দেখিতে বাকি।

প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় আসিয়া পড়িল। সুভাষবাবু অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন না। তাই তাঁহার স্থানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বসিলেন। যখন অনেকক্ষণ চেষ্টার পরেও মনোনীত সভাপতি আসিয়া পৌঁছিলেন না তখনই এই ব্যবস্থা হইল। তাঁহার অস্বাস্থ্যের কথা সকলেরই জানা ছিল আর সেখানেও সব কথা বুঝাইয়া বলা হইল। অধিবেশন আরম্ভ হইল। সভাপতির ভাষণ পড়িয়া শোনানো হইল। মিশর হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি কংগ্রেস দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইল। তাঁহারা মিশরের দিক হইতে কংগ্রেসের প্রতি ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন। তাহার পর বিধিবদ্ধ কার্যক্রম আরম্ভ হইবার কথা; এমন সময় কয়েকজন সদস্যের দিক হইতে বলা হইল, সভাপতির অনুপস্থিতিতে যেন প্রস্তাব পেশ করা না

হয়। সমগ্র দেশের লোক একত্র হইয়াছিল। এত বড় অধিবেশন স্থগিত রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সভাপতি বলিলেন, প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে, অধিকাংশ আলোচনা ও ভোট গ্রহণ পরের দিন হইবে। আশা করা যায় যে পরের দিন সভাপতি আসিতে পারিবেন। তাঁহার এই কথা কাহারও কাহারও ভাল লাগিল না। কেহ কেহ গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিল। যাহারা গণ্ডগোল করিতেছিল তাহাদের সংখ্যা বেশি হইবে না। কিন্তু অল্প কয়েকজন লোক অতি প্রকাণ্ড সভাও পণ্ড করিয়া দিতে পারে। তখন পণ্ডিত জওয়াহরলালজী মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে শান্ত করিতে খুবই চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শান্ত হওয়া দূরে থাক, তাহারা নিজের নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং মঞ্চের নিকটে আসিয়া আরও বেশি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতে থাকিল। জওয়াহরলালজী তাঁহার স্থান ত্যাগ করিলেন না। তিনি লাউড স্পীকারে সমাগত পঞ্চাশ হাজার লোককে এবং অন্য প্রতিনিধিদিগকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা স্ব-স্ব স্থানে শান্ত হইয়া বসিয়া থাকুন। ফলে হইল এই যে, যে-কয়েকজন লোক গণ্ডগোল করিতেছিল তাহারা আগাইয়া আসিল বটে, কিন্তু অন্য কেহ তাহাদের সঙ্গী হইল না। সেই জনসমুদ্রে তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় দেখাইতে লাগিল। তাহারা মঞ্চের নিকটে আসিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া গণ্ডগোল করিতে থাকিল, কিন্তু জওয়াহরলালজী নিজের জায়গা ছাড়িয়া একটুও নড়িলেন না। শেষে তাহারা ক্লান্ত হইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর সভার কাজকর্ম ঠিকভাবে চলিতে থাকিল। দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল, আলোচনা ও ভোট লইবার ব্যাপার পরের দিনের জন্য মুলতুবী রাখা হইল।

আমরা দেখিলাম, এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত জনসাধারণ ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা ক্রুদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণ ও প্রতিনিধিদের নিজেদের দলে টানিবার কথা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টা শুধু ব্যর্থই হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে ক্ষতিকরও হইয়াছিল। কারণ, যে-অল্প সংখ্যক লোকের তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবার কথা ছিল, তাহারাও তাঁহাদের এই কার্যে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। পরের দিন এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ঐ খোলা প্যাণ্ডালে অধিবেশন না করিয়া বিষয়-নির্বাচনীর কার্যালয়ে করা হইল। যাহাতে ভোট লইবার সুবিধা হয় ও কাহারও অভিযোগ না থাকে, সেজন্য শুধু প্রতিনিধিদেরই আসিতে দেওয়া হইল। সেখানে পুরাপুরি আলোচনার পর ভোট গ্রহণ করা হইল। বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রকাশ্য অধিবেশনে অন্য প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হইল—এ-প্রস্তাবে কোনও মতভেদ ছিল না।

অধিবেশন তো শেষ হইল, কিন্তু কটুতা আরও বাড়িয়া গেল। আমরা কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কংগ্রেসের অধিবেশনে এমন প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম যাহা সভাপতি চাহেন নাই। শুধু তাহাই নয়, অধিবেশন সভাপতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল, উহা বাতিল করিয়া দিল। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল, সভাপতি কি করিবেন। যদি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে নূতন কার্যকরী সভা এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যে তাহার উপর গান্ধীজীর আস্থা থাকে, আর তাহার সহিত তিনি একমতও হইবেন। ত্রিপুরীতে অসুস্থ থাকার জন্য সুভাষবাবু সেখানে নূতন কার্যকরী সভা গঠন করেন নাই, সভাপতিরা যেমন করিয়া থাকেন। তিনি ও আমরা সকলে নিজের নিজের স্থানে ফিরিয়া গেলাম।

ত্রিপুরীতে যে-সিদ্ধান্ত হইল সুভাষবাবু তাহার অনুযায়ী কাজ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার স্বাস্থ্যও এমন ছিল না যে এ-বিষয়ে কিছু-দিন পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া কোনও মীমাংসা করা যায়। হয়ত মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁহার কিছু কিছু পত্রযোগে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। কিন্তু কোনও মীমাংসা হইতে পারে নাই। তিনি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতায় হইবার কথা ছিল। তাহার পূর্বে আমি একবার তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় ঝরিয়ায় জামাডোবা কলিয়ারিতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখাও করিয়াছিলাম। তিনি সেখানে তাঁহার ভাইয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতি করিতেছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে খোলাখুলি কোনও কথা হয় নাই। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতায় বৈঠক হইল। মহাত্মাজীও কলিকাতায় গেলেন, যদিও তিনি কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকিলেন না। মহাত্মাজী থাকিলেন সোদপুরের খাদি-প্রতিষ্ঠানে, আর আমরা থাকিলাম শহরে। সুভাষবাবু ও মহাত্মাজীর মধ্যে কয়েকবার কথাবার্তা হইল, তাহাতে আমরাও প্রায়ই উপস্থিত থাকিতাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল, সুভাষবাবু সভাপতি থাকিতে পারিবেন না; কারণ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকসংখ্যক ভোট তাঁহার অনুকূলে নহে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল, সভাপতি হইবেন কে? সুভাষবাবু ও অন্য অনেকে সরদার বল্লভভাইয়ের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তিনি সকলের সঙ্গে পরিষ্কার কথাবার্তা চালাইতেন, কাহাকেও খোশামোদ করিয়া সন্তুষ্ট করিবার কলা তিনি কখনও শিখেনই নাই। পণ্ডিত জওয়াহরলালজী এই সকল কথা হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র রহিতেন, যদিও তাঁহার সম্মুখে অন্য কোনও পথ দেখা যাইত না, তথাপি তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমাদের চিন্তাধারার সহিত একমত ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রয়াগ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পড়িয়া গিয়া পায়ে

চোট পাইয়াছিলেন বলিয়া চারপাইয়ের উপর পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার উপর ভার চাপানো ভাল লাগিতেছিল না, এবং এইরূপ অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাহা গ্রহণও করিতেন না।

লোকের মনে হইল, সুভাষবাবু পদত্যাগ করিলে পরে আমাকেই সভাপতি করা যায়। আমার একথা মোটেই ভাল লাগে নাই। একে তো আমি এই ধরনের ঝগড়া হইতে সর্বদা নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতাম—আমি বুঝিয়াছিলাম যে যতক্ষণ পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন না নয়, আর নূতন সভাপতি নির্বাচিত না হন, ততক্ষণ গোলমাল চলিতেই থাকিবে, আর আমি এই ঝঞ্ঝাট সামলাইতে পারিব না, কারণ আমার মেজাজই এমন নয় যে ঝগড়া করিতে পারি; দ্বিতীয় কথা, ত্রিপুরীর পরে বিহারে ছিল কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ, আর তাহার জন্য ব্যবস্থাও আমাকেই করিতে হইবে, তাহার জন্যও সময় দিতে হইবে, আর যদি আমি নিখিল-ভারতীয় কার্যেই আটকাইয়া যাই তাহা হইলে নিজের প্রদেশের কাজও আটকাইয়া যাইবে। এই সব ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি সভাপতি হইতে চাই নাই। কিন্তু যখন মহাত্মাজী অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে আমাকে এই ভার গ্রহণ করিতেই হইবে, তখন আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম দিনের অধিবেশন কোনও প্রকারে সমাপ্ত হইল। উহাতে কোনও বিশেষ কাজ হয় নাই। আমরা যখন সকলে প্যাণ্ডাল হইতে স্ব-স্ব স্থানে রওনা হইতেছি তখন শুনিলাম যে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সঙ্গে, যিনি কি না ত্রিপুরীর প্রস্তাব কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, আর বুলাভাই দেশাইয়ের সঙ্গেও কেহ কেহ অশিষ্ট আচরণ করিয়াছিল, এবং কেহ কেহ কৃপালনীজীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গেও অশিষ্ট আচরণ করিয়া থাকিবে। এই সকল সংবাদ আমি তখন পাই নাই, কিন্তু শহরে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। উত্তর ভারতের অধিবাসীদের রোষের সীমা থাকিল না। জওয়াহরলালজী ইহার সন্ধান পাইলেন এবং তাহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তাহা না হইলে পরের দিন সভার পূর্বেই মারপিট হইয়া যাইত। পরের দিন সভায় সুভাষবাবু আসিলেন না। তিনি শুধু নিজের পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিলেন। কমিটি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে সভাপতি নির্বাচন করিল। আমি যেমনই দাঁড়াইয়া উঠিলাম ও পূর্বেকার কাজকর্ম শুরু করিতে গেলাম অমনই কেহ কেহ জোরে গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়া দিল। ত্রিপুরীতে যে-দৃশ্য দেখিয়াছিলাম এখানেও স্বল্প আয়তনে সেই দৃশ্য আরম্ভ হইল। আমি স্বস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। যতক্ষণ গণ্ডগোল শেষ না হইল, ততক্ষণ আমি দাঁড়াইয়াই থাকিলাম। যখন গণ্ডগোল শেষ হইয়া গেল, তখন

সামান্য কিছু কাজ শেষ করিয়া আমি সভা ভঙ্গ করিলাম। সেখান হইতে ফিরিবার সময়ে কিছু স্বেচ্ছাসেবক আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া অগ্রসর হইল। তাহাদের দুই-একজন রক্ষা করিবার ছলে আমার জামা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তখন অন্যেরা আসিয়া পড়িল। আমি কিছু আঘাত পাই নাই, তবে জামার বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আমাকে গাড়িতে করিয়া আমার জায়গায় পেঁছাইয়া দেওয়া হইল। আমি কাহারও নিকট এ-বিষয়ের উল্লেখ করি নাই, তাহাতে মন-কষাকষি আরও বাড়িত। রাত্রের গাড়িতে যখন রওনা হইলাম তখন জানিতে পারিলাম, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে কেহ কেহ গিয়া গণ্ডগোল করিয়াছিল, জিনিসপত্রও কিছু কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিয়াছিল। নূতন যে ওয়ার্কিং কমিটি হইল তাহাতে বাংলা হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সদস্য ছিলেন। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুও তখন সদস্য হইতে স্বীকার করেন নাই। যদিও তিনি সর্বদা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

অপ্রিয় কর্তব্য

কলিকাতার অধিবেশনে বিশেষ কিছু কাজ হইতে পারে নাই। এই জন্য নিখিল-ভারত কংগ্রেসের অন্য এক অধিবেশন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অল্প দিন পরেই বোম্বাইয়ে এক অধিবেশন আহ্বান করা হইল। উপরে যেমন বলা হইয়াছে, ত্রিপুরীতে প্রধান প্রস্তাবে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পন্থজী ছিলেন যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী। আমাদের বিরোধী দল সেখানে এবং পরে এই কথাটির বিশেষ প্রচার করিয়াছিল যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল সুভাষবাবুর বিরোধী ছিল, আর তাহারাই ত্রিপুরীতে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদার অন্যায় সুযোগ লইয়া ত্রিপুরীর প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়াছিল। অন্যান্য কারণে অনেকে মন্ত্রীমণ্ডলের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এইভাবে এমন এক দলের সৃষ্টি হইল যাহারা মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত এবং তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিত। যেখানে যেখানে কংগ্রেসের ভোটাধিক্য সেই সকল প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডল কংগ্রেসের নির্দেশানুসারেই চলিতেন। পারলামেণ্টরী কমিটি কখনও তাঁহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, কিন্তু দৃষ্টি রাখিতেন যে নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের দিক হইতে যে ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হইয়াছে তাহা যেন পালিত হয়। মন্ত্রীমণ্ডলেরও যথাসাধ্য এই দিকে চেষ্টা থাকিত। আমার মত এই যে নিজের অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে ও বর্তমান পরিস্থিতিতে যাহা কিছু হইতে পারিত, তাহা তাঁহারা করিতেন। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরের লোকেদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। এই বিরোধ সক্রিয় আকার ধারণ করিতে যাইতেছিল। কংগ্রেস-বিরোধীদের প্রতিকূলতা আমরা বুঝিতে পারিতাম; কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধ আলোচনাও বুঝিতে পারিতাম। মন্ত্রীমণ্ডল যথাসাধ্য এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এখন অবস্থা এমন ধরনের হইয়া দাঁড়াইল যে সুভাষবাবুর অনুযাত্রী সকলে মন্ত্রীমণ্ডলের বিরোধী দলের সহিত একত্র হইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। লোকের মনোবৃত্তি এমনভাবে দেখা গেল যে কংগ্রেসের মধ্যে যে-কলহ ত্রিপুরীর পূর্বে ও পরে হইয়াছিল, তাহার লক্ষ্য হইল মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে লাগাইয়া মন্ত্রীমণ্ডলকে অপদস্থ করিয়া তাহাকে লঘু প্রতিপন্ন করা। ইহাতে ডাক্তার খরে ও তাঁহার কোন কোন সঙ্গী, যেমন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের বিরোধী দল যোগ দিলেন। কাহারও কাহারও চিন্তা এই দিকে গেল যে মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিতে পারিলে সুভাষবাবুদের বিরোধীদের হীন করা যাইবে। আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা সহজ ছিল না, কিন্তু মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কিছু বলা বা কিছু করা সহজ ছিল। কারণ তাঁহাদের রাতদিন কিছু না কিছু করিতে হইত, আর কোনও বস্তু লইয়া তাহাতে ছিদ্র বাহির করা এমন কিছু কঠিন ছিল না। আমাদের এই কথা বলিবার ছিল যে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে যদি কোনও কংগ্রেসীর কোনও অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে সে কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে তাহা উপস্থিত করুক। পারলামেণ্টারী কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি এবং প্রয়োজন হইলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও সেই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহা দূর করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেই সকল অভিযোগ লইয়া শুধু বিরূপ মন্তব্য করা, অথবা মন্ত্রীসভাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা, কোনও কংগ্রেসীর পক্ষে অনুচিত হইবে। যাহাতে মন্ত্রীসভার উপর ও সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে, সেইভাবে সমস্ত বিষয়টি দেখাইবার চেষ্টা দেশে বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

বোম্বাই অধিবেশনে এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহাতে এই ধরনের সক্রিয় বিরোধের নিন্দা করা হয়, এবং ঐরূপ না করিবার জন্য কংগ্রেসীদের আদেশ দেওয়া হয়। সুভাষবাবু ও তাঁহার অনুযাত্রীরা এই প্রস্তাবের প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। আমরা ভাবিতেছিলাম যে কংগ্রেসের সভ্যেরা এই প্রস্তাব মানিয়া চলিবে এবং এই ধরনের আলাপ-আলোচনা ও কাজকর্ম

আর হইবে না। কিন্তু তাহা হইল না। অতি শীঘ্র এমন অবস্থা দাঁড়াইয়া গেল যে আমাদের নির্দেশ ভঙ্গের জন্য সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে হইল।

এই দুঃখের কাহিনী বলার পূর্বে একটি সুখকর ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। এদিকে কয়েক বৎসর হইতে গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের এক বার্ষিক উৎসব হইত, তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন সদস্যেরা এক নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হইয়া কয়েক দিন ধরিয়া মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেন। গান্ধীজীও তাহাতে যোগদান করিতেন। যেখানে অধিবেশন হইত, সেখানে সদস্যেরা সাধারণের কল্যাণকর কিছু কাজও করিতেন। খাদি, সুতাকাটা প্রভৃতির প্রদর্শনীও হইত। এইবার গান্ধী সেবা-সংঘের অধিবেশন বেতিয়া (চম্পারণ) জেলার নিকটে বৃন্দাবনে হওয়ার কথা ছিল। সেখানে কয়েক দিন পূর্ব হইতে পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র এক আশ্রম খুলিয়া বসিয়া আছেন। এই অঞ্চলে ওয়ার্ধা যোজনা অনুযায়ী, বিহার সরকারের দিক হইতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ও খোলা হইয়াছিল। সেখানকার কর্মীরা অতিশয় উৎসাহের সহিত অধিবেশনের জন্য সুবৃহৎ আয়োজন করিয়াছিল। মহাত্মাজীকে এক থলি টাকা উপহার দিবার কার্যক্রমও প্রস্তুত হইয়াছিল। উৎসবের দিন এমন ভাবে ফেলা হইয়াছিল যাহাতে কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধি-বেশনের পর মহাত্মাজীকে লইয়া আমরা সকলে সোজাসুজি সেখানে যাইতে পারি। এইজন্য অখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত করিয়াই মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও কলিকাতা হইতে বেতিয়া রওনা হইলাম। গান্ধী সেবা-সংঘের মেম্বর নহেন এমন অনেক সদস্যও অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য আসিলেন। এই সময়ে সংঘের অধিবেশন ভিন্ন, ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য সক্রিয় তালিমী সংঘের অধিবেশনও ঐ স্থানে করা হইয়াছিল। তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন বোম্বাই প্রদেশের প্রধান- ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত খের। তিনিও আমাদের সঙ্গে কলি-কাতা হইতে আসিলেন। অধিবেশন খুব সমারোহের সহিত হইল। জন-সাধারণও অতিশয় উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন। একে তো চম্পারণের লোকেরা গান্ধীজীকে গভীর প্রেম ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিত, তাহার উপর আবার এই ধরনের এত বড় অন্য কোনও সভা সেখানে কখনও হয় নাই। বাহির হইতে এত লোক সেখানে কখনও আসে নাই। অভ্যাগত ও অভ্যর্থনাকারী, উভয় পক্ষেই যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সমস্ত কিছুই সুচারুরূপে নির্বাহ হইল। গান্ধীজীকে টাকার থলিও দেওয়া হইল, তাহা তিনি কিছু হরিজন সেবা আর কিছু অন্য কাজের জন্য ভাগ করিয়া দিলেন। হরিজন সেবার টাকা তো হরিজন সেবক-সংঘকে দেওয়া হইল। স্থানীয় কাজ-

কর্মের জন্য যাহা ছিল, তাহা স্থানীয় লোকের হাতে দেওয়া হইল। কিছু মোটা রকম টাকা বিহারে শ্রমিক সংগঠনের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির এই অধিবেশনের অল্প দিন পরেই, যাহাতে স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেসের কোনও সভ্য এমন কোনও সক্রিয় ব্যাপারে যোগদান করিবেন না যাহাতে কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভার মর্যাদায় আঘাত লাগে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে কংগ্রেস কমিটির এই নির্ধারণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইবে। উপরে বলা হইয়াছে যে প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছিল। এখন সেই নির্ধারণ সোজাসুজি অবজ্ঞা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে—সংবাদপত্রে এই ঘোষণা পড়িয়া আমি সভাপতি হিসাবে সুভাষবাবুকে তার করিলাম যে এই প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন উচিত নহে এবং তিনি যেন ইহা হইতে সরিয়া আসেন। তিনি তাহা করিতে অস্বীকার করিয়া নিজের সংকল্প অনুসারে এমন বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলেন যাহাতে অনেক স্থানে কংগ্রেস কর্মীরাও যোগ দিলেন। আমাদের সম্মুখে এখন এই কঠোর প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে এই ধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন কংগ্রেস কত দিন সহ্য করিতে পারিবে। কংগ্রেসের ভিতর মতভেদ দূর করিবার একমাত্র উপায় কোনও বিষয়ে ভোট লওয়া। কিন্তু যতক্ষণ সেই নির্ধারণ ভোটাধিক্য দ্বারা পরিবর্তিত করা না হইতেছে ততক্ষণ কোনও কংগ্রেসী সভ্যের কংগ্রেসের নির্ধারণের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিলেও এবং বিরোধী মত প্রদর্শন করিলেও, কোনও বিরোধী ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়—বিশেষ করিয়া যদি সে ক্রিয়া কংগ্রেসের মর্যাদাকে আহত করে। এই বিক্ষোভকারীরা ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। আমাদের পক্ষে শাসনের পথ অবলম্বন করা ভিন্ন কোনও উপায় থাকিল না।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন করা হইল। সুভাষবাবুর নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল। তিনি কৈফিয়তে নিজের কর্মপদ্ধতি বিবৃত করিলেন এবং উহা সমর্থন করিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি অনেক আলোচনার পর স্থির করিল যে সুভাষবাবুর কার্য এমন হইয়াছে যে তাহার উপর বাধ্যতামূলক নিয়মানুবর্তিতা অনুসারে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই নির্ধারণ বড় সহজ ছিল না; সুভাষবাবু কংগ্রেসের এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুই দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন ও কংগ্রেসের কার্যাদি পরিচালনা করিয়াছিলেন। মতভেদ হওয়ায় তিনি তখনকার মতো ঐ পদ হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দেশসেবা, নির্ভীকতা ও ত্যাগ সকলেই স্বীকার করিত। এমন লোকের প্রতি দণ্ডবিধান কি করিয়া করা সম্ভব? সকলেরই মনে সংকোচ ছিল। জানি না কেন, আমার মনের

গহনে তাঁহার প্রতি ভালবাসাও ছিল, যদিও আমি তাঁহার সঙ্গে একত্র কোনও কাজ করিবার সুযোগ পাই নাই, আর আমাদের দুই জনের মধ্যে কখনও সেরূপ ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। অবশ্য তাঁহার অগ্রজ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে আমি পঠদ্দশার সময় হইতেই জানিতাম; কারণ আমরা দুই জনে একই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম, একই ছাত্রাবাসে থাকিতাম—তাঁহার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল, তাঁহার প্রতি কিছুটা প্রীতির ভাবও ছিল। কিন্তু প্রশ্ন ছিল ইহাই যে, কংগ্রেসের সমগ্র সংগঠনের উপর এই প্রকার আঘাত লাগিতে দেওয়া উচিত হইবে কি? নিজের ব্যক্তিগত ভাবের জন্য এই সার্বজনিক ও সার্বদেশিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় আঘাত-কারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা যাইবে না? এরূপ সময়ে, যেমন হইয়া থাকে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্তব্য পালনের ভাবনা ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রতিরুদ্ধ করিতে বাধ্য করিল। আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখের সহিত, কিন্তু কর্তব্যভাবনার প্রেরণায় নিরূপায় হইয়া, সুভাষবাবুকে কংগ্রেস কমিটি হইতে এক নির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কৃত করিলাম। অন্য যে-সব লোকেরা তাঁহার সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনে সংগী হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধেও কিছু করা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি এই কার্য নিজে না করিয়া প্রাদেশিক কমিটির উপর ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা তদন্ত করিয়া যেন যথারীতি ব্যবস্থা করেন।

সুভাষবাবু ত্রিপুরীর সময় হইতেই নূতন দল সংগঠন করিতেছিলেন। তাহার তিনি নাম দিয়াছিলেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। এখন তাহা অধিক উৎসাহে সংগঠিত হইল। ইহার পর ঐ দল ও কংগ্রেসের মধ্যে খোলা-খুলি বিরোধ চলিতে থাকিল। প্রাদেশিক কমিটিগুলিও এখানে ওখানে কিছু কিছু লোকের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আরও বাড়িয়া গেল। ঐ দলের পক্ষ হইতে সকল জায়গায় কংগ্রেসের বিরোধ হইতে থাকিল।

উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভা

এইবারের সভাপতিত্ব আমার পক্ষে দুঃখজনক হইল; এমন আবহাওয়া সৃষ্টি হইল যে সর্বত্র ঝগড়াই চলিতে থাকিল, অন্য কিছু করা কঠিন হইয়া পড়িল। আরও দুইটি ঝগড়া হইল; এখানে তাহার উল্লেখ করা ভাল হইবে। একটি উড়িষ্যায়, অন্যটি মধ্যপ্রদেশে। ইহাদের সম্বন্ধে

পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে স্থানে স্থানে এক এক দল লোক মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইভাবে উড়িষ্যাতেও কিছু কিছু লোক সেখানকার মন্ত্রী-সভার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ইহাও বলিয়াছি যে ১৯৩৮ সালের মার্চ বা এপ্রিল মাসে হরিপুরা কংগ্রেসের পরে পরেই ডেলাং-এ যখন গান্ধী সেবা-সংঘের বার্ষিক অধিবেশন হয় তখন এই ধরনের অভিযোগ আসিয়াছিল। সেখানে সরদার বল্লভভাই উপস্থিত ছিলেন, আমিও ছিলাম। আমরা উভয়পক্ষকে ডাকাইয়া নিজেদের মধ্যে আপোসে নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যে-সকল অভিযোগ ছিল তাহা অল্পবিস্তর সরাসরি তদন্তও করিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম যে মামলা মিটিয়া যাইবে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। পারলামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে কথাটা উঠিল। তাহার সভাপতি সরদার প্যাটেল শেষে বলিলেন যে অভিযোগ যাঁহারা করিবেন তাঁহারা যদি অভিযোগ ঠিকভাবে লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তদন্ত করাইবেন, কিন্তু উভয়পক্ষকে বুঝিতে হইবে যে অভিযোগের কারণ সত্য বলিয়া প্রমাণ হইলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, আর মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে, যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের কিছু পূর্বে কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে সুভাষবাবুর নিকটও অভিযোগ পৌঁছিয়াছিল। এই সকল কারণে তদন্ত করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদন্তের ভার সুভাষবাবু আমার উপর দিয়াছিলেন। আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। আমাকে একাধিকবার উড়িষ্যায় যাইতে হইয়াছিল; কয়েক দিন ধরিয়া উভয় পক্ষের কথা শুনিতে হইয়াছিল; সাক্ষ্য লইতে হইয়াছিল; অনেক কাগজ-পত্র পড়িতে হইয়াছিল। আমার রিপোর্ট যখন তৈয়ার হইল, তখন সুভাষ-বাবু সভাপতির পদ হইতে ইস্তফা দিয়াছেন—আমি সভাপতি হইয়া গিয়াছি। আর দীর্ঘ রিপোর্ট আদালতের মকদ্দমার রূপ ধারণ করিয়াছিল। পারলামেণ্টারী কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি তাহা গ্রহণ করিল। প্রধান অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইল। অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। কিন্তু কয়েক দিন পরে তাহারা মাপ চাওয়ায় বিধিমত দণ্ড প্রত্যাহার করা হইল।

এখানে এ-বিষয়ে এত বিস্তৃতভাবে লেখা এইজন্য আবশ্যক যে অভিযোগকারীদের পিছনে থাকিয়া যে-সকল ব্যক্তি সাহায্য করিতেছিলেন তাঁহারা পিছনে পিছনে আসিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র। তাঁহারা প্রথম হইতেই প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ

দাসের বিরোধিতা করিতেছিলেন। এই দুই জন ১৯২০-২১ সাল হইতেই কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। উড়িষ্যার অধিবাসীদের মধ্যে উভয়েরই প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক এসেমব্লীর যখন নির্বাচন হয়, তখন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস কেন্দ্রীয় এসেমব্লীর সভ্য ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক এসেমব্লীর জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন নাই, কিন্তু নির্বাচনে তিনি সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের দিক হইতে প্রচারকার্যও করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র প্রাদেশিক এসেমব্লীর জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন এবং নির্বাচিতও হইয়াছিলেন। নির্বাচনের পর যখন মন্ত্রীসভা গঠন করিবার সময় আসিল তখন সেখানকার এসেমব্লীর সদস্যেরা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসকে—যিনি ঐ এসেমব্লীর সদস্য ছিলেন না—নির্বাচন না করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ দাসকে নেতা নির্বাচন করিলেন। মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে বিশ্বনাথ দাসই প্রধানমন্ত্রী হইলেন। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ইহাতে অতিশয় রুষ্ঠ হইয়াছিলেন। যে-সকল অভিযোগ আসিত তাহাতে বিশ্বনাথবাবুর নৈতিক চরিত্র ও মনুষ্যত্বের প্রতি আক্রমণ থাকিত। এই জন্য তদন্তের পূর্বে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে অভিযোগ প্রমাণ না হইলে, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। অভিযোগকারী নীলকণ্ঠ দাসের সহকর্মী ছিলেন, পরে হয়তো তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া থাকিবেন। সে-সময়ে তাঁহাদের জারিজুরি কিছুই চলিল না, কারণ অভিযোগ ভুল ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। কংগ্রেস হইতে সুভাষবাবু পৃথক হইয়া যাইবার পর পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং কেন্দ্রীয় এসেমব্লীতেও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে কংগ্রেসী সদস্যের তাহা হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া তিনি কেন্দ্রীয় সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাহাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল যে কংগ্রেসের অনুশাসন মানিয়া চলিবেন। কিন্তু কিছু কাল পরেই তিনি ঐরূপ করিতে অস্বীকার করিলেন। কংগ্রেস পার্টি হইতে তিনি পৃথক হইয়া গেলেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা যখন পদত্যাগ করিল তখন অন্যান্য স্থানের মতো উড়িষ্যার মন্ত্রীসভাও ভাঙিগয়া গেল। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও গোদাবরীশ মিশ্র ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারা যায়। কিন্তু যখন কংগ্রেসী সদস্যদের অধিকাংশকে তাঁহারা দলে পাইলেন না, তখন জমিদার-পার্টির সঙ্গে যোগ দিয়া, যাহার নেতা ছিলেন পারলাখেমেড়ির রাজা, তাঁহারা মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। শ্রীগোদাবরীশ মিশ্র মন্ত্রী হইলেন; স্বয়ং মহারাজা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁহারা কংগ্রেসের কোন কোন সভ্যকে জুটাইয়া লইলেন, কিন্তু অধিকাংশকে জেলে বন্দী করিয়া

কোনও প্রকারে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করিয়া লইলেন এবং এখনও মন্ত্রী-সভা টিকিয়া আছে। কিন্তু যে-সময়ে এই লাইন কয়টি লেখা হইতেছে (১৯ জুন, ১৯৪৪), তখন সংবাদপত্র পড়িয়া বুঝিতেছি যে মহারাজ ও মিশ্রজীর মধ্যে কিছু মনোমালিন্য হইয়া গিয়াছে, এবং মন্ত্রীসভা সংকটাপন্ন। শোনা গিয়াছে যে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্রের মধ্যেও কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া মন্ত্রীসভা গঠনের সময়ে যে-সদ্ভাব ছিল তাহা এখন আর নাই।

মধ্য প্রদেশেরও এই ধরনের কিছু কিছু অভিযোগ ছিল, তাহার আভাস পূর্বে দিয়াছি। মন্ত্রীসভা গঠন করিবার পূর্বেকার কথাও কিছু কিছু ছিল। মন্ত্রীসভা গঠন করিবার সময় ডক্টর খরে ও পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র এক সঙ্গে ছিলেন, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল; তখন শ্রীরবিশঙ্কর শুক্লকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হইত। কিন্তু ডক্টর খরের নীতি ও কর্মপদ্ধতি হইতে মিশ্রজী প্রভৃতি এত সরিয়া আসিয়াছিলেন ও ডক্টর খরে তাঁহাদের প্রতি এত বিরূপ হইয়াছিলেন যে এখন মিশ্রজী ও শুক্লজী একত্র হইয়া কাজ করিতেছিলেন, আর ডক্টর খরে ছিলেন তাঁহাদের বিরোধী! এই কারণে সেখানকার মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ডক্টর খরেকে সরিয়া পড়িতে হইয়াছিল আর নিজেদের ঝগড়া এ-পর্যন্ত একই গতিতে চলিতে-ছিল। ডক্টর খরে তো হটিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার কিছু কিছু সঙ্গী ও সহকর্মী ঝগড়া চালাইয়া যাইতে থাকিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুরানো পচা অভিযোগ ও কিছু কিছু নূতন কথা লইয়া পার্লামেণ্টারী কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে মন্ত্রীসভা ও বিশেষ করিয়া মিশ্রজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। প্রথমে শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের উপর এই সকল অভিযোগ তদন্ত করিবার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু উঁহার সহিত সাহায্যকারীদের মতভেদ হইয়া গেল। শেষে আমাকে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে এই মকদ্দমাও দেখিতে হইল। আমি ইহাতেও উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া অনেক কাগজপত্র ঘাঁটিয়া রায় দিলাম, তাহা ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে পেশ হইয়া গৃহীত হইল। কেহ কেহ ব্যাপারটি শেষ হইয়া গেলেও অনেক কিছু লিখিতে ও বলিতে থাকিল, কিন্তু একবার রায় দিয়া ফেলিলে ও তাহা সংবাদপত্রে প্রচারিত হইলে সব ঠাণ্ডা পড়িয়া গেল।

আমার অধিকাংশ সময় এই ধরনের কাজেই লাগিয়া যাইত; তাই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত, এবং ঠিক ভাবে গঠন-কর্ম করিবার সুযোগ মিলিত না। এইবার প্রেসিডেণ্ট হইবার আরও একটি ফল ইহাই দাঁড়াইল যে নিজের প্রদেশের সহিত যে-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এতদিন ছিল তাহা কমিয়া আসিল। সময়াভাবে আমি প্রদেশের কাজকর্ম ও আলাপ-আলোচনায় ততখানি মন দিতে পারিতাম না, প্রদেশ ভ্রমণেরও কিছু করিতে পারিতাম

না। ১৯৩৪, '৩৫ এবং '৩৬ সালেও যখন প্রেসিডেণ্ট ছিলাম আর বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শনেই সমস্তটা সময় লাগাইয়া দিতাম, তখন বিহারে মোটেই সময় দিতে পারি নাই। এবারেও সেই কথা, যদিও এবারে পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাওয়া গেল না। কিন্তু এবার বিহারে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য কোথাও কোথাও অবশ্যই যাইতে হইয়াছিল। যখন নিখিল ভারতের কাজ হইতে ছুটি পাইতাম, তখন এদিকে ছুটিয়া আসিতাম, অথবা উভয়ের মাঝে এদিক-ওদিক ছুটিতাম।

রামগড় কংগ্রেসের জন্য স্থান নির্বাচন

ত্রিপুরী হইতে ফিরিয়াই আমাদের চিন্তা হইল, বিহারে কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় করা যায়। এদিকে কয়েক বৎসর হইতে গ্রামেই অধিবেশন হইতেছিল। আমরাও কোনও গ্রামেই করিতে চাহিতেছিলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, সোনপুরে অধিবেশন করিব। উহা তিনটি জেলার কিনারায়। প্রতি বৎসর সেখানে ভারত বিখ্যাত খুব বড় মেলা হয়। তাহাতে সমগ্র দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসে। লক্ষ লক্ষ গো, মহিষ, হাতি, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ার বিক্রয়ের জন্য আনা হয়। এ-জন্য সেখানে অনেক বাগিচা আছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য জলের ব্যবস্থা সহজ নয়, এজন্য অনেক কুয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। মেলার সময় জলের কলও চালু করা হয়, তাহা জেলা বোর্ড তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছে। মেলা হয় কার্তিকী পূর্ণিমায়। কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে প্রায় তিন মাস দেরি। এইজন্য মেলায় আমি বাঁশ খড় চাটাই ইত্যাদি অনেক জিনিসপত্র সস্তায় কিনিয়া রাখিতে পারিতাম। প্রতিনিধিদের বাসস্থান নির্মাণ মেলার পরেও আরম্ভ করিয়া সহজে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। এ-সকল সুবিধা ছাড়া গণ্ডক নদীর ধারে বলিয়া বাঁশ, কাঠ, শন প্রভৃতি নদী দিয়া সহজে আনা যাইতে পারিত। গঙ্গার উত্তর তীরের জেলাগুলি, বিহারে কংগ্রেসের কার্যকলাপের জন্য, খুব পরিচিত স্থান বলিয়া গণ্য হইত। ইতিপূর্বে দুইবার কংগ্রেসের অধিবেশন বিহারে হইয়া গিয়াছে, দুইবারই গঙ্গার দক্ষিণ তীরে—পাটনা ও গয়ায়। উত্তরের লোকদের বড়ই ইচ্ছা ছিল যে উত্তর বিহারেও এক অধিবেশন হয়। এ-সকল কথা ভাবিয়া আমার মনে হইল এখানেই অধিবেশন করা হউক। কিন্তু সকলের মত

লইবার ছিল। সবচেয়ে বেশি দেখিবার ছিল যে, যে-নগর আমরা বসাইব, স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে কোথায় তাহা বসাইলে অধিক সুবিধা হইবে। এজন্য ত্রিপুরী হইতে ফিরিয়া আমরা দু-চার জন সেই সব জায়গা দেখিতে গেলাম যাহা অধিবেশনের পক্ষে উপযুক্ত মনে হইতেছিল। ত্রিপুরীতেই আমি শ্রীরামদাস গুলারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, যে বিহারের কংগ্রেস অধিবেশনের নির্মাণকার্যে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার আসা চাই। তিনি সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুলারীজী ছিলেন এক মর্মজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু এখন মহাত্মাজীর সঙ্গে সেবাগ্রামে বাস করিতেছিলেন।। ফৈজপুরে যখন প্রথম প্রথম গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন করিবেন বলিয়া গান্ধীজী স্থির করিলেন, তখন সেখানে নির্মাণকার্যে সাহায্য করিবার জন্য গুলারীজীই গিয়াছিলেন। ত্রিপুরীতেও তিনিই কংগ্রেস নির্মাণ কার্য করাইয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিবে বলিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তিনি যথাসময়ে আসিয়া গেলেন। স্থান নির্বাচনেও উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে-সকল স্থান উপযোগী মনে করিয়াছিলাম তিনিও সেই সকল স্থানে গিয়াছিলেন।

এই কার্যের জন্য আমরা পাটনার রাজগির নামক স্থানও দেখিলাম। উহা বড়ই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থান। জরাসন্ধের রাজধানী ও বুদ্ধদেবের নিবাসস্থান বলিয়া উহার গৌরব। বৌদ্ধ ও জৈন যুগেও উহা অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। নালন্দার সেই মহান বিদ্যাপীঠও ওখান হইতে অল্প দূরে অবস্থিত, যেখানে এক সময় হাজার বিদ্যার্থী ও ভিক্ষু বিদ্যাভ্যাস করিতেন—যেখান হইতে বিদ্বান্ ভিক্ষু ও পরিব্রাজক প্রচারক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন—যেখানকার বিধ্বস্ত বিহার ও ভগ্নাবশেষের খননকার্য হইতে বহির্গত বাড়িঘর ও নানা প্রকারের সরঞ্জাম আজও লোককে চমকিত করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে স্থানটি বড়ই উপযুক্ত, প্রাকৃতিক দৃষ্টিতেও রমণীয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল। কিন্তু আধুনিক সুবিধার অভাব! সবচেয়ে বেশি, ওখানে যাওয়ার অসুবিধা! জলেরও অভাব! এই সব কারণে উহা ছাড়িয়া দিতে হইল। পরে ইহাও মনে হইল যে পাটনার নিকটেই ফুলওয়ারি শরিফে অধিবেশন করিলে হয়। কিন্তু এস্থানও পাটনার এত নিকটে যে উহা শহরেরই অধিবেশন মনে হইত, যদিও শহরের সুখ-সুবিধা ওখানে পাওয়া যাইত না। ওদিকে ছোটনাগপুরের লোকদের, বিশেষ করিয়া হাজারীবাগের কর্মদক্ষ কংগ্রেসী বাবু রামনারায়ণ সিংহের, খুব আগ্রহ ছিল যে ছোটনাগপুরেই কোনও জায়গা বাছা হউক। তাঁহার সর্বদাই অভিযোগ ছিল যে আমরা ছোটনাগপুরকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। ছোটনাগপুরও নজরে থাকিল। আমরা শেষে হাজারিবাগেরই রামগড় পছন্দ করিলাম। ইহার বিশেষ কৃতিত্ব

শ্রীরামদাস গুলোরীরই প্রাপ্য; কারণ তিনি স্বাস্থ্যের দিক হইতে ইহাকে অধিক উপযোগী বলিয়া মনে করিলেন। আমারও ধারণা ছিল যে ঐ সুন্দর শোভাময় বনের মধ্যে দামোদর নদীর তীরে অধিবেশন স্বকীয় ভংগীতে অতুলনীয় হইবে।

স্থান তো নির্বাচিত হইল, কিন্তু অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত স্থানে ছিল জংগল! উহা পরিষ্কার করিতে হইবে, ওখানে প্রায় সব কিছু প্রস্তুত করিতে হইবে। আরম্ভেই আমি শ্রীঅম্বিকাকান্ত সিংহকে সেখানে পাঠাইলাম। তিনি সেখানে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম ও প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। আমিও কিছুদিন পর্যন্ত রাঁচীতে থাকিলাম, সেখান হইতে রামগড় প্রায় ৩০/৩২ মাইল দূরে। নক্সা প্রভৃতি গুলোরীজী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। জংগল কাটিতে লাগিলেন। কার্য অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি সহকর্মীদের লইয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য এখানে ওখানে ঘুরিতে লাগিলাম। প্রধানতঃ তাঁহাদের মধ্যে বাবু মথুরাপ্রসাদ আমার সঙ্গে প্রায় সকল স্থানে গিয়াছিলেন। দৌড়-ধাপ করিতেছিলাম। বর্ষায় কাজ বেশি অগ্রসর হইল না। তথাপি সকল কাজের একটা ছায়া তো করিয়া লইয়াছিলাম। আমি রামগড়েই ছিলাম। তখনও হাঁপানিতে ভুগিতেছিলাম। ঐ জায়গায় থাকিতে থাকিতেই খবর পাইলাম যে জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সংগেও তাহার লড়াই বাধিয়াছে। সে সময় জার্মানী, লড়াইয়ের কয়েক দিন পূর্বে, রুশের সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছিল।

এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনার পর ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে, কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়াই, ওয়ার্কিং কমিটি কথাটি সেইখানেই ছাড়িয়া দিয়াছিল; কারণ লড়াই শুরু হয় নাই, আর চেম্বারলেন চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলারের হাতে ছাড়িয়া সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন। এখন কংগ্রেসকে যাহা হউক একটা কিছু স্থির করিতে হয়। ওদিকে জওয়াহরলালজী এই সময়ে চীনে গিয়াছিলেন। ভাইসরয়ের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হইল। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ওয়ার্ধায় করা হইল। আমি অবশ্য অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু কোনও ক্রমে ওয়ার্ধা পৌঁছাইয়া গেলাম। মহাত্মাজী মহাদেব দেশাইকে পাঠাইয়াছিলেন, যাহাতে যেরূপেই হউক

তিনি আমাকে অবিলম্বে ওয়ার্ধায় লইয়া আসেন। কয়েকদিন ধরিয়া ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলিল। ইতিমধ্যে জওয়াহরলাল নেহরুও চীন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ব্যাপারটি বড়ই কঠিন ছিল। এই কথা হইল, যদিও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আছেন তথাপি তাঁহাকেও এই অবস্থায় আহ্বান করা উচিত, তাঁহারও মত লওয়া উচিত। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবর্গ, যাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে ছিলেন না, তাঁহাদেরও ডাকিয়া লওয়া হইল।

ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে গান্ধীজী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইংলণ্ডের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে আমাদের কোনও শর্ত না করিয়াই ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহাতে কাহারও ভুল ধারণা হইয়া থাকিবে। পরে যখন কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে দাবি করা হইল যে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ-বিষয়ে ও যুদ্ধোত্তর শান্তি-বিষয়ে নিজের ধারণা ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলুন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ মন খুলিয়া সাহায্য করিতে পারিবে, তখন ইংরেজরা এই কথা বলিবার সুযোগ পাইল যে গান্ধীজী তাঁহার প্রকাশিত বিবৃতি হইতে সরিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যে অনেকের একথা ভাল লাগে নাই যে তিনি এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে বিনা শর্তে সাহায্য করিতে সম্মত আছেন। কথাটা এই যে উভয় পক্ষের আলোচনাই আংশিক। গান্ধীজী কখনও ভাবেন নাই যে ভারতবর্ষ হইতে অর্থ ও লোকবল দিয়া সাহায্য করা হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশের সহানুভূতি ইংরেজদের পক্ষে এক এমন বহুমূল্য বস্তু হইবে যে সমগ্র পৃথিবীর সহানুভূতি তাহার সঙ্গে থাকিবে। তিনি এই সহানুভূতির কথাই ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তখনকার দিনে এই শ্রেণীর বিবৃতিতে লোকের মধ্যে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে প্রশ্ন ছিল যে এই যুদ্ধের বিষয়ে উহা কি স্থির করিবে; কংগ্রেস এই যুদ্ধে সাহায্য করিবে কি না, যদি করে তো বিনা শর্তে, না কোনও শর্তাধীনে? সাহায্যের রূপ কি হইবে? কংগ্রেস তাহার লক্ষ্যের মধ্যে অহিংসা উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই হিংসাত্মক যুদ্ধে এক অহিংসাত্মক প্রতিষ্ঠান কি করিয়া এবং কিরূপ সাহায্য করিতে পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কমিটি কয়েক দিন আলোচনার পর এক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিল আর এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। তাহাতে নাৎসীবাদ ও ফাসিস্তবাদের সহিত বিরোধের কথা বলিয়া কমিটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও বিরুদ্ধভাব বিবৃত করিয়াছিল এবং ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিল যে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই যুদ্ধে আন্তরিকভাবে

যাহাতে সাহায্য করিতে পারে সেজন্য যুদ্ধ-বিষয়ে তাহাদের উদ্দেশ্য সরকারীভাবে প্রচার করে।

এই প্রস্তাবের ভাষা বড়ই সুন্দর, ভাবও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও উপযুক্ত ছিল। ইহার কৃতিত্ব বিশেষ করিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলালেরই প্রাপ্য, তিনি মুসাবিদা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে স্পষ্ট জানা গিয়াছিল যে কংগ্রেস তাহার অহিংস নীতির জন্য এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করিতে পারিতেছে না, তবে যদি সুযোগ পায় তবে সে অস্ত্র দিয়াও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। এ-কথা বলিয়া দেওয়া এজন্য আবশ্যক যে ইহার পর যখন যখন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে কংগ্রেসের বিরোধী ইংরেজ—বিশেষ করিয়া ভারতমন্ত্রী মিঃ এমরী ও ভারত সরকারের উচ্চ কর্মচারীরা যাঁহাদের মধ্যে লর্ড লিনলিথগো পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত—ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে গান্ধীজীর অহিংসার জন্যই কংগ্রেস সাহায্য দিতে পারে নাই। ইহা ঠিক যে ঐ অধিবেশনে এ-কথা ততখানি স্পষ্ট হয় নাই, কিন্তু ঐ ভঙ্গী হইতে এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল যে ব্রিটিশ সরকার যদি সন্তোষজনকভাবে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিত তাহা হইলে কংগ্রেসকে সাহায্য করিতেই হইত, আর সে-সাহায্যকে হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করিতেই হইত। তখন সমস্ত দেশে—বিশেষ করিয়া অধিকাংশ কংগ্রেসী লোকের মনে—ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি ছিল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যদি একটুও পরিচয় দিত যে তাহারা সত্যই এ-লড়াই জনসাধারণের জন্য করিতেছে, যে-কথা সে-সময়ে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মধ্যে কেহ কেহ গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, তাহা হইলে ভারতের প্রায় সকলে মন খুলিয়া তাহাদের সঙ্গে আগাইয়া যাইত। কিন্তু এ-লড়াই দুনিয়ার সহানুভূতি পাইবার জন্যই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তো উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা ও পুষ্টির জন্যই হইতেছিল, তাহা পরে স্পষ্ট হইয়া গেল!

এই প্রস্তাবের পর প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমার দুই বার লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল—একবার পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে, দ্বিতীয়বার মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সঙ্গে। সে-সময় লর্ড লিনলিথগো ভারতের সকল দলের ও সর্বপ্রকারের মতবাদের লোকের সঙ্গে মিলিয়া, লড়াইতে ভারতবর্ষের সাহায্যের কথা বলিতেছিলেন, চাহিতেছিলেন যেন ভারতবাসীরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সাহায্য করে, কোনও প্রকারের গণ্ডগোল হইতে না দেয়। লড়াই শুরু হইতেই কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়া, না পরামর্শ করিয়াই তিনি ব্রিটিশ সরকারের দিক হইতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষও যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে! ভারতবর্ষের আইনসভা (লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লী) চলিতেছিল। সমস্ত

প্রদেশেই ১৯৩৫-এর গঠনবিধি অনুসারে মন্ত্রীসভা কাজ করিয়া যাইতেছিল, তাহার মধ্যে এগারোটির আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইল না, কাহারও মত লওয়া হইল না, যেন ভারতবর্ষের কোনও প্রতিষ্ঠান অথবা কোনও ব্যক্তির এই লড়াইয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নাই! জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই ভারতবর্ষকে যুধ্যমান দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইল! কংগ্রেস কমিটিও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। ভারতবর্ষের অন্য লোকেরাও ইহা পছন্দ করিতেছিল না। এ অবস্থায় যতক্ষণ তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হয়, কাহারও জন্য কিছু করা সম্ভবও ছিল না, উচিতও ছিল না। লর্ড লিনলিথগো পরে এই কারণে লোকদের সঙ্গে মতামতের কথা বলিতে থাকেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থাও রাখিয়াছিলেন যে তিনি (ভাইসরয়) তাঁহার একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া দিবেন, আর তাহাতে ভারতবাসীর সংখ্যা বেশি রাখিবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দেন যে তাঁহার নূতন ও পুরাতন সদস্যদের মধ্যে অধিকারের কোনও পরিবর্তন হইবে না। তাঁহার মতে এসব সদস্য আপনাপন বিভাগের সরদার মাত্র, ইঁহাদের কোনও স্বতন্ত্র অধিকার নাই, কাউনসিলের অধিবেশন তো হয় শুধু সদস্যদের পরস্পরের বিভাগের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত করাইবার জন্য, এখানে কোনও কোনও বিষয়ের উপর তাঁহারা শুধু আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু সকল গুরুতর প্রশ্নের সমাধানের ভার পরিণামে ভাইসরয়ের উপরই আছে, তাঁহারই অধিকারও বটে—লড়াইয়ের সময়ে তিনি কোনও বিধানের পরিবর্তন করার সম্ভাবনা দেখেন না, আর তাই বলিয়া যাহা কিছু হইতে পারিত তাহা ১৯৩৫-এর বিধানের ভিতরই হইতে পারিত।

কংগ্রেসের দাবি ছিল দুইটি। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া ধরা হউক; আর সেই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতিকে স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার রূপ দেওয়া হউক এবং সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের শাসন সম্পর্কে এমন অধিকার দেওয়া হউক যাহার দ্বারা তাঁহারা সত্য সত্যই ভারতের ইচ্ছানুসারে এখানে ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং যুদ্ধেও প্রকৃত সাহায্য করিতে পারেন। ভবিষ্যতের ঘোষণার গুরুত্ব কিছুটা কম করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ অবিলম্বে অধিকার না পাওয়া যায় ততক্ষণ যুদ্ধে জনসাধারণ আগ্রহ দেখাইবে না, মন হইতে সাহায্যও করিতে পারিবে না। তখন হইতে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতি কখনও যুদ্ধে বাধা দেওয়ার নয়। কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও জগতের হিতকর বলিয়া মনে করিত না। অন্ততঃ পূর্ববর্তী বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কখনও মনে করে নাই।

সে আশায় ছিল এবং আশায় আছে, সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে প্রকৃত প্রজাতন্ত্রবাদ আসিবে। সে চাহিতেছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরিবর্তিত হইয়া প্রকৃত প্রজাতন্ত্রবাদের রূপ ধারণ করিবে। যে-সকল দেশ ও উপনিবেশ এই সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রের নীচে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে ভারতই হইল প্রধান, এবং স্বভাবতই এখানকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করে। ইংরেজও এই উদ্দেশ্যের নিন্দা করে না। সেও ইহাদের স্বাধীনতাকে নিজের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে। সে শুধু বলে যে ভারতবর্ষ এবং তাহার অধিকৃত অন্যান্য দেশ ইহার উপযুক্ত নয়। এজন্য ইংরেজ মনে করে যে যোগ্যতা অর্জন করা অবধি তাহাদের শাসনভার নিজের হাতে রাখা তাহার কর্তব্য। আমরা ভারতবাসী এ-কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই, আর ইহাই হইল আমাদের মতভেদ ও সংঘর্ষের কারণ। লড়াইয়ের আরম্ভে প্রজাতন্ত্রের সম্বন্ধে লম্বা চওড়া কথা শোনা গিয়াছিল, কংগ্রেস একটা প্রশ্ন করিয়া এই প্রচারের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করিয়া দিল। প্রশ্ন তো এই মাত্র যে এই প্রজাতন্ত্র কি ভারতের জন্যও হইবে—এশিয়া ও আফ্রিকার পদদলিত জাতিদের জন্যও হইবে—না শুধু ইংরেজ ও ইউরোপের অধিবাসীদের জন্যই হইবে—যদি এশিয়া ও আফ্রিকার লোকদের জন্যও হয় তবে খোলাখুলিভাবে, স্পষ্ট ভাষায় সে-কথা বলা হউক, আর এখনই যথাসাধ্য অধিকার সমর্পণ করিয়া খোলাখুলিভাবে সকলকে আশ্বস্ত করা হউক।

১৯৩৯-এর নভেম্বর হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ পায় নাই। শব্দের আড়ম্বরে প্রথমে আসল কথা লুকাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই কথাটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অক্ষত রাখিবার। যেমন যেমন সময় যাইতে লাগিল, কথাটা আরও পরিষ্কার হইল। সে-সময়ে লর্ড লিনলিথগো হাজার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল তাঁহার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। তবে মুসলিম লীগকে খুশী করিবার জন্য তিনি কিছুদিন পরে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে ১৯৩৫-এর বিধান লইয়া যুদ্ধের পর নূতন করিয়া আলোচনা করা যাইবে। সেই বিধানের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিল কংগ্রেস, আর নরম দলের কিয়দংশ ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দল তাহার অনুযায়ী কাজ করিবে বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করে নাই। এই কারণে, যুদ্ধের পরে উহা এক প্রকার আমূল সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি শুধু মুসলিম লীগ নয় হয়তো অন্যদেরও সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এমনটা বোঝা যাইতেছিল না; কারণ তাঁহার তখনকার ও পরবর্তী কাজকর্ম হইতে একমাত্র উদ্দেশ্যই সূচিত হয়। তিনি চাহিতেছিলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্য এক প্রতিষ্ঠান দাঁড়

করাইতে, আর এদিকে ভারতবর্ষকে বলিতেছিলেন যে যত দিন এই দুই প্রতিষ্ঠান মিলিত দাবি উপস্থিত করিতে না পারে, তত দিন আমরা কোন কিছু করিতে বাধ্য নহি, আবার ওদিকে দুনিয়াকেও বলিতে পারেন যে ইংরেজ তো অধিকার দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা এতই অপদার্থ যে তাহারা নিজেদের মধ্যে মিলনই ঘটাইতে পারে না, এইজন্য সেখানে ব্রিটিশ সরকারের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক ও অনিবার্য। এ-বিষয়ে লর্ড লিনলিথগো তাঁহার সময়ে অনেকখানি সফলও হইয়াছিলেন। সে-সময়ে এই সব দেখা সাক্ষাতের ফল এই দাঁড়াইল যে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে আমরা কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। তিনি গভর্নমেণ্টের দিক হইতে যে-ঘোষণা বাহির করিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার বলিয়া দিতে হইল যে তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি।

ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমাদিগকে ইহাও স্থির করিতে হইল যে কংগ্রেসের সদস্যেরা মন্ত্রীসভায় থাকিতে পারে না, আর প্রদেশেও শাসনভার নিজেরা লইতে পারে না। এই নির্ধারণ অনেক আলাপ-আলোচনার পরই ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি স্থির করেন। কংগ্রেসের ভিতর এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা এই নীতি পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, অল্প-বিস্তর যে-অধিকার আমরা পাইয়াছি তাহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। তাঁহারা ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে নিজেদের হাতে এই সব অধিকার রাখিয়া আমরা দেশের অধিক সেবা করিতে পারিব, যুদ্ধ হইতে আমাদের যে-ক্ষতি হইতে পারে তাহা হইতে বাঁচিতে অথবা যুদ্ধ হইতে আমাদের যে-লাভ হইতে পারে তাহা পাই ত— উভয় ক্ষেত্রেই অধিকার রাখিয়াই আমরা অধিক অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। অধিকাংশের মত ছিল এই যে, যুদ্ধ যতই ভীষণ হইতে ভীষণতর অবস্থায় উঠিবে প্রদেশগুলির অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার ততই নিজের হাতে লইতে থাকিবে; মন্ত্রীসভা নিজের নিজের প্রদেশে কিছু কাজ করিবার অধিকার তো রাখিতে পারিবে না, কিন্তু যাহা কিছু নষ্ট হইবে তাহার জবাবদিহি তাহাদেরই করিতে হইবে— কেন্দ্রীয় সরকারে ভারতীয়দের কোনও অধিকার নাই বলিয়া সেখানে যে কোনও ভারতীয় সদস্য ভাইসরয়ের সঙ্গে কাজ করিবে তাহারই, যুদ্ধমন্ত্রী ও ভাইসরয়ের 'হাঁ'তে 'হাঁ' মেলানো ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না, চাহিলেও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার কোনও বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে না। যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে পুরা সাহায্যের আশা করা হইবে। জনসাধারণ তো খুশি হইয়া সাহায্য করিবে না, কারণ তাহাদের সামনে ভবিষ্যতের কোনও উজ্জ্বল আশাও নাই বর্তমানে তাহাদের প্রতি-

নিধিদের কোনও অধিকারও নাই, তাই ব্রিটিশ সরকারের আদেশ মতো সাহায্য করিতে না পারিলে মন্ত্রীসভার জনসাধারণের উপর খানিকটা জোর-জবরদস্তিও করিতে হইতে পারে, যাহা কোনও প্রকৃত লোকহিতব্রতী প্রতিষ্ঠান এ-অবস্থায় করিবে না; এজন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাও এরূপ করিতে অসমর্থ হইবে—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকেও লড়াই করিতেই হইবে, আর তাহার সাহায্য—খুশিতেই হউক আর জবরদস্তিতেই হউক—পাওয়াই চাই। মন্ত্রীসভার নিকট হইতে এই সাহায্যের আশা সে পোষণ করিবে এবং আশা পূর্ণ না হইলে ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক—সুতরাং যদি আমরা শুষ্ক জবাবদিহির ভার না গ্রহণ করি, তাহা হইলেই ভাল হয়, নতুবা জনসাধারণ ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েরই লাথিজুতা আমাদের খাইতে হইবে, আর তাহা যদি সহ্য করিতে না হয় তবে উভয়ের অন্ততঃ ধমক তো খাইতে হইবে—বিশেষত এই অবস্থায় যখন আমরা কংগ্রেসের সভ্যেরা যে-অবস্থা বর্তমান এবং যাহা যুদ্ধের জন্য আরও জটিল হইবে, তাহা সামলাইবার শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছি; আর যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সত্যই ভারতবর্ষের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে ও তাহাকে স্বাধীন করিতে চাহে তাহা হইলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাহার আচরণ হইতেই, আর যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহা না চায়—তবে কংগ্রেসের সরিয়া যাওয়াই উচিত হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি স্থির করিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে তাঁহারা কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দিবেন। ওয়ার্ধায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইল। সে-কমিটি এই ব্যাপারের মীমাংসা করিতে, ও প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে আদেশ করার অধিকার ওয়ার্কিং কমিটিকে দিলেন। যখন ভাইসরয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ও গভর্নমেণ্টের ঘোষণা হইতে ওয়ার্কিং কমিটি সন্তুষ্ট হইল না, তখন উহা কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে নির্দেশ দিল যে নিজ নিজ প্রদেশের আইন-সভায় দেশের দাবি যেন তাঁহারা সমর্থন করাইয়া লন এবং তাহার পর পদত্যাগ করেন। তাঁহারা সেইরূপই করিলেন। ১৯৩৯-এর নভেম্বরে সমস্ত প্রদেশের মন্ত্রীসভা ভাঙিগয়া গেল। কংগ্রেসের ভোটাধিক্য এত ছিল যে অন্য কেহ মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারিত না; কারণ গঠন করা মাত্র তাহার উপর অনাস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারিত। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো গভর্নর ও ভাইসরয় ইহাই পছন্দ করিতেন যে এ-প্রকারের মন্ত্রীসভার পরিবর্তে (যাহারা মাঝে মাঝে মৃদু গুঞ্জনই করিতে পারিত) কোনও মন্ত্রী না থাকাই তাঁহাদের পক্ষে ভাল—তাহা হইলে তাঁহাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার পুরা সুযোগ থাকিবে। এইজন্য তাঁহারাও ঐ সকল

প্রদেশে বিধানের ৯৩ ধারা সনভার নিজের হাতেই তুলিয়া লইলেন। এখন শুধু কাজ চালাইবার জন্যই নয়, নূতন আইন প্রণয়ন করিবার ও পুরাতন আইন বদলাইবার বা রদ করিবারও পূর্ণ অধিকার গভর্নরের হাতে আসিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ১৯৩৫-এর বিধানে এক দিন সংশোধন করিয়া লইলেন যাহার ফলে ভাইসরয় ইচ্ছা করিলেই প্রদেশের গভর্নমেণ্টের অধিকার নিজের হাতে লইতে পারেন অথবা উহাদের দিয়া নিজের আজ্ঞা পালন করাইতে পারেন। যুদ্ধের খারাপ অবস্থার অজুহাতে এরূপ করা হইল, কিন্তু উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা গেল, আর মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিলে তাহার পথ তো আরও পরিষ্কার হইয়া গেল।

কেহ কেহ আজও জোর করিয়া বলেন যে যদি মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ না করিত, নিজের নিজের স্থানে শক্ত হইয়া বসিত, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধের নামে যে-সব বিশৃংখলা ও অত্যাচার হইয়াছিল তাহা হইতে পারিত না। যাঁহারা এই ধরনের কথা বলেন তাঁহারা বিধানের সংশোধক ধারাটি ভুলিয়া যান এবং ইহাও ভুলিয়া যান যে, যে-প্রদেশে মন্ত্রীসভা স্থায়ী হইয়া রহিল সেখানেও কেন্দ্রীয় সরকারের গণ্ডগোল চলিয়াছে—বাংলা দেশের মন্ত্রীসভা ইহার জাগ্রত প্রমাণ। সেখানে মন্ত্রীসভা গড়িতে ও ভাঙিতে গভর্নর সম্পূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সেখানকার সাধারণ লোকেরা লাখে লাখে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মারা গিয়াছে, যে-সকল কারণে সেখানকার ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটিল সেগুলিও দূর করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ হইলে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ না-করা পর্যন্ত জনসাধারণের কোনও প্রকার সাহায্যও করিতে পারে নাই—তথাকথিত সকল অধিকার থাকা সত্ত্বেও না ফজলুল হক সাহেবের না স্যর নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীসভা বাংলাকে এই বিপদ হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছিল। এই হিসাবে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মন্ত্রীসভার কাজও নির্দোষ প্রমাণিত হইল। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট তাহাদের দাবাইয়া তাহাদিগকে দিয়া দুর্মূল্য চাল ও গম প্রভৃতির ব্যবসায় করাইয়া ছিল। যখন আমরা প্রাদেশিক সরকারের অধিকারের কথা লইয়া আলোচনা করি তখন আমরা ইহা লইয়া মাথা ঘামাই না যে সে সরকার ঠিক পথে চলিয়াছে না ভুল পথে। অধিকার থাকিলে ভুল করিবারও অধিকার, ঠিক করিবারও অধিকার। ভুল করিলেই, অধিকার আছে কি না তাহা লইয়া ঠিক সন্ধান চলিতে পারে। এমনও হইতে পারে, যে সকল ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দাবাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে দাবানো ঠিকই হইয়াছিল এবং তাহারা ভুলই করিতেছিল। কিন্তু এ-কথায় ইহা প্রমাণ না হইয়া পারে না যে প্রাদেশিক সরকারের অধিকার সীমাবদ্ধ এবং যুদ্ধের আর্ডিন্যান্সের যুগে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারিত। মনে থাকে যেন, এই মন্ত্রীসভা সর্বদাই ব্রিটিশ

সরকারের সাহায্য করিবার দাবি করিত এবং সাহায্য করিতও বটে। তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দমন করিতে সঙ্কোচ ভাব দেখান নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা যদি স্বস্থানে দৃঢ় হইয়া থাকিত, আর ব্রিটিশ সরকারের সহিত কংগ্রেসের বোঝাপড়া সন্তোষজনক না হইত—যাহা হইতে পারিল না—তাহা হইলে ইহাতে একটুও সন্দেহের অবসর নাই যে তাহাদের এমন অনেক কাজ করিতে বাধ্য করা হইত, যাহা না কংগ্রেস না তাহারা নিজেরা পছন্দ করিত। বাধ্য হইয়া তাহাদের অল্প কয় দিনের মধ্যে পদত্যাগ করিতে হইত এবং তাহা না হইলে গভর্নরের সুরে সুর মিলাইয়া নিজের চিন্তা ও মতবাদের বিরুদ্ধে হুকুম তামিল করিতেই হইত।

ঐরূপ স্থির করার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে যখন এই সব পংক্তি লেখা হইতেছে, তখন ঐ সকল ঘটনা ও ব্রিটিশ নীতির দিগ্‌দর্শন করিয়া আমরা একই সিদ্ধান্তে আসিয়া পেঁছিতে পারি—তাহা হইল এই যে, ইংলণ্ড সাম্রাজ্যবাদের জন্য যুদ্ধ করিতেছে তা অন্যে যাহাই বুঝুক না কেন। চার্চিলের ভাষায় তাহার উদ্দেশ্য হইল এই যে, 'তাহার যাহা আছে তাহা নিজের হাতের মুঠোয় রাখা।' শুধু তাহাই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি জার্মানীকে হারাইয়া নিষ্কণ্টক, একচ্ছত্র ও অধিক প্রবল করিয়া তুলিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অন্তত তাহার নিজের স্থান ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় পূর্ববৎ স্থায়ী রাখিতে হইবে। এ অবস্থায় ভারতের জন্য কতদূর আশা মনে পোষণ করা যায়? কংগ্রেসের মনে যে-আশঙ্কা ১৯৩৯ সালে ছিল, পরবর্তী সকল ঘটনা ও ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদের শব্দজাল—বিশেষ করিয়া চার্চিল-এমেরির কৌশল পদবিন্যাসে—স্পষ্টরূপে গলা ফাটাইয়া সমর্থন করিয়াছে। এইজন্য, আমি ঐ সময়েও বুঝিয়াছিলাম, আজ তো সে ধারণা আরও দৃঢ় হইয়া গিয়াছে যে, আমরা মন্ত্রীসভায় থাকিয়া দেশের হিতসাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলাম—আমরা স্বদেশের পক্ষে শুধু অনর্থের সাধনই করিতে পারিতাম।

এই সব ধারণা সত্ত্বেও আমি বলিতে পারি না যে সে-সময়ে আমি ইংলণ্ডের পরাজয় হউক ইহা চাহিতাম। যে কারণেই হউক, জার্মানীর জয় পছন্দ হইত না। সে চেকোস্লোভাকিয়ার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, আর অত্যাচার করিয়াছিল এই কারণে যে চেকোস্লোভাকিয়া তাহার তুলনায় দুর্বল ছিল। যখন জার্মানী ঐ দেশের উপর চড়াও হইল, তখন অন্য লোকেরা কিছু-না-কিছু সুবিধা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না; তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড। এইজন্য, যখন জার্মানী উল্টাইয়া পোল্যাণ্ডও আক্রমণ আরম্ভ করিল তখন মনে এমন ভাবও হইল যে ঠিকই করিয়াছে—পোল্যাণ্ডের বেলায় হইয়াছে যেমন কুকুর তেমন মুগুর। কিন্তু আবার যখন সে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও

নরওয়ের উপরও আক্রমণ করিল তখন আমার মনের উপর ইহার খুব প্রভাব পড়িল। মনে হইতে লাগিল যে কোনও দুর্বল দেশকেই জার্মানী স্বাধীন থাকিতে দিবে না। ইংরেজের প্রতি যে অল্পস্বল্প রাগ ছিল তাহা কম হইল, এমন মনে হইতে লাগিল যে আমাদের ব্রিটিশকে সাহায্য করা উচিত, যাহাতে সে জার্মানীকে হারাইতে পারে এবং এই অন্যায়ের শক্তিকে দমন করিতে পারে। এই ভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে আমি এক ক্ষুদ্র বিবৃতিতে আমার মনোভাব প্রকাশও করিয়া ফেলিলাম। মনে হয়, অন্য অনেক কংগ্রেসের লোকও এই ভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ত্রুটি ও ভারতের প্রতি তাহার অন্যায়াচরণের কথা মনে রাখিয়াও জার্মানীর কাণ্ডকারখানায় এতখানি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপারটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তাই আজ যে অনেক ইংরেজ ও তাঁহাদের সমর্থক বলেন, যে কংগ্রেস ইংলণ্ডকে দুর্বল মনে করিয়া পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে ও তাহাদের বিপদের সময়ে লাভবান হইতে চাহিয়াছিল, এ-কথা একেবারেই মিথ্যা। হাজার হাজার অভিযোগ সত্ত্বেও, যুদ্ধের আরম্ভ হইতে ১৯৪০ সালের জুলাই পর্যন্ত—বোম্বাইয়ে তখন নিখিল-ভারত কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের তরফ হইতে এ-কথা বলা গিয়াছিল যে যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে এ-কথা ঘোষণা করিয়া দেয় আর দেশ শাসনের অধিকার তখনই দিয়া দেয়, তবে ভারত ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে সাহায্য করিবে। প্রায় কোনও কংগ্রেস সভ্যের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কটুতা ছিল না, তখন পর্যন্ত সকল কংগ্রেস সভ্যই ব্রিটেনকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য বলিয়াই স্বীকার করিত। তবে কর্তব্য পালনের অধিকার চাহিত, যাহা না হইলে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা সম্ভব ছিল না।

বোম্বাইয়ের ঐ অধিবেশনের পর, যাহার জন্য গান্ধীজীকে কংগ্রেস হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হইয়াছিল এবং তাঁহাকে পৃথক করিয়াও ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যখন ঐ প্রস্তাব এত শীঘ্র নাকচ করিয়া দিল তখন বহু লোকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইল, আর সে-ক্ষোভ এমেরি ও চার্চিলের কথায় দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে যত কম মূল্যে ইংলণ্ড তখন বাণিজ্য করিতে পারিত হয়তো আর কখনও তাহা পারিবে না। অবশ্য সে পশুবলে আরও কিছুদিন ভারতকে দমনে রাখিতে পারিত, তাহা অন্য কথা। তখন যদি একটা বোঝাপড়া হইত তাহা হইলে হয়তো জাপানকে এই যুদ্ধে ঝাঁপ দিবার পূর্বে আরও কিছু ভাবিতে হইত। ভারত 'তন মন ধন' দিয়া সর্বপ্রকারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আছে, জাপান যদি এ-কথা বিশ্বাস

করিত তবে পূর্ব এশিয়ায় তাহার অতর্কিত আক্রমণ যেমনটি করিয়াছিল তেমন করার সাহস হইত না। যদিই হইত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে যতখানি সতর্কতা সে লাভ করিয়াছে ততখানিই লাভ করিত? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতারও ব্যবস্থা হইয়া যাইত। ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থা হইয়া গেলে মালয় ও সিঙ্গাপুরের যে দশা হইয়াছিল তাহা আর হইত না। এ-জন্য, আমি স্বীকার করি যে ব্রিটেন তখন যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল হয়তো তাহার ইতিহাসে একবার ভিন্ন আর কখনও তাহা দেয় নাই। সে-বিষয়ে অবশ্য ১৮শ শতাব্দীতে আমেরিকায় উপনিবেশগুলির দাবি অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছিল। পরিণামে ইহাতে তাহার ভাল হয় নাই, যদিও পৃথিবীতে তাহা হয়তো ভালই হইয়াছিল। আর ইহার পরিণামে কে বলিতে পারে কি হইবে? হইতে পারে, আমেরিকায় যাহা হইয়াছিল তাহার চেয়েও খারাপ হইবে, আর জগতের পক্ষে তাহার চেয়েও হিতকর। যাক, এতো গেল ভবিষ্যতের কথা, মনে করিয়া রাখার নয়, আর তাহার স্থানও ইহা নয়। এখানে তো একথা বলাই যথেষ্ট যে প্রচারের জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যতই বলা হউক, সত্যের কষ্টিপাথরে একথাই স্থির যে কংগ্রেস প্রতিপদে চেষ্টা করিয়াছে যাহাতে ভারতকে সম্মানের সহিত ও সফলতার সহিত অধিকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা হউক, কিন্তু প্রতি পদে পদে শুধু 'না' 'না' উত্তরই পাইয়াছে। শেষে নিরুপায় হইয়া তাহাকে ১৯৪২-এর আগস্ট-এর সংকল্প লইতে হইল, তাহার উল্লেখ পরে করা হইবে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কিছুকাল পর্যন্ত এ-কথা একরূপ অনিশ্চিত ছিল যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে কি না, এবং হইলে কবে হইবে। কংগ্রেসের নিয়ম পুনরায় বদল হইয়া গিয়াছিল, আর স্থির হইয়া গিয়াছিল যে ডিসেম্বরেই বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এ-কথা পরিষ্কার হইয়া গেল যে এখন ডিসেম্বরে অধিবেশন হইবে না। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহাও পরিষ্কার বোঝা গেল যে অধিবেশন করিতেই হইবে। তাই এখন স্থির হইল যে মার্চ মাসে বাৎসরিক অধিবেশন করিতে হইবে। রামগড়ে এখন পুনরায় জোর আয়োজন চলিতে লাগিল। আমি সেখানে বেশি সময় দিতে পারি নাই; কারণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভারও আমার উপর ছিল। কিন্তু এখন সেখানে শুধু শ্রীঅম্বিকাকান্তই ছিলেন না, মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর অন্যেরাও সেখানে যাওয়ার অবকাশ পাইলেন— বিশেষ করিয়া, অনুগ্রহবাবু, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় এবং শ্রীরামনারায়ণ সিংহের দেশসেবাও বেশ অনুভব করা গেল। এই কারণে আমি বহু দূর পর্যন্ত নিশ্চিন্তও হইয়া গেলাম।

রামগড়ে কাঠ ও বাঁশের কমতি ছিল না। মজুরও যথেষ্ট পাওয়া যাইত। সেইজন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সাময়িক ঘর তৈয়ারির কাজ জোর উৎসাহে সুরু হইয়া গেল। কিন্তু শ্রীরামদাস গুলারি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক ঐ সময়ে শ্রীরামজীপ্রসাদ বর্মা বিলাত হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। উনি বাল্যকাল হইতেই কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে জেলেও গিয়াছিলেন। সেখানে বেতও খাইতে হইয়াছিল। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন বলিয়া কলেজের অধ্যক্ষ উঁহাকে পূর্বের কলেজে ভর্তি করিয়া লইলেন। সেখানে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঞ্জিনীয়ার হইলেন। কিছুদিন এখানে-সেখানে কাজ করিয়া কিছু পয়সা হাতে হইলে তিনি আরো বেশি জ্ঞান-লাভের জন্য বিলাত যাওয়া স্থির করেন। সেখানে কঠিন পরীক্ষা পাশ করিলেন। ঠিক দেশে ফিরিবার সময়টিতে লড়াই বাধিল। কোনমতে দেশে ফিরিলেন। পেঁৗছিয়াই কিন্তু ইনি রামগড়ের প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের কাজটি পাইলেন। সেইজন্য গুলজারিবাবু চলিয়া গেলেও যতটা অসুবিধা হওয়ার কথা ছিল ততটা অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। লোকের থাকিবার জন্য ঘর, প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্য বড় প্যাণ্ডাল, বিষয় নির্বাচনী কমিটির জন্য ছোট প্যাণ্ডাল, প্রদর্শনীর জন্য পৃথক গৃহ নির্মাণ করিতে হইল। জলের ব্যবস্থা করিতে হইল। আলোর বন্দোবস্ত করিতে হইল। প্রত্যেক কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর দেওয়া ছিল। কিন্তু মণ্ডপ ইত্যাদি নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণই ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের উপর অর্পিত ছিল। ঠিক সময়ে সুন্দরভাবে সব কাজ সম্পন্ন হইল।

আমরা কংগ্রেসের জন্য যে-জায়গাটুকু বাছিয়াছিলাম, সেখানে ছোটমোট দুই-একটা কুয়া তো অবশ্য ছিল, কিন্তু যত লোক আসিবে তাহার শতকরা এক ভাগের জন্যও পুরা জল দিবার সাধ্য ছিল না। জায়গাটি ছিল দামোদরের ধারে, কিন্তু তখনকার দিনে দামোদর প্রায় শুকাইয়াই থাকিত—সেই দামোদর যাহা বান আসিলে ভীষণ রূপ ধারণ করে আর বিহার হইতে বাহির হইয়া বাংলায়, বিশেষ করিয়া বর্ধমান জেলায়, সমূহ বিপদ ও সংকটের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। রামগড়ে শীত ও গ্রীষ্মকালে এক ক্ষীণধারা দিয়াই—লোকে যাহা কাপড় না ভিজাইয়াই পার হইতে পারে—সে নিজের অস্তিত্ব জাগাইয়া রাখে। কিন্তু যদিও উপরের ধারা ক্ষীণ ও মৃদু, তথাপি

বালির নীচে জল থাকে যথেষ্ট মাত্রায়। যদি জল বাহির করিবার ও রোধ করিবার ব্যবস্থা করা যায় তবে সে-স্রোত অটুট হয়। এইজন্য স্থির করা গিয়াছিল যে নদী হইতেই জল বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুয়া দিয়াও হয়তো হইতে পারিত, কিন্তু পাথুরে পাহাড়ে জমি বলিয়া ইহা স্থির করা কঠিন ছিল যে কোথায় কুয়া খোঁড়া যায়, কোথায় বা খুঁড়িলে তাহাতে যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে। নদীতে কুয়া খোঁড়া সহজ ছিল, জলও একটু খুঁড়িলেই পাওয়া যাইত। তাই নদীতে কুয়া খুঁড়িয়া তাহাতে পাম্প লাগানো হইল। জল পরিষ্কার করার জন্য বড় বড় পাকা ট্যাঙ্ক তৈরি করা হইল, তাহাতে একবারে এক লক্ষ লোকের জন্য দুই-তিন দিন কুলাইবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ জল ধরে। সমস্ত নগরে পাইপ লাগাইয়া জল পেঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার জন্য গয়া ও ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটির জলকলের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারেরা অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। জলের ব্যবস্থা ঠিক ঠিক হইয়া গেল, তবে উহাতে শুধু একটা ত্রুটি থাকিল। কুয়া ছিল নদীতে, আর হঠাৎ নদীতে জল আসিলে কুয়া ও পাম্প দুই-ই বিকল হইয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু একথা কে জানিত যে মার্চ মাসে এতখানি বর্ষা হইবে যে দামোদরে বান ডাকিবে!

জলের চেষ্টায়, এবং সৌন্দর্য বাড়াইবার চেষ্টাতেও বটে, আমরা আর একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। যেখানে কংগ্রেস-নগর বসিয়াছিল, তাহার নিকট দিয়া এক ছোট নদী 'হুরহুরী' সেখানেই দামোদরের সঙ্গে মিশিয়াছিল। এই নদী আমরা এক পাকা বাঁধ দিয়া বাঁধিয়াছিলাম। ফলে এক দিক দিয়া সাঁতার জল, অন্য দিকে বাঁধের উপর দিয়া যে-জল বহিয়া যাইত তাহা এক ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের শোভার সহিত যাহারা স্নান করিত তাহাদের শোভাও বাড়াইয়া দিত। সঙ্গে সঙ্গে স্নানার্থীদের এক কৌতূহলের বস্তুও হইয়া গিয়াছিল।

ইচ্ছা তো ছিল যে গ্রামের কংগ্রেসে যতদূর সম্ভব গ্রামের জিনিসই ব্যবহার করা হইবে; কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। সর্বপ্রথমে জলকলের দ্বারাই ইহার ব্যতিক্রম হইল। এখন থাকিল আলোর কথা। তাহার জন্য হয় বিজলী বাতির নয়তো কিটসনের আলোর ব্যবস্থা করিতে হইত। দুইয়ের একটিও গ্রামের বস্তু নয়। তেলের মশাল, প্রভৃতি দিয়া কাজ চালানো কঠিন মনে হইল। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম যে এমন একটা ব্যবস্থা যদি করা যায়। কিন্তু তাহা হই'ত পারিল না। শেষে বিজলী বাতির শরণ লইতেই হইল। এ-বিষয়ে হঠাৎ একটা সুবিধাও বিনা চেষ্টায় পাওয়া গেল। গয়া কটন মিলস্-এর মালিকেরা ঠিক এই সময়ে নূতন ইঞ্জিন, ডাইনামো প্রভৃতি আনাইয়াছিল। তাঁহারা ঐগুলির বাঁধা-ছাঁদা ও বোঝাই করা পার্শেল গয়াতে না খুলিয়া নিজেদের ইঞ্জিনীয়রের সঙ্গে

সোজাসুজি রামগড়ে পাঠাইয়া দিলেন। কাজ সহজ হইল। বিজলী লাগানো গেল।

প্রদর্শনীর কাজ ছিল কঠিন; কারণ তাহাতে অনেক জিনিস একত্র করিতে হইত। চরখা-সংঘের মন্ত্রী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ইহার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নিখিল ভারত চরখা ও গ্রামোদ্যোগ সংঘের সাহায্যে চমৎকার আয়োজন করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তত্ত্বের দিক দিয়া প্রদর্শনীর সীমানার ভিতর বিজলী বাতি আনিতে দেন নাই; কারণ প্রদর্শনীর নির্ভর ছিল শুধু গ্রামোদ্যোগের উপরই।

কয়েকজন বন্ধুর মত ছিল যে আগন্তুক প্রতিনিধিদের জন্য বিহারের এক ইতিহাস হিন্দীতে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাক। কথাটা আমার ভাল লাগিল। ত্রিপুরীতেও এই প্রকারের ইতিহাস তৈয়ার করা হইয়াছিল। বিহারের ইতিহাস গৌরবপূর্ণ। এই কার্যের ভার শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকে দেওয়া গেল। উহা ছাপিবার ভার লাহেরিয়া সরাইয়ের শ্রীরামলোচন শর্মা বিহারী লইলেন। ইতিহাস ছাপা হইয়া প্রস্তুত হইল। কিন্তু যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, উহা বেশি বিক্রয় হয় নাই। তাহা হইলেও একটা জিনিস তো হইয়া রহিল।

বিহারে কয়েকজন সাহসী চিত্রকর প্রস্তুত ছিলেন। সকলেরই ইচ্ছা হইল, আমারও মনে হইল যে বিহারের ইতিহাসের কিছু কিছু গৌরবপূর্ণ ঘটনা চিত্র দ্বারা চিত্রিত করিয়া দেখানো হউক। এই কার্যে বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধহস্ত কলাকৃৎ বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মার নেতৃত্বে সফল হওয়া গেল। তিনি কলিকাতা আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। এখন তিনি সেখান হইতে পেনসন লইয়া জন্মভূমি পাটনাতে বাস করিতেছিলেন। তিনি অনেকগুলি সুন্দর মৌলিক চিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শনীতে রাখিয়াছিলেন, সেগুলির প্রতিলিপি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল, তাহাতে চিত্রিত বিষয়গুলির ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হইল। পুস্তকখানি জনপ্রিয় হইল। লোকে চিত্রগুলি খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখিল।

কংগ্রেসের আয়োজন, যেমন হইয়া থাকে, প্রশস্ত পরিসরেই করা হইয়াছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হইলেন—প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বলি এইজন্য যে, শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ও (এম্. এন্. রায়) প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি অল্প ভোটই পাইয়াছিলেন। বিপুল সংখ্যক ভোট মৌলানার পক্ষে ছিল।

কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্বেই পাটনায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা হইয়াছিল। এ বৈঠক এইজন্য ডাকা হয় যে কংগ্রেসে উপস্থিত করার জন্য কিছু কিছু প্রস্তাবের মুসাবিদা প্রথম হইতে তৈয়ার করা হয় যাহাতে ঠিক কংগ্রেসের সময় এ-ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করিতে হয়। এই বৈঠকের

পরেই আমি রামগড় রওনা হইয়া গেলাম। আমাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। তাহাও কিছু অদ্ভুত ধরনে হইয়া গেল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা বুঝিয়াছিল যে সভাপতি নির্বাচনের জন্য কয়েকটা নাম পেশ করা যায়। লোকেদের নিকট কথাটা ভাল লাগে নাই। কারণ তাহারা ইহা লইয়া মতভেদ প্রদর্শন করিতে চাহে নাই। কোনও ব্যক্তি বিশেষের নামে কিছু বলা উচিত নয়, তাই আমি নাম দিই না। এরূপ মতভেদে ভয় পাওয়া উচিত নয়—বিশেষ করিয়া যখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অধিকার শুধু অভ্যর্থনা ও ব্যবস্থা লইয়া। কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হিসাবে, তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলেও কোনও কোনও লোকের মতে এই হইল যে, আমি এই পদ গ্রহণ করিলে মতভেদ হইবে না। বাধ্য হইয়া আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। যাহা হউক, আমি পাটনা হইতে মোটরযোগে যাত্রা করিলাম। পথে নালন্দায় থামিলাম। সেখানকার খনন কার্য হইতে প্রাপ্ত বাড়িঘর ও মিউজিয়মে সংগৃহীত বস্তুগুলি দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দুঃখ ও লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে যে নালন্দা যদিও পাটনা জেলারই অন্তর্গত, যে-পাটনা জেলায় আমি বাস করিতাম, তথাপি ইতিপূর্বে কখনও ঐ সব ঘর-বাড়ি ও সামগ্রী আমি দেখি নাই। আমি এ-সব দেখিয়া শুধু যে আশ্চর্য হইলাম তাহা নহে, বিহারের অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। নালন্দা হইতে কিছু অগ্রসর হইয়া রজৌলী ডাকবাংলোয় আমি দুই দিন থাকিয়া গেলাম। সেখানে থাকিবার দুইটি কারণ ছিল—একে তো খানিকটা বিশ্রাম করার প্রয়োজন ছিল, আর অভ্যর্থনার বক্তৃতা প্রস্তুত করিবার ছিল। নিজের পছন্দ মত ভাল জায়গাও পাইয়া গেলাম। সামান্য একটু দূরেই জঙ্গল ও পাহাড় ঐ স্থানের সৌন্দর্য বাড়াইয়া দিয়াছিল। আমাদের বন্ধু ও পুরাতন কংগ্রেসকর্মী শ্রীগৌরীশঙ্কর শরণ সিংহের বাড়ি ঐ গ্রামে। তাই বিনা কষ্টে ও বিনা চিন্তায় সেখানে নির্জনে থাকিয়া বক্তৃতা লেখার সুবিধা হইল। বক্তৃতায় আমি বিহারের ইতিহাসের কথারই দিগ্‌দর্শন করিয়াছিলাম। চলতি প্রশ্ন ও সমস্যা বুঝাইয়া দিতে অথবা সে-সব বিষয়ে মন্তব্য করিবার চেষ্টা আমি জানিয়া শুনিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

রামগড়ে পৌঁছিয়া আয়োজনে যাহা কিছু অভাব ছিল তাহা পূরণ করিতেই রাত-দিন কাটিল। মহাত্মাজী ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করিবার কথা ছিল। তাই তিনি কিছু পূর্বেই আসিলেন। তাঁহার পৌঁছিবার এক দিন পূর্বে খুব বৃষ্টি হইল। ঝড়ও আসিল। প্রদর্শনীর কাজে কিছু বাধা পড়িল। কিন্তু একটু সামলাইয়া লইলাম। মহাত্মাজী ঠিক সময়ে প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করিলেন। আশা করা গিয়াছিল যে এখন এই বর্ষার পরে আকাশ পরিষ্কার থাকিবে এবং ঝড়-

বাদল যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহা ঘটিবার ছিল, তাহা ছিল অন্যরূপ।

হুড়াহুড়ি ও দামোদরের তীরে নেতাদের জন্য কুটির প্রস্তুত ছিল। তাহাদের একটি মহাত্মাজী ও অন্যগুলিতে সভাপতি মশাই ও অন্যান্য কুটিরে অন্যান্য লোক থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছিল। কুটিরগুলি খুব ভালভাবে ও সুন্দরভাবে নির্মিত হইয়াছিল। বাঁশের চাটাই-এর দেওয়াল, হোগলার ছাউনী আর শালগাছের থাম—এইভাবে সমস্ত কুটির নির্মাণ করা গিয়াছিল। তাহাতে লোক থাকিবার জন্যই হউক বা প্রদর্শনীর জন্যই হউক অথবা কমিটির অধিবেশনের জন্যই হউক। মাঝখানে অতিশয় প্রশস্ত রাস্তা বানানো হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত সরু সরু রাস্তা তৈয়ারী করা হইয়াছিল।

জায়গাটি ছিল পাটনা-রাঁচীর বড় রাস্তার উপরেই। ঐ বড় রাস্তায় দামোদর নদের উপরে এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মিত হইয়াছে। সেতু ও রাস্তার জন্য নগরের শোভা খুবই চোখে পড়িত। রাস্তা বরাবর চলিয়া গিয়াছে। ঐ সময় তো আরো বেশি লোকে চলাচল করিত। ঐখানে রেলের দুইটি স্টেশন—এক হইল শহর হইতে আধ মাইল দক্ষিণে বি. এন. আর-এর স্টেশন রামগড়, অন্যটি সেখান হইতে প্রায় চার মাইল উত্তরে ই. আই. আর-এর উত্তরে। দুই রেলওয়ের কর্তৃপক্ষই জনসাধারণের সুবিধার জন্য স্টেশনে অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী রামগড় স্টেশনে নামিয়াছিলেন আর সভাপতি নামিলেন রাঁচী রোড স্টেশনে। প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া সভাপতিকে কংগ্রেস নগরে লইয়া যাওয়া হইল। স্বর্গীয় মজহরউল হক সাহেবের নামে নগরের নাম রাখা হইয়াছিল। একটি বিশেষ ফটক ছিল স্বর্গীয় দীপনারায়ণ সিংহের নামে।

যথারীতি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ও বিষয় নির্বাচনী কমিটির অধিবেশন দুই-তিন দিন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের কাজ কংগ্রেসের খোলা অধিবেশনের দিন পর্যন্ত প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল। জনসাধারণ সেখানে একত্র হইয়াছিল। প্যাণ্ডেল খুব সুন্দর করিয়া তৈরী হইয়াছিল। তাহার প্রকৃতিই তাহাকে প্রায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের তো কাজ ছিল জায়গা বাছিয়া মাটি সমান করা, নেতাদের মঞ্চ বা প্ল্যাটফরম তৈরী করা, বাতি জ্বালানো এবং চারদিক ঘিরিয়া দেওয়া। প্যাণ্ডেলের নিকটেই প্রায় দুই দিক ধরিয়া গভীর জঙ্গল। জঙ্গল ছিল পাহাড়ের উপরে এইজন্য সেইখান হইতে দুই দিকে পাহাড় ও জঙ্গল, যতদূর চোখ যায় দেখিতে পাওয়া যাইত। পাহাড় ও জঙ্গল ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতেছে, দেখিতে কি সুন্দর। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগের থাকিবার জায়গা বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানোভাবে রহিয়াছে, রাত্রি-

বেলা আলোতে যেন নাচিতে থাকিত। সকলের নীচে ছিল প্ল্যাটফরম। সভাপতি ও দর্শকদের জায়গা ছিল যেন গ্যালারির মত। কোন দর্শক যতদূর হইতেই দেখুক না কেন ঐ মঞ্চের উপর সমাসীন সভাপতি ও নেতাদের ঠিক ঠিক দেখিতে পাইত। লাউড স্পীকারের জন্য তাহাদের কথা শুনিতে কোন অসুবিধাত ছিলই না।

কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন আসিল। দর্শকদের টিকিট খুবই বিক্রয় হইতেছিল। ঘণ্টায় সম্ভবত ছয়-সাত হাজার অথবা তাহারও বেশি টাকা আসিতেছিল। অধিবেশনের সময় ছিল সন্ধ্যাকাল পাঁচটা কি ছয়টার সময়। আমি সভাপতিকে আনিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিলাম। প্যাণ্ডেলের সীমানার অল্প একটু দূরে এক সজ্জিত কুটির ছিল, সেখান হইতে প্রথামত প্রধান প্রধান নেতাদের সভাপতির সংগে মিছিল করিয়া লইয়া আসিবার ব্যবস্থা ছিল। কিছু কিছু লোক সেই পর্যন্ত গিয়া পেঁৗছিয়াছিল কিছু কিছু আসিতেছিল। ইহারই মধ্যে হঠাৎ আকাশের এক কোণে মেঘের ঘটা হইল, বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া গেল। সভাপতি ঐ কুটির পর্যন্ত পেঁৗছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মিছিল তখনও বাহির হয় নাই। জল পড়িতে আরম্ভ করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এত জোরে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল যে সেই নীচু জমি জলে ভরিয়া উঠিল। দর্শক ও প্রতিনিধি সকলে আপন আপন জায়গায় বসিয়া থাকিল—বসিয়া বসিয়া ভিজিতে থাকিল—এই আশায় যে এখনই জল বন্ধ হইবে এবং অধিবেশন হইতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইল না। বর্ষার বেগ বাড়িয়াই চলিল, শেষে মঞ্চের নিকটে নীচু জমিতে এত জল জমিল যে সেখানকার লোকদের দাঁড়াইয়া থাকাও কঠিন হইয়া পড়িল। লাউড স্পীকারের সমস্ত ব্যবস্থা ঐ স্থানেই ছিল। এইজন্য তাহা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইল। শেষে ঐ বর্ষায় সভাপতিমশাই ঐ মঞ্চে গেলেন, আমিও তাঁর সংগে গেলাম। আমি দুই-চার কথায় স্বাগত অভিনন্দন জানাইলাম—বক্তৃতা পড়িবার না হইল কোন সুযোগ, না পারিত কেহ শুনিতে। সভাপতিমশাইও দুই-চার কথা বলিয়া সে-দিনকার অধিবেশন সমাপ্ত করিলেন। যাহারা মাসাবধি রাত-দিন পরিশ্রম করিয়া এই শুভদিনের আয়োজন করিতেছিল তাহারা খুবই নিরাশ হইল কিন্তু কিছুইত করিবার ছিল না। কিন্তু ইহাই দেখিবার ছিল যে প্রতিনিধিদের থাকিবার স্থান কিরূপ ছিল। সুখের বিষয় এই কুটিরগুলি এই মুষলধার জলও সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সেই রাত্রে বৃষ্টি হইতে থাকিলেও তাঁহারা শুইতে পারিলেন। তাঁহাদের কষ্টত অবশ্যই হইয়াছিল। কিন্তু আমি বুঝি আমাদের উপর সকলের সহানুভূতি ছিল; আমাদের উপর বা আমাদের ব্যবস্থাতে কেহ রাগ করেন নাই।

পরদিন বৃষ্টি হইল না কিন্তু কিছু মেঘের ডাক চলিতেই থাকিল।

পতাকা অভিবাদনের জন্য খোলা ময়দানে পাকা সিমেণ্টে এক মঞ্চ তৈরী করা হইয়াছিল। তাহার মাথায় ছিল অশোকস্তম্ভের মতো এক সিংহের মূর্তি। সেই স্তম্ভের চারদিকে লোকেরা একত্র হইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন সেখানেই করা হইল। জল জমিয়া যাওয়ায় প্যাণ্ডেলের মধ্যে বসা অথবা দাঁড়ানো পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া গেল। এই খোলা ময়দানে স্তম্ভের চত্বরের উপর সভাপতি মহাশয় মহাত্মাজী এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা বসিয়াছিলেন, অন্যান্য সকলে চারদিকে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। বিষয় নির্বাচনী যে-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিল সাধারণের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করা হইল। পূর্ণ তর্কবিতর্কের পর তাহা গৃহীত হইল। সাধারণ অধিবেশনে যাহা হইত তাহা সবই হইল, কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যে। কারণ সর্বদা ভয় ছিল, কখন আবার না জল পড়িতে আরম্ভ করে। মহাত্মাজীরও বক্তৃতা হইল, শেষকালে আমি সকলের নিকট অসুবিধার জন্য মার্জনা চাহিয়া নিবেদন করিলাম যে এখন সকলে নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়া যান। কারণ নদীতে জল আসিয়াছে বলিয়া আমাদের জলের কলের ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। লোকদের এখন নদীর দুর্গন্ধ জলের উপর ভরসা করিতে হইবে। আমাদের ভাণ্ডারে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি এখন আর জল নাই। লোকেরা এ-কথা মানিয়া লইল। অধিবেশন শেষ হইতেই লোকেরা নিজের নিজের দেশে রওনা হইতে লাগিল। ঐ দিন রাত্রের গাড়িতে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য নেতারাও নিজের নিজের স্থানে চলিয়া গেলেন।

রামগড় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিও আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই যে-নীতি ওয়ার্কিং কমিটি ও অখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের দিক হইতে তাহা সমর্থন করিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করিল ভবিষ্যতে স্বরাজের জন্য কিছু করিতে হইবে। সেইজন্য এখন হইতেই গঠনমূলক কার্য প্রবলভাবে চালাইয়া লোকদের প্রস্তুত করাইতে হইবে।

রামগড় কংগ্রেসের সময় রামগড়েই অন্য এক প্রকাণ্ড সভাও হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল, রফা বিরতি সভা, Anti Compromise Sabha. তাহার প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। এই প্রদেশের ব্যবস্থাকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী আর শ্রীধনরাজ শর্মা। যখন হইতে সুভাষবাবুর সংগে মতভেদ হইয়া গেল তখন তিনি অন্য এক নূতন দল চালু করিলেন, তাহার উল্লেখ আগেই করিয়াছি। তাহারা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বিরুদ্ধে এ-কথাই প্রচার করিতেছিলেন যে ঐ সমিতি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করিবার জন্য ব্যস্ত এবং দেশের অনিষ্ট করিয়াও বোঝাপড়া করিবে। এই দলের মধ্যে অনেক

ধরনের লোক যোগ দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে যাহারা সুভাষ বসুর মত ও আলোচনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিত না। কিন্তু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির উপর তাহাদের রাগ ছিল। এখন সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া তাহার বিরোধে লাগিয়া গেল। কংগ্রেস রফা নিষ্পত্তি করিতে ভয় পাইত না এবং সেজন্য দেশের ক্ষতিও করিতে চাহিত না। যদি তাহাদের মধ্যে কোন কিছুর জন্য ব্যস্ততা দেখা যাইত, তবে তাহা এইটুকু যে দেশের ভাল হউক। কিন্তু সেই সময় এই শ্লোগান খুব চালু ছিল, উক্ত কন্‌-ফারেন্সও খুব সমারোহের সঙ্গে হইল। কংগ্রেস ও উক্ত কনফারেন্সের মধ্যে উহাই প্রভেদ ছিল যে উহার অধিবেশন যে কংগ্রেসের প্রথম হইবার জন্য, বর্ষা শুরু হইবার পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

বিহারের তিন কমিটি ও সোনপুর শিবির

রামগড়ে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আমাদের গঠনমূলক কার্যের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তাই সেখানকার কাজ শেষ হইতেই আমরা স্থির করিলাম যে নিজেদের প্রদেশে ইহার ব্যবস্থা করা চাই—মহাত্মাজীর আদেশ মতো সকল স্বেচ্ছাসেবকের চরকা চালানো ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং সংগঠনে জীবন-যাপনেরও পাঠ গ্রহণ করা উচিত। এইজন্য আমরা স্থির করিলাম যে একটা শিবির খুলিতে হইবে, তাহাতে সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রধান প্রধান লোক আসিয়া এক সঙ্গে অন্তত সপ্তাহ-কাল কাটাইবেন। যাহারা ভাল করিয়া চরকা চালাইতে জানে না তাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে, আর প্রত্যহ আলাপ-আলোচনার পর নিজের মতও সুস্পষ্ট ও দৃঢ় হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে শিবির-জীবন হইতে যে ঐক্য ও সমতার শিক্ষা পাওয়া যায় তাহাও পাইতে পারিবে। এজন্য আমরা শোনপুর স্থান হিসাবে বাছিয়া লইলাম। যে-দিন সেখানে শিবির খোলা হইবে সেই দিনও নির্ধারিত করা হইল। সেখানকার লোকেরা ইহাতে সন্তুষ্টও হইল, কারণ তাহারা পূর্বেই আশা করিয়াছিল যে কংগ্রেসের অধিবেশন সেখানেই হইবে। তাহা তো হইল না; কিন্তু শিবির হওয়াতেই তাহারা খানিকটা সন্তুষ্ট হইল।

আমি বুঝিয়াছিলাম যে হউক আর নাই হউক, কিছু তো করিতেই হইবে। তাই নিজের হাতের কাজকর্ম খুব তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ছুটি লওয়া আবশ্যক মনে করিলাম। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের

ভার আমার হাতে দিয়াছিলেন। বিহার-শ্রমিক-তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে বিহারের শ্রমিকদের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া সে-বিষয়ে সুপারিশ করিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। আমিই ছিলাম সে কমিটির কর্ণধার। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ মামুদের জোর তাগিদে পাটনা ইউনিভার্সিটিতে পুনরায় সিনেটের সদস্য হইতে হইয়াছিল—১৯৩০ সালের নভেম্বর হইতেই তাহা হইতে আমি বিযুক্ত হইয়াছিলাম। এ-বিষয়ে প্রথমে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। সিনেটে শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর বিষয়ে তীব্র আলোচনা করিতে করিতে আমি বলিয়াছিলাম যে এই প্রদেশে, বিশেষ করিয়া শিক্ষায়, আমরা সর্বপ্রকারে পিছনে আছি—কিছু আইনজ্ঞ ও কেরাণী চাকুরিয়া এবং ডাক্তার ছাড়িয়া দিলে আমরা আর কোনও ধরনের লোক তৈরী করিতেছি না, আর কোনও বিষয়ে নূতন সন্ধান করিয়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয়ও দিতেছি না—দেশ কৃষি প্রধান হইলেও এখানে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান পড়াইবার অথবা কৃষিবিষয়ক শিক্ষার কোনও প্রাধান্য অথবা ব্যবস্থা নাই—খনিজ পদার্থে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা ধনী হইলেও এই প্রদেশের লোকেরা না পাইয়াছে এ-সব বিষয়ে শিক্ষার কোনও বিশেষ সুবিধা, না পাইয়াছে এ-সব বস্তু কাজে লাগাইয়া লাভবান হইবার প্রেরণা। ভাল, প্রস্তাব গৃহীত হইল, এবং সরকার এক কমিটিও গঠন করিলেন যাহার সম্পূর্ণ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় এক কমিটি—হিন্দুস্থানী কমিটি—তাহারও আমি সভাপতি ছিলাম, কিন্তু হাতে অনেক কাজ ছিল বলিয়া ইহাতে আমি ইস্তফা দিয়াছিলাম এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে তাহার সভাপতি করা হইল। এ বিষয়ের আলোচনাও পূর্বেই করা হইয়াছে। এই তিন কমিটির কাজ শেষ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা-সমিতির প্রধান বোম্বাইয়ের অর্থশাস্ত্রী ও শিক্ষাশাস্ত্রী শ্রীকে. টি. শাহ মহাশয় বড়ই পরিশ্রমী ও চিন্তাশীল পুরুষ ছিলেন; তিনিই এ-কাজের ভার লইলেন, যদিও আমাকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ও অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় পরিশ্রম ভাগ হইয়া যাওয়ায় আমি ততটা বেশি বোধ করি নাই। শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট তিন ভাগে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। প্রথম ভাগে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে অনুমোদন করা হইয়াছিল। আমাদের প্রধান অনুমোদনের সঙ্গে ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার সাদৃশ্য ছিল—অথবা এ-কথা বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না যে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার দৃষ্টিতেই উহা রচিত হইয়াছিল। এমনটাই হওয়া ছিল স্বাভাবিক; কারণ ওয়ার্ধা পরিকল্পনা গান্ধীজীর মস্তিষ্কের সৃষ্টি হউক না কেন, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাশাস্ত্র তাহার সমর্থন করে। শিক্ষাশাস্ত্রীদের মধ্যে ডাঃ জাকির হুসেন, প্রফেসর

সৈয়দাইন ও স্বয়ং শ্রীকে. টি. শাহ তাহার প্রধান সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন; আর যখন ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাশাস্ত্রীরাও উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক, তখন কমিটির অন্য সদস্যেরা উহা যে কেন মঞ্জুর করিবেন না তাহার কোনও কারণ নাই। আমি ইহা জানিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম যে গান্ধীজীর এই পরিকল্পনা সর্বজনসমর্থিত হইতে পারিয়াছিল। শুধু একটা বিষয়ে আমার মতভেদ ছিল। আমি গান্ধীজীর সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করিতাম যে ভারতের মতো দরিদ্র দেশে ছাত্রদের সাহস ও নৈপুণ্যে বিদ্যালয়ে আমরা যাহা কিছু উৎপন্ন করিতে পারিব তাহা এতই পর্যাপ্ত হইবে যে তাহার আয় হইতেই সম্পূর্ণ না হউক অধিকাংশ ব্যয় কুলাইয়া যাইবে। অন্য সদস্যেরা এতখানি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। কাহারও কাহারও তো এমন মতও ছিল যে যদি আমরা আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখি তবে ঐ সকল শিল্পনৈপুণ্যের দিক হইতে সরিয়া আসিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে আয়ের উপর, শিক্ষা হইতে শিশুদের যে-লাভ হওয়া উচিত তাহা আর হইতে পারিবে না। যাহা হউক, এইরূপ মতভেদও আমি সরাইয়া দিয়াছিলাম এই বলিয়া যে, আয়ের দিকটা উপেক্ষা করিতে পারা যাইবে না সত্য, কিন্তু তাহা আমাদের উদ্দেশ্যে নয়—হাতের কাজ শেখাটা হইবে শিক্ষার জন্যই, আয়ের জন্য নয়। দ্বিতীয় ভাগ স্কুলের শিক্ষার বিষয়ে, তৃতীয় ভাগের সম্পর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে। তিন ভাগ তৈয়ারি করিবার জন্য পৃথক পৃথক উপসমিতি গঠন করিয়া দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে আমি প্রাথমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক উপসমিতির সঙ্গে সদস্য হিসাবে যুক্ত ছিলাম। উপসমিতিগুলির রিপোর্ট সমগ্র কমিটির সামনে পেশ হইয়া মঞ্জুর হইয়া গেলে পরে গভর্নমেন্টের নিকটে পাঠানো হইল।

শ্রীযুক্ত শাহের সঙ্গে আমার পূর্বে বেশি সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। এই সুযোগে তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিবার সৌভাগ্য হইল। তাঁহার পাণ্ডিত্য, শ্রমশীলতা ও সৌহার্দ্যে মন খুশি হইয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম যে তাঁহার সহিত মনে মনে যে বন্ধুত্ব হইয়া গেল, তাহা প্রয়োজন হইলে কাজে দিবে। এইভাবে ডক্টর জাকির হুসেন ও প্রফেসর সৈয়দাইনের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া প্রফেসর সৈয়দাইনের সঙ্গে, এই বিষয় লইয়া যথেষ্ট পরিচয় হইল। ডক্টর জাকির হুসেনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার আরও সুযোগ পাওয়া যাইতেছিল। উভয়ের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হইয়া গেল। ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহের বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। আমার ছাত্রজীবনের সময় হইতেই তিনি আমার অভিভাবকের মতো। সর্বদাই তিনি আমার সঙ্গে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ ও আদর করিয়া আসিয়াছেন। রাজনৈতিক বিষয়ে হাজারো মতভেদ থাকিলেও তাঁহার এই স্নেহানুগ্রহ আমাকে

এতটুকু অন্তরে থাকিতে দেয় নাই। এই কমিটিতে একত্র কাজ করায় ও আমাদের উভয়ের মধ্যে আর বেশি কী হইতে পারিত? শ্রীবদ্রীনাথ বর্মার প্রতিও এই মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি ডাঃ সিংহ ছিলেন বড় ভাইয়ের মতো, তবে শ্রীযুক্ত বর্মা ছিলেন ছোট ভাইয়ের মতো। রাজনীতির প্রশ্ন লইয়াও তাঁহার সঙ্গে কোনও মতান্তর হয় নাই। তাঁহার সঙ্গেও শুধু এই কার্যের জন্য কোনও বিশেষ পরিচয়ের কথা ওঠে না। ডাঃ অমরনাথ ঝার সঙ্গে এই কমিটিতে খুব কমই কাজ করিতে হইয়াছিল। কমিটির সেক্রেটারি শ্রীভবনাথ মুখার্জী আমার অনেক দিনের পরিচিত। আমি যখন কয়েক দিনের জন্য মজঃফরপুরের ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজের অধ্যাপক ছিলাম, তখন তিনি ছিলেন সেখানকার একজন ছাত্র। আমিও কিছু কিছু তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি এখন শিক্ষাশাস্ত্রী হইয়াছেন এবং ঐ দপ্তরে উঁচু পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁহার এখনও সেই রকমই ভাব আছে, আর কমিটির কাজে তাহার বহু পরিচয় পাওয়া গেল। এই কমিটির কাজ শেষ হইয়া গেল।

মজদুর-নির্বাচন কমিটির কাজ তখনও শেষ হয় নাই। এই ব্যাপারে কমিটির সদস্যদের প্রায়ই এমন সব জায়গায় যাইতে হইত যেখানে অনেক বড় বড় কারখানা এবং যেখানে অনেক মজুর কাজ করে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই অঞ্চলের মজুররা যে-রকমভাবে যে-অবস্থায় কাজ করে সম্ভবতঃ অন্য প্রদেশেও সেই একই ভাবে একই অবস্থায় কাজ করে। খেতের মজুরদের কথা আলাদা, তাহাদের এই কমিটির বাহিরে রাখা হইয়াছিল, এই কমিটির উপর কেবল কারখানার মজুরদের অবস্থা যাচাই করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তবে কারখানাগুলি নানা প্রকারের। উত্তর-বিহারে আখের রস হইতে চিনি প্রস্তুত করার কারখানাই বেশি। অন্য রকম কারখানা বিশেষভাবে সহরে অথবা সহরের আশে পাশে থাকে, অথবা মজুরদের সংখ্যাধিক্যে যেখানে সহর আপনি গড়িয়া ওঠে এবং কারখানার সঙ্গে সঙ্গে সহরও ক্রমে উন্নতি করিতে থাকে; কেন না দেখাদেখি এবং বড় এক কারখানার সুখ-সুবিধা উপলব্ধি করিয়া কাছাকাছি অনেক ছোট কারখানা খোলা হয়। কিন্তু আখের কারখানা ঠিক ইহার বিপরীত, ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ে থাকে, কেননা গ্রামে বসিয়াই আখ মাড়াইয়ের কাজ চালাইতে হয়; বেশি ছোট জায়গায় এ-কাজ করা যায় না, তাছাড়া অনেক দূর দূর জায়গা হইতে আখ আনানও চলে না। সেইজন্য কারখানাকেই কাঁচা মালের কাছে যাইতে হয় অর্থাৎ এমন জায়গায় কারখানা খুলিতে হয় যেখানে কাঁচা মাল উৎপন্ন করা যায়। কেননা, কাঁচা মাল আনিয়া বেশি দিন ফেলিয়া রাখা চলে না আর খুব বেশি দূর হইতে আনাও সম্ভব নয়। এই কারখানাও আবার সারা বৎসর ধরিয়া চলে না;

বৎসরে আন্দাজ চার-পাঁচ মাস চলে। গ্রামেই কারখানা হওয়ায় মজুররা নিজের নিজের গ্রাম হইতে আসিয়া কাজ করে এবং কাজ ফুরাইলে নিজের গ্রামে চলিয়া যায়। এই হইল এক রকম। দ্বিতীয় প্রকার বিহারের কয়লা-খনিতে দেখা যায়। সেখানে সারা বৎসর কাজ চলে। বহু মজুর দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া খনির কাছাকাছি ডেরা বাঁধে, এই সব ডেরা খনির মালিকই উহাদের জন্য তৈয়ারি করাইয়া দেন। এই কাজটা খানিক চালু হইয়াছে কিন্তু আখের খেতির মতো নয়, সমান তো নয়ই। তৃতীয় আর এক প্রকারের কাজ হয় জামশেদপুরের বড় কারখানায়। ঐখানে সকল দেশেরই লোক কাজ করে এবং ঐখানেই তাহারা বসবাস করে। উহাদের সুবিধার জন্য কোম্পানী সেখানে অনেক ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়াছে। এই প্রদেশের অন্যান্য জায়গায় আরও কিছু ছোট বড় কারখানা আছে সেখানেও রকমারি জিনিস তৈয়ারি হয়। যেমন, লোহা আর গালার কারখানা, কাপড় আর পাট বোনার কারখানা, চাল এবং তেলের কারখানা ইত্যাদি। অভ্রের খনি ও কারখানাও যথেষ্ট আছে। অন্য ধাতুর খনিও আছে। এই সব রকম কারখানারই মজুরদের অবস্থা জানার জন্য কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন কারখানা ও খনি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা মজুরদের এবং পুঁজিপতিদের কথা শুনিলেন এবং বিবৃতি নিলেন। আমি আখের এবং আর দুই-একটি ব্যতীত সব কারখানাই এই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে গিয়া দেখিলাম। বিবৃতি ও এজাহার গ্রহণের কাজে আমারও কিছু অংশ ছিল। এই কাজ শেষ হইলে রিপোর্ট সম্বন্ধেও অনেক কথা হইয়া গেল। কমিটি রিপোর্ট লিখিবার ভার অধ্যাপক রাজেন্দ্রকিশোর শরণকে দিলেন। তাঁহার রিপোর্ট লেখাও শেষ হইয়াছিল, কিন্তু কমিটির তখনও উহা বিচার করিয়া দেখিবার সময় হয় নাই। রামগড় কংগ্রেস শেষ হইতেই আমি এই কাজটি সমাপ্ত করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কংগ্রেসের অধিবেশনের তিন-চার দিন পরেই ইহার এক বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছিল। আমি রামগড় হইতে পাটনা গিয়া এই কমিটির কাজে লাগিয়া গেলাম।

প্রায় চৌদ্দ-পনের দিন ধরিয়া কমিটির বৈঠক চলিল। সকাল ৭টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত, আবার ২॥টা হইতে সন্ধ্যা সাত-আটটা পর্যন্ত প্রতিদিন আমরা বসিতাম। তাছাড়া রাত্রিবেলা অথবা সকালে দুপুরে যতটুকু সময় পাইতাম আমি একা বসিয়া তথ্যগুলি অধ্যয়ন করিতাম। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রিপোর্ট মঞ্জুর হইল। আমার সর্বাপেক্ষা বেশি আনন্দ হইল যে রিপোর্টের বড় বড় অনুমোদনগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ছোটখাট দুই-চারিটি বিষয়ে অল্পবিস্তর মতভেদ অবশ্য হইল, কিন্তু রিপোর্ট সকলেই একবাক্যে পাশ করিলেন। ইহাতে আনন্দের কথা এই জন্য যে ইহার মধ্যে মালিকদের প্রতিনিধিও ছিলেন আর মজদুর

সংঘের প্রতিনিধিও ছিলেন। জন কয়েক নিরপেক্ষ সমঝদারও ছিলেন। এই তিনের মতৈক্য এই কথাই বলে যে আমাদের সকলকেই ইহাতে ওজন করা হইয়াছে এবং আমাদের অনুমোদনগুলি কারখানার মজদুর ও মালিক কেহই সেগুলিকে অযোগ্য ও অসম্ভব বলিয়া সরাসরি নামঞ্জুর করিতে পারিল না। সকলেই এই বিষয়ে পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন। সকলের সদিচ্ছা ও শুভ ভাবনারই ফলে এই মতৈক্য। আমরা জানিতাম যুদ্ধের জন্য পরিস্থিতির বহু পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, আর যদিও এখন পর্যন্ত (১৯৪০ এপ্রিল মাস) ভারতের এমন কোন বড় রকম আর্থিক পরিবর্তন চোখে দেখা যাইতেছিল না তথাপি তাহার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেজন্যই মনে হইয়াছিল আমাদের অনুমোদনগুলি হয়তো পুরাপুরি কাজে লাগান হইবে, যাহাই হউক আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করিলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে মালমসল্লা আমরা প্রস্তুত করিলাম, আমরা যে-সব অভিজ্ঞতার কথা হাসিল করিয়াছি, তাহা এ-বিষয়ে যাঁহারা বিবেচনা করিবেন তাহাদের অবশ্যই কাজে লাগিবে এবং কংগ্রেস যদি আবার অধিকার ফিরিয়া পায় তবে কিছু-না-কিছু অবশ্যই করিবে। আমাদের আশা পূর্ণ হইল না। আমি যতদূর জানি, কমিটির সুপারিশগুলি ফাইলেই পড়িয়া আছে, উহার উপর কোন কাজই করা হয় নাই। আমরা একটি মজদুর-বিভাগ স্থাপনার জন্য অনুমোদন করিয়াছিলাম। শুনিয়াছি এ-বিষয়ে অল্প কিছু করা হইতেছে কিন্তু তাহা অতি সামান্য এবং তাহাও নাম-কে-ওয়াস্তে করা হইতেছে। শ্রমিকের সুবিধাজনক একটি অনুমোদনও কাজে লাগান হয় নাই। গভর্নমেণ্ট সম্ভবতঃ এ-বিষয়কে মোটেই গুরুত্ব দেন না। এই কমিটির মেম্বারদের মধ্যে শ্রীহেমেন আগে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। রেলওয়ে বোর্ডের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি এখন টাটা কোম্পানীর হিসাব বিভাগে প্রধান অডিটরের কাজ করিতেছেন। সেই দিক হইতে ইনি বড় বড় কারখানার প্রধানদের মধ্যে অন্যতম। কমিটিতে আমি দেখিয়াছি ইঁহার পরিশ্রমের শক্তি অদ্ভুত আর ইঁহার বিচারবুদ্ধি বেশ প্রগতিশীল। যদি ইনি আর শ্রীএম. বি. গান্ধী, যিনি পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন, আমাদের সঙ্গে একমত না হইতেন তবে আমাদের একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। সেইরূপ, অধ্যাপক আব্দুল বারি যদি মজদুরদের তরফ হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত না মানিয়া লইতেন তাহা হইলেও মতৈক্য দুর্লভ হইত। এজন্য ইঁহারা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন। অন্যান্যদের মধ্যেও শ্রীরাধাকমল মুখার্জি আর রাজেন্দ্রকিশোর আপনাদের বিদ্যা ও অধ্যয়ন দিয়া কমিটির রিপোর্ট লিখিতে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। তাছাড়া, শ্রীবাখলের বোম্বাই মজদুর-সংঘের অভিজ্ঞতা এবং শ্রীজগতনারায়ণলাল ও শ্রীহরেন্দ্র বাহাদুর

চন্দ্রের বিহারের সম্বন্ধে জ্ঞান কমিটি রিপোর্ট রচনার কাজে লাগাইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বড়ই দুঃখের ঘটনা হইয়া গেল। কমিটির রিপোর্ট তৈয়ারি হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই অকস্মাৎ শ্রীরাজেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হইল। পূর্ব হইতেই তাঁহার পেটের পীড়া ছিল। আমি জানিতাম তাহাকে খুবই কষ্ট ভোট করিতে হয়। কমিটির কাজে তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রচুর উৎসাহ আর যোগ্যতা সহকারে তিনি কাজটি করিয়াছিলেন। রোগ বাড়িয়া গেলে চিকিৎসার জন্য তিনি বোম্বাই চলিয়া গেলেন। শুনিয়াছি, পেট চিরিয়া ফেলিতে হইয়াছিল আর তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। আমার থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কথা মনে পড়ে আর দুঃখ হয় যে, হয়তো বা কমিটির জন্য পরিশ্রমের ফলেই বিহারের এক অতি যোগ্য ও উৎসাহী বিদ্বান ব্যক্তি এমন অকালে আমাদের ছাড়িয়া গেলেন।

তৃতীয় কমিটি ছিল হিন্দুস্থানী কমিটি, ইহার কাজ বৃহৎ। কেননা একটি পারিভাষিক শব্দের অভিধান, আর হিন্দী উর্দু দুইয়ের গ্রাহ্য শব্দের একটি অভিধান, ইহারা এই দুইটি প্রস্তুত করিবার ভার হাতে নিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন উপসমিতির হাতে কাজের ভাগ সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয় নাই। ১৯৪৩ সনে পেঁাছিয়া এই কাজটি শেষ হইল। ১৯৪২ সনের অগাস্ট মাস হইতে জেলে থাকার জন্য আমি এই কাজের ভাগ লইতে পারি নাই। ইহার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ উপসমিতি নির্বাচন ছাড়া, অন্য কোন উল্লেখযোগ্য কাজে আমি লাগাতে পারি নাই। প্রধান কাজ ছিল অভিধান দুইটি আর ব্যাকরণ প্রণয়ন করা। ইহার একটির দিকেও আমি দেখিতে পারি নাই। এই হিন্দুস্থানী কমিটির সম্বন্ধে আমাদের বিহারে এবং তাহার বাহিরেও নানা প্রকার কথা হইয়াছিল। হিন্দীওয়ালারা ইহাকে হিন্দীর বিরোধী মনে করিল, আর পরে উর্দুওয়ালারাও তাহাদের অনুসরণ করিল। আমি এ-কথা মানিয়া লইতে পারি নাই যে আমি হিন্দীর বিরোধী, এবং তাহার অনিষ্ট করিতে চাই। এই-ভাবে উর্দুওয়ালারাও ডাক্তার আবদুল হককে উর্দুর বিরোধী কোনও মতেই বলিতে পারে না, কারণ তিনি উর্দুর শুধু একজন পণ্ডিতই ছিলেন না, তাহার অনেক সেবাও করিয়াছিলেন, এবং আজও করিতেছেন—তাঁহাকে উর্দুর সকল আন্দোলনের নেতাই বলিলে চলে। তাহা হইলেও উভয় পক্ষের লোকেরা কমিটির বিরোধিতা করিল। বিরোধিতা করে করুক, কিন্তু এ-বিষয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্যই আছে যে অনেক কথা অনর্গল বলা হয় যাহার কোনও ভিত্তি নাই, সেই সব ভিত্তিহীন কথা আবার জন-সাধারণের মধ্যে বুদ্ধিভেদের সৃষ্টি করে। যাহা হউক, তাহার কাজও শেষ

হইয়া গিয়াছে। জানি না, যে-অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল, তাহার বিষয়ে লোকে কি বলিবে। এ-কথাও বলিতে পারি না যে আমি নিজেই বা কি বলিব; কারণ ওসব দেখিবার সুযোগ এখনও পাইলাম না।

শ্রমিকদের তদন্তের কাজ শেষ করিয়া আমি সোজা ওয়ার্ধা চলিয়া গেলাম, সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, সোনপুরে শিবির খুলিবার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল, দিনও নির্ধারিত হইয়াছিল। যে-দিন শিবির খুলিবার কথা ঠিক সেই দিন আমি ওয়ার্ধা হইতে ফিরিলাম এবং সোজা সোনপুর চলিয়া গেল্যম। সেখানে এক সপ্তাহকাল থাকিলাম। সুতাকাটা ছাড়া সেখানে একত্রিত লোকদের সঙ্গে প্রত্যহ অনেক কথাবার্তা বলিতে হইত। এইভাবে এই সময়ও পরিশ্রমেরই সময় ছিল। প্রায় দেড়শ দুইশ প্রধান কর্মী সেখানে থাকিতেন। যখন তখন সন্ধ্যাবেলায় সাধারণ সভাও হইত, তাহাতে আশ-পাশের গ্রামের লোকেরাও আসিত। প্রধানতঃ গঠনমূলক কার্যক্রমেরই উপর জোর দেওয়া হইত; কারণ তাহার জন্য প্রস্তুতির উপায় বলিয়া আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। উহার সাহায্যে আমরা লোককে বিদ্রোহ করিতে শিখাই, এরূপ নয়; সত্যাগ্রহের জন্য যে-সংযম অনিবার্য তাহা কর্মীদের মধ্যে আসে বলিয়া, জনসমূহকে সঙ্গে লইয়া কাজ করিবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক যে জনসাধারণের সম্পর্ক তাহা সৃষ্টি হয় বলিয়া।

শিবিরের কাজ শেষ করিয়া আমি পাটনায় ফিরিলাম। সেখানে অন্য একটি কাজ শেষ করিতে লাগিয়া গেলাম যাহা শেষ করা কর্তব্য মনে করিলাম। এ-কাজ ছিল এক পঞ্চায়েতের, যাহা আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে যে-পরিশ্রম করিতে হইল তাহা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। রামগড়ের পরিশ্রমের পর হইতেই যে ক্রমাগত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইল—শ্রমিক তদন্ত কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি, সোনপুর শিবির ও পঞ্চায়েতের—তাহা আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল; কাজ করিতে করিতে আমার মাথা ঘুরিত, আমি যেন অজ্ঞানের মত হইয়া যাইতাম। ডাক্তার শরণ ও ডাক্তার ব্যানার্জি আসিলেন। অবস্থা দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। অনেক দিন পর্যন্ত মাথা ঘোরার কষ্ট থাকিল। একটু ভাল হইলে আরাম করিবার জন্য জীরাদেঈ চলিয়া গেলাম। সেখানে প্রায় এক মাস ধরিয়া পড়িয়া থাকিলাম। তবে গিয়া আবার কিছু কাজ করিবার শক্তি হইল।

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার যুগেই মুসলীম লীগ প্রবলভাবে তাহার বিরোধিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। লীগ এ-কথাও উঠাইয়াছিল যে মন্ত্রীসভা মুসলমানদের সঙ্গে ন্যায়াচরণ করে না, অত্যাচার করে। তাহারা পীরপুরের রাজাকে সভাপতি করিয়া এক কমিটি করিল। সেই কমিটি এক রিপোর্ট দাখিল করিল, তাহাতে কংগ্রেসের তথাকথিত অত্যাচারের এক তালিকা দিল। বিহারে ব্যারিষ্টার মিঃ শরীফ এই প্রকারের রিপোর্ট দুই খণ্ডে দুই বার প্রকাশিত করেন। এই রিপোর্টে অনেক ভুল, ভিত্তিহীন ও অসংযত কথা লেখা ছিল। মন্ত্রীসভা তাহা খণ্ডন করিয়া প্রচার করিলেন। যখন এসেম্বলিতে কথা হইল, সেখানে ইহার পুরাপুরি উত্তর দেওয়া হইল। কিন্তু মন্ত্রীসভা যাহা করিত বা যাহা বলিত তাহার প্রচার তো মুসলমানদের মধ্যে হইতে পারিত না, লীগ যাহা চাহিত ও বলিত তাহার প্রচার খুবই হইতে লাগিল! লীগ হিট্‌লারের সেই নীতি অবলম্বন করিল যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ—কিছু সত্য থাকিলেও তাহা অনেক বাড়াইয়া ও বারবার বলিয়া—প্রচার করা হয়, আর সে-প্রচার এত প্রবল হয় যে জনসাধারণ তাহাতে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এইভাবে কংগ্রেসের প্রতি ও হিন্দুর প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষ-বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের মধ্যে এক প্রকাণ্ড পরিখা খনন করা হইল। নির্বাচন যখন হয়, যে-নির্বাচনের ফলস্বরূপ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল, লীগের জোর খুব সামান্য ছিল। বিহারে তো লীগের তরফ হইতে কোন প্রার্থীই ছিল না। এইভাবে অনেক প্রদেশে তো লীগের অস্তিত্বই ছিল না। যদি বা কোথাও থাকিত তবে উহা ছিল এক দুর্বল প্রতিষ্ঠান। তাই কংগ্রেসকে যখন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে হইল তখন লীগকে মন্ত্রীসভার মধ্যে আনিতে পারিল না; অন্যান্য মুসলমানদের মধ্য হইতেই যাহারা নির্বাচিত হইয়াছিল তাহাদের মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশে লীগের সদস্যদের মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, আর আজ মনে হয় যে এরূপ করিলে হয়তো লীগের এতখানি শক্তি হইত না। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই কেহ কেহ ইহা ভাল মনে করে নাই, তাই লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া হইতে পারে নাই। লীগ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করা লীগ তাহার প্রধান কর্তব্য করিয়া লইল। যে-সব অভিযোগের কথা পীরপুর রিপোর্ট ও শরীফ

রিপোর্টে ছাপা হইয়াছিল তাহার সত্যতা নির্ণয় কোনও নিরপেক্ষ আদালতের অথবা ব্যক্তির দ্বারা কখনও করা হয় নাই। আমি কংগ্রেসের প্রধান কর্ম-কর্তা হিসাবে মিঃ জিন্নাকে লিখিয়াছিলাম যে এগুলির তদন্ত ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গোয়ার অথবা ঐরূপ অন্য কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির দ্বারা করানো হউক এবং তিনি তাঁহার অভিযোগগুলি পেশ করুন, আমি এজন্য প্রস্তুত। কিন্তু উত্তরে তিনি ইহাতে সম্মত হন নাই, বলিয়াছিলেন যে বিষয়টি তো ভাইসরয়ের সম্মুখে পেশ করাই আছে, তিনি যাহা ভাল মনে করিবেন করিতে পারেন।

উপরে বলা হইয়াছে যে ভাইসরয় কংগ্রেসের প্রতি খুশি ছিলেন না। তিনি তো মুসলিম লীগকে সাহায্য করিয়া উহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার জন্য এবং উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি এই সকল অভিযোগের তদন্ত করাইবার বিষয়ে কিছু বলেনই নাই, হয়তো মিঃ জিন্নাই এ-কথার উপর জোর দেন নাই। কথা যেখানে সেখানেই থাকিয়া গেল। কিন্তু সংবাদপত্র, পত্রিকা, বক্তৃতায় ঐ সকল অপ্রমাণিত অভিযোগ প্রচার করিবার পদ্ধতি চলিতে থাকিল। লর্ড লিনলিথগো লীগের এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে ১৯৩৫-এর বিধান লইয়া যুদ্ধের পর পুনরায় নূতন ভাবে আলোচনা করা যাইবে এবং তাহাতে সমগ্র ভারত-জোড়া যে এক সংঘ করিবার কথা হইয়াছিল তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। লীগ এই সংঘের বিরোধিতা করিতেছিল, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহাকে ইঙ্গিত আশ্বাস দিয়াছিল। এই সকল কথায় উৎসাহিত হইয়া, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিলে পর, মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের দিক হইতে আনন্দ জ্ঞাপন করিবার অনুমতি দিলেন, এবং মন্ত্রীসভার মুসলমানের মু ভ বলিয়া মনে করা হইল। বুদ্ধিমান মুসলমানদের উপরও এই প্রচারের এতখানি প্রভাব যে বিহারের মন্ত্রীসভা ইস্তফা দিলে পর অধুনা পরলোকগত মৌলবী খুরশেদ হোসেন আমার নিকটে ধন্যবাদ জানাইয়া তার করিয়াছিলেন।

এ-পর্যন্ত লীগ ভারত বিভাগের কথা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু বহু মুসলমান নানারূপে এ-কথা পেশ করিতেছিল। যখন আমি ১৯৩৯-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ওয়ার্ধায় ছিলাম তখন আমি এ-বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন পর্যন্ত আমি পাকিস্তানের বিষয়ে বিশেষ-রূপে কিছু জানিতাম না। সেখানে এ-বিষয়ে লেখা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া পড়িতাম। তাহার পর এক দীর্ঘ 'নোট' লিখিয়াছিলাম, তাহা পরে রামগড় কংগ্রেসের সময় 'হিন্দুস্থান টাইমসে' এক বিশেষ প্রবন্ধরূপে ছাপা হয়। উহা পরে এক পুস্তিকারূপেও প্রকাশিত হয়। অনেকে তাহা পড়িয়া পাকিস্তানের কথা জানিতে পারিল। ওদিকে মুসলিম লীগও

চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। রামগড় কংগ্রেসের কয়েক দিন পরেই ১৯৪০-এর মার্চ মাসেই লাহোরে লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেখানে লীগ পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাহার পর হইতে পাকিস্তানই মুসলিম লীগের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এক বৎসর পরে মান্দ্রাজে বাৎসরিক অধিবেশনে লীগ পাকিস্তান স্থাপন মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিল। নিয়মাবলীর মধ্যেও এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইল।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, কারণ ও পরিণাম

ইউরোপের যুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ভীষণ হইয়া উঠিতেছিল। জার্মানী প্রবল গতিতে ইউরোপে একের পর আরেক দেশ জয় করিতেছিল। পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি গ্রীষ্মের পূর্বেই উহার মুঠির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। এইবার ফ্রান্সের পালা। ফ্রান্সও বেশি দিন টিকিতে পারিল না। অবশেষে উহাকেও অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইল। ইংরেজ সেনা বহু কষ্টে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া ডানকার্ক হইতে কোন প্রকারে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিল। ইংল্যাণ্ডে সেই জন্য লোকের মনে বড়ই ক্ষোভের সঞ্চার হইল। চেম্বারলেনের মন্ত্রীসভার পতন হইল। উহার জায়গায় একটি সর্বদলগত মন্ত্রীসভা গঠিত হইল, উইন্‌স্টন্ চার্চিল হইলেন প্রধানমন্ত্রী এবং মিঃ এমেরি ভারতের জন্য মন্ত্রী হইলেন। ইংল্যাণ্ড বেশ পরাক্রমের সহিত জার্মানীর বিমান বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিল—এমন সময় যদি ইংল্যাণ্ডের হার হয় আর ফ্রান্সও যদি অস্ত্র ত্যাগ করে এই আশঙ্কায় ইটালিও যুদ্ধে যোগ দেওয়া ঠিক মনে করিল। ইংল্যাণ্ডের তখন ভারি কঠিন সময়। তখন পর্যন্ত আমেরিকা যুদ্ধে নামে নাই আর জার্মানীও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় নাই।

আমাদের ওয়ার্কিং কমিটিতে এই গুরুতর পরিস্থিতির বিষয় বিচার করা হইতেছিল। কথা হইল, একবার ইংল্যাণ্ডকে স্পষ্ট বলা হইবে যে তাহারা যদি ভারতের সমস্যা মিটাইয়া ফেলে তবে কংগ্রেস যথাসাধ্য ইংরেজকে সাহায্য করিবে। এ-বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটিতে বিস্তর বাক্‌-বিতণ্ডা হইল। মহাত্মাজী যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্য দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহার মতে এভাবে সাহায্য করা কংগ্রেসের অহিংস আদর্শের বিরুদ্ধ কাজ হইবে। তিনি যে-সাহায্যের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কেবল নৈতিক

সাহায্য। তিনি মনে করিতেন ও এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, ইংল্যান্ড যদি ভারতকে স্বাধীন হইতে দেয় তবে তাহার নৈতিক স্থান এত উঁচু হইবে যে কেহই উহার সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারিবে না। কংগ্রেসের কথা হইল যে কংগ্রেসের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে আর হিন্দুস্থান সন্তুষ্ট হইয়াছে এটুকু জানা গেলেই যথেষ্ট। এমনি তো কংগ্রেস সক্রিয় সাহায্য না দিলেও ইংরেজ সরকার যাহা ইচ্ছা নিতে পারিবে ও নিবে, কংগ্রেস নিরপেক্ষ আছে তবু সে সবই নিতেছে—সুতরাং আমাদের পক্ষে আদর্শ ত্যাগ করা অনুচিত। তা ছাড়া এখন যদি হিন্দুস্থান আপনার আদর্শ নীতি বর্জন করে তবে যুদ্ধের অবসানে সমস্ত জগতের উপর ইহার খারাপ ফল ফলিবে। অপর দলের মতে, ভারত যদি ইংরেজের কাছে স্বাধীনতা প্রার্থনা করে তবে সেই সঙ্গে আমাদেরও ইংরেজকে সাহায্য করার কথা আসে। তাহাদের মতে, কংগ্রেস ইংরেজের নিকট হইতে স্বাধীনতা আদায় করিবে অহিংসাত্মক উপায়ে, কংগ্রেসের কথা তো এই পর্যন্ত; কিন্তু যদি কোন বিদেশী শত্রু দেশকে আক্রমণ করে, ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও যদি তাহা ঘটে, তখনও ভারতবর্ষ অহিংস থাকিবে এই বলিয়া দেশের হাত-পা বাঁধিয়া দিতে হইবে এমন তো কথা নাই। এরূপ করার আমাদের অধিকারও নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে দুই দলের এক মত ছিল যে, স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে এবং আপোশ রফার কাছে অহিংসার পথ ছাড়া হইবে না।

এইভাবে কেহ কেহ অহিংসার প্রয়োগকে সীমাবদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়া ইংরেজ সরকারকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং অন্য কেহ কেহ অহিংসার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা ভারতের, তথা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। আমারও সমর্থন এই দলের পক্ষেই ছিল, যদিও যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আমি একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম এবং এইভাবে আমরা কিছু করিতে পারিব কিনা সেই ভাবনাও ছিল। খান আব্দুল গফুর খাঁ পরম দৃঢ়তার সঙ্গে অহিংসার সিদ্ধান্তকে ধরিয়া রহিলেন। দিল্লী অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি যখন ঠিক করিলেন যে তাঁহাদের শর্ত—অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে এবং রাজ্যশাসনের এমন ব্যবস্থা হইবে যাহাতে ভারতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতা আসিয়া যায়—মানিয়া নিলে কংগ্রেস যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্য করিবে, তখন খান সাহেব, আমি ও আরও জনকয়েক বন্ধু ওয়ার্কিং কমিটির পদে ইস্তফা দিলাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ আশ্বাস দিলেন যে যতদিন ব্রিটিশ সরকার আমাদের দাবি পূরণ না করিতেছে ততদিন তো সক্রিয় সাহায্য দেওয়া এবং অহিংসা বর্জন করার কথাই উঠে না, অতএব আমাদের পদত্যাগপত্র উঠাইয়া লওয়া উচিত; যদি সরকার আমাদের দাবি

স্বীকার করিয়া লয় তখন তো আমাদের সক্রিয় সাহায্য করার কথা উঠিবে এবং তখন আমরা পদত্যাগ করিতে পারি। এই আশ্বাসের পর আমরা কয়জনে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলাম, কিন্তু খান সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। মহাত্মাজী এই সময়ে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি আর সম্বন্ধ রাখিবেন না। ইহাতে ওয়ার্কিং কমিটিতে এবং বাহিরে লোকের চিত্তে ভারি এক আলোড়ন উঠিল।

ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির আর একটি বৈঠক বসিল। তাহার পর এই বিষয়ে বিবেচনার জন্য পুণায় নিখিল ভারত কমিটির এক অধিবেশন ডাকা হইল। মতভেদ তো ছিলই আর পুণার অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ভোটাধিক্যে মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। আমিও ঐ বৈঠকে গিয়াছিলাম। গান্ধীজী পুণায় যান নাই। আমি আমার বন্ধু-গণের পক্ষ হইতে আমাদের মত জানাইয়া দিলাম, আর একথাও বলিয়া দিলাম যে আমরা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরোধিতাও করিব না, নিরপেক্ষ থাকিব। ইহা সত্ত্বেও অনেকে বিরোধিতা করিল। আমরা নিরপেক্ষ না থাকিলে হয়তো প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া যাইত। এইভাবে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব পাঠান হইল। আশা ছিল উহারা প্রস্তাবটি ভাবিয়া দেখিবে এবং আমাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। প্রস্তাবটি পাশ হইবার দিন কতক পরেই ঐ পক্ষ হইতে প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। লর্ড লিনলিথগো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইলেন যে লড়াইয়ের মধ্যে ইংরেজ সরকার আইন বদল করিতে অপারগ; তবে ইংরেজ সরকারের মধ্যেই থাকিয়া ভাইসরয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে কাজ করিবার জন্য হিন্দুস্থানীদের মধ্য হইতে, বিশেষভাবে বিখ্যাত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য হইতে বাছিয়া নূতন সদস্য নিযুক্ত করা হইবে, কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাই বেশি থাকিবে কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা বর্তমান সদস্যদেরই সমান হইবে। তা ছাড়া, যুদ্ধসম্বন্ধীয় ব্যাপারে মতামত দিবার জন্য অপর একটি কমিটি সরকার গঠন করিবেন, তাহাতেও বিশিষ্ট ভারতীয়দের স্থান দেওয়া হইবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে ইংরেজ ভারতীয়দের কোন অধিকার দিতে রাজী নয়, সকল ক্ষমতাই নিজের হাতে রাখিতে চায়। কংগ্রেসের দাবি না মানিয়া লইবার কোন কথাই ছিল না। এইরূপে, ওয়ার্কিং কমিটি এবং অখিল ভারতীয় কমিটি যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা কথার কথা থাকিয়াই ভাঙ্গিয়া গেল।

হিংসা আর অহিংসা লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। সেজন্য পুণায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই বিষয়ে এক প্রস্তাব পাশ করাইয়া-ছিলেন। তাহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছিল যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য

যতদিন বৃটিশ সরকারের সহিত আমাদের প্রযত্ন চলিতেছে ততদিন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মিটমাট করিতে ভারত আপনার অহিংসাত্মক কর্ম-পন্থায় অবিচল থাকিবে, ইহার মধ্যে কোন পরিবর্তন হইবে না। যদিও এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, তবু কংগ্রেসের ভিতরেই বহু লোকের এই কথা মনে ছিল কিনা আমার সন্দেহ হয়। আর যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাবের দরুণ অহিংসা নীতির মধ্যে যে-শিথিলতা আসিয়া পড়িল তাহার প্রভাব দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। অহিংসার সিদ্ধান্ত অপূর্ব সিদ্ধান্ত। এত বৃহৎ পরিসরে বিশেষত এক বৃহৎ শক্তির হাত হইতে স্বরাজ্য লাভ করার ব্যাপারে উহার প্রয়োগ আরও অদ্ভুত। অধিকাংশ লোকে ইহাকে নীতিরূপে গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ইহা পালন করিয়াছে। খুব কম লোকেই ইহাকে ধর্ম-বিশ্বাসের মতো করিয়া স্বীকার করে। সে জন্য ইহাতে লোককে অবিচল রাখা সহজ কাজ নয়। যে হেতু এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের ভিতরে সক্রিয়ভাবে এ-বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় নাই, সে জন্য জনসাধারণের মনে ইহার সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা জন্মে নাই। এখন যেই ওয়ার্কিং কমিটি আর নিখিল ভারত কমিটিতেই মতভেদ দেখা দিল, তখন জনসাধারণের মধ্যে আর বিশেষভাবে সাধারণ কংগ্রেসী কার্যকর্তাদের মধ্যে মতভেদ হওয়া আর আশ্চর্য কি? বৃহৎ জলরাশিকে বাঁধ দিয়া বাঁধিবার পর সামান্য একটু ছিদ্র থাকিলে তাহা যেমন ক্রমেই বাড়িয়া যায় আর কালে বাধ ভাঙিগয়া কুল ভাসাইয়া দেয়, ইহাও একরকম সেই অবস্থা দাঁড়াইল।

পুণাতেই আমি খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। কোন মতে ওয়ার্ধা পৌঁছিলাম। তখন বর্ষাকাল—যাহা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই খারাপ। সেখানে দিন কয়েকের মধ্যে একটু সুস্থ হইলে পর শেঠ যমুনালাল বাজাজ মহাশয় আমাকে কিছুদিন রাজপুতানার ভাল জলবায়ুতে থাকিয়া সারিয়া আসিতে বলিলেন। তিনি নিজেই আমাকে সেখানে লইয়া যাইবেন বলিয়া ব্যবস্থা করিলেন। পূজনীয় বাপুজীও এই ব্যবস্থা ভাল মনে করিলেন। আমি শেঠজীর সঙেগ জয়পুর গেলাম। দুর্ভাগ্যবশে সেখানেও বর্ষা নামিয়া-ছিল। রাস্তার কষ্টে আর বাদলার জন্য আমার শরীর খারাপ হইয়া পড়িল। সে জন্য আমাকে কিছুদিন জয়পুর থাকিতে হইল। প্রথমে তো ডাক্তারদের, পরে কবিরাজ শ্রীনন্দকিশোর শর্মার ওষুধ চলিতেছিল। সকলেরই মত হইল, জয়পুরের চেয়ে শীকরের মতো বালুকাময় কোন স্থানে থাকা আমার পক্ষে ভাল হইবে। এজন্য শেঠজীর সঙেগ শীকর গেলাম। সেখানে প্রায় এক মাস রহিলাম। এই শীকরেই এই জীবন-স্মৃতি লেখার আরম্ভ হয়। এই সময়েই আমার শেঠজীর জন্মস্থান, কাশীকেবাস নামক জায়গা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। উহার কাছেই

লোহাগরজী নামে একটি জায়গা আছে, লোকে উহাকে তীর্থস্থান মনে করে। পাহাড়ের উপরে বড় সুন্দর জায়গায় উহা অবস্থিত। যমুনালালজী একদিন আমাকে ঐখানে নিয়া গেলেন। আমি ঐখানে থাকিতে থাকিতেই বোম্বাইয়ে আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইল; সেই অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা সম্বন্ধে আলোচনার পর ঠিক হইল যে, কংগ্রেস ইহা মানিয়া লইতে পারে না। এখন কংগ্রেসকে আপনার সক্রিয় নীতির কথা জগৎকে বলিতে হইবে। আর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করাও স্থির হইল।

সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার গান্ধীজীর উপর দেওয়া হইল। তিনি স্থির করিলেন, যদিও এই সত্যাগ্রহ হইবে ব্যক্তিগত, সামূহিক নয়, তথাপি কোনও ব্যক্তি তাঁহার অনুমোদন বিনা সত্যাগ্রহ করিতে পারিবে না, আর এমন লোককে সে-অনুমতি দিবেন যাহারা গঠন কর্মের কোনও এক অংগ গ্রহণ করিয়াছে এবং উহাতে কাজ করিয়াছে। সংগে সংগে ইহাও স্থির হইল যে এমন লোককে অনুমতি দেওয়া হইবে যে প্রতিনিধিত্ব করিতেছে—অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ এমন হইবে যে তিনি কেবল ব্যক্তি নহেন, অনেকের প্রতিনিধিও বটে, যেমন এসেম্‌ব্লি ও কাউন্সিলের মেম্বর, জেলা ও মিউনিসিপাল বোর্ডের মেম্বর, কংগ্রেস কমিটির পদাধিকারী এবং নির্বাচিত সভ্য প্রভৃতি। ফলে এরূপ লোকেরাই অনুমতি পাইত যাহারা নিজেরা সুতা কাটিত, অস্পৃশ্যতা ভাবনা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং কোথাও-না-কোথাও পুনরায় নির্বাচনপ্রাপ্ত সদস্য। প্রথমটায় এসেম্‌ব্লি ও কৌনসিলের সদস্যদের তথা কংগ্রেস কমিটির পদাধিকারীদেরই অনুমতি মিলিত। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিদের তরফ হইতে এই সব লোকের তালিকা প্রস্তুত করিত, আর গান্ধীজীর নিকট অনুমোদন চাহিয়া পাঠাইত। তিনি অনুমতি দিলে তবে তালিকাভুক্ত লোকেরা সত্যাগ্রহ করিত।

সত্যাগ্রহের রূপ হইত এই—সত্যাগ্রহী ঘোষণা করিত যে আমরা যুদ্ধে কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পারি না। লোকে এ জন্য এক ধুয়া করিয়া লইয়াছিল—'না এক ভাই, না এক পাই', অর্থাৎ আমরা নিজেদের মধ্য হইতে এক ভাইকেও লড়াইয়ে পাঠাইতে চাই না, লড়াইয়ের জন্য এক পাইও অর্থ সাহায্য করিতে চাই না। লোকদের এ-বিষয়ে খুবই সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে সত্যাগ্রহে কোনও প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন যেন করা না হয়; কারণ আমরা সত্যাগ্রহের দ্বারা এই অধিকারই পাইতে চাই যে আমরা যাহাই উচিত মনে করি না কেন, দেশের সামনে তাহা প্রচার করিতে পারি, আমাদের এই অধিকারে যেন কোনও প্রকার বাধা না পড়ে, এমন কি যুদ্ধের দুর্বল যুগেও আমরা ইচ্ছা করিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিবার অধিকার যেন আমাদের থাকে।

অনেক লোক এই সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করিল, অনেকে ঠাট্টা করিল। বামপন্থীরা গরম দলের, তাহাদের বক্তব্য ছিল যে এই প্রকার ঠাণ্ডা সত্যাগ্রহ হইতে কোনও লাভ নাই, ইহাতে ব্রিটিশ সরকারের উপর কোনও প্রভাব পড়িতে পারে না, ইহাতে আমরা তাহাদের কাজে কোনও প্রকার বাধা জন্মাইতে পারিব না। কেহ কেহ বলিত যে প্রচারের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা তো শুধু ধোঁকার টাটি, আমরা যুদ্ধের বিরোধ করিতে চাই। কিন্তু খোলাখুলিভাবে তাহা করিবার সাহস আমাদের নাই, এইজন্য এই ছলনা বা স্বার্থসিদ্ধির যুক্তি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছি। কথাটা হইল এই যে আমরা সংসারকে দেখাইতে চাহিয়াছিলাম যে আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যুদ্ধে তাহাকে সাহায্য দিতেছিলাম না, আর কোনও প্রকার শোরগোল বা হাঙ্গামা না করিয়াই তাহা দেখাইতে চাহিয়াছিলাম। যদি ব্যাপক সত্যাগ্রহ করা হইত তবে অনেক শোরগোল ছাড়া কাজ করা কঠিন হইত, আর প্রতিনিধিদের শুধু অনুমতি দিয়া আমরা ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলাম যে শুধু একজন নয়, তাহার পিছনে যাহাদের সে প্রতিনিধি অর্থাৎ অসংখ্য নরনারী, তাহারাও আছে, আর এই সত্যাগ্রহ হইতেছে সকলের তরফ হইতে; ব্যক্তি কেবল নিমিত্তমাত্র, সত্যাগ্রহ সকলেই করিতেছে। এই সকল কারণে বিক্ষোভ প্রদর্শন শক্ত হাতে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি নির্বাচনেও সম্পূর্ণ কড়াকড়ি করা হইত। যাহারা সত্যাগ্রহে যোগ দিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল কিন্তু কোনও কারণে যোগ দিতে পারে নাই, তাহাদের দরখাস্ত দিয়া ছুটি লইতে হইত।

বিহারে, নিজের স্বাস্থ্যের জন্য, আমার পক্ষে সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার অর্থ হইত আমার অসুস্থতা দেখা-শোনার ভার গভর্নমেণ্টের উপর দেওয়া। এইজন্য গান্ধীজী নিজেই আমাকে আটকাইয়া দিলেন। প্রথম দিন যখন শ্রীবাবু ও অনুগ্রহবাবু পাটনাতে দুই জায়গায়, একজনের কিছু পরে অন্য জনে সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল এবং সেই অনুসারে শ্রীবাবু সত্যাগ্রহ করিবার জন্য বাঁকীপুরের ময়দানে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানে বিস্তর লোক একত্র হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল বেশি। সেখানে কিছু শোরগোল হইল, আর শ্রীবাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া যে জেলে লইয়া যাওয়া হইল তাহার জের কটক পর্যন্ত চলিল। আমি দেখিলাম, এইভাবে আরম্ভ করা গান্ধীজীর নির্দেশ ভঙ্গ করা হইবে এবং যদি এখন ইহাকে উৎসাহিত করা হয় তবে পরে আর সামাল দেওয়া মুশকিল হইয়া দাঁড়াইবে এবং লোকে নিজেরাই অনুশাসনের ধ্বজা উড়াইবে। ইহা চিন্তা করিয়া আমি অনুগ্রহবাবুর একক সত্যাগ্রহ আর ঐ প্রদেশের সত্যাগ্রহ দুই-ই তখনকার মত বন্ধ করিয়া দিলাম। যতদিন না লোকে সত্যাগ্রহের মর্ম পুরাপুরি বুঝিতে পারিবে এবং গান্ধীজীর

নির্দেশ ঠিকমত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে ততদিন উহা বন্ধ থাকিবে। এই কথা সারা দেশে ছড়াইয়া গেল। লোকে বুঝিল যে এই রকমটা চলিতে পারে না, পরের দিনই আমার কাছে আসিয়া অনেকে বলিল যে এই রকম ভুল আর হইবে না, কিন্তু এইভাবে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিলে সমগ্র প্রদেশের দুর্নাম হইবে। আমিও দেখিলাম আবহাওয়ার সংশোধন হইয়াছে, তখন দুই দিন বাদে আবার সম্মতি দিয়া দিলাম। তাহার ফলে সমগ্র প্রদেশে শান্তিপূর্ণভাবে, ঠিক যেমনটি গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন, সত্যাগ্রহ চলিতে লাগিল।

প্রধানমন্ত্রী (শ্রীবাবু) হইতে আরম্ভ করিয়া এসেম্‌ব্লি আর কাউন-সিলের অধিকাংশ সভ্য, জিলা বোর্ড আর মিউনিসিপ্যালিটির অনেক সদস্য, কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষের কয়েকজন ও সদস্যদের জনকয়েক, সবশুদ্ধ প্রায় হাজার খানিক লোকে সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে গেলেন। সরকার যে-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রায় সকলেরই এক বৎসর করিয়া শাস্তি হইল। ইহার মধ্যে আবার প্রায় সকলেরই তিন মাস মকুব হইত, যাহাকে জেলের ভাষায় মার্কা বলে। সেজন্য প্রায় সকলেই নয় মাস পরে ছাড়া পাইয়া যাইত। আমি বাহিরে ছিলাম আর অধিকাংশ সময় গান্ধীজীর সঙ্গে ওয়ার্ধাতেই কাটাইতে হইয়াছিল। ইহার এক কারণ ছিল যে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট জেলে যাওয়ার পর কংগ্রেস সংগঠনের সমুদয় ভার একরকম তাঁহারই উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, যদিও কংগ্রেসের সেক্রেটারি আচার্য কৃপালনিকে বাহিরে রাখিয়া লওয়া হইয়াছিল। মহাত্মাজীর আগ্রহে আমি আর কৃপালনিজী তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ওয়ার্ধাতেই বেশি সময় ছিলাম।

কংগ্রেসীরা মন্ত্রীত্ব তো ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী ছিল সে সব জায়গায় এখন গভর্নর নিজে ৯৩ ধারায় শাসন করিতেছিলেন। সরকার কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন, দেখিলেন মন্ত্রীরা ফিরিয়া আসেন কি না; সেদিকে কোন আশা নাই দেখিয়া ক্রমে তাঁহারা এসেম্‌ব্লি-সদস্যদের ভাতা বন্ধ করিয়া দিলেন। যদিও পরিষদের অধ্যক্ষ-গণের সঙ্গে চাপরাশি প্রভৃতিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহারা অল্পবিস্তর কাজও করিতেছিলেন, তবু তাঁহাদের মাসোহারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কংগ্রেস অবশ্য জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি বর্জন করিতে কংগ্রেসী সদস্যগণকে নির্দেশ দেন নাই। অনেক জায়গায় কংগ্রেসীরা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। কংগ্রেসী সদস্যগণ সকলে মিলিয়া ইহাদের কাজ করিতেন। এমনও দেখা গেল যে সত্যাগ্রহের ফলে ভাল সদস্যেরা কেহ কেহ সরিয়া গেলে তাহাদের জায়গায় অন্যায় লাভের জন্য কেহ কেহ গিয়া বসিলেন। আমাদের কেহ কেহ এমন ভুলও

করিলেন যে কংগ্রেসী সদস্যদের শূন্য আসনে নতুন এমন লোক বসাইলেন যাহারা কংগ্রেসের অনুশাসন মানিয়া চলিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল। কোনও কোনও জায়গায় নূতন নির্বাচন হইল, এবং সোজাসুজি না হইলেও পরোক্ষভাবে কংগ্রেসীরাই সে সব জায়গায় ঢুকিলেন। ফলে এই সকল বোর্ডে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল সেরূপভাবে কংগ্রেসের অনুশাসন খাটিল না। নানা রকম অভিযোগ শুনা যাইতে লাগিল। কংগ্রেসের মধ্যে যে-দলগত ঐক্য ছিল তাহা এবার ছুটিয়া গেল। তাহাতে কংগ্রেসের দুর্নাম হইল।

আমার নিজ প্রদেশে তো সব দায়িত্বই আমার উপর ছিল। অধিক সময় ওয়ার্ধায় থাকায় আমি অনেক কিছু করিতে পারিতেছিলাম না। সেজন্য আমি একটু বাঁধাবাঁধির জন্য একটি ছোট বোর্ড গঠন করিলাম। এই সব বোর্ডের কাজ এই কমিটির উপর সঁপিয়া দিলাম। আমার দুঃখ এই যে, এত চেষ্টাতেও অবস্থা শুধরাইল না। আমার বিশ্বাস হইল, বিহারের এই সবগুলি বোর্ড হইতেই কংগ্রেসী সদস্যদের সরাইয়া নিলে কল্যাণ হইবে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার অল্প কয়েক দিন পরেই এই প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুক্তি পাইবার সময় হইল। তখন মনে হইল উহাদের ছাড়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিয়া উহাদের মতটা নেওয়া উচিত। উঁহারা ছাড়া পাইলে পর উঁহাদের মত লইয়া আমি নির্দেশ দিয়া দিলাম যে কংগ্রেসীরা জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। ইহার ঠিক পরেই আবার অসুস্থ হইয়া আমি ওয়ার্ধা ফিরিয়া গেলাম। সেখানে গিয়া খবর পাইলাম যে অধিকাংশ লোকে এই নির্দেশ পালন করিলেও জন-কয়েক এই নির্দেশ মানিতেছেন না। অবশ্য ইঁহাদের সংখ্যা বেশি নয়। জিলা কমিটিগুলি আর প্রাদেশিক কমিটি ইঁহাদের বিরুদ্ধে অনুশাসন জারি করিয়াছেন। অনেক লোককে কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। এসব ১৯৪১ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের কথা। ১৯৪০ সনের নভেম্বর হইতে ১৯৪১ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরও কিছু ঘটিল যাহার কথা এখানে বলা উচিত।

আমি উপরে বলিয়াছি যে তখন আমাকে ওয়ার্ধাতে অনেক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। আমি ওখানে থাকিতে মহীশূর কংগ্রেসের শ্রীদাসাপ্তা ওয়ার্ধায় আসিলেন। তিনি মহাত্মাজীকে বলিলেন যে তাঁহাদের বার্ষিক উৎসব হইবে, সেই অনুষ্ঠানে আমার যাওয়া দরকার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের ভার তাঁহারা আমার উপর দিতে চাহেন। মহাত্মাজী তাঁহার অনুরোধ মানিয়া নিলেন। আমাকে ওখানে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর ধারে হরিহর নামক স্থানে ঐ সম্মেলন হইল। ভারি সুন্দর দৃশ্য। লোকের মনে খুব উৎসাহ দেখা গেল। সম্মেলন, প্রদর্শনী ছাড়াও দাসাপ্পাজী আমাকে মহীশূরের অনেক সুন্দর ও পুরাতত্ত্বের জন্য প্রসিদ্ধ জায়গা দেখাইতে চাহিলেন। আমিও তাহাই চাহিতেছিলাম। সেখানে যাইবার আগেই শ্রীদাসাপ্পার সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছিল। তিনি কাজের প্রোগ্রামও করিয়া নিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর এবং মহীশূরের মন্দিরগুলি ছাড়াও বহু হিন্দু এবং জৈন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিলাম। শ্রবন বেলগোলা এবং হলেবীড়ের দৃশ্য অদ্ভুত। ঐ সব জায়গায় বিশ্বের মানুষকে চমৎকৃত করার মত যে-সব নিদর্শন আছে, মনে হয়, সেই সব না দেখিলে মানুষের কৃতিত্বের অনেকখানিই দেখা হইল না। একটি পাহাড়ের চূড়ায় পাথর কাটিয়া মহাবীর তীর্থঙ্করের যে-বিরাট মূর্তি খোদিত করা হইয়াছে তাহা অনেক দূর হইতে, প্রায় ১০/১৫ মাইল হইতে, দৃষ্টিগোচর হয়। কৃতিত্ব এইখানে যে অত বড় মূর্তি কিন্তু পৃথকভাবে নির্মাণ করিয়া ওখানে শিখরের উপর চড়ানো হয় নাই বরং সেই পাহাড়ের উঁচু চূড়া কাটিয়াই করা হইয়াছে এবং চারদিকের পাহাড় কাটিয়া সমতল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূর্তি এত সুন্দর যে আপনি অনেক মাইল দূর হইতেই দেখুন আর নিকটে গিয়াই দেখুন, তাহার সকল অঙ্গ এমন অনুপাত রাখিয়া গড়া হইয়াছে যে মনে হয় কোথাও কোনও ত্রুটিই চোখে পড়িবে না। প্রত্যেক অঙ্গ, পায়ের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া নাক কান পর্যন্ত নিজের নিজের জায়গায় ঠিক অনুপাতে তৈরি হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। ইহা জৈনদের এক মহা তীর্থ, আর সারা ভারতবর্ষের জৈনগণ ইহা দেখিতে যান। শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল যে আরার শ্রীনির্মল-কুমার জৈন সপরিবারে আসিয়া সেখানে অবকাশ যাপন করিতেছেন। ওখানকার লোকে আমাকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন। আমি শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম যে আরার নিকটে যেখানে

তিনি বিধবাদের জন্য একটি আশ্রম খুলিয়াছেন সেখানে এই মূর্তির অনুকরণে একটি ছোট মূর্তি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, অবিকল এই রকম, তফাতের মধ্যে শুধু আকারে—যেখানে এই পাহাড়ের মূর্তিটি ৬০/৭০ ফুট উঁচু সেখানে আরার মূর্তি ২০/২২ ফুট। এখানকার এই জিনিসটি তো বিশাল মূর্তি নির্মাণ-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা।

এখন হলেবীডে এমন কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায় যাহা সূক্ষ্মতার একেবারে সীমা পর্যন্ত পেঁছাইয়া গিয়াছিল। সেখানকার মন্দিরগুলিতে পুরাণের কথা মূর্তির আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূর্তিগুলি অত্যন্ত সুন্দর ও মধুর। প্রায় পনেরো-কুড়ি ফুট উঁচুতে একটি মূর্তি আছে, তার গায়ে ফুল-লতা-পাতা আঁকা আছে আর সেই ফুলের মধ্যে একটি মধুমক্ষিকা বসিয়া রহিয়াছে। নীচে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় সত্য একটি মৌমাছি বসিয়াছে আর ঐ তো তাহার পা ও পাখা। বস্তুত মূর্তিটি ও তার গায়ের ফুল-পাতা যেমন পাহাড়ের গা খোদিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে, ঐ মধুমক্ষিকাও সেইভাবেই পাথরে খোদাই করা। কেহ আলাদা তৈয়ারি করিয়া উহাকে ঐখানে বসায় নাই। দক্ষিণের মন্দিরগুলিতে পাথরে তৈয়ারি শিকল আকছার দেখা যায়। কোন ধাতু দিয়া শৃংখল তৈয়ারি করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কারণ উহার এক একটি কড়া আলাদা আলাদা করিয়া বানাইয়া একটির সঙ্গে আরেকটি গাঁথিয়া তোলা হয় আর জোড়ের জায়গাগুলি পিটিয়া বা গরম করিয়া ফাঁকগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাথরে গড়া শৃংখল তো আর সে প্রকারে করা চলে না। উহার কড়াগুলি আলাদা আলাদা বানানো যায় না। একই পাথরকে লম্বা লম্বা টুকরা কাটিয়া একের সঙ্গে অপরকে জুড়িয়া বানাইতে হয়। কাজটা বেশ শক্ত, কেননা, যদি কোন হাতুড়ি বা ছেনি জোরে লাগে আর একটি টুকরাও ভাঙ্গিয়া যায় তবে সমস্ত শিকলটাই খারাপ হইয়া যাইবে। আমি অন্য মন্দিরেও শিকল দেখিয়াছি কিন্তু তাহারা আকারে বৃহৎ। হলেবীডের একটি মূর্তি আমি বেশ কিছু উঁচুতে উঠিয়া দেখিয়াছি, অনেক অলঙ্কারে মূর্তিটি সুসজ্জিত। সকল অলঙ্কারই পাথরের আর ঐ রকমই একটি টুকরা পাথরে খোদাই করা, যে-পাথরে মূর্তিটি তৈয়ারি সেই পাথরেই অলঙ্কারগুলিও খোদিত। ঐ মূর্তির নাকে একটি ছোট্ট ঝুলনি বা নাক-বেশর, তাহাও ঐ পাথরের, আর ছোট্ট বেশরটি নাকের এক ততোধিক ছোট ছিদ্র হইতে ঝুলিতেছে। নাকে যে নথ ছিল তাহাও খুব সূক্ষ্ম আর নাকের ছিদ্রের চারি পার্শ্বে উহাকে ঘুরান যায়। ঐ নাকের গহনাটির ব্যাস আধ ইঞ্চির বেশি হইবে না আর তাহা হইতেই নাকের ছিদ্রের আয়তন আন্দাজ করা যাইবে। বিশালতা আর সূক্ষ্মতা এই দুইয়ের সুন্দর সুন্দর নমুনার বিবরণ পড়িয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন স্বল্প সময়ের মধ্যেই

ওখানকার কত শিল্পকলা আর শিল্পীদের কৃতিত্বের নমুনা আমরা দেখিতে পারি! পাথরের উপর এই রকম বিশাল ও সূক্ষ্ম কাজের নিদর্শন আমরা অজন্তা এবং এলোরায় দেখিতে পাই। অজন্তায় চিত্রকলার আশ্চর্য বিকাশ দেখা যায় আর এলোরায় আছে পাহাড়ের গায়ে কাটা বিশাল মন্দির আর সুন্দর সূক্ষ্ম মূর্তি নির্মাণের চমৎকার নিদর্শন।

তৃতীয় আশ্চর্য ছিল সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। গিরিসপ্পা জল-প্রপাত যে-জায়গায় অবস্থিত তাহা ইংরেজ রাজ্য আর মহীশূর রাজ্যের সংযোগস্থল। প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু হইতে জল পড়িতেছে। একদিকে বৃটিশ রাজ্যের এক কোণ আর অন্যদিকে মহীশূর রাজ্যের এক কোণ হইতে আমরা ইহা দেখিতে পারি। কিন্তু মহীশূর রাজ্য হইতে দেখিলে দৃশ্য অধিকতর সুন্দর ও মনোরম হয়। সেখানে থাকিয়া ও বসিয়া দেখিবার জন্য উৎকৃষ্ট স্থান রাজ্য সরকার করাইয়া দিয়াছেন। আমি খানিকক্ষণ বসিয়া এই চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতেছিলাম। সেই সময় ঐখান হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার জন্য কারখানা প্রস্তুত করার ও বহু-দূর পর্যন্ত বিদ্যুৎ পেঁাছাইবার ব্যবস্থা মহীশূর রাজ্যের পক্ষ হইতে করা হইতেছিল। অনেক শ্রমিক সেখান হইতে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত কাজ করিতে আসিয়াছিল। জানি না এতদিনে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর মানুষকে মানুষের পীড়নের কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে আর সেই শোভা আছে কি না।

বিহার শরীফের দাংগা ও ভারতীয় জাহাজ কোম্পানি

কয়েক দিনের জন্য পাটনায় আসিয়াছিলাম, পুনরায় ওয়ার্ধায় ফিরিয়া গেলাম। যে-দিন পাটনা হইতে রওনা হওয়ার কথা ছিল সেই রাত্রিতে শুনিতে পাইলাম, বিহার-শরীফে হিন্দু-মুসলমানে কিছু মনোমালিন্য হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে একটা বড় সমস্যা, এবং ইহার পরিণামে ভয়ংকর খুন-খারাপি হইতে পারে, তাহা মনে হয় নাই। ওয়ার্ধায় পেঁাছিবার একদিন পরেই সংবাদপত্রে জানা গেল, টেলিগ্রামও পেঁাছিল যে বিহারে ভীষণ দাঙ্গা-ফেসাদ বাধিয়াছে। গান্ধীজীর নির্দেশ হইল, আমিও মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, এ-অবস্থায় আমার অবিলম্বে বিহারে যাওয়া উচিত। আমি ফেরত গাড়ীতে রওনা হইলাম। পাটনায় পেঁাছিয়া জানিলাম যে শাহ মহম্মদ উজির মুনীমী ও মথুরাবাবু কয়েক দিন ধরিয়া বিহার-শরীফেই আছেন এবং সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে,

অনেক হিন্দু ও মুসলমান খুন হইয়াছে, এবং অত্যাচার বিহার-শরীফ শহরে আরম্ভ হইলেও সেখানে সীমাবদ্ধ না-থাকিয়া গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। মনে পড়িল, ১৯১৮ সালে এই প্রকারে শাহাবাদের পীরো নামক গ্রামে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া সেই জেলা ছাড়া আশপাশের জেলাগুলির কয়েক অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাই আমি আরও চিন্তিত হইলাম। সুযোগ মতো ঐদিন প্রফেসর আবদুল বারিও, ইনি বাহিরে ছিলেন, পাটনায় আসিয়া পেঁাছিলেন। আমরা সঙ্গে মোটর ও লরী লইলাম। তাহাতে বিহার বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রদের এবং অন্য অনেক কর্মীদের উঠানো হইল। ঐ দিনই বিহার-শরীফের দিকে যাত্রা করিলাম। সেখানে পেঁাছিয়া যখন শাহ উজির মুনীমী ও মথুরাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল তখন সব বুঝিতে পারিলাম। অনেকে খুন হইয়াছিল; তবে অবস্থা এখন কিছু ভালর দিকে যাইতেছে। গভর্নমেণ্ট পুলিশেরও প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনার এবং পুলিশের বড় বড় অফিসারও পেঁাছিয়া গিয়াছিলেন। শাহ সাহেব ও মথুরাবাবু প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যেখানে যেখানে হাঙ্গামা হইত সেখানে গিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিতেন। কোথাও কোথাও আক্রমণকারীদের পরে পেঁাছিতেন, সেখানে মৃতদেহগুলি নিজেরাই উঠাইয়া যথাস্থানে পাঠাইবার বিষয়ে সাহায্য করিতেন।

আমরা পেঁাছিবামাত্র চারদিকে গ্রামে গ্রামে, যেখানে যেখানে কিছু দুর্ঘটনার সংবাদ আসিতেছিল, সর্বত্র আগমনবার্তা ছড়াইয়া পড়িল। লোকের মনে সাহস জন্মিল, ভুল ধারণা দূর করিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় সকলে লাগিয়া গেল। তিন-চার দিনের মধ্যে অবস্থা অনেকটা শুধরাইয়া গেল। সেখানেই প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খাঁ বাহাদুর মহম্মদ সৈয়দ ইসমাইলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হইল। আমরা দুইজন এক দিনের জন্য পাটনায় আসিলাম। সেখানে এক বৃহৎ সাধারণ সভায় আমরা উভয়েই বক্তৃতা করিলাম। আমি পুনরায় বিহার-শরীফে ফিরিয়া গেলাম। কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া যেখানে যেখানে মারপিট, লুটতরাজ ও খুন-খারাপি হইয়াছিল সেই সব স্থানে গিয়া লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম ও তাহাদের শান্ত করিলাম। যাহা দেখিতে পাওয়া গেল সে-দৃশ্য বড়ই ভয়ানক ও ব্যথাদায়ক। হিন্দু বা মুসলমান যখন এই ধরনের ঝগড়ায় জড়াইয়া পড়ে তখন ধর্ম ও মনুষ্যত্ব দুই-ই ভুলিয়া যায়। পরস্পরের রক্তপিপাসু হইয়া ওঠে। এই ঝগড়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মারা গিয়াছিল, তবে মুসলমানের সংখ্যা ছিল অধিক। এই ঝগড়া না থামাইলে অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিত। শান্তি স্থাপিত হইলে পরে আমি পুনরায় ওয়ার্ধায় ফিরিয়া গেলাম।

সেখানে অন্য একটি কাজের ভার লইলাম, অথবা ইহা বলাই ভাল যে আমার উপর সেই কাজের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোং ভারতবাসীদের জাহাজী কোম্পানী। ইহাদের জাহাজ বিশেষ করিয়া ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষের সমুদ্রতটের বন্দরগুলিতেই বেশি যাওয়া-আসা ও মাল বহার কাজ করিত। কোম্পানী চাহিতেছিল যে জাহাজ তৈরি করিবার জন্য এক কারখানা খোলে। অন্ধ্রের বিশাখাপট্টনমে এজন্য উপযুক্ত স্থান বাছা হইয়াছিল। ডিরেক্টরদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শেঠ বালচন্দ হীরাচন্দ ও শেঠ শান্তিকুমার নরোত্তম মুরারজী। তাঁহাদের মত হইল যে আমি এ-কাজের ভার লই। সে-সময়ে আমি গান্ধীজীর আজ্ঞা ছাড়া কোনও কাজই করিতাম না। এজন্য তাঁহারা গান্ধীজীকে বলিলেন। ওখানে যাইবার অনুমতি পাইলাম। এই ব্যাপারে ভারতীয় জাহাজের ও বাণিজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার সুযোগ মিলিল। এমনিতে তো অল্পস্বল্প জানিতাম যে ব্রিটিশেরা কি ভাবে এরূপ প্রসারিত বাণিজ্য ভারতবাসীদের হাত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু এবার অধ্যয়নের ফলে এ-বিষয়ের জ্ঞান আমার আরও অধিক বাড়িল। এই অধ্যয়নে কোম্পানীর লোকেরা পুস্তকাদিও পেঁৗছিয়া দিয়াছিল, এইজন্য পড়াশুনায় অনেক সুবিধাও হইয়াছিল। আমি এই সুযোগে ওখানে যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহাতে সমস্ত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলাম। কোম্পানীর দিক হইতে বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। সমস্ত ডিরেক্টরেরাই সেখানে আসিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সরকারি নৌ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনেক ধুমধামের সঙ্গে এই মহোৎসব শেষ হইল। সাধারণের হিতকর কার্যের জন্য আমাকে উৎসবের আয়োজনকারীরা কিছু টাকাও দিয়াছিল। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে আমি সে-টাকা যে-সব প্রতিষ্ঠান ঐ কাজে যুক্ত থাকিত তাহাদের দিয়া দিলাম। তাঁহারা আমার সঙ্গে কিছু জিনিসপত্রও দিয়াছিলেন, ফিরতি ট্রেনে কিছু দূর চলিয়া আসিবার পর আমি তাহা দেখিলাম।

বিশাখাপট্টনমের কাছেই ওয়ালটেয়ার। সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া ঢাকা যাইবার পথে আমি আর মথুরাবাবু কলিকাতা পেঁীছিলাম। পথে কটকেও অল্পক্ষণের জন্য ছিলাম। ঢাকায় যাইতেছিলাম কারণ সেখানেও গুরুতর হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছিল। ঢাকা শহরে আরম্ভ হইয়া এই দাঙ্গা অনেক গ্রামেও ছড়াইয়াছিল। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঢাকায় তো বহু লোক খুনও হইয়াছিল। আমরা যখন পেঁীছিলাম তখন অবস্থা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ওখানে যাওয়ার আগেই কলিকাতায় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও স্যার নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি যখন কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিতাম তখন হইতেই ফজলুল হকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বাংলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীরা সেবার যখন জেলে অনশন করিতেছিল সেই সময় আলোচনার সূত্রে স্যার নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

ঢাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করিলাম। হিন্দুদের উপরে বড়ই জুলুম হইয়াছিল। সেজন্য হিন্দুদের মনে স্বভাবতই রাগ ছিল। মুসলমানগণ ঢাকার নবাব সাহেবের বাড়ীতে এক চায়ের আসরে আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। আমি ঢাকার প্রাচীন কংগ্রেসী, তখনকার জিলা কমিটির সভাপতি, শ্রী শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। যে সব গ্রামে লুঠপাট, আগুন লাগানো ইত্যাদি হইয়াছিল, ঢাকা হইতে গিয়া সেগুলি দেখিলাম। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বাংলা দেশে সব সময় পাকা দালান হয় না, অনেক সময়ই ঘরগুলি টিন অথবা খড় দিয়া ছাওয়া হয়। দেওয়ালগুলি বাঁশের টাট দিয়া গাঁথা হয়, আর ঐগুলি কাঠ বা বাঁশের খুঁটির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মাটির মেজে রক্ষার জন্য কোন কোন জায়গায় ঘরের মেজে সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইয়া লওয়া হয়। এমন সব গ্রাম দেখিলাম যেখানে শুধু আগুনে পোড়া কাঠের খুঁটি ও সিমেণ্ট করা মেজে ছাড়া ঘর-বাড়ির কোন চিহ্ন নাই। অবস্থা বিহার-শরীফেও খুব খারাপ হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকা জেলার অবস্থার সঙ্গে তুলনাই হয় না। বিহারে হিন্দুর সংখ্যা বেশি, সেখানে মুসলমানরাই বেশি মার খায় ও লুঠপাটও তাহাদের উপরই বেশি হয়। ঢাকার মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশি সেজন্য হিন্দুদের উপরই উপদ্রব বেশি হয়। তবে ঢাকায় যে-ধরনের লুঠ-পাট আর অগ্নিদাহ হয় উহার তুলনায় বিহারে কিছুই হয় নাই।

দুই-তিন দিন ঐ সকল গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবার পর ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামাঞ্চলে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার স্বগ্রাম জিরাদেঈয়ের দুইটি লোকের সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা কাজ খুঁজিতে ঢাকায় আসিয়াছে। বহু বিহারী লোক যেমন করে, ইহারাও কিছু পয়সা কামাইয়া বিহারে যাওয়া-আসা করিত। আমার আশ্চর্য লাগিল যে আসাম যাত্রায় যেমন সারণ জেলার লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, বাংলা দেশের গ্রামে আসিয়া সেইরূপ আমার দেশের লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। গরীব বিহারী মজদুরদের যতটা সাহস আর অধ্যবসায় আছে, সেখানকার লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। প্রদেশের বাহিরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু অশিক্ষিত মজদুর একদিকে যেমন বোম্বাইয়ে হঠাৎ দেখিয়াছিলাম, অন্যদিকে সেই রকম রহিয়াছে বর্মা, বাংলা ও আসামে। ইংরেজী শিক্ষা কি আমাদের প্রদেশের লোককে অলস ও নিষ্কর্মা করিয়া তুলিতেছে?

এ-বিষয়ে আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। এই গরীব বেচারীরা সুদূর ব্রহ্মদেশ, বাংলা, আসাম ইত্যাদিতে গিয়া মজুরি খাটিতেছে, সেখানকার ক্ষেত চাষ করিতেছে, ধান পাকিলে কাটিতেছে, পালকি বহিতেছে, গরুর গাড়ি হাঁকিতেছে, মাটি কাটিবার ক্ষেত্রে তো ইহাদের যেন একচ্ছত্র রাজত্ব—গ্রামে পুষ্করিণী কাটা, কূয়া তৈয়ারি করা, বাড়ি তোলা, ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যকীয় কাজ সবই করিতেছে—ধনী লোকের বাড়িতে চাকরি করিতেছে, খিদ্‌মদ্‌গারির ও পাহারাদারের কাজও অধিকাংশ ইহাদেরই হাতে। এইভাবে বাংলা, আসাম ইত্যাদি হইতে বিহারের গ্রামে অনেক পয়সার আমদানি হয়—বিশেষ করিয়া সারণ জেলায়। উপার্জনকারীরা যখন বাহিরে গিয়া থাকে, তখন জীরাদেঈ গ্রামের পোষ্ট অফিসে প্রায় প্রতি সপ্তাহে চার-পাঁচ হাজার টাকা মনি অর্ডারযোগে আসে। লোকেরা হিসাব করে যে এইভাবে বিহারের গ্রামে বাহির হইতে বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা আসিয়া থাকে। কোনও কোনও বাঙ্গালী-ভাই বলিতে চান যে বিহারের লোকেরা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বিহারী, যাহাদের সরকারি দপ্তরে ও উকিলখানায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। জানি না এইভাবে সরকারি দপ্তরের কেরানীরা রাজা-রাজড়ার কর্মে নিযুক্ত বাবু, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি বিহার হইতে কত টাকা লইয়া যান; কারণ ইঁহাদের টাকা তো আর গরীবের মত ছোট ছোট মনি অর্ডারযোগে যায় না; আর একথাও বলা কঠিন যে হিসাব করিলে বিহার পায় বেশি না বাংলা। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট। বিহারীরা বাংলায় গিয়া এমন আবশ্যক কাজ করে যাহা না-হইলে সেখানকার লোকদের জীবন নির্বাহই কঠিন হইয়া পড়ে, আর যাহার

প্রয়োজন বাঙগালী-ভাই অনুভব করে। কিন্তু বিহারে বাঙগালী যে-কাজ করে তাহার বিষয়ে শিক্ষিত বাঙগালী চায় ও বলে যে বাঙ্গালী যদি একাজে না আসিত তাহা হইলে বিহারীদের কিছু ক্ষতি হইত না। তাহারা নিজেরাই সমস্ত কাজ চালাইতে পারিত। এ ছাড়া শত শত বিহারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ম্যালেরিয়া ইত্যাদির কবলে পড়িয়া যাহা অর্জন করে একজন বাঙগালী উচ্চ পদে বসিয়া আরাম করিতে করিতে ততখানি উপার্জন করে। যাহা হউক, এ-প্রকার মন কষা-কষি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। চাকুরিজীবীদের মধ্যে বিহারী ও বাঙগালীর বড় ভিড়। গরীবের কথা হয়তো কদাচিৎ কাহারও মনে ভাসে।

এই ঝগড়ার জন্য কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সময়, বিহারে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। একদিকে বিহারীদের অভিযোগ ছিল যে অনেক বিভাগের দপ্তরে এবং সরকারি কাজে ঐ সময় হইতে—যখন বাংলা ও বিহার একত্র ছিল—বাঙগালীরা দখল করিয়া লইয়াছিল এবং স্বতন্ত্র প্রদেশ স্থাপিত হইবার পরে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেলেও তাহাদের সমান আধিপত্য ছিল। অন্যদিকে বাঙগালীরা বলিত যে অনেক বাঙগালী যদিও বাংলা ভাষাই বলে, কিন্তু তাহারা বিহারের অধিবাসী অথবা বিহারে বসতি করিয়া আছে, তাই তাহাদের সরকারি চাকুরি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও প্রকারের বিহারী-বাঙগালী ভেদ-জ্ঞান করা অনুচিত—তাহাদের অভিযোগ ছিল যে এই প্রকার ভেদ-ভাব কার্যতঃ দেখানো হয়। এই অভিযোগ কংগ্রেস পর্যন্ত পৌঁছিল, আর যে-সময়ে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন ওয়ার্কিং কমিটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার ভার আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমি সকল কথা পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়া এক দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করিলাম, তাহাতে গত কথা ছাড়া ভবিষ্যতের নির্দেশও ছিল, কিরূপে সকলের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে আচরণ করা যায়। ওয়ার্কিং কমিটি আমার রিপোর্ট ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে সেই অনুসারে কাজ করিতে আদেশ দিলেন। আমার অনুমান, উভয় পক্ষই আমার অনুমোদনগুলি মঞ্জুর করিলেন। যদিও কোনও এক পক্ষের সকল দাবী তাহাতে মঞ্জুর করা হয় নাই তথাপি লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা এক প্রকার সত্যই।

যাহা হউক, যখন আমি পল্লী-অঞ্চল হইতে ফিরিয়া ঢাকা শহরে পৌঁছিলাম, তখন জানিতে পারিলাম যে ঢাকায় দাঙ্গার বিষয়ে গভর্নমেণ্ট তদন্ত করা স্থির করিয়াছেন এবং সরকারের দিক হইতে বাংলার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল আমার পুরাতন প্রিয় বন্ধু শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারকে অনুসন্ধান করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া দেখা হয়

নাই, বর্তমান সুযোগ উৎকৃষ্ট মনে করিয়া আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি নদীমধ্যে ছোট এক স্টীমারেই বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম এমন সময়ে খবর আসিল, ঢাকা শহরে পুনরায় খুনাখুনি আরম্ভ হইয়াছে, আর দুই-একজন ছোরাতে ঘায়েল হইয়াছে। আমার পরের দিনই চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল। রাত্রিও এই-ভাবেই কাটিল। সকাল বেলায় জানা গেল যে শহরে খুব গোলমাল চলিতেছে, অনেক লোকে ছোরার ঘায়ে আহত হইয়াছে। মনে হইতেছিল, হিন্দুরা যদি খবর পায় যে মুসলমানদের কোনও পাড়ায় দুই-এক জন হিন্দুকে ছোরা মারিয়াছে তাহা হইলে দুই-চার ঘণ্টার মধ্যে কোথাও-না-কোথায় কোনও পাড়ায় ঠিক ঐ-সংখ্যক মুসলমানকে ছোরা মারে। এই-ভাবের ব্যবস্থা হিন্দু-মুসলমান করিয়া চলিয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থার জন্যই যাহারা ছোরা মারে তাহারা ভাবে না যে যাহাকে মারা হইল সে কি দোষ করিল। যে মারে সে তো সুরক্ষিত থাকে, বাঁচিয়া যায়, আর হিন্দু হউক কি মুসলমান হউক, যে চুপচাপ নিরীহভাবে নিজের পথে চলে, কোনও অপরাধ করে না, সে অকারণে মার খায়। দুপুর বেলা যখন রওয়ানা হই তখন পর্যন্ত আট-দশ জন খুন হইয়াছিল। এই অবস্থায় তদন্তের কাজ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই উহা স্থগিত করিয়া দেওয়া হইল এবং যে-জাহাজে আমি ফিরিলাম সেই জাহাজে যোগেন্দ্রবাবুও কলিকাতায় আসিলেন।

কলিকাতা হইতে আমি সোজা পাটনায় ফিরিয়া আসিলাম। পাটনাতে ১৯৪১-এর জুন মাসের শেষ দিনে আসিয়া পেঁাছিলাম। পথেই যে হাঁপানি ও কাশি আরম্ভ হইয়াছিল তাহা খুবই বাড়িয়া গেল। জ্বরও হইল। আমি পাটনাতেই নামিয়া পড়িলাম। বর্ষাও শুরু হইয়া গেল, আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা বড়ই খারাপ। প্রায় দুই মাস সেখানেই পড়িয়া থাকিলাম। অবশেষে, উপরে যেমন বলিয়াছি, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিতেরা ছাড়া পাইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া শ্রীবাবু, অনুগ্রহবাবু, ইত্যাদি নেতৃস্থানীয় লোকেরা মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া ও জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কংগ্রেস সভ্যদের বাহিরে যাইতে আদেশ দিয়া আমি স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে ওয়ার্ধায় চলিয়া গেলাম।

যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা ও ক্রিপ্‌স্‌ পরিকল্পনা

আমি ঢাকায় থাকিতেই শুনিলাম জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। জার্মান সেনা খুব দ্রুত গতিতে রাশিয়ায় প্রবেশ করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। অল্প দিনের মধ্যেই জার্মানরা রাশিয়ার এক বৃহৎ অংশ দখল করিয়া লইল। এই যুদ্ধ বিরাট আকারের। রাশিয়ার উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত জার্মান আর রুশ সৈন্যের সমাবেশ। জার্মানী পশ্চিমে স্পেন ও পর্তুগাল, উত্তরে সুইডেন আর দক্ষিণে ইটালী ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব দেশ নিজের কবলে আনিয়া ফেলিয়াছিল। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আধিপত্য ছিল, তাহাকে ডিক্টেটার করিবার মধ্যে জার্মানীর অনেকখানি সহায়তা ছিল সেইজন্য তাহার জার্মানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ছিল। সুইডেনের বড় খারাপ অবস্থা। ইটালীও জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। এই সব পরাজিত দেশে কিছু লোক লুকাচুরি করিয়া জার্মানীর সঙ্গে গেরিলা লড়াই চালাইতেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ জায়গায়ই জার্মান রাজ চলিতেছিল অথবা কোন কোন জায়গায় জার্মানী স্থানীয় এমন লোকের হাতে শাসনভার দিয়া রাখিয়াছিল যাহারা জার্মানীর পক্ষ হইয়া শাসন করিবে।

আমেরিকার সহানুভূতি ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রতি। জাহাজ, অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া সে ইংরেজকে সাহায্য করিতেছিল, তবে খোলাখুলিভাবে তখনও যুদ্ধে নামে নাই। এদিকে জাপান আগেই চীনের এক বড় অংশ আপনার মুঠিতে লইয়াছিল; এখন দিন দিন আগাইয়া চলিল। আমেরিকা তো চীনকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু উহাকে সাহায্য পাঠাইবার তো একটি মাত্র রাস্তা আর সেই রাস্তা নিরাপদ নয়। সেই পথ ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া। ইংরেজ জাপানকে অসন্তুষ্ট করিতে চায় না সেজন্য ব্রহ্মের পথ সে বন্ধ করিয়া দিল। চীন তো একরকম নাচার হইয়া পড়িল। জাপান তো এই তক্কেই ছিল যে এই সুযোগে আমেরিকার পাল্টা জবাব দিবে। ১৯৪১ সনের শীতের আরম্ভে সে এই সুযোগ খুঁজিয়া পাইল এবং আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া আমেরিকার নৌসেনাকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিল। সে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং জার্মানী ও ইটালীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইল। ১৯৪১-এর নভেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খুব বড় একটা অংশের উপর প্রভুত্ব দাবি করিল। ডাচ উপনিবেশ —যেমন জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও অন্যান্য দ্বীপ—তাহার অধিকারে

আসিয়া গেল। ইংরেজদের নিকট হইতে সিঙ্গাপুর সে অতি শীঘ্র জয় করিয়া লইল। মালয় দখল করিতে করিতে সে বর্মার দিকে অগ্রসর হইল। শীঘ্রই মৌলমেন, রেঙ্গুন, মান্দালয় প্রভৃতি বর্মার শহর হাত করিয়া সে প্রায় সমস্ত ব্রহ্মদেশকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। লড়াই আরম্ভ হইবার দুই-এক দিনের মধ্যেই সে ব্রিটিশ নৌসেনাকে সিঙ্গাপুরের নিকটে কোথাও এক যুদ্ধে বিশেষভাবে পরাজিত করিল। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' নামে খুব বড় জাহাজ লইয়া ইংরেজ এডমিরাল ফিলিপ খুবই গর্ব করিয়া ঘোষণা করিতে করিতে বাহির হইয়াছিলেন যে তিনি জাপানী নৌসেনার সন্ধানে যাইতেছেন। জাপান তাহা ডুবাইয়া দিল।

উত্তর আফ্রিকায় ইটালিয়ানদের কিছু উপনিবেশ তো আছেই। সেখানেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তাহাতে জার্মানেরা যোগ দিল। কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা প্রায় মিশরের সীমা পর্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকা নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া লইল। মনে হইতেছিল, কোনও দেশই এখন জার্মানী ও জাপানের সৈন্যস্রোত রোধ করিতে পারিবে না। শীতের জন্য রাশিয়ায় জার্মান সেনাকে কিছুটা থামিয়া যাইতে হইল, কিন্তু উহা পিছনে হটিল না, যতদূর পৌঁছিয়া গিয়াছিল সেখানেই থামিয়া শক্ত হইয়া রহিল। ১৯৪২-এর প্রথম কয় মাসে অবস্থা এমন মনে হইতেছিল যে যুদ্ধে আমেরিকা যোগ দিলে ব্রিটেনের দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তখনও জাপান ও জার্মান সেনার সামনে কেহ দাঁড়াইতে পারিল না। আমেরিকা অতি বড় পরিসরে যুদ্ধের উপকরণ, নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী গঠন করিতে লাগিল। যে-সব দেশ মিত্রশক্তির সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিতেছিল তাহাদের সে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সম্পূর্ণ শক্তি সংগঠিত করিয়া যুদ্ধে পূর্ণ সাহায্য করিতে সময়ের অপেক্ষা ছিল, ১৯৪২-এর প্রথম কয় মাস পর্যন্ত সে-সময় আসে নাই।

জার্মানীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইতেছিল যে যে-দেশ তাহার দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিত তাহাকে সে আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লইত। কিন্তু এই দোষ হইতে ইংরেজ ও মিত্রদেশরাও মুক্ত ছিল না। তাহাদের ভয় ছিল যে জার্মানী ও জাপানী সেনা কখনও-না-কখনও ভারতবর্ষে একত্র হইতে পারে। ইহার প্রতিরোধের জন্য ইংরেজ একদিকে বর্মার সীমানায় যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, অন্যদিকে মিশরের নিকটে এক পরিখা বা দুর্গ প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিল। আরব ও ইরাণে আরও একটি পরিখা করিতে চাহিয়াছিল। এজন্য সে আরব ও ইরাণ দখল করিয়া লইল। ইরাণের বাদশাহ রেজা শা পেহ্লবী, যিনি ১৯১৪-১৮ যুদ্ধের পরে ইরাণকে শক্তিশালী করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং যিনি

সেখানকার লোকদের উন্নতি সাধনে অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া নির্বাসিত করা হইল। তাহার উপর আবার রুশ ও ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যদের এক খুব বড় কেন্দ্র ঐদেশে গড়িয়া উঠিল! মিঃ চর্চিল সারা জীবন রুশের সঙ্গে বিরোধ করিয়া আসিয়াছিলেন, না জানি কত গালি দিয়াছিলেন, তিনি এখন রুশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। মনে হইতেছিল উভয়পক্ষ বুঝি অতীতের সব কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন!

এই অবস্থায় ইংল্যান্ড ভাবিল যে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লওয়া যাক। স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ইংল্যান্ডের রাজদূত করিয়া রুশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যখন বন্ধুতা ছিল তখন রুশিয়ায় পাঠানো হয়; তিনি রুশিয়াকে জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। লড়াই আরম্ভ হইলে পর তিনি ইংল্যান্ডে ফিরিয়া আসেন। তখন সেখানকার যুদ্ধ পরিষদের তিনি প্রধান সদস্য হইলেন। তাঁহার চিন্তাধারার প্রগতির জন্য লেবার পার্টি বা শ্রমিক দল হইতেও তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই দুঃসময়ে, তাঁহার যোগ্যতার জন্য, বিশেষ করিয়া রুশদেশে তিনি যে-কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন তাহার জন্য, তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন। ভারতের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করিতে হইবে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত করেন। ক্যাবিনেটে লেবার দল ও লিবারেল দলের লোকেরাও ছিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক পরিকল্পনা রচনা করেন। উহা লইয়া স্যর ক্রিপ্‌স্‌ ভারতবর্ষে আসিলেন। এই পরিকল্পনা প্রথমে প্রকাশ করা হয় নাই। অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতবর্ষের পক্ষে এই পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইহা বলিতে বলিতে, ভারতবর্ষের দ্বারা ইহা অনুমোদন করাইবার ভার লইয়া তিনি ১৯৪২-এর মার্চ মাসে ভারতবর্ষে পেঁীছিলেন। পেঁীছিয়াই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদ, গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েক দিন পরে পরিকল্পনা প্রকাশ করাও হইল। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। আমরা সেখানে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ ধরিয়া ইহা লইয়া আলোচনা করিতে থাকিলাম। গোড়ায় কিছুকাল গান্ধীজীও দিল্লীতে থাকিলেন। কিন্তু কস্তুরবা গান্ধীর অসুস্থতার জন্য তিনি সেবাগ্রামে চলিয়া গেলেন। কংগ্রেসের দিক হইতে কথাবার্তা মৌলানা আজাদ ও পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু করিতে থাকিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য দিল্লীতে থাকিলেন। যে-সব কথাবার্তা হইত, তাহা আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বরাবর হইতে থাকিল।

ক্রিপ্‌স্‌-পরিকল্পনাকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম

ভাগে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে, তখন তখন ভারত-সরকারের কাজ চালাইবার জন্য ভারত-সরকারের বর্তমান কাউন্সিলে কি পরিবর্তন হইবে তাহা বলা হইয়াছিল। ইহাতে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এ-কথা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছিল যে যুদ্ধের পরে অন্যান্য উপনিবেশের যে-স্থান ভারতবর্ষকেও সেই স্থান দেওয়া হইবে, আর যদি ভারতবর্ষ চায় তো সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া থাকিবার অধিকারও তাহার থাকিবে—বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভা হইতে নির্বাচন করিয়া বিধান পরিষৎ গঠিত হইবে—প্রত্যেক প্রদেশের ইচ্ছা করিলে ভারতীয় সংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার অধিকার থাকিবে, আর যদি কোনও প্রদেশ ঐরূপ করে তবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারত অথবা ভারতীয় সংঘ বা ইউনিয়নের যে-সম্বন্ধ উহার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধই থাকিবে। এইরূপে এই পরিকল্পনা মুসলিম লীগের দাবি মানিয়া লইল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রদেশগুলির উপর ছাড়িয়া দিল। আপাতত কি করা হইবে, সে-বিষয়ে ভাইসরয়ের কাউন্সিলকে কি অধিকার দেওয়া হইবে তাহার কথা কিছু বলা হয় নাই। তাহাতে শুধু ইহাই ছিল যে সেনা সম্পর্কিত অথবা যুদ্ধ সম্পর্কিত কোনও অধিকার তাহার থাকিবে না; লোকেরা তাহার অর্থ ইহাই করিয়াছিল যে অন্য সকল বিভাগে ও বিষয়ে কাউন্সিলের অধিকার থাকিবে। প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ক্রিপ্‌স্‌ এরকম কিছু বলিয়াও দিয়াছিলেন।

এই পরিকল্পনায় গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইলেন না। দেখা হইলে তিনি স্যর ক্রিপ্‌স্‌কে এই কথাই বলিয়াও দিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির মতেও এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্থির হইল না; তবে কমিটিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ-বিষয়ে আলোচনা হইল। ভবিষ্যতে যদিও পাকিস্তানের কথা এই পরিকল্পনা এক প্রকার মানিয়া লইতেছিল এবং ওয়ার্কিং কমিটি তাহা মানিতে চাহে নাই, তথাপি ওয়ার্কিং কমিটি ইহা বুঝিয়াছিল এবং তাহার প্রস্তাবেও বলিয়াছিল যে, এ-কথা যদি প্রমাণ হয় যে কোনও বিশেষ প্রদেশের অধিবাসীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চায় তবে তাহাদিগকে জোর করিয়া সঙ্গে রাখাও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরোধী। কমিটির বিশেষ লক্ষ্য ছিল আপাতত কর্মের জন্য প্রস্তাবিত কাউন্সিলের উপর; কারণ কমিটি স্বীকার করিয়াছিল যে যুদ্ধের যুগে সমস্ত বোঝা কাউন্সিলকেই বহিতে হইবে, এবং তাহাতে কোনও অধিকার যদি ভারতবাসীরা না পায় তাহা হইলে ভারতের হিতের জন্য ভারতের অধিবাসীদেরই এই বোঝা বহন করা শুধু যে অনুচিত তাহা নয়, পরন্তু অসম্ভব অথবা অন্ততঃ কঠিন হইবেই। এইজন্য ওয়ার্কিং কমিটি এ-কথা পরিষ্কার করিয়া লইতে চাহিয়াছিল, সেনা অথবা যুদ্ধের সম্পর্কে কোনও অধিকার কাউন্সিলের থাকিবে কি

থাকিবে না, অথবা সব কিছু ভাইসরয় অথবা যুদ্ধ বিষয়ে যিনি লাট থাকিবেন তাঁহার হাতেই থাকিবে। আলাপ-আলোচনার পর তিনি কিছু সামান্য নামমাত্র অধিকার কাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যদের হাতে দিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে সে-অধিকার কি এবং কতখানি, তখন বোঝা গেল যে তাহা নিতান্তই নামমাত্র হইবে, তাহাতে কোনও অধিকারই বাস্তবিক হস্তান্তরিত হইবে না।

কমিটির নিকটে যখন এ-কথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল তখন উহা স্থির করিল যে এই পরিকল্পনা সে অনুমোদন করিবে না। কিন্তু এ-পর্যন্ত উহার এই ধারণা ছিল যে সৈন্য ও যুদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে এবং ভাইসরয় উহার মত অনুসারেই কাজ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও প্রকাশ ছিল যে যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য বিভাগে তো বিশেষ কিছু কাজ হইবে না, আর যুদ্ধ এমন বস্তু যে যাহা চালাইতে গেলে গভর্নমেণ্টকে পূর্ণ শক্তি দিতে হইবে, অন্যান্য বিভাগকেও ঐ কার্যেই লাগিয়া যাইতে হইবে; এইরূপে উহারাও একপ্রকার যুদ্ধ ও সৈন্য বিভাগেরই অধীন হইয়া থাকিবে, এইজন্য উহাদের অধিকার অর্থ এমন কিছু নয়। কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল, তখন স্যর ক্রিপ্‌স্ বলিয়াছিলেন যে কমিটি তাহার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখুক, কেবিনেটের সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে কথা-বার্তা চালাইবেন। এই কথাবার্তার ফলে সেনা-বিষয়ে নামমাত্র অধিকার দেওয়ার কথা হইয়াছিল। এ-বিষয়েও আলোচনা করার পর কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসিল যে কোনও বাস্তবিক অধিকার না পাইলে তাহার সম্মুখে যে-পরিকল্পনা উপস্থিত আছে তাহা অগ্রাহ্য করা ভিন্ন অন্য কোনও পথ থাকিল না। কমিটি এই নির্ধারণ করিয়াও লইল। ঠিক এই সময়েই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিশেষ দূত কর্ণেল জনসন দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁহার দেখাও হইল। তিনি বলিলেন, কিছু সময় দিন, আমিও চেষ্টা করিয়া দেখি কিছু হইতে পারে কি না। তাঁহার চেষ্টার ফল হইল এই যে, স্যর ক্রিপ্‌স্ লেখাপড়ার পর সেনা সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তন হইল। কেবিনেটের প্রস্তাব ছিল যে সেনা-সম্পর্কিত বিষয়ে ছাড়িয়া আর সকল কথা সামরিক লাটের অধীন হইবে। এখন এই প্রস্তাব আসিল যে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি সামরিক লাটের অধীন হইবে, অন্য সব কথা মেম্বরদের অধীন।

কথাটা দেখিতে ভাল লাগিল; কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্ কথা থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিয়া কয়েকটি বিভাগের নাম জানা গেল। কর্ণেল জনসনও জানিতেন না যে বিভিন্ন

বিভাগের যে-নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহার বাহিরের কোনও কথা রহিয়া গেল কি না যাহা সদস্যদের অধিকারে আসিবে। শেষে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেল যে প্রস্তাবে পূর্বে যে-সবের কথা বলা হইয়াছিল শুধু সেই সব বিষয়ই থাকিবে, তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছুই থাকিবে না! স্পষ্ট হইয়া গেল যে ইহা শব্দাড়ম্বর মাত্র, বাস্তবিক কোনও প্রভেদ নাই। আমাদের ইহা বড় খারাপ লাগিল। ইহার পরও আমরা ভাবিতে লাগিলাম যে সৈন্য-বিষয়ক আর যুদ্ধ-বিষয়ক অধিকার যদি না-ই পাওয়া যায় তো না-ই যাক, কিন্তু যদি অন্যান্য বিষয়ে অধিকার মিলে তবে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা চলে। কিন্তু তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে তাহাও বাস্তবিক কতটা পাওয়া যাইবে। প্রশ্ন করায় স্যর ক্রিপ্‌স্‌ বলিলেন যে এ-বিষয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গেই কথা বলিতে হইবে; কারণ এ-কথা তাঁহারই কাউন্সিলের বিষয়ে, এবং যখন আইন বদল হইতেছে না, তখন প্রচলিত বিধান অনুসারে তাহার যে-অধিকার আছে তাহার বিষয়ে তিনিই কিছু বলিতে পারেন। যখন বলা হইল যে কেবিনেট তাঁহাকে আদেশ দিন যে তিনি যেন নিজের অধিকার প্রয়োগ না করেন, এবং ঐ সকল বিষয়ে কাউন্সিলের রায় অনুসারেই কাজ করেন, তখন উত্তর হইল যে ক্যাবিনেট এ-প্রকার আদেশ দিতে পারেন না। আমরা এ-কথা সম্পূর্ণভাবেই জানিতাম যে কাউন্সিলের সদস্যদের কোনও অধিকারই ভাইসরয় মানেন না। তিনি মনে করিতেন ও মুখেও বলিতেন যে সদস্যদের কোনও অধিকারই নাই, শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়েরই সকল অধিকার, এবং সে-অধিকার তিনি ছাড়িতে চাহেন না!

যখন জানা গেল যে ঐ সকল বিভাগেও অধিকার পাওয়া যাইবে না, আর স্যর ক্রিপ্‌স্‌ প্রথমে যে বলিয়াছিলেন কেবিনেটের মত কাউন্সিলেরও অধিকার থাকিবে ও তাহা সক্রিয় অধিকার, তাহা শুধু বাগাড়ম্বর, তাহার মধ্যে কিছুই তথ্য নাই, তখন উহা নামঞ্জুর করা ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটির অন্য কিছু করার উপায় থাকিল না। সেই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। স্যর ক্রিপ্‌স্‌ও সে-দিন ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তিনি ফিরিয়া যাইতেছেন, এবং কেবিনেটের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের সামনে যে-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মীমাংসার অপেক্ষায় ছিল, এবং আমাদের মীমাংসা হওয়া মাত্র তাহারাও পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিল; তবে কারণ এই জানাইল যে উহাতে পাকিস্তান দেওয়া হয় নাই। শুধু উহার সম্ভাবনা আছে এবং লীগ শুধু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট নয়।

এইভাবে, কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মনে করিত যে পাকিস্তানের সম্ভাবনা নির্দেশ

করাও ঠিক হয় নাই—যদি কোনও প্রদেশ সত্যসত্যই পৃথক হইতে চায় এবং তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া সঙ্গে রাখা আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির বিরোধী হইবে, তথাপি এইজন্যই পরিকল্পনাটি অগ্রাহ্য করা হয় নাই। উহা অগ্রাহ্য করার কারণ ইহাই ছিল যে তখন কোনও অধিকার পাওয়া যায় নাই, যদিও কাউন্সিলের উপর লড়াইয়ে সাহায্য করার ভার সম্পূর্ণরূপে আসিয়া পড়িত—তাহার এই মাত্র অর্থ ছিল যে চাঁদা ও কর ধার্য করা এবং রংরুট ভর্তি করা বা করানো ছাড়া তাহার অন্য কোনও অধিকার মিলিত না! লীগের অগ্রাহ্য করিবার কারণের সঙ্গে তখন তখনই প্রাপ্য অধিকারের সম্পর্ক ছিল না। সে-কারণ তো ছিল শুধু লীগের মুসলমানদের মত অনুসারে শীঘ্র পাকিস্থান কায়েম না করা মাত্র।

ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরে শ্রীরাজাগোপালাচারির মত ছিল যে ক্রিপ্‌স্‌ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। তিনিই এই কথার উপর জোর দিয়াছিলেন যে উহার দ্বারা ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্যদের সৈন্য বিভাগ ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব বিভাগের উপর পূর্ণ অধিকার পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু শেষকালে যখন একথা পরিষ্কার হইয়া গেল যে উহাতেও কিছু পরিবর্তন হইবার কথা নয়, এবং ভাইসরয় তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিবার অধিকার কিছুমাত্র খর্ব করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন তাঁহার মুখও বন্ধ হইয়া গেল। ওয়ার্কিং কমিটির এই নির্ধারণ বিষয়ে কংগ্রেসের ভিতরেও অনেক লোকের খুবই ইতস্ততঃ ভাব ছিল তাহা পরে গিয়া বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের মনে কখনও কোনও সন্দেহ ছিল না। স্যর ক্রিপ্‌স্‌ও এমন অনেক কথা বলিয়াছিলেন যাহার কোনও ভিত্তি ছিল না। তাঁহার এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছিলেন যে ইহা গ্রহণ না করাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের একটা কারণ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত হইতে পারিল না তাই উভয়ে উহাকে অগ্রাহ্য করিল! তাঁহার বিবৃতির তাৎপর্য ছিল, এই অগ্রাহ্য করার দোষ কংগ্রেসের। কথা ছিল এই যে, ওয়ার্কিং কমিটির সামনে এ-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ বা ভেদের কথা লোকে যেমন বলে, সেরূপে আসেই নাই। পাকিস্থান লইয়া ঘোষণার বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির পরিকল্পনা হইতে মতভেদ অবশ্যই ছিল; কিন্তু তাহার জন্য কমিটি পরিকল্পনা বর্জন করে নাই। বর্জন করিবার কারণ, প্রথমেই যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি, একটিই—এই যুদ্ধকালে ইহার দ্বারা ভারতীয় কাউন্সিলারেরা এই দায়িত্ব লইয়া দেশের ভাল কিছু করিতে পারিবে না, যুদ্ধে সাহায্য করিবার দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ে আসিবে। উহাতে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা কত থাকিবে ইহা লইয়া মতভেদ হইয়াছিল, বিরোধী-পক্ষের বিবৃতিতে যাহা জানা গিয়াছিল, তাহাও ভুল। বরং কাউন্সিলে কতজন সভ্য থাকিবে, তাহার মধ্যে কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান

হইবে, কংগ্রেসের কতজন আর লীগেরই বা কতজন—এ-প্রশ্ন একবারও আমাদের সম্মুখে আসে নাই। তাহার সুযোগও ছিল না; কারণ এ-প্রশ্ন তো তখনই উঠিবার কথা যখন আমরা স্থির করিব যে কাউন্সিলে যাইতে হইবে। আমরা যখন সেখানে যাওয়ার প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিলাম তখন আমাদের সংখ্যা তাহাতে কত থাকিবে, এই প্রশ্ন কি করিয়া উঠিতে পারে, কখনও উঠেই নাই। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচার অনেক করা হইয়াছিল।

ক্রিপ্‌স্‌ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানের পর

ক্রিপ্‌স্‌ পরিকল্পনা ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাখ্যান করিলেন। এখন সে-বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য নিখিল কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আবশ্যক হইয়া পড়িল। অল্প দিনের পরেই এলাহাবাদে অধিবেশন হইল। এ-কথা এখন স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, ব্যাপারটা প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত থাকিয়াই থামিবে না, কংগ্রেসকে তাহার নীতি বুঝাইবার জন্য আরও কিছু করিতে হইবে। জাপান সবিক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। ইংরেজ সৈন্য তাহাদের সামনে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ভারতবর্ষে ঐরূপ সংঘর্ষের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতিও ছিল না। অত্যধিক বেগে ইংরেজ ও আমেরিকান সেখানে আনা হইতেছিল। অস্ত্রশস্ত্রও আমদানী করা হইতেছিল। কিন্তু তখনও সংঘর্ষ অনিবার্য বলিয়া মনে হইতেছিল না। দেশের সম্মুখে এই প্রশ্ন ছিল, জাপান যদি আসিয়া পড়ে তবে ভারতবর্ষ কি তাহার সম্মুখে মাথা নত করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইবে, না তাহার বিরোধিতা করিবে। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের রক্ষার ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছিল। এখন তাহাকে অসমর্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু এই অসমর্থতা সত্ত্বেও সে আমাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া, আমরাও দেশ রক্ষার কাজে হাত দিই, সে সুযোগ আমাদের দিতে চাহে নাই। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের নীতি তো ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিল। সে অস্ত্র লইয়া, ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া, জাপানের বিরোধিতা করিবার জন্য নিজের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করিয়াছিল এবং করিতেও চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহা তখনই সম্ভব ছিল যখন সেও ব্রিটিশের মত অধিকার লইয়া বা দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে পারিত। ইংরাজের ইহা ভাল লাগিতেছিল না!

তাহারা চাহিতেছিল, ভারতবর্ষ যাহা কিছু সাহায্য করিতে পারে তাহা করুক, কিন্তু ভারতবর্ষকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিল না। মিঃ চার্চিল বারবার এমনও বলিয়াছিলেন যে ইংরেজ কোনও নূতন দেশকে কুক্ষিগত করার লোভ করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহা তাহার আছে তাহা ছাড়িতেও চাহে না। একথা তো স্পষ্টই ছিল যে ভারত তাহারই ছিল, আর তাহাকে এই বিপদের সময়েও সে ছাড়িতে চাহে নাই। দুঃসময়ে সে ফ্রান্সকে বলিয়াছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্য দুই সাম্রাজ্য একত্র মিশাইয়া দেওয়া হউক—সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাহা কত সংগ্রাম, কত কূটনীতির পর ব্রিটেন ফ্রান্সের নিকট হইতে জয় করিয়া লইয়াছিল! কিন্তু ভারতবাসীরা নিজেদের কর্তৃত্বে বাস করিবে ব্রিটেন ইহা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের নিজের দেশে নিজেরা দায়িত্ব লইয়া জাপানীদের প্রতিরোধ করিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটেন প্রস্তুত ছিল না!

এই অবস্থায় আমাদের প্রশ্ন ছিল, আমরা কি ভাবে আত্মরক্ষা করিব। লোকের মধ্যে উৎসাহ না থাকিলে জাপান তো সহজে দখল করিয়া লইবে। হইতে পারে আমাদের দেশে এমন কিছু কিছু লোক আছে যাহারা মনে করে যে ইংল্যাণ্ডকে কোনও রকমে হটাইয়া দেওয়া যায় এবং জাপান যদি আসিয়া বসেও, তাহা হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ থাকিবে না, আমরা তাহাদের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করিয়া লইব। এমনও হইতে পারে, কেহ কেহ জাপানের নিকট সাহায্য লইয়া ইংরেজকে হটাইয়া দেওয়ায় কোনও ক্ষতি আছে কি না তাহা দেখে নাই। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরে অথবা প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না যিনি জাপানকে সাহায্য করিয়া অথবা তটস্থ থাকিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে এই দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহিতেন। তাহার কারণ ইহা নয় যে ব্রিটিশকে জাপান হইতে ভাল বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। আমরা জাপানকে ব্রিটিশ অপেক্ষা ভাল কখনও মনে করিতাম না। চীনের প্রতি জাপান যে আচরণ করিয়াছিল, যে-ভাবে চীনকে দাবাইয়া তাহার প্রকাণ্ড ভূভাগ নিজে মুষ্টিগত করিয়া লইয়াছিল তাহার এক মাত্র অর্থ ইহাই হইতে পারিত যে ব্রিটেনের মত সেও তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। এক সাম্রাজ্য হইতে বাহির হইয়া অন্য সাম্রাজ্যের কবলে যাওয়া কোনও বুদ্ধির কথা হইত না। উহা তো তপ্ত কড়াই হইতে লাফাইয়া আগুনে পড়ার মত হইত। তাই আমরা স্থির করিয়াছিলাম, জাপানকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে। নিজের সিদ্ধান্ত ছাড়িলেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসকে সশস্ত্র হইয়া ও দায়িত্ব লইয়া প্রতিরোধ করিবার সুযোগ দিতে চাহিতেছিল না। আমাদের পক্ষে আমাদের মত করিয়া প্রতিরোধ করা ছাড়া অন্য কোনও পথ ছিল না। সেই প্রতিরোধের

আয়োজন, জনসাধারণের মধ্যে শত্রু-প্রতিরোধের জন্য উৎসাহ বাড়ানো ছাড়া, অন্য কোনও কিছু হাতে ছিল না। এই দেশ, যাহা প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করিতে অসমর্থ ছিল, অথবা বিরোধিতা করিতে চাহে নাই, তাহাকে কি নবাগত জাপানীদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে? আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এ-অবস্থায়, প্রতিরোধের জন্য ভারতবাসীদের হৃদয়ে স্বাধীনতার বহ্নি প্রজ্বলিত করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় হইতেই পারে না।

কিন্তু ইহার ফল ব্রিটিশ ও জাপান উভয়ের বিরুদ্ধে পড়িতেছিল। পুনরায় দেখিতে হইবে, ইহার দোষ আমাদের ঘাড়ে নয়, ব্রিটিশের ঘাড়ে। যে-সীমাবদ্ধ স্বতন্ত্রতা আমরা তখনকার মত লইতে রাজী ছিলাম তাহাও তাহারা দিতে অস্বীকার করিয়াছিল। ব্রিটিশ ও জাপানীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য কোথায়? আমাদের স্বাধীনতা এক পক্ষ কাড়িয়া রাখিয়াছিল, এই বিপদের সময়ে জাপানকে প্রতিরোধ করিবার জন্যও আমাদিগকে তাহা দিতে প্রস্তুত ছিল না; অন্যে আমাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া তাহার সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল! আমাদের চোখে দুইজনেই সমান। বলিতে হইবে বলিয়া ইংরেজ বলিতেছিল, যুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর, যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা তোমরা পাইবে; জাপানীরাও বলিতেছিল। আমাদের সাহায্য কর, আমরা তোমাকে স্বাধীন করিয়া দিব! কাহার কথা মানিব? তাই আমরা স্থির করিলাম, দুইয়ের মধ্যে আমরা কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য নিজেদেরই প্রস্তুত থাকিতে হইবে—ইংরেজের তাহাতে ভাল না লাগিলে কি হইবে।

গান্ধীজী এই সকল চিন্তা করিতে করিতে কড়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এলাহাবাদে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবার কথা, সেখানকার জন্য এক প্রস্তাবের খসড়া করিয়া তাহা মীরাবেনের হাতে পাঠাইয়া দিলেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে ইহা লইয়া খুব তর্ক-বিতর্ক হইল। বোঝা গেল যে সেখানে দুইটি মত আছে—এক মত গান্ধীজীর খসড়ার পক্ষে, অন্য মত অতদূর যাইতে চাহে নাই। কমিটি উহা গ্রহণ করে নাই। উহা সংশোধন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কোনও চেষ্টাই সফল হইল না। অবশেষে, ঐক্য বজাইয়া রাখিবার জন্য আমরা নিজেদের আপত্তি সরাইয়া লইলাম, আর যাহা কিছু অন্যের পছন্দ মত হইয়াছে তাঁহাই গ্রহণ করিলাম। এ-কথা ওয়ার্কিং কমিটিতে হইল। দেশের অধিকাংশের প্রবৃত্তি ছিল গান্ধীজীর অনুগামী। যদি ঐ খসড়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পেশ করা যাইত, তাহা হইলে হয়তো উহা গৃহীত হইত, কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতভেদও খুব প্রকট হইত।

যদি নিজেদের মধ্য হইতে কিছু করিবারই ছিল, তাহা হইলে উহা এই-ভাবে নিজেদের মধ্যে এই মতভেদের কথা প্রচার না করিয়া পারা যাইত না। তাই এই মতভেদ চাপিয়া যাওয়াই উচিত মনে হইল; গান্ধীজীর প্রস্তাব কোনও রূপেই পেশ করা গেল না। তবে যে-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল তাহাতেও গান্ধীজীর চিন্তার যথেষ্ট সমাবেশ ছিল। গান্ধীজী যখন উহা দেখিলেন তখন বলিলেন, যদিও তিনি উহা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন না, তাহা হইলেও উহাতে তাঁহার কাজ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল বলিয়া তিনি উহা এক প্রকার গ্রহণ করিতেছেন।

যুদ্ধকালে দেশের অবস্থা আর বিহার পরিভ্রমণ

আমি প্রয়াগ হইতে সোজা এলাহাবাদ চলিয়া গিয়াছিলাম। আমি পরিষ্কার বুঝিতেছিলাম যে ইংরেজ সরকারের সংগে বিরোধ না হইয়া যায় না। গান্ধীজী কড়া কড়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। দেশে ঘোর অশান্তি ছিল। আমাদের বুকেও জ্বালা করিতেছিল। আমার মনে হইল, এই সময় একবার সারা প্রদেশটায় ঘুরিয়া দেখা উচিত। এক কাজ তো, গান্ধীজীর বক্তব্য লোককে বুঝাইয়া দেওয়া, অপর কাজ হইল, আসন্ন কঠিন সময়ের জন্য লোককে প্রস্তুত করা। অন্যদিকে, জাপানের অগ্রগতিতে লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, উহার প্রতিরোধ আবশ্যক আর অন্যদিকে জাপান যদি ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করে তখন আমাদের কি কর্তব্য হইবে, তাহাও লোককে বুঝাইয়া বলা আমাদের কর্তব্য।

এই সময়ে সরকারের পক্ষ হইতেও যথেষ্ট বিশৃংখলা চলিতেছিল। সমুদ্রতীরের যে-সব গ্রামে জাপানী সেনা আসিয়া নামিতে পারে, সে-সব গ্রামে বহু সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল আর তাহা ছাড়া এই নীতিও প্রচার করা হইতেছিল যে যদি জাপানী সেনা ভারতের মাটিতে আসিয়া পড়ে তবে তাহারা যেন কোন কিছু জিনিস হাতে না পায়। সেই জন্য নৌকা আটক করা হইতেছিল। কোন কোন জায়গায় নৌকাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবার কাজও চলিতেছিল। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে যেখানে নৌকায় করিয়া জল-পথেই সব কাজকর্ম চলে সেখানে ইহার ফল খুব খারাপ হইল। লোকের যাওয়া-আসা, মালপত্রের চলাচল, এমন কি, ছোট ছোট মামুলি কেনাবেচার কাজ বন্ধ হইয়া পড়িল। গ্রামে ধান চাউল যাহা ছিল, তাহাও সরকার হস্তগত করিলেন, যেন শত্রুর হাতে গিয়া না পড়ে। ইংরেজীতে যাহাকে scorched earth policy বলে, অর্থাৎ শত্রুর হাতে পড়া বন্ধ করিবার জন্য

সব কিছু জ্বালাইয়া দেওয়ার নীতি, লোকে বলে সেই নীতি পালিবার জন্য সব ব্যবস্থা ছিল। বিহারে, ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া শোণ নদী পর্যন্ত বড় এক পরিখার আয়োজন হইতেছিল। এই জন্য নানান জায়গায় বিমানঘাঁটি আর হাওয়াই জাহাজ নামিবার পথ তৈয়ারি করা হইতেছিল। সরকার যেখানে সেখানে হাজার হাজার বিঘা জমি লইতে-ছিলেন। সেই সব জায়গার বাসিন্দা প্রজা আর জোতদার কিষাণদের কষ্টের একশেষ হইল। বলা হইত যে জমি আর ঘরবাড়ি যাহা উহাদের খালি করিয়া দিতে হইতেছিল তাহার জন্য খেসারত দেওয়া হইবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও কেহ কিছু পাইল না। এই সব কাজ খুব জোরে চলিতেছিল। উত্তর বিহার আর ছোটনাগপুরে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যের বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল। কত লাখ লোক আসিয়া গিয়াছে, আরও কত আসিবে, জানি না। আসামের সীমা পর্যন্ত যুদ্ধ আসিয়া পড়ায় সেদিকে সৈন্য চলাচলের জন্য অধিক সংখ্যক রেলগাড়ির প্রয়োজন হইয়া পড়ায় রেলে চড়িয়া কোথাও যাওয়া লোকের পক্ষে কঠিন হইল। বিশেষত বি. এন্. ডব্লিউ রেলওয়েতে, যাহা উত্তর বিহার (তিরহুত) হইয়া অযোধ্যা যায়, চলাচল বড়ই কষ্টকর ছিল। ঐ পথে বহু সৈন্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করিত। উহাদের মধ্যে কতক তো আহত সৈন্যদের আসামের ঘাঁটি হইতে বোঝাই করিয়া উত্তর ভারতের স্থান বিশেষে লইয়া যাইত। বহু লোক পূর্বদিক হইতে বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ এবং আরও পশ্চিমের দিকে পলাইতে লাগিল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া লোকে আরও ঘাবড়াইয়া উঠিতেছিল। জায়গায় জায়গায় এই সব পলাতকদের বাসের জন্য আড্ডা, নতুন নতুন রাস্তা বাহির করা হইতেছিল আর কোথাও কোথাও খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে অবশ্য দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে একটা আতঙ্কও দেখা দিল যে, যুদ্ধ না করিয়া পলাইয়া যাওয়ারই জন্য এই সব প্রস্তুতি। যুদ্ধ এখন কতদূর আসিল, আর কি ভাবেই বা এই লড়াই হয়, জনসাধারণ তাহার কি জানে? সব মিলিয়া দেশময় ভারি একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি আগেই ঠিক করিয়াছিলাম, ওয়ার্ধা গিয়া সেই সংকল্প আরও দৃঢ় হইল যে আমার একবার সমগ্র দেশটা ঘোরা উচিত। আমার স্বাস্থ্য কিন্তু এমন ছিল না যে. আগের মত প্রদেশের ছোট ছোট সব জায়গায় ঘুরিতে পারি বা ঝড়ের মত এই সফরের মধ্যে এক দিনে সাত-আটটা সভায় বক্তৃতা করিতে পারি। সেজন্য স্থির করিলাম, প্রত্যেক জেলার একটি কি দুইটি বড় বড় শহরে যাইব. সেখানে প্রকাশ্য জনসভা ছাড়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে লইয়া বিশেষ-ভাবে আলোচনা সভা করিব। অন্নবস্ত্রের সমস্যাও প্রবল হইয়া উঠিয়া-ছিল। এই বিষয়েও ব্যবসায়ীদের এবং জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা

বলিয়া ভিতরের ব্যাপারটা জানা দরকার ছিল। সেজন্য ভাবিয়াছিলাম, ইহাদের সঙ্গেও পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিব। এইরূপ কর্মসূচী স্থির করিয়া আমি এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে সারা প্রদেশে ঘোরা আরম্ভ করিলাম—জুনের শেষ সপ্তাহে এই ভ্রমণ শেষ হইল।

তখন জানা গেল, গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির জন্য এলাহাবাদে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ইহার একটি নকল পাইবার জন্য পুলিশ তক্কে তক্কে ছিল, কিন্তু সম্ভবত উহারা তখন সেই নকল পায় নাই। দিন কয়েক পরে একদিন আচমকা স্বরাজ্যভবনে খানাতল্লাসি হইল। পুলিশ সেই-খান হইতে কেবল খসড়া প্রস্তাবের একটি নকলই নিয়া গেল না, তাহার সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি নিজেদের আফিসের কাজের জন্য যে সংক্ষিপ্ত নোট তৈয়ারি করিয়াছিলেন তাহাও নিয়া গেল। অগাস্ট বিপ্লবের উপর লর্ড টোটেনহ্যাম গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই প্রস্তাবের খসড়া আর নোট খুব কাজে লাগিয়াছে। আমার একটু সন্দেহ হয় যে পুলিস যে এই খসড়ার সন্ধান পাইয়াছিল তাহার মূলে আমি কতক পরিমাণে আছি। উপরে বলিয়াছি, গান্ধীজীর খসড়ার কিছু কিছু সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যে-প্রতিলিপির উপর এই সংশোধন করিয়াছিলাম, তাহা আফিসে পড়িয়াছিল। আমি এলাহাবাদ হইতে সোজাসুজি ওয়ার্ধায় গিয়াছিলাম। রওয়ানা হওয়ার সময় এই প্রতি-লিপিটি লইতে ভুলিয়া গেলাম। স্টেশনে আসিয়া অথবা রাস্তার মধ্যে একথা মনে পড়িল। আফিসের লোকদের বলিয়া দিয়াছিলাম বা লিখিয়া দিয়াছিলাম, উহা যেন তাহারা সত্বরে ওয়ার্ধায় পাঠাইয়া দেয়; কারণ গান্ধীজী হয়তো উহা দেখিতে চাহিবেন। আফিস হইতে ঐ দিনই ডাকে সেই প্রতিলিপি পাঠানো হইয়াছিল। যদি পুলিশ রাস্তায় উহা না আটকাইত তাহা হইলে আমার ওয়ার্ধা পেঁৗছিবার পরের দিনই উহা সেখানে পেঁৗছিত। কিন্তু আমি উহা পাই নাই। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে আফিসের লোকেরা উহা পাঠায়ই নাই। পরে যখন আফিস খানাতল্লাস হয়, তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিলাম যে তাহারা সেদিনই ডাকে উহা আমার নিকটে ওয়ার্ধায় পাঠাইয়াছিল। সম্ভবত এই প্রতিলিপি দেখিয়াই পুলিশ স্থির করিয়াছিল যে খানাতল্লাসী করিলে কিছু-না-কিছু উপাদান পাইয়া যাইবে।

যাহা হউক, ওয়ার্ধা হইতে বিহারে ফিরিয়া আমি ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের যে হাঙ্গামা হইবে, সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও প্রকার সন্দেহই ছিল না। আমার সকল বক্তৃতাতেই আমি খোলাখুলিভাবে এ-কথা পরিষ্কার বলিতাম। এ-পর্যন্ত আমাদের কোনও কার্যক্রম ছিল না। এজন্য আমি কার্যক্রম বলিতে

পারিতাম না, আর বলিতামও না। অবশ্য এইটুকু বলিয়াছিলাম যে তাহা আইন অমান্যেরই রূপ ধারণ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বলিতাম যে তাহা সম্পূর্ণ অহিংসাত্মক হইবে। আর ইহাও বলিয়াছিলাম যে পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলি অপেক্ষা ইহা কিছুটা অধিক উগ্র হইবে। সে সময়ে জাপানের তরফ হইতে রেডিওতে এই কথা জোর প্রচারিত হইতেছিল যে জাপান ভারতকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর সর্বপ্রকারে ভারতকে সাহায্য করিবে। এই কথার পরেও আমি আমার সকল বক্তৃতায় বলিতাম, জাপানের কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়—বিশেষ করিয়া যখন দেখিতেছি যে সে তাহার প্রতিবেশী চীনের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে এবং ক্রমেই তাহার রূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে—ব্রিটিশ ও জাপান উভয়ের কবল হইতে আমাদিগকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে হইবে, এক-জনের নিকট হইতে বাঁচাইয়া অন্যজনের হাতে যাইতে দেওয়া আমরা সর্বদাই অপছন্দ করিতাম; এইজন্য আমাদের সংগ্রাম হইবে উভয়ের সঙ্গে এবং সে সংগ্রাম অহিংসই হইবে। আমার বক্তৃতা জোরালো ও উগ্র হইত। আমিও বুঝিতাম আর লোকেও আমাকে বলিত যে প্রথমে আমার বক্তৃতা খুবই মৃদু হইত, এবার তো আমি যেন অগ্নিশিখা উদ্‌গিরণ করিতাম।

১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্বে একবার পাটনায় যুবকদের মধ্যে খানিকটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়। তাহারা কোনও ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া, যাহার কথা আমার আজ স্মরণ নাই, সত্যাগ্রহের কথা বলিতে আরম্ভ করে। সাধারণ সভায় গরম গরম বক্তৃতা হইতে থাকে। কয়েকজন বক্তার পর আমার কিছু বলার সুযোগ হইল। আমি যখন উঠিলাম তখন এক সঙ্গী যুবক আস্তে আস্তে বলিল, ইনি এখন লোকদের উৎসাহানলের উপর ‘ভিজা কম্বল’ ফেলিয়া দিবেন। আমি এ-কথা শুনিয়া ফেলিলাম, এবং ইহা লইয়া লোকদের বলিলাম যে আমি ‘ভিজা কম্বল’ ফেলিয়া দিবার পরও যদি আগের মত তাপ থাকে, তাহা হইলে বুঝিব যে উহা সুস্থ ও সবল ব্যক্তির তাপ, যে-উৎসাহ প্রকট হইতেছে তাহা সত্যকারের উৎসাহ, না হইলে তো আমি সে তাপ ত্রিদোষপীড়িত ব্যক্তির উপর জ্বরের প্রকোপ বলিয়া মনে করিব এবং ঐ তাপ প্রদর্শনকে মনে করিব প্রলাপমাত্র।

এবার আমার বক্তৃতায় সেই ভিজা কম্বল কোনওভাবে কোথাও দেখা গেল না। তাহার বিপরীত, তাহাতে এমন সব কথা থাকিত যাহাতে উৎসাহ বাড়াইয়া দেয়, পাগল করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি গঠন কর্মও করিয়া চলিতেছিলাম। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের সঙ্গে অন্নবস্ত্রের সংকট হইতে বাঁচিবার ও বাঁচাইবার কথাও বলিতেছিলাম। আমার বিশ্বাস গভর্নমেণ্ট যদি জনসাধারণের সহিত যোগ স্থাপন করিতে পারিত তাহা হইলে এই সঙ্কটের এমন ভয়ঙ্কর রূপ হইত না, যেমন আজ পর্যন্তও

আছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লোককে উসকাইয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ইহাও উদ্দেশ্য ছিল না যে আমরা তাহাদিগকে পথে ঘাটে আটকাই বা যেমন করিয়াই হউক ক্লান্ত করিয়া ফেলি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে লোকদের আমরা এজন্য প্রস্তুত করি যে তাহারা জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; আর যেহেতু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আমাদের সে-সুযোগ দিতেছে না, সেই হেতু তাহাদের নিকট হইতেও সময় পাইয়া যুদ্ধ করিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি। এ-কারণ আমরা অনিশ্চিত ধরনে তাহাকে ক্লান্ত করিতে চাই নাই। নিজেদের এই নীতি তাই সক্রিয়রূপে দেখাইবার ও সপ্রমাণ করিবার এক সুযোগ পাওয়া গেল।

উপরে বলিয়াছি যে সে সময়ে জায়গায় জায়গায় হাওয়াই জাহাজের আড্ডা এবং সৈনিকবাহিনীদের জন্য ছাউনি নির্মাণ করিবার জন্য জন-সাধারণের জমি লওয়া হইতেছিল। আমি গয়ায় পৌঁছিয়া শুনিলাম যে শহর হইতে একটু দূরে, যেখানে প্রথম হইতেই আড্ডা ছিল, আরও অনেক জমি লওয়া হইতেছিল এবং হাজার হাজার লোক গৃহহীন ও ভূমিহীন হইয়া গিয়াছে, তাহারা কোনও ক্ষতিপূরণও পায় নাই, তাই তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ আছে। আমি সেখানে গেলাম। শোনামাত্র হাজার হাজার লোক একত্র হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা ছিল সত্যই করুণ। কয়েকটি গ্রাম বিধ্বস্ত হইতেছিল। খেতের চাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আড্ডা বানাইবার জন্য মাটি তৈরি করা হইতেছিল। সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক খাটিতেছিল। অনেক লরী মালপত্র বহিয়া পৌঁছাইয়া দিতেছিল। যাহাদের ঘরবাড়ি ও জমি লওয়া হইয়াছিল তাহারা এধারে-ওধারে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কেহ ছিল না। আমি যাওয়ামাত্র লোকেরা সকলে নিজেদের দুঃখের কথা বলিয়া শোনাইল। যদি সরকারি বা যুদ্ধের কাজে রাস্তা আটক করা আমাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ইহার চেয়ে অন্য কোনও সুযোগ পাইতাম না। কিন্তু আমি লোকদের বুঝাইলাম যে যুদ্ধের কাজের জন্য গভর্নমেণ্ট এমন না-করিলে বাঁচিবার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিত না, এজন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণ লইয়া নিজেদের অন্য কোনও জীবিকার উপায়ের কথা ভাবিয়া দেখা উচিত, আর আমি ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে চেষ্টা করিব। আমি বলিয়া তো দিলাম; কিন্তু জানিতাম না যে গভর্নমেণ্ট শুনিবে কিনা।

পাটনায় ফিরিয়াই গভর্নমেণ্ট এড্‌ভাইজারকে পত্র লিখিলাম, তাহাতে সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলাম, আর কি ভাবে ক্ষতিপূরণ হইতে পারে তাহাও বলিয়া দিলাম—একথাও লিখিলাম যে ক্ষতিপূরণ ভাগ করিয়া দিবার সময়েও অনেক গণ্ডগোল হয়, তাই ভাগ করিয়া দেওয়ার সময়ে কংগ্রেস কর্মী ডাকিয়া লওয়া উচিত, তাহাদের সামনেই টাকা ভাগ

করিয়া দেওয়া উচিত। কিছু কিছু জমি তো এইরূপই ছিল যে তাহাতে ঘরবাড়ি তৈরি হইত, অথবা জাহাজ নামাইবার জন্য মজবুত রাস্তা বানানো যাইত তাহা ফিরিয়া পাইলেও চাষের কাজে লাগানো যাইত না। কিন্তু অধিকাংশ জমি শুধু সমতল করিয়া রাখা হইত, তাহার মধ্যে ঘাস গজাইত, তবে আর কোনও পরিবর্তন হইবে না। গভর্নমেণ্টকে আমি এই কথা লিখিলাম যে লড়াইয়ের কাজ যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন জমি যাহার ছিল তাহাকে যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়, আর তাহা যথাসাধ্য চাষীদের কাজের উপযোগী করিয়া যেন ফেরত দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে জমিতে চাষী যাহা উৎপাদন করিত তাহাও তাহাকে দেওয়া যাক। যে জমি ফেরত দেওয়া হইবে না এবং যে ঘরবাড়ি প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া হইতেছিল তাহার দাম যেন নগদ টাকায় দেওয়া হয়, আর নগদ টাকা ভাগ করার, ফসলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে এবং মিটাইয়া দেওয়ার সময়ে, কংগ্রেস কর্মীদের যেন সাহায্য লওয়া হয়।

আমার পত্র পাইয়াই কমিশনর তাহার ভিত্তিতে কাজ করিলেন। আমার প্রস্তাবগুলি তিনি গ্রহণ করিলেন, এবং আমাকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র দিলেন, তাহাতে ইহা লিখিলেন যে সেখানকার জটিল অবস্থা আমি খুব ভাল করিয়াই সামলাইয়া লইয়াছি।

আমি যখন মানভূম জেলায় যাই তখন সেখানেও একই অবস্থা ছিল। পাটনা বিভাগের কমিশনর যেমন করিয়াছিলেন সেখানকার কলেক্টরও সেইরূপ করিলেন। এসব কথা এত বিস্তারিতভাবে লিখিতেছি এইজন্য যে যখন আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন গভর্নমেণ্ট আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিলেন যে আমরা জাপানকে সাহায্য করিতে ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সর্বপ্রকারে অসুবিধাগ্রস্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। পরে গভর্নমেণ্ট জাপানকে সাহায্য করিবার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু আমাদের মুসলিম লীগের ভাইয়েরা এখনও তাহা বলিয়া মরিতেছে এবং ইহাতে সঙ্কুচিতও হয় না।

সে-কথা যাক, আমি ভ্রমণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের নোটিশ পাইলাম। আমি ভ্রমণের ব্যবস্থাও এমন করিয়া লইয়াছিলাম যে তাহা শেষ করিয়া সোজা ওয়ার্ধায় চলিয়া যাইব। জুন মাসের শেষের দিকটায় আমি সেখানে চলিয়াও গেলাম। সেখানে প্রথমটায় তো চরখা সংঘের অধিবেশন প্রথমে হইল, তাহার পর ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। কয়েকদিন সেখানেই থাকিয়া যাইতে হইল। খাদি উৎপাদনের অনেক বিস্তার করিয়া আয়োজনের কথা ভাবা হইল; কারণ দেখা গেল যে সাধারণ লোকে মিল হইতে যে কাপড় পাইত তাহা এই লড়াইয়ের জন্য দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ মিলকে সৈন্যবাহিনীর

কাজের জন্যই তাহাদের কাপড় প্রস্তুত করিতে হইত, আর যে বস্ত্র সংকট ছিল তাহা চরখা ও করঘা দ্বারাই দূর করা যাইতে পারিত। এইজন্য কয়েক দিন আলোচনার পর চরখাসংঘ খুব বড় পরিসরে কাজ বাড়াইবে স্থির করিল। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন কয়েক দিন ধরিয়া হইতে থাকিল। অবশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পেঁৗছিলাম যে অহিংসভাবে আইন অমান্য আমাদের করিতেই হইবে, আর এই অর্থে আজ্ঞা দিবার জন্য আগস্টের আরম্ভে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন করা হউক।

১৯৪২-এর বিপ্লবের পূর্বকথা

ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। সেখানে মতভেদ স্পষ্ট আকার ধারণ করিল। এখানে একথা বলা অনুচিত হইবে না যে ডক্টর সৈয়দ মামুদ সত্যাগ্রহের বিরোধী ছিলেন। পরে গিয়া তিনি এক ভুল করিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ আবশ্যক নয়; কিন্তু তাঁহার একথা সত্য ছিল যে তিনি সত্যাগ্রহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার এই বিরোধের কথা তিনি কমিটিতে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলেন। জুলাই মাসের প্রায় অর্ধেক কাটিয়া গিয়াছে। জোরে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। হিসাব মত হাঁপানিরও সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ শুরু হইয়াছে। কিন্তু আমি সকল অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিয়াছি। এত কথা হইল, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি সত্যাগ্রহের কোনও কার্যক্রম স্থির করিলেন না। আমার মনে এই কথাটি পীড়া দিতে লাগিল। আমি গান্ধীজীকে এ-কথাও বলিয়াছিলাম যে তিনি কার্যক্রমের নির্দেশও কিছুটা করুন; কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মন এভাবে কাজ করে না—যখন একবার স্থির হইবে যে সত্যাগ্রহ করিতেই হইবে, তখনই তিনি কার্যক্রম সম্বন্ধে ভাবিতে পারিবেন, আর তাহা নির্ধারণ করিতেও পারিবেন। এখন তো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—ওয়ার্কিং কমিটি আদৌ একমত নয়, তাহার পর গভর্নমেণ্ট কি করিবে, তাহাও জানা নাই—এই অনিশ্চিত অবস্থায় তিনি কার্যক্রম সম্বন্ধে এখনও কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিবেন না; কিন্তু এই পর্যন্ত অবশ্য বলিতে পারেন যে এইবারের সত্যাগ্রহ অত্যন্ত উগ্র হইবে; শুধু জেলে গেলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহার চেয়ে কিছু বেশি ত্যাগের প্রয়োজন হইবে। আবশ্যক হইলে ধনধান্য ঘরদ্বার সব কিছু আহুতি দিতে হইবে—চরখা সংঘে যে পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ বা তাহার চেয়েও

অধিক টাকা খাটিতেছে তাহার উপরও আক্রমণ হইতে পারে। আর যদিও আমরা কাজ বাড়াইব স্থির করিয়াছি তথাপি সমগ্র চরখা সংঘ ও তাহার ধনজন দুই-ই আহুতি দিতে হইতে পারে; কিন্তু এখনও সত্যাগ্রহের রূপের চিত্র তাঁহার সামনে আসে নাই, আর তিনি এখনও ও-বিষয়ে মন দিতেও চান না, কারণ যতক্ষণ সত্যাগ্রহ অনিবার্য, অবশ্য করণীয় বলিয়া স্থির না হইতেছে, ততক্ষণ কার্যক্রম প্রস্তুত করিতে তাঁহার মন অগ্রসরই হইবে না। ইহা আমাদের এক মস্ত বড় ত্রুটি মনে হইতেছিল, কিন্তু কার্যক্রম তো গান্ধীজীকেই প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদের বাধ্য হইয়া তাঁহার কথা মানিয়া লইতে হইল।

ওয়ার্ধা হইতে যাত্রা করিবার পূর্বে গান্ধীজীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য সেবাগ্রাম গেলাম। সেখানে আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কার্যক্রমের কথা উঠাইলেন, প্রশ্ন করিলেন, তার ও টেলিফোনের তার কাটা অথবা রেল লাইন উঠাইয়া ফেলা অহিংসার ভিতর আসিতে পারে কি না। প্রশ্নটি সময়োচিত ছিল, কারণ আমি জানিতাম যে যখনই সত্যাগ্রহের কথা ওঠে তখনই কয়েকজনের মন এইদিকে যায়, আর তাঁহারা এই প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেই আমি গান্ধীজীকে বলিলাম, এই প্রশ্ন বারবার উঠিতেছে, ১৯৩০-এর আন্দোলনেও উঠিয়াছিল, যখন মহাত্মাজী ও অন্য অনেকে জেলে চলিয়া যান। মতিলালজী অস্থায়ী সভাপতি হন, এবং আমি ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হিসাবে প্রয়াগ গিয়াছিলাম, তখন লোকে এই প্রশ্নই করিয়াছিল এবং নানা স্থানে তার ও টেলিফোনের তার কাটিয়াও দিয়াছিল; কিন্তু এ-সকল খুব কম জায়গায়ই হইতে পারিয়াছিল আর সে সময় উহা বন্ধ করিয়াও দেওয়া হইয়াছিল। এইজন্য ইহাতে কোনও আশ্চর্যের কথা নাই যে আজও যখন আমরা সত্যাগ্রহের কথা ভাবিতেছি তখন এইরূপ চিন্তা কাহারও কাহারও মনে উঠিতেছে—মহাত্মাজীকে কার্যক্রম প্রস্তুত করার সময়ে এ-বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ দিতে হইবে। গান্ধীজী বলিলেন যে লোহা-কাঠ কাটা বা ভাঙগায় হিংসা-অহিংসার কথা ওঠে না, আমরা তো নিত্য সাধারণ রীতি অনুসারে লোহালক্কড় কাটি বা ভাঙ্গি; কিন্তু রেলের লাইন উঠাইয়া ফেলা অথবা তার কাটা হইল অন্য কথা—কোন উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে করা হইতেছে, ইহার ফলই বা কি হইবে, এই সকল কথার উপর নির্ভর করিবে ইহা হিংসাত্মক, না অহিংসাত্মক; যদি ইহাতে হত্যা হয় অথবা নির্দোষ লোকদের বিপদ ঘটে, তবে ইহা হিংসাত্মক হইবে, কিন্তু আমরা এমন অবস্থাও অনুমান করিতে পারি যখন ইহা অহিংসাত্মকও হইতে পারে।

আমরা তাঁহার কথার অর্থ ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে এই সব কাজ অহিংসাত্মক হওয়া বহু পরিমাণে ইহার উপর নির্ভর করিবে যে ইহার জন্য

কাহারও প্রাণহানি না হয়। যে কেহ এরূপ কার্য করিবে সে যেন ইহার জবাবদিহির ভার নিজের উপর পরিষ্কার ও সোজাসুজিভাবে গ্রহণ করে, যাহাতে যাহাদের ইহার সহিত কোনও সংস্রব নাই তাহাদের ইহার ফল ভুগিতে না হয়। এ সমস্ত কথা এমনি হইয়া গেল, কোনও কার্যক্রম তখন নির্ধারিত হইল না। হইবার কথাও ছিল না। যখন গভর্নমেণ্ট অভিযোগ করিলেন যে আমরা রেল ও তার বিকল করিবার কার্যক্রম প্রস্তুত করিয়াছিলাম তখন গান্ধীজী উত্তরে বলিয়াছিলেন যে গভর্নমেণ্ট একটা কথার কথা বা তত্ত্বমূলক আলোচনাকে কার্যক্রম বলিয়া ভুল করিয়াছেন। গান্ধীজীর এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিল এবং আমরা সে সময়ে এই কার্যক্রম অথবা অন্য কোনও কার্যক্রম নির্ধারণ করি নাই।

ওয়ার্ধা হইতে পাটনা রওনা হইলাম। প্রথম হইতেই দুই-তিন জায়গায় যাইবার কথা স্থির করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ছিল গোন্দিয়া, তাই গোন্দিয়ায় নামিয়া গেলাম, সেখানকার সভা ইত্যাদি শেষ করিয়া রাত্রের গাড়িতে রওনা হইলাম। পরের দিন রাত্রে কাশী পৌঁছিলাম। সেখানে ভারতীয় ইতিহাস পরিষদের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন করিয়া লইবার ছিল। এখন তো একপ্রকার স্থির হইয়াছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই আন্দোলন উগ্র আকার ধারণ করিবে। এইজন্য পরিষৎ সম্বন্ধে কিছু কাজ করিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা ও যে পুস্তক প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে তাহা ছাপানো ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের সঙ্গে কথা বলিয়া লওয়ার আবশ্যকতা ছিল। গোন্দিয়ায় কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা জমা করিয়া দিলাম, আর অন্য সকল কার্যের ব্যবস্থা করিয়া কাশী হইতে পাটনায় না থামিয়া মুঙ্গের জেলার তারাপুরে চলিয়া গেলাম। সেখানে কৃষক সম্মেলন হইবার কথা ছিল। লোকেরা আমার জন্যই কয়েকবার সম্মেলন স্থগিত করিয়াছিল। কৃপালনীজীও সেখানে সম্মেলন উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণবল্লভজীর সভাপতি হইবার কথা ছিল। শ্রীবাবু, অনুগ্রহবাবু প্রভৃতি অন্যান্য নেতারাও আসিয়াছিলেন। পথের সর্বত্র খুব বৃষ্টি হইতেছিল, আর বর্ষায় আমার স্বাস্থ্যের উপর যে ফল হওয়ার কথা তাহা হইতেছিল ঠিকই। তারাপুরে গিয়া তো পৌঁছিলাম, কিন্তু হাঁপানির আক্রমণ হইতেছিল। সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হইল। আমার বলিবার পালা আসিল। আমি কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময়ে হঠাৎ মেঘ ভাঙিয়া পড়িল, প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল। রামগড় কংগ্রেসের মতো সম্মেলনের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। যে ডাকবাংলোয় আসিয়া উঠিয়াছিলাম, কোনও প্রকারে ভিজিতে ভিজিতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে রাত কাটাইয়া পরের দিন সকালেই

পাটনায় রওনা হইয়া গেলাম। পাটনায় পেঁছিতে না পেঁছিতেই হাঁপানির এক জোর আক্রমণ হইল, জ্বরও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। সেই দিন হইতে তের-চোদ্দ দিন পরেই বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবার কথা ছিল। আমার চিন্তা হইল, ঐ সময়ের মধ্যে সুস্থ হইতে হইবে।

বোম্বাই যাওয়ার পূর্বেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন করিয়া লওয়া উচিত মনে হইল, তাহাতে ওয়ার্ধার প্রস্তাবের বিষয়ে, যাহা লইয়া বোম্বাইতে আলোচনা হইবার কথা, প্রদেশের লোকদের অভিমত বুঝিতে পারা যাইবে। প্রাদেশিক কমিটির অধিবেশন সদাকত আশ্রমে ৩১ জুলাই তারিখে হইল। আমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল, বড়ই দুর্বল ছিলাম। আমি কমিটির সম্মুখে এক জোর বক্তৃতা করিলাম, তাহা সমগ্র প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময় যে-সব কথা বলিয়াছিলাম, তাহার সারাংশ মাত্র। আরও একটা কথা ছিল; ওয়ার্ধায় যে-সব কথা হইয়াছিল, তাহাও আমি সকলকে শুনাইয়া দিলাম। সকলেই বুঝিতে পারিল, বোম্বাইতে যাহা স্থির হইবে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিবেশন হওয়ার দুই-এক দিনের মধ্যেই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ, এবং কংগ্রেসের অনেক সভ্যেরা দর্শক হইয়া বোম্বাইয়ের অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করিলেন। আমার শরীর এতই অসুস্থ ছিল যে সেখানে যাইতে পারিলাম না, পাটনাতেই পড়িয়া থাকিলাম।

সংবাদপত্রে জোর খবর ছাপা হইতে থাকিল যে গভর্নমেণ্টের দিক হইতে আয়োজন চলিতেছে, বোম্বাইতেই সকলকে গ্রেপ্তার করা হইবে। চারদিক হইতে এই সংবাদও পেঁছিতেছিল যে বিহারেও প্রস্তুতি চলিতেছে। যে সমস্ত ক্যাম্প জেল বন্ধ ছিল, সেগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া গিয়াছিল। বোম্বাইয়ে ৫ই আগস্ট (১৯৪২ খ্রীঃ) হইতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইল। ৭ই আগস্ট হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসিবার কথা। আমি রেডিও এবং সংবাদপত্রে খবর শুনিতাম ও পড়িতাম। ৮ই আগস্টের রাত্রে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃকও গৃহীত হইবার পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। খুব গরম গরম সংবাদ হইল এই যে, বোম্বাইয়েই সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই তাহা দমন করা হইবে। আমি ভাবিলাম যদি এরূপই হয় তবে জনসাধারণের সম্মুখে কোনও কার্যক্রম রাখিতে পারা যাইবে না। এইজন্য, অন্ততঃ নিজেদের প্রদেশের জন্য আমি কিছু কিছু কার্যক্রম স্থির করিয়া দিব। বসিয়া বসিয়া অনেক কিছু লিখিবার শক্তি আমার ছিল না। তাই যে-সব বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া মুসাবিদা তৈয়ার করিতে বলিলাম।

ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীদীপ-নারায়ণ সিংহ ও শ্রীমথুরাপ্রসাদ। অনুগ্রহবাবুও বোম্বাই যান নাই, পাটনাতেই ছিলেন। মুসাবিদা প্রস্তুত হইলে তাহা অনুগ্রহবাবুর সহিত আমি দেখিয়া কিছু অদল-বদল করিয়া স্থির করিয়া দিলাম। উহা ছাপাইবার ব্যবস্থাও করা হইল। স্থির হইল যে, যদি সত্যই সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে যাহারা বাকি থাকিবে তাহারা ঐ অনুসারেই কাজ করিবে। এমনিতেই তো গান্ধীজী বারবার বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যদি নেতারা গ্রেপ্তার হইয়া পড়েন, এবং কেহ কার্যক্রম দিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই অবস্থায় প্রত্যেক কংগ্রেসী সদস্য নিজেকে নেতা বলিয়া স্থির করিবেন, এবং অহিংসার সিদ্ধান্তের ভিতরে থাকিয়া সত্যাগ্রহের রূপে যাহা কিছু করিতে পারা যায় তাহা করিবেন। এই সংগ্রামকেই শেষ সংগ্রাম মনে করিয়া কেহ যেন কিছু বাকি না রাখেন, অহিংসাকে কোনও প্রকারে না পরিবর্জন করেন। আমরা যে কার্যক্রম প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাতেও এই কথার উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছিল যে অহিংসাকে যেন ত্যাগ করা না হয়। তাহাতে সত্যাগ্রহের জন্য কার্যক্রমও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্বের সত্যাগ্রহগুলির কার্যক্রম হইতে সিদ্ধান্তের দিক দিয়া ভিন্ন ছিল না, অবশ্য তাহাদের অপেক্ষা উগ্র ছিল।

ইহার মধ্যে একদিন দিল্লী হইতে সংবাদ ছাপা হইল যে ৮ই আগস্টের পর কংগ্রেসের লোকদের গ্রেপ্তার করা হইবে না আর গভর্নমেণ্ট এ-কথারও অপেক্ষা করিবেন যে কংগ্রেস কি করিতেছে—কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও বলা হইতেছিল যে এক পদ অগ্রসর হইবার পূর্বে গান্ধীজী ভাইসরয়ের সঙ্গে আরও একবার আলাপ-আলোচনা করিবেন; কিন্তু তাহাতেও যদি কোনও ফল না হয় তখনই অগ্রসর হইবার নির্দেশ দিবেন। এই সংবাদ আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলাম। আর বুঝিলাম যে এখন তাড়াতাড়ি কিছু হইবার নয়। যাঁহারা বোম্বাই গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে—এমনও হইতে পারে যে তাঁহারা সেখান হইতে নির্ধারিত কার্যক্রম সঙ্গে করিয়া আনিবেন; যদি এমন হয় তবে আমাদের প্রস্তুত কার্যক্রম কার্যে পরিণত করা অনুচিত না হইলেও অনাবশ্যক হইবে। এইভাবে আমরা স্থির করিয়া লইলাম যে ১১ই আগস্টের পূর্বে, যে-তারিখে বোম্বাই হইতে সভ্যদের ফিরিবার আশা করিতেছিলাম, আমাদের কিছুই করিবার নাই। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুগ্রহবাবু রায়বেরিলী চলিয়া গেলেন, সেখানে তাঁহার বড় ভাই অসুস্থ ছিলেন, আর দীপবাবু মজঃফরপুর জেলায় পূর্ব হইতে স্বীকৃত কোনও কাজ শেষ করিতে গেলেন। মথুরাবাবু ও চক্রধর শরণের সঙ্গে আমি আশ্রমে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট রাত্রি প্রায় ১০টার পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। শুনিয়াছি, গান্ধীজী দীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'কর বা মর' মন্ত্রের সাধনা লোককে দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আরও একবার বুঝাইতে চেষ্টা করিবার কথাও বলিয়াছিলেন। অন্যান্য নেতারাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং লোকে সর্দার বল্লভভাইয়ের বক্তৃতার খুব প্রশংসা করিয়াছিল। ৯ই আগস্ট সকালে সার্চলাইটে বোম্বাইয়ের ঘটনাবলীর সংবাদ পড়িতেছিলাম। মথুরাবাবু শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন, এমন সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর্চার আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি খাটে শুইয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া আমার স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশ্নাদি করিলেন এবং আমার কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আগমনহেতু অবশ্য বুঝিতে পারিলাম; কারণ রেডিওতে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তারের সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। আমাকে অসুস্থ দেখিয়া তিনি গভর্নমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই অবস্থায় কি করা যায়। সেখান হইতে হুকুম আসিল যে সিভিল সার্জনকে দেখাও, জিজ্ঞাসা কর যে সেখান হইতে আমাকে দূরবর্তী স্থানে লইয়া যাইতে পারা যাইবে কি না। মিঃ আর্চার সিভিল সার্জনকে গিয়া লইয়া আসিলেন।

ইহারই মধ্যে আমার বাড়িতে খবর আসিয়া পৌঁছিল। সেখান হইতে দিদি ও মৃত্যুঞ্জয়ের মা প্রভৃতি আসিলেন। সিভিল সার্জেনের অভিমত হইল যে আমি বাহিরে লইয়া যাওয়ার উপযুক্ত নই। তাই আমাকে বেলা প্রায় ১১টা-১২টায় বাঁকিপুর জেলেই লইয়া যাওয়া হইল। খুব বৃষ্টি হইতেছিল, সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পড়িল। সদাকত আশ্রম হইতে আমার রওনা হওয়ার পূর্বেই কিছু কিছু লোক আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছাত্রেরাই সংখ্যায় প্রবল। শুধু আমাকেই গ্রেপ্তার করিবার হুকুম ছিল। মিঃ আর্চারের তালমান-বোধ ও ব্যবহার ভাল ছিল। তিনি কোনও প্রকারের তাড়াতাড়ি করেন নাই, কোনও অভদ্রতা করেন নাই, কোনও অশোভন আচরণ করেন নাই। জেলে আমার জন্য সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া মথুরবাবু ও চক্রধর ফিরিয়া আসিতেই শ্রীফুলনপ্রসাদ বর্মাও গ্রেপ্তার হইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। এইরূপে প্রায় একটা-দেড়টা বাজিবার পূর্বেই স্থির বোঝা গেল যে আমি একা থাকিব না, অন্ততঃ একজন সাথী আমাকে দেখাশোনা করিবার জন্য অবশ্যই থাকিবেন। মথুরাবাবুও মিঃ

আচার্যের সংগে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন এবং তিনিও সন্ধ্যার পূর্বেই আসিলেন। পরের দিন তো আরও কেহ কেহ আসিতে লাগিলেন। বোম্বাই হইতে ফিরিবার পর শ্রীবাবু, সত্যনারায়ণবাবু, মহামায়াবাবু প্রভৃতিও আসিয়া পড়িলেন। অনুগ্রহবাবুও আসিলেন। পাটনায় প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। বড় বড় মিছিল বাহির হইতে লাগিল। কাছারি সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল এবং এক খুব বড় মিছিল গভর্নমেণ্ট হাউসের দরজা পর্যন্ত বিপ্লবাত্মক ধ্বনি দিতে দিতে আসিয়া পেঁাছিল। রাত্রি হইয়া গেল বলিয়া সেদিন আর কিছু হয় নাই; কিন্তু খবর সর্বত্র প্রচারিত হইল যে পরের দিন সেক্রেটারিয়েটের উপর জাতীয় পতাকা উঠাইবার জন্য মিছিল বাহির হইবে।

জেলে খবর পাইবার একই উপায় ছিল—গ্রেপ্তার হইয়া নূতন লোকের আসা। সংবাদপত্র তখনও বন্ধ হয় নাই, কিন্তু তাহা হইতে সামান্যই খবর পাওয়া যাইত। সেক্রেটারিয়েটের দিকে মিছিল গেল; গুলি চলিল; আট-নয় জন যুবক শহীদ হইলেন; অনেকে আহত হইল, তাহাদের লোকে হাসপাতালে পেঁাছাইয়া দিল। এই মিছিল হইতে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছেলেকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই রাত্রেই বাঁকিপুর জেলে আনা হইল। তাহাদের নিকট হইতে গুলি করার ব্যাপার সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। সমস্ত রাত্রি সারা শহরে মিছিল বাহির হইতে লাগিল। মিছিলকারীদের ধ্বনি জেলের ভিতরে আসিয়া পেঁাছিতেছিল। ঐদিন টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কাটার কাজও আরম্ভ হইয়া গেল। আমরা শুনিয়াছিলাম যে পাটনায় টেলিফোন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জেল অফিসেও টেলিফোনের আনাগোনা বন্ধ হইয়া গেল। সেক্রেটারিয়েটের মিছিলে যে-সব ছেলে গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাহাদের কোনও প্রকারে বাঁকিপুর জেলে সারা রাত্র রাখা হইল, পরের দিন তাহাদের ক্যাম্প-জেলে পাঠাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। জেলের কৈফিয়ৎ ছিল যে, প্রথম হইতেই উহা ঠাসা ভর্তি ছিল। সমস্ত প্রদেশে মামুলি কয়েদীর সংখ্যা খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল, কারণ কয়েক বৎসর ধরিয়াই, যুদ্ধের সময় হইতেই, ডাকাতির সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, আর চুরি ইত্যাদিও খুবই চলিতেছিল। কয়েদীদের মধ্যে অনেকে তখনও হাজতে বাস করিতেছিল, কারণ তাহাদের মকদ্দমার তদন্ত তখনও হয় নাই। এইজন্য যখন রাজনৈতিক কয়েদীদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন তাহাদের স্থানাভাব হইল। উচ্চ শ্রেণীর কয়েদীদের অবশ্য বাঁকিপুর জেলে রাখা হইল, অন্য সকলকে ক্যাম্প-জেলে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। যতক্ষণ ছেলেদের ক্যাম্প-জেলে পাঠানো না হইল ততক্ষণ শহরের বিপুল জনতা জেলের ফটকে ও রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত। বাঁকিপুর জেলে দোতলা বাড়ি রাস্তার ধারের দিকেই ছিল, সেখান হইতে ছেলেরা রাস্তায়

যে-জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে কিছু কিছু কথাও চালাইয়াছিল। যখন প্রায় তিনটা বেলায় তাহাদের লইয়া যাওয়ার জন্য লরিগুলি আনা হইল, তখন তাহাদের লরিতে চড়ানো হইল। প্রথম লরি অগ্রসর হইতেই জনসাধারণ তাহার উপর ভাঙিয়া পড়িল; ছেলেদের ছাড়াইয়া লইয়া লরিতে আগুন দেওয়া হইল। অন্য লরিগুলি আর অগ্রসর হইল না। যে-সব ছেলে লরিগুলিতে চড়ানো হইয়াছিল তাহাদের নামাইয়া আবার জেলেই লইয়া যাওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদল ডাকা হইল। তাহারা রাস্তা পরিষ্কার করিল। সামনে ও পিছনে সৈন্য-দলের গাড়ির মধ্যে কয়েদীদের লরি ক্যাম্প-জেলে পেঁছাইয়া আসা হইল।

যাহাদের 'ক' শ্রেণীতে রাখা হইত তাহাদের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিতে-ছিল, তাহাদের জন্য জেলের হাসপাতাল ছাড়া অন্য স্থান ছিল না। তাহা-দিগকেও হাজারিবাগ লইয়া যাইবার কথা ছিল; কিন্তু ততদিনে রেল গাড়িতে আসা-যাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহাদের সেখানে যাওয়া অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। প্রায় এক মাস পর্যন্ত তাহারা ঐ ছোটখাটো হাসপাতালেই থাকিল, কেহ কেহ এদিকে ওদিকেও থাকিয়া গেল। বাঁকিপুর জেল পাটনা জংশন রেলওয়ে স্টেশনের নিকটেই। সেখান হইতে গাড়িগুলির আসা-যাওয়া, বিশেষতঃ রেলের বাঁশীর আওয়াজ, খুবই শুনিতে পাওয়া যাইত। এ-সকল কয়েক মাস ধরিয়া বন্ধই থাকিল। শুধু একটি ইঞ্জিনের বাঁশী শুনিতে পাওয়া যাইত, যখন রেলের কামরাগুলি স্টেশনের এদিক হইতে হয়তো ওদিকে সরানো হইত। সে-সব আওয়াজও আমরা চিনিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমরা উহাতে এই ভুল করি নাই যে, গাড়ি বুঝি চলিতেছে। প্রায় এক মাস পরে সকলকে হাজারিবাগে লইয়া যাওয়া হইল। আমি সেখানে যাওয়ার উপযুক্ত ছিলাম না। সেখানকার জলবায়ুও আমার অনুকূল হইত না। এই কারণে আমাকে পাটনাতেই রাখা হইল।

জেলে পেঁছিবার দুই-চার দিন পরে এই খবর রটিয়া গেল যে আমাকে বুঝি বাহিরে, যেখানে ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের রাখা হইয়াছে, এমন কোথাও রাখা হইবে। রেল চলা বন্ধ হইয়াছে, এইজন্য যাওয়ার একই যান ছিল—হাওয়াই জাহাজ। ডাক্তারদের মত লইলে তাঁহারা বলিলেন যে আমার শরীরের অবস্থা এমন নয় যে হাওয়াই জাহাজে যাওয়া সহ্য করিতে পারিব। এইজন্য এ-প্রস্তাবও স্থগিত রাখা গেল। প্রায় দশ মাস পরে, ১৯৪৩ সালের জুন মাসে, একদিন হঠাৎ মেজর মর্ডক জেলে আসিলেন। ইনি আমাকে গ্রেপ্তারের সময় দেখিয়াছিলেন, হাজারিবাগ লইয়া না যাওয়ার অনুকূলেও মত দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, আমরা সরকারের হুকুম পাইয়াছি যে আপনাকে দেখিয়া আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সত্বর

রিপোর্ট যেন দিই। গ্রীষ্মকালে, বিশেষ করিয়া জনুনের প্রারম্ভে, আমি খুবই ভাল থাকিতাম। সেই সময় খুব ভালই ছিলাম। তাই স্বাস্থ্য বিষয়ে যখন কোনও খারাপ রিপোর্ট দেওয়া হয় নাই এমন সময়ে ডাক্তারের আসা অবশ্যই আশ্চর্যজনক ছিল। আমি অনুমান করিয়া লইলাম যে আমাকে বুঝি অন্য কোনও স্থানে পাঠাইতে চায়। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে গোপন সংবাদ তো তিনি কিছু জানেন না, জানাইতেও পারেন না, তথাপি সাধারণভাবে বলিতে পারেন যে এমন কিছু কথাই ছিল। আরও খানিকটা প্রশ্ন করিলে তিনি এ-কথাও বলিলেন যে আমাকে হাজারিবাগ পাঠানো হইবে না, দক্ষিণে পুনার দিকে আমাকে যাইতে হইবে। পরে জেল হইতে বাহির হইবার পর সংবাদ পাইয়াছিলাম যে আমেদনগর কেল্লায় আমাকেও পাঠাইবার কথা ছিল, সেখানে আমার জন্য ঘরও ঠিক করা হইয়াছিল; কিন্তু কেন জানিনা, কিছু হয় নাই। কিছুদিন পরে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দেখিতে আসিলেন তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কথা আর অগ্রসর হয় নাই কেন তাহা তিনি জানেন না।

জেলে যাওয়ার সময় আমার চিকিৎসা বৈদ্যরাজ ব্রজবিহারী চৌবেজী করিতেন। জেলখানায় তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করানো সম্ভব ছিল না। জানি না গভর্নমেণ্ট অনুরোধ করিলেও এ-বিষয়ে অনুমতি দিবেন কি না, আমিও নিজের জন্য আরাম চাওয়া পছন্দ করিতাম না। তাই জেলে পেশছানো মাত্রই ডাক্তারী চিকিৎসা শুরু হইয়া গেল। বাহিরে থাকিলে পাটনার স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীত্রিদিবনাথ ব্যানার্জি (টি. এন. ব্যানার্জি), যিনি সে সময়ে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, ডাক্তার রঘুনাথ-শরণ ও ডাক্তার দামোদরপ্রসাদ আমাকে দেখিতেন। গভর্নমেণ্ট আদেশ করিলেন যে কখনও জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (সে সময়ে সিভিল সার্জেনই এই পদে নিযুক্ত থাকিতেন) প্রয়োজন বোধ করিলে ডাক্তার ব্যানার্জিকে ডাকাইয়া লইবেন। এইজন্য ডাক্তার ব্যানার্জি যখন-তখন আসিতেন। শরীর একটু বেশি খারাপ হইলে ডাক্তার শরণ ও ডাক্তার দস্তিদারকেও বিশেষ করিয়া ডাকা হইত। এই প্রকারে, যখন যখন আমার শরীর অসুস্থ হইত, তখন তখন পাটনাতে যাঁহারা উৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন, আর বহু বৎসর ধরিয়া আমার চিকিৎসা করিতেন, তাঁহারাই আসিতেন। আমার স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই, এরূপ অভিযোগ কখনও করা হয় নাই। এইভাবে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা সম্বন্ধেও কখনও কোনও প্রকারের অভিযোগ হয় নাই। গভর্ন-মেণ্টের হুকুম অনুসারে আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য প্রথম হইতে মথুরা-বাবু ও চক্রধরবাবুকে বাঁকিপুর জেলেই থাকিতে দেওয়া হয়। পরে

বাল্মীকিকেও আমার সঙ্গে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। অন্য লোক আসিত যাইত, কিন্তু আমার জন্য নয়। কত লোককে তো গ্রেপ্তার করিত আর সোজা জেলে লইয়া যাইত। কিন্তু কিছুকাল পরে এরূপ করা বন্ধ হইল, গ্রেপ্তার করিয়া লোককে সোজা ক্যাম্প-জেলে পাঠানো হইত। কখনও কখনও কাহারও শরীর অসুস্থ হইলে হাজারিবাগ জেল হইতে, কি অন্য কোনও জেল হইতেও, পাটনার বড় হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা প্রথমে আসিত বাঁকিপুর জেলে, সেখান হইতে আবার হাসপাতালে পাঠানো হইত। এইরূপে হাসপাতাল হইতে ফিরিবার সময়েও বাঁকিপুর জেল হইয়াই ফিরিত। হাজারিবাগ হইতে আগত এই সকল রুগ্ন কয়েদী ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে বর্তমান জগতের সংবাদ পাওয়ার উপায় ছিল না। কিছুকাল পরে ইহাও বন্ধ হইয়া গেল। যাহাদের হাসপাতালে যাওয়ার কথা তাহাদের সোজাসুজি হাসপাতালেই পাঠানো হইত। তাহা জেলে না জানি কিভাবে, জিজ্ঞাসা না করিয়াও, জানার চেষ্টা না করিয়াও, খবর আসিয়াই যাইত। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের কোথায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে সংসারে কেহ তাহা জানিত না, গভর্নমেণ্ট এইরূপ মনে করিতেন। বাইরের লোকেরা কবে জানিতে পারিল যে তাঁহারা আমেদনগর দুর্গে আছেন তাহা জানি না, কিন্তু আমরা তো বাঁকিপুর জেলে থাকিয়াই ধরা পড়ার কয়েকদিনের মধ্যেই একথা জানিতে পারিয়াছিলাম। স্থানীয় সংবাদপত্র আমাদের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরে পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। বিহার সরকার পাটনা 'ডেলি নিউজ' নামে এক ইংরাজি দৈনিকে বিবৃতি বাহির করিতে থাকিলেন, তাহাতে সমস্ত খবর পাওয়া যাইত। তাহা হইতে এক বিশেষ কথা এই জানা গেল যে গভর্নমেণ্ট কোন জেলার উপর কতটা সামূহিক জরিমানা বা পিউনিটিভ টেক্স ধার্য করিয়াছেন। দেখিতে পাইলাম যে কয় মাসের মধ্যে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে!

বিয়াল্লিশ সালের বন্দীজীবন

বাঁকিপুরের কারাজীবন আমার পক্ষে কোনও ক্রমেই কষ্টকর হয় নাই। এমনিতে তো কোনও এক স্থানে বন্ধ থাকাই কষ্টকর, কিন্তু আমি নিজেকে এমন করিয়া তৈয়ার করিয়াছিলাম বা এমনি অবস্থা পাইয়াছিলাম যে জেলে পোঁছাইবার পর আমি বাইরের চিন্তা ভুলিয়া যাইতাম—যাহা কিছু বাহিরে

ঘটিত অথবা ঘটিতে পারিত তাহার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিতাম না। বাহির হইতে কোনও কয়েদী যদি আসিত ও তাহার সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে সে বাহিরের সংবাদ দিত। অন্যান্য জেল হইতে যাহারা আসিত তাহারা সেই সব জেলের অবস্থা জানাইত। সংবাদপত্র যখন পুনরায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ও আমরা পাইতে লাগিলাম, তখন তাহা হইতেও দেশের কথা বোঝা যাইত। আমি কিন্তু একভাবে এ-সকল কথা শুধু শুনিয়া লইতাম, অন্য কোনও সম্বন্ধ রাখিতাম না। দুই-এক-জন বন্ধু বাহির হইতে খবর পাঠাইতে ও সেখান হইতে আমার মতামত জানিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে বিশেষ উৎসাহ দিই নাই, তাহার পর আর কেহ বড় একটা চেষ্টা করে নাই। গোড়ার দিকে কয় মাস ধরিয়া অসুস্থ ছিলাম। বর্ষায় ও শীতকালে সর্বদাই অসুস্থ থাকিতাম। শুধু মার্চের শেষ হইতে জুন মাস পর্যন্ত সুস্থ থাকিতাম। কিন্তু সর্বদাই অস্বাস্থ্য এত দূর ছিল না যে শুধু চৌকির উপর শুইয়া থাকি। সেইরূপ অবস্থাও কিন্তু সর্বদা নয়। তাই সুতা কাটিবার ও লেখাপড়া করিবার সময় পাইয়াছিলাম। পরবর্তীকালে এই সুযোগ আরও বাড়িয়া গিয়াছিল—যখন বাহির হইতে কয়েদীদের যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া গেল এবং আমার সঙ্গেও দুই-তিন জনের বেশি থাকিল না।

বাড়ির লোকদের সঙ্গে বরাবর দেখা-সাক্ষাৎ হইতে থাকিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিত যাইত; হয়তো এ-জ্ঞানও তাহাদের ছিল না যে আমি কোথায় আছি, এবং কেনই বা এক জায়গায় বন্ধ আছি; কিন্তু শুনিয়াছ যে দেখা করিবার দিন আমার নিকটে আসিবার জন্য তাহারা উৎসুক হইয়া থাকিত। শ্রীমান অরুণ, আমার নাতি, তাহার বয়স তখন আড়াই বৎসর, কিন্তু সে জেলের ফটকে ঢুকিবামাত্র সেখান হইতে সোজা ছুটিয়া হাসপাতাল-ওয়ার্ডে আমার ঘরে আসিত। দুই-চারিবার আসিবার পরেই সে পথ চিনিতে পারিল, আমার ঘরও চিনিল। তাহার চেয়ে বড় মেয়েরা তো রাস্তা ও ঘর পূর্ব হইতে জানিতই। আমার নিকটে পৌঁছিয়া শিশুরা ফরমাইশ করিত—দাদু, কিছু খাওয়াও! আমি তাহাদের জন্য কিছু প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। আধ ঘণ্টা থাকিয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া, কিছু খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইত। যাওয়ার সময় জেল পরিধির ফুটন্ত সুন্দর সুন্দর ফুল পছন্দ হইলে তুলিয়া লইয়া যাইত। জেলের কর্তৃপক্ষ গোলমালে অসন্তুষ্ট হইতেন না, শিশুদের চঞ্চলতা দেখিয়া খুশিই হইতেন ও হাসিতেন। যখন তখন অরুণ আমার হাত ধরিয়া যাওয়ার সময় বলিত—'দাদু, তুমিও চল।' শৈশবের কেমন সুন্দর, নিরীহ, নিশ্চিন্ত ভাব!

জেলে এক সময় খুব চিন্তায় কাটিয়াছিল যখন মহাত্মাজী উপবাস করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে সংবাদ তো সংবাদপত্র হইতে পাওয়া গিয়াছিল। আমরা গভর্নমেণ্টকে লিখিয়াছিলাম যে ওখানকার খবর যেন আমাদিগকে তার করিয়া পাঠানো হয়। কয়েকজন বন্ধুকেও তার পাঠাইবার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তার আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতক্ষণ সি. আই. ডি. সেই তার দেখিয়া না দিত, 'পাস' না করিত, ততক্ষণ পাইতাম না। ইহাতে দেরি হইত, আর জেল আফিসে পেঁছাইবার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার পর তার পাইতাম। ওদিকেও লোকে ততখানি খবর পাঠাইতে পারিত, যতখানি সরকারি বুলেটিনে ছাপা হইত, তাহাতো পাটনা ডেলি নিউজে সকালবেলাতেই আমরা পাইতাম; তাই তার আরও অকেজো হইয়া যাইত। কিছুদিন পরে আর তার চাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। একদিন খবর আসিল যে মহাত্মাজীর অবস্থা খুবই খারাপ। শহরে তো সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে তিনি আর নাই! জেলে আমরা এই সংবাদ পাই নাই। পাটনা ডেলি নিউজে জানিতে পারিলাম যে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন ও শরীরের অবস্থা একটু ভাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা চিন্তা করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম। ঈশ্বরের দয়ায় সংকট কাল পার হইয়া গেল; মনে হইল তিনি এখন এই বিপদের শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন। পবে এই শুভ সংবাদও শুনিতে পারিলাম যে এ যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও লর্ড লিনলিথগোর নীতি ও কঠোরতা যতখানি দেখাইবার ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে দেখানো হইয়াছে।

কারাজীবন এক প্রকার কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিনাই কাটিতেছিল। বাহিরের যাহা কিছু জনসাধারণ, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, ফৌজ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা ঘটিত তাহার সংবাদ কিছু কিছু পাইতাম। তাহা ছিল ভয়ংকর, রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমরা নিরুপায়, শোনা ছাড়া আর কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না। নূতন নূতন অর্ডিন্যান্স হইতেছিল, তাহাতে অত্যাচার আরও বাড়িতেছিল। সে অত্যাচার শুধু রাজনৈতিক মামলায় নয়, মামুলি মকদ্দমায়ও ছিল। এখানে দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

আমাদের জেলে যাইবার কয়েক দিনের মধ্যেই পাটনা জেলার কোনও গ্রামে দুই দলে, জমি বা অন্য কোনও বস্তু লইয়া মারপিট হইয়াছিল। এক ব্যক্তি মারা যায়। তখনকার দিনে কোনও মকদ্দমায় সাজা দিতে হইলে পুলিশের পক্ষে সবচেয়ে সহজ পথ ছিল তাহার উপর রাজনৈতিক আবরণ দেওয়া। তাহারা ইহার উপরও রাজনৈতিক জামা পরাইয়া দিল। খুনের কারণ বলা হইল যে যে-লোকটিকে খুন করা হইয়াছে সে সৈন্য বিভাগে ভর্তি হইয়াছিল, বিপক্ষ কংগ্রেসী ছিল বলিয়া তাহারা উহাকে ফৌজে ভর্তি হইতে বারণ করিয়াছিল, সে কথা শোনে নাই বলিয়া তাহাকে খুন

করা হইয়াছিল! মামলা সোজা স্পেশাল জজের সম্মুখে পেশ করা হইল। তাহার ফয়সালা হইল এই যে যাহাকে খুন করা হয় সে কখনও সৈন্য বিভাগে ভর্তিই হয় নাই, তাই উহা তাহার খুনের কারণ হইতে পারে না—তবে কারণ যাহাই হউক, খুন যখন হইয়াছে তখন আটজনকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হউক। অর্ডিনান্স অনুসারেও ফাঁসির মঞ্জুরী হাইকোর্টের একজন জজের দ্বারা হওয়া চাই। এজন্য বিশেষ করিয়া একজন জজ নিযুক্ত করা হইল। তিনি সাতজনকে ছাড়িয়া দিলেন, একজনের ফাঁসির দণ্ড বহাল রাখিলেন। তাহার পক্ষ হইতে প্রিভি কাউন্সিলেও আপিল করা হইল, কিন্তু আপিল নামঞ্জুর হইল। যতদিন জেলে ছিলাম, আমাদের মধ্য হইতে কাহাকে না কাহাকে একটা কাজ করিতে হইত। তাহা আমরা খুশি হইয়া করিয়াও দিতাম। কোনও সাধারণ কয়েদী জেল হইতে আপিল করিবে স্থির করিলে সে কোনও-না-কোনও প্রকারে আমাদের নিকট আসিয়া যাইত। আপিলের দরখাস্ত লিখাইয়া লইত। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতের পক্ষ হইতে দরখাস্ত আমাকে লিখিতে হইত। দেখিয়াছি, জেলের কর্তৃপক্ষ এরূপ ব্যক্তির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সর্বদাই এ-বিষয়ে আগ্রহ দেখাইত। মনে আছে, তাঁহারা দুইটি মামলায় আমাকে দিয়া দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমটি ছিল ফাঁসির মামলা। পুলিশ ইহার উপর রাজনৈতিক রঙ চড়াইয়াছিল। রাজনৈতিক বলিয়াই ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। দরখাস্ত লিখিয়া দিলাম। গভর্নর ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। সে প্রাণে বাঁচিল। পুলিশ যে রাজনৈতিক উপলক্ষ করিয়া সাজা দেওয়াইয়াছিল তাহার এক সুফল হইল এই যে যখন পুনরায় ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিদল গঠিত হয় তখন অন্যান্য রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গে সেও নিষ্কৃতি পাইল! মুক্তি পাইয়াই সে আমার নিকটে আসিয়া সদাকত আশ্রমে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। একটি স্ত্রীলোকেরও ফাঁসির হুকুম হয়। জেলার নিজে আসিয়া তাহার দরখাস্ত আমাকে দিয়া লেখাইয়া লইয়াছিলেন। তাহারও সাজা ফাঁসির বদলে কালাপানি বা দ্বীপান্তর হয়।

অন্য মকদ্দমাটি ছিল ডাকাতির। অভিযুক্তকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তখনকার দিনে সাধারণ মকদ্দমার তদন্তও অর্ডিনান্স অনুসারেই করা হইত। ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী দণ্ড দিতে পারিতেন। একজন লোক ছিল, তাহার বয়স ষাট বৎসরের কম হইবে না। তাহার হাতে আব ছিল, আঙ্গুলগুলি পুরাপুরি খুলিত না। খোঁড়া ছিল বলিয়া ভাল করিয়া হাঁটিতে পারিত না, দৌড়ানো তো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। জেলেও অসুস্থ ছিল। আমি যেখানে ছিলাম সেই হাসপাতালেই সে থাকিত। মকদ্দমাটা

এই : পাটনা-রাঁচি রোড, যেখানে সর্বদা লোকের চলাচল, গরুর গাড়ি করিয়া একজন বস্তা বস্তা চাল লইয়া যাইতোছল। ডাকাতেরা গাড়ি আটক করিয়া চাল লুটিয়া লইল। তাহারা বস্তাগুলি পিঠে করিয়া খেত দিয়া পালাইয়া গেল। গাড়োয়ানের চীৎকারে আশপাশের কয়েকজন লোক আসে। সকলে ডাকাতদের পিছনে পিছনে ছুটিল। এক মাইল দেড় মাইল দূরে গিয়া খেতে বস্তা ফেলিয়া দিয়া ডাকাতেরা চম্পট দিবে, এমন সময় লোকেরা গিয়া তাহাদের ধরিয়া ফেলিল। সেই সব ডাকাতের মধ্যে উপরের অষ্টাবক্র মহাশয়ও ছিল! তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট জেল হাসপাতালে আসিয়াই তাহার বক্তব্য গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে সাত বৎসরের সাজা দিলেন। আমি যখন হাস-পাতালের নিজের ওয়ার্ড হইতে বাহির হইলাম তখন সে পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে আপিল করিতে বলিলাম। জেলারকে বলিয়া সে রায়ের নকল আনাইল। আমি আপিলের দরখাস্ত লিখিয়া দিলাম। সে হাইকোর্ট হইতে মুক্তি পাইল। জজেরা সমস্ত ঘটনা অসম্ভব মনে করিয়া গরিব বেচারীর গ্রেপ্তারের কারণ ডাকাতি ভিন্ন অন্য কিছু ছিল বলিয়া মনে করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল যে মানুষ সত্যই অন্ধ—অন্তত অর্ডিনান্সের মাধ্যমে যে-সব ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করেন তাঁহারা মানুষকে অন্ধ করিয়া দেন। তাহা না হইলে অষ্টাবক্রকে দেখিবার পর যাহার চোখ আছে এমন কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারে যে, সে গাড়ি হইতে লুট করিয়া চালের বস্তা পিঠে লইয়া এক মাইল দেড় মাইল পর্যন্ত ধান খেত দিয়া পালাইবার পর অনুসরণকারীদের হাতে ধরা পড়ে! যাহার হাতের আঙ্গুলগুলি খোলে না, যাহার হাত সোজা হইতেই পারে না, যাহার পা এমন খোঁড়া যে হাঁটাই তাহার পক্ষে কঠিন, যাহার বয়স ষাট বৎসর, সে দুই-মণী চালের বস্তা পিঠে লইয়া এক মাইল দেড় মাইল পালাইতে পারিয়াছিল, এ-বিশ্বাস অন্ধ ব্যক্তিই করিতে পারিত। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করিয়া তাহাকে সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত কারয়াছলেন।

রাজনৈতিক মকদ্দমার কথা তো বলারই নয়। পাটনা জেলার কিছু অংশ বর্ষায় জলে ডুবিয়া যায়। তাহাকে 'টাল' বলে। বর্ষাকালে রেলপথ হইতেই যতদূর চোখে দেখা যায় জলের পরে জলই দৃষ্টিতে আসে। এই টালে যে-সব গ্রাম আছে বর্ষাকালে তাহারা পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। এখান হইতে বাহিরে যাওয়ার জন্য নৌকা ছাড়া আর কিছু উপায় নাই। এমনিতেই অন্যান্য সময়েও এই সব গ্রামে সপ্তাহে একবার ডাক-হরকরা ডাক লইয়া যায়। বর্ষাকালে হয়তো মাসে এক-আধবার ডাক যদি পেঁছায় তো ভাগ্য বলিতে হইবে। এমন একটি ছোট গ্রামের লোকদের

সঙ্গে সেখানকার অন্যতম জমিদারের কয়েক বৎসর ধরিয়া ঝগড়া চলিয়া আসিতেছিল। এই আন্দোলনের সুযোগ বুঝিয়া সে সেখানকার প্রধান প্রধান চাষীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে দিয়া রাজনৈতিক মকদ্দমা চালাইয়া দিল। তাহাদের ধরিয়া জেলে আনা হইল। যখন তাহাদের মকদ্দমা দায়রা সোপর্দ করা ইহল তখন তাহাদের বাঁকিপুর জেলেই রাখা হইল। সেসনে এত মকদ্দমা জমা হইয়াছিল যে এই মকদ্দমার শুনানী ১৯৪৪-এর জুন-জুলাইয়ের পূর্বে হইতে পারিল না। তাহারা প্রায় দুই বৎসর হাজতেই পড়িয়া থাকিল। তাহাদের বিরুদ্ধে বড় সঙ্গীন অভিযোগ আনা হইয়াছিল;—গ্রামের লোকেরা, বোম্বাইয়ে ৮ই আগস্ট প্রস্তাব গ্রহণের পর, কংগ্রেসের নির্দেশে নিজেদের ও অন্যান্য গ্রামে ব্রিটিশ রাজ্য উঠাইয়া নিজেদের রাজ্য স্থাপন করিয়া লইয়াছে—একজন রাজা, অন্যজন মন্ত্রী, তৃতীয়জন সেনাপতি, এইভাবে অন্য লোকেরাও এই রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতেছিল, এবং এই রাজ্য চালাইবার জন্য লোকদের উপর 'কর' ধার্য করিতেছিল। সবচেয়ে কঠোর দফা যাহা হইতে পারে তাহা সকলই তাহাদের বিরুদ্ধে লাগানো হইল, তাহাদের শাস্তি হইতে পারিত ফাঁসি, অথবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতিকে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে বাঁকিপুর জেলে আনা হইল। সেনাপতি এতই অসুস্থ ছিল যে তাহাকে এই দুই বৎসরের অধিকাংশ সময় হাসপাতালেই কাটাইতে হইল। মকদ্দমা সেসন জজের নিকট পেশ করা হইল। পুলিশের বিবৃতি এইরূপ ছিল যে বোম্বাইয়ের সংবাদ পাইয়া ইহারা নিজেদের রাজ্য কায়েম করিয়া লইয়াছে ঐ গ্রামে ও আশপাশের গ্রামে লোকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে আর যে কর দিবে না তাহার গৃহ-সম্পত্তি লুটিয়া লইতেছে। সেই সব লোকের জবাব ছিল এই যে, মকদ্দমা একেবারেই মিথ্যা, তাহারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখিত না, বোম্বাইয়ের সিদ্ধান্তের কোনও সন্ধানই তাহাদের ছিল না, গ্রামের ঐ জবরদস্ত জমিদার তাহার শত্রুতা সাধনের জন্য তাহাদিগকে মিথ্যা মকদ্দমায় ফাঁসাইয়া দিয়াছে। সেসন জজের রায় হইল এই যে, মকদ্দমা একেবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, জমিদারই উহা খাড়া করাইয়াছে, কারণ এইরূপ গ্রামে—যাহার সম্বন্ধ বর্ষাকালে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—বোম্বাইয়ের সিদ্ধান্ত ও আন্দোলনের খবরও হয়তো পেঁছায় নাই; কারণ যেদিন সেখানে স্বাধীন রাজ্যের কথা বলা হইতেছিল সেদিন পর্যন্ত পাটনা শহরেও আন্দোলনে তখনও জোর হয় নাই। শেষে সকলেই মুক্তি পাইল; কিন্তু দুই বৎসর ধরিয়া হাজতবাস ও মকদ্দমায় প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পরে।

অন্য একটি দৃষ্টান্তের কথা বলি। উনিশ-কুড়ি বৎসরের একটি ছেলে।

রাজনীতির সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। দেখিতে সুদর্শন। পুলিশের তাহার উপর কিছু রাগ ছিল। হয়তো সে ছোটখাট সাধারণ চোর বা পকেটমার হইয়া থাকিবে। ৯ আগস্টের আন্দোলন আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বেই, বিনা টিকিটে রেলে চড়ার জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার মধ্যে আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। পুলিশ তাহাকে বেশ কিছু দিনের জন্য জেলে রাখিবার সহজ উপায় ইহাই ভাবিল যে থানা লুট করা, রেলের লাইন উপড়ানো, তার কাটা ইত্যাদি মকদ্দমায় তাহাকে অভিযুক্ত করিলে হয়। পুলিশ হয়তো ভাবিয়াছিল এইভাবে এক পকেটমারকে দেখা-শোনা করার ভার কয়েক বৎসরের মত তাহাদের ঘাড় হইতে নামিয়া যাইবে। টিকিট-বিষয়ক মকদ্দমায় তাহার এক সপ্তাহের জেল সাজা হইল, তাহা তো শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটা মকদ্দমা ছিল। তাহাকে রাজনৈতিক হাজতে বন্দীদের সঙ্গে জেলে রাখা হইল। একটা মকদ্দমায় সে বলিল যে ঘটনার অনেক পূর্ব হইতেই সে জেলে আটক আছে। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার কথা মানিয়া লইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আরও এই ধরনের আন্দোলন সম্পর্কিত মকদ্দমা ছিল, তাই সে খালাস পাইল না। দুই-তিনটি মকদ্দমায় সে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পাইল, কিন্তু তাহার ছুটি হইল না। এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আরও একটা মকদ্দমা আরম্ভ হইল, তাহাও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সে হাঙ্গামার বহু পূর্ব হইতেই জেলে আছে আর জেল রেজিষ্টার চাহিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলে তাহার কথার প্রমাণ মিলিবে, একথা বলা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে কয়েক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। আপিলও নামঞ্জুর হইল! কিন্তু তাহার দিক হইতে এক দরখাস্ত দায়ের করা হইল তাহাতে সমস্ত কথা লেখা হইল—তাহার গ্রেপ্তারের তারিখ, হাঙ্গামার তারিখ, অন্য যে-সব মকদ্দমায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল—সমস্তই লিখিয়া দেওয়া হইল, আর বলা হইল যে জেল রেজিস্টার চাহিয়া দেখা হউক যে সে হাঙ্গামার সময় জেলেই ছিল কি না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেল দেখিতে আসিলে ঐ দরখাস্ত তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি দেখিয়া অবাক হইলেন; কিন্তু সেই দরখাস্ত সঙ্গে লইয়া গেলেন। জানা গেল যে তিনি কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলেন, বুঝিতে পারিলেন যে লোকটি ভুল সাজা পাইয়া জেলে পচিতেছে। তিনি গভর্নমেণ্টের কাছে লিখিয়া তাহার মুক্তির আদেশ আনাইলেন।

এইভাবে কত গণ্ডগোলই যে হইয়াছিল, তাহার জন্য দুর্গতি ভুগিতে রাজনৈতিক লোকদের তো হইয়াছিলই, অন্যান্য লোকদেরও সংখ্যা কম ছিল না। রাজনৈতিক লোকদের কথা আর কি বলিব? কতদূর বলিব? এমন সব লোকও দেখিয়াছি, যাহাদের পঁচিশ পঁচিশ বৎসর জেল সাজা হইয়া-

ছিল। এমন লোকও ছিল যাহার দণ্ডাদেশ ছিল পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি-কাল কারাভোগ। যাহাদের দশ বৎসরের জেল (অথবা ডামল হাউস) তাহাদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। দুই বৎসর চার বৎসরের তো কথাই নাই। এই সকল মকদ্দমা যে অর্ডিনান্স অনুসারে রুজু হইয়াছিল তাহা যখন কলিকাতা হাইকোর্ট অবৈধ বলিয়া নির্দেশ দিলেন ও লর্ড লিনলিথগোকে নূতন অর্ডিনান্স করিতে হইল, এবং এই সব মকদ্দমায় অভিযুক্তদের আপিল করিবার সুযোগ পাওয়া গেল, তখন হাইকোর্ট অনেককে ছাড়িয়া দিলেন। অনেকের সাজা কমাইয়া দেওয়া হইল। অনেককে এই বলিয়া ছাড়াইয়া দেওয়া হইল যে যতখানি সাজা পাইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। প্রথমেই, আন্দোলনের যখন জোর ছিল ও মকদ্দমা সবে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন এই গণ্ডগোলের কিছু কিছু নমুনা দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্য হইতে একটির উল্লেখ উপরে করা হইল। ইহাতে জেলা জজ আটজনের ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন।

ইহার পূর্বের আন্দোলন যখন যখন চলিয়াছিল, তখন তখন কংগ্রেসের লোকেরা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন না। তখনও গণ্ডগোল হইত, কিন্তু সাজার একটা কিছু সীমা ছিল, এত দীর্ঘকালের সাজাও হইত না। কোথাও কোথাও অনেক অনেক টাকা জরিমানা হইত, কিন্তু সাধারণত লোকে ইহা গ্রাহ্য করিত না, গান্ধীজী আত্মপক্ষ সমর্থনের বিরুদ্ধে যে নিষেধ করিয়াছিলেন, লোকে তাহা মানিয়া চলিত। এবারকার মকদ্দমাগুলির রূপ ছিল অন্য ধরনের। ইহাতে খুব দীর্ঘকালের জন্য সাজা হইত বা হইতে পারিত, এমন কি ফাঁসি পর্যন্ত। তাই প্রশ্ন উঠিল, আত্মপক্ষ সমর্থন করা চলিবে কি না। বাঁকিপুর জেলেই এমন সব লোক ছিল যাহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩২-৩৪-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও জরিমানা আদায় করিতে গিয়া বিস্তর গোলমাল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সামান্য টাকার জন্য ঘরের জিনিসপত্র আইনসঙ্গতভাবে বাজেয়াপ্ত করাই যে হয় নাই, বে-আইনীভাবে লুটপাটও আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ-কেহ অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চালাইয়াছিল। সেখান হইতে হুকুম হইল যে সমগ্র হিন্দু পরিবারের জিনিসপত্র কোনও একজন লোকের জরিমানার জন্য বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে না। ফলে জরিমানা আদায়ের গণ্ডগোল অনেক কম হইয়া গেল, কারণ সব জায়গার লোকেরাই জানিতে পারিল যে এরূপ নজীর হইয়া গিয়াছে। এবার যখন লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এমন-এমন সঙ্গীন মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন চলিবে কি না, তখন আমি উত্তর করিলাম, অবশ্যই চলিবে। কাহারও কাহারও একথা মনঃপূত হইল না, আমি যে এরূপ মত দিয়াছি, কোনও কোনও লোক সে-খবরই

পায় নাই। তাই কেহ-কেহ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে নাই, যে সাজা দেওয়া হইয়াছিল তাহা হাসিতে-হাসিতে বরণ করে। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীজগলাল চৌধুরী, তিনি দশ বৎসর সাজা পাইয়াছিলেন, তাহাও আবার তাঁহার এক তরুণ পুত্র গুলির আঘাতে নিহত হইয়াছে তাহা শুনিয়া তিনি তাহার মৃতদেহ খুঁজিতে থানায় গিয়াছেন এমন সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নূতন অর্ডিনান্স অনুসারে যখন আপিলের সুযোগ পাওয়া গেল, তখন তাহাতেও আমি মত দিয়াছিলাম যে আপিল করা হউক। দুই কারণে এই রায় দিয়াছিলাম—প্রথমত, আমি ভাবিয়াছিলাম যে আত্মরক্ষা করিলে ম্যাজিস্ট্রেটের হয়তো কম গণ্ডগোলে পড়িতে হইবে, দ্বিতীয়ত, আমি দেখিয়াছিলাম যে এই আন্দোলনে এমন অনেক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছিল যাহাদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও যোগ ছিল না এবং যাহারা সকল অবস্থায় নিজেদের বাঁচাইয়া চলিত। কংগ্রেসের লোকদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা নিজেদের বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। সাজাও হইতেছিল কঠোর। তাই আমি ভাবিলাম যে যদি ইহাদিগকে বারণ করা যায় তাহা হইলে অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িবে এবং বারণ করিলেও হয়তো অনেক লোক আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে। এই অবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে দেওয়াই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। আমি জানিতাম এবং যাহাদের সঙ্গে দেখা হইত তাহাদেরও নিজের বিশ্বাসের কথা বলিয়া দিতাম যে যদিও তাহাদের দণ্ডাদেশ দীর্ঘকালের তথাপি তাহারা এবং আমার মতো যাহারা বিনা মেয়াদে জেলে আবদ্ধ আছে সকলে একই সময়ে মুক্তি পাইব। এমনও হইতে পারে যে আমরা কিছু আগেই মুক্তি পাইব, কিন্তু যতদিন তাহাদিগকেও ছাড়াইয়া না লই ততদিন বাহিরে থাকিতে পারিব না। কথাও তো এইরকমই ছিল। আমরা যদি এতগুলি লোককে দীর্ঘদিন জেলে ভুগিবার জন্য ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে নিজেরা কতদিন বাহিরে থাকিতে পারিব? আমি একথা ভাবিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম যে জেলের বাহিরে আসিয়া মহাত্মাজীও মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন কবিবার জন্যই আদেশ দিলেন। চিন্তা তাহাদের জন্যই হইত যাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। যাহাদের কয়েদ হইয়াছিল তাহারা কিছু আগে পরে জেল হইতে বাহির হইতে পারিবে, কিন্তু যাহাদের ফাঁসির সাজা হইয়াছিল তাহারা তো চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। পাটনাতে কয়েক-জনের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। কিন্তু কোন-না-কোন প্রকারে সকলে বাঁচিয়া গেল। আপিল প্রভৃতিতে কিছুটা সময় গেল। পরে আমরা যখন বাহির হইলাম আর মহাত্মাজী ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত লোকদের বিষয়ে লর্ড ওয়েভেলের সঙ্গে কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন, তখন অন্য সকলের সঙ্গে

পাটনার লোকদের ফাঁসির সাজাও 'ডামল হাউসে' বদল করা হইল, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সময়ে তাহারা নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু মজঃফরপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের ইত্যাদি স্থানে বহুলোকে ফাঁসিতে ঝুলিল। তাহারাও যদি হঠাৎ ফাঁসির দড়িতে না ঝুলিত, তাহা হইলে শেষকালে অবশ্যই ছাড়া পাইত। কিন্তু যদিও তাহাদের সঙ্গে একই মকদ্দমায় সাজা পাইয়াছে এমন সব লোক পরে ছাড়া পাইল, তথাপি তাহারা তো চলিয়াই গেল। যাহারা ফাঁসির সাজা পাইয়াছিল তাহাদিগকে আজ বাহিরে দেখিয়া যেমন একদিকে ভাল লাগে, তেমনি অন্যদিকে দুঃখও হয় যে অন্যদের এইভাবে বাঁচাইতে পারিলাম না।

বিয়াল্লিশ সালের উত্তেজনার পরিণাম

এবার বিয়াল্লিশ সালের ৯ আগস্ট তারিখে জেলে যাই, পঁয়তাল্লিশ সালের ১৫ই জুন বাহিরে আসি। উপরে যেমন বলিয়াছি, প্রথমে মথুরাবাবু ও শ্রীচক্রধর শরণ আমার সঙ্গে ছিলেন; অন্যান্যেরা আসিতে যাইতেছিলেন, তবে আমার জন্য নয়। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে শ্রীচক্রধর শরণকে হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হয়; ১৯৪৪ সালের মার্চে মথুরাবাবু মুক্তি পান। তাহার পর ১৯৪৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার সঙ্গে শুধু বাল্মীকিই ছিল। নূতন অর্ডিন্যান্স অনুসারে গভনমেণ্টের দিক হইতে প্রতি ছয় মাসে এক কমিটি আসিত ও নজরবন্দী লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিত। যাহাদের জন্য সুপারিশ করিত তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই কমিটি প্রথমবার আসেন ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে। ইহারই অনুমোদনে মথুরাবাবু হঠাৎ ছাড়া পান। কমিটির সভ্যেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি বাহিরে যাইতে চাই? আমি উত্তর দিই, একা নয়, সকলের সঙ্গেই যাইতে চাই। তাহাতে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, ছাড়িয়া দিলে কি আমি খুবই আশ্চর্য হইব? আমি উত্তরে বলি, নিশ্চয়, খুবই আশ্চর্য হইব। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, দেশে বিপর্যয় করিবার কার্যবিধি যদি কংগ্রেস না-ই দিয়া থাকে তবে লোকে কি করিয়া জানিল, আর দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এত তাড়াতাড়ি কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িল? আমি উত্তর দিলাম, ৮ই আগস্টের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তি ৯ই আগস্টে সকালবেলায় সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির লোকদের

গ্রেপ্তারের কারণ বলিয়া গভর্নমেণ্ট ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গভর্নমেণ্টের ইহা উচিত হইয়াছে; সে বিজ্ঞপ্তিতে একথার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবার রেল ও টেলিগ্রামের লাইন নষ্ট করিয়া দেওয়ারও কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই দিনই বা তাহার পরের দিন মিঃ এমেরি রেডিওতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতেও একথার উল্লেখ ছিল, এবং সে বক্তৃতাও সংবাদপত্রে ছাপা হইয়াছিল। কংগ্রেসের দিক হইতে কোনও কার্যক্রম বাহির হয় নাই—লোকে বুঝিয়া লইয়াছিল যে কার্যক্রম এইরূপই হইবে, এবং গভর্নমেণ্টের কথার উপরই বিশ্বাস করিয়া লোকে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার আজ বিশ্বাস যে এই কার্যক্রমের এত অধিক ও এত তাড়াতাড়ি প্রচার এই কারণে হইয়াছিল। উপরে যেমন বলিয়াছি, লোকের মনে প্রথম হইতেই, ১৯৩০ হইতেই, এই ধরনের কথা উঠিত, এবার তাহার সমর্থন পাওয়া গেল, এবং জনসাধারণও তাহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিল। ইহার দুইটি স্পষ্ট প্রমাণ আমি সে-সময়ে জেলে থাকিতে থাকিতে পাইয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম একথা খুব জোরেই চলিবে। আমার গ্রেপ্তারের অল্প কয়েক দিন পরেই ফুলনবাবু জেলে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি বলিলেন যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এ-সংবাদ শহরে আসিয়া গেলে অনেকে তাঁহার নিকটে গিয়া কার্যক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করে। লোকে ভাবিত আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়া থাকিবে এবং আমি কিছু বলিয়া থাকিব। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা হয় নাই বলিয়া কিছু বলিতেও পারি নাই। তবে ঐ দিন কয় ঘণ্টা পূর্বেই সরকারি বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, লোকের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই দিন পরে যখন কয়েকজন ছেলেকে সেক্রেটারিয়েটে গোলাগুলির ব্যাপারে গ্রেপ্তার করিয়া বাঁকিপুর জেলে আনা হইল তখন দেখিলাম তাহারা সকলে তার-টেলিফোন আর রেল ও রাস্তা ভাঙ্গা, কাটা ও কোনও রকমে চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিত। উপরে যেমন বলিয়া আসিয়াছি, যখন জেল দরজার নিকটে একটা লরীতে করিয়া কয়েক-জন ছাত্র গ্রেপ্তার করিয়া কোথাও পাঠানো হইতেছিল, তখন জনসাধারণ তাহা-দিগকে উদ্ধার করিয়া লরী পোড়াইয়া ফেলিল, কিন্তু অন্য লরীগুলি হইতে অন্যান্য ছাত্র নামাইয়া খানিকক্ষণের জন্য পুনরায় জেলের ভিতরে লইয়া গেল। আমি অবশ্য অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাপারটা যে ভাল হইল না সেকথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইহার পর তাহাদের উত্তর পাইলাম যে এখন টেলিফোনের তার প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা ও রেল বন্ধ করাই ঠিক, তাহা হইলে লরীগুলি অকেজো করিয়া দেওয়া উক্ত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত, তাই ইহাও ঠিক হইয়াছে মনে করিতেই হইবে। আমি অনেক

করিয়া বলিলেও উহা তাহাদের ভালো লাগিল না, যদিও আমার সম্মান রাখিবার জন্য তাহারা কিছু বলিল না। তাহারা তো জেলে কয়েক দিন ধরিয়া আটক থাকিল, তাই হয়তো উহারা জেলে এই কার্যক্রম চালু করে নাই। কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট বোঝা গেল যে মানুষের মনে এ-বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে এই কাটাকাটি ও ভাঙ্গার কার্যক্রম আছে।

এইজন্য, এত তাড়াতাড়ি, প্রায় মোগলসরাই হইতে আসানসোল পর্যন্ত ই. আই. আর.-এর মুখ্য লাইনে গাড়ির আসা-যাওয়া অনেক দিন ধরিয়া বন্ধ ছিল। পাটনা-গয়া শাখা লাইনও এইভাবে বেকার করিয়া দেওয়া হইল। শুধু গ্রান্ড কর্ড লাইনে বেশি ক্ষতি হয় নাই। এইজন্য সেখানকার গাড়িগুলির যাওয়া-আসা বন্ধ হয় নাই। গঙ্গার উত্তর দিকে, (ও. টি. রেলওয়ে নামে পরে খ্যাত) বি. এন. ডব্লিউ. আর. রেলপথে এদিকে কাশী হইতে বিহার, অন্য দিকে গোরখপুর-বস্তি হইতে ছাপরা ও বানারসের লাইন যেখানে মিশিয়াছে ততখানি জায়গায় ভাঙিয়া চুরিয়া খুবই দেওয়া হইয়াছিল—প্রায় সর্বত্র এতগুলি স্টেশন ভাঙিয়া চুরিয়া ছিল যে কয়েক মাস ধরিয়া গাড়ি চলিতেই পারিল না। এইজন্য বিহারের বাহিরের লোকেরা ভাবিত যে সমগ্র বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের পূর্বভাগের জিলাগুলিতেই আন্দোলনের রূপ সর্বাপেক্ষা উগ্র ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল; এখানেই তাই সরকারের দমননীতিও সর্বাপেক্ষা প্রচন্ডরূপে চলিয়াছিল। জানি না কত লোক পুলিশ ও ফৌজের গুলিতে প্রাণ দিয়াছিল, কত ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কত ঘর লুটপাট হইয়াছিল, কত লোককেই বা অন্য প্রকারের অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাহারা জেলে গেল তাহাদের সংখ্যা তো আমরা এমন কিছু ভালভাবে ঠিক ঠিক সন্ধানও পাই নাই। এইটুকুই জানি যে বিহারে অনেক সাধারণ কয়েদীকে রাজনীতিক কয়েদীর জন্য স্থান করিয়া দিতে হইয়াছিল, আর মেয়াদ পূর্ণ হইবার অনেক আগেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহাদের উপর সঙ্গীন মকদ্দমা জারি হইয়াছিল তাহাদের অনেককে হাজত হইতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিত যে ভাগলপুর জেলার বাঁকা সবডিভিজনে ৩০/৪০ জন ডাকাত এইজন্যই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা বাহিরে গিয়া ডাকাতি করিলে জনসাধারণ কংগ্রেস হইতে ছাড়িয়া যাইবে! শুনিয়াছি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহিরে আসিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, একজনের তো ফাঁসির হুকুম ছিল। অন্য অনেকের অন্য প্রকারের কঠোর দন্ড ছিল। আমি জেল হইতে বাহিরে আসার পর গভর্নরের সঙ্গে দেখা হইলে এ-কথা জানাইয়াছিলাম, তিনি এ-বিষয়ে তদন্তও করাইয়াছিলেন। জানিয়াছিলাম, অনেক ডাকাত এইভাবে বাঁকাতে ছাড়া পাইয়াছিল! শুনিয়াছিলাম, প্রথম দিকে আন্দোলন

যে পর্যন্ত প্রবল ছিল, চুরি ডাকাতি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল!

আন্দোলনকারীরা কয়েকটি ডাকঘর ও রেজিষ্টারি অফিস প্রভৃতি দখল করিয়া লইয়াছিল। কোথাও তাহারা কয়েকটিতে আগুনও লাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আরম্ভের দিকে, আন্দোলন যখন প্রবল ছিল, তখন ইহাও শুনিতে পাইয়াছিলাম যে-সব জায়গায় টাকা পয়সা ছিল তাহার কিছুই তাহারা নেয় নাই। সে সময়ে তো রূপার টাকা কমই দেখা যাইত। নোটেরই চলন ছিল বেশি। লোকে আসিয়া সেই নোট পোড়াইত, তাহা হইতে ব্যক্তিগতভাবে লাভ করিবার অথবা আন্দোলনের জন্য ব্যয় করিবার চিন্তাও কাহারও ছিল না। কিন্তু কয়েকদিনের পর এ-কথা আর থাকিল না। অনেকে এ-ভাবে যোগ দিলে তাহারা আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেল, এমন কি আন্দোলনের নামে ডাকাতিও হইল। জানি না, এই সব ডাকাতির টাকা কাহার নিকটে গেল, কেই বা তাহা কি ভাবে খরচ করিল। কিন্তু এ-সব হইল অনেক পরে যখন আন্দোলন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আন্দোলন যখন প্রবল ছিল তখন গভর্নমেণ্টের কর্মচারীরাই তো লুটপাট করিবার জন্য লোককে ডাকিয়া আনিত! ডাকঘরের লোকেরা তো ডাকঘর লুট হইলেই ভালো মনে করিত; তাহারা একথা বলিবার বাহানা পাইত যে যে-টাকা জমা ছিল, তাহা লোকেরা লুটিয়া লইয়াছে; সত্যই লুট হোক আর নাই হোক, গভর্নমেণ্ট তো কিছু পাইল না। অনেক জায়গায়, প্রথম হইতেই, থানার লোকেরাও জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া যাইত; লোকেরা থানায় পেঁাছিবামাত্র পতাকা উঠাইতে দিত আর তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া একত্র উচ্চস্বরে বন্দেমাতরম্ কি ঐ প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিত। থানার এরূপ লোকদের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবহারও ভাল হইত। শুনিয়াছি, কোথাও কোথাও থানার লোকেরা নৌকা বা অন্য কোনও যানবাহনে উঠাইয়া জেলার সদর শহরে লোকদের পেঁাছাইয়া দিত, আর থানা দখল করিত। যেখানে থানার লোকেরা অত্যাচার করিত সেখানেই তাহাদের সঙ্গে জনতার হইত সংঘর্ষ। কোনও কোনও স্থানে তাহাদের মারধর করা হইত, তবে সেরূপ স্থানের সংখ্যা কম। কোনও কোনও থানার লোকেরা খুব অত্যাচারী সাব্যস্ত হইয়াছিল—ফৌজ আসিলে পুলিশের রূপই বদলাইয়া যাইত—তাহারা যে-সব অত্যাচার করিত তাহা বর্ণনা করাও কঠিন। এই সব অত্যাচারে অধিকাংশ দারোগা প্রভৃতি ঊর্ধ্বতন কর্মচারী অধিক ভাগ লইত—সিপাই কনস্টেবল কম যোগ দিত।

এ-সব কথা জানিবার পর ইহা মানিতে হইবে যে জনসাধারণ রেল ও তার তো খুবই ভাঙ্গিয়াছিল ও কাটিয়াছিল, সরকারি বাড়িঘরেরও ক্ষতি

করিয়াছিল, কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপকতার অনুপাতে জনসাধারণ সরকারি কর্মচারীদের উপর বেশি অত্যাচার করে নাই। প্রাণে মারা বা মারপিট করাও খুব কমই । মনে হয় লোকের ধারণা হইয়াছিল যে কাহাকেও মারপিট করা অথবা প্রাণে মারা অহিংসার সিদ্ধান্তের বিরোধী, তবে রেল-তার, বাড়িঘর ইত্যাদি প্রাণহীন দ্রব্য ভাঙ্গা বা গুঁড়াইয়া দেওয়া অথবা পোড়াইয়া ফেলাও অহিংসার অন্তর্গত! যদিও গভর্নমেণ্টের কিছু কিছু লোক মারা গিয়াছিল, তথাপি তাহাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। যখন দেখিতে পাই যে সুদূর প্রান্তেও বহুকাল ধরিয়া আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল ও চলিয়াছিল, তখন বুঝিতে পারি যে জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বিস্তর লোকের প্রাণ লইতে পারিত। ইহা হইতে একথাই তো বোঝা যায় যে লোকে জানিয়া শুনিয়াও কত লোককে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা না দিলে না জানি থানার আরও কত লোককে কোতল হইতে হইত। আবার এই অল্প সংখ্যক লোকের বদলে গভর্নমেণ্ট না জানি কত লোককে গুলি মারিয়া শেষ করিয়াছে। যদি উভয় পক্ষের হতব্যক্তির সংখ্যা ঠিক ঠিক জানা যাইত তাহা হইলে একজনের বদলে অন্ততঃ ৭৫ না হইলেও ৫০/৬০ জন তো অবশ্য পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র। ঠিক সংখ্যা জানাও নাই, ভবিষ্যতেও হয়তো জানা যাইবে না। তাহা হইলেও ইহা তো স্বীকার করিতেই হইবে যে আন্দোলন একেবারে অহিংসাত্মক থাকিতে পারে নাই। জনসাধারণও এই বন্ধন হইতে বাহিরে আসিয়াছিল।

আন্দোলনের জোর তো এক হইতে দুই মাস পর্যন্তই ছিল। তাহার পর তাহার প্রভাব সামান্য কিছু থাকিয়া গেল। কিন্তু লোকে আক্রমণ না করিয়া আত্মরক্ষাতেই ব্যস্ত ছিল, কারণ সরকারের দমননীতি তখনও তাহাদের বিরুদ্ধে উদ্যত ছিল। কেহ কেহ ঘুমন্ত আন্দোলন পুনরায় জাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টার কোনও বিশেষ ফল দেখা গেল না, উহা আর উঠিল না বা চলিল না। একটু আধটু এখানে ওখানে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কোনও প্রভাব গভর্নমেণ্টের উপর পড়ে নাই, লোকেও তাহাতে বিশেষ আগ্রহ দেখাই নাই—অবশ্য এজন্য দমননীতি প্রবলভাবে চলিতে লাগিল। আর জনসাধারণকে অনেক কিছু সহিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ জেলে আসে নাই, বাহিরে থাকিয়াই কাজ করিতে থাকিল। কেহ কেহ বা জেল হইতে বাহির হইয়া এই প্রকার কর্মে লাগিয়া ছিল। কিন্তু একথা অল্প সময়ের পরেই স্পষ্ট হইয়া গেল যে যাহারা এইরূপ কর্মে লাগিয়াই রহিল তাহারা এখন আর জনসাধারণের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিবে না, এবং আন্দোলন আর প্রবলভাবে চালাইতে পারা যাইবে না। যাহারা এইভাবে কাজ করিতেছিল তাহাদের পক্ষে লুকাইয়া

ছিপাইয়াই কাজ করা সম্ভব ছিল। এই আন্দোলনে এ প্রকার অনেক লোক যুক্ত ছিল। অল্পদিন পরেই তাহাদের আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কিছু করার না মিলিত সময় না মিলিত কোনও উপায় বা সাধন। ফেরার হইয়া থাকাই এমন একটা কাজ হইয়া দাঁড়াইল যাহাতে তাহাদের সমগ্র সময় ও শক্তি লাগিয়া যাইত। তাহা হইলেও অনেকে খুব কর্মপটুতা দেখাইয়াছে। কোথাও কোথাও তাহারা প্রতিষ্ঠানকে এমন দৃঢ় করিয়াও তুলিয়াছিল যে গভর্নমেণ্ট হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহা ভাঙ্গিতে পারে নাই, তাহার সন্ধানও জোগাড় করিতে পারে নাই। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে সেই সব লোকের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইল ও ওয়ারেণ্ট উঠাইয়া লওয়া হইল, তখন তাহারা বাহিরে আসিল, তখন সরকারী কর্মচারীরা তাহাদের সন্ধান পাইল। এই কর্মপটুতা ও সাহসের জন্য তাহারা প্রশংসার পাত্র। কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, যদি লুকাইয়া ছিপাইয়া কাজ না করা হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্যই মরিত, ফাঁসি যাইত অথবা অন্য প্রকার কঠোর দমননীতির কবলে পড়িত। কিন্তু নিরীহ জনসাধারণের উপর যতটা জুলুম হইয়াছিল ততটা হইত না, আন্দোলনও কোথাও কোথাও প্রবলাকার ধারণ করিত। তাহাকে শীঘ্র দমন করিয়া রাখাও সম্ভব হইত না। জনসাধারণের সম্মুখেও এমন সব লোক সর্বদাই প্রস্তুত পাওয়া যাইত যে যাহাদের তাহারা নেতা বলিয়া মনে স্বীকার করিত, যাহাদের কথায় তাহারা খুশী হইয়া প্রাণ দিত এবং ধন লুঠ করিত। লুকাইয়া ছিপাইয়া কাজ করিলে তাহার এই ফল পাওয়া যাইত যে কাজ বহু ব্যাপকভাবে অগ্রসর হইতে পারিল না, অল্প লোকের কার্যের প্রতিফল অন্য বহু লোককে ভুগিতে হইল। এইজন্য আমার বিশ্বাস জন্মিল যে যদি রেল-তার ভাঙ্গিবার লোক সামনে আসিয়া কাজ করিত আর নিজের কাজের দায় স্বীকার করিয়া লইত তাহা হইলে লোকের সাহস কোথাও বাড়িয়া যাইত, এমনও হইতে পারিত যে একজনের পরিবর্তে শত শত অন্যান্য লোক ঐ কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিত, এবং যাহারা স্বীকার করিত তাহাদের সাজা হইত, নির্দোষীরা প্রায়ই বাঁচিয়া যাইত। যাহা হউক, ইহাই তো অহিংসাবাদের কথা। যাহাদের ইহাতে বিশ্বাস নাই, অহিংসাবাদের পদক্ষেপ তাহাদের পছন্দ হইবে কেন? জন-সাধারণের সাহস যে বাড়িয়াছিল তাহা তো খোলাখুলি বিদ্রোহের জন্যই বাড়িয়াছিল—সেই নীতি অব্যাহত থাকিলে অনেক কিছু বাড়িত।

জেলে থাকিতে থাকিতেই বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে চাউল ও আহার্য দ্রব্যের মূল্য এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। আমার ছাপরা ও পাটনায় পঠদ্দশায় অবশ্য একবার দুর্ভিক্ষ হয়। মনে আছে, গভর্নমেণ্টের দিক হইতে নানা স্থানে লোকদের কাজ করাইয়া সাহায্য দেওয়ার জন্য বড় বড় পুকুর খোড়ানো হয়। আমার গ্রাম হইতে কিছু দূরে এক বড় পুকুর খোড়ানো হইয়াছিল। নানা স্থানে গরিব-দুঃখীর জন্য রান্না ভাতও বিতরণ করা হইত। তখনও ভাল চাল টাকায় পনের সের বিক্রয় হইত। তাহার পর দাম বাড়িয়া টাকায় ৯/১০ সেরে দাঁড়াইল। তাহার পর একবার কিছু মহার্ঘ হইলে উহা আরও পড়িয়া টাকায় ৫/৬ সের দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। ১৯৪৩ সালে সাধারণত টাকায় সওয়া সের দেড় সের হইয়া গেল। জেলে আমরা খবরের কাগজ হইতে কিছু কিছু খবর পাইতে লাগিলাম। বাংলাদেশের অবস্থা ধীরে ধীরে আরও খারাপ হইতে লাগিল। সেখানে লোকে খাওয়ার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে এরূপ খবরও পাওয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে এ-কথা বোঝা যাইতে লাগিল যে কলিকাতার রাস্তায় মানুষের মৃতদেহ পাওয়া যাইতেছে। আরও কিছু দিন পরে সংবাদপত্রে মৃত ব্যক্তিদের ছবিও ছাপানো হইতে লাগিল। এ ব্যাপারে 'স্টেট্‌সম্যান' ছিল সকলের অগ্রণী। ভারতীয় অন্যান্য সংবাদপত্রেও অনেক ছবি ছাপিতে লাগিল। জনসাধারণের দিক হইতে লোকদের সাহায্য করিবার চেষ্টা দেখা দিল। আমি প্রথম হইতেই সংবাদপত্রে এই সব সংবাদ পড়িতাম, ছবিও দেখিতাম। কিন্তু কিছুকাল পরে অবস্থা এমনই ভীষণ হইল যে আমার পক্ষে ছবি দেখা ও সংবাদ পড়াও অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম। জেলে বসিয়া কি বা করিতে পারিতাম! পাটনায় শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাস (পি. আর. দাস) মহাশয় দুর্গতদের সাহায্যকল্পে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি এক আবেদন বাহির করিলেন। ভাবিলাম, এই কার্যে অন্তত পত্র দিয়া লোকদের খানিকটা সেবা করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইতাম। শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়ের নিকটে এক পত্র লিখিলাম, তাহাতে তাঁহার আবেদনের সমর্থন করিলাম। ধান কাটিবার সময় আসিলে জন-সাধারণের নিকট অন্নদানের জন্য আবেদন করিয়া কিছু ধান্য সংগ্রহ করিবার পথও দেখাইলাম। কিছু দিন পর গভর্নমেণ্টের আদেশ আসিল যে আমার

পত্র শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়ের নিকট পাঠানো হয় নাই, আটকানো হইয়াছে। হয়তো আজ পর্যন্ত এই সংবাদ বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই।

বাংলাদেশের অবস্থা এত খারাপ হইয়া গেল যে জানি না কত লক্ষ লোক মারা পড়িল। নেতাদের মতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের সময়ে কালের কবলে পড়িল। সরকারি অনুমানেও হয়তো মৃতের সংখ্যা ১৯/২০ লক্ষ হইবে। যে-সকল বেদনাকর ঘটনা হইল তাহা অবর্ণনীয়। যে কারণেই হউক, গভর্নমেণ্ট প্রথমে কিছু করিতে পারিলেন না। স্যর নাজিমুদ্দিন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন মিঃ সুরাবর্দী। স্যর হার্বার্ট ছিলেন গভর্নর, বড়লাট ছিলেন লর্ড লিনলিথগো। আমার আশ্চর্য লাগিত, এই দুরবস্থাতেও ওখানকার জনসাধারণ কেমন নিঃশব্দে সব সহ্য করিয়া যাইত। অন্তত মন্ত্রিমণ্ডল কি করিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইত, পরিষদের সভ্যরাই বা কি করিয়া উহা চালাইতে দিত। কিন্তু যুদ্ধের সময়—অর্ডিনান্সের শাসন। মুসলিম লীগের হাতে ছিল অধিকার। কেহই কিছু করিতে পারিল না। লর্ড লিনলিথগো কংগ্রেসের লোকদের দাবাইয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট জোর ও শক্তির সঙ্গে কাজ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বাংলাদেশে যখন এত লোক মারা গেল যে মহাযুদ্ধে সমস্ত দেশ মিলিয়াও হয়তো মারা যায় নাই, তখনও তাঁহার দ্বারা একদিনের জন্যও বাংলাদেশে আসা সম্ভব হইল না! তিনি চলিয়া যাওয়ার পর যখন লর্ড ওয়াভেল গভর্নর-জেনারেল (ভাইসরয়) হইয়া আসিলেন তিনি আসিবামাত্র বাংলাদেশে গেলেন। সেখানে তিনি সৈন্য বিভাগকে লোকদের নিকট সাহায্য পৌঁছানোর কাজ করিতে আদেশ করিলেন। স্যর হার্বার্ট অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্থানে বিহারের গভর্নরকে পাঠানো হইল। তিনিও অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সাহায্য করেন। কয় মাস পরে, কোনও প্রকারে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইল। রাস্তায় রাস্তায় লোক মৃত্যু হইবার পূর্বে যে মরিতেছিল, তাহা বন্ধ হইল।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, যাহাদের কাজ ছিল জনসাধারণকে রক্ষা করা, ও যাহাদের এই কাজের দায়িত্ব ছিল এই বিপদে তাহাদের অনেকে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিল ও কত অর্থ তো এদিক-ওদিক হইয়া গিয়াছিল। ইহার কারণগুলির মধ্যে প্রধানরূপে ইহাও নির্দেশ করা যাইতে পারে যে গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের জন্য লোকের নিকট ধান চাউল লইয়াছিল, তাহাদের ছোট ছোট নৌকাও লইয়া গিয়াছিল। শত্রুরা যাহাতে কিছুই না পায় সেজন্য সমুদ্রতীরের স্থানগুলি জীবিকানির্বাহের উপকরণহীন অথবা মরুভূমি করিয়া দিবার যে নীতি (scorched earth policy) জাপানীদের আক্রমণের ভয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, এই দুর্ভিক্ষের মূলে তাহাও অবশ্য কাজ করিয়া থাকিবে। সে সময়ে লর্ড ওয়াভেলই ছিলেন সামরিক মন্ত্রী।

ঐ নীতির জবাবদিহি করিবার ভার তাঁহারই উপর ছিল। তাই বড়লাট হইয়া আসিতেই তিনি উক্ত নীতি হইতে উৎপন্ন যে অবস্থা তাহা সামলাইতে গিয়া সৈন্য বিভাগের দ্বারা সাহায্য করা প্রয়োজন মনে করিলেন। ইহাতে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হইল।

বিহারে চালের দাম এমনিতেই বাড়িয়া গিয়াছিল। চাল ত্রিশ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছিল। কিন্তু বিহারে বাংলার মত অবস্থা হয় নাই। এখানে অনশনে মৃতদের সংবাদ অন্ততঃ পত্রিকায় দেখা যায় নাই। এই দুর্ভিক্ষ হইতে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া গেল, এ-বিপদে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক, যেমন বিহারের ভীষণ ভূমিকম্পের পর তেমনভাবেই বাংলার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল। তফাৎ এইটুকু যে এখন লড়াইয়ের জন্য লোকের নিকট কোনও উপায় ছিল না। টাকা থাকিলেও লোকের সরকারি সাহায্য বিনা অন্ন জুটিত না। আর খানিকটা দূরে অন্ন মিলিলেও সরকারি আদেশ ও সাহায্য বিনা তাহা বাংলাদেশে পেঁছাইতে পারা যাইত না; কারণ রেল স্টীমার ইত্যাদি যাতায়াতের সমগ্র উপায়ের উপরই ছিল নিয়ন্ত্রণ। তাই ইচ্ছা থাকিলেও যতখানি সাহায্যের প্রয়োজন ছিল ততখানি লোকে পেঁছাইয়া আসিতে পারিত না। তাছাড়া এই বিপদ সুদূর প্রসারিত ছিল, আর অনেক দিন ধরিয়া ছিল। ভূমিকম্প তো ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। তাহার পর তাহার প্রভাবই শুধু দূর করিবার ছিল। এখানকার বিপদ তো কয়েক মাস ব্যাপিয়া। তাহার উপর যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ নিজের বাহাদুরি দেখাইতেছিল। ভারতবর্ষ এক। তাহার জনসাধারণ এক। এই বিপদ তাহার এক অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু যাহারা দেশ বিভাগ করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের উপরও কি ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল?

জেলে বই লেখা

এবার আমি জেলে কিছু লিখিয়াছিলামও বটে। এমনিতে তো ১৯৩০ সালেও আমি কিছু লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই—পরে যাহা কিছু লিখিয়াছিলামও তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। আমি প্রথম হইতেই পাকিস্তানের বিষয়ে কিছু লেখা-পড়া করিয়াছিলাম। ওখানে গিয়া ভাবিলাম, এ-বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু পড়াশুনা করি। পাকিস্তানের সমর্থন করিয়া লেখা কিছু কিছু বই আনাইয়া

লইলাম। সে-সব পড়িবার পর মনে হইল, যে-কথা আশ্রয় করিয়া এই দাবি পেশ করা হইতেছে তাহা কতদূর পর্যন্ত ঠিক তাহা দেখা যাক। তাহার পর একথাও মনে হইল যে মুসলিম লীগ যাহাকে পাকিস্তান বলে তাহা দেখাও প্রয়োজন—যদি কেহ তাহার দাবি মানিয়া লয় তবে তাহাকে কি দিতে হইবে এবং মুসলিম লীগ কি পাইবে—পাকিস্তান কি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে? শেষে আমি চিন্তা করিলাম যে এ-বিষয়ে কিছু লেখার অবকাশ আছে—যদিও জানি না কতদিনে জেলের বাহিরে আসিতে পারিব, আর যাহা কিছু লিখিব তাহা কখনও ছাপা হইবে কি না; তাহা হইলেও নিজের চিন্তাধারাকে পরিষ্কার করিয়া এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাহাতে অন্যেরা বুঝিতে পারে, সংগত বলিয়া মনে হইল। স্থির করিলাম যে কিছু লিখিব। আমার মনে হইল যদি এ-বিষয়ে সমস্ত কথা দেশের সামনে—বিশেষ করিয়া মুসলমানদের সামনে—উপস্থিত করা হয় তবে বিশেষভাবে আলোচনার পর আমার যেমন সন্দেহ হইয়াছিল এরূপ অন্যেও ইহাকে 'অচল' বলিয়া বুঝিতে পারিবে। এজন্য আমি স্থির করিলাম যে সে-সব কথা লিখিব যাহাতে এই অব্যবহার্যতা বা অকেজোর ভাব বোঝা যায়। পাকিস্তান যে চলিতে পারে না ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সেই অংশ লিখিবার পর তাহার ভিত্তির বিষয়েও লেখা উচিত মনে হইল; অর্থাৎ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের দুই পৃথক রাষ্ট্র আছে, সুতরাং উহা ভাগ করিয়া দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও দেশ স্থাপিত করা উচিত, এই বিষয়ে। এইভাবে লেখা যেমন অগ্রসর হইতে থাকিল, পুস্তকের আকারও তেমনি বাড়িয়া চলিল। কাজ অতি দ্রুতবেগে চলে নাই। একে তো স্বাস্থ্য তেমন নয় যে অতিশয় পরিশ্রম করি। অসুস্থ হইয়া পড়িলে মাসের পর মাস না পারিতাম কিছু লিখিতে, না পারিতাম পড়িতে। সুস্থ থাকিলে পড়িতাম এবং লিখিতাম। এমন কিছু তাড়াতাড়ি করিবারও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইতেছিল না। কারণ আশা ছিল না যে জেলে থাকিতে থাকিতে কোনও পুস্তক প্রকাশিত করিবার অনুমতি পাইব, আর এখন কারামুক্তির কোনও উপায়ও নজরে আসিতেছিল না। এইজন্য আস্তে আস্তে অল্প অল্প করিয়া লিখিলাম।

ইতিমধ্যে কোনো কোনো সংগী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে আসিল। তাহারা কোনও সংবাদপত্রের লোকদের বলিয়া দিল যে পাকিস্তানের বিষয় লইয়া এক পুস্তক লিখিতেছি। এ-কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সরকারি কর্মচারী কখনও কখনও জেলে আসিতেন। কমিশনর আসিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমার বই কতদূর লেখা হইয়াছে? আমি বলিলাম যে লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি দেখিতে চাহিলেন। আমার পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দিয়া দিলাম। একে তো আমার

অভ্যাস সরু ছোট ছোট অক্ষরে লেখার, তাহাতে আবার কাগজ কম বলিয়া কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম। বইখানি অল্প অল্প করিয়া লেখা হইয়াছিল—কোনও নূতন কথা পাইলে অথবা কোনও নূতন বইয়ের সন্ধান মিলিলে তাহা যথাস্থানে লাগাইয়া রাখিতাম; এইরূপে যেখানে অল্প জায়গাও ছাড়িয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহাও একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল, আর কোথাও কোথাও পড়ার সুবিধার জন্য অন্য রঙের পেনসিল বা কালি দিয়াও কাজ চালাইতে হইয়াছিল—তাই অন্য কাহারও পক্ষে পাণ্ডু-লিপিটি পড়া ছিল খুব কঠিন। কমিশনর প্রশ্ন করিলেন, বইখানি ছাপাইবার কি চেষ্টা চলিতেছে? আমি উত্তর করিলাম, গভর্নমেণ্ট অনুমতি দিলে ছাপানো হইবে। হইাতে তিনি বলিলেন যে বইখানি না দেখিয়া গভর্নমেণ্ট অনুমতি দিবেন না,—পাণ্ডুলিপিটির যে-অবস্থা তাহাতে গভর্নমেণ্টের দেখিতে পারাও যে কঠিন—গভর্নমেণ্ট তো টাইপ করা প্রতিলিপি শুধু দেখিতে পারেন। তাহাতে আমি বলিলাম যে টাইপ করাইবার উপায় তো আমার নিকট নাই; কিন্তু যদি গভর্নমেণ্ট এ-বিষয়ে সুবিধা দিলে টাইপ করাইয়া লইব।

এই আলোচনার পর আমি গভর্নমেণ্টকে লিখিলাম যে টাইপ করাইবার জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়া হউক, এবং ইহার জন্য তিনটি উপায়ের মধ্যে গভর্নমেণ্ট যে কোনও একটি উপায় অবলম্বন করুন। প্রথম উপায় ইহা হইবে যে আমার সহযোগী শ্রীচক্রধর শরণকে টাইপ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক, সে আমার হাতের লেখা পড়িতে জানে। সে ইতিমধ্যে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া গিয়াছিল। এজন্য সে তো জেলের ভিতরে আসিতেই পারিবে না, না হইবে আমার সঙ্গে তাহার দেখা, গভর্নমেণ্ট মঞ্জুর না করা পর্যন্ত পুস্তক জেলের বাহিরে পাঠাইতে পারা যাইবে না। তাই তাহাকে জেলারের অফিসে বসিয়া টাইপ করিতে হইবে, আর হস্তলিখিত পুঁথি ও টাইপ করা তাহার প্রতিলিপি জেলারের নিকটেই রাখিয়া আসিতে হইবে। দ্বিতীয় উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে—গভর্নমেণ্ট নিজের কোনও কর্ম-চারীকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করুন, এ-জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা আমি দিব। তৃতীয়ত এরূপ হইতে পারে যে কয়েদীদের মধ্যে যদি কেহ টাইপ করিতে জানে তবে তাহাকে বাঁকিপুর জেলে আনাইয়া তাহাকে দিয়া টাইপ করা। ভাবিবার পরে মনে পড়িল যে কংগ্রেসকর্মী জমানাদপুর লেবর ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীমাইকেল জন টাইপ করিতে জানে—আন্দোলনের জন্য এই সময়ে সে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হইয়া ও সাজা পাইয়া হাজারিবাগ জেলে আছে। আমি লিখিলাম যে যদি তাহাকে বাঁকিপুর ডাকাইয়া আনা হয় তবে সে এই কাজ করিতে পারে। এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে সুবিধাজনক, তাহা বলিলাম; কারণ যেরূপ ঘন ঘন ও ছোট ছোট লেখা

তাহা পড়িয়া যে টাইপ করিবে তাহাকে যথেষ্ট বিব্রত হইতে হইবে, তাহাকে বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এজন্য সে যদি আমার নিকটে থাকে তাহা হইলে সুবিধা হয়। এ ছাড়া অন্য একটা সুবিধাও হইবে—গভর্নমেণ্টের অনুমোদনের পূর্বে বাহিরের কোনও লোক পুঁথি দেখিবার সুযোগ পাইবে না।

গভর্নমেণ্ট আমার কথা মানিয়া লইলেন, জনকে বাঁকিপুর জেলে পাঠাইলেন। সে অনেক পরিশ্রম করিয়া যতদূর লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা টাইপ করিয়া দিল। দৈবক্রমে এই কাজ ১৯৪৫-এর ১৪ই জুন সন্ধ্যার সময়ে শেষ হইল। ঐ দিন রাত্রে আমরা জানিতে পারিলাম যে আমি কাল অর্থাৎ ১৫ই জুন সকালেই ছাড়া পাইব। এখন প্রশ্ন হইল, হস্তলিখিত পুঁথি ও টাইপ করা প্রতিলিপি—ইহাদের কি হইবে? দুইটিই কি আমার সঙ্গে বাহিরে যাইতে পারিবে, না গভর্নমেণ্ট ওগুলি দেখিয়া শুনিয়া রাখিলেই বাহিরে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিবেন? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সরকারি নির্দেশ না পাইয়া, নিজের দায়িত্বে উহা বাহিরে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিতে চাহেন নাই। কিন্তু গভর্নমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে ওগুলি লইয়া যাইবার অনুমতি পাওয়া গেল। এইভাবে, যখন আমি বাহিরে আসিলাম, তৈয়ারি বই লইয়াই আসিলাম।

উপরে বলিয়াছি, ১৯৪৪-এর মার্চ হইতে নভেম্বর পর্যন্ত বাঁকিপুর জেলে প্রায় একাই ছিলাম, শুধু বাল্মীকিই আমার সঙ্গে ছিল। তদন্ত কমিটির লোকেরা যখন অক্টোবরে আসিল তখন তাহারা এ-কথা বুঝিতে পারিল যে আমরা একেলাই আছি। তাহারা গভর্নমেণ্টকে লিখিল যে আমার নিকটে একজন সঙ্গী রাখা উচিত। নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমি কয়েকজন বন্ধুর নাম বলিলাম। গভর্নমেণ্ট শ্রীফুলনপ্রসাদ বর্মাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেও ১৯৪৫-এর গোড়াতেই ছাড়া পাইয়া গেল। তাহার পর হাজারিবাগ হইতে বাঁকিপুরে আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষকে পাঠাইল। ইনি একজন খুব পরিশ্রমী ও চিন্তাশীল ভদ্রলোক। অংক দেখিয়া ভয় পান না। আমার পুস্তক দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে হাতের লেখা পুঁথি পড়েন। আমি তাহা পড়িতে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘাড়ে একটা ভারও চাপাইলাম যে তিনি অংকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যাহাতে কোথাও কোনও ভুল দেখিলে তাহা শুদ্ধ করিয়া দেন। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি এই কার্য সম্পন্ন করিয়া দেন। বই পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে হইল যে একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে—আমি পুস্তকে ইহা দেখাই নাই যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা কিভাবে জটিল হইয়া গিয়াছে, কিভাবে ইহা এ-পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছে যে মুসলিম লীগের কাছে মনে হইতেছে যে দেশ বিভাগই সমাধানের একমাত্র উপায়।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে জেল হইতে মুক্তি পাইবার দিনই টাইপ করিবার কাজ শেষ হইয়া গেল। যখন টাইপ হইতেছিল তখন আমার নূতন কিছু লিখিবার সময় হইত না; কারণ যাহা টাইপ হইয়া যাইত তাহা একবার দেখিয়া লওয়া দরকার মনে হইত। টাইপ করার সময়েও নূতন কিছু জুড়িয়া দেওয়া যাইত। মিঃ জনকেও প্রায়ই আমাকে কিছু-না-কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিতে হইত। এই কারণে আমি পুস্তকের আরও এক ভাগ লিখিয়া মণিবাবুর কথা রাখিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহা ভুলি নাই। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে যখন ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য রাজপুতানার পিলানী নামক স্থানে যাই, তখন ঐ ভাগ লিখিয়া শেষ করি। শ্রীচক্রধর শরণ টাইপ করিলেন। পিলানী হইতে বোম্বাই যাওয়ার পথে রেলে উহার অধিকাংশ দেখিয়া মথুরাবাবুর সাহায্যে প্রেসের জন্য তাহা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলাম। বোম্বাই পেঁাছাইবার মধ্যে প্রায় সমস্ত পুস্তক প্রেসের জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। সেখানেই তাহার নামকরণ হইল 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড্'। ছাপাইবার জন্য পুস্তক প্রেসে দেওয়া হইল। ১৯৪৬-এর জানুয়ারির গোড়াতেই পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশিত হইল। এক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তিন-চার মাসের মধ্যে উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইল।

জেলে আমি আর এক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম। ১৯৪০-এ যখন আমি স্বাস্থ্যের অনুরোধে জয়পুর রাজ্যের সীকারে গিয়াছিলাম, তখন একদিন নিজের স্মৃতিকথা লিখিবার কথা ভাবি, লিখিতে আরম্ভও করি। কাহাকেও এ-কথা বলি নাই। মথুরাবাবু দিন-রাত আমার সঙ্গে থাকিতেন। তিনিও অনেক দিন পর্যন্ত টের পান নাই যে আমি কিছু লিখিতেছি। ভোর চারটা সাড়ে চারটার সময় জাগা আমার অভ্যাস। ঐ সময়ে উঠিয়া প্রতিদিন কিছু-না-কিছু লিখিতাম আর অন্যের জাগার পূর্বেই লেখা শেষ করিয়া ফেলিতাম। সেখানে অল্পই লিখিতে পারিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আর সময়ই পাওয়া গেল না। দুই বৎসর পরে যখন জেলে শরীরটা কিছু সারিল তখন সঙ্গীদের আগ্রহ হইল যে আমি যেন উহা শেষ করিয়া ফেলি। কতদূর লিখিয়াছিলাম, তাহাও ঠিক মনে ছিল না। হাতের লেখা পুঁথি বাড়ি হইতে জেলে চাহিয়া পাঠানও ভাল মনে হইতেছিল না; কারণ সি. আই. ডি. না পড়িলে কোনও জিনিস আমি পাইতাম না আর জানিতাম না যে পড়িবার পরও গভর্নমেণ্ট তাহা ভিতরে আনিবার অনুমতি দিবেন কি না। তাই আমি অনুমান হইতেই তাহার পরবর্তী কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম, সীকারে যতদূর লিখিয়া ফেলিয়াছি মনে হইতেছিল তাহার পর হইতে। ধীরে ধীরে তাহাও অনেক কিছু লেখা হইল। শেষও হয়তো হইয়া যাইত, কিন্তু পরে 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড্'

লইয়াই সমস্ত সময় কাটিতে লাগিল। তাই স্মৃতিকথা বাদ দিয়া রাখিলাম।

কখনও কখনও মনে এই চিন্তাও উঠিত যে এই স্মৃতিকথার প্রয়োজন বা উপযোগিতাই বা কি। আমি যাহা কিছু করিয়াছি বা পাইয়াছি তাহা তো অন্যের সঙ্গে থাকিয়াই—প্রথমে আমার দাদার, পরে মহাত্মা গান্ধীর। আমার এমন কোনও যোগ্যতা নাই যে আমার অবস্থা অন্যের পক্ষে জানা প্রয়োজন, অথবা তাহা হইতে অন্যে কিছু শিখিতে পারে। অবশ্য আমি সাধারণের কাজে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের কাজে, লাগিয়া আছি। যদি তাহার সম্বন্ধে নিজের স্মৃতিকথা লিখি তবে হয়তো লোকেরা কোনও কোনও কথা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টি হইতে এই স্মৃতিকথার কোনও মূল্য নাই; কারণ আমি সাধারণ হিতকল্পে উদ্‌যাপিত এত দীর্ঘ জীবনে বেশি কিছু লিখি নাই। যদি কিছু লিখিয়াও থাকি তাহা হইলেও তাহার প্রতিলিপি আমার নিকটে সুরক্ষিত নাই। অন্য লোকেরা সাধারণ ঘটনার বিষয়ে সাময়িক উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, আমি তাহাও করি নাই। কেহ কেহ অন্যের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পত্রের আদান-প্রদান করিয়াছে। আমি স্বভাবতই ঐরূপ কিছু করি নাই। আর যদি করিয়াও থাকি তাহা হইলে তাঁহার প্রতিলিপিও আমার নিকটে নাই। কেহ কেহ রোজনামচা লেখে, তাহাতে প্রতিদিন সমস্ত ঘটনার উল্লেখ থাকে। আমি রোজনামচা লিখিতেও অভ্যাস করি নাই। তাই নিজের স্মৃতিশক্তি ছাড়া স্মৃতিকথা লিখিবার অন্য কোনও উপায়ও আমার কাছে ছিল না। ইতিহাসের দৃষ্টিতে, শুধু স্মরণশক্তির উপর নির্ভর, স্মৃতিকথাকেও বিশেষ প্রামাণিকতা দিতে পারে না। এই সকল কারণে কখনও কখনও মনে হইত, আমার স্মৃতিকথা লেখা শুধু অহঙ্কার, তা ছাড়া অন্য কোনও লাভ হইতে পারে না। তাহা হইলেও যখন একবার কাজ আরম্ভ করিয়াছি তখন তাহা শেষ করিয়া ফেলাই ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম; প্রকাশিত করা আর না করার কথা পরে দেখা যাইবে।

এইভাবে, রামগড় কংগ্রেস পর্যন্ত স্মৃতিকথা জেলে লিখিতে পারিয়াছিলাম। এক প্রকার এই স্মৃতিকথাই প্রকৃত স্মৃতিকথা; কারণ ইহাতে কেবল সেই সব কথারই উল্লেখ আছে যাহা লিখিবার সময় মনে পড়িয়াছে।

জেলে থাকিতে থাকিতেই আর এক ভীষণ দুঃখের বিপদ আসিল। তাহা বিহারের উপরই আসিল। ১৯৪৪-এ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উগ্ররূপে দেখা দিল। বিস্তর লোক মরিতে লাগিল। সংবাদপত্রে এ-সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকিল। ঘটনাক্রমে শ্রীবাবু, অনুগ্রহবাবু ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা এতদিনে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জনসাধারণকে সাহায্যের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ডাক্তারেরা ডাঃ টি. এন. ব্যানার্জিকে সভাপতি করিয়া নিজেদের কমিটি করিয়া লইয়া সেবা-কার্য আরম্ভ করিলেন। ভূমিকম্পের সময় কিছু টাকা বাঁচিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, এ প্রকার বিপদের সময় জনসাধারণের সেবার জন্য এক ট্রাস্ট গঠন করিয়া সেই টাকা সংরক্ষিত ছিল। যখন কোথাও বন্যা প্রভৃতি হইত তখন অল্পবিস্তর সাহায্যের জন্য সেই টাকা হইতে খরচ হইত। এই খরচ এমন কিছু বেশি হইত না। যে টাকা ছিল তাহার সুদ হইতেই এই কাজ হইয়া যাইত। টাকার অনেক অংশ চরখা সংঘকে ধার দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে যথাসময়ে সুদের টাকা আসিয়া যাইত, তাহা ব্যাঙ্কে পড়িয়া থাকিত আর সময়ে সময়ে খরচ করা হইত। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে চরখা সংঘের কাজ বিহার গভর্নমেণ্ট এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কে আমার নামের সমস্ত খাতেই টাকা বাজেয়াপ্ত ছিল, তাহার মধ্যে একটি খাতা সহায়তা-কেষেরও ছিল। ম্যালেরিয়ার কথা পড়িয়া আমি গভর্নমেণ্টকে লিখিলাম, বাজেয়াপ্ত টাকা সাহায্যের জন্য খরচ করিবার অনুমতি দেওয়া হউক, আর প্রথম টাকাটা আমি ডাক্তারদের কমিটিকে দিবার জন্য চাহিলাম। গভর্নমেণ্ট একথা মঞ্জুর করিলেন। টাকাটা তাঁহাদের দেওয়া হইল। পরে অনুগ্রহবাবু যখন সাহায্য সমিতি গঠন করেন তখন তাঁহাকে টাকা দেওয়ার অনুমতি গভর্নমেণ্ট দিলেন। শেষে তো ট্রাস্টের যে প্রাপ্য চরখা সংঘের জিম্মায় ছিল তাহা গভর্নমেণ্ট সাহায্য কর্মের জন্য চরখা সংঘের বাজেয়াপ্ত টাকা হইতে সমস্ত টাকা দিয়া দেন। কিন্তু সমস্ত টাকাটা খরচ হয় নাই। টাকাটার বেশির ভাগ এখনও জমা আছে। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম যে এবার বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়ের মত গভর্নমেণ্ট জেলের ভিতর হইতে কিছু সাহায্য পাঠাইবার ইচ্ছা ব্যর্থ হইতে দেন নাই।

এই অবস্থায় 'ইণ্ডিয়ন নেশন' লিখিতে আরম্ভ করিল যে সাহায্য ব্যাপার শৃঙ্খলার সহিত চালাইবার জন্য আমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। উহা আমার মুক্তিদানের উপর খুব জোর দিল। এখানে ওখানে

সাধারণের মধ্য হইতেও ঐরূপ দাবি শোনা যাইতে লাগিল। কথাটা আমার ভাল লাগিল না। আমাকে রাজনৈতিক কারণে জেলে আনা হইয়াছিল। যতক্ষণ না তাহার কোনও মীমাংসা হয় এবং আমাদের সমস্ত সংগীর ছাড়া পাইবার পথ পরিষ্কার হয়, ততক্ষণ আমি এইভাবে ম্যালেরিয়া পীড়িত লোকদের সাহায্যের অজুহাতে ছুটি পাইতে চাই নাই। আমি ইহাও চাহিয়াছিলাম যে যাঁহারা বাহিরে আছেন—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাবু, অনুগ্রহ-বাবু, মথুরাবাবু প্রভৃতি আছেন—তাঁহারা সমস্ত দিক সামলাইতে পারিবেন, আমার বিশেষ কোনও প্রয়োজনও নাই। আমার এমনও লাগিয়াছিল যে গভর্নমেণ্ট আবার না মনে করেন, এই আন্দোলন খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইবার এক অজুহাত মাত্র, আর আমার অনুমতি লইয়া অন্ততঃ আমার বন্ধুদের অনুমতি লইয়া করা হইতেছে। আমি গভর্নমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়া দিলাম যে এই আন্দোলন আমার দৃষ্টিতে অনাবশ্যক, আর আমি এইভাবে ছাড়া পাইতেও চাই না। কিন্তু আমি যখন ছাড়া পাইলাম, তখন বুঝিলাম যে সে সময় গভর্নর আমাকে ছাড়িয়া দিবার কথা ভাবিতে-ছিলেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, যাহার আদেশেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা নজরবন্দী হইয়া ছিল, হয়তো এখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ছাড়িতে রাজি ছিলেন না। ইহাও বুঝিলাম যে গভর্নর কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন, আমি নিজে যখন ছাড়িয়া দেওয়া হউক ইহা চাহি না, তখন ছাড়িয়া দেওয়ার কথাই বা ওঠে কি করিয়া? যাহা হউক, ঐ সময়, অর্থাৎ ১৯৪৪-এর বর্ষায়, ছাড়া পাওয়ার যে কথাটা উঠিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইল না। আমি নিশ্চিন্তভাবে কাজ করিয়া যাইতে থাকিলাম। এইভাবে সময় কাটাইতে কিছু দেরি হইল না। ১৯৪৫-এর ১৫ জুন তারিখে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এবার গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়াছিলাম যে কারাবাস দীর্ঘ হইবে। তাহার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। যেমন যেমন আন্দোলন বাড়িতে থাকিল এবং লোকের কারাদণ্ড দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল, তেমন তেমন এ ধারণা আরও পুষ্ট হইল। প্রতিবার জেল যাওয়ার মধ্যে কিছু লোক জেলে মারাও পড়ে। এবারও এমন লোকের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। রাঁচী জেলার টানা ভগতদের মধ্যে অনেকে জেলে মারা গেল জানিয়া আমাদের বিশেষ দুঃখ হইয়াছিল। এ ছাড়া অন্য লোকও যথেষ্ট মরিয়াছিল। কিন্তু জেলের ভিতরে মৃত্যুপথযাত্রীদের অপেক্ষা বাহিরে গুলির দ্বারা নিহত লোকদের সংখ্যা কোথাও কোথাও একটু বেশি ছিল। যাহারা এভাবে দেশহিতের জন্য আত্মবলি দিতে পারে, তাহাদের অতি অল্প লোকই আমার জানা ছিল। তাহার বিশেষ কারণ ছিল এই যে প্রধান প্রধান কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে রাখিয়া

দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা বাহিরে থাকিয়া গিয়াছিল তাহারা খুব খ্যাতি-সম্পন্ন কেহ ছিল না। এছাড়া এবারকার ঢেউয়ে অনেক নূতন লোক আসিয়া পড়িয়াছিল যাহারা প্রথমে কোথাও কংগ্রেসের কাজ তো করেই নাই, কিন্তু ইহা স্বরাজের জন্য গান্ধীজীর শেষ সংগ্রাম মনে করিয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। ইহা তো আমি নিজের প্রদেশের কথা বলিলাম। প্রদেশের বাহিরেও এমন অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল যাহাদের স্থান কখনও পূর্ণ করা যাইবে না। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে গ্রেপ্তারের পর কয়েক দিনের মধ্যে মারা গেলেন শ্রীমহাদেব দেশাই। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়া পুণায় আগা খাঁ মহলে তাঁহার সঙ্গেই বন্দী ছিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। পূজ্য মহাত্মাজী ইহাতে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন, কারণ তিনি ছিলেন গান্ধীজীর ডান হাত। যখন হইতে তিনি মহাত্মাজীর সেবা আরম্ভ করিলেন তখন হইতে তিনি নিজের জীবন গান্ধীজীর শিক্ষা ও মতের অনুযায়ী গঠন করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তাহাতে অনেকটা সফলও হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লিখিবার রীতিও ছিল অদ্ভুত। তাহাও তিনি গান্ধীজীর লেখার রীতির সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছিলেন। পরিশ্রম এত বেশি করিতে পারিতেন যে হয়তো দুই-তিন জন মিলিয়াও তাঁহার মতো কাজ করিতে পারিত না। কাজও ছিল সকল রকমের। কাপড় ও কমোড পরিষ্কার করা, তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ কথা লইয়া দূতের কাজ করা, সুন্দর হইতে সুন্দর প্রবন্ধ লেখার কাজও, তাঁহার নিকট ছিল সবই সমান। সমস্ত কিছু সমান সহজভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত খুশী মনে তিনি করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি এত সরল এবং তিনি এত সহৃদয় ছিলেন যে কখনও তাঁহার সঙ্গে কাহারও কলহ হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সর্বপ্রথমে চম্পারনে হইয়াছিল, তখন মহাত্মাজী তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী দুর্গা বহিনকে একত্র সেখানকার নিজের প্রতিষ্ঠিত এক পাঠশালায় কাজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন যে প্রেম ও সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বরাবরই ছিল। তাঁহার এই প্রকার আকস্মিক মৃত্যুতে আমার মনে খুবই আঘাত পাইয়াছিলাম।

দ্বিতীয় মৃত্যু ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, কস্তুরবার। তিনিও আগা খাঁ মহলে মহাত্মাজীর সঙ্গেই ছিলেন। অনেক দিন ধরিয়া অসুস্থ ছিলেন। শেষকালে চলিয়া গেলেন। গান্ধীজীর সহধর্মিণী হইবার সৌভাগ্য তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। গান্ধীজীর কোলেই তাঁহার মহাপ্রস্থান হইল। এরূপ সৌভাগ্যবতী অন্যে কে হইতে পারে? তাঁহাকে সকলে 'বা' বলিয়া ডাকিত। তিনি সত্যই সকলের 'বা' বা মা ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথমে ১৯১৭ সালে চম্পারনে আসেন। তখনই

তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। তিনি সেখানে যাওয়ার পূর্বে আমাদের আহার প্রস্তুত করার জন্য একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখা হইয়াছিল। তিনি যাইতেই গান্ধীজীর আদেশ হইল এখন আর ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই, তিনি সকলের জন্য রাঁধিবেন। আমরা সংখ্যায় ভারি ছিলাম। হয়ত ১৪/১৫ জন হইব। আমাদের সকলের জন্য রাঁধিবার ভার তাঁহার উপর দেওয়া অনুচিত মনে হইল। এমনও মনে হইল যে এরূপ দুর্বল ও ক্ষীণদেহ বলিয়া দেখিতেছি, ইনি একাজ করিতেও পারিবেন না। কিন্তু গান্ধীজী কবে আমাদের ওজর আপত্তি শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, চিন্তা করিও না, ও সব করিতে পারে, উহার এরূপ কাজের অভ্যাস আছে। অন্যেরা তাঁহার কিছু সাহায্য করিয়া দিত—বিশেষ করিয়া ভারি কড়াই বাসন-পত্র নামানো প্রভৃতি কাজে। কিন্তু তিনি সকলের জন্য অতিশয় প্রেমের সহিত রান্না করিতেন। সে সময়ে যে প্রেমের সঙ্গে তিনি প্রথম প্রথম আমাদের খাওয়াইতেন, যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ও যখন যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, সেইরূপ প্রেমের সঙ্গেই খাওয়াইয়াছেন। সাবরমতীর সত্যাগ্রহাশ্রমেই হউক, আর মগনবাড়ী বা সেবাগ্রামের আশ্রমেই হউক, অথবা কোনও ভ্রমণ বেলায় কেন না হউক, বাপুর নিকটে গেলে, বিশেষ করিয়া যদি একত্র থাকিবার সুযোগ মিলিত তবে, তাঁহার নিকটে সর্বদা মাতৃস্নেহ পাইতাম। তাঁহার শেষ দিনের দুঃখের কাহিনী গান্ধীজীর সেই সব পত্রে পড়া যাইতে পারে যাহা তিনি গভর্নমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্র শ্রীবনমালা পারিখ ও ডক্টর সুশীলা নায়ার দ্বারা লিখিত 'হমারী বা' (আমাদের বা) নামক পুস্তিকায় ছাপা হইয়াছিল। তিনি ছিলেন হিন্দু রমণীর আদর্শ মূর্তি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক, প্রেমের পুত্তলী। তিনি সত্যই 'বা' ছিলেন এবং 'বা' থাকিয়াই গেলেন। একবার গান্ধীজী আমাকে বলিয়াছিলেন—'বা' কে 'বা' বলিয়া ডাকিতে আমারও খুব আনন্দ হয়। স্বামীস্ত্রীর প্রচলিত সম্বন্ধ উভয়ে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি সত্যই তাঁহারও 'বা' হইয়া গিয়াছিলেন।

আমরা জেলে থাকিতেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পত্নী-বিয়োগের সংবাদ শুনিয়াছিলাম। ইহা জানিয়া আরও দুঃখ হইয়াছিল যে অন্তিম সময়ে মৌলানার সহিত তাঁহার দেখা হইবার ব্যবস্থা করা গেল না। তিনি পর্দা রক্ষা করিয়া চলিতেন বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু মৌলানার ব্যথা আমরা অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। শ্রীরণজিৎ পণ্ডিতের (আর্. এস্. পণ্ডিত) সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহার মৃত্যুও এক অতি দুঃখের ব্যাপার হইল। জেলের মধ্যে সরকারি নীতি বুঝিতে পারা কঠিন হইত। নিয়ম ছিল যে শুধু নিকট আত্মীয়দের সঙ্গেই পত্র-বিনিময় হইতে পারিবে। আমার নিকট কখনও কখনও এমন সব

লোকের পত্র চলিয়া আসিত যাহাদের সহিত কোনও প্রকার পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু মৌলানার নিকট ও ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মীর নিকট আমার সহানুভূতির তার পৌঁছাইতে পারা গেল না।

আমাদের প্রদেশের বন্ধুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা করুণ বিয়োগ ছিল শ্রীরামদয়াল সিংহের। পঠদ্দশায় তাঁহার সঙ্গে যে পরিচয় হইয়াছিল তাহা পরে ঘনিষ্ঠ প্রেমের রূপে পরিণত হয়। অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ চলিতেছিল। এইজন্য আন্দোলনে যোগ দিতে তাঁহার যোগ্যতা ছিল না। গভর্নমেণ্টও তাহা বুঝিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই। আমার মুক্তির কয়েক মাস পূর্বেই তাঁহারও মৃত্যু হয়। যে বন্ধুত্ব প্রায় ৩৫/৩৬ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল তাহার ঐহিক যোগ বিচ্ছিন্ন হইল! তিনি আমাদের প্রদেশের এক বিভূতিস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার স্থানও পূর্ণ হইবার নয়। কংগ্রেসের বাহিরে, কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল, এমন দুইজনের সঙ্গে আমার আর দেখা হইল না। একজন ছিলেন বৈদ্যরাজ ব্রজবিহারী চৌবে, তিনি আয়ুর্বেদে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, আমার প্রতি তাঁহার বরাবর কৃপা ছিল। আমি বলিয়াছি যে আমার গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি সদাকত আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি ইহা কখনও ভুলিতে পারি না যে আমার গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি কতখানি দুঃখিত ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি ভেষজাদি সঙ্গে দিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজের সরলতার জন্য একথাও বলিয়াছিলেন যে যদি আমি খারাপ না মনে করি তবে তিনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করিবেন ও আমার কথা বলিবেন। তিনি জানিতেন না যে গ্রেপ্তারের হুকুম গভর্নরই দিয়াছিলেন, আর গভর্নরেরও তাহা স্থগিত রাখিবার অধিকার ছিল না। অন্য জন ছিলেন স্যার গণেশ দত্ত সিংহ। কলিকাতায় যখন পড়িতাম তখন তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি সেখানে ওকালতি করিতেন। তখন হইতে তিনি আমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন তাহার আর শেষ পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন হয় নাই। পরে রাজনৈতিক কথা লইয়া তাঁহার সহিত যথেষ্ট মতভেদ হয় আর আমি তাঁহার কার্যকলাপের উপর কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই ভালবাসায় কোনও প্রভেদ হয় নাই। শেষ অবস্থায় তিনি খুবই অসুস্থ হইয়াছিলেন। আমি যতদিন বাহিরে ছিলাম ততদিন পাটনায় থাকিবার সুযোগ হইলে সর্বদা তাঁহার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিতাম। তিনি অনেক দিন পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় ছিলেন। তখন তাঁহার কার্যকলাপের উপর ঠিক ঠিক মন্তব্য করিবার অনেকে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। কিন্তু আমি ইহা দেখিয়াছিলাম যে তিনি মন্ত্রিসভায় থাকিতেই হউক আর তাঁহার শেষকালে যখন তিনি সমস্ত কাজকর্ম হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন তখনই হউক, এই

চিন্তা তিনি সর্বদাই করিতেন যে আমাদের মত যাঁহারা সাধারণের সেবার কাজে নিযুক্ত আছে তাহাদের স্বাস্থ্য যেন ঠিক থাকে। এইজন্য আমাদের জেলে যাওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। যদি কখনও তিনি জেলের কাহারও অসুখের সংবাদ পাইতেন তাহা হইলে তিনি আরও চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময় তিনি তাঁহার মাসিক বৃত্তির এক বৃহৎ অংশ সাধারণের কাজে ব্যয় করিবেন বলিয়া তিনি প্রথমেই স্থির করিয়া লন। এইভাবে কয়েক লক্ষ টাকার তিনি ট্রাস্ট নির্মাণ করেন। আমাদের নিকটে ইহা ছিল এক আদর্শ, যাহা আর কেহ অনুসরণ করিল না। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের মাসিক বৃত্তি তো পাঁচ শত টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বাঁচাইবার সুযোগ খুব কম ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও আমি জানি এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা পাই পয়সার হিসাব রাখিয়াছেন এবং তাহা হইতে বাঁচাইয়া সাধারণের কাজে দিয়াছেন। তৃতীয় সংগী, যাঁহার সহিত আর দেখা হইবার ছিল না, শ্রীনিরসুনারায়ণ সিংহ। ইঁহার সংগেও পঠদ্দশায় পরিচয়। জনসাধারণের ব্যাপারে অনেক মতভেদ থাকিলেও ভালবাসা বরাবর ছিল। নিজের বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাইঝি গিরিজাও আমার জেলে থাকিতে থাকিতেই চলিয়া গেল। তাহারও শরীর অনেক দিন হইতে খারাপই ছিল। আমার জ্ঞান হইবার পর বাড়িতে সর্বপ্রথমে উহারই জন্ম হয়। ছেলেবেলায় আমি সর্বপ্রথম উহাকে খেলনা দিয়াছিলাম। সে আমাকে খুবই ভালবাসিত। জেলে আসিয়া দেখা করিয়া গিয়াছিল। কে জানিত যে উহাই শেষ সাক্ষাৎ। সে খুব ভাগ্যবতী ছিল। পতিপুত্র সামনে রাখিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গৃহিণী থাকিয়া সে যেভাবে সকলকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিল সেকথা সকলে মনে রাখিবে।

অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে

জেলে সময় কাটানো অনেকের পক্ষে বড় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য যদি কিছু খেলাধূলা, চিত্তবিনোদনের উপাদান পাওয়া যায় তো অনেকে তাহা পছন্দ করে। হাজারিবাগ জেলে আমার সংগীরা এক বিড়ালের ছানা পুষিয়াছিল। সে লোকের সংগে এতই মিশিয়া গিয়াছিল যে বিনা সংকোচে চারপাইয়ের উপর গিয়া শুইয়া থাকিত। খাওয়ার সময়ে কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া কোলে বসিয়া যাইত, এবং যাহা কিছু দেওয়া হইত তাহাই খাইত। লেখা বা পড়ার সময়ে হাত হইতে কলম

পেন্সিল কাড়িয়া লইতেও তাহার বাধিত না। তাহার জন্ম হইতেই সে কখনও জেলের বাহিরে যায় নাই। সর্বদা বয়স্ক ও যুবক শ্রেণীর সঙ্গেই থাকিত। সে মানবশিশু কখনও দেখেই নাই। হাজারিবাগ জেলে আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার ছেলেপেলে তাহাকে দেখিতে আসে। ছোট শিশুদের দেখিয়াই সে এত ভয় পাইয়া গেল যে তখন সে যাহার কোলে বসিয়া ছিল সে কোল হইতে লাফাইয়া পলাইল, অনেক দূর গিয়া লুকাইয়া থাকিল। শিশুরা চলিয়া যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল না!

এবার বাঁকিপুর জেলে কয়েকজন সাধারণ কয়েদী ময়না পাখির ছানা পালিয়াছিল। সে লোকের হাতে, কাঁধে, মাথায় নির্ভয়ে বসিয়া পড়িত। কয়েদী কাজ করিত, সে বসিয়া থাকিত। আমাদের সঙ্গেও তাহার পরিচয় হইয়া গেল। সে আমার ঘরেও আসিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সে বেশির ভাগ সেখানেই থাকিয়া গেল। চরকা চালাইবার সময়ে সামনে বসিয়া থাকিত আর সুতা যেমনি বাহির হইত অমনি ঠোঁট দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। রাত্রে মশারির উপর উড়িয়া আসিয়া বসিত, আর সেখানেই সারা রাত কাটাইত। সকালে উড়িয়া বাহিরে যাইত আর ঘুরিয়া বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিত। একদিন কোথায় উড়িয়া গেল, আর ফিরিল না। জানি না কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল, না কোনও পাখি বা অন্য কোনও জানোয়ার মারিয়া ফেলিল। অন্য ময়নাও লোকে পালিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আমরা উৎসাহ দিলাম না। এইভাবে লিখিতে পড়িতে, চরকা কাটিতে কাটিতে, অসুখে পড়িয়া, লোকদের ও আন্দোলনের সমাচার শুনিতে ও শোনাইতে, ও পুরাণ কথা শুনিতে শুনিতে—বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, চৈতন্যচরিত ইত্যাদি গ্রন্থ তাহার মধ্যে প্রধান—সময় কোথায় দিয়া কাটিয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না। প্রায় তিন বৎসর পরে ১৫ই জুন ছুটি পাইলাম।

আমাদের কারা-মুক্তির কয়েক দিন পূর্ব হইতেই, এখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এই কথা লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছিল। আহমদনগর কেল্লায় যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন কোন লোককে অন্যান্য জায়গায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মনে হইতেছিল যে এ সমস্ত ছাড়িয়া দিবার আয়োজন। একথা ঘোষণা করা হইয়াছিল যে ১৪ই জুন সন্ধ্যায় লর্ড ওয়াভেল তাঁহার কোনও নূতন পরিকল্পনা দেশের সামনে উপস্থিত করিবেন—এই পরিকল্পনা রেডিও মাধ্যমে সেই দিন রাত্রেই সমস্ত দেশকে জানানো হইবে। হইলও তাহাই। পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তিনি রেডিওর মাধ্যমে বলিয়াছিলেন যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ১৫ই

জুনের সকাল বেলায় সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। রেডিওর কথা শুনিয়া কেহ কেহ তো সে রাত্রে আমাদের ছাড়িয়া দেওয়ার আশায় জেলের দরজায় আসিল। কর্তৃপক্ষের একথা বলা সত্ত্বেও সে রাত্রে ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ আসে নাই, তাহারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে বসিয়া থাকিল। ১৫ই জুন এক প্রকাণ্ড জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। জেলে এতদিন থাকিবার পর সেখান হইতে বাহির হইবার সময় মনে কত ভাবনা চিন্তা উপস্থিত হইল। যেদিন জেলে গিয়াছিলাম সেই দিন হইতে সাধারণ কয়েদীদের আমাদের সঙ্গে, না জানি কেন, ভালবাসার সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল—আমাদের উপর তাহাদের খুব বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আমাদের জেলের কর্তৃপক্ষের চেয়েও বড় মনে করিত। কোনও কষ্ট হইলে হাজার পাহারা সত্ত্বেও কোনও না কোনও প্রকারে আমার কাছে আসিয়া পোঁছিত। আমাদের কোনও অধিকার নাই, একথা হাজার বলিলেও তাহারা মানিতে প্রস্তুত ছিল না। আমি একথাও বলিব যে যতদিন পর্যন্ত আমরা সেই জেলে ছিলাম, ততদিন তাহাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের আচরণও ভালই ছিল। এমনিতে তো জেলে কয়েদীদের সহিত ব্যবহার কঠোরতার—প্রেমের নয়; ভালবাসার নয় দণ্ড দেওয়ার সম্বন্ধ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা পুরাতন তাহারা বলিয়াই ফেলিত যে কর্তৃপক্ষের প্রকৃতির অনেকটা বদল হইয়াছিল। দৈবক্রমে ঐ জেলের কর্তৃপক্ষের মধ্যেও অধিকাংশ সৎপ্রকৃতির ছিলেন। যাহারা সমস্ত প্রদেশে নিজেদের বাহাদুরির জন্য বদনাম কিনিয়াছিল তাঁহারা তাহাদের মধ্যে ছিলেন না। এইরূপে, যদিও সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ থাকার প্রয়োজন ছিল না তাহা হইলেও এক অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গেল। আমাদের মুক্তির খবর পাইয়া না জানি তাহাদের মনে আনন্দ হইল না কষ্ট হইল। আমি এইটুকু বলিতে পারি যে অনেকের আশা অবশ্যই হইয়াছিল যে তাহারাও কয়েকদিন মধ্যেই মুক্তি পাইবে। আমরা এই ধরনের আশা তাহাদিগকে কোনও প্রকারেই দেওয়াই নাই। কিন্তু আমি বলিতে পারি যে তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের মুক্তির পর নিরাশ হইয়া থাকিবে।

জেল হইতে বাহির হইয়াই আমাকে বোম্বাই যাইতে হয়; কারণ সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইল, যাহাতে ওয়াভেল-পরিকল্পনা ছিল বিচার্য বিষয়। বোম্বাইতে কথা হইল অতি সামান্যই, সিমলা হইতে মহাত্মাজী ও সভাপতি মৌলানা আজাদের ডাক আসিল। তাঁহাদের সেখানে যাইতে হইল। আমি পাটনায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সেখানে দুই চার দিন থাকিতে পারিলাম না; কারণ সিমলা হইতে আমার ডাক আসিল—সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে। সিমলায় প্রায় দুই সপ্তাহ থাকিতে হইল। লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমাদের দিক হইতে কখনও

মৌলানা, কখনও পণ্ডিত জওহরলাল আর কখনও মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা হইত। মুসলিম লীগের দিক হইতে মিঃ জিন্না ও তাঁহার সঙ্গী, ভাইসরয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতেন। কিন্তু প্রধান কাজ তো ছিল সেখানে এক কনফারেন্সের, যেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভাপতিদের ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীদের ডাকা হইয়াছিল। যেখানে মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া গিয়াছিল—যেমন সেই সকল প্রদেশে যেখানে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল—সেখানকার ভাঙিয়া যাওয়ার সময় যাঁহারা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাঁহাদের ডাকা হইয়াছিল।

পরিকল্পনা লইয়া অন্যান্য কথা আলোচনা করা হইল। বোঝা গেল যে ভাইসরয়ের কার্যকরী সমিতিকে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় সরকারের রূপ দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের দিক হইতে আমরা পরিকল্পনাটি একরকম মানিয়া লইলাম। কংগ্রেসের দিক হইতে নাম দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল। কনফারেন্সে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসদলভুক্ত। বাকি ৪টির মধ্যে তিনটির দিক হইতে লীগদল-ভুক্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আসামের। আসাম কংগ্রেসের দল সরিয়া যাওয়ার পর মন্ত্রিসভায় হেরফের হইল। সেখানে তখন যদিও লীগের মন্ত্রিসভা ছিল না, তথাপি প্রধানমন্ত্রী স্যার সাদুল্লা ছিলেন লীগের দলভুক্ত। চতুর্থ প্রদেশ পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার খিজির হায়াৎ খাঁ লীগের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পৃথক হইয়া যান। পরিকল্পনার একটা শর্ত ছিল এই যে, ভাইসরয়ের কাউনসিলে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকিবে—এ ছাড়া অন্য লোকও কিছু থাকিবে, তাহাদের মধ্যে হরিজনদের প্রতিনিধিও থাকিবে। একদিক হইতে পরিকল্পনা হরিজনদের প্রতিনিধি হিন্দু প্রতিনিধি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিল, এবং হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিদের যে সমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা অ-হরিজন অর্থাৎ সবর্ণ হিন্দুদের সম্বন্ধেই ছিল।

এ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতেছিল। দেশের অবস্থা কিছু ভাল ছিল না। আমরা ভাবিলাম, এই পরিকল্পনা স্বীকার করিয়া হয়তো আমরা ঐ অবস্থার কিছুটা উন্নতি করিতে পারিব। আমরা এই কথা বলিলাম যে কাউন্সিল, ভাইসরয় ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া, ১৫ জন লোক লইয়া গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে ৫ জন সবর্ণ হিন্দু, ৫ জন মুসলমান, ২ জন হরিজন আর ৩ জন শিখ, খ্রীষ্টান, পারসী ইত্যাদি জাতির প্রতিনিধি হইবে। আমরা ১৫ জনের নামও দিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অন্য নাম ছাড়া ৫ জন মুসলমানের নামও দিয়াছিলাম। ইহাদের মধ্যে তিনজন মুসলিম লীগের লোক ছাড়া একজন কংগ্রেসী মুসলমান ও লীগের বাহিরে অন্য একজন মুসলমানের নাম ছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে লীগ যদি তাহার দিক

হইতে অন্য নাম দিতে চায় তবে তাহা দিতে পারে, তাহাতে আমাদের আপত্তি হইবে না। মিঃ জিন্না এই দাবি পেশ করিলেন যে মুসলমানদের সকল প্রতিনিধিদের নাম দিবার অধিকার লীগেরই থাকিবে, অন্য কোনও মুসলমানের সে অধিকার থাকা তিনি পছন্দ করিবেন না! লর্ড ওয়াভেলকে এই বাধার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইল। তিনি কংগ্রেসী মুসলমানদের অবশ্য ছাড়িতে পারিতেন, কিন্তু স্যর খিজির হায়াৎ খাঁ সাহেবের দলকে নয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্যর খিজির হায়াৎ ও তাঁহার পূর্বে ঐ দলের নেতা স্যর সেকন্দর হায়াৎ খাঁ যুদ্ধে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের বাদ দিলে পাঞ্জাবের মুসলমানদের গভর্নমেণ্টের বিরোধী করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা তো ইহা বুঝিতে পারি নাই যে ভাইসরয় কাহাদের রাখিতে চান, কিন্তু আমরা বুঝিয়াছিলাম যে কংগ্রেস ও লীগের দিক হইতে তাহাদেরই লওয়া হইবে যাহাদের নাম ঐ দুই প্রতিষ্ঠান হইতে দেওয়া হইবে, অন্যগুলিতে কিছু পরিবর্তন হয় যদি তো হউক। এরূপ অনুমান করা হইতেছিল যে তিনি মুসলমানদের চারটি নাম লীগের আর একটি পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট পার্টি হইতে লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না তাহাতে রাজি হইলেন না। কনফারেন্স ভাঙিয়া গেল।

কনফারেন্স ভাঙিয়া গেলে মিঃ জিন্না এক বিবৃতি দিলেন, তাহাতে তিনি লীগের দাবি ব্যাখ্যা করিলেন। সেই সব কারণও বলিলেন যে জন্য লীগকে পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিতে হইল। প্রধান কারণ ইহাই ছিল যে একমাত্র লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, আর তাহারই মুসলমান মেম্বরদের নামের তালিকা দেওয়ার পুরা অধিকার থাকা চাই—যেহেতু লর্ড ওয়াভেল এই কথা স্বীকার করেন না তাই পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি এই বলিয়াছিলেন যে ঐ প্রস্তাবানুযায়ী ১৫ জন বেসরকারি লোকের মধ্যে কাউন্সিলে শুধু পাঁচ-জনই মুসলমান হইবে, তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হিন্দু থাকিবে, আর অন্যান্য অল্প সংখ্যক জাতিদের যে প্রতিনিধি হইবে তাহারা সর্বদা হিন্দুদের পক্ষেই থাকিবে, কারণ অন্যান্য জাতির চিন্তা ও মনোভাব কংগ্রেসেরই অনুযায়ী—এইভাবে কাউন্সিলে মুসলমান কেবল এক-তৃতীয়াংশভাবে অল্প সংখ্যক থাকিবে, একথা লীগ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল দুইটি। এক তো এই যে আজ পর্যন্ত সকল সংখ্যালঘু জাতির রক্ষার ভার মিঃ জিন্না সর্বদা নিজের উপর রাখিতেন—বলিতেন যে কংগ্রেস শুধু সবর্ণ হিন্দুদের প্রতিনিধি, বাকি সকলের রক্ষা লীগই করিতে পারে এবং করেও। একথা বলিবার কোনও কারণ ছিল না; কারণ বার বার সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠানে লীগ এবং ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট কথায় বিরোধ করিয়াছিল

এবং কংগ্রেসের প্রতি নিজেদের সহানুভূতির কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই ধরনের কথা বলিয়া চলিতেছিলেন। এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে তিনি হরিজনদেরও গণনা করিতেন, আর নিজেকে তাহাদের সমর্থক বলিয়া পরিচয় দিতেন। এখন, যখন কাউন্সিলে সবর্ণ হিন্দুদের সংখ্যা শুধু এক-তৃতীয়াংশ, মুসলমানদেরও এক-তৃতীয়াংশ, আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে দুইজন হরিজন ও অন্য অল্পসংখ্যক জাতি, প্রতিনিধি রাখিবার কথা হইল তখন সব চক্রান্ত ফাঁসিয়া গেল! তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে অন্য সকলে কংগ্রেসের সঙ্গে আছে ও থাকিবে, তিনি কেবল মুসলমানদের উপরই ভরসা রাখিতে পারেন, আর মুসলমানদের মধ্যেও কেবল সেই সব মুসলমানের উপর যাহাদের নাম লীগ অর্থাৎ তিনি নিজে পাঠাইয়াছেন। দ্বিতীয় কথাও স্পষ্ট হইয়া গেল এই যে, তিনি একথায় রাজী নন যে কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংখ্যাগত সমতা থাকে। তিনি চাহিতেছিলেন যে একদিকে শুধু মুসলমান আর অন্য দিকে শুধু বহুসংখ্যক সবর্ণ হিন্দু—হরিজন ও অন্যান্য সব সংখ্যা-লঘু জাতি—থাক, আর ঐ সকল জাতির সঙ্গে মুসলমানের সংখ্যার সমতা যেন থাকে! ইহার সঙ্গে একথাও স্পষ্ট ছিল যে মুসলমান অর্থে সব মুসলমান নয়, শুধু সেই মুসলমান যে লীগে যোগ দিয়াছে!

লীগের মুসলমানদের তখন এমনই অবস্থা যে তাহাদের সংখ্যা যেখানে বেশি সেই দুই প্রদেশে—পাঞ্জাব ও বাংলায়, লীগের মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবে লীগ হইতে পৃথক হইয়া, মিঃ জিন্নার সহিত ঝগড়া করিয়া, স্যর খিজির হায়াৎ পৃথক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন—তাহাও তখন, যখন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্যর সিকন্দর হায়াৎ খাঁর পুত্র সর্দার শৌকত হায়াৎ খাঁ লীগে যোগ দিয়াছিলেন আর স্যর খিজিরের প্রাণপণে বিরোধিতা করিতেছিলেন। বাংলার মন্ত্রিসভা পরাজিত হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল। যদি তখন বিপক্ষ দলকে সুযোগ দেওয়া হইত, যেমন ন্যায় ও বিধানসম্মত নিয়মমত দেওয়া আবশ্যক ছিল, তবে সেখানে লীগবিরোধী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া যাইত। কিন্তু গভর্নর তখনকার নীতি অনুসারে লীগকে অখুশী করিতে চান নাই—লীগের মন্ত্রিসভা অচল হইলে, বার বার বলা সত্ত্বেও, অন্য কোনও মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সুযোগ কাহাকেও না দিয়া, ৯৩ দফা অনুসারে নিজের হাতে অধিকার গ্রহণ করিলেন। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সরিয়া গেলে কয়েক দিন পরেই লীগের মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, কিন্তু তাহার নিজের কার্যকলাপে এত অখ্যাতি রটিয়া গেল যে আমাদের কারামুক্তির কয়েক দিন পূর্বেই কংগ্রেসের সভ্যেরা বিধানসভায় যোগ দিয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিল, তাহা হইতে সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা স্থায়ী হইয়া গেল। এক সিন্ধু প্রদেশেই

লীগের মন্ত্রিসভা কাজ করিয়া যাইতেছিল। যদিও সেখানেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নেতা আল্লাবক্সকে প্রধানমন্ত্রী পদ হইতে হটানো ব্যাপারে গভর্নরের কোনও হাতই ছিল না। কারণ সেজন্য গভর্নরকে অনেক পরিমাণে বিধান-বিরোধী কাজও করিতে হইয়াছিল, এবং পরে আল্লাবক্সকে হত্যাও করা হইয়াছিল!

এই তো গেল মুসলমান যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সব প্রদেশের অবস্থা। তাঁহারা পাকিস্তানের সঙ্গে আসামকেও জুড়িয়া দিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ⅓ অপেক্ষা বেশি নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দূর হইলে কয়েক দিন পরে সেখানেও লীগের সরদার স্যর সাদুল্লা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে-মন্ত্রিসভার এমন বদনাম হইয়াছিল যে সে তাহার অন্তিম শ্বাস গুণিতেছিল। এ অবস্থায় এমন দাবি করা যে লীগই শুধু মুসলমানদের প্রতিনিধি সংস্থা আর তাহারই মনোনীত লোক কাউন্সিলে লওয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের সংখ্যাও এমন হওয়া চাই যে তাহারা একাই সবর্ণ হিন্দু ও হরিজন এবং অন্য সমস্ত লঘু জাতির প্রতিনিধিদের নিজেদের সংখ্যায় শক্তিমান হইয়া বিরোধিতা করিতে পারে ইহা শুধু মুসলীম লীগ ও মিঃ জিন্নার পক্ষেই সম্ভব ছিল! এই দাবির উপর সিমলা কনফারেন্সকে ব্যর্থ ঘোষণা করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব ছিল! মনে রাখিতে হইবে যে তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল এবং ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন মিঃ চার্চিল ও ভারতমন্ত্রীর পদে মিঃ এমেরি!

সিমলা কনফারেন্সের বিষয়ে আরও দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তাহার দিক হইতে কাউন্সিলের জন্য নামও দিয়া দিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীভূলাভাই দেশাইয়ের নাম ছিল না। তিনি তখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিধানসভায় কংগ্রেসী দলের নেতা ছিলেন। তিনি সেই পদে কাজও খুব ভাল করিয়াছিলেন। বারদোলী সত্যাগ্রহের সময় হইতে যখন তিনি খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসে আসিলেন তখন হইতে যখন যখন সুযোগ হইয়াছিল তখন তিনি জেলে যাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। টাকা পয়সা দিয়াও বরাবর সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা ও ত্যাগের জন্য তিনি বরাবর ওয়ার্কিং কমিটিরও সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের দিক হইতে তাঁহাকে না নেওয়া, তাঁহার পক্ষে বড়ই দুঃখের কারণ হইল। যদিও নাম প্রকাশিত করা হয় নাই তথাপি তাঁহার নাম যে দেওয়া হয় নাই সে কথা অনেকেই জানিতে পারিয়াছিল। অন্যদেরও, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সভার সভ্যদের, এই ব্যাপারে বড়ই বিরক্তি হইয়াছিল। তাঁহার নাম না দেওয়ার কারণ এখানে লেখার প্রয়োজন নাই, উচিতও নয়। আমি এই ব্যাপারে

সন্তুষ্ট ছিলাম না, দুঃখিত ছিলাম। কিন্তু অন্য কোনও পথ দেখিতে পাই নাই। শ্রীভুলাভাইয়ের আমার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা ছিল। আমার উপর তাঁহার বিশ্বাসও ছিল, সে কথা তিনি বন্ধুদের নিকটও বলিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার সহিত আমার বোম্বাইয়ে দেখা হয়, তখন তিনি যে রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাতে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার দুঃখ তিনি অত্যন্ত করুণভাবে আমাকে জানাইলেন। এখানে বলিয়া দেওয়া ঠিক হইবে যে ইহার অল্প দিন পরেই, যখন আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ ও তাঁহার সংগীদের বিরুদ্ধে দিল্লীতে লালকেল্লায় রাজদ্রোহের মকদ্দমা চালানো হয়, আর ভুলাভাইকে তাঁহাদের পক্ষে মকদ্দমায় দাঁড়াইতে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি খুশি হইয়া এই কঠিন কাজ নিজের হাতে লইলেন—যদিও তাঁহার স্বাস্থ্য তখন এমন কিছু ভাল ছিল না। এই মকদ্দমায় কঠোর পরিশ্রম এক দিক দিয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল; কারণ সে মকদ্দমার কাজ কোনও প্রকারে শেষ করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না। মকদ্দমায় তাঁহার প্রখর যোগ্যতা ও অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁহার তর্কযুক্তি বড় বড় মকদ্দমার বড় বড় উকিলের যুক্তিতর্কের সমপর্যায়ে গণ্য হইবে। বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভুলাভাইয়ের একটা বিষয়ে সন্তোষ হইয়াছিল—তাঁহার সমস্ত মক্কেল খালাস পাইল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের এক বিভূতি চলিয়া গেল। তাঁহার স্থান লইবার মত অন্য কাহাকে এখন আর দেখিতে পাই না। তাঁহার শেষ দিন আমার সর্বদা স্মরণ থাকিবে—বিশেষ করিয়া সেই করুণাপূর্ণ ভাবনা যে এতখানি সেবা করিবার পরও ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে কাউন্সিলের উপযুক্ত মনে করিলেন না। তাঁহার মনে পদের জন্য কোনও লোভ ছিল না। কংগ্রেসে না আসিলে তিনি অনায়াসেই উহা পূর্বে পাইতে পারিতেন। তাঁহার দুঃখ এইজন্য যে আমরা তাঁহাকে অযোগ্য মনে করিলাম!

অন্য যে কথার উল্লেখ করিতে চাই তাহা হইল আমার নিজের কথা। ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে যখন নাম বাছিবার প্রশ্ন উঠিল তখন অন্য সকলের নামের সংগে আমার নামও ছিল। আমি এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। একে তো আমার স্বাস্থ্য এরূপ ছিল না যে বেশি পরিশ্রম করিতে পারি। তাহার উপর আবার এ প্রকার কাজে আমার মোটেই অভিজ্ঞতা ছিল না। এইরূপ কঠিন সময়ে এই ভার লওয়া ঠিক মনে হইল না। তৃতীয়তঃ, আমি বুঝিয়াছিলাম যে বাহিরে থাকিয়া যেমন আমি এই পর্যন্ত কাজ করিয়া আসিয়াছি তেমনভাবেই কাজ করিয়া যাওয়া আমার প্রকৃতির অনুকূল হইবে। চতুর্থতঃ, মনের মধ্যে কিছু নৈতিক সঙ্কোচও হইতেছিল। আমার অসুবিধার কথা পূজনীয় বাপুজীর কাছে একাকী

গিয়া বলিলাম। তিনি মত দিলেন যে আমার গ্রহণ করাই উচিত। ইহার পর আমার আর কিছু বলিবার থাকিল না। কিন্তু মনের মধ্যে পূর্ণ শান্তি পাইলাম না। এজন্য সিমলায় যখন কথাবার্তা শেষ হইয়া গেল তখন আমার এমনই মনে হইল যে আমার মাথা হইতেও একটা বোঝা নামিয়া গেল—দেশহিত সাধনের দৃষ্টিতে যদিও তাহা ভাঙিয়া যাওয়া ভাল মনে হয় নাই তথাপি ব্যক্তিগত বিচারে ভালই হইয়াছে মনে হইল।

পীড়িত রাজবন্দীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্‌যোগ

সিমলা হইতে দিল্লী আসিলাম। সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। শরীর বোম্বাই যাওয়ার কিছুটা পরেই খারাপ হইয়াছিল, তাই বোম্বাই হইতে তাড়াতাড়ি পাটনায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু পাটনাতেও থাকিতে পারিলাম না, সেখান হইতে সিমলা যাইতে হইল। সিমলাতে কোন প্রকারে কাজ শেষ করিলাম। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সেই সময় সিমলায় গিয়াছিলেন, তিনি পরামর্শ দিলেন যে কোন শুকনো জায়গায় কয়েকদিনের জন্য চলিয়া গেলে ভাল হয়। আমি এই ভাবিয়া দিল্লী থাকিয়া গেলাম যে সেখান হইতে পিলানী গিয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করিব। কিন্তু দিল্লীতে বেশি অসুস্থ হওয়ায় প্রায় দুই সপ্তাহ থাকিতে হইল। সেখান হইতে পয়লা কি দোসরা আগষ্ট পিলানী গেলাম। সেখানে এক মাসের কিছু বেশি থাকিলাম। পিলানীতে বিড়লা-বন্ধুদের দিক হইতে আমার থাকিবার সুব্যবস্থা ছিল। সেখানে আমার ভগ্নী ও মৃত্যুঞ্জয়ের মার সহিত খুব আরামে ছিলাম। আমাকে আরামে রাখিবার চেষ্টা শ্রীহরিশচন্দ্র খুব উৎসাহের সঙ্গে করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন বিড়লা বন্ধুদের ম্যানেজার। বিড়লা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীশুকদেব পাণ্ডেয় এবং অন্যান্য অধ্যাপক ও আচার্যদের সঙ্গও খুব উপাদেয় হইয়াছিল।

জেলে যে পুস্তক লিখিয়াছিলাম, তাহার এক ভাগ লেখা বাকি ছিল, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। পিলানীতে সে কাজ করা হইল। এখানে বিড়লা কলেজের পুস্তকালয়ে পুস্তক সংগ্রহ ভাল। যে সব পুস্তকের প্রয়োজন ছিল তাহার প্রায় সবগুলিই ঐখানে পাইলাম। এইজন্য বাকি অংশ সম্পূর্ণ করিতে সুবিধা হইল। পরিশ্রম অবশ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কাজ হইয়া গেল। সেখান হইতে ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জন্য বোম্বাই যাইতে হইল। বোম্বাই-এর হাওয়া

আমার পক্ষে এতটা ক্ষতিকর হইল যে আমার সেখানে পেঁাছিতেই কাসি ও হাঁপানি আরম্ভ হইল। শেষে ওয়ার্কিং কমিটি বোম্বাইয়ে না হইয়া পুণাতে হইল। আমরা পুণা গেলাম। সেখানেও বরাবর বৃষ্টি হইতেছিল তাই শরীর ভাল থাকিল না। বোম্বাহয়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পর পাটনায় ফিরিয়া গেলাম বোম্বাহয়ে ডিভাইডেড্ ইণ্ডিয়া' বইখানি ছাপাইবার ও প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম মনে হইল দুই-তিন মাসের মধ্যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবে। সিমলাতেই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের নূতন নির্বাচন শীঘ্রই হইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম যে ঐ সব নির্বাচনের পূর্বেই পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভাল। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনের পূর্বে তো নয় তবে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পূর্বে উহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল।

আমি যখন জেলে ছিলাম তখন তাহাদের জন্য চিন্তা হইত যাহারা বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলনের জন্য নানাপ্রকার কষ্টে পড়িয়াছিল—বিশেষ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধেও চিন্তা হইত যাহাদের বিরুদ্ধে সঙ্গীন মকদ্দমা চলিতেছিল এবং ফলে ফাঁসি অথবা দীর্ঘকালের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। মকদ্দমার তদ্বির করিতে খরচ হইতেছিল আর যাহারা বাহিরে ছিল তাহারা সাধ্যমত ইহার ব্যবস্থা করিত। বহু এমন লোক জেলে আসিয়াছিলেন যাঁহাদের জেল হওয়ায় পরিবারবর্গকে মহা কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। অনেকে তো আবার ছাড়া পাইবার সময় এমন স্বাস্থ্য নিয়া ফিরিতেছিলেন যে বাহিরে গিয়াই চিকিৎসার আবশ্যক হইয়া পড়িত। বাহিরে আসিয়া যখন এই সব নানা ব্যাপার দেখিলাম, তখন আমার মনে হইতে লাগিল যে ইহাদের সাহায্যের জন্য কিছু টাকা উঠান দরকার। কিন্তু সিমলা আর বোম্বাইয়ের কথাবার্তা আর তাহার পর নিজের রোগ-ভোগ, এই সব কারণে বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। বোম্বাইয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এই বিষয়ে কিছু আলাপ করিয়াছিলাম কিন্তু পরিস্থিতি তখন উৎসাহজনক ছিল না। সেখানকার লোকে আগে বহু অর্থ দিয়া দেশের সাহায্য করিয়াছিল। এখন আলাদা করিয়া একটি অঞ্চলের জন্য টাকা তোলা মুশকিল মনে হইল। যদি সমগ্র দেশের জন্য বলিতে পারিতাম তবে অন্য কথা হইত, কিন্তু এখন তো আমি কেবল একটা প্রদেশের জন্যই বলিতে পারি। অন্য লোকের চিন্তা এদিকে এখনও যায় নাই। সেজন্য আমি ভাবিলাম যে আগে আমার প্রদেশেই যদি কিছু টাকা উঠাইতে পারি তবে বোম্বাই কলিকাতার মত বড় বড় জায়গায় চেষ্টা করিব।

আমি পিলানীতেই টাকা সংগ্রহ করিবার কাজ আরম্ভ করিলাম। কাজটা অনায়াসেই শুরু হইয়া গেল, বলিলেই বোধ হয় বেশি ঠিক বলা

হয়। সেখানকার কলেজের অধ্যক্ষ এবং আর কয়েকজনের সঙ্গে কথায় কথায় এই কথা পাড়িয়াছিলাম, আমি কিছু চাহি নাই। কিন্তু ১৯৪৫-এর ৯ই আগষ্ট কলেজে একটি সভা হইল, সেই সভায় ৯ই আগষ্ট সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ঐ সভাতেই কলেজের অধ্যাপক-গণ ও ছাত্রগণ পীড়িত রাজবন্দীদের জন্য এক হাজার টাকা তুলিয়া আমাকে দিলেন। পিলানী হইতে রওয়ানা হইবার আগে আমি শেখাবাটির কয়েক জায়গায় গেলাম সেখানকার লোকের আগ্রহে। চিড়াবা, সূর্যগড়, ফতে-গড় প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় গিয়াছিলাম। সব জায়গায়ই টাকার থলি আমার হাতে আসিয়াছিল। এইভাবে ঐখান হইতে আসিবার আগেই আমার হাতে পনের-ষোল হাজার টাকা হইল। পাটনায় ফিরিয়া আমি সারা প্রদেশ সফর করিবার এক কার্যক্রম প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু তখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। আমার স্বাস্থ্যও ঠিক ভাল ছিল না। সেজন্য ঠিক করিলাম যে দিন-দশেক জিরাদেই গিয়া বিশ্রাম করিব এবং তারপর দশহরার দিন হইতে সফরে বাহির হইব। জিরাদেই যাইবার সময় অনুভব করিলাম যে অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার মনে যে সংশয় ছিল তাহা দূর হইল।

গঙ্গাতীরে পহলেজাঘাট স্টেশনে স্টীমার হইতে নামিয়া রেলে উঠিতে-ছিলাম। সেখানে লোকের ভারি ভীড় লাগিয়া গেল কারণ ঐ গাড়িতে আমি জিরাদেই যাইতেছি এই খবর পেঁৗছিয়া গিয়াছিল। আমি বেশি কিছু না ভাবিয়াই ভীড় দেখিয়া লোক-সমাবেশকে বলিলাম, আমি পীড়িত রাজবন্দীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছি, যাহার যাহা সাধ্য আমার ভাণ্ডারে দাও। পাটনা হইতেই জিলায় জিলায় খবর দিয়াছিলাম যে আমি এই বার অর্থ সংগ্রহে বাহির হইব। প্রত্যেক জিলার জন্য একটা বরাদ্দ ধরিয়া-ছিলাম যাহার কম সেই জিলা হইতে লওয়া হইবে না। পহলেজাঘাটের কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছিলেন এই সুযোগে কিছু টাকা উঠাইয়া লইবেন। এই জিলার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে তাঁহাদের দেয় অংশ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছিল, আর কিছু টাকা উঠানও হইয়াছিল। তাহা তো আমাকে উপহার দিলেন, তাছাড়া উপস্থিত জনতার ছোট ছোট দানেও বেশ বড় রকম টাকা উঠিল। আমি দেখিলাম লোকের মনে বেশ উৎসাহ, ইহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। এই ভাবিয়া প্রত্যেক স্টেশনেই আমি টাকা তোলা শুরু করিয়া দিলাম। আমি এইবার প্রায় তিন-চার বৎসর পরে জিরাদেই যাইতেছিলাম, কাজেই সেখানকার লোকেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। উহারাও শুনিয়াছিল যে আমি নিপীড়িত রাজবন্দীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছি, তাই কিছু টাকা তুলিয়া রাখিয়াছিল। এইভাবে জিরাদেই পেঁৗছিতে পেঁৗছিতে বড় রকম টাকার থলি পাইয়া গেলাম,

ইহাতে আমার উৎসাহ বাড়িয়া গেল, আমি বুঝিতে পারিলাম যে টাকা যথেষ্টই পাওয়া যাইবে।

জিরাদেই গেলাম তো বিশ্রাম করার জন্য, কিন্তু বিশেষ বিশ্রাম হইল না। দলে দলে লোক আসিত, তাহাদের যাহা কিছু হইয়াছে সব শুনাইত। ঐখানে থাকিতেই আমি কাছাকাছি জায়গায় কয়েকজনের বাড়ীঘর দেখিলাম। ১৯৪২ সনে সরকারি কর্মচারিরা এগুলি জ্বালাইয়া দিয়াছিল। আর তাহাদের পরিবারস্থ এমন লোকজনের সঙ্গে দেখা হইল যাহারা বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু নরেন্দ্রপুরের বাবু কৃষ্ণকুমার সিংহজী যাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাটনা সেক্রেটারিয়েটের গুলিকাণ্ডে মারা যায়। সেই সব পোড়া পোড়া ঘর দেখিয়া বড়ই দুঃখ পাইলাম আর অনুমান করিতে লাগিলাম, তিন বৎসর পূর্বে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন ইহাদের কি অবস্থাই না হইয়াছিল। জিরাদেইয়েরও একজন লোক গুলি খাইয়া মারা যায়। উহার পরিবারের লোকদের সাহায্যের জন্য কিছু দিলাম। জিরাদেই বসিয়াই অর্থ সংগ্রহের কাজ চলিতে লাগিল। যাহারা দেখা করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে অনেকে আমার ফণ্ডে টাকা দিত আর লোকের কষ্টের কথা সবিস্তারে শুনাইত।

জিরাদেইয়ে আরেকটি কাজ হইল। জব্বলপুরের শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র ১৯৪০-৪১ সনের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় জেলে থাকিতেই 'কৃষ্ণায়ণ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একবার ওয়ার্ধা হইতে পাটনা ফিরিবার পথে ঘণ্টাকতক তাঁহার সঙ্গে কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখন আমার আগ্রহে তিনি উহার কিছু অংশ আমাকে শুনাইয়াছিলেন। আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ১৯৪২-৪৫-এর কারাবাসকালে তিনি উহা শেষ করিয়াছিলেন। আমি জেল হইতে ছাড়া পাইলে পর বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় বলিয়াছিলেন যে দিনকয়েক আমার সঙ্গে থাকিয়া উহা আমাকে শুনাইতে চান। আমি তাঁহাকে জিরাদেই ডাকিয়া নিলাম। তিনি এবং তাঁহার ভাই দুইজনে আসিলেন। পুস্তকের কিছু অংশ তিনি আমাকে শুনাইলেন। আমাকে দিয়া একটি ভূমিকা লিখাইবার তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমি ঐখানেই তাহা লিখিয়া দিই। বইটি তুলসীদাসের রামায়ণের শৈলীতে দোহা আর চৌপদীতে লেখা। রামায়ণে যেমন শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র কীর্তন করা হইয়াছে ইহাতে তেমন-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনী আর চরিত্রের কীর্তন করা হইয়াছে। শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। মিশ্রজীর সাধুসঙ্গে কয়টা দিন ভালই কাটিল।

জিরাদেই হইতে আমি সোজা সফরে বাহির হইলাম। প্রায় ছয়-সাত সপ্তাহ ধরিয়া ঘোরাঘুরি করিলাম। লোকের মধ্যে খুব উৎসাহ ছিল। '৪২ সনের পীড়নের বিন্দুমাত্র ফল দেখিলাম না। মনে হইল, রবারের বল

যেমন যত জোরে ফেলাও তত উপরে ওঠে তেমনই লোক-চিত্তও যত বেশি পীড়ন করা হইয়াছে ততই যেন তাহার তেজ বাড়িয়া গিয়াছে। সভায় টাকার যেন বৃষ্টি হইত। লোকে ফাণ্ডের জন্য আগে যাহা জমা করিয়া রাখিত তাহা ছাড়া সভায়ও বেশ ভারি রকম টাকা পাওয়া যাইত। এই ভ্রমণ বেশ কষ্টকর ছিল, কেননা যাইতে হইত বহু রকম জায়গায়, আর সব জায়গায়ই ভাষণ দিতে হইত। অসুখ যদিও সারিয়া গিয়াছিল, তবু দুর্বলতা যথেষ্ট ছিল। বক্তৃতার সময় লোকের মনে উৎসাহ জাগানো ছাড়াও ভাবী নির্বাচনের কথাও কিছু কিছু বলিতে হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থের জন্য আবেদন করিতে হইত। নির্দিষ্ট 'কোটার' অপেক্ষা কম কোন জিলাই দেয় নাই। অনেকেই 'কোটা' অপেক্ষা অধিক দিয়াছিল। আমরা প্রথমে ঠিক করিয়াছিলাম নিজেদের প্রদেশ হইতে তিন লাখ টাকা উঠান হইবে। বোম্বাই, কলিকাতার মত বড় বড় জায়গা হইতে দুই লাখ। কিন্তু এই প্রদেশের মধ্য হইতেই পাঁচ লাখের বেশি টাকা আসিয়া গেল। বাহিরে চাহিবার আর দরকার থাকিল না। সফর তখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখনও দুই-তিনটি জিলা বাকি এমন সময় কাটিহার পেঁৗছিয়া আমি কঠিন রোগে পড়িলাম। নিউমোনিয়ার মত হইল। সেইখানেই দিন কতক থাকিতে হইল। পাটনা হইতে বড় ডাক্তার আনান হইল। একটু ভাল হইলে পর স্পেশ্যাল ট্রেনে ওখান হইতে পাটনা আসিলাম। কেননা ঐ পথে গাড়ির এমন বন্দোবস্ত ছিল যে—কোন কোন জায়গায় গাড়িতে রাত্রি কাটাইতে হইত, তাই ডাক্তাররা আমাকে উহা হইতে বাঁচাইতে চাহিলেন। পাটনা পেঁৗছিয়াও অনেক দিন আমি অসুস্থ ছিলাম। খুব ধীরে ধীরে ভাল হইতেছিলাম। ইতিমধ্যে কলিকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইবার কথা। আসার আগে যে প্রোগ্রাম করিয়াছিলাম তাহাতে কথা ছিল শরীরে সহিলে আমি সফর শেষ করিয়া কলিকাতা পেঁৗছিব। কিন্তু রোগে পড়িয়া আমার না হইল সফর শেষ করা, না হইল কলিকাতা যাওয়া। যে জেলাগুলি বাদ পড়িয়াছিল, কয়েক মাস পরে সেই সব জায়গায় আমি গিয়াছিলাম কিন্তু তখনকার মত আর হইল না। তখন লোকের মনে অদ্ভুত উৎসাহ আর প্রাণশক্তি দেখিয়াছিলাম।

উপরে বলিয়াছি যে কেন্দ্রীয় এসেম্‌ব্লির জন্য আগে নির্বাচন হইল। উহা জানুয়ারি আন্দাজ শেষ হইল। ইহার পরে আসিল প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য বিহার হইতে যে কয়জন অ-মুসলিম দাঁড়াইয়াছিলেন সকলেই সহজে জিতিয়া গিয়াছিলেন, অধিকাংশ আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল, কিন্তু প্রতি-দ্বন্দ্বীর জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। তবে মুসলিম আসনে কংগ্রেসের পক্ষে যে সব প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা হারিয়া গেলেন, সব আসনেই মুসলিম লীগের জয় হইল। এই অবস্থা অবশ্য শুধু বিহারেই হয় নাই, সমগ্র দেশেই এই রকম হইয়াছিল। অ-মুসলিম আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী আর মুসলিম আসনে লীগের প্রার্থী নির্বাচিত হইল।

এখন প্রাদেশিক নির্বাচনের আয়োজন হইতেছিল। এখানেও মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। বিহারে কংগ্রেস তিনটি মুসলমান দলের সঙ্গে একত্র মিলিয়া লীগের বিরোধিতা করিতেছিল। এই তিন দল ছিল, জমিয়ত উলেমা, জমিয়ত মোমিন, আর স্বতন্ত্র দল। ইহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র দলের কোন নিজস্ব রূপ ছিল না, কিন্তু মোমিনদের সংগঠন খুব বিস্তৃত ছিল। প্রার্থী ঠিক করিতেই অনেক দেরি হইয়া গেল, একাধিক দলের সঙ্গে মিলিয়া চলিতে হইতেছিল। ঠিক হইল যে কোন কোন জায়গায় কংগ্রেসী, কয়েক জায়গার জন্য জমিয়ত উলেমা, আর কোন কোন জায়গার জন্য মোমিন প্রার্থী দাঁড় করান হইবে। মোমিনদের বেশি জায়গায় দেওয়া হইল। খুব ধুমধামের সঙ্গে নির্বাচন হইল। লীগের পক্ষ হইতে হরেক রকম জোর-জবরদস্তিও করা হইল। খরচও হইল প্রচুর। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, চল্লিশটি আসনের মধ্যে ২৪টি লীগ নিয়া নিল, ৫টি মোমিনরা, আর কংগ্রেস পাইল মোটে একটি আসন! জমিয়ত উলেমার একজনও নির্বাচিত হন নাই। যে-সব জায়গায় শোনা গিয়াছিল সব ভোটারেরাই উলেমার দলকে সমর্থন করিবে, সেখানেও উলেমা দলের প্রার্থী হারিয়া গেল! কংগ্রেসের সব চেয়ে বেশি বাজিল প্রোফেসার আবদুল বারির পরাজয়ে। কংগ্রেসী প্রার্থীদের মধ্যে ডাঃ সৈয়দ মামুদ জিতিয়াছিলেন।

অ-মুসলিম জায়গায় আর কোথাও বিশেষ বিরোধ হয় নাই, কেবল ছোটনাগপুরের রাঁচি আর সিংভূম জেলায় জোর দাঙ্গা হইয়াছিল। জমি-দারদের জায়গায় আমরা কোনও প্রার্থীই দাঁড় করাই নাই। ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের মধ্যে কিছুদিন যাবৎ আদিবাসী মহাসভা নামে একটি সংস্থা

কাজ করিতেছিল ইহাদের কাজকর্মের এক প্রধান অঙ্গ ছিল, ছোটনাগপুরকে বিহার হইতে স্বতন্ত্র প্রদেশ বানাইবার চেষ্টা ইহার নেতা ছিলেন শ্রীজয়পাল সিংহ। তিনি নিজেই রাঁচি জিলার খুঁটি অঞ্চল হইতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সিংভূম, রাঁচি, সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি জায়গায়ও এই সভার পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছিল। বিধান অনুসারে কয়েকটি আসন আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। অন্যান্য অ-মুসলিম আসনের জন্যও ইহাদের দাঁড়াইবার অধিকার আছে। উহারা সংরক্ষিত আসনগুলি ছাড়াও কয়েকটি সাধারণ আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইল। কংগ্রেসের দিক হইতেও তো সকল সাধারণ নির্বাচনে এবং আদিবাসীর জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছিল। এই সব জায়গাতেই জোর বিরোধ হইল। নির্বাচনের সময় সময় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলাম। যেখানে যেখানে বিরোধ-বিবাদ বেশি হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সব জায়গায় আমার যাইবার কথা হইল। কোথাও কোথাও আদিবাসীদের আসন ছাড়া, মুঙ্গের আর শাহাবাদের কিছু জায়গাতে এবং শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত স্থান হইতেও রেডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (শ্রীএম্‌ এন্‌ রায়ের পার্টি) আর কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছিল।

১৯৪২ সনের বিপ্লব আন্দোলনের সময় শ্রীএম্‌ এন্‌ রায় এবং তাঁহার দল কংগ্রেসের বড়ই নিন্দা প্রচার করেন। কেবল এদেশেই নয়, বিদেশেও, বিশেষ করিয়া আমেরিকায় তিনি এই আন্দোলনের নিন্দা করেন। তাঁহার লোকেরা গিয়া কংগ্রেসের বিষয়ে অনেক ভুল ও মিথ্যা অভিযোগ করেন। সরকারকেও কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখিতে এবং এই সংস্থাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিতে পরামর্শ দেন। সরকারের অবশ্য তাঁহার পরামর্শের কোন প্রয়োজন ছিল না, সরকার নিজে হইতেই সব কিছু করিতেছিলেন। তবে তাঁহার প্রচারের ফলে সরকারের পীড়নচক্র চালাইবার পক্ষে নিশ্চয়ই কিছু সুবিধা হইয়াছিল। আমরা জেলে থাকিতেই কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সরকারপক্ষ হইতে বলা হয় যে এই দলকে সরকারের কাছ হইতে মাসে মাসে তের হাজার টাকার মত সাহায্য করা হইয়া থাকে। উহাদের দলের মধ্যেও এই বিষয় লইয়া পরস্পরে ঝগড়া হইল, আর এক দল এই সুযোগে অপর দলকে লোকের চোখে নীচু করিতে চাহিল। আমরা বাহিরে থাকিতেই কিছু কিছু শুনিতেছিলাম। দেখিতাম উহারা বেশ খরচপত্রও করে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারিতাম না। বিয়াল্লিশ সনের আন্দোলনের সময় উহাদের নিজেদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিল। একদল আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু মিঃ এম্‌ এন্‌ রায় এবং তাঁহার দলের অন্য কয়েকজন তীব্রভাবে আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে চাহিলেন। জেলে থাকিতেই আমরা এই খবর জানিয়াছিলাম; ইহাও

শুনিয়াছিলাম যে এই দল সরকারের পক্ষ হইয়া কাজ করিতেছে। এসেম্‌ব্লিতে তো গভর্নমেণ্টই এই কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছিল। ইহারা বলিয়া বেড়াইতেছিল যে, তাহাদের পার্টিই নিজেদের দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি আর দেশে বিদেশে কংগ্রেসের নিন্দা গাহিয়া বেড়াইতেছিল।

কমিউনিষ্ট দলের অবস্থাও একটু বিচিত্র ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন আগে রুশ-জার্মান চুক্তি হইয়া গিয়াছিল। যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল একদিকে জার্মান পোল্যাণ্ডের উপর চড়াও হইল, অপর দিকে রাশিয়া পোল্যাণ্ডের কিছু কিছু অংশ করায়ত্ত করিয়া নিল। এইভাবে দুইয়ের মধ্যে খুব আদর-আপ্যায়ন হইল। ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল, যাহারা প্রধানত রাশিয়ার ইঙ্গিতেই চলে, তাহারা গোড়ায় ইংরেজের বিরুদ্ধেই বলিতে ও লিখিতে ব্যস্ত ছিল, সেই জন্য উহাদের সংস্থা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং উহাদের দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লুকাইয়া চলাফেরা করিতেছিল। যতদিন রাশিয়া-জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ লাগে নাই, ততদিন ভারতীয় কমিউনিষ্টগণ জার্মানির সহায়তা আর ইংরেজের বিরোধিতা করিতেছিল। রাশিয়া জার্মানির মধ্যে যখন যুদ্ধ লাগিয়া গেল তখন উহারাও নিজেদের মত বদল করিল। যেই ব্রিটেন আর রাশিয়া একজোট হইয়া জার্মানির সঙ্গে লড়াই সুরু করিল, তখন ইহারা বলিতে আরম্ভ করিল যে, এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ, এবং সকলেরই এই যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করা উচিত! এই অবস্থায় কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রতি বিরোধিতা অনিবার্য হইয়া উঠিল। উহারা বিরোধ আরম্ভও করিল। এই কারণে কংগ্রেসীদের মনে, বিশেষত কংগ্রেসের ভিতরে সোস্যালিষ্ট পার্টির মনে উপরোক্ত দুই দলের বিরুদ্ধে প্রবল চিন্তার উদয় হইল। জেলের মধ্যেও ইহার খবর কিছু কিছু পৌঁছিতেছিল, কিন্তু বাহিরে আসিয়া যখন পুরোপুরি খবর জানা গেল, তখন ভাবনা আরও বাড়িয়া গেল।

এই দুই পার্টি হইতেই কংগ্রেসের বিপক্ষে প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছিল। উহাদের জিতিবার তো কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবে দ্বন্দ্বের একটা সূত্র হইয়া রহিল। কোন কোন জায়গায় কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মারামারিও হইয়া গেল। আমার বড়ই আপসোস যে কংগ্রেসীরা ইহাদের প্রহারকে অহিংসভাবে সহ্য করিতে পারিল না, তাহারাও কমিউনিষ্টদের এক বড় নেতাকে জোর প্রহার করিয়া বসিল। আবহাওয়া খুব দূষিত হইয়া উঠিল। আমাদের আদর্শে জোর ধাক্কা লাগিল। শেষ পর্যন্ত দুই দলের লোকই বেজায় হারিয়া গেল। বিহারের কোনও আসনেই উহাদের দলের কেহ নির্বাচিত হইল না। কোন কোন আসনে তো জামানতের টাকাও বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল।

আদিবাসীদের বিরোধও হিংসা হইতে মুক্ত ছিল না। আমার পরি-

ভ্রমণের সময় রাঁচি জেলার অনেক লোক আসিয়া আমাকে জানাইয়াছিল যে আদিবাসী-সভার লোকে তাহাদের খুব মারিয়াছে। তাহারা সভায় দলে দলে জড় হইত আর কংগ্রেসীদের মারপিট করিত। যে সব আদিবাসীরা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দাঁড়াইত, সেই সব আদিবাসীদের উপরই তাহাদের রাগ গিয়া পড়িত। এমন কতক লোককে তো তাহারা বেজায় মারিয়াছিল, কয়েকজনকে আহত অবস্থায় অনেক দিন হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। খুঁটি অঞ্চলে উহাদের ঝগড়া বেশ গুরুতর হইয়াছিল। আমি গভর্নমেণ্টকে এই বিষয় জানাই, কিন্তু স্থানীয় অফিসারদের এমন মত ছিল যে সরকার আমার কথায় বিশেষ কান দেন নাই। এক জায়গায় পাঁচজন আদিবাসীকে মারিয়াই ফেলিয়াছিল। এই নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ আর আদিবাসীদের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা হইয়াছিল। দুই দলে মিলিয়াই এই সব করিতেছিল। আদিবাসী-সভার লোকেরাও 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' রব তুলিয়াছিল। মুসলিম লীগ পরে এই পাঁচটি মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইয়া ১০০/১৫০ বানাইয়া সব কিছুর জন্য কংগ্রেসকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিল। এই বিষয়ে বেশি লেখা সঙ্গত নয়, কারণ এখনও মামলা চলিতেছে। তবে এই পর্যন্ত বলিয়া রাখা উচিত যে কংগ্রেসীরা বরাবর এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে।

নির্বাচনের ফলে দেখা গেল যে শ্রীজয়পাল সিংহ নিজে পরাজিত হইলেন কিন্তু তাঁহার দলের তিন ব্যক্তি নির্বাচিত হইলেন, দুইজন সিংভূম জেলা হইতে, আর একজন রাঁচি জেলা হইতে। সাতটি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে দুইটি তাঁহারা পাইলেন, একটি রাঁচিতে, একটি সিংভূমে আর সাধারণ আসনের মধ্যে একটি পাইলেন সিংভূমে। পাঁচটি সংরক্ষিত আসন আর যে-যে জায়গায় কংগ্রেস-প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন, সব আসনই কংগ্রেসের হাতে আসিল। খৃষ্টানদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও এমন একজন নির্বাচিত হইলেন, যাহাকে কংগ্রেসের দলেরই বলা যায়, অথবা সাহায্যকারীদের মধ্যে গণনা করা যায়।

আমি নিজে নির্বাচন সংক্রান্ত সফরে বাহির হইয়াছিলাম আর যেখানে যেখানে হওয়ার কথা হইয়াছিল সর্বত্রই গেলাম। তবে শেষের তিন-চারি দিন আর ঘুরিতে পারিলাম না। আমার শরীরটা আবার কিছু খারাপ হইয়া পড়িল। তখন বর্ষাও খুব জোর নামিয়াছে। এই উপলক্ষে মুঙ্গের জেলায় যাইবার কথা, তাহা আর হইল না। পীড়িত বন্দীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের সময়ও মুঙ্গের যাওয়ার আগেই অসুস্থ হইয়া পড়ার ফলে মুঙ্গের যাওয়া হয় নাই। অনেক দিন পর মুঙ্গের জেলার অন্য কতকগুলি জায়গায় গিয়াছি, কিন্তু খাস মুঙ্গেরে আজ পর্যন্ত যাওয়া হয় নাই। আমার সফরের আর বিশেষ দরকার ছিল না, কেননা সাধারণ

লোকের মনে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল আর কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত ছিল। তবু আর একবার কতকগুলি জায়গায় ঘুরিয়া আমার ভালই হইল।

নির্বাচনের পরে মন্ত্রিসভা গঠন করার কথা। যদিও কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যাইবে কিনা তাহা তখনও ঠিক করা হয় নাই, তবে যুদ্ধ তো এখন শেষ হইয়াছে, আর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছাড়িয়াছিল যুদ্ধের জন্যই। দেশের তখন যে পরিস্থিতি তাহাতে দেশবাসী সকলেরই ইচ্ছা যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যায়। কংগ্রেসের ভিতরে, বাহিরে সর্বত্রই সকলে ধরিয়া লইয়াছিল যে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে, আর হইলও তাহাই। সীমান্তপ্রদেশ, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ আর বোম্বাইয়ে তো কংগ্রেসেরই সংখ্যাধিক্য—এই সব জায়গায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। পাঞ্জাবে কোন একটি দলের সংখ্যাধিক্য হয় নাই, কিন্তু লীগের অনেক সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সেখানে কংগ্রেসী, শিখদল আর ইউনিয়নিষ্ট পার্টি তিন মিলিলে লীগের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশি হয়। এজন্য এই তিন দলের সম্মিলিত দল গঠিত হইল আর ইহারাই মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন, লীগ দল নয়। সিন্ধুদেশে লীগ আর অন্যদলগুলির প্রায় সমান সমান লোক নির্বাচিত যদি বা ইংরেজ সদস্য তিনজন লীগের সঙ্গে যোগ দেয়, তবু ঐ মিলিত দল দুই-এক সংখ্যায় ভারি হইবে। তথাপি সিন্ধুর গভর্নর লীগকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিলেন। সেখানে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, কিন্তু এখনও শোনা যায় উহাদের দলে ভোটাধিক্য নাই। কেবল বাংলা-দেশেই ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে মিলিয়া লীগের দল ভারি হয়। সেখানেও লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। বাকি সব জায়গায়ই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হইল। বিহারে প্রথমে পুরাতন চারজন মন্ত্রীই নিযুক্ত হইলেন। শ্রীজগলাল চৌধুরী দশ বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন, সেজন্য নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারেন নাই। শ্রীবাবু, অনুগ্রহবাবু আর ডক্টর মামুদ নিযুক্ত হইয়াই উঁহাকে জেল হইতে খালাস করিয়া আনিলেন আর চতুর্থ স্থানে নিযুক্ত করিলেন। দিন কয়েক পর আরও পাঁচজন মন্ত্রী লওয়া হইল। এখন বিহারে নয়জন মন্ত্রী কাজ করিতেছেন।

অনেক দিন হইতেই মহাত্মা গান্ধী গোসেবা সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করিতেছিলেন। সবরমতীতে এবং সেবাগ্রাম আশ্রমেও গোশালা বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে। ওয়ার্ধার কাছে নলবাড়ীতে শেঠ যমুনালাল বাজাজের তত্ত্বাবধানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাজাজ কয়েক বৎসর হইল গোশালা চালাইয়া আসিতেছেন। গান্ধীজীর মতানুসারে পারনেরকরজী গোসেবা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এবং সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে শেঠ যমুনালাল বাজাজ গোসেবাকে তাঁহার জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। তাই তিনি ওয়ার্ধাতে নলবাড়ির গোশালাকে কেন্দ্র করিয়া এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সময় সেখানে যে সম্মেলন হয় তাহাতে সুদূর স্থান হইতে বিশেষজ্ঞেরা আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমিও সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। আমি সকল বিষয়েই কিছু কিছু পড়াশোনা করিয়াছিলাম, কিন্তু গোসেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিই নাই। ইহার মহত্ত্ব ও উপযোগিতা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল না। শ্রীবালুঞ্জকর-পরিচালিত নলবাড়ির চর্মালয়ও জানিতাম, যখন তখন সেখানে গিয়া উহা দেখিয়া আসিতাম, গোশালার সঙ্গে চর্মালয়ের সম্বন্ধও বুঝিতাম, এ বিষয়ে মাঝে মাঝে কিছু লিখিয়াছিলামও। গোশালাগুলি, বিশেষ করিয়া দ্বারভাঙ্গার গোশালা, যাহাতে এই পথে চলে সেজন্য চেষ্টাও করিয়াছিলাম। তাহা সত্ত্বেও আমি গোসেবা সঙ্ঘের সদস্য হই নাই, এবং এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ কোনও সম্বন্ধে যুক্তও হই নাই।

১৯৪৬-এর গোড়ায় ওয়ার্ধা হইতে শ্রীমতী জানকীদেবী বাজাজ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাজাজের পত্র আসিল আমি যেন এবার গোসেবা সম্মেলনের সভাপতি হই। তাহাতে ইহাও লেখা ছিল যে পূজ্য বাপুজীরও ইচ্ছা যে আমি এই পদ গ্রহণ করি। এমনিতেই তো শ্রীমতী জানকীদেবীর বলাই যথেষ্ট, তাহার উপর পূজ্য বাপুজীর আজ্ঞা! আমি তখনই সম্মতি জানাইলাম। নির্দিষ্ট সময়ে ওয়ার্ধায় পোঁছিয়াও গেলাম। সেখানে পদের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য এদিকে বিশেষ মন দিতে হইল। সম্মেলনে ভাল ভাল বিশেষজ্ঞেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার দাতার সিং, লালা হরদেও দাশ (হিসার, পাঞ্জাব) ও মধ্যপ্রদেশের সরকারি বিশেষজ্ঞ শ্রীশাহীজী ছিলেন প্রধান। ঐখানে সব দেখিয়া শুনিয়া ও দ্বারভাঙ্গা

গোশালার প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর স্থির করিলাম যে এই ধরনের কাজ বিহারেও করা হইবে, আর এজন্য এক প্রাদেশিক গোসম্মেলনের ব্যবস্থাও করা হইবে। এই সংকল্প অনুসারে পাটনায় এক গোসম্মেলন হইল, সেখানে বিহারের সকল গোশালা হইতে প্রতিনিধিরা আসিলেন। ইঁহারা ছাড়া অন্য লোকও আসিয়াছিলেন। স্যার দাতার সিং, লালা হরদেও সহায়, দিল্লীর সৈয়দ রহিমতুল্লা কাজী (হিন্দু-মুসলমান গোরক্ষা সভার সভাপতি), রাওয়ালপিন্ডীর নাজীর আহম্মদ শেরওয়ানি ও গোসেবা বিষয়ে উৎসাহী বিহার গভর্নমেণ্টের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আসিয়াছিলেন। আমাকেই সভাপতি করা হইল। ভাগলপুরের রায় বাহাদুর বংশীধর ঢনঢনিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। পাটনা সিটির গোশালায় সম্মেলন হইল। শ্রীমতী জানকীদেবীও উপস্থিত ছিলেন।

আমি বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করিয়া এই দীর্ঘ ভাষণ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, বিশেষজ্ঞগণের এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলেরও ইহা খুব ভাল লাগিয়াছিল। সম্মেলনে স্থির হইল—সারা প্রদেশের গোশালা পিঁজরাপোলগুলি লইয়া এক সংঘ গঠিত হইবে, সকলে গোশালাকে তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং সংঘের একটি স্থায়ী কার্যালয়ও করিতে হইবে, সংঘ রেজিস্টারি করা হইবে। সংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আদর্শ গোশালাও খোলা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যালয় স্থাপিত হইল, সদাকত আশ্রমে এক ছোট গোশালাও হইয়া গেল। উহা বাড়াইয়া আদর্শ গোশালার রূপ দিবার চেষ্টা চলিতেছে। আশা আছে, দ্বারভাঙ্গা গোশালার কর্মকর্তা শ্রীধর্মপাল সিংহের পরিশ্রম ও উৎসাহে এই কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিবে। ইহা এক নূতন কাজ। এ বিষয়ে যাঁহারা একান্ত আগ্রহ দেখাইয়াছেন সেই সব বন্ধুদের ভরসায়ই আমি এই কাজে হাত দিয়াছি।

গোসেবাকে আমি ধর্মের দৃষ্টি দিয়া দেখাইতে চাই না। ভারতের আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে বলি। এই দিক দিয়া দেখিলে, যাঁহারা হিন্দু, জৈন ও শিখদের মতো বিষয়টি ধর্মভাবে দেখেন না তাঁহারাও আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে এই আর্থিক লাভ ও উপযোগিতার চিন্তা কিছু কাজ করিতে পারে, সফলও হইতে পারে। নিছক ধর্মের দোহাই দিলে মুসলমানদের মধ্যে দ্বেষ ও হিন্দুদের মধ্যে দম্ভ ও আড়ম্বর সৃষ্টি করে, ফলে সত্যকারের গোরক্ষা ও গোসেবা থাকে পিছনে পড়িয়া এবং বাহিরের সমারোহই বড় হইয়া ওঠে। তাই আমার বক্তৃতাতেও আমি আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতেই এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি বুঝাইয়াছিলাম যে কৃষিপ্রধান দেশে গোজাতি ও

গোবংশের কতখানি মহত্ত্ব—কেমন করিয়া আমরা নিজেদের অন্ধ বিশ্বাস ও অজ্ঞতার জন্য তাহার সেবার পরিবর্তে তাহার অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতেছি, অন্যের সহানুভূতির বদলে তাহাদের দ্বেষ ও বিরোধ ক্রয় করিয়া লইতেছি। আমাদের বিশ্বাস, ঠিক ঠিকভাবে, বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে যদি বিষয়টির অধ্যয়ন ও প্রচার করা যায় তবে আমরা অবশ্যই সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে পারিব।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা স্থূল কথাই ধরা যাক। সারা বৎসরে বকরীদ একদিন কি বড় জোর দুই দিন ধরিয়া হয়। ঐ দিন জায়গায় জায়গায় মুসলমানেরা কিছু গো-কোরবানি করেন। এই উপলক্ষে বহু স্থানে খুন-খারাপি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিদিন কসাইখানায় যে হাজার হাজার গোহত্যা হয়, সেদিকে হিন্দুদের দৃষ্টি নাই—বিশেষ করিয়া সেনাদের ছাউনির জন্য প্রতিদিন কত ভাল ভাল গরু যে হত্যা করা হয়। এই মহাযুদ্ধে না জানি বিদেশী সৈন্যদের জন্য ভারতবর্ষের কত প্রাণী জবাই করা হইল! ধর্মবুদ্ধিতে যাহারা গো-কোরবানি করে, তাহাদের সঙ্গে যে সকল ক্রূর ব্যক্তি উদর বা জিহ্বার জন্য, অথবা সামান্য কিছু উপার্জনের জন্য গোহত্যা করে বা করায় তাহাদের তফাতের কথা তো কেহ জিজ্ঞাসাও করে না! বৃদ্ধ, খঞ্জ আর অকর্মণ্য গরুদের রক্ষার জন্য গোশালায় কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু যত্ন করিলে যে গোপালন এমন একটা লাভজনক কাজে পরিণত হইতে পারে যাহাতে হিন্দু বা অহিন্দু কাহারও আর গরু বিক্রয় বা বধের কোনও প্রয়োজনই থাকে না, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। আজ তো গরুর দুধ বা বাছুর বিক্রয় করিয়া যে পয়সা হয় তাহা অপেক্ষা উহা বধের জন্য বিক্রয় করিলে অনেক বেশি পাওয়া যায়। যে বধ করিবার জন্য কেনে সে-ও উহা পালন করিয়া দুধ বা বাছুর হইতে যত না লাভ করিবে তাহার অপেক্ষা উহার মাংস, চামড়া, হাড়, চর্বি ও সিং হইতে বেশি আয় করিতে পারিবে। এই সব কারণে গোসেবায় বিশ্বাসী হিন্দুও বধের জন্য গাভী বিক্রয় করিয়া দেয়, ক্রেতা বধ করিবার জন্য তাহার নিকট হইতে উহা ক্রয়ও করে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত শাস্ত্রীয় মতে গাভীর পালন-পোষণ করিলে উহার দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, উহার গোময় ও মূত্রাদি ঠিক ঠিক কাজে লাগাইলে, আর উহার মৃত্যুর পর হাড়, চামড়া, মাংস, শিং, চর্বি ও পিঠ ইত্যাদি ঠিক মত ব্যবহার করিলে গোপালন লোকসানের না হইয়া লাভের ব্যবসায়ে দাঁড়াইবে।

এই লক্ষ্য ও চিন্তাধারা সম্মুখে রাখিয়া কাজ করা চাই। যে গাভী কেবল প্রচুর দুধ দেয়, যাহার বাছুর হলকর্ষণ বা গাড়ি টানার উপযুক্ত নয়, তাহা কেবল সেই দেশেই কাজে লাগে যেখানে মাংস ছাড়া বলদের অন্য উপযোগিতা নাই, যেখানে বাছুরও শুধু মাংসের জন্যই পালন করা হয়,

যেমন ভারতবর্ষে খাসি। কিন্তু ভারতবর্ষে, যেখানে লোকে গোমাংস খায় না, যেখানে বলদের জন্য অন্য অনেক প্রকারের কাজ আছে, যেখানে বলদ না হইলে চাষীর কোনও কাজই চলিতে পারে না, সেখানে আমাদের এমন গরু চাই যাহা প্রচুর দুধও দিবে আবার ভাল ভাল বাছুরও দিবে। বংশের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি দিলেই ইহা হইতে পারে। আগে আমাদের দেশে এবিষয়ে যথেষ্ট মন দেওয়া হইত। তখন প্রয়োজন মত গোমহিষ উৎপন্ন করিয়াও লইত। আজও আমরা দেখিতে পাই যে এক জাতীয় পশু প্রচুর ভার বহন করিতে ও পরিশ্রম করিতে পারে, কিন্তু খুব জোরে দৌড়াইতে পারে না; আর এক জাতীয় পশু খুব জোরে ছুটিতে পারে বটে, কিন্তু প্রথমোক্ত পশুর ন্যায় অধিক পরিশ্রম করিতে বা ভার বহন করিতে পারে না। কতকগুলি গাভী প্রচুর দুধ দেয় কিন্তু তাহাদের বাছুর ভাল হয় না। আবার কাহারও বাছুর অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু দুধ তত বেশি দেয় না। ভারতের কৃষকদের পক্ষে দুধের জন্য এক প্রকারের আর বাছুরের জন্য অন্য প্রকারের গাভী রাখা সম্ভব নহে। এক গরু দিয়াই উভয় কাজ তাহাদের করাইয়া লইতে হইবে। সুতরাং আমাদের এমন জাতের গরু সম্বন্ধেই উৎসাহ দিতে হইবে, যাহা এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সাহায্য করিতে পারে। আমাদের এমন সব গোশালা চাই যেখানে প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী থাকিবে—যাহাদের ভাল কর্মপটু বাছুরও জন্মিবে। যদি ঠিক ঠিকভাবে গোসেবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে গরু হইতে লাভই হইবে—এবং আপনা হইতেই তাহার বধ বন্ধ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাল গরু হইতে যে আয় হইবে তাহা হইতেই গোশালার দুর্বল, বৃদ্ধ ও রুগ্ন পশুদের ভরণপোষণ চলিবে, এবং মৃত্যুর পর তাহাদের হাড়, চামড়া ইত্যাদির দাম হইতেও এই ব্যয়ের সংকুলান হইবে। তখন দেখা যাইবে গোরক্ষা ও গোসেবাতেই লাভ, গোবধেই লোকসান। তখনই হিন্দু-মুসলমান সকলে, ধর্মভাবে ভাবিত হইয়াই হউক আর স্বার্থবশে চালিত হইয়াই হউক, গোরক্ষার কাজ হিতকর বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিবে। প্রকৃত গোসেবা ও যথার্থ গোরক্ষা তখনই হইতে পারিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৯৪২ সনে জেলে যাইবার আগে ওয়ার্ধা হইতে ফিরিবার পথে, আমি ইতিহাস-পরিষদের অধিবেশনের জন্য কাশীতে নামিয়া গেলাম। ঐ সময়ে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির উপর ইতিহাস লিখিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। সেখানে শোনা গেল, আকবরের সম্বন্ধে এক খণ্ড প্রায় প্রস্তুত। ১৯৪২ সনে আকবরের জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ণ হইবে। স্থির হইয়াছিল যে আকবরের জন্মদিনটিতেই ঐ খণ্ড প্রকাশ করা হইবে। জেলে যাইবার ঠিক আগে এই কাজে অনেক বাধা আসিয়া জুটিল। ছাপা আর কাগজের বিভ্রাট তো ছিলই, তা ছাড়া বোমাবর্ষণের ভয়ে কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের পুস্তকালয় ও সংগ্রহ-শালার জিনিসপত্র সুরক্ষিত করিবার জন্য নিরাপদ স্থানে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে লেখার কাজেও বিশেষ বিঘ্ন জন্মিল। তবু আশা ছিল, বইটি বাহির করা যাইবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা গেল না। আমার গ্রেপ্তারের অল্প দিন পরেই শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালংকারকেও গ্রেপ্তার করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। ফলে সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গেল। আমার কারামুক্তির কয়েক দিন পূর্বে স্যার যদুনাথ সরকার ও মথুরাপ্রসাদজীর ইচ্ছা হইল, ইতিহাস-প্রকাশনের কাজ আবার চালু করা হউক। পণ্ডিতেরা তাঁহাদের লেখা প্রায় শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাকি শুধু প্রকাশনের কাজ। দুই খণ্ড তৈয়ারি ছিল। বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের সঞ্চালক শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীর সহিত কথাবার্তা চলিতেছিল, প্রকাশনের ভার বিদ্যাভবন গ্রহণ করুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সেইজন্য স্থির হইয়াছিল যে, যে দুই খণ্ড প্রস্তুত আছে তাহাই প্রকাশ করা হইবে—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ অলটেকরের লেখা বাকাটক যুগ সম্বন্ধে ষষ্ঠ খণ্ড, আর পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখিত গুপ্তবংশের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড। ষষ্ঠ খণ্ড ছাপাখানায় চলিয়া গিয়াছিল। জেল হইতে ফিরিয়াই আমার মনে হইল, এ কাজটি আর ফেলিয়া রাখা চলে না। সিমলা হইতে ফিরিয়াই আমি কলিকাতায় গেলাম। সেখানে স্যার যদুনাথ সরকার ও ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করিলাম। কথাবার্তা সব ঠিক হইল। এই কাজের জন্যই আরও একবার ঘণ্টা কয়েক কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল, চতুর্থ খণ্ড তখনও ছাপাখানায়।

অল্প কয়েক দিন পরে শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালংকার জেল হইতে ছাড়া

পাইলেন। আমার মনে হইল, এইবার কাজটি তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইবে। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিলেন, বিস্তর অনুনয় সত্ত্বেও তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলেন না। বিদ্যালংকার মহাশয় তখন পর্যন্ত পুরাপুরিভাবে কাজটি হাতে তুলিয়া লন নাই। সেইজন্য কাজটি স্থগিত রাখিতে হইল। আমি জয়চন্দ্রজীর অনুপ্রেরণায় ও স্বর্গীয় বন্ধু কাশীপ্রসাদ জয়সয়ালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এ কাজে হাত দিয়াছিলাম। ইতিহাসে অনুরাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আমার উপর অন্য এত রকম কাজের ভার ছিল যে অবস্থা এইরূপ না দাঁড়াইলে শুধু ইতিহাস প্রীতির জন্য এই ভার গ্রহণ করিতাম না। এই অবস্থাতে স্যার যদুনাথও আমাকে উৎসাহিত করিলেন। এখন তো ঘটনা এমন দাঁড়াইয়াছে যে একাজ কতদিনে শেষ হইবে বলা কঠিন। কিন্তু শেষ যে করাই চাই। বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কাজ করিতেই হইবে, তাহার পর ঈশ্বর জানেন।

১৯৪৬-এর ঘোষণা ও সরকারি পরিকল্পনা

১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল, ভারতের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ আর মিঃ এ. ভি. আলেকজান্ডার ভারতে আসিবেন এবং ভারতের নেতৃবর্গ ও তদানীন্তন ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলি ইহাও বলিলেন যে, যদিও সংখ্যালঘু ব্যক্তিদেরও স্বত্ব রক্ষার চেষ্টা করা হইবে, তথাপি কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেন ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা না জন্মায় তাহা দেখিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হইল যে ইংলন্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। অবশ্য ভারতবর্ষ ইংলন্ডের সহিত যুক্ত থাকিবে, কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবে, ইহা নির্ণয়ের স্বাধীনতা ভারতবর্ষেরই থাকিবে, যদিও ইংরেজ নিশ্চয়ই চাহে যে ভারতবর্ষ ইংলন্ডের সহিত যুক্ত থাকে। ঘোষণা অনেক অংশেই সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইল। অল্প দিনের মধ্যেই ইংলন্ডের তিন মন্ত্রী ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভাইসরয় এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদ

এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহাদের কথাবার্তা হইল। এইভাবে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অনেক দিন লাগিয়া গেল। তখন তাঁহারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট দুইজনকে অনুরোধ করিলেন যে, প্রত্যেকে চারিজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করুন। সিমলা শৈলে ইঁহাদের লইয়া এক সম্মেলনে কথাবার্তা হইবে। দুই পক্ষের আটজনের সহিত ভাইসরয় ও তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী—এই চারিজন মিলিত হইলেন। দিন কয়েক আলোচনা চলিল, কিন্তু কোনও মীমাংসা হইল না। তখন তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, দিল্লীতে ফিরিয়া দেশবাসীর সম্মুখে তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। সকলে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। দিল্লীতে ফিরিবার পর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ১৬ই মে-র বিবৃতি প্রচার করা হইল, তাহাতে তাঁহাদের পরিকল্পনা দেশের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল।

এই পরিকল্পনার মুখ্য অংশ ছিল তিনটি। অনেক যুক্তি দিয়া মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবিকে অবাস্তব বলা হইল; তবে ভারতের সংবিধানে বলা থাকিবে যে পাকিস্তান ভারতেরই অংশ হিসাবে থাকিতে পারিবে, এবং দেশীয় নৃপতিরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই কেন্দ্রীয় সংঘের অধিকারে তিনটি বিভাগ থাকিবে, সেবা ও প্রতিরক্ষা বিভাগ, বিদেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য পররাষ্ট্র বিভাগ, এবং ডাক, তার ইত্যাদির বিভাগ; এই তিন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় বিভাগেরই থাকিবে। অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশগুলির স্বতন্ত্রতা থাকিবে; এমন কি, যে সকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্র হইল না এবং যাহা বাদ পড়িয়াছে তাহা প্রদেশগুলির অধিকারে থাকিবে। দ্বিতীয় অংশে ছিল যে একটি সংবিধান গঠন সমিতি থাকিবে, তাহার উপর সংবিধান গঠনের ভার অর্পণ করা হইবে। তৃতীয় অংশে ছিল অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা।

এই উক্তির মধ্যে স্পষ্টই উল্লেখ ছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যাইবার অধিকার ভারতের থাকিবে। সংবিধান রচনা সমিতির গঠন হইবে নিম্নলিখিত রূপে: প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি লোকসংখ্যার দশ লক্ষে একজন নির্বাচন করিবেন, এবং তাহাদের লইয়া সংবিধান রচনা সমিতি গঠিত হইবে। এই নির্বাচনে মুসলমানগণ ও পাঞ্জাবের শিখগণ স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে, অন্য সকলে একত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। দিল্লী-আজমীঢ়-মাড়োয়ারের প্রতিনিধি বলিতে তাঁহাদেরই বুঝাইবে, যাঁহারা সেই সকল স্থান হইতে নির্বাচিত হইয়া এখন কেন্দ্রীয় পরিষদে আসিয়াছেন। কুর্গ ও বেলুচিস্থানের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে নির্বাচিত হইবেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলিয়া

উঁহাদের প্রতিনিধি কাহারা হইবেন এবং কিভাবে নির্বাচন হইবে, তাহা স্থির করিবেন। উঁহাদের সংখ্যাও দশ লক্ষে একজন এই অনুপাতেই হইবে। এইভাবে ব্রিটিশ ভারতে মোট ২৯২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২১০ জন অমুসলমান, ৭৮ জন মুসলমান ও ৪ জন শিখ থাকিবেন। সমগ্র দেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে—একভাগে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা; একভাগে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান, এবং তৃতীয় খণ্ডে থাকিবে বাংলা ও আসাম। ব্রিটিশ ভারতের সংবিধান রচনা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সদস্যগণ সকলেই যোগ দিবেন। সেই অধিবেশনে সভাপতি-ইত্যাদি পদাধিকারী নির্বাচিত হইবেন, এবং কার্যপদ্ধতিও স্থির করা হইবে। তাহার পর তিন বিভাগের সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে আপন আপন প্রদেশগুলির জন্য এক যুক্ত সংবিধানপত্র রচনা করিবেন। তখন এই তিন স্বতন্ত্র বিভাগ মিলিয়া স্থির কিরবেন, তাঁহাদের সম্মিলিত বিধান রচনা করিবার প্রয়োজন আছে কি না, থাকিলে তাহার বিষয় এবং রূপ কি হইবে। পরে সংবিধান রচনা সমিতির পুনরায় এক যুক্ত বৈঠকে (সেখানে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকিবেন) সমগ্র ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করা হইবে। বিধান রচনার শেষে যখন তাহার অনুসারে প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির সাধারণ নির্বাচন হইবে, তখন নিজেরা স্বতন্ত্র থাকিবার বা যে বিভাগের সহিত তাহাদের জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত যুক্ত বা পৃথক থাকিবার, স্বাধীনতা প্রত্যেক প্রদেশের থাকিবে। সংখ্যালঘু জাতিদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এক পৃথক সমিতি থাকিবে, আর উহার নির্দেশ-গুলি আলোচনা করিয়া বিধান রচনা সমিতির দিক হইতে উপায় ও ব্যবস্থা করা হইবে। সংবিধানে তাহাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিবার উচিত ব্যবস্থা থাকিবে। অন্তর্বর্তী কালের জন্য ভাইসরয় নূতনভাবে তাঁহার কাউনসিলের সদস্য নিয়োগ করিবেন, তাহাতে যথাসম্ভব ভারতের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লওয়া হইবে। যদিও ১৯৩৫ সালের আইন এখনই বদল করা যাইবে না, এবং সেই আইন অনুযায়ী ভাইসরয়ের হাতেই চরম ক্ষমতা থাকিবে, তথাপি যেখানে যতটা সম্ভব কাউনসিলের মতানুসারেই কাজ চলিবে, এবং সাধ্যমত উহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

এই প্রস্তাবে কোনও দলেরই সকল দাবি মানিয়া লওয়া হয় নাই, আবার একেবারে সব কিছু নামঞ্জুর করাও হয় নাই। সকল দলকেই কিছু কিছু দিয়া খুশি রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। লীগের পাকিস্তান দাবি অবশ্য নামঞ্জুর করা হইল, কিন্তু দেশকে এমন তিন ভাগে ভাগ করা হইল যে মুসলিম লীগ যে প্রদেশগুলিকে পাকিস্তানের মধ্যে লইতে চাহিয়াছিল, তাহাদের দুইটি অংশে রাখা হইল, বাকি প্রদেশগুলি লইয়া

এক ভিন্ন বিভাগ হইল। পাকিস্তান মঞ্জুর না হওয়ায় লীগ অসন্তুষ্ট হইল, অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু দেশগুলির এই ভাগ-বাঁটোয়ারা লীগের বেশ পছন্দ হইল, কেননা ইহার মধ্যে তাঁহারা পাকিস্তানের বীজ নিহিত আছে দেখিতে লাগিলেন। অন্য সকলের এইরূপ বিভাগ পছন্দ হইল না, বরং ইহার মধ্যে তাঁহারা সূক্ষ্ম বিবাদের বীজ দেখিতে পাইলেন, যে বীজ ক্রমে বড় হইয়া ধীরে ধীরে পাকিস্তানের রূপ ধারণ করিতে পারিবে। ইহাতে বিরোধ আরও প্রবল হইয়া দেখা দিল, কারণ মুসলমানদের দুই বিভাগের মধ্যে বাংলা আর পাঞ্জাবের যে সব অংশ রাখা হইয়াছিল, সে সকল অংশে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি, আবার আসামকেও ঐ ভাগের মধ্যে ফেলা হইয়াছিল, যদিও আসামে মুসলমানের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক নয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক ডাকা হইল। আর মধ্যে মধ্যে কেবিনেট মিশন ও ভাইসরয়ের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতির, কখনও অন্য সদস্যদের, দেখা-সাক্ষাৎ চলিল। প্রস্তাবের যে সব ত্রুটি ওয়ার্কিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেন তাঁহারা সে সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহারা রায় দিলেন যে, যে বিভাগের মধ্যে প্রদেশগুলি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে প্রদেশগুলির তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবার কোনই বাধ্য-বাধকতা নাই। একথা তো স্পষ্টই বলা ছিল যে, সংবিধান রচনার পর প্রদেশগুলি যুক্ত থাকিতেও পারে, স্বতন্ত্র থাকিতেও পারে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তখন বলিতে চাহিলেন ইহা ছাড়াও বিধান রচনার জন্য যে কমিটি বসিবে, তাহার পৃথক অধিবেশনে যোগ না দিবার স্বাধীনতাও প্রদেশগুলির আছে। আসাম ও সীমান্ত প্রদেশ, উভয় প্রদেশই, জোর করিয়া বিভাগগুলির মধ্যে মিশাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল—তাই উহাদের এই অধিকার পাওয়া চাই যে তাহারা প্রথম হইতেই বিভাগগুলি হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটির বক্তব্য ছিল যে সমস্ত পরিকল্পনা পড়িলে এই অর্থই হয়।

কেবিনেট মিশন মত দিলেন যে, তাঁহাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে আরম্ভ হইতেই প্রদেশগুলি যোগ না দেয়, কিন্তু বিধান গঠিত হওয়ার পরে প্রদেশগুলির পৃথক হইয়া থাকার অধিকার অবশ্যই আছে।

ওয়ার্কিং কমিটি নিজেদের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রহিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, তাঁহাদের মত অনুসারেই এই পরিকল্পনা কাজে লাগাইবেন। আবার মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবের কড়া সমালোচনা করিলেন। বলিলেন যে, পাকিস্তান নামঞ্জুর করার কোনও যুক্তি নাই; তবে ইহার মধ্যে পাকিস্তানের বীজ নিহিত আছে দেখিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের আশায় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া অন্তর্বর্তী শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গোড়ায় ভাইসরয়ের মত ছিল যে, বারোজন সদস্য লইয়া এক গভর্নমেণ্ট চালু হউক, তাহার মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু, পাঁচ জন মুসলমান ও অপর দুইজন সদস্য থাকিবেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাবে কোনও মতেই রাজী হইলেন না। প্রথম কারণ, হিন্দু-মুসলমান সদস্যের সংখ্যা সমান ধরা হইল, অথচ হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশি, প্রায় তিন গুণ। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে সিমলা কনফারেন্সে লর্ড ওয়াভেল যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে মুসলমান ও হরিজন প্রতিনিধি ছাড়া পাঁচ জন হিন্দুর স্থান ছিল, আর অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা দুইয়ের অধিক ধরা ছিল। এইভাবে শুধু হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যার সমতার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু এই প্রস্তাব লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবও কংগ্রেস শুধু যুদ্ধকালীন বলিয়া কোনও মতে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এখন তো যুদ্ধের সময়ও নয়। কংগ্রেস এখন সেই চাপ হইতে মুক্ত; এখন কি করিয়া তাহার এই প্রস্তাব মানিয়া লওয়া চলে? কংগ্রেসের মতে পনরো জন সদস্য লইলে সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধি লওয়া হয়, আর সকল দলকেই সন্তুষ্ট রাখা যায়।

ভাইসরয় বারো জনের স্থানে তেরো জন প্রতিনিধি লওয়ার কথা বলিলেন, তাহার মধ্যে পাঁচ জন মুসলমান, এক জন হরিজন, পাঁচ জন হিন্দু, আর দুই জন অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিবে। কংগ্রেস ইহাও নামঞ্জুর করিলেন। তখন ভাইসরয় ও কেবিনেট মিশনের যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইল, কংগ্রেস ও লীগ, দুই দলের সম্মতি লইয়া সরকার গঠনের প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে, এখন মিশন নিজের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন। ১৯৪৬ সনের ১৫ই জুন তারিখে এই প্রস্তাব ঘোষণা করা হইল। তাহাতে চৌদ্দ জনের নাম থাকিল, ভাইসরয় এই চৌদ্দ জনকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন। তাহার মধ্যে পাঁচ জন লীগের মুসলমান, পাঁচ জন বর্ণহিন্দু (অ-হরিজন), এক-একজন কংগ্রেসী হরিজন, শিখ, খ্রীষ্টান ও পারসীর নাম ছিল। আলাপ-আলোচনার সময় ভাইসরয় মাঝে মাঝে জওয়াহরলাল নেহেরুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতেন, তাঁহার কাছেও নাম চাহিয়াছিলেন, তিনিও কয়েকটি নাম দিয়াছিলেন। হরিজন ও কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহাদের নাম ছিল, তাঁহাদের একজন ছাড়া আর সকলের নামই পণ্ডিতজীর দেওয়া। খ্রীষ্টান ও শিখ প্রতিনিধিদের নামও পণ্ডিতজীই দিয়াছিলেন। মুসলমানদের পাঁচ জনের মধ্যে চারজনের নামও তাঁহারই দেওয়া নাম হইতে। কেবল লীগের বাহিরের একজন মুসলমানের পরিবর্তে লীগভুক্ত একজনের নাম, কংগ্রেসী

হিন্দুর মধ্যে একজনের স্থানে অন্য একজন কংগ্রেসী হিন্দুর নাম ও পারসী প্রতিনিধির নাম ভাইসরয় নিজে নির্বাচন করেন।

যখন আমরা এই প্রস্তাব মানিয়া লইব কি না বিবেচনা করিতে-ছিলাম, এমন সময় ভাইসরয়ের সঙ্গে মিঃ জিন্নার একবার সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহার কতকগুলি কথা ভাইসরয় মানিয়া লইলেন— একথা সংবাদ-পত্রে কোন-না-কোনও ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে আমরা চমকিয়া উঠিলাম। কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে ভাইসরয় শুধু সেই সব কাগজেরই প্রতিলিপি পাঠাইলেন, যাহার মধ্যে তিনি মিঃ জিন্নার দাবি মানিয়া লইয়াছেন। ইহার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই ছিল যে, গভর্ন-মেণ্টে চৌদ্দ জনের অধিক সদস্য থাকিবে না, সংখ্যালঘুদের স্থান শূন্য হইলে সেই স্থান পূরণ করিবার সময় লীগের মত লইতে হইবে, লীগের ভোট দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন লোককে নিযুক্ত করা চলিবে না। কার্যত শুধু সরকার সংগঠনে নয়, প্রাত্যহিক কোনও কাজকর্মও লীগের বিনা অনুমতিতে করা চলিবে না। যখন ভাইসরয় আমাদের নির্বাচিত অ-মুসলিম লীগভুক্ত মুসলমান প্রতিনিধির নাম ছাঁটিয়া দিলেন, এবং পরিষ্কার বোঝা গেল যে লীগভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ-এর কম হইবে না, তখন ওয়ার্কিং কমিটির মনে হইতে থাকিল যে কংগ্রেস নিজের পাঁচজন সদস্যের মধ্য হইতেই একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম করিবে। আমাদের মনে হইতেছিল যে ভাইসরয়ের পত্রেই বুঝি আছে যে কংগ্রেস যেন মুসলমানদের নামের তালিকা না দেয়, কারণ তাহা মঞ্জুর করা সম্ভব হইবে না। ওয়ার্কিং কমিটি পর্যন্ত এই পরিস্থিতি কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিত না, কারণ ইহা মানিয়া লইলে তাহার অর্থ দাঁড়াইত যে কংগ্রেস শুধু হিন্দুর, মুসলমানের নয়, এবং মুসলিম লীগই শুধু মুসল-মান প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে।

এই সব নানা দিক বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই জুন ৪৬-এর ঘোষণা অনুযায়ী সাময়িকভাবে সরকার গঠনের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিলেন। তখন প্রশ্ন হইল, সংবিধান রচনাকারী কমিটি গঠনের প্রস্তাব সম্বন্ধে কি করা হইবে? উহার দোষ-ত্রুটির কথা তো আমরা বলিয়া দিয়াছি, এই প্রস্তাবের মর্ম আমরা যেরূপ বুঝিয়াছিলাম তাহাও বলা হইয়াছে। একথাও বলা হইয়াছে যে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি সেইভাবেই আমরা উহার ব্যাখ্যা করিব। অর্থাৎ, আমাদের মত অনুযায়ী কাজ করার কথা বলিয়া আমরা তো ইহাকে একরূপ স্বীকার করিয়াই লইয়াছি, কিন্তু স্পষ্ট কথায় কোনরূপ পরিষ্কার মীমাংসা করা হয় নাই। সেজন্য বিষয়টি লইয়া আর একবার বিশেষ আলোচনা করা দরকার। কমিটির মধ্যে যাঁহারা এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে অরাজী, সেই দুই-চারিজন ভিন্ন আর সকলে

প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষেই ছিলেন। বিশেষত মহাত্মা গান্ধী সাগ্রহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে আসাম হইতে এক তার আসিল। তাহাতে বলা হইল যে বাংলা দেশে সংবিধান রচনা সমিতির গঠন নির্বাচনের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে নির্বাচনপ্রার্থী প্রত্যেককে যে ধারা অনুযায়ী শপথ করিতে হইবে, সেই ধারায় অন্য নানা কথার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে তিন ভাগে ভাগ করার উল্লেখও রহিয়াছে। তার যিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহার মতে ইহার এই অর্থ দাঁড়ায় যে, নির্বাচনপ্রার্থীকে প্রথম হইতেই এই দেশ বিভাগের কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আসাম, এবং শুধু আসাম কেন, আমরা সকলেই এই সব বিভাগের মধ্যে যাওয়ার বিরোধী ছিলাম। ইহাতে আশঙ্কা দেখা দিতে লাগিল, কিন্তু কোনও মত স্থির করা গেল না, কারণ তখন পর্যন্ত নিয়মগুলি সব ভাল করিয়া দেখা যায় নাই; যদিও নমুনা হিসাবে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্রদেশগুলিতে যে নিয়মাবলী পাঠানো হইয়াছিল, তাহার নকল সরকার আমাদের নিকটেও পাঠাইয়াছিলেন।

ঐ দিনের কাজ শেষ করিবার সময় হইয়া গিয়াছিল, সেই দিনকার মত তাই আলোচনা স্থগিত রহিল। মনে করিলাম, ইতিমধ্যে আমরা নিয়মাবলীর ভাল-মন্দ ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া রাখিব। মহাত্মাজীর মনে ঐ তারের জন্য আশঙ্কা হইল। প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি সেই কথা বলিলেন। ফলে বোঝা গেল, কংগ্রেস এই প্রস্তাবেও রাজী হইবে না। পরের দিন আমরা একত্র হইলাম। আমাদের মতে, তার-প্রেরক যে অর্থ বাহির করিয়াছেন নিয়মাবলীর সেই অর্থ হয় না। ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর সঙ্গে কেবিনেট মিশনের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারাও বলিলেন, ঐ প্রতিজ্ঞার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় না; তবু যদি কোনও রকমে এই ব্যাখ্যা করাও হয় আর যদি কথাগুলিতে মহাত্মাজীর নৈতিক আপত্তি থাকে, তবে সেই সকল কথা তাঁহারা বদলাইয়া দিবেন, ও অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। কারণ তাঁহাদের ঐরূপ অভিপ্রায় মোটেই ছিল না।

নিয়মের পরিবর্তন করাও হইল। আমরা তখন সেই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইলাম। এইভাবে ব্যাপার এখন দাঁড়াইল যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৬ সনের ১৬ই মের দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা মানিয়া লইলেন। যদিও মানিয়া লইবার সময় উহার দোষত্রুটিগুলির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই, এবং ঐ ব্যবস্থার যে অর্থ করা হইয়াছিল তাহাও ছাড়া হয় নাই, তথাপি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন-সম্বন্ধীয় ১৬ই জুনের ,প্রস্তাব অস্বীকার করা হইল। প্রস্তাবের প্রতিলিপিসহ এই সিদ্ধান্ত পত্রযোগে ভাইসরয় ও কেবিনেট মিশনকে জানানো হইল। অপর-দিকে লীগ তো দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাব আগেই মানিয়া লইয়াছিলেন, এখন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের মীমাংসার অপেক্ষা করিতেছিলেন। যেদিন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঐখানে পৌঁছিল, সেইদিন মিঃ জিন্নার সঙ্গে ভাইসরয়ের কথাবার্তা চলিতেছিল, ভাইসরয় আমাদের পত্র তাঁহাকে দেখাইলেন। ১৬ই জুনের প্রস্তাবে ছিল যে, যদি কোন দল এই প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহা হইলেও ভাইসরয়ের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে, এবং যে যে দল ১৬ই মের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছে তাহাদের প্রতিনিধি লইয়াই ভাইসরয় সরকার গঠন করিতে পারিবেন। এখন ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, কংগ্রেস ও লীগ দুই-ই ১৬ই মের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাই ১৬ই জুনের প্রস্তাবের আট দফা অনুসারে এই দুই দলের প্রতিনিধি লইয়াই ভাইসরয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে পারিবেন, আর ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, সেদিনকার সাক্ষাতের সময়ে বড়লাট মিঃ জিন্নাকে সে কথা বলিয়াও দিয়াছিলেন।

লীগ দল তো আশা করিয়াছিল যে কংগ্রেস যদি ১৬ই জুনের প্রস্তাব অস্বীকার করে তবে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগেরই প্রাধান্য থাকিবে, আর কংগ্রেসীরা গভর্নমেণ্টের বাহিরে থাকায় ক্ষমতা লীগের হাতেই আসিয়া যাইবে। জিন্না-ভাইসরয়ের সেই সাক্ষাতের সময় পর্যন্ত ১৬ই জুনের পরিকল্পনা লীগও গ্রহণ করে নাই; কারণ উহা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করিতেছিল। ভাইসরয়ের এই কথায় তাহাদের খটকা লাগিল, তাহা হইলেও তাহারা সে রাত্রে সিদ্ধান্ত করিল যে ১৬ই জুনের পরিকল্পনাও লীগ গ্রহণ করিতেছে। পরের দিন ভাইসরয় ও কেবিনেট মিশন ঘোষণা করিলেন যে ১৬ই জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে কংগ্রেস অস্বীকার করিয়াছে, তাই তাহার অষ্টম দফা অনুসারে এখন কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের প্রতিনিধি লইয়া ভাইসরয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিবেন—কিন্তু যেহেতু কেবিনেট মিশনকে অবিলম্বে ইংলণ্ডে ফিরিতে হইবে এবং এই সরকার গঠন করিতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে, তাই ততদিন শুধু সরকারি কর্মচারী লইয়াই কাজ চালাইবার মত গভর্নমেণ্ট গঠন করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কেবিনেট মিশন ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন, একটি কাজ চালানো গভর্নমেণ্ট গঠিত হইল।

ভাইসরয় ও কেবিনেট মিশনের এই মীমাংসায় লীগের ঘোর অসন্তোষ হইল। উহার নেতারা কড়া কড়া মন্তব্য করিলেন। লীগ-কাউনসিলের এক অধিবেশন ডাকা হইল। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল, কংগ্রেস ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই, উহার এমন কঠোর সমালোচনা করিয়াছে এবং কদর্থ করিয়াছে যে তাহা অগ্রাহ্য করারই মত—নিজেদের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে যে উহারা দেশবিভাগ মানে না, অথচ দেশবিভাগই তো এই প্রস্তাবের গোড়ার কথা। এই গোড়া ভাঙিয়া দেওয়ার

জন্যই তো কংগ্রেস এই সংবিধান রচনা সমিতিতে যাইতে চায়। ইতিমধ্যে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হইল, তাহার নবানবাচত কমিটিতে নেহরু হইলেন সভাপতি। সেই অধিবেশনে কংগ্রেস-সোস্যালিষ্ট দলের বিরোধের পরেও কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিলেন। তাহার পর বিভিন্ন প্রদেশের বিধানসভাগুলিতে সংবিধান রচনা সমিতির সদস্য নির্বাচন আরম্ভ হইল। এই নির্বাচনে কংগ্রেস তাহার বাহির হইতেও বিশিষ্ট লোকদের সদস্য নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করিলেন। তাহা ছাড়া অন্য লোকও নির্বাচিত হইলেন। মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সব প্রদেশেই বিধানসভায় শুধু লীগ দলেরই লোক ছিলেন, সেইজন্য লীগের সদস্যেরাই প্রায় নির্বাচিত হইলেন, কারণ মুসলমানই মুসলমানকে নির্বাচন করিতে পারিতেন। সীমান্ত প্রদেশ হইতে তিনজন মুসলমানই নির্বাচিত হইবার ছিল—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও খান আবদুল গফর খান নির্বাচিত হইলেন। যুক্তপ্রদেশে শ্রীরফি আহমদ কিদোয়াই, দিল্লীর শ্রীআসফ আলি আর বাংলা দেশের শ্রীফজলুল হক, লীগের বাহিরের এই কয়জন নির্বাচিত হইলেন। বিহারের কোন মুসলমান নির্বাচিত হইতে পারিলেন না। বাংলাদেশ হইতে ডাঃ আম্বেদকর নির্বাচিত হইলেন। বাছিয়া বাছিয়া কংগ্রেসের প্রধান প্রধান লোক, প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ আর পুরাতন দেশভক্ত লোক বিধান রচনা পরিষদে লওয়া হইল। লীগও এই নির্বাচনে যোগ দিলেন। লীগের মেম্বারগণ আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিলেন। মিঃ জিন্না পাঞ্জাব হইতে নির্বাচিত হইলেন।

নির্বাচনের পরে লীগ-কাউন্সিলের এক বৈঠক বসিল। সেই বৈঠকে লীগ স্থির করিলেন যে তাহারা ১৬ই মে এবং ১৬ই জুনের দুই প্রস্তাবই অস্বীকার করিবেন, যে সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা এই প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যাহার করা হইবে। আরও স্থির হইল যে পাকিস্তান স্থাপনের জন্য তাঁহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (ডাইরেক্ট এক্শান) আরম্ভ করিবেন। তখনকার মতো ইংরেজ রাজের দেওয়া উপাধিগুলি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মেম্বারদের নির্দেশ দেওয়া হইল। বৈঠকে ইংরেজ সরকার এবং কংগ্রেস উভয়ের বিরুদ্ধে কড়া কড়া বক্তৃতা হইল। মনে হইল যেন, সে উভয়কেই আক্রমণ করিবে। ইহার পরেই ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হইল। সেই অধিবেশনে পুনরায় পরিষ্কার ভাষায় ১৬ই জুনের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লওয়া হইল।

এখন ভাইসরয়ের সামনে পরিস্থিতি দাঁড়াইল এই যে, একদিকে কংগ্রেস ১৬ই মের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল, কিন্তু ১৬ই জুনের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইল। অপর দিকে, লীগ তাহার কাউন্সিলের অধিবেশনে নূতন আপত্তি তুলিয়া এই দুই প্রস্তাবই অস্বীকার করিল। এজন্য, লীগকে

বাদ দিয়াই ১৬ই জনুের অষ্টম বিধি অনুযায়ী তর্বতীকালীন গভর্নমেণ্ট কায়েম করা স্থির হইল। ভাইসরয় জওয়াহরলাল নেহেরুকে এই অন্তর্কালীন সরকারের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। পণ্ডিতজী মিঃ জিন্নাকে এই সরকারে আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মিঃ জিন্না সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কাজেই লীগকে বাদ দিয়াই সরকারের জন্য নাম বাছাই করা ভিন্ন পণ্ডিতজীর সামনে অন্য পথ রহিল না। ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি নামের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই কাজে সহায়তার জন্য দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির পার্লামেণ্টারি সাব-কমিটির এক বৈঠক ডাকিলেন। এই কমিটির তিন জন সভ্য ছিলেন—সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আর আমি।

কলিকাতার হত্যাকাণ্ড

আমরা এই নাম বাছাইয়ের কাজে ব্যাপৃত আছি, এমন সময় খবর আসিল, কলিকাতায় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লীগ আপনার নূতন নীতি প্রচারের জন্য ১৬ই আগষ্ট ঠিক করিয়াছে। ঐ দিন সর্বত্র হরতাল ও সভাসমিতি করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলিকাতায়ও হরতাল ইত্যাদি হওয়ার কথা ছিল। বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশে তখন লীগ সরকার কায়েম ছিল। ঐ দুই প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলী ঐ দিন অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট সাধারণভাবে সরকারি ছুটি ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেজন্য আপিস, আদালত, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিও বন্ধ করা হইল। কংগ্রেস প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর যাবৎ হরতালের জন্য দিন স্থির করিয়া আসিতেছিলেন, বহু স্থানে পূর্ণ হরতালও পালিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ হরতাল সরকারের বিরুদ্ধেই হউক বা সরকারের কর্তৃত্ব উহার হাতেই থাকুক, সরকার হাতে আছে বলিয়াই তাহার দরুন এই হরতালে কংগ্রেস কোন সুবিধা কখনও গ্রহণ করে নাই। লীগ কিন্তু প্রথম সুযোগেই অধিকারের অপ-প্রয়োগ করিল। লোকমাত্রেই ইহার বিরোধিতা করিল। স্পষ্টই বলা হইল যে, আপিস, কাছারি বন্ধ থাকিলে বহু লোকের অবসর থাকিবে এবং হরতাল, সভা-সমিতি, মিছিল সব কিছুতে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। বাংলা দেশে প্রকাশ্য জনসভা করিয়াও এই কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি কাহারও কথায় কান দিলেন না, বরং উত্তর দিলেন যে, শান্তি বজায় রাখিবার জন্যই

ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ দিন প্রভাত হইতেই দোকান-পাট বন্ধ রাখিবার জন্য লোকের উপর জবরদস্তি চলিল, সঙ্গে সঙ্গে লুটতরাজ, খুনখারাবিও সুরু হইল।

গভর্নমেণ্ট ১৬ই আর ১৭ই আগষ্ট দুপুর বেলা পর্যন্ত এই ব্যাপার বন্ধ করার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিলেন না। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক মরিল, হাজার হাজার দোকান লুটপাট হইল, এবং আগুনে পুড়িয়া গেল। তখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল কিন্তু ততক্ষণে দাঙ্গা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। চার দিনব্যাপী জোর মারামারি খুনাখুনি চলিল।

শোনা যায় ছয়-সাত হাজার লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল। দুই-তিন দিন পর্যন্ত রাস্তায় ঘাটে লাশ পড়িয়া রহিল। এখান ওখান হইতে প্রায় তিন হাজার মৃতদেহ সরান হইল—আরও শোনা গেল যে, বহু মৃতদেহ মাটির নীচে, নালার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের দুর্গন্ধে পথ চলা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আগুনে পোড়া ঘরগুলির মধ্যে আর হুগলী নদীর ভিতরে কত যে মড়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। শুনা যায় হাওড়ার পুলের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া বহু লোককে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারা হইয়াছে। শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক কাহারও প্রতি দয়া করা হয় নাই, নির্বিচারে সকলকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করা হইয়াছে। আজ নয় দিনের দিন। এখন অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে। এখনও পুলিশ আর সেনাবাহিনীর কড়া পাহারা। তবু এদিক ওদিকে কিছু কিছু চলিতেছে। খাস কলিকাতার উপরে এই রকম হত্যাকাণ্ড আর কখনও হয় নাই। বোধ হয় নাদির শাহের দিল্লী হত্যাকাণ্ডের পর ভারত-বর্ষের ইতিহাসেই আর এই রকম ব্যাপার ঘটে নাই। সেই হত্যাকাণ্ডে কত লোকের প্রাণ গিয়াছিল তাহার সঠিক হিসাব আজও জানা যায় নাই: লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন, সম্প্রতি একবার বলিয়াছিলেন যে এমন অবস্থা করিয়া তুলিবেন যাহা চেঙ্গিজ খাঁর আমলেও করা হয় নাই। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কিছু নমুনা পাওয়া গেল। কলিকাতার বাহিরেও কোথাও কোথাও সেই দিন এই দাঙ্গা চলিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার ঘটনার তুলনায় সে সব তুচ্ছ। তবে এখন শোনা যাইতেছে যে ঢাকা, বেনারস, এলাহাবাদ, রাণীগঞ্জ, দিল্লী এবং এরকম আরও কয়েক জায়গায় কিছু কিছু লাগিয়াই আছে। তবে সরকারি কর্মচারীরা অবস্থা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন। এখন তো মিঃ সুরাবর্দিও এই কাজে হাত দিয়াছেন আর শান্তি স্থাপনের জন্য আবেদন করিতেছেন। হিন্দীতে একটা কথা আছে, "সতরটা ইঁদুর মেরে খেয়ে বেড়াল এখন চলল মক্কা"। কলিকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে ইংরেজি দৈনিক 'স্টেট্‌স্‌ম্যান', যাহা বরাবর লীগেরই পোষকতা করিয়া আসিতেছিল, লিখিল যে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে

লীগের অযোগ্যতা প্রমাণিত হইয়া গেল, এইবার উহাদের সরিয়া পড়া দরকার। ইংলণ্ডের 'টাইম্‌স্‌' প্রভৃতি অনেক কাগজে এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হইল। দেশীয় কাগজগুলির তো কথাই নাই। এত সত্ত্বেও লীগদলের চৈতন্য হইল না। ১৯৩৭-৩৮ সনের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে যাহারা বিনা কারণে এত আন্দোলন সুরু করিয়াছিল সেই লীগই আজ এই অশ্রুতপূর্ব ও ভীষণ অত্যাচারের কথায় একেবারে চুপ করিয়া রহিল, অথচ এই ব্যাপারে স্পষ্ট তাহাদের হাত না থাকিলেও পরিষ্কার সমর্থন ও উৎসাহ তো ছিলই। মিঃ জিন্না শুধু বলিলেন যে অপরাধীর সাজা অবশ্যই হইবে, তবে পুরাপুরি রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কাহার দোষ তাহা ঠিক বলিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার বিশ্বাস লীগভুক্ত লোকেরা নিশ্চয় লীগের হুকুমের বিরুদ্ধে যায় নাই এবং যদি কেহ সেরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে তবে প্রাদেশিক লীগ সরকার অবশ্যই তাহার শাসনের ব্যবস্থা করিবেন। উঁহাদের মুখ্য পত্রিকা 'ডন' তো সব কিছুকেই অনেক লঘু করিয়া ছাপাইল, এবং শুধু খবরটা দেওয়া ছাড়া এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করিল না। এই ব্যাপারে সারা দেশময় একটা চঞ্চলতা ও ত্রাসের সঞ্চার হইল। এমনও শোনা যাইতে লাগিল যে গোড়ায় তো হিন্দুই বেশি মারা পড়িয়াছে, কিন্তু পরে যখন সরকার হইতে হিন্দুদের কোন রকম সাহায্যই মিলিল না তখন উহারাও আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য লাগিয়া গেল; ফলে হয়তো মৃতের সংখ্যা মুসলমানের মধ্যেই বেশি। যাহা হউক, হিন্দুই অধিক মারা যাক, কি মুসলমানই অধিক মারা যাক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যাহারা মরিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই নির্দোষ, যাহারা দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল না, কিন্তু দাঙ্গাকারীর হাতের শিকার হইয়া মারা পড়িল। কোটি কোটি টাকা নষ্ট হইল, বেশির ভাগ টাকাই গেল হিন্দুর। বহু হিন্দুর ঘর-সম্পত্তি লুট হইল। এখন পর্যন্ত এই ব্যাপার চলিতেছে। দেখা যাক কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে আরও কত কি হয়।

অস্থায়ী সরকারের পূর্বাহ্নে

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার স্থাপনার জন্য কথা চলিতেছে, ওদিকে খুন-খারাবি চলিয়াছে। ভাইসরয় আর পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু ঠিক করিলেন যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য সরকার গঠনের কাজ যেন বন্ধ করা না হয়। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি ভাইসরয়ের কাছে অন্ত-র্বর্তী সরকারের জন্য নাম পাঠাইয়া দিয়াছেন, আজই তাহা কাগজে ছাপা

হইবে। ঐ তালিকায় আমার নামও আছে। আজ হইতে এক সপ্তাহ পরে এই তালিকায় যাহাদের নাম আছে তাহারা গভর্নমেণ্টের কাজকর্ম চালাইতে থাকিবেন, সুতরাং আজ পর্যন্ত লিখিয়াই এই কাহিনী সমাপ্ত করিতে চাই।

ইঁহারা তো সিমলায়ও আমার নাম দিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, আমার বেশ একটু দ্বিধা ছিল, কিন্তু পূজনীয় বাপুজীর কথায় পরে সম্মত হইলাম। একটি নৈতিক দ্বিধা আমার মনকে আলোড়িত করিতে-ছিল; তখন যুদ্ধ চলিতেছে, মন্ত্রিমণ্ডলে যাওয়ার অর্থ হইবে ঐ যুদ্ধে সহায়তা করা। সিমলা কনফারেন্স ভাঙিয়া যাইবার অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সেজন্য এখন আর নৈতিক দ্বিধা-সঙ্কোচের কোন কারণ রহিল না। আর, পণ্ডিত নেহেরু তো আগেই আমার নাম পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেজন্য ১৬ই জুনের প্রস্তাবেই আমার নাম গিয়া-ছিল যদিও উহা প্রত্যাখ্যানের পর কথাটা স্থগিত ছিল। ইতিমধ্যে আবার যখন কথাবার্তা সুরু হইল তখন মনে হইল, অন্তর্বর্তী সরকারে পণ্ডিতজীর মন্ত্রিমণ্ডলে নাম গেলেও পরে মীরাট কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য আমার নাম খালি রাখা হইবে। কেহ কেহ মনে করিলেন, আমাকে বিধান-নির্মাণ-সমিতির সভাপতি করা হইবে, গভর্নমেণ্টে কোন আসন দেওয়া হইবে না। আমার এ বিষয়ে বলিবার কিছু ছিল না, যাহা কিছু ঠিক হইবে তাহাতেই আমি রাজী আছি। তবে আমার পছন্দ অপছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দুইটির মধ্যে অস্থায়ী সরকারের মধ্যে যাওয়াই বেশি পছন্দ। কিন্তু আমার রুচির উপর এই কথা নির্ভর করিল না। সকলের বিচারে আমাকে সভাপতির পদ দেওয়াই স্থির হইল। আমার নাম দেওয়া হইল। এই সব কথা দিল্লীতে আমার সামনেই ঠিক হয়। আমি বিশ্রামের জন্য পিলানী চলিয়া আসিলাম। ওখান হইতে একদিনের জন্য জয়পুর গিয়াছিলাম। জয়পুরেই তার-যোগে আহ্বান আসিল। সেখান হইতেই দিল্লী চলিয়া গেলাম। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যখন কাহার কাহার নাম দেওয়া হইবে স্থির হইয়া গেল তখন পিলানী ফিরিয়া গেলাম। যতদিন আবার ডাক না আসে এখানে থাকিব মনে করিয়াছিলাম। মনে হইল, আগষ্টের শেষাশেষি পর্যন্ত এখানে থাকিতে পারিব, কেননা ইহার আগে আর সরকার গঠনের সময় হইবে না। কিন্তু এইখানে পৌঁছিয়াই মনে পড়িল যে ২৭শে আগষ্ট (১৯৪৬) ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজী আসিতেছেন সুতরাং ২৭শের মধ্যে দিল্লী পৌঁছিতেই হইবে।

গত ২৬ বৎসর যাবৎ দিন-রাত কংগ্রেসেরই কাজে লাগিয়া রহিয়াছি। কেবল অসুস্থ হইয়াই বাড়ী যাইতাম। ভাইয়ের মৃত্যুর পর দিন-কতক বাড়ীর কাজে সময় দিয়াছিলাম, তাহা ভিন্ন সংসার হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম। নিজের থাকিবার জন্য কখনও কোথায়ও ভিন্ন ব্যবস্থা

কার নাই। হয় আশ্রমে থাকিয়াছি, নয় যেখানে যখন গিয়াছি বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে থাকিয়াছি। পাটনায় দুই-চারি দিন মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে কাটাইয়াছি। এই এক ধরনের জীবন কাটিয়াছে। কখনও কোন আপিসে বসিয়া কাজ করি নাই। কিছুদিন পাটনা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়া ঐ আপিসের দপ্তরে বসিয়াছি তবে তাহা এত অল্প দিনের জন্য যে উহা গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে। কংগ্রেসের কাজ পরিচালনার ভার অবশ্য লইতে হইয়াছে, তবে সেখানেও দপ্তরের কাজ অপেক্ষা জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিবার কাজই বেশি আর সেই কাজ একেবারেই অন্য ধরনের। এবার এক নূতন জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে। এখন এই কাজে মাসিক বেতন-রূপে অর্থও আসিবে। অবশ্য জানি না, এই বিষয়ে কংগ্রেস কি নির্দেশ দিবেন—এই টাকার কতটা গ্রহণ করিব আর কিভাবে খরচ করিব।

তাছাড়া, যে সকল কঠিন সমস্যা দেখা দিবে তাহাদের মীমাংসাই বা কি ভাবে করিব। আমাকে কোন্ দপ্তর দিবে তাহাও জানি না।' প্রথমে শুনিয়াছিলাম আমাকে কৃষি ও খাদ্য বিভাগ দেওয়া হইবে। আমি চলিয়া আসার পর পণ্ডিতজী আর ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর আমাকে কোন্ বিভাগ দেওয়া স্থির হইয়াছে তাহা জানি না। এই বিভাগই যদি পাই তবে আমার মনোমত হইবে। যদিও অন্ন-সমস্যা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই সময়ে তাহা সামলানো সহজ হইবে না।

আমার ইচ্ছা ছিল, কাজে যোগ দেওয়ার আগে একবার পাটনা ও রাঁচি ঘুরিয়া আসিব কিন্তু সম্ভবত সময় হইবে না। রাঁচি যাওয়া খুবই দরকার। জনার্দনের ছেলে শ্রীমান সূর্যপ্রকাশ দীর্ঘদিন রোগে ভুগিতেছে। ঐ অসুখের জন্য বোম্বাই হইতে তাহাকে পাটনায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বোম্বাই, পাটনা কোথায়ও ডাক্তার উহার রোগ ভাল করিতে পারিলেন না। তারপর উহাকে রাঁচি পাঠান হইয়াছে। এই তো প্রায় দশ মাস হইল। আড়াই বৎসর মাত্র বয়সের শিশুটি বড়ই কষ্ট পাইতেছে। প্রতিদিন জ্বর আসে। খুব কাসিও ছিল। ফুসফুসের কিছু দোষ ছিল। এখন শুনিতেছি সেই দোষ একটু কমিয়াছে। এখন কোমরে ঘায়ের মত দেখা দিয়াছে। উহাকে একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা প্রবল। জনার্দনও এখন চাকুরিস্থল বোম্বাই ফিরিয়া গিয়াছে। দেখি, কি করা যায়। এই তো পরিস্থিতি, ইহার মধ্যেই নূতন কাজ আরম্ভ করিতে হইতেছে।

নূতন নূতন লোকের মধ্যে এমন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হইবে যাঁহারা বা যাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা আমাদের সঙ্গীদের জেলে আটক রাখিয়াছিলেন, —আমাদের সঙ্গে নানা প্রকারের কঠোর ব্যবহারও করিয়াছিলেন। তবে আমার মনে কাহারও প্রতি কোন বিরূপতা নাই, এবং আমার মনে হয় আমি সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে পারিব। তবে গভর্ন-

মেণ্টের বাহিরেও অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা আছে। জানি না লীগ কি করিবে, আর জনসাধারণের বা কি মতি হইবে। আমি যদি সততার সঙ্গে আর বিনা পক্ষপাতে সকলের সেবা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই ফল শুভ হইবে। আমার তো এই আশা, এখন ঈশ্বরের হাত।

সমাপ্ত

পিলানী
১৪ আগষ্ট ১৯৪৬

পরিশিষ্ট

এই ডায়েরী আমি কখন হইতে লিখিতে সুরু করিয়াছি আর কিভাবে লিখিয়াছি তাহা এই পুস্তকের 'বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও ভারতের অখণ্ডতা' অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি। পুস্তকের শেষে বলিয়াছি যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার আগেকার পরিস্থিতি ইহাতে লেখা হইয়াছে। আজ হইতে চারি মাস পূর্বে আমি বইটি শেষ করিয়াছি। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়াছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হইয়াছে—তাহাদের বিষয়ে বইয়ের পরিশিষ্টে কিছু বলা ভাল মনে করিতেছি।

১৯৪৬ সনের ২রা ডিসেম্বর এই সরকার চালু হইল। ইহার মধ্যে মন্ত্রী হইলেন ১২ জন—সর্বশ্রী জওয়াহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শরৎচন্দ্র বসু, রাজাগোপালাচারি, আসফ আলি, ডক্টর মাথাই, জগজীবন-রাম, শফত আহমদ খাঁ, সর্দার বলদেও সিং, ভাভা, আলি জহীর আর আমি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীজগজীবনরাম আর আমি—এই তিনজন ঐ সময় বিড়লা ভবনে বাস করিতেছিলাম। বিড়লা ভবনে আমাদের সম্বর্ধনা করা হইল আর গভর্নমেণ্ট হাউসে রওনা করা হইল। সেখান হইতে পূজনীয় গান্ধীজীর কাছে গেলাম, সকলে বাপুজীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে ভাইসরয়ের কাছে গেলাম নিজ নিজ কাজ বুঝিয়া লইবার জন্য। নিয়মানুযায়ী সেখানে আমাদের শপথ গ্রহণ করিতে হইল। ইহার মধ্যে একটা প্রধান কথা ছিল যে আমাদের রাজা জর্জ ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে হইবে।

আমাদের সারা জীবন কাটিয়াছে ব্রিটিশ শাসন হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার সাধনায়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ রাজের আনুগত্যসূচক শপথ গ্রহণ করা কতদূর উচিত হইল সেই প্রশ্ন অনেকের মনকে তোলপাড় করিতে লাগিল। কথা হইল যে, ইংরেজের শাস্ত্রে এই প্রকার শপথ একটি আবশ্যকীয় অংগ, আবার প্রজাতন্ত্রে শাসনকার্য প্রজার মতানুসারে চলিবে ইহাও অনিবার্য অংগ। প্রজাতন্ত্রের সম্মতি বিনা রাজা কিছুই করিতে পারেন না, আর প্রজাতন্ত্রের মতামতও পার্লামেণ্টে পাশ করাইয়া লইতে হয়। সেই সম্মতি অনুসারে প্রধানমন্ত্রী কার্য পরিচালনা করেন। রাজা উহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর তিনি যে ভাষণ দেন তাহা ঐ মন্ত্রিদেরই প্রস্তুত করা আর কাজ যাহা করেন তাহাও মন্ত্রীদের কথামত। একজন আইনশাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে প্রধান-মন্ত্রী রাজার কাছে কাগজপত্র পেশ করিলে রাজাকে উহাতে সহি দিতেই

হয়, এমন কি যদি সেই কাগজে রাজার ফাঁসির হুকুমনামা থাকে তাহাতেও সহি দিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাজার নাই। এইরূপ এক ঘটনা তো বৎসর কয়েক পূর্বেই হইয়া গিয়াছে যখন প্রধানমন্ত্রী বল্‌ডুইনের সম্মতি মানিয়া লইয়া রাজা অষ্টম এড্‌ওয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল। ইংলণ্ডেই যখন এই রীতি তখন ভারতকে স্বাধীন করার এই প্রচেষ্টার সময় এই শপথ লইয়া বিরোধ করা সঙ্গত হইবে কি? বিশেষ লোকে যখন এইভাবেই উহাকে গ্রহণ করিয়াছে। বল্‌ডুইন যদি রাজাকে গদি ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন তবে ভারতের মন্ত্রীও ইংরেজকে ভারত ছাড়িয়া যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারিবে, এমন শপথ মানিয়া লইলেও। এই হিসাবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ আমরা দেখিলাম না এবং সকলেই শপথ লইলাম।

আমাকে কৃষি ও খাদ্য বিভাগের ভার দেওয়া হইল। সারা দেশে প্রচণ্ড অন্নসংকট—বিশেষত দক্ষিণের যে-সব প্রদেশে শুধু ভাতই খায়। ১৯৪৫ সনে বর্ষা খুব কম হইয়াছিল, সেজন্য সর্বত্র, বিশেষ দক্ষিণে, ধানের ফসল মরিয়া গিয়াছিল। শীতেও তেমন বৃষ্টি হইল না, সেজন্য রবিশস্যও কম হইল। আগেই যুদ্ধের বৎসরে চাউলের ঘাটতি হইয়াছিল কারণ বর্মা হইতে চাউল আমদানি করা যায় নাই। হিন্দুস্থানের কতকগুলি প্রদেশে লোকের প্রয়োজনমত ধান উৎপন্ন হয় না, ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আনিয়া সেই ঘাটতি পূরণ করা হয়। ঐখানকার আমদানি বন্ধ হওয়ায় মুশকিল হইল। বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের ইহাও একটি কারণ। ১৯৪৬ সনের গোড়াতেই আশঙ্কা হইতেছিল যে এই বৎসর অন্নের অভাবে আকাল পড়িবে। এজন্য ভারত সরকার বিদেশ হইতে চাউল আমদানি করার কথা ভাবিতেছিলেন। আজকাল দুনিয়াভর অন্নসংকট দেখা দেয়, সেজন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হইয়াছে, এই সংস্থা যেখানে উদ্‌বৃত্ত চাউল পাওয়া সম্ভব সেই সব জায়গায় খোঁজ করিয়া ঘাটতি অঞ্চলে সেই চাউল পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। ভারতবর্ষও ঐ সংস্থার সভ্য, সেজন্য ভারতের পক্ষ হইতে ঐ সংস্থার কাছে খাদ্যের জন্য আবেদন জানান হইয়াছিল।

বিদেশের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া আমেরিকায়, এখানকার খবর পৌঁছিয়াছিল। আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি হুভার সাহেব সারা পৃথিবীর খাদ্য পরিস্থিতি দেখিতে দেখিতে অবশেষে হিন্দুস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানকার শোচনীয় অবস্থায় অভিভূত হইয়া সাহায্য দিতে চাহিলেন। তখন আমেরিকা হইতে বেসরকারি জনকয়েক লোক হিন্দুস্থানের অবস্থা দেখিতে আসিলেন। ইঁহারাও আমাদের শোচনীয় খাদ্যসংকট দেখিয়া বিচলিত হইলেন। ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতকে অন্ন সাহায্য করিলেন, কিন্তু তাহা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতি

সামান্য। কারণ হয়তো ইহাদের পুঁজির অল্পতা, আর এক কারণ, ইহাদিগকে সকল দেশকেই কিছু সাহায্য করিতে হয়। আমি যেদিন হইতে এই দপ্তরের ভার হাতে লইয়াছি সেই দিন হইতে আশঙ্কায় মন ব্যাকুল, কবে না জানি অনাহারে লোক মরিতে থাকিবে। দেশে ও বিদেশে যে পরিমাণ খাদ্য মজুত পাওয়া গেল, প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে তাহা প্রদেশগুলির মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। এই কাজে হাত দিয়াই আমি দেখিলাম, গান্ধীজী আগে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। তিনি বলিয়াছিলেন, বিদেশের উপর বিশেষ ভরসা করা যায় না, কেননা সাহায্য গ্রহণ করিলেই তাহার হাজার রকমের অন্ধি-সন্ধি। নিজের দেশ ও নিজের দেশবাসীর উপর নির্ভর করাই ভাল। আমি অবিলম্বে ব্যাপারটি বুঝিয়া লইলাম ও দেশের কাছে আবেদন করিলাম যে, যে যতটা করিতেছে তাহার অপেক্ষা অধিক অন্ন উৎপাদন করুক, যে যতটা পারে কম খাইয়া চাউল বাঁচাইয়া চলুক আর সেই উদ্‌বৃত্ত চাউল অপরকে দিক।

বিদেশ হইতে যতটা আমদানি করা সম্ভব তাহার দিকে জোর চেষ্টা চলিতে লাগিল আর যেখানে যতটা ভাত খাওয়া কমানো যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রহিল। দিন-রাত চিন্তার বিরাম নাই। শুধু আমার নয়, আমার বিভাগে সকল কর্মীরই—তাঁহারা যেন অধিকতর চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেন না এতদিন পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ভার তো তাঁহাদের উপরেই ছিল। আমি তো এই মোটে আসিয়াছি। সুখের বিষয় আমার সহকর্মীদের আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র মতভেদ ছিল না—এবং আমরা সকলে মিলিয়া-মিশিয়া এই সংকট সময়ে দেশকে বাঁচাইবার কাজে লাগিয়া আছি। আমাদের মতে সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর এই চারি মাস সর্বাপেক্ষা কঠিন সময়। ডিসেম্বর তো শেষ হইয়া আসিল। ঈশ্বরের দয়ায় এখন পর্যন্ত অন্নাভাবে কেহ মারা পড়ে নাই। লোকের খাওয়ার বরাদ্দ খুব কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা চাউল ভিন্ন গম যব, জোয়াড়ি কিছু খাইত না, তাহাদের এখন অন্নাভাবে সব কিছুই খাওয়ার জন্য তৈয়ারি করা হইতেছে, কিন্তু মানুষকে গম মকাই-ই বেশি দিতে পারিতেছি, চাউলের অংশ খুবই কম। লোকের খোরাক সেজন্য খুবই কম হইয়া পড়িয়াছে, আর আগে কোনদিন এমন খাদ্যের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তবু, এত কষ্ট সত্ত্বেও, যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্য সহকারে সাধারণ লোকে এই সংকটকাল পার করিয়া থাকে। বর্ষা মোটামুটি ভালই হইল এবং ধানের ফসল মাঝামাঝি ধরনের। এখন তো ধান লোকের চোখের সামনে, কেহ কেহ বা গোলায় তুলিয়াছে আবার কোথাও কোথাও চাউল তৈয়ারিও হইয়া গিয়াছে। যে-সব অঞ্চলে লোকের চাউলই খাদ্য তাহাদের জন্য ভয় কমিয়া আসিল এখন ভাবনা হইল সেই

সব প্রদেশের জন্য যেখানে গম প্রধান খাদ্য। চাউলের অভাবের সময় যে সব প্রদেশ হইতে গম আনিয়া খাদ্যের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখন সেই সব প্রদেশে গম ফিরাইয়া দিতে হইবে। গমের ফসল উঠিবার এখনও কমপক্ষে তিন-চারি মাস দেরি। ইহার মধ্যে ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও না জানি কত বিপদ আকাশ হইতে আসিতে পারে। বিদেশ হইতে, বিশেষত আমেরিকা হইতে গম পাওয়ার যে আশা ছিল তাহা পূর্ণ হইল না, তাহার কারণ সেখানে জাহাজের ডকের আর কয়লাখনির মজুরদের হরতাল। সেজন্য গমের ঘাটতি থাকিয়াই গিয়াছে। ঈশ্বর যে উপায়ে চাউলের সংকট দূর করিয়া দিলেন, আশা হয় সেইভাবেই গম-সংকটেও তিনিই ত্রাণ করিবেন।

অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশকে আপনার খাদ্য আপনাকে উৎপন্ন করিতে হইবে। এজন্য বিদেশের ভরসায় থাকা কোন কাজের কথা নয়। সমস্যাটি সহজ নয়। আমাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। চাষের উপযুক্ত পতিত জমি আর বড় একটা নাই। অনেক চাষ তো হইয়াই গিয়াছে। আগে পাঁচ-ছয় কোটি মণ চাউল বাহির হইতে আনাইতে হইত। এখন লোক বৃদ্ধির সংগে সংগে খাদ্যের প্রয়োজনও বাড়িয়াছে, ক্রমে আরও বাড়িবে। এই ঘাটতি পূরণের কাজ কৃষি বিভাগের। আর একটা কথা হইল যে, আমাদের জনসাধারণ যে খাদ্য খায় তাহা তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। ঐ খাদ্যে অনেক কিছু জিনিসের অভাব আছে যে অভাবগুলি পূরণ করা দরকার। এইজন্য ভাত, রুটি ছাড়া দুধ, মাছ, মাংস, তেল, ঘি, ফলমূল সব্জি ইত্যাদি সব কিছুই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা দরকার। আমার এই দিকে বিশেষ উৎসাহ এবং কি ভাবে খাদ্য ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় তাহারই চেষ্টায় আমি দিনরাত লাগিয়া আছি। সরকার তো কেবল উপায় প্রদর্শন করিতে পরামর্শ দিতে, পথ বাতলাইয়া দিতে পারেন এবং এইভাবে অল্পবিস্তর সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু এই কাজ জনসাধারণের। আমাদের জনসাধারণের প্রধান কাজ কৃষিকর্ম। তাহাদিগকেই এই ভার সামলাইতে হইবে। কি ভাবে এই কাজ তাহারা ভালরূপে করিবে তাহারই জন্য সহায়তা সরকারকে করিতে হইবে। কৃষি বিভাগের মুখ্য হিসাবে আমার এই সমস্যায় জবাবদিহি আছে। কর্মচারীরা সকলেই সাহায্য করিতেছেন কিন্তু কাজটি এত বিরাট ও ব্যাপক যে প্রায় চারি মাস পরেও বলিতে পারিতেছি না যে আমরা এতদূর করিয়াছি, আরও এতদূর পর্যন্ত করিতে পারিব। এই সংকট মোচনের কাজে জনসাধারণও প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। আমার আবেদনের ফলে হাজার হাজার লোক তাহাদের খোরাক কম করিয়াছে। তাহারা মাঝে মাঝে উপবাস করিয়া অন্ন বাঁচাইবে সংকল্প

করিয়াছে এবং অন্য নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছে। আমার আশা আছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারেও তাহারা আমার সহায় হইবে।

লর্ড ওয়াভেল বরাবরই চেষ্টায় ছিলেন, যেন মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে ও বিধান পরিষদে যোগ দেয়। আমাদের নিয়োগের অল্প দিন পরেই তিনি মিঃ জিন্নার সঙ্গে পত্রালাপ সুরু করিলেন এবং একটা সময় আসিল যখন মিঃ নেহেরুরও উঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা দরকার হইল। ভূপালের নবাব সাহেব ইতিমধ্যে মধ্যস্থতা করিলেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে মিঃ জিন্নার একটা বোঝাপড়া হউক। কিন্তু এই চেষ্টা বিফল হইল। শেষে মিঃ জিন্না ঠিক করিলেন যে ভাইসরয়ের অনুমতিক্রমে, কংগ্রেসের সম্মতি বিনাই অন্তর্বর্তী সরকারে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইবেন। আমরা তিনটি আসন খালি করিয়া দিলাম আর পাঁচ জন মুসলিম লীগের সদস্য নিযুক্ত হইলেন। এই নিয়োগের সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা লিখিয়া রাখা খারাপ হইবে না। ১৯৪৬ সনের ১৬ই জুনের বক্তব্যের মধ্যে কেবিনেট মিশন এবং ভাইসরয় উভয়েই বলিয়াছিলেন যে এই অন্তর্কালীন সরকারে তাহারাই যাইতে পারিবে যাহারা ১৬ই মের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিল এবং তখন যদি দুই পক্ষেরই ইহাতে সম্মতি পাওয়া যাইত তখন দুই পক্ষ হইতে সদস্য লইয়া অন্তর্কালীন সরকার গঠন করা যাইত। ঐ সময় কংগ্রেস রাজী ছিল না বলিয়াই সরকার গঠিত হয় নাই। ইহাতেই রুষ্ট হইয়া লীগ কাউন্সিল স্থির করিলেন যে দুই প্রস্তাবের স্বীকৃতিই প্রত্যাহার করিয়া নিবে।

অক্টোবর মাসে লর্ড ওয়াভেল যখন লীগের মেম্বারদের নিয়োগ করিতে চাহিলেন তখন প্রশ্ন হইল যে লীগ ১৬ই মের প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিয়াছে কি দেয় নাই। স্বীকার করিয়া নিলে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে উঁহারা বিধান পরিষদে যাইবেন ও পরিষদের কাজ সম্পূর্ণ করিবেন। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লর্ড ওয়াভেল আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে তিনি লীগকে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে অন্তর্কালীন সরকারে যোগ দেওয়ার অর্থ ১৬ই মের প্রস্তাব মানিয়া লওয়া।

দ্বিতীয় কথা হইল, অন্তর্কালীন সরকারে যাইবার আগে আমরা ঠিক করিয়া নিয়াছিলাম যে কেবিনেটের সদস্য হইয়া আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিব। ইহার তাৎপর্য এই যে প্রত্যেক মন্ত্রীর বিভাগীয় কাজের জন্য সমগ্র কেবিনেটের দায়িত্ব থাকিবে এবং যদি কোন এক কারণে একজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয় তবে সমগ্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে। ইহার ফলে কেহ নিজের মর্জি বা ইচ্ছানুসারে চলিবেন না, সকলে একমত হইয়া কাজ করিবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। আমরা তো এই নীতি অনুসারে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম। আমাদের মনে

হইয়াছিল, প্রচলিত সরকারি নীতি হইতে আমাদের নীতি বেশ অন্য রকম হইবে এবং কেবিনেটের কাজে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপ করার অবকাশ কমই মিলিবে। কারণ এই নীতিতে একের কাজে হস্তক্ষেপের অর্থ হইবে সকলেরই কাজে হস্তক্ষেপ করা এবং তাহাতে মন্ত্রিসভা ভাঙিগয়া যাইতে পারে।

আগে তো একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে নিযুক্ত হইতেন। একের সঙেগ অন্যের সম্পর্ক ছিল কেবল ভাইসরয়ের মারফৎ, আর সেজন্য একের জন্য অন্যের পদত্যাগের কথাই উঠিত না। আমাদের নিয়োগের পর হইতেই একজিকিউটিভ কাউন্সিল ও কাউন্সিলার নামের পরিবর্তে কেবিনেট ও কেবিনেটের সদস্য নাম চালু হইল। যে সব কাগজপত্রে কাউন্সিলের নাম ছিল ঐ নাম কাটিয়া কেবিনেট লেখা হইল। আমাদের নিজেদের কাজকর্মও এইভাবে চলিতে লাগিল। আমরা সব কয়জন মন্ত্রী সন্ধ্যা পাঁচটার পর নিজেদের ব্যবস্থামত এক জায়গায় মিলিত হইয়া যে যাহার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতাম। লীগ দল কেবিনেটে আসার পরও আমাদের কাজ এইভাবেই চলিবে আমাদের আশা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না।

লীগ দল আসিয়াই কিন্তু এই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিলেন। বলিলেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে কখনই ১৬ই মের প্রস্তাবের অস্বীকৃতিকে প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই এবং অন্তর্কালীন সরকারের সদস্যগণ কেবিনেটের মত কাজ করিবে এমন কথাও তাহারা মানিয়া লন নাই। উঁহাদের মতে একজিকিউটিভ কাউন্সিল যেমন কাজ করিতেছিল তেমনই থাকিবে। পণ্ডিত নেহেরু যখন লীগ দলকে আমাদের কেবিনেটের সন্ধ্যা-কালীন ঘরোয়া বৈঠকে আহ্বান করিলেন, উহারা সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ।। তখন অবস্থা দাঁড়াইল যে ভাইসরয়ের উপস্থিতিতে যদি কেবিনেটের কোন বিশেষ বৈঠক হয় তবেই কেবল আমরা দুই দল মিলিত হই এবং তখন যে সব বিষয় উপস্থাপিত হয় তাহারই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলে।

এদিকে তো অন্তর্কালীন সরকারের কাজ এইভাবে চলিতেছিল, অপর-দিকে কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশে বড় রকম সোরগোল পড়িয়া গেল। বোম্বাই, প্রয়াগ, ঢাকা ইত্যাদি নানা জায়গায় ছোরাছুরি চলিতে লাগিল আর ফলে বহু নির্দোষ পথচারী লোক মারা পড়িতে লাগিল। বিহারের অনেক লোক কলিকাতায় বাস করে। তাহাদের অনেকে কলিকাতার দাঙগায় মারা পড়িল, এবং অন্যভাবে নাকাল হইল। যাহারা পলাইয়া দেশে ফিরিল তাহারা নিজেদের ও পরের দুঃখের কাহিনী শুনাইতে লাগিল। ফলে বিহারবাসীর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিল। মজঃফরপুর জিলার

বেনীবাদ গ্রামে এক উড়ো খবর আসিল যে সেখানে একজন মুসলমান কলিকাতা হইতে একজন হিন্দু মেয়েকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। এই খবরে এক দল হিন্দু ঐ গ্রামে গিয়া জনকয়েক মুসলমানকে মারিয়া ফেলে আর জনকতক মুসলমানের ঘর জ্বালাইয়া দেয়। খবর পাইয়া সরকার ঐ গ্রামের লোকদের উপর জুলুম জবরদস্তি করিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করেন ও সমগ্র গ্রামের উপর জরিমানা ধার্য করেন। এই ঘটনার খবর পাইয়া মুসলমানদের মধ্যে অশান্তির উদ্রেক হইল। কয়েকদিনের মধ্যে জোর খবর আসিল যে নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায়, যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশি, মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু করিয়াছে। বহু লোক মরিয়াছে, হিন্দুর গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, হাজার হাজার হিন্দুকে জোর জবরদস্তি করিয়া মুসলমান করা হইয়াছে। বহু হিন্দু মেয়েদের জোর করিয়া তাহারা বিবাহ করিয়াছে, অনেককে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে বা অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়াছে। এই দুই জেলার অনেক জায়গার সম্বন্ধেই এই বিবরণ শোনা গেল। প্রথমে তো এই অবস্থা কতদূর পর্যন্ত ছড়াইয়াছে তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যাইতেছিল না। হাজার হাজার হিন্দু ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া অথবা লুটপাঠ ও আগুনে সর্বস্বান্ত হইবার পর পলাইয়া সহরের দিকে বা অন্যত্র আশ্রয়ের জন্য গেল। ঐ এলাকায় হিন্দু মাত্রেরই যাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল কারণ সমগ্র অঞ্চলটির উপরেই মাসিক কর ধার্য করা হইয়াছে। শুনা যাইতে লাগিল যে সেখানকার সরকার বিপ্লব দমনের জন্য যথেষ্ট উচিত ব্যবস্থা করিতেছেন না এরূপ অভিযোগ শুনা যাইতে লাগিল এবং যেমন কলিকাতায় দাঙ্গাকারীরা যথেচ্ছ আচরণ করিতেছিল প্রতিরোধ হয় নাই সেইরূপই ঐখানেও চলিতেছে। বেশ কয়েক দিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলিল। ঐখানকার আর কলিকাতার কাণ্ডের মধ্যে বড় এক তফাৎ ছিল, কলিকাতায় সংখ্যায় অনেক বেশি। এইজন্য গোড়ার দিকে হিন্দু অনেক মরিলেও পরে তাহারা নিজেদের বাঁচিবার জন্য জোর ব্যবস্থা করিয়া লয়। কিন্তু নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় তাহা সম্ভব হইল না কারণ সেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় খুব কম ও শক্তিতেও ক্ষীণ। এই সব ঘটনার বিবরণ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল এবং চতুর্দিকে হিন্দুরা বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

এই ঘটনাবলীর ফলে হিন্দুদের মনে প্রতিশোধের ভাবনা জাগিয়া উঠিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগের নেতাগণ আর সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন বিষ উদ্গীরণ করিয়া হিন্দুদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার মত আহ্বানবাণী প্রচার করিতে লাগিল। পণ্ডিত জওয়াহরলালজী সরকারের মন্ত্রী হিসাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ঐখানকার সরকারী রাজনৈতিক বিভাগ সরাসরি ভাইসরয়ের অধীনে থাকিয়া কাজ

করিতেছিল। শুনা যাইতেছে, বিপরীত প্রচারের দরুণ ঐ প্রদেশের কোন কোন জায়গায় জনসাধারণকে এমন উত্তেজিত করা হইয়াছে যে জনকতক লোক পণ্ডিতজীর আর বাদশা খাঁর সঙ্গে কেবল দুর্ব্যবহারই করে নাই, অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে। এক জায়গায় তো এমন জোর দাঙ্গা হইয়াছে যে লোকে কোনমতে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। বাদশা খাঁর হাতে এমন জোর চোট লাগে যে একটা হাড় ভাঙিগয়া যায় আর মাস ভর হাত বাঁধিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু এই সব দুর্ঘটনা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে পণ্ডিতজীর ওখানে যাওয়াটা ভাল হইয়াছে এবং সেখানকার লোকে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছে—তাহাদের আনন্দ ও প্রীতির পরিচয় দিয়াছে। হিন্দুদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ভালই হইল। উহারা বেশ বুঝিল যে, মুসলিম লীগ ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলাইয়া হিন্দুদের চাপিয়া রাখিতে চায় এবং এতদিন তাহাই করিতেছে।

বিহারে দারুণ দাঙ্গা বাধিয়াছে। কয়েকটি জায়গায় ছোটখাটো ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দুরা মুসলমানদের গ্রামে জোর জবরদস্তি চালাইতেছে পাটনা জিলার কয়েক জায়গায় অনেক মুসলমান মারা গিয়াছে, অনেকে ঘরে আগুন লাগান হইয়াছে, এবং অন্য নানাভাবে উৎপাত ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছে। এই আগুন মুঙ্গের ও গয়া জেলার বহু স্থানে গিয়া পেঁাছিয়াছে। প্রথম আরম্ভ হয় ছাপরা জিলার কয়েকটি সহরে, পরে কয়েকটি গ্রামেও বহু মুসলমান নিহত হয়। দিল্লীতে এই দুর্ঘটনার খবর পেঁাছিল। পণ্ডিত জওয়াহরলাল ও সর্দার বল্লভভাই বাংলা দেশের অবস্থা দেখিতে কলিকাতা গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে তাঁহারা পাটনায় আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিঃ লিয়াকত আলি এবং সর্দার নিস্তারও ছিলেন। উঁহারাও পাটনায় নামিলেন। কাজ থাকায় সর্দার বল্লভভাই আর মিঃ লিয়াকত আলি দিল্লী ফিরিয়া গেলেন কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু এবং সর্দার নিস্তার বিহারে রহিয়া গেলেন। আমিও প্লেনে ঐখানে আসিলাম। আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যগণ খুব তৎপরতার সহিত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন এবং পুলিশের সাহায্যে যেখানে যেখানে সম্ভব বিপ্লব দমনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেনাবিভাগের সহায়তাও চাওয়া হয় কিন্তু তাহা পাইতে কিছু দেরি হইল। পণ্ডিত জওয়াহরলাল এবং আমি দৌড়ধাপ করিতে লাগিলাম। ওদিকে গান্ধীজীর কানেও খবর পেঁাছিল, এবং তিনি ঘোষণা করিলেন যে বিহারের দাঙ্গা না থামিলে তিনি আমরণ অনশন আরম্ভ করিবেন। গান্ধীজী তখন নোয়াখালিতে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব আবার স্থাপন করার চেষ্টায় রত। সেখান হইতে এই ঘোষণা করিলেন। ফলে বিহারের দাঙ্গা সহজেই তখন বন্ধ হইল। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল তাহা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বিরাট। কত লোক মারা গিয়াছে

তাহার ঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই কিন্তু হাজার হাজারে মরিয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুসলিম লীগের সদস্যগণ অবশ্য অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে লাগিল এবং মিঃ জিন্না ঘোষণা করিলেন যে হাজার ত্রিশের মত লোক মারা গিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল, আমার মনে হয় এই সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ হইবে। অবশ্য সংখ্যা যাহাই হউক, কাজটা যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও গর্হিত হইয়াছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহাতে হিন্দুদের নিতান্তই লজ্জিত হওয়া উচিত। আপোষে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার চেষ্টার পথে ইহা এক বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এই দাঙ্গার মূলে ছিল হাজার হাজার মুসলমানের নিজ নিজ জায়গা ছাড়িয়া নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করিয়া সহরে চলিয়া আসিয়াছে। উহাদের থাকিবার ও খাইবার সুব্যবস্থার চেষ্টা সরকার করিতেছে ও মুসলিম লীগের পক্ষ হইতেও বহু কর্মী এই সব জায়গায় আসিয়া জড়ো হইয়াছে। দাঙ্গা তো দিন কয়েকের মধ্যেই বন্ধ হইল কিন্তু ইহার ফল এখনও চোখের সম্মুখে দেখা যাইতেছে, এবং আরও দীর্ঘ দিন থাকিবে।

এই ধরনের আরেকটি ঘটনা হইয়া গেল মীরাট জেলার গড় মুক্তেশ্বরের মেলার সময়। সেইখানেও বহু মুসলমান মারা যায় এবং পরে তাহারা হিন্দুদের উপর জোর প্রতিশোধ লয়। এই সময় আরেক খবর পাওয়া গেল যে সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু হইয়াছে। একাধিক সহরে কম বেশি ছোরা লইয়া মারামারি কাটাকাটি চলিয়াছে। এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।

এই বৎসর মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল। গড় মুক্তেশ্বরের ঘটনায় সন্দেহ হইতে লাগিল সেখানে কংগ্রেস হইতে পারিবে কি? কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসিল এবং কংগ্রেসের জলসা হইল। যে সমারোহ হওয়ার কথা ছিল, তাহা হইল না। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রদর্শনী হইবার কথা ছিল তাহা হইল না, অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান ঐ সময় সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেসবও হইল না। কংগ্রেসর অধিবেশনেও শুধু প্রতিনিধিদের আসিতে দেওয়া হইল, দর্শকদের আসা বন্ধ করা হইল। অবশ্য এত সত্ত্বেও কিছু সমারোহ হইল এবং অল্প বিস্তর দর্শকও যোগ দিল। আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হইল। দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইল। এক প্রস্তাব ছিল, ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র (republic) কায়েম করা হউক, আর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিধান পরিষদকে বিধানসম্বন্ধীয় নির্দেশ দেওয়া হইল।

আমি দিল্লী হইতেই মীরাট গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়াই শুনিলাম ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের নেতা পণ্ডিত জওয়াহরলাল ও সর্দার বল্লভভাইকে, শিখ নেতা সর্দার বলদেও সিংকে এবং লীগের নেতা মিঃ

জিন্না ও মিঃ লিয়াকত আলিকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমাদের এই আমন্ত্রণের কারণ বুঝা গেল না, কারণ আমরা তো ১৬ই মের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়াই দিয়াছি। কেবল লীগ নিজের অস্বীকৃতির সিদ্ধান্ত এখনো বদলায় নাই। বিধান পরিষদের অধিবেশনের সময় হইয়া আসিল কারণ পহেলা ডিসেম্বর হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইবে এই প্রস্তাব ২৩শে নভেম্বর পেশ করা হইয়াছে। আমাদের পক্ষ হইতে বলা হইল যে আমরা তো ঐখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না কারণ ১৬ই মের প্রস্তাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিলাতের মন্ত্রিসভার সঙ্গে আমাদের যে মতভেদ তাহা তো ঐ মন্ত্রিসভার জানাই আছে, বিলাতে গেলে উহাতে কি পার্থক্য ঘটিবে? অবশ্য ইহা সত্ত্বেও যদি ডাকা হয় তবে আমরা যাইব। প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলির তার আসিল, অবশ্যই আসুন, ১লা ডিসেম্বর বিধান পরিষদের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই ফিরিয়া যাইবেন। লীগ তো আগে যাইবেন বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু যেই মিঃ জিন্নার মনে হইল যে কংগ্রেসকে কিছু আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে অমনি তিনি বিলাত যাইতে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। তিনি তখন করাচিতে। ভাইসরয় সেখানে চলিয়া গেলেন এবং দুইজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হইল। তখন তিনি যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তখন পণ্ডিত জওয়াহরলাল, সর্দার বলদেও সিং, মিঃ জিন্না আর মিঃ লিয়াকত আলি আকাশ পথে ইংলণ্ডে গেলেন।

কেবিনেট মিশন ও ভাইসরয় বারবার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে ১৬ই মের প্রস্তাবের কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হইবে না। কিন্তু এখন তাঁহারা উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দুইই করিলেন, শুধু তাহাই নয় উহাতে আগেকার বক্তব্যের সঙ্গে কিছু নূতন কথা জুড়িয়া দিলেন অথচ বলা হইল যে বিশেষ কিছু অদল-বদল করা হয় নাই, শুধু বক্তব্যের অর্থ একটু স্পষ্টতর করা হইল। এইবার লণ্ডনে যে আলোচনা হইল তাহার ফল যখন ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে জানা গেল তাহাতেই দেখা গেল অনেক অদল-বদল আছে, অনেক নূতন কথাও আছে। এই বিষয়ে বিবেচনার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হইল।

আগে বলিয়াছি যে ৯ই ডিসেম্বর বিধান পরিষদের বৈঠক বসিবে স্থির হইয়াছিল, সেই মর্মে সদস্যদের কাছে নিমন্ত্রণপত্রও চলিয়া গিয়াছিল। এজন্য ঐ অধিবেশন তো করা হইল। ঐ বৈঠকের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার চত্বরের এক অংশ, যেই অংশে পুস্তকালয়টি ছিল, খুব সুন্দরভাবে সাজাইয়া অধিবেশনের জন্য জায়গা করা হইল। এই সব দালানে কথা বলিলে স্বভাবতই কথার প্রতিধ্বনি হয়, সেজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা

হইল যেন সদস্যদের কথাগুলি প্রতিধ্বনিত না হয়। এজন্য নানারূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সদস্যদের ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্য ঘরটি গরম রাখার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এইভাবে ঐ ঘরে ৯ই ডিসেম্বর হইতে বিধান পরিষদের কাজ আরম্ভ হইল।

এখন প্রথম প্রশ্ন উঠিল যে, যতক্ষণ স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত না হইতেছে ততক্ষণ পরিষদের কাজ পরিচালনা কে করিবেন? ঠিক হইল, সভ্যদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই সভাপতি হইবেন। দেখা গেল, আমাদের বিহারের ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ সর্বাপেক্ষা বয়সে বড়। ইনি, স্যর হরিসিং গৌড়, আর শ্রীপ্রকাশম্ তিনজনেরই বয়স প্রায় কাছাকাছি, তবু ডাঃ সিংহই সকলের বড়। সেজন্য তিনিই সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন এবং স্থায়ী সভাপতির নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দিন দুই-তিন খুব দক্ষতার সহিত কাজ পরিচালনা করিলেন।

তখন প্রশ্ন হইল, স্থায়ী সভাপতি কাহাকে করা যায়। উপরে বলিয়াছি যে অন্তর্বর্তী সরকারে আমাদের নিয়োগের আগেই কথা হইয়াছিল যে আমাকে এই কাজের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারে পাঠান হইবে না, এই পদের জন্য রাখা হইবে। পরে অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া আমাকে সরকারে পাঠান হয়। বিলাত যাইবার আগেই পণ্ডিতজী আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। ঠিক হইয়াছিল যে কংগ্রেসের বাহিরে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদের জন্য নির্বাচন করা ভাল হইবে। স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের নামও হইয়াছিল ইনি সুযোগ্য এবং মহানুভব ব্যক্তি এবং এই কাজে আন্তরিকতা আছে। ইনি কংগ্রেসের সভ্য নন, যদিও ইঁহার নির্বাচনে কংগ্রেস ইঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। পরিষদের সভাপতি পদের জন্য লোক আসিতে লাগিলেন তখন পরিষদের সদস্যরা আমাকে পদটি দিবেন স্থির করিলেন। সদস্যরা তো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন বাহিরেও বহু লোকের ইহাই ইচ্ছা। আমি আগে এবিষয়ে কিছু জানিতাম না, কিন্তু একে একে অনেক সদস্য আমার কাছে এবং আমি যেন এই পদটি গ্রহণ করিতে রাজী হই সেজন্য জোর অনুরোধ জানাইলেন। আমি পড়িলাম বিপদে—যে দুইটি বিভাগের ভার আমার উপর আছে তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার সঙ্গে আবার এই কাজ চালানো নিতান্তই কঠিন হইবে। এই ভাবিয়া আমি প্রথমে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম। ওয়ার্কিং কমিটিতে যখন এই বিষয়টি উঠিল, তখন আমি বলিলাম যে এই পদ যদি আমাকে লইতে হয় তবে অন্তর্কালীন সরকারের দায়িত্ব হইতে আমাকে মুক্তি দেওয়া হউক। কেহ রাজী হইলেন না। পরিষদের সদস্যগণ ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে আমাকেই এই ভারটি দেওয়া হইবে। অবশেষে নাচার হইয়া ভয়ে ভয়ে আমি ভার

গ্রহণে স্বীকৃত হইলাম। আমার নাম পেশ করা হইল এবং সর্বসম্মতিক্রমে আমি নির্বাচিত হইলাম। আমাদের ধন্যবাদ দিবার সময় লোকে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিলেন। কিন্তু আমি তো এই দায়িত্বের ভারে দমিয়া গেলাম। এখনও আমার সেই অবস্থা। এদিকে দিন কয়েক ধরিয়া বৈঠক চলিতেছে। কোনও রকমে কাজ চালাইতেছি; তবে এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন বিরোধিতা বা জটিল প্রশ্ন ওঠে নাই। দেখা যাক, ভবিষ্যতে কি হয়। ঈশ্বরই চালাইয়া লইবেন।

উপরে বলিয়াছি যে, ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নিখিল ভারত কমিটির এক সভা ডাকা হইয়াছে। পাঁচ ও ছয়ই জানুয়ারি ঐ সভার অধিবেশন হয় আর ঠিক হয় যে ১৬ই মের প্রস্তাবের যে অর্থ ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাবের মধ্যে করা হইয়াছে সেই অনুসারেই কাজ করা হউক। তবে হ্যাঁ, কোন প্রদেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে জোর-জবরদস্তি আমরা বরদাস্ত করিব না এবং কোনখানে যদি ঐ রকম কিছু হয় তবে তাহার প্রতিরোধের জন্য আমরা যাহা উচিত মনে করিব তাহাই করিব। দেখা যাক, তাহাতেও মুসলিম লীগ বিধান পরিষদে যোগ দেয় কিনা। উহাদের অথবা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এখন কংগ্রেসের সঙ্গে ১৬ই মের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ থাকিতে পারে না। তবে দেখা যাক উহারা কি করে।

এদিকে তো বিধান পরিষদের বৈঠক চলিতেছে, অপর দিকে আমি আগেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিভাষণ দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেজন্য ১৫ই ডিসেম্বর সেখানে যাইতে হইল। আকাশ পথে পণ্ডিত জওয়াহরলালের সঙ্গে সেখানে গেলাম। উঁহাকে ডক্টর উপাধি দেওয়া হইল আর আমি দীক্ষান্তে বক্তৃতা দিলাম। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কুড়ি বৎসর চলিতেছে। প্রারম্ভে পণ্ডিত মালব্যজীর তো মত ছিল যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় পরিস্থিতি এমন হইল যে এই মতের পরিবর্তন করিয়া ইংরেজী ভাষাকেই মাধ্যম করিতে হইল। নাগপুরের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু হিন্দী ও মারাঠী এই দুই ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিয়াছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রুটিকে বহু লোকে নিন্দা করিতে লাগিল। উহার রজত জয়ন্তীর সময়ে মহাত্মা গান্ধীজীও হিন্দীর অভাব আর ইংরেজীর প্রাচুর্য দেখিয়া নিন্দা করেন। আমার অভিভাষণে আমি ইহার উপরে জোর দিয়াছিলাম আর বলিয়াছিলাম যে এখন আর ইহার পক্ষে কোন যুক্তিই খাটে না কারণ এখন হিন্দীতে যথেষ্ট পাঠ্য-পুস্তক লেখা হইয়াছে আর যাহা যাহা নাই তাহাও সহজেই লিখাইয়া লওয়া যায়। আমার এমনও মনে হয় যে জনসাধারণও উহা পছন্দ করে। জানি না, কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে মনোভাব কি।

এইবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা, কর্তা-ধর্তা মহামান্য মদনমোহন মালব্যজীর সবেমাত্র দেহাবসান হইয়াছে। এই একজন মহান কর্মবীর যোগী পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিন তাঁহার স্মৃতি বহন করিবে। আবার স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াসের মধ্যেও তাঁহার দানের পরিমাণ অল্প নয়। তিনি তিন বার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মতভেদ সত্ত্বেও কংগ্রেসকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। যখনই কংগ্রেস কোন কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছে, তিনি অদম্য উৎসাহে কংগ্রেসের সহায়তা করিয়াছেন।

হিন্দু মহাসভার তো তিনি এক রকম জন্মদাতা আর প্রাণই ছিলেন বলা যায়। ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য তিনি হিন্দুদের যে সেবা করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করা যায় না। দেশ সেবকদের জন্য প্রেম আর সদয় ব্যবহার তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে এক প্রকার শূন্যতায় ছাইয়া গিয়াছে। তাঁহার শেষ দিনগুলি এক বিপত্তির জন্য দুঃখপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাকান্ত মালব্যর মৃত্যুর আঘাতে স্বাভাবিকভাবে তাঁহার বুক ভাঙিগয়া গেল, কিন্তু দেশকে তিনি একদিনের জন্যও ভোলেন নাই, দেশ স্বাধীনতা পাইতে চলিয়াছে তাহাতে আনন্দ আর বর্তমান পরিস্থিতিতে দুঃখবোধ দুইই ছিল। তাঁহার জীবন হইতে অনেক কিছু শিখিবার আছে আর তাঁহার জীবন আমাদের চিরদিন পথ প্রদর্শক হইয়া থাকিবে।

বিহারের এইরূপ অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল পূজনীয় বাবু ব্রজ-কিশোর প্রসাদের মৃত্যুতে। ইদানীং স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য বৎসর কয়েক তিনি সার্বজনীন কাজে যোগ দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর দেশ তাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এতদিন যেভাবে দেশের সেবা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আর তাঁহার অভাবে যে ক্ষতি হইল তাহার জন্য ব্যথিত হয় নাই এমন লোক বিহারে ছিল না। আমার পক্ষে তো ইহা প্রচন্ড আঘাত। সেই তীক্ষ্ম বুদ্ধি, অবিচল দৃঢ়তা, তীক্ষ্ম দূরদর্শিতা। সেই মহান্ ত্যাগশক্তি আর নিঃস্পৃহতা, সেই অতুলনীয় সুনাম লইয়া বাঁচিবার সংকল্প, সেই নির্ভীকতা, আর কোথায় দেখিতে পাইব? আমরা বিহারবাসীরা যখন অবসর বিনোদনের সাধন হিসাবে অল্পক্ষণের জন্য সময় দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করিতেছিলাম তখন তিনি আমাদের সম্মুখে অখন্ড সেবার আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন আর আমাদের মধ্যে অনেককে এই ব্রতে ব্রতী করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে কখনও দুর্বলতা আসিয়া পড়িলে তিনি আপনার অটল প্রতিজ্ঞা দ্বারা আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেন আর কাজের শৈথিল্য ও অবসাদ হইতে আমাদের রক্ষা করিতেন। তিনি যখন কিষাণের সেবাকাজ আরম্ভ করেন তখন

নীলকরদের দুর্দান্ত প্রতাপ ছিল আর তাহাদের হইয়া কিছু বলা নিরাপদ ছিল না। আমি যেবার এণ্ট্রান্স পাশ করিলাম সেবারেই আমি তাঁহার স্নেহের অধিকারী হই আর আমার জীবনের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি আমাকে চিরদিন কত না সাহায্য করিয়াছেন। পরে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে অন্য একটা সম্বন্ধও হইয়াছিল, কিন্তু সার্বজনীন কাজে তাহার জন্য কোনও প্রভেদ ঘটে নাই। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি একরকম ঘরের লোকেরই মত আমাদের পরিবারের সব কাজে সাহায্য করিতেন। রোগ আসিয়া বাধা না দিলে ঐরকমই চলিত। সেইজন্য দিল্লীতে বসিয়া তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমি গভীর দুঃখ অনুভব করিলাম। মহাত্মাজী তাঁহার পুত্রদের নিকট যে সান্ত্বনাসূচক তার প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষেও পরম সান্ত্বনার কারণ হইল। মহাত্মাজী লিখিয়াছিলেন, তাঁহার শরীরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যু তাঁহার পক্ষে সুখেরই কারণ, দুঃখের নয়, আর তাছাড়া আত্মা তো অমর। তাঁহার জন্য চিন্তা করা বৃথা। আর তাঁহার রোগযন্ত্রণা দেখিয়া ইদানীং যে কষ্ট হইত, তাহা আর হইবে না। ঈশ্বরই তাঁহার পুত্রদের সহায় হইবেন।

তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী বিভাবতী দারভাঙ্গায় উহার মা ভাই যেখানে ছিলেন, সেখানে গেল। শ্রাদ্ধের পর স্ত্রীকে সেখানে রাখিয়া সে পাটনায় চলিয়া গেল। দিন কয়েকের মধ্যেই, কি জানি কি হইল, হঠাৎ এক-দুই দিনের অসুখেই সে চলিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় অসুখের খবর পাইয়াই দারভাঙ্গা যাওয়ার জন্য পাটনা হইতে রওয়ানা হয় কিন্তু পথেই সে স্ত্রীর দেহান্তের খবর পাইল। আমি বিহারের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার খবর পাইয়া পাটনা যাইতেছিলাম, এমন সময় এই খবর আসিল। আমি সেইখানে চলিয়া গেলাম। শিশুদের কোলাহল, মেয়েদের কান্নাকাটি শুনিলাম। সেদিন মৃত্যুঞ্জয় দারভাঙ্গা গিয়াছিল। দুই দিন পরে সেখান হইতে দাহক্রিয়া করিয়া ফিরিয়া আসিল। আমি পাটনা জিলার গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বন্ধ করিবার কাজে লাগিয়া থাকিলাম। যেখানে এত বেশি লোক মারা গিয়াছে, এত সব ঘরে শোকের ক্রন্দন উঠিয়াছে, সেখানে নিজের শোক যেন লজ্জায় চাপা পড়িয়া গেল। অনেক ছুটাছুটির ফলে আমি পাটনায় অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। এজন্য কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া যাইতে হইল। ইহার মধ্যে শ্রাদ্ধের কাজও শেষ হইল।

দুই-এক মাসের মধ্যে অন্য এক শোকের কারণ উপস্থিত হইল। দীর্ঘকাল রোগের পর শিশু প্রকাশ রাঁচিতে মারা গেল। রোগের প্রকোপ খুব বাড়িলে আমাকে টেলিফোনযোগে দিল্লীতে খবর দেওয়া হইল, যাওয়ার জন্য তৈয়ারি হইতেছি, এমন সময় খবর আসিল সে চলিয়া গিয়াছে। ইহা প্রচণ্ড আঘাত। তাহার বড় ভাই মোহন বার বৎসর পূর্বে চলিয়া গিয়া-